২৯৭৭৩

(গল্প-ভারতী)

বার্ষিক-সূচী

~~আষাঢ় ১৩৭১ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২~~

বিষয়		পৃষ্ঠা
অ		
অমৃত কথা ও কাহিনী	...	১৬, ১৭৪, ২৪১, ১০১, ৪৮৩, ৫১৪, ৬৩৮, ৭৩১, ৮৮৬, ১০৬৭
অন্তরীক্ষে (কার্টুন)	...	৯৭,২০০,৩০৫,৪০২,৪৮৪,৮১২,৮৮৪ ৯৯২
অন্ধকার পেরিয়ে (গল্প)—শ্রীরজত রায় চৌধুরী	...	২১৯
অন্ধকার মুখ (গল্প)—শ্রীরমণীরঞ্জন মজোপাধ্যায়	...	১১৯
অথ মেছুনী পর্বম্ (ব্যঙ্গ গল্প)—শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)	...	৪৪৪
অসমাপ্ত (গল্প)—শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৯৩৯
অপমৃত্যু (গল্প)—শ্রীঅশোক সেনগুপ্ত	...	৯০৭
অবিস্মরণীয় স্মৃতি (স্মৃতি)—কিওশোর প্রেমোক	...	৯৬৩
আ		
আজও যা ভুলিনি (স্মৃতিকথা)—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	৮৯
" " —শ্রীনরেন্দ্র দেব	...	১৮৪
" " —স্বর্গীয় সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	...	৪০৪
আত্মপরিচয় (উদ্ধৃতি)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০৬
আগমনী (গান, স্বরলিপি)—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫ (পূজা সংখ্যা)
আপসহীন সংগ্রামের প্রতীক উন্নইন চার্চিল (জীবনকথা) —শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৬৯২
আরশি (গল্প)—শ্রীসমরেশ দাশগুপ্ত	...	৭৫৭
আধুনিক কালের চলতি ভাষার প্রবর্তক বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ) —শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়	...	৮৩১
আঁধারে-আলোয়—তরুণ মজোপাধ্যায়		১০২৫
ই		
ইলোরায় (ভ্রমণ)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	...	৩১৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
উ		
উদাত্ত আহ্বান (মহাপুরুষ-বাণী)	...	১, ১০৫, ২০৫, ২৯৭, ৪০২, ৫০৮, ৭০৯, ৮১৪, ৮৮৫, ১০৭৮
উত্তর সাধক (নৃত্য-শিল্পের আলোচনা)—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য	...	৬৫৬
এ		
একই স্কুলের ছাত্র (গল্প)—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী	...	২০১ (পূজা সংখ্যা)
একটি তরুণ আর কর্নেশান ফুল (অনুবাদ গল্প) অনুবাদক : —শ্রীগৌরীশঙ্কর দে	...	৩১৯ (পূজা সংখ্যা)
একমুঠো টাকা (গল্প)—শ্রীসুজিত সেনগুপ্ত	...	৩৩৭
এই প্রথম (গল্প)—শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪৬৪
" " —শ্রীসুকৃতি রায় চৌধুরী	...	৬৪৯
" " —শ্রীপ্রফুল্ল বসু	...	৭৫০
" " —শ্রীলেখা বসু	...	১০৩৭
একটি পুরাতন কথা (আলোচনা)—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৯৭৩
ক		
কোম্পানী আমলের কাহিনী (ইতিহাস গল্প) —শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৪৪, ১৫০, ৭৬৩, ৮৪৫, ৮৯১, ১০০৬
কবিকথা (জীবনী-সাহিত্য)—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫১ (পূজা সংখ্যা)
কায়া (গল্প)—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী	...	১৪৫
কথা-প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়)	...	৩৯৯, ৬২৪, ৭১৯, ৮০৭, ৮৭৯, ৯৮৫
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কি এক স্বপ্নবিলাসী কবি ছিলেন (প্রবন্ধ) —শ্রীনরেন্দ্র দেব	...	৯৭৬
খ		
খেলাধূলা	...	২৭০, ৪৮৯, ৬০৯, ৭০১, ৯৫৩, ১০৬০
খেলাখেলা (গল্প)—শ্রীকুমারকান্তি ঘোষ	...	৪৫১
গ		
গানের সন্ধানে (গল্প)—এ, না, বি	...	১৮ (পূজা সংখ্যা)
গুরু-শিষ্য কথামৃত (গল্প)—শ্রীনির্মল গোস্বামী	...	৬৩
চ		
চিঠি-শুধু চিঠি নয়—(গল্প সংকলন)	...	৭, ১১৭, ২৭৮, ২৯৯, ৪০৩, ৬২৬, ৭৯১, ৮৫১, ৮৮৭, ১০৫৮
চিত্র-বিচিত্র (সংবাদ)—মৃত্যুঞ্জয় করণাম	...	৫৩, ১৯১, ২৪৮, ৩৪৪, ৪২৫, ৫৬১, ৬৫২, ৭৬৭, ৮৩৪, ৯২৭, ১০৫১

বিষয়		পৃষ্ঠা
চলতি দুনিয়া	...	৯৪
চুটকি (বাঙ্গ কবিতা)— অঃ, কুঃ, তঃ	...	১০০, ১৮১, ২৭৫
চাঁদ (গল্প)—শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু	...	১৫৯
চাঁদ-এ-আকাশ— শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়	...	৫৮৮
চমক	...	৭৪৪, ৯৪৮
ছ		
ছদ্মগুরু শ্রীশ্রীবিশ্বরূপক (জীবনী-সাহিত্য)—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	৯, ১১১, ২০৬, ৪০৯, ৬৩১, ৭২১, ৮১৫, ৮৮৯, ১০৬৫
জীবনবেদের সন্ধানে (স্মৃতি)—শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	...	২৩
জীবনের রঙ্গশালায় (উপন্যাস)—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	৬৭, ১৫৫
ত		
তন্দ্রিলা (গল্প)—শ্রীমতী সুলেখা দাশগুপ্ত	...	২৬৮
তাম্রলিপি (গল্প)—শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	...	৫১৯
তিমতা তীর (গল্প)—শ্রীমিহির দাশগুপ্ত	...	৫২৭
দ		
দুদিন বৈত নয় (গল্প)—শ্রীসুবোধ বসু	...	১৭
দেবভূমি (সচিত্র ভ্রমণ)—শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়	...	১ (পরিশিষ্ট)
দণ্ডিত (গল্প)—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	৯ (পৃষ্ঠা সংখ্যা)
দেশান্তর (গল্প)—শ্রীসুবোধ বসু	...	১৮৩
দুঃস্বপ্নের রাত (গল্প)—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়	...	৩১৩
দৈপায়ন (গল্প)—শ্রীসুশীল সিংহ	...	৩২৭
দলিল (গল্প)—ফুলকিকার	...	৪১৫
দ্বীপান্তরের যাত্রী (স্মৃতি)—শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	...	৬৮৬
দীপশিখা (গল্প)—শ্রীরমণীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়	...	৮৩১
দুর্গেশনন্দিনী ও বঙ্কিম (প্রবন্ধ)—শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত	...	৯৬৫
দুই মহাযুদ্ধ	...	৯৫৭, ১০৮০
ন		
নীল সমুদ্রের ডাকা (গল্প)—শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী	...	১১৯
না (প্রবন্ধ)—সব্যসাচী	...	২২৫
নামবার সিঁড়ি (সম্পূর্ণ উপন্যাস)—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	২০৭ (পৃষ্ঠা সংখ্যা)
নেতাজী	...	৪০৭
নিজের দুঃখ (গল্প)—শ্রীতরুণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৫২৩
নির্বাসন (গল্প)—হরিপ্রসাদ ভৌমিক	...	১০১৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
প		
পুরাতন পাতা (সংগ্রহ)	...	৭৪, ১৩৩, ২৫৮, ৬২৮, ৭৯৪
পথের সন্ধানে (স্মৃতি)—সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	...	১২৭
পুতুল খেলা (গল্প)—শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি	...	১৩৫
পিতৃদেবের ছবি (গল্প)—শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি	...	১৬৩ (পূজা সংখ্যা)
পুতুল (গল্প)—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	...	১৬৭ "
পূর্ব কাহিনী (সম্পূর্ণ উপন্যাস)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	২৭১ "
পুতুল পুতুল (গল্প)—শ্রীসলীল মুখোপাধ্যায়	...	৩০৭
পোপের ভারতে আগমন	...	৪০১
প্রেম প্রতিবন্ধক (গল্প)—শ্রীপরিচয় গুপ্ত	...	৪৮৬
পাঠক-পাঠিকার কলহ—(চিঠিপত্র)	...	৫০৯, ৬৩০, ৭৯৭, ৮১০, ৮৮১, ১০৭১
পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় (জীবনী)—শ্রীনীলাদ্রি সোম	...	৭৮২
পাঠক পাঠিকা (প্রবন্ধ)—শ্রীমতী নীলিমা দে	...	৯৭১
প্রত্যাবর্তন (গল্প)—শ্রীমানবেন্দ্র পাল	...	৯৯৯
প্রতিশ্রুতি (গল্প)—শ্রীমতী রেখা বসুয়া	...	১০২১
ফ		
ফাল্গুন মাসুষ (গল্প)—শ্রীদিব্যেন্দু দাশগুপ্ত	...	৬৬৪
ব		
বনস্পতি (গল্প)—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	...	২৯
বাংলার লোকজীবনে ঘট ও পট (প্রবন্ধ) —ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	...	৩৯
বিশ্বসাহিত্য আড়াল বেস্ট টিকটের (জীবনী আলোচনা) —শ্রীগৌরীশঙ্কর দে		৫৬
" আর্থার সি ক্লার্ক " —শ্রীগৌরীশঙ্কর দে	...	১৪৩
" সমারসেট্ মম " —শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু	...	২৩৩
" ডিলান টমাস " —শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু	...	৩৬৫
" জাঁ পল সার্তর " শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৩৬৮
" সেবাস্টিয়ান বাক " —শ্রীনীলাদ্রি সোম	...	১০৪২
" রাকড়সার জাল—রিয়োনোস্থকি আকুতগবা অনুবাদ—শ্রীগৌরীশঙ্কর দে	...	১০৪৪
বাঙালির লেখক ও তার সমস্যা (আলোচনা)—নীলাদ্রি সোম	...	৪৪৫
টি, এস, এলিয়ট " —শ্রীগৌরীশঙ্কর দে	...	৬০৪
টি, এস, এলিয়টের কবিতা (অনুবাদ)—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য	...	৬০৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
মহাসঙ্গীত আর্থার সি, ক্লার্ক (অনুবাদ)—শ্রীগৌরীশঙ্কর দে	...	৮৯২
সাহিত্য সংবাদ	...	৭৮১, ৮৫৬, ৯৩০
বিশ্বের সেরা গল্প (বিদেশী গল্প অনুবাদ) অনুবাদ—শ্রীসুকুমার দে	...	৫৮
" " —শ্রীনক্ষত্র রায়	...	১৪৫
" " —আর্যভট্ট	...	২১৬
" " —শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৪৪৭
" " শ্রীমতী নীলিমা দে	...	৭৭৭
" " —শ্রীগৌরীশঙ্কর দে	...	৮৪৭
" " —শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৮৬০
" " —শ্রীবলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৯৩৪
বঙ্কিম ও রবীন্দ্র মানস (প্রবন্ধ)—ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	...	৯৫৮
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সন্ন্যাসী (প্রবন্ধ)—শ্রীগৌরীশঙ্কর দে	...	৯৮৩
বঙ্কিম সাহিত্যে স্বপ্ন দর্শন শ্রীগৌরীশঙ্কর দে	...	১০৮৩
বঙ্কিম-রবীন্দ্র সঙ্গম—শ্রীশুভসব বসু	...	১০৮৭
ব্যাপার যা চলছে (ঘটনা-সমীক্ষা)—চক্রপাণি	...	৮০, ১২৭, ২৮২, ৩৬০, ৪৭৯, ৫৭৭, ৬৭০, ৭৮৭, ৮৫১, ৯১১, ১০৫৪
বর্ষারম্ভল (শুভুবন্দনা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		১১০
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা (বিজ্ঞান আলোচনা)—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য	...	১৩৯
বিচিত্র সাহিত্য	...	১৪৯
বিচিত্রা (সংবাদ-আলোচনা)		৭৭১, ৮৬৬, ৯৪৯, ১০৭৪
ভ		
ভাগ্য কে না জানতে চায় (জ্যোতিষ-আলোচনা)—মহাভারত শর্মা	...	৭৬, ১৬৮, ২৭০
ভেজাল (গল্প) শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী		৪১ (পূজা সংখ্যা)
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তি সাধনার প্রভাব—শ্রীহিমাদ্রি রায়	...	২৯২
ভারত সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি (আলোচনা)	...	৩১৩, ৭০৭
ভুজঙ্গ (গল্প)—শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৬৭০
ম		
মরণীয় যাঁরা অমরণীয় তাঁরা (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)—ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	...	১৭১
বীরপূজা (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—জীবনী)—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়	...	২০৬
মরণীয় যাঁরা অমরণীয় তাঁরা (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়)—শ্রীগৌরীশঙ্কর দে	...	২৮২

বিষয়		পৃষ্ঠা
বরণীয় যাঁরা স্মরণীয় তাঁরা (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) —শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য	...	২৮৮
বীরবলের কৌতুক (রঙ্গকাহিনী)—বরুরুচি	...	২৭৯, ৫৭০, ৬১৫
বিপরীত (গল্প)—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	...	২৬ পূজা সংখ্যা
বন্ধু (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	...	৩৩ "
বিবেক (গল্প)—শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু	...	৪৫ "
বায়ু বয় পূর্বদিকে (সম্পূর্ণ উপন্যাস)—শ্রীমতী বাণী রায়	...	৭৯ "
বিসর্জন (গল্প)—শ্রীমানবেন্দ্র পাল	...	১৯১ "
বসন্তাস টাউন থেকে (গল্প)—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য	...	১৯৬ "
বাঙালীর শক্তিপূজা	...	২৯১ "
বিচিত্র সংবাদ	...	৩০২, ৪৭৬, ৬৯৫
বার্টাণ্ড রাসেলের ধর্মচিন্তা (প্রবন্ধ)—শ্রীঅমল ভৌমিক	...	৩৪৭
বিপর্যয় (গল্প)—শ্রীঅপূর্বমণি দত্ত	...	৩৫৫
ব্রহ্ম (গল্প)—শ্রীরামপ্রসাদ সেন	...	৩৭২
বিচারক (গল্প)—শ্রীধূর্জটি মাইতি	...	৪৬৭
বৃত্ত (গল্প)—সরোজ রায়	...	৬৫৯
বিচিত্র বৈঠক (আলোচনা)	...	৬৯৬
বিশ্ব-উৎসব	...	
বৃক্ষরোপণ উৎসব—শ্রীমতী মীনাক্ষী ঘোষ	...	৫ পূজা সংখ্যা (পরিশিষ্ট)
বহ্ন্যুৎসব—শ্রীমতী নীলিমা দে	...	৭ "
বর্ষ-উৎসব—শ্রীনীলাদ্রি সোম	...	৯ "
ভারতের উৎসব—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী বসু	...	১১ "
প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ জাপান—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র	...	১৩ "
উৎসবের দিনে বিপদ—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মল্লিক	...	১৫ "
গ্রীসের উৎসব—ডঃ উমা রায়	...	১৭ "
বিচিত্র উৎসবের দেশ ব্রিটেন—শ্রীনির্মলেন্দু মাজা	...	২০ "
উৎসবের দেশ ফ্রান্স—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৩ "
জার্মানীর উৎসব—শ্রীতরুণ বসু	...	২৬ "
আমেরিকার উৎসব—শ্রীগোপাল ভৌমিক	...	২৮ "
আমেরিকার মৌজ উৎসব	...	৩১ "
উৎসব-রাজ শান্তিনিকেতনে—ডঃ কালিদাস নাগ	...	৩৩ "
যে দেশে প্রতিদিনই উৎসব : ডেনমার্ক—শ্রীমতী নীলিমা দে	...	৩৮৫
ইতালীর উৎসব—শ্রীনীলাদ্রি সোম	...	৩৮৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিশ্ব-উৎসব		
বিশ্ব-উৎসবে টোকিও অলিম্পিক—শ্রীবিমল রে	...	৩৯১
খৃষ্টোৎসব—শ্রীগৌরীশঙ্কর রে	...	৪২৪
রাজসভায় খৃষ্টমাস—শ্রীমতী নীলিমা রে	...	৫০০
উৎসব—য়ুরোপের শেষ সীমান্তে—শ্রীগৌরীশঙ্কর রে	...	৬১৭
জাপানের চা উৎসব—শ্রীমতী নীলিমা রে	...	৬১৯
জাপানি পুতুল—শ্রীমতী পারুল মিত্র	...	৬২১
নিউইয়র্কের ব্রাহ্মমান অভিনয় উৎসব—সমিপত্র	...	৭১৩
চিরনূতন কাবুকী—শ্রীমতী লাসি ভট্টাচার্য	...	৭১৬
কবিতাজ—শ্রীগৌরীশঙ্কর রে	...	৮০৫
সেকালের পেরুদেশের উৎসব—শ্রীমতী নীলিমা রে	...	৮৭৩
বিনজান—শ্রীসরোজমোহন মিত্র	...	৮৭৫
সিংহলের উৎসব - শ্রীমতী অপর্ণা বসু	...	৮৭৭
বাংলা উপন্যাসের বিস্মৃত অধ্যায় (প্রবন্ধ)—ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়		৭০৩
বর্ষসূচী (আষাঢ় '৭১—জ্যৈষ্ঠ ৭২)	...	১০২১
ম		
মূল্য (গল্প)—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৬৬
মিষ্টার ডি'কষ্টা (গল্প)—শ্রীবিমল মিত্র	...	২১ (পূজা সংখ্যা)
মাতাল হাওয়া (গল্প)—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু	...	৬৭ ,,
মোহমুক্তি (গল্প)—ডঃ নরেন্দ্রনাথ রায়	...	৩০১ ,,
মেয়েদের কথা (আলোচনা)—শ্রীমতী শান্তা দেবী	...	৩২৪ ,,
মেকলার বিস্ময়কর দর্শন (গল্প)—শ্রীসরিৎ শর্মা	...	৩৪৯
মেয়ে মজলিস (মহিলা বিভাগ)—শ্রীমতী সুরঞ্জনা সেন	...	৬৪৭, ৭৬০, ৩৩২,
মেয়েটি না বাঘটি (গল্প)—শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়	...	৮৯৪
মাছি (গল্প)—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য	...	৯৪৫
য		
যৌবন (গল্প)—শ্রীমতী নীলিমা জাপগুপ্ত	...	১৫৫ (পূজা সংখ্যা)
যুগ সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (প্রবন্ধ)—শ্রীসজীবকুমার বসু	...	৭৫৪
র		
রং বদলায় (গল্প)—শ্রীআশীষ গুপ্ত	...	২৬১ (পূজা সংখ্যা)
রৌদ্রছায়া (গল্প)—শ্রীমদন চৌধুরী	...	৪২৮
রবীন্দ্র সাধনা (প্রবন্ধ)—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী	...	৪৩১
রক্তকমল (স্মৃতি)—শ্রীসত্যনারায়ণ মজুমদার	...	৪৪৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
রাজবন্দী (প্রবন্ধ)—পুষ্পকুমার পাল	..	১০৩৭
ল	...	
লঘুমেঘ (গল্প)—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	১৭৫
শ	...	
শুভবিবাহ (উপন্যাস)—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	৮৩, ১৭৫, ২৫১, ৭২৭, ৯১৯, ১০৪৭,
শক্তি-সাধনা (প্রবন্ধ)—শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ	...	১ (পূজা সংখ্যা)
শিল্পচিন্তায় নূতন যুগ (প্রবন্ধ)—ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	...	১৪২ ,,
শোনপাংশুদের সাথে (স্মৃতি)—শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	...	৪৮১
শেকস্‌পীয়র বিদ্বেষী (আলোচনা)—শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু	...	৭৫৫
শেষ সন্ধ্যায় (গল্প)—শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত	...	৬৮২
স	...	
স্মৃতি রোমন্থন (স্মৃতি-উপন্যাস)—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	...	৪৭, ১৩৪, ২৪১, ৪৭১, ৫১৫, ৯১১,
সাহিত্য ও সাহিত্যিক (সাহিত্য-আলোচনা)	...	৬৫, ২৩৯, ৪৬১,
সাহিত্য সংবাদ	...	৬৬, ২৪০, ৪৬২,
সম্পাদকীয়—ডঃ কালিদাস নাগ	...	১০৩, ২০৩,
সমাধি (গল্প)—শ্রীধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	...	২২৮
সুরলোক (গল্প)—শ্রীরামপ্রসাদ সেন	...	৭২৭
সম্রাটের বিলাস (জীবন-কাহিনী)—বরুচি	...	৯৩১, ৯৯৩
হ		
হাউস ফুল (সম্পূর্ণ নাটক)—শ্রীবিজন ভট্টাচার্য	...	৩১৯ (পূজা সংখ্যা)
হারানো আয়না (গল্প)—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৩৮৩ ,,

গল্প-ভারতী
পৌষ, ১৩৭১

"তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও,—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাইত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারেনা, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাইত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত তোমাকে ডিঙ্গাইয়া চলিতে হয়,—কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল সেইত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সেত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত পরাধীন দেশের হে রাজ-বিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার!"

"আমি নেড়েচেড়ে এদের ভেতর সাড়া আনতে চাই — এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত' এই অভয়বাণীই শুনাতে আমার জন্ম। তোরা ঐ কাজে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শোনাগে। সকলকে ধরে ধরে বলগে যা তোমরা অমিতবীর্য্য অমৃতের অধিকারী।"

"তোমরা কি অনুভব কর যে কোটি কোটি আর্য্য-ঋষিদের বংশধর পশুর প্রতিবেশী হয়ে আছে, তোমরা কি অনুভব কর যে কোটি কোটি মানুষ আজ অনাহারে আছে, যুগ যুগ ধরে অনাহারে আছে, তোমরা কি অনুভব কর যে কৃষ্ণ মেঘের মতো অজ্ঞানতা সমস্ত দেশ ছেয়ে ফেলেছে।.....এই চিন্তা কি তোমাদের ব্যাকুল করেনা, বিনিদ্র করেনা, তাহা কি তোমাদের পাগল করেনা। এই ধ্বংসের কথা, এই দারিদ্রের কথাই কি তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করেনা?"

"এখন চাই সবল সমর্থ বিশ্বাসী অল্পবয়স্ক মানুষ। এমন একশত মানুষ পেলে দুনিয়ার চেহারা আমূল পরিবর্তন হবে। কিন্তু আমরা ক'জন এই অগণিত নর-নারীর দারিদ্র, অশিক্ষা, অত্যাচার, অবিচারের দায় গ্রহণ করেছি। ক'জনের সেই দায়ের চিন্তা করে সুখনিদ্রা ঘুচে গেছে, ক'জন সেকথা ভেবে উন্মাদের মতো কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছি? ক'জন নিজের মধ্যে দেবশক্তিকে জাগ্রত করেছি, ক'জনকে তা করতে সহায়তা করেছি?"

স্বামিজী যে সব সিংহ-হৃদয় তরুণ-তরুণীর কথা বলেছিলেন, সেই সব "Men rebels" and "Women rebels" কোথায়? স্বামিজীর আমূল রূপান্তর সাধনের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা একমাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব। স্বামিজী আজও তাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন, কবে তারা আসবে, আর কবে হবে স্বামিজীর বিপ্লব সার্থক।

পাঠক-পাঠিকার কলম

[পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক গ্রাহিকাদের কাছ থেকে আমরা প্রায়শই নানা ধরণের পত্র পাই। অনেক পত্রে চিন্তাশীলতা এবং নানা সমস্যা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও সুচিন্তিত মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন থেকে আমরা সেই ধরণের প্রকাশ যোগ্য এক বা একাধিক পত্র প্রতি সংখ্যায় দেব। এই বিভাগে শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে সমসাময়িক জীবন ও তার সমস্যা সম্পর্কে মতামত আহ্বান করা হচ্ছে।
গল্পভারতী সম্পাদক।]

মাননীয় গল্পভারতী-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

গল্প-ভারতী পত্রিকাটি ইদানিং নিয়মিত পাঠ করে আমাদের এই প্রতীতি জন্মেছে যে, গল্প-উপন্যাস ও কয়েকটি নতুন ধরণের ফীচারের মাধ্যমে পাঠক পাঠিকাদের আনন্দ বিধান করা ছাড়াও আপনারা নানাভাবে নানা লেখা ও একটি বিশেষ ফীচারের দ্বারা দেশের লোককে সচেতন করবার চেষ্টা করছেন। এই প্রচেষ্টা যে সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় তাতে সন্দেহ নেই। সংবাদ-পত্র, সাময়িক পত্র, মাসিক-পত্র, যাদের পৃষ্ঠায় দেশের সমসাময়িক জীবন ও সমস্যার ছবি প্রতিফলিত, তাদের সম্পাদকগণের অবশ্যই গুরু দায়িত্ব আছে। ব্যবসায়িক দিক ছাড়া যে নৈতিক দিক আছে তার দাবী দাবকতা কম নয়। সুখের বিষয় গল্প-ভারতীর পরিচালক মণ্ডলী সেই দাবী দাবকতা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। ... ...বর্তমানে আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সমস্যা আর সংকট! আহারে বিহারে কর্মে ধর্মে শিক্ষায় দীক্ষায় সর্বক্ষেত্রেই রুদ্ধদ্বারের বাইরে সারবন্দী লাইনের হতাশা আর ক্ষোভ! অন্য প্রদেশের কথা সবিশেষ জানি না, বাংলা দেশের অবস্থা যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে গোটা জাতটাই আজ পথে বসেছে—লাইন দিচ্ছে। কিন্তু সার্থক হচ্ছে না তার সেই লাইন দেওয়া!.....এই পরিপ্রেক্ষিতে এবার কংগ্রেস-রথ অনুষ্ঠিত হল বাংলা দেশেরই দুর্গাপুরে। কংগ্রেস সম্বন্ধে বর্তমানে একটা প্রশ্ন বড় হয়ে যা মনে জাগছে তা হচ্ছে এই : যে প্রতিষ্ঠানকে সর্বস্ব সমর্পণ করলাম, যে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষার জন্যে নিজের অঙ্গচ্ছেদ করতেও কুণ্ঠিত হলাম না, নিজের ভাই বোনকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করলাম না। সর্বহারা হয়ে যে প্রতিষ্ঠানকে সতেরো বছর ধরে কায়েম রাখলাম, তার কর্ণধারদের রাজকীয় বিলাস ব্যসনকে সহ্য করলাম—সে প্রতিষ্ঠানের কাছে শেষ পর্যন্ত কী পেলাম!.....অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, যত দিন যাচ্ছে কংগ্রেস রাজের শাসনে আমাদের

অবস্থা ততই সঙ্গীন হয়ে উঠছে···এই ভয়াবহ অবস্থার অবসান কল্পে গালভরা বড় বড় কথা আমরা শুনি বটে কিন্তু এ পর্যন্ত শূন্যগর্ভ ফানুষের মত সেসব কথা অচিরেই চুপসে গেছে—কাজের কাজ কিছুই হয়নি।···এবারকার কংগ্রেস-অধিবেশনে তাই পুনরাবৃত্তি হল। অর্থাৎ এই অধিবেশনে কোন আশার আলো দেখা যায়নি। বরং অনেক নেতার মুখেই আমরা সমালোচনা আর হতাশার সুর শুনেছি। এমনকি সভাপতি শ্রীকামরাজও তাঁর ভাষণে যথার্থহীন ভাষায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, ·····আসলে দেখা যাচ্ছে পরিকল্পনার চেকনাই আর বাগাড়ম্বরের ছটায় আমাদের দেশের দুর্গতি দূর হবে না। দেশের মজ্জায় মজ্জায় যে নৈতিক অধোগতির ঘুণ ধরেছে তা অপসারিত করবার জন্যে চাই মানুষ। মানুষের মতো মানুষ। দেশের মানুষ যতদিন না তার চেতনা ফিরে পাবে যতদিন পর্যন্ত না দেশের মানুষ জীবনের নীতিগত মূল্যবোধ স্বীকার করবে ততদিন পর্যন্ত কোন পরিকল্পনাই সার্থক হবে না। আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন মানুষ তৈরী করা। গল্প-ভারতীর মধ্যে সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনেছি বহুবার।

কলিকাতা ১৪.১.৬৪

নমস্কারান্তে—

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)

সুভাষচন্দ্র কর্তৃক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত

The Union Society,
Cambridge.
১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২১

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

আপনি আমাকে বোধ হয় চিনেননা—কিন্তু আমার পরিচয় দিলে বোধ হয় চিনিতে পারিবেন। আপনাকে আমি খুব প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে এই পত্র লিখিতেছি—কিন্তু কাজের কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমাকে নিজের Sincerity আগে প্রমাণ করিতে হইবে। সেইজন্য প্রথমে নিজের পরিচয় দিতেছি।

আমার পিতা শ্রীজানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট প্লিডার ছিলেন। আমার একজন দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কলিকাতা হাইকোর্টের Barrister। আপনি আমার পিতাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন এবং আমার দাদাকে নিশ্চয়ই চেনেন।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম। ১৯১৬ সালের গোলমালের সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Expelled হই। দুই বৎসর বন্ধ হইবার পর আমি কলেজে পড়িবার অনুমতি পাই। তারপর ১৯১৯ সালে আমি বি-এ পাশ করি এবং Honours এর প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে এখানে আসিয়াছি। ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে আমি Civil Service পরীক্ষা পাশ করি এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করি। এই বৎসর জুন মাসে আমি Moral Science Tripos পরীক্ষা দিব। সেই মাসে আমি এখানকার B. A. Degree পাইব। এখন কাজের কথা বলি। সরকারী চাকুরী করিবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। আমি বাড়িতে লিখিয়াছি বাবাকে এবং দাদাকে যে, আমি চাকুরী ছাড়িয়া দিতে চাই। আমি এখনও উত্তর পাই নাই। তাঁদের অনুমতি পাইতে হইলে, আমাকে দেখাইতে হইবে আমি চাকুরী ছাড়িবার পর কি tangible কাজ করিতে চাই। আমি অবশ্য জানি যে, চাকুরী ছাড়িয়া আমি যদি কোমর বাঁধিয়া দেশের কাজে অবতীর্ণ হই তাহা হইলে করিবার আমার অনেক আছে—যথা, জাতীয় কলেজে শিক্ষকতা, পুস্তক ও খবর কাগজ প্রণয়ন ও গ্রাম্যসমিতি স্থাপন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, ইত্যাদি। কিন্তু আমি যদি এখন বাড়ীতে দেখাইতে পারি আমি কি tangible কাজ করিতে ইচ্ছা করি—তাহা হইলে বোধহয় চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে অনুমতি সহজে পাইব। আমি যদি তাঁদের অনুমতি লইয়া চাকুরী ছাড়িতে পারি তাহা হইলে বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করিবার আবশ্যকতা নাই।

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি সবচেয়ে ভাল জানেন। শুনিলাম আপনারা কলিকাতায় এবং ঢাকায় জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ইংরাজী ও বাংলায় "স্বরাজ" পত্রিকা বাহির করিতে চান। আমি আরও শুনিলাম বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে গ্রাম্য সমিতি প্রভৃতি স্থাপন করা হইয়াছে। আমি জানিতে ইচ্ছা করি আপনারা আমাকে এই স্বদেশ সেবা যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই—কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, যৌবনোচিত উৎসাহ আমার আছে।

আমি অবিবাহিত। লেখাপড়ার মধ্যে আমি Philosophy টা একটু পড়েছি কারণ কলিকাতায় আমার ঐ বিষয়ে Honours ছিল এবং এখানেও আমি ঐ বিষয়ে Tripos পড়িতেছি। Civil Service পরীক্ষার কৃপায় সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা খানিকটা হইয়াছে—যেমন, Economics, Political Science, English and European History, English Law, Sanskrit, Geography ইত্যাদি।

আমি বিশ্বাস করি যে আমি যদি নিজে এই কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে এখানকার ২।১ জন বাঙ্গালী বন্ধুকে এই কাজে টানিতে পারিব। কিন্তু আমি নিজে যতক্ষণ এই কাজে না নামিতেছি, ততক্ষণ কাহাকেও টানিতে পারিতেছি না।

এখন আমাদের দেশে কোন কোন বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিবার সুবিধা আছে তাহা এখান থেকে বুঝিতে পারিতেছি না। তবে আমার মনে হইতেছে যে, দেশে ফিরিলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকায় লেখা এই দুই কাজে হাত দিতে পারিব। আমার ইচ্ছা—Clear-cut plans লইয়া চাকুরী ছাড়িতে। তাহা করিতে পারিলে চাকুরী ছাড়ার পর আমাকে চিন্তায় সময় ব্যয় করিতে হইবে না এবং আমি চাকুরী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে পারিব।

আপনি আজ বাঙ্গলা দেশে স্বদেশ সেবা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের বন্যা তুলিয়াছেন তার তরঙ্গ চিঠি ও খবরকাগজের ভিতর দিয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃভূমির আহ্বান শুনা গিয়াছে। Oxford থেকে একজন মাদ্রাজী ছাত্র তাঁর লেখাপড়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে—সেখানে গিয়া কাজ আরম্ভ করিবার জন্য। Cambridge—এ পর্য্যন্ত কাজ কিছু হয় নাই যদিও "অসহযোগিতা" সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশী রকম চলিতেছে। আমার বিশ্বাস, যদি কেহ পথ দেখাইতে পারে তাহা হইলে সেই পথ অনুসরণ করিবার লোক এখানে আছে।

আপনি বাঙ্গলাদেশে আমাদের সেবা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎ সামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর।

আপনাকে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য—শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আপনি আমাকে এই বিপুল সেবা যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমি তাহা জানিতে পারিলে বাড়ীতে—বাবাকে এবং দাদাকে সেইরূপ লিখিতে পারিব এবং নিজের মনকেও সেইভাবে প্রস্তুত করিতে পারিব। আমি এখন একরকম সরকারী চাকর। কারণ আমি এখন I. C. S. Probationer। আপনাকে চিঠি লিখতে সাহস করিলাম না পাছে চিঠি Censored হয়। আমার জনৈক বিশ্বাসী বন্ধু শ্রীপ্রমথনাথ সরকারকে আমি এই চিঠি পাঠাইতেছি—তিনি আপনার হাতে এই চিঠি দিয়া আসিবেন। আমি যখনই আপনাকে পত্র দিব—তখন এই ভাবেই দিব। আপনি অবশ্য আমাকে চিঠি লিখিতে পারেন কারণ এখানে চিঠি Censored হইবার ভয় নাই।

আমার এখানকার মতলব সম্বন্ধে আমি কাহাকেও জানাই নাই—শুধু বাড়ীতে বাবাকে এবং দাদাকে লিখিয়াছি। আমি এখন সরকারী চাকর সুতরাং আশা করি যে আমি যে পর্য্যন্ত চাকুরী না ছাড়িতেছি সে পর্য্যন্ত আপনি কাহাকেও এ বিষয়ে কিছু বলিবেন না।

আমার আর কিছু বলবার নাই। আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু কর্ম্মের আদেশ দেন।

আমার নিজের মনে হয় যে, আপনি যদি "স্বরাজ" পত্রিকা ইংরাজীতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে আমি সেই পত্রিকার Sub-editorial staff এ কাজ করিতে পারি। তাছাড়া "জাতীয়

কলেজের" নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে পারি। কংগ্রেসের বিষয়ে আমার মনে অনেক প্রস্তাব আছে। আমার মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী আফিস চাই। তার জন্য একটা বাড়ী করা চাই সেখানে একদল Research Student থাকিবেন—যাহারা আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা লইয়া গবেষণা করিবেন। আমি যতদূর জানি Indian currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও definite policy নাই। তারপর Native States এর প্রতি কংগ্রেসের কিরূপ attitude হওয়া উচিত তাহা বোধ হয় স্থির করা হয় নাই। Franchise (for men and women) সম্বন্ধে কংগ্রেসের কি রকম মত তাহাও বোধ হয় জানা নাই। তারপর Depressed classesদের লইয়া আমাদের কি করা উচিত তাহাও বোধ হয় কংগ্রেস ঠিক করে নাই। এই বিষয়ে (অর্থাৎ Depressed Classes সম্বন্ধে) কোন কাজ না করার দরুণ মাদ্রাজে আজ সব Non-Brahmin এবং Pro-Government এবং Anti-Nationalist হইয়াছে।

আমার নিজের মনে হয় যে Congress-এর একটা permanent staff রাখা দরকার। ইহারা এক একটা সমস্যা (problem) লইয়া গবেষণা করিবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে Up-to-date facts and figures সংগ্রহ করিবে। এইসব facts and figures সংগৃহীত হইলে Congress-committee প্রত্যেক বিষয়ে (Problem এ) একটা policy formulate করিবে। আজ অনেক জাতীয় problem সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোন definite policy নাই। আমার সেইজন্য মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী বাড়ী চাই এবং স্থায়ী staff of research students চাই। তাছাড়া Congress-এর intelligence Department খোলা দরকার, দেশের সম্বন্ধে Up-to date সব খবর, facts and figures যাহাতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। Propaganda Department থেকে প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় ছোট ছোট পুস্তক প্রকাশিত হইবে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে। এতদ্ভীত জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া Propaganda Department থেকে এক একটি বই প্রকাশিত হইবে। সেই পুস্তকে কংগ্রেসের Policy বুঝান হইবে এবং কি কি কারণের নিমিত্ত কংগ্রেসের এইরূপ Policy হইয়াছে তাহাও লেখা থাকিবে। আমি অনেক লিখিয়া ফেলিলাম। আপনার কাছে এই সব কথা পুরাতন। আমার কাছে খুব নূতন বলিয়া মনে হইতেছে বলিয়া আমি না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছে যে কংগ্রেস সংক্রান্ত বিপুল কাজ আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে। আপনারা ইচ্ছা করিলে আমি এ বিষয়ে ও বোধ হয় কিছু করিতে পারিব।

আপনার মতের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। আপনি কি কি কাজে আমাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহা জানিবার জন্য আমি ব্যগ্র আছি। যদি আপনাদের অভিপ্রায় থাকে কাহাকেও বিলাতে পাঠাইতে Journalism শিখিতে, তাহা হইলে আমি সে কাজের ভার লইতে পারি। আমাকে যদি সে ভার দেন তাহা হইলে passage এবং outfit-এর খরচ বাঁচিয়া যাইবে। অবশ্য এ কাজের ভার লইবার পূর্বে আমি চাকুরী ত্যাগ করিব, অবশ্য আমার থাকা ও খাওয়ার খরচ দিবেন—কারণ চাকুরী ছাড়ার পর বাড়ী থেকে টাকা লওয়া বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

আমার নিজের ইচ্ছা যে যদি চাকুরী ছাড়ি তাহা হইলে জুন মাসেই রওনা হইব। তবে প্রয়োজন হইলে আমি নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। আমার বহুভাষিতা ক্ষমা করিবেন।

আশা করি যথাশীঘ্র উত্তর দিবেন। আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—সুভাষচন্দ্র বসু

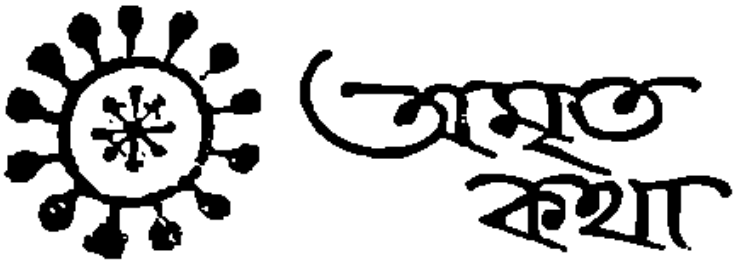

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের কথা—

ষোড়শ বৎসরের পর দেখা হ'ল। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজের আর কোন গ্রন্থাদি রচনা হয়েছে কি? রাজা রাজশেখর মহা দুঃখিত হয়ে বললেন, যতিবর! দুঃখের কথা আর কি বলব? কিছুদিন পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ হয়, তাতে আমার এই তিনখানি গ্রন্থ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। আমি মনের দুঃখে আরকোন গ্রন্থই রচনা করি নাই। আচার্য্য হাসতে হাসতে বললেন, মহারাজ এজন্য এত দুঃখ করছেন কেন? আপনি যদি ইচ্ছা করেন তো আমি বলছি, আপনি লিখে নিন। উহা আমার অবিকল মনে আছে। রাজা রাজশেখর বিস্ময়েও আনন্দে যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন। তিনি অতিশয় বিস্মিতভাবে বললেন, আপনার সমস্তই স্মরণে আছে? আমি এখনই লিখছি—আপনি অনুগ্রহ করে বলুন। আচার্য্য বলতে লাগলেন, রাজা লিখতে লাগলেন। রাজার যতদূর মনেছিল, তাতে তাঁর মনে হল, আচার্য্য অবিকল তাঁর গ্রন্থই বলছেন, কোনরূপ অন্যথাই হচ্ছে না। রাজা অন্যকথা পরিত্যাগ করে যারপরনাই আনন্দিত চিত্তে কেবল গ্রন্থই লিখতে লাগলেন। পরদিন রাজা একটি লেখককে লিখতে আদেশ করলেন এবং তিনি স্বয়ং শুনতে লাগলেন। অন্য কোন কথাই নাই, কেবলই লেখা চলতে লাগল। আচার্য্য অনর্গল বলতে লাগলেন, লেখক রাজার সামনে বসে লিখে যেতে লাগলেন। সভাসদবৃন্দ সকলেই বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন। এইভাবে কয়েকদিনঅনবরত পরিশ্রমের পর 'বাল রামায়ণ', 'বাল ভারত' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনখানি লিখিত হ'ল। রাজার আর আনন্দ ধরে না। তিনি পুনঃ পুনঃ আচার্য্যের পদধূলি নিয়ে আচার্য্যের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন। আচার্য্যের অদ্ভুত শক্তির কথা দেশময় প্রচারিত হয়ে পড়ল।

• • • •

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথা

"ওরে যার দেখার আছে, তার সেখায় আছে, যার দেখায় নাই, সেখায়ও নাই। যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপন হয়ে, তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায়; আর যার প্রাণে ঐভাব নেই, তার বিশেষ আর কি হবে। তীর্থে বাস করতে গিয়ে কত লোক সেখানে আবার দোকানপাট-বাবসা ফেঁদে বসে। মথুরের সঙ্গে পশ্চিমে গিয়ে দেখি, এখানেও যা, সেখানেও তাই। এখানকার আম গাছ, তেঁতুল গাছ, বাঁশ ঝাড়টি যেমন, সেখানকার সেগুলিও তেমনি। তাই দেখে, হৃদুকে বলেছিলাম, ওরে হৃদু, এখানে আর তবে কি দেখতে এলাম রে? সেখানেও যা এখানেও তাই। কেবল মাঠে-ঘাটের বিঠাগুলো দেখে মনে হয় এখানকার লোকের হজম-শক্তিটা ওদেশের লোকের চেয়ে অধিক। ভেবেছিলাম, কাশীতে সকলে চব্বিশ ঘণ্টা শিবের ধ্যানে সমাধিস্থ আছে দেখতে পাব। বৃন্দাবনে সকলে গোবিন্দকে নিয়ে ভাবে-প্রেমে বিহ্বল হয়ে রয়েছে দেখব। গিয়ে দেখি সবই বিপরীত। যদি এখানে এসে ভক্তিলাভ করতে পারে, তীর্থে যাবার কি দরকার? তীর্থে যাবার কি দরকার? তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হলো তাহলে তীর্থে যাওয়ার আর ফল হয় না।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সুখী চোলায়

সব সাধু সংকল্প এবার যেন বানের জলে ভেসে গেল।

চম্পার চাচাজির এই নতুন পরিচয়টুকু পাবার পর নিখিলের ভাবে সমস্ত ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলে নিখিলদের ছেড়ে চলে যাওয়া আর সম্ভব হল না।

শুধু কৌতূহল চরিতার্থের প্রশ্ন আরও নয় এবার মনে হল যে ভাবেই হোক নিখিলের জীবনের রহস্যের সঙ্গে যখন জড়িয়ে একটু পড়েছি তখন তার সম্বন্ধে আমার একটা দায়িত্বও পালন করবার চেষ্টা না করে নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে নেবার অধিকারও আর আমার নেই।

চম্পা খানিক আগে নিখিলের বিরুদ্ধে গভীর একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে একথা তাকে জানাতে বলেছে।

উত্তেজনার মাথায় উচ্ছ্বাস ভরেই কথা গুলো বলেছে ঠিকই, কিন্তু কিছু সত্য কি তার মধ্যে নেই!

চম্পা চাচাজি বলে যাকে সম্বোধন করেছে সেই লোকটির সমস্ত আচরণ'ও ওই ইঙ্গিতই দেয়।

ষড়যন্ত্রটা কি ধরণের হতে পারে এবং চম্পার ভূমিকা তার মধ্যে কি তা অবশ্য এখনো বুঝে উঠতে পারছি না। তবে নিখিলের সঙ্গে খোলাখুলি সব এবার আলোচনা না করলেই নয়।

চম্পার আজ রাত্রে মন্দিরে পূজার আয়োজন করার কথা শুনে নিখিল প্রথমে বেশ একটু বিচলিত যে হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরে অবশ্য ব্যাপারটা সহজভাবে গ্রহণ করবার একটা ভঙ্গি সে দেখিয়েছে। ভঙ্গিটা কপট ছাড়া হয়ত নয়। নিজেকে যে স্তোক দেয় নিখিল তাতে বিশ্বাসও করে নিশ্চয়। তবু এ খবর শুনে তার প্রায় নিজের অজান্তেই বিচলিত হয়ে ওঠার মধ্যে কিছু একটা ইঙ্গিত অবশ্যই আছে।

সেই ইঙ্গিতটাই স্পষ্ট করে তুলতে হবে নিখিলকে সোজাসুজি সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করে।

কিন্তু আজ রাত্রেই তা কি করে সম্ভব? নিখিল এখন ঘুমের ওষুধের ঘোরে গাঢ় তন্দ্রায় নিশ্চয় আছন্ন। চম্পা এই অবস্থাতেই তাকে জাগিয়ে তুলে যেমন করে হোক এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে। নিখিলকে নিয়ে চলে যাওয়ার প্রশ্ন বাদ দিয়ে শুধু সমস্ত রহস্যের খোলাপড়ার জন্যে তাকে এখন জাগিয়ে তোলা সঙ্গত হবে কি?

বেশ একটু দ্বিধা সংশয় নিয়েই বারান্দায় উঠে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। দাঁড়াতে হল নিখিলেরই ডাক শুনে।

তুমি যে এর মধ্যে চলে এলে?

বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকিয়ে নিখিলকে এবার দেখতে পেলাম। অন্ধকার বারান্দায় একটি বেতের চেয়ারে সে বসে আছে।

কাছে গিয়ে তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজেই সবিস্ময়ে বললাম তুমি এখনো জেগে আছ।

হ্যাঁ, আজ ঘুমের ওষুধ খাইনি।

অন্ধকারে নিখিলের মুখের ভাবটা দেখা গেল না, কিন্তু গলার স্বরে যেন একটা চাপা উত্তেজনার আভাস পেলাম।

তার পাশের একটি বেতের চেয়ারে বসে এবার একটু উদ্বিগ্নভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম,—তাতে শরীর খারাপ হবে না?

নিখিলের মৃদু একটু হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপর সে বললে—হয়ত হবে। কিন্তু শুধু শরীরটা ভালো রাখবার জন্যেই কি বেঁচে থাকা?

কথাগুলো একটু অদ্ভুত লাগল। তার গলার স্বরও। একবার উত্তরে কি বলব ভেবে ঠিক করবার আগেই নিখিল আবার বললে,—তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে ভাবিনি। পুজো'ত সারারাত ধরে হবে।

হ্যাঁ, তা হবে।—নিজের কৈফিয়ৎটা এবার দেবার চেষ্টা করলাম.—কিন্তু তুমিত জানো এ সব ব্যাপারে আমার তেমন আগ্রহ উৎসাহ নেই। সমস্ত রাত ধরে ওই পুজো দেখা আমার কাছে একটা শাস্তি। তাই চলে এলাম। তা ছাড়া আর একটা কারণও আছে।

ইচ্ছে করেই শেষ কথাটা বলেছিলাম নিজের পরের বক্তব্যের জমি তৈরীর জন্যে। নিখিলের কাছে যা কিছু জানবার তা এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হ'তে পারে না। তাকে এ সময়ে এমন নিরিবিলিতে আয়ত্ত অবস্থায় পাওয়াই একটা সৌভাগ্য। নিখিলকে শুধু কথায় খেইটা ধরাতে পারলেই হয়।

নিখিল কিন্তু তা ধরবার চেষ্টাও করল না। আমার এখন চলে আসবার অতিরিক্ত কারণ সম্বন্ধে তার কোন আগ্রহই নেই।

একটু চুপ করে থেকে বললে,—তুমি এখন শুতে যাবে নিশ্চয়। আমার জন্যে বসে থাকবার তোমার দরকার নেই।

তুমি একলা এখানে বসে থাকবে!—বিস্ময়টা প্রকাশ না করে পারলাম না।

তাতে কি হয়েছে!—নিখিল একটু হাসল —অসুবিধেত কিছু নেই, তা ছাড়া আমার সঙ্গ দেবার জন্যে তুমি মিছিমিছি রাত জাগবে কেন?

সন্দেহটা হঠাৎ মনে এল। অন্ধকারেই নিখিলের মুখটা যতটুকু সম্ভব দেখবার চেষ্টা করে একটু গম্ভীর ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ এ সময়ে আমার ফিরে আসায় তুমি কি খুশী হয়েছ? আমার সঙ্গ এখন তুমি চাওনা? বেশ, তাহলে আমি এখন মন্দিরেই ফিরে যেতে পারি। রাতটা সেখানেই……

না, না,—আমার কথার মাঝখানেই নিখিল অত্যন্ত কুণ্ঠিত অস্থির হয়ে উঠল,—এ কি বলছ! তুমি আসায় আমি খুশী হব কেন। তোমার মন্দিরে ফিরে যাবার কোন কথাই হচ্ছে না। শুধু …… নিখিল কি এক গভীর দ্বিধাভরে থেমে গেল।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলাম,—শুধু কি?

শুধু—শুধু আমি এখন একটু একলা থাকতে চেয়েছিলাম,—নিখিল অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করলে।

কেন ?—গলার স্বরটা আমার নিজের অজান্তেই একটু কঠিন হয়ে গেছে তখন।

তা না হলে,—মানে আমার একলা না পেলে,—নিখিল অসহায় কাতরতার সঙ্গে থেমে থেমে বললে,—সে হয়ত আসবে না,

কে আসবে না ? এবার আমার গলার স্বরে বিস্ময় বিমূঢ়তা।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিখিল প্রায় অর্ধস্ফুট স্বরে বললে,—আমার স্ত্রী। আজ হয়ত আসতে পারে।

তোমার স্ত্রী ! এখানে তিনি আজ রাত্রে আসবেন !

কথাটা নেহাৎ আপনা থেকেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। মনের মধ্যে তখন অন্য ভাবনার স্রোত বইছে।

নিখিলের স্ত্রী বেশ কিছুদিন আগে মারা গেছেন বলে জানি, তার ধারণা কিন্তু অন্য রকম। তার স্ত্রী নিজেকে কোন কারণে সরিয়ে নিয়েছেন ও তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তাকে দেখা দেন নিখিলের অসুস্থ মনের দৃঢ়বিশ্বাস এই।

নিখিলের এই ধরণের আত্মবিভ্রমের আভাস কলকাতার নার্সিং হোমের সেই ডাক্তারের কাছে পেয়েছিলাম। সেই অপ্রকৃতিস্থতাই কি আবার উগ্র হয়ে উঠেছে। এ কয়দিনে তার কোন পরিচয় কিন্তু পাইনি। আজকের কথাবার্তার মধ্যেও চাপা একটু উত্তেজনার আভাস ছাড়া মানসিক বিকারের কোন লক্ষণ ত নেই। তবু এই বিভ্রমের সূত্র ধরেই হয়ত যে রহস্য তাকে ঘিরে আছে তার মূল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

কিভাবে অযথা বিচলিত না করে তাকে নিজের কথা বলান যায় ভাবছি, এমন সময় নিখিলই নিজে থেকে ঈষৎ আহত স্বরে বললে,—তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না জানি। কেউ এ কথা বিশ্বাস করে না। সবাই আমায় বোঝাতে চায় সে মারা গেছে। কিন্তু আমি যে নিজের চোখে তাকে দেখেছি। কতবার সে যে আমার কাছে এসেছে।

সহানুভূতি দিয়ে ছাড়া নিখিলের মনের দরজা খোলানো যাবে না বুঝে বেশ একটু গাঢ় স্বরেই বললাম,—তুমি নিজে যখন দেখেছ তখন তার ওপর কোন কথা নেই। কিন্তু তোমার স্ত্রী মারা গেছেনএ ধারণা অন্য অনেকের হয়েছে কেন ?

হয়েছে, সে নিজেই এ ধারণা হতে দিতে চায় বলে। সে'ত আমার কাছে এখন থাকে না।

কেন থাকেন না ?—নিজের অনিচ্ছাতেই স্বরটা একটু বুঝি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সেটা ঢাকতে যথাসম্ভব স্নিগ্ধ কণ্ঠে আবার বললাম,—তিনি ত তোমায় একবারে ত্যাগ করেননি। এখনো তোমায় দেখা দিতে আসেন। তাহলে এভাবে তোমায় ছেড়ে থাকার কারণ কি ?

নিখিল বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে চুপ করে রইল তাতে সন্দেহ হ'ল এ কথার উত্তর দিতে সে বুঝি চায় না, কিন্তু আমার ধারণা ভুল। প্রসঙ্গটা চালু রাখার অন্য কোন উপায় যখন ভাবছি তখন ধীরে ধীরে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে,—কেন সে আমায় এমন করে ছেড়ে আছে এতদিন ধরে ভেবে একটা কারণ আমি বোধহয় অনুমান করতে পেরেছি। তা সত্য কি না আজই হয়ত জানতে পারব।

আজই জানতে পারবে!—আমার সংশয়টা এবার তেমন প্রকাশ করতে পারলাম না,—কিন্তু আজই তিনি আসবেন কি করে বুঝছ! তিনি কখন আসবেন আগে থাকতে কি আভাস পাও?

আবার নিখিল কিছুক্ষণ একেবারে নীরব। এবার ধৈর্য ধরেই অপেক্ষা করে রইলাম। অপেক্ষা বৃথা হল না। নিখিল খানিকবাদে আগের মতই মৃদু কণ্ঠে যেন ভেবে ভেবে বললে,—না আভাস ঠিক পাই না। তবে আমাকে একান্ত একলা না পেলে সে আসে না। অনেকদিন, সেই বাড়ি থেকে চলে আসবার পর থেকে আর সে আসেনি। আজ চম্পা পুজোর অন্তে সারা রাত বাইরে থাকবে। তোমারও সেখানে থাকবার কথা। তাই মনে হয়েছে আজ হয়ত তার আসবার দিন। চম্পার এই রকম পুজো দিতে যাওয়ার রাত্রে আগেও এসেছে কখনো।

এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্নই মনে ভিড় করে এল, নিজেকে সংবরণ করে একটা একটা করেই সেগুলো তুলব ঠিক করলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম,—চম্পাদেবীর এরকম পুজো দেওয়ার সঙ্গে তাঁর আসার কোন সম্বন্ধ আছে কি?

জানি না। তবে এরকম পুজোর রাত্রে ছাড়াও সে এসেছে।

কিন্তু তোমার কথায় মনে হচ্ছে রাত্রে ছাড়া তিনি তোমায় দেখা দেননি, তাও তোমায় একেবারে একলা না পেলে নয়। তাই যদি হয় তা হলে তাঁর আসার সুযোগ করে দেবার জন্যে তুমি রাত্রে একেবারে নিঃসঙ্গ থাকবার ব্যবস্থাও ত করতে পারো।

তা পারি। কিন্তু সুযোগ করে দিলেই সে আসবে তার কোন ঠিক ত নেই। এক সময়ে সে চেষ্টা করেও দেখেছি। তা ছাড়া, তা ছাড়া,—নিখিল যেন অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর স্বরে বললে—তার আসা আমি যেমন ব্যাকুল ভাবে চাই তেমনি আবার ভয়ও করি।

ভয় করো!

হ্যাঁ, সে এসে চলে যাবার পর আমার ভেতরটা যেন চুরমার হয়ে যায়। অনেকদিন পর্যন্ত নিজেকেই যেন খুঁজে পাই না: সব কিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেছে মনে হয়।

কেন?—ব্যাকুলভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম,—এসে তোমায় দেখা দিয়ে কি তিনি করেন? কি বলেন?

কি করে, কি বলে? কিছুই তেমন কখনো বলেনি এসে শুধু ম্লান মুখে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। আমায় ছুঁতে পর্যন্ত দেয় না। তবু তার নীরব যন্ত্রণার ভাষা আমি বুঝতে পারি।

কি বুঝতে পারো?

বুঝতে পারি গভীর কোন অভিমানে সে আমার কাছ থেকে দূরে সরে আছে। তীব্র কি একটা অভিযোগ সে যেন জানাতে গিয়েও পারছে না। [ক্রমশঃ]

তাম্রলিপি

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য

মাঘমাসের সকাল। সমুদ্রতীরে ঢোল বাজে কাঁসি বাজে। মেয়েদের গলায় হুলাহুলি, বৃদ্ধারা সমুদ্রে নারকেল দেন। আজ সকালে ছোটহাতিনপুর-গ্রামে সকলের আনন্দের শেষ নেই। কাতারে কাতারে মানুষ কুলচন্দ্রের ঘরে গিয়ে নতুন উজ্জ্বল তামার লিপি দেখে। তামার রং কি সুন্দর যেন নতুন সূর্যের লাবণ্য সে পাত হতে ঠিকরে পড়ে. 'কুলচন্দ্র তোর জীবন ধন্য, বৃদ্ধারা কম্পিত কণ্ঠে বলেন।

ধন্য সত্যিই কুলচন্দ্র ধন্য। এ আনন্দের দিনে কে মনে রাখে সে মোরগ্রাম থেকে মোহনদীর বন্যায় গৃহচ্যুত হয়ে এখানে এসেছিল ; কে মনে রাখে সে সমাজে সবচেয়ে লক্ষ্মীছাড়া, ক্ষেতচাষী, তার আপন জনরা এখনো ফসলের সময়ে পরের খেতে চাষ করে, সুদূর মোরগ্রামে তবু তাদের ঘরছিল, জমি ছিল. এখানে তাদের বসতে গেলে বৃক্ষতলে বাস। পরনে ছেঁড়া কানি, চুল জটাবাঁধা, সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করাই তাদের একমাত্র জীবিকা।

'কুলচন্দ্র, তুমি ধন্য, কায়স্থ নরদণ্ড এ-কথা বলে সাদরে কুলচন্দ্রের পিঠে হাত রাখে। কুলচন্দ্র ধন্য কেননা তার বুদ্ধি শেয়ালের মত তীক্ষ্ণ, সাপের মত পাতালগামী, ভাগ্য সর্বদা বল লোকের প্রতি প্রসন্ন থাকে। ভাগ্য কুলচন্দ্রকে আশ্চর্য সুযোগ দিল, রাজার নৌকা যখন ঝাড়কেশ্বরে ডোবে, তখন সেই জীবন বিপন্ন করে জলে ঝাঁপ দেয় রাজা ভক্ত প্রজার কথা সর্বদা চিন্তায় রাখেন।

তাই কুলচন্দ্রের আঙিনায় কাতারে কাতারে লোক। তাই বাজনা বাজে ডিম-ডিম ক্রম-ক্রম। তাই রাজা কুলচন্দ্রকে বর্ধমান ভুক্তির দণ্ড ভুক্তির অন্তর্গত ক্ষুদ্র হস্তাবয় গ্রামের সকল অধিকার দেন। আজ কুলচন্দ্রের নতুন সম্মান। কায়স্থ, বণিক, ব্রাহ্মণ সবাই আজ তাকে নিয়ে হুড়োহুড়ি করে। নরদণ্ড বলে এখন তুমি ভূস্বামী। নামের পেছনে দণ্ড দেখনা কেন? বাপে বাপ কাঁপে মানুষ তোমায় মান্য দেবে না। নানা, ভেবনা কিছু। সমাজ আবার কি হে! কথা মানতে গেলে ত বলতে হয় ঐ নেংটা ক্যাঙালীগুলোই তোমার সমাজ। সে কি একটা শুনবার মত কথা হল?

সবাই সায় দেয়। বলে 'এ তোমার কাছে এখন আর বিদেশ নয়, মোরগ্রাম হতে স্বদেশ। এখানে কেউ কুলক্ষী নিয়ে বসে নেই। ধনধন বড় বল, কুলচন্দ্র, আজ হতে তুমি উঁচু জাত।

তাই কুলচন্দ্রের ঘরে উৎসব হয়। ওদিকে সমুদ্রতীরে হুলোহুলি। মেয়েরা শঙ্খ বাদ্যের বৃদ্ধারা মনে নারকেল দেন! আজ আকাশে উৎসব, সূর্যদেব অয়নপরিবর্তন করেন। আজ মাটিতে উৎসব, মেয়েরা ব্রতপূজা দেন, জালিকরা নতুন নৌকো বউনী করে, সমুদ্রতীরে মেলাবসে যায়, বয়স্ক পুরুষরা জালিকদের সঙ্গে বচসা করে মাছ কিনে নিয়ে যান, আজ যুবকরা গুঁড়িবাড়ীর পথে যায়।

এদিকে ঢোল বাজে ডিম ডিম ক্রম ক্রম। কুলচন্দ্রের ঘরে দলে দলে মানুষ আসে। এদের মাথায় তেল নেই পরনে উত্তম কার্পাস বস্ত্র শোভা পায়না।

'আমরা কুলচন্দ্রের নিজের সমাজের লোক হে, আমাদের আগে আসতে দাও।

এ-কথা শুনে কুলচন্দ্রের শীত বর্ষুল, ঘর্ম শরীর কাঁপে। 'কে বলে সে আমার সমাজের লোক? হতভাগাদের মধ্যে আমার কেউ আপনজন নেই।

তবু তারা আসে। সকলের মাথায় মাথায় উঁচু হোগলার বসে আসে কলক, বৃদ্ধ কলক, বয়সে প্রপিতামহ, সব ক্ষেতচাষীদের আদিপুরুষ যেন।

ভাগ্যহীন কলক আসে পথ দাও পথ দাও; মুনিয়ারা হই হই করতে করতে চোকে। কলকের পাশে হেঁটে আসে খাসক, কলকের প্রৌঢ় ভাইপো বলে 'এখানে নামাও।'

'কি বল? কুলচন্দ্র কি বলে? কলক কাঁপা, নীর্ণ, নিস্তেজ গলায় জিজ্ঞেস করে। তার ভুরু সাদা, মাথায় চুল নেই, কথা কইতে গেলে মাথাটি নড়ে।

খাসক কাকার কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বলে 'আমরা কুলচন্দ্রের কেউ নই। উনি অন্য সমাজের লোক।' কলকের দন্তহীন মুখ নিষ্পাপ হাসিতে ভরে যায়। বলে 'পুত্র রাজা হলে পিতা রাজা হয় না কুলচন্দ্র, আমি তোমার বাপের গুরু, তোমার আপন লোক···'

খাসক চেঁচায় 'কাকা বলে ছেলে মন্দ হতে পারে বাপ মন্দ নয়, তিনি ওঁর বাপের গুরু ··ওঁর আপন লোক·····'

'আজ তোমায় আশীর্বাদ দিই।'

'তিনি কুলচন্দ্রকে আশীর্বাদ দেন।

'এখন তুমি ভুঁয়ের রাজা, তোমার কাছে বিচার চাই·····'

'বিচার চাই, আমরা মুনিয়ারা বিচার চাই···' সবাই চেঁচায়।

কলক নীর্ণ আঙুল তোলে। সবাই প্রায় চুপ। কলক নম্র দুর্বাদলের মত শান্ত, সুন্দর কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে আমাদের লবণের আড়ি ভেঙে দিলে কেন কুলচন্দ্র? আজকের দিনে ভিখারী মাথায় তেল পায়, পুত্রহীন পুত্র পায়, এমন দিনে আমাদের লবণ আড়ি তোমার দাসরা ভেঙে দিল?

কুলচন্দ্রকে সামনে নয়ও বলে খাম কুলচন্দ্র, আমি জবাব দিই। তোমার উত্তর করা সাজেনা। শোন খাসক। তোর কাকাকে বল, এ-গ্রামের সকল অধিকার রাজা কুলচন্দ্রকে দিয়েছেন।'

'সকল অধিকার কুলচন্দ্রকে দিলে রাজা আমরা লবণ করতে পারব,' খাসক চেঁচায়।

'কলক হাসে। বলে 'তোরা ভুঁয়ের মালিক। লবণ ত' ঠাকুরের, তবে তার জলে আমরা লবণ করবনা?

'না, লবণ করবেনা।

'তবে আমরা কোথায় যাব?'

'তা কুলচন্দ্র জানেনা।'

'তোমরা সমাজের মাথা, তোমরা এমন নিয়ম করলে কেন যে ঘরেঘরে এখন হতে ঘাস রাখবে, খেত চষাবে তাদের দিয়ে, কেন আমরা কি দোষ করেছি?

দূরে মেয়েদের হুলুধ্বনি। কুলচন্দ্র বিব্রত হয়ে ওঠে। এখন জালিকরা আসবে তাদের প্রথম নমস্কারী দিতে, আজ কুলচন্দ্রের ঘরে নতুন তেওড়ে শুঁড় জাল হয়, পাকশালা থেকে রান্নার ধোঁয়ার গন্ধ ওঠে, আজ কুলচন্দ্রের ঘরে পাঁচজন পাতা পাড়বে।

'আমরা কোথায় যাব?'

নরদণ্ড বিরক্ত হয়। এতক্ষণে ভেতরের ঘরে গানোৎসব সুরু হয়, প্রথম গায়টি নরদণ্ডের বউনী করে দেবার কথা।

'যেথায় খুশী যা না কেন, তেন তেন করিস কেন?'

'আলিকরা থাকবে? শৌণ্ডিকরা থাকবে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা গ্রামের শোভা। তো বেটারা অমঙ্গলে। যেমন ঘরদোরের ছিরি, তেমনি চেহারা সে কুলচন্দ্রের দয়ার শেষ নেই তোদের মারকেল দেয় কাপড় দেয় সে, হাতে ধর।

খানিক ভগ্নস্বরে বলে রাজা গ্রাম দিলে গ্রাম ভোগ কর। সবাই তোমায় ধান দেবে, মাছ দেবে, কাপড় দেবে, আমরা নবণ দেব ঘাট বাঁধব, খেতে খাটব।'

এই বৈশাখে কুলচন্দ্রের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছিল এখন গোপালীর বাবার কাছে ভিক্ষে চাইতে খানকের মাথা কাটা যায়, গোপালীর ঝলমলে শরীর, চোখ সর্বদা চুলু থাকে, এমন অলস চাউনি, গোপালীর চিন্তায় সে এই সেদিনও ধান কাটতে হাতে কোর পেত; প্রৌঢ় বলে কি হয়, খানক রসটি বুঝতে অনায়াসে সাঁতরে হারিয়ে দেয়।

কলক বলে 'কোন সুবাদে আমাদের তাড়াও তুমি কুলচন্দ্র। আমি সেইটি বুঝি না।'

এখন অপারগ কুলচন্দ্র রাজপুরুষকে ডাকে। রাজপুরুষ রাজার তাম্রশাসন এনেছে সেই সুবাদে উত্তম ঘরে, বড় পালঙ্কে বসে সুরাপান করে ও গ্রামের মাতব্বর পুরুষদের সঙ্গে কথা কয়। এখন সে লাল্ স্ফীত চোখে গোঁফ মোচড় দিয়ে কোমরের চাদর বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে আসে। বলে 'ব্যাপার কি?'

কুলচন্দ্র সব বলে। খানক জোড়হাতে বলে আমরা এ গ্রামে সবার পাশে পড়ে আছি, কোন অপরাধে আজ গ্রাম ছাড়া করেন বলুন? মোরগ্রাম আমরা জানিনা এ-গ্রাম আমাদের ভাত কাপড় দিয়েছে, আমরা যাব কোথায় আর শুধু কি আমরা? এ-গ্রামের আদিবাসিন্দা যারা আমাদের স্বজাতি, তারা যা কোথায় যায়?

রাজপুরুষ বলেন, 'কুলচন্দ্র, রাজার কাছে কোন ফাঁক রাখতে নেই। শোন হে, আমি তোমাদের রাজার শাসন পড়ে শোনাই।'

'তাই শোনান, তাই শোনান না কেন, আমরা জানি, রাজার কাছে অবিচার নেই।'

'এতে যা বলবে, তা তোমরা মানবে?'

তামার ফলক দেখে দুনিয়াদের ক্ষেতচাষীদের চোখ ধাঁধে। বলে 'নিশ্চয়।' তামার শাসনকে দণ্ডবৎ করে।

রাজপুরুষ পড়ে যান শোন হে তোমরা রাজা কুলচন্দ্রকে এ ক্ষুদ্র হস্তাবয়া গ্রামের সব কিছু দেন।

'সব কিছু দেন।' শ্রোতারা প্রতিধ্বনি করে।

'বাস্তুক্ষেত্র জলাধার, গর্ত এবং পথ, চাষের জমি, পতিত জমি, এমন কি আবকরস্থান যাকে তোমরা আওাকুঁড় বল হে সব ঐ কুলচন্দ্রের।

'সব!' সবাই অবাক, সন্ত্রস্ত।

'ঐ নবণের ভাঁটি আমলহরা সবরকম ফলপাকুড়, গাছ, লতা, পাতা, ধান, রবিশস্য, সব কুলচন্দ্রের।'

শ্রোতারা নীরব। এখন খানক ভয় পায়। সে অসহায়ভাবে কলকের দিকে চায়।

'হাট ঘাট, পার খেয়াঘাট আর নবণাকর।'

রাজপুরুষ উঠে দাঁড়ান। ঘোষিত পুরুষকণ্ঠে বলেন, সব অধিকার যার সে যদি তুলে দেয় তোমাদের, তার সেটাই ন্যায় বিচার। আর দেখ, লবণকর দেবার অর্থ বড় জটিল হে, রাজপণ্ডিতদের অবধি এর অর্থ বুঝতে ঘাম ছুটে যায়। এর মানে হচ্ছে, কুলচন্দ্রকে রাজা মস্ত সম্মান দিয়েছেন। লবণের অধিকার রাজা চট করে ছাড়েন না।

কলক ক্ষীণ কণ্ঠে বলে কিন্তু সব অধিকার রাজা দেয় কি করে? ভুঁই কি রাজার?

বৃদ্ধের অজ্ঞতা দেখে সবাই হাসে।

'রাজা চিরদিন ছিলনা, তখন ভুঁই কার ছিল? আমরা তখন থেকে ভুঁয়ে বাস করি।

কলকের এ-কথা কেউ শোনেনা। কেননা এমন সময়ে ঝমঝম বাজনা বাজিয়ে জালিকরা তারে তারে মাছ নিয়ে নাচতে নাচতে উঠোনে ঢুকে পড়ে। মেয়েরা ছুটে এসে মাছে তেলসিঁদুর দেন, শাঁখ বাজে উলুধ্বনি ওঠে, কলকের ছুলি মাথায় তুলে নিয়ে খাসকরা বেরিয়ে আসে।

খাসকর' সমুদ্রতীর ধরে যায়। সমুদ্রের তীরে দশহাত ভুঁই কারো নয়, এ জমি ভগবানের। এ জমিটি বড় সরু, এ-জমিতে শুধু পথ হতে পারে, বাস চলেনা, বাস করতে হলে মানুষের জমি দরকার। ভগবানের জমি ধরে দুনিয়ারা যায়, ক্ষেতচাষীরা যায়। এখন তারা দাক্ষনে যাবে। দাক্ষন দেবস্থান, সেখানে কেউ বিনাঅন্নে থাকে না, কলক স্বপ্নে নির্দেশ পেয়েছে।

বালি ভেঙে ওঠে। পিঠের চামড়া মাঘী শীতে চড়চড় করে। কাকার ছুলি বইতে বইতে খাসক বিনীত কণ্ঠে বলে 'মাটির ওপর, নিচ, জল, গাছ, সব কুলচন্দ্রের?'

কলক হাসে। বলে না। তা কখনো হয়।

'হয়। কাল তুমি নিজে স্বীকার হয়ে এলে।

'আরে খাসক,' ভাইপোর মাথায় হাত রেখে কলক সাদরে বলে এরা কি জানে? কার সাথে কথা বলব বল্? রাজা চিরদিন ছিল? কুলচন্দ্র চিরদিন থাকবে? অথচ এই জল মাটি, জলের লবণ এ চিরদিন ছিল।'

'তাতে কি হবে?

'ওরা মলে পরে আবার যে-কে সেই হবে।

'তার মানে?

'যার ইচ্ছে, সেই দুনিয়াই লবণ জাল দেবে, যার ইচ্ছে সেই বাস করবে।'

খাসক ধীরে বলে কাকা, যবে দেশে রাজা ছিলনা, যবে সব জমি ঠাকুরের ছিল সে কথা ভুলে যাও। এখন আর তেমন দিন হবে না।

দিনের কথা তুই কি জানিস, খাসক? সেদিনের ছোঁড়া?

গোপালীর দুঃখে এখনো খাসকের বুক হুহু করে, সমুদ্রের সমসম্ বাতাস, সে চেঁচিয়ে বলে এখন এর পর এর ছেলে তারপর আর কজন, না, ভুঁয়ের আর সেদিন আসবে না। কোনদিন না, কোনদিন না।'

কলক চুপ। দুনিয়ারা হাঁপাতে হাঁপাতে যায়। দূর, দিগন্তে, দাক্ষনের মন্দিরের চূড়ায় সোনালের ধ্বজা ঝকমক করে। কলক সনিশ্বাসে বলে 'কিন্তু কুলচন্দ্র আমাদের তুলে দিলে কেন?

কেউ বৃদ্ধের কথার জবাব দেয়না। তারা ঘুরে ঘুরে বাতাস ঠেলে হাঁটে। সমুদ্রে শোঁ শোঁ শব্দ। পায়ের নিচে বালি। দাক্ষন ক্রমে কাছে আসে।

নিজের দুঃখ

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

গণেশবাবু গাড়িটা ছাড়ার শেষ মুহূর্তে হন্ত দন্ত হয়ে উঠলেন। ব্যাণ্ডেল লোকাল—হাওড়া স্টেশন থেকে ছেড়েছে। কোনগতিকে গাড়ির ভেতর ঢুকলেন। গণেশবাবু মধ্য বয়সী. উসকো খুসকো চেহারা। সব সময় একটা রুক্ষ তিরিক্ষি ভাব। কামরায় বসার জায়গা নেই। থাকলেও জন কয়েক লোক এমন ভাবে আরাম করে বসে আছেন যে তাদের ইচ্ছে থাকলে ওর মতো জনছয়েকের সংকুলান হয়ে যায়।

গণেশবাবু ভুরু কুঁচকে এমন ভাবে বসে থাকা শেষের বেঞ্চের লোকগুলির দিকে মিনিট কয়েক চেয়ে রইলেন। ইচ্ছেটা—এঁকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরাই ভদ্র ভাবে বসতে বলে কিনা দেখা যাক। কিন্তু দেখেও দেখল না কেউ। গণেশ বাবু সঙ্গে সঙ্গে অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন এবং আর কাল বিলম্ব না করে সরোষে ওদিকেই এগিয়ে গেলেন। গিয়ে বললেন—আমার জন্যে কেউ একটু কষ্ট করবেন দয়া করে? চেষ্টা করলেন কথাগুলো বিনীতভাবে বলতে। কিন্তু পারলেন না। স্বরে রুক্ষতা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

ওঁর কথাগুলো এঁরা না শোনবার ভাণ করতেই গণেশবাবু মুহূর্তে তেরিয়া হয়ে উঠে বললেন —আমার কথাগুলি কি কারুর কানে গেলনা মশাই? কানের মাথা সবাই খেয়ে বসে আছেন নাকি?

ওঁর কণ্ঠের রুক্ষতায় এবার সকলে মুখ তুলে চাইল। কেউ বিরক্ত হল। কেউ আশ্চর্য হল। আবার কেউ কৌতুকের হাসি হাসল। ওর মধ্যে এক ছোকরা গোছের যাত্রী মুচকি হেসে বললে—গাড়িতে চলা ফেরা করলে একটু কম শোনাই ভাল।

এাঁ!—একটা কানের পেছনে হাত রেখে সেটিকে ঠেলে এগিয়ে ধরলেন গণেশবাবু। উনি এমনিতেই কানে একটু খাট।

ছোকরা যাত্রীটি বললে মরেছে, ইনি দেখছি নিজের কানের মাথাটা আগেই খেয়ে বসে আছেন।

—কি বললেন—? গণেশবাবু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন।

—বলছি, নিজের কানের মাথাতো আগেই খেয়ে রেখেছেন। তাই বলে কি পরেরটাও।

ফেটে পড়লেন গণেশবাবু। ঠিক ব্যথার জায়গাটিতে ঘা পড়েছে। বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। কানের মাথা খেয়েছি। তাতে আপনার কি মশাই? আপনারটা ঠিক থাকতেও তো দেখলাম। আমার প্রথম কথাগুলো কানে গেল না।

আরও কি সব বলতে যাচ্ছিলেন। আমার ঘুটে টান পড়ল। দেখলেন কোণের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু সরে গিয়ে জায়গা করে ওঁকে ইঙ্গিতে বসতে বলছেন।

সবার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে, বৃদ্ধটির দিকে প্রসন্ন হেসে উনি ওঁর কাছেই এগিয়ে গেলেন। ঝোলাটি বাঁকে রাখতে রাখতে বেশ শুনিয়েই বললেন—দুনিয়ায় সবাই যে অভদ্র নয় এই যা রক্ষে। তা না হলে আমাদের মত নিরীহ লোকের যে কি হত!

ছোকরাটি মুখ টিপে হেসে বললে, আমরা জানতাম না আপনি একজন নিরীহ—!

—এঁ্যা—আবার কানের পাশে হাত রেখে খিঁচিয়ে উঠলেন গণেশবাবু।

ছোকরার কথায় এবার কয়েকজন আপত্তি করলেন। বৃদ্ধটি হাত ধরে টেনে বসালেন গণেশবাবুকে।

ছোকরাটি বকুনি খাওয়ায় এবার খুসি হয়ে স্বস্থানে বসলেন গণেশবাবু। বৃদ্ধটির দিকে চেয়ে স্মিত হেসে বললেন—বসব না কেন মশাই। নিশ্চয়ই বসব। আপনার মত দেবতা লোকের কথা শুনব না তো কি, এই এদের কথা শুনব। আবার আড় চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন একবার ওদের দিকে।

গণেশবাবু বাস্তবিক নিরীহ লোক। আগের কথা ভুলে গেলেন। বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে পা দুটি মুড়ে ওদের দিকে পেছন ফিরে দেবতা লোকটির সঙ্গে গল্পে রত হলেন। বললেন—নিজের দুঃখের কথা আর কি বলব মশাই। কানে হাত দিয়ে মুখটা একটু উঁচুকে বললেন—এ কানটায় একেবারে আর শুনতে পাইনা। কিন্তু এর জন্যে আমি কি দায়ী? স্কুলে পড়ার সময়ে কানের মধ্যে কি একটা ঢুকে সেই কানের দফাটি সেরে রেখেছে, সারা জীবনটা কি কালাই না হতে হল। "কলিয়া কালা" শুনতে শুনতে আর একটা কানেও কম শুনি। ভয় হয়, এই করে শেষটা মরবার সময় আত্মীয় স্বজনের মরা কান্নাটাও শুনতে পাব না। কিন্তু এ জন্যে আমি যে দোষী নই, তা কে শুনতে গেছে। আমি তো আর কালা হয়ে জন্মাইনি। তাহলে বুঝতাম মোড়াতেই একেবারে ভগবানের মার। কিন্তু ভগবানের মারের চেয়ে মানুষের মার সাংঘাতিক মশাই।

বৃদ্ধটি মৃদু হাসলেন। এ কথার ওপর আর বলার কি থাকতে পারে!

উৎসাহ পেয়ে গণেশবাবুর মুখে খৈ ফুটতে লাগল। বলে চললেন—আমি কালা, আমি কানের মাথা খেয়েছি, তাতে আপনার কি? আমি না খেতে পেয়ে মরলে আপনি খেতে দেবেন? এই যে হাড়ির হাল হয়েছে। এই বয়সে কলকাতা থেকে মাল কিনে নিয়ে গিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে তবে বউ ছেলের দুটি অন্ন জোটে—আপনারা কখন ডেকে দুটো কথা জিজ্ঞেস করেছেন। না কখনও কিছু সাহায্য করছেন? তবু কেউ বলতে ছাড়বেন না।—রাগে করে গোঁজ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন গণেশবাবু।

আবার নিজের মনেই সুরু করলেন -নিজের দুঃখের কথা আর কি বলব মশাই। স্কুলে ভাল ছেলে ছিলাম। সবাই বলত প্রমিসিং বয়। নিজের বিষয় তখন কত রঙিন কল্পনা ছিল। কিন্তু অত ভাগো করে তো আসিনি। কানের মধ্যে কি একটা ঢুকেই সর্বনাশ করে ছেড়ে দিলে। মাষ্টার ছাত্র যে যা পেয়েছে বলেছে মশাই। কোন রকমে ম্যাট্রিকটা পাশ করলাম। গরীবের ছেলে তায় আবার কালা—। বাবা বললেন—আরে রাখ তোর পড়া—চাকরি দেখ, নয়ত খাবি কি? কালা লোক কি আর চাকরি পায় সহজে। সব কেটে যেত ঐ এক অজুহাতে। শেষ বারেরটায় যখন সব পরীক্ষায় পাশ হয়ে মেডিকেলে ছেঁটে দেবার, "যে আই কাম ইন্" বলে সোজা সাহেবের

ঘরে ঢুকে বললাম—কানে একটু কম শুনি বলে কি সারা জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে তার? সাহেব গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবলেন। ইশারায় যেতে বললেন। কিন্তু পরে দেখি হয়ে গেছে চাকরিটা। সে কি আনন্দ মশাই! হবে না? সেদিনই প্রথম বুঝলাম আমার জীবনেরও একটা ভবিষ্যৎ আছে। কি বলেন, খুশী হবার কথা নয়!

অতীতের একটি উজ্জ্বল দিনের স্মৃতি স্মরণ করে হাসিখুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন গণেশবাবু। বৃদ্ধটি হাসিমুখে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছেন। স্টেশনের পর স্টেশন অতিক্রম করে যাচ্ছে।

—তারপর শুনুন মশাই, মনের মত লোক পেলেই মনের কথা বলতে ইচ্ছে করে। চাকরিটা পেয়ে জীবনের যখন একটা ভরসা পেলাম। তখন ভাবলাম জীবনের আর একটা সাধই বা বাকি থাকে কেন! অবশ্য বাড়িতে পেড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। রাজি হয়ে গেলাম বিয়ে করতে। ফুলশয্যার রাত্রিতে সে এক মহা বিভ্রাট। বউ যদি আগে কিছু বলে আর আমি যদি তা না শুনতে পাই ভাববে এ কোন কালার পাল্লায় পড়লাম রে বাবা! আর আগে যদি আমি কিছু বলি, তার জবাবটা মৃদু সলজ্জ স্বরেই আসবে। সেটুকু আমার কানে আসবে না। বুঝুন একবার ব্যাপারটা। জীবনের অমন একটা মুহূর্ত—।

কথাটা অসমাপ্ত রেখে গণেশবাবু কোন এক অতীত স্মৃতির কৌতুকে হো: হো করে হেসে উঠলেন।

বৃদ্ধটির মুখমণ্ডলও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

গণেশবাবু হাসি থামিয়ে বললেন—ব্যাপারটা কিন্তু সহজেই মিটে গেল। ঘরে একা পেয়ে একসময় নিজের দোষের কথাটি আগেই স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিলাম। কি আশ্চর্য! উত্তরে উনি লজ্জা পেয়ে কি একটা বলতে গিয়ে তার আগ অক্ষরটা নিয়ে মুখের কসরৎ দেখাতে গিয়ে যখন আরও লজ্জা পেয়ে ভেঙে পড়লেন আমার কি আনন্দ মশাই!

গণেশবাবু আবার হেসে উঠলেন। পরে বললেন—আমার দোষের কথাটা আগেই যেন বলে দেওয়া হয় কনে পক্ষকে, এ ইচ্ছাটা বিয়ের আগে প্রকাশ করি। কিন্তু সেটা যে রাখা হবে এবং এমন একটা সামঞ্জস্য রেখে, আগে কি ভেবেছিলাম মশাই? না কেউ ভাবতে পারে? কি মজার ব্যাপার দেখুন। ভাগ্যের মারে দুজনেই বারেন হয়ে এক ঘাটে কেমন এক হ'য়ে জুটেছি।

আস্তে আস্তে গণেশবাবুর আশেপাশে আরও কিছু শ্রোতা বেড়েছে বৃদ্ধটিকে মধ্যমণি করে। সকলের মুখে মৃদু হাসি। গণেশবাবুর গল্প সকলে উপভোগ করছেন।

গণেশবাবু এবার ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—বিয়েটা না হলেই ছিল ভাল। অমন লক্ষ্মী প্রতিমার মত স্ত্রী সোনার চাঁদের মত ছেলেমেয়েদের সুখী করতে পারলাম না। বছর দশ পনের চাকরিটা ছিল। তারপর গেল। ক্রমশঃ আর একটা কানও খাট হয়ে আসছিল। কয়েকটা ওয়ার্নিংও পড়ল অফিসে। কাম শুনতে যান শুনি। উল্টা কাজ করে বসি। পুরানো সাহেব বদলি হয়ে নতুন ছোকরা সাহেব এল। সে কিন্তু মানল না। বললে—রিয়েটার করুন। কালা লোকের দ্বারা কাজ হবে না। বরাবরি করলাম কাকাকাটি করলাম। কিছুতেই কিছু হল না। আমার দুঃখ আর কেউ বুঝল না।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে গণেশবাবু চুপ করলেন। চোখের কোন এক ফাঁকে কখন সিক্ত হয়ে উঠেছে। সেটুকু কাপড়ের খুট দিয়ে মুছে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে রইলেন। গণেশবাবুর দুঃখ সকলকে স্পর্শ করেছে—বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল।

পরের একটি স্টেশনে গাড়ি থামতেই বৃদ্ধটি উঠে দাঁড়ালেন। গণেশবাবু বললেন এইখানেই নামবেন নাকি?

বৃদ্ধটি বেঞ্চের নিচে থেকে একটা বোঁচকা টেনে বের করতে ব্যস্ত। গণেশবাবু সাহায্য করলেন।

বৃদ্ধটি বোঁচকাটি ঘাড়ে তুললেন। এগোবার মুখে গণেশবাবু কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন। বৃদ্ধটি নমস্কারের ভঙ্গীতে একটা হাত মাথায় ঠেকিয়ে স্মিত হাসলেন। সেই হাতটিই আবার একবার নিজের কানে ও মুখে ঠেকিয়ে নাড়লেন দুবার—তারপর নিজের কপালে করাঘাত করে ধীরে সুস্থে এগিয়ে এলেন।

অন্যমনস্ক, মূক ঐ চিরদুঃখী বৃদ্ধটির দিকে গণেশবাবু বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন আর পাঁচজনের সঙ্গে।

• • • •

সৈন্যাধ্যক্ষ ধরে এনেছেন জন কুড়ি তরুণকে। তাদের মধ্যে কে জোসেফ্ ম্যাটসিনি সেটা জানতে চাইলেন তিনি।

কিন্তু কে যে ম্যাটসিনি তা ঠিক করতে না পেরে তিনি হুকুম দিলেন, সব কটাকে গুলি করে মার—"

একদল সৈন্য বন্দুক উঁচিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াল,—শুধু হুকুমের অপেক্ষা।

হঠাৎ দেখা গেল একজন তরুণ ছুটে সেখানে এলেন,—তীব্র কণ্ঠে বল্লেন, ম্যাটসিনি কে চান আপনি—আমিই সেই'—

এদের ছেড়ে দিন।

সৈন্যাধ্যক্ষ ভ্রূকুটি করলেন, তারপর বল্লেন—তবে তুমিই মরতে প্রস্তুত হও।

—হয়েছি জেনারেল,—বুক ফিরিয়ে দাঁড়াল তরুণ।

—বড্ড সাহসী যে তুমি ছোকরা,—তাহলে দেখছি তোমাকে আর মারা চলবেনা।

হেসে উঠল সৈন্যাধ্যক্ষ।

॥ তিস্‌তা তীর ॥

(বড় গল্প)

মিহির দাশগুপ্ত

হাঁটতে হাঁটতে একসময় থেমে পড়ে বুনি। পেছন ফিরে তাকায়। সিমেন্ট বাঁধানো বেদীটা ঝক ঝক করছে। একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

কিছুদূরে ত্রিপলের চালে জল আটকে ডোঙ্‌ হয়ে আছে। লোকগুলো এখানে সেখানে বসে বিড়ি ফুঁকছে। আজ সমস্ত রাত ওরা মণ্ডপ তৈরী করবে। আগামী কাল মন্ত্রী আসবেন উদ্বোধন করতে। একটি সুইচে হাত রাখবেন সঙ্গে সঙ্গে ঝল ঝল করে সঞ্জীবনী সুধার মত জলের তরঙ্গ কাটা খালগুলোতে ছড়িয়ে পড়বে। প্রাণ পাওয়া শিশুর মত খিলখিল করে উঠবে। খালের শুকনো আকণ্ঠ তৃষ্ণা মিটিয়ে তরঙ্গকে ঠেলে দেবে মাঠের দিকে। মাঠের বুক ভরে উঠবে পরিপূর্ণতায় তারপর—

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বুনি আবার তাকালো সিমেন্ট বাঁধানো জায়গাটার দিকে। মুঠো মুঠো মলিন আঁধার ছড়িয়ে পড়ছে, সাদা বালিতে তার স্পর্শ কেমন ঘোঁয়াটে শান্ত হয়ে আসছে চতুর্দিক।

সেদিনও সন্ধ্যা নামতো তিস্‌তার চরে। মানুষের কোলাহল ছিলনা কিন্তু কি যেন ছিল আর আজ কি যেন নেই—মনে হল বুনির। চোখদুটো চিক্‌ চিক্‌ করে উঠলো জলে। ঝাপসা চোখে তিস্‌তার দিকে তাকালো।—ঐতো লোক যাচ্ছে আসছে ওপারে জলপাইগুড়ি শহর আর এপারে ময়নাগুড়ি। মাঝে তিনমাইল রাস্তা, যেখানটা শুধু বালির চড় আর নদী তিস্‌তা।

পাগলা নদী, উচ্ছল নদী এখন স্তব্ধ। ভাটীয়ালির সুর চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নৌকার পাল আর হাওয়ায় ফুলে ওঠে না—লগিতে জলের বুকে শব্দ ওঠে না। বুকের ভেতর শূন্যতায় হাহাকার করে উঠলো।

ডাঙ্গা চর যেখানে কোনকালে কেউ আশা করেনি আবাদ হবে সেখানে তিস্‌তার বাঁধ দিয়ে জল আটকিয়ে বিস্তীর্ণ চরকে ফসি ভূমিতে পরিণত করা হচ্ছে, নদীর বুকে স্রোত হল পারাপারের জন্য। কিন্তু কেউ কি একবারও ভেবেছিল—ঐ যারা তিস্‌তার চরে বিলাসকে কাঁধে নিয়ে ঝোপড়া পাতার ঘর করে নৌকা নিয়ে জীবিকা সংস্থান করে, তাদের কথা, তারা কি করবে—কি খাবে! ওরা বড় গরীব। সমস্ত দিন পর যখন বুড়োটা চাঁক থেকে পয়সা গুলোকে বুনির আঁচলে ফেলে দিত তখন তার কান্না পেতো। একটা বোবা কান্নায় বুক ভারী হয়ে আসতো।

এক-দুই-তিন-সাড়ে ছয় আনা—

সাড়ে ছয় আনা!

নিমাই বুড়ো নিশ্বাস ফেলতো অদ্ভুত ভাবে। পুরোনো ময়লা কাপড়ের খুঁট দিয়ে কপাল মুখ রগড়ে নিতো! ভেঙে পড়া দেহটা আরো ভেঙে পড়তে চাইতো। শুয়ে পড়তো চটের ওপর।

ঝুমি মাটির হাঁড়িতে ভাত আর কিছু সেদ্ধ চড়িয়ে দিল। বুড়ো শুয়ে শুয়ে কি যেন ভাবছিল আর গামছা দিয়ে মশা উড়িয়ে দিচ্ছিল।

ভাবনাটা কিসের! অন্ধকারে ঝুমি বুঝবার চেষ্টা করল। ওর মা কবে মরে গিয়েছে, বুড়ো কি তার কথা ভাবে! ভাত খাওয়ার জন্ত বুড়োকে ডাকতে উঠে বসলো। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলো।

—আজি সাড়ে ছয় আনা।

—হুঁ

—এখুন হতি জমাবার লাগিবে। তুমি আলায়—

—কি?

উৎকর্ণ হয়ে প্রশ্ন করে ঝুমি। বুড়ো মাথাটা নিচু করে।

তিস্তায় আর নৌকা চইলবে না।

বুড়োর স্বরটা হাহাকারের মত শোনালো। ভীতিসূচক একটা অস্ফুট শব্দ বেরুলো ঝুমির মুখ থেকে। বুড়ো বলে কি? মাথা খারাপ নাকি!—নৌকা চলবে না কেনে? কি হইছে, পরমিটের লুটিশ নাকি—

নিমাই বলে—পুল হবে নদীতে—

না, না, অসম্ভব ঝুমি বলতে চায়। বলে—কি করে জাইনলে?

—আইজ দুপুরে আইছিল সব বাবুরা। জায়গা দেখলো, মাপ দিল, কি সব ইংরাজিতে বলাবলি করলো। আমি এক বাবুকে পুছলাম, বইললো,……যত বালির চর আছে তামামলাতে ফসল ফলিবে। মানুষির ঘর হবে। নদীর উপর পুল হবে—মানুষির দুর্দশা আর থাকিবে না।

ঝুমি বলে- মিথ্যা কথা। এইঠে হবে কসল। তোমাকে মিথ্যা কথা কইছে।

এর কিছুদিন পর সত্যিই বিস্মিত হ'ল ঝুমি। তিস্তা চরের অর্ধ উলঙ্গ মানুষগুলো হা করে দেখলো। বড় বড় ট্রাকে করে যন্ত্রপাতি আসছে ইট কাঠ পাথর, একটা নতুন রাজত্বের সূচনা।

রতন সকালেই জমিতে বেরিয়েছিলো তাই সে উপস্থিত হতে পারেনি তখনই, একটু পরেই এসে ওদের মধ্যে দাঁড়ালো।

পাঞ্জাবী ড্রাইভারগুলো চেঁচাচ্ছে, কুলিরা ছুটোছুটি করছে। রতন সাহস করে এগিয়ে গেলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখলো। একটা পাঞ্জাবী কি যেন বললো। দূরে দাঁড়িয়ে ঝুমি দেখলো চরের অন্য মানুষদের সঙ্গে। রতনের সাহস আছে বটে। ঐ যণ্ডামার্কা পাঞ্জাবীর সঙ্গে এভাবে হেসে কথা বলছে। রতন ফিরে এলে ঝুমি বলে,—তোর ভয় নাই?

—ভয়! কিসের ভয়? অত্যন্ত সুরে উচ্চারণ করে রতন।—মুইতো মেইরাছিলে না হই।

—কি হবে ঐঠে? বাপ যে বইললো, সব সত্যি নাকি—

রতন খুশী গলায় বলে,—ঝুমি, আমাদের দিন ফিরি যাবে। গত সন জলের অভাবে আবাদ কৃষি নষ্ট হয়্যা গেইল তারো আগের সন বইন্যায় সব ভাসে দিল, জল নামি গেলে জমিনা বালি হয়্যা গেইল, মনে নাই তোর—

—আছে তো, তার কি—?

—দুঃখ যাদের ঘুচি যাবে। তিস্তার বইছাকে মিসিন দিয়া আটকি দিবে তাদের ঐ জল আস্তে আস্তে লাস্ত জমিত নামা কাটি পহুছে দিবে। এই চরাত ধান হবে বুমি—

—ধান হবে না কচু হবে। খালি ফাঁকিবাজি—আমি কয়া দিলাম যদি হয় আমার নাম বদলি রাখিস।

রতন আর কিছু বলল না। এতোক্ষণ একটা রঙ্ দেখছিলো, কেমন ক্যাকাশে হয়ে গেল সে। প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হল না। কি জানি পাক্কাবী ড্রাইভারটা মিথ্যে কথা বললো কিনা। ওদের কথার ঠিক নেই, কার কাছে যেন শুনেছিল ওরা মদ খায়। নেশায় মাথা ঠিক থাকে না।

রোদ্দুর ভেতে উঠেছে। বালিতে আগুনের উত্তাপ। বুমি পা দিয়ে বালিতে গর্ত করে ফেললো। সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলো একরাশ বালি। রোদে চক্ চক্ করে উঠলো, ধুলো ছাড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।

কালো কালো কুলিগুলো চিৎকার করছে। বুমি নিজের মনে ভাবতে চেষ্টা করে, ওরা ভবে কেন এসেছে, কেন মিসিনগুলো এখানে নামাচ্ছে, কেন—ব্যাকুল ভাবে বলে রতনকে,

—আমরা কি করবো রতন?

—কি করবা, রতন বলে, কি?……

রতন সূর্যের দিকে তাকালো। হয়ত বেলা বাড়লো, তারপর বুমির চোখে চোখ রাখলো।

—কি বুলছিস?

—তুই বললি, পুল হবে নদীত্—

—হবেতো শুনলাম। তাস্ হবে, মানষিগিলা প্রাণে বাঁচিবে—তোর বাপের লগিতে আর জোর নাই। বর্ষার কালে নৌকা ইদিক-সিদিক হয়া যায়। সেইবার তো ডুবি গেইল—

বুমি কি যেন বলতে চাইলো কিন্তু আটকে গেল। সাড়ে ছয় আনা থেকেও বাঁচাতে হবে পয়সা। কিন্তু তাতে কয়দিন চলবে—বুড়োটার হাড়ে সত্যিই আর জোর নেই। আজ না হোক একবছর পরেতো আর মানুষ নৌকাতে যাবেনা যদি সত্যিই পুল হয়ে যায়। তখন কি হবে ওদের—একটা ভয়াবহ সম্ভাবনায় তার মুখের প্রতিটি রেখা কেঁপে উঠলো; কিছুনা বলে চলে যাচ্ছিলো বুমি। রতন হাত ধরে বলে,

—তুই বড্ড স্বার্থপর বুমি। কেন, তোদের কয়টা পেটের জন্তে এতোগুলা মানষির কথা ভুলি গেইলি। বালিতে সব খাল্ হয়া গেইল, মানুষি জলের অভাবে আবাদ করিবার পারছে না। না খাওয়া গরুগুলা পর্যন্ত মরি যাছে, এক এক গোছা ঘাসের অভাবে। তুইতো হামার ঘরে যাবি তুই কেনে ভাবিস্?

নিজেকে কেমন সঙ্কুচিত বোধ করে বুমি। একটা পাখি কোথায় ডেকে উঠলো হোগলা বনের ভেতর। সেদিকে তাকালো রতন।

—চল

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ এগিয়ে চললো। বালির রাস্তা একটু ঘুরেই হোগলা আর কাশ বন ছাড়ালেই যাত্রীদের যাতায়াতের পথ। বালির উপর হোগলার মোটা চ্যাপ্টা পাতা বিছানো,

যাতে মোটেরের চাকা বসে না যায়। ভাঙা ট্যাক্সিগুলো বিকট শব্দ করতে করতে যাত্রী নিয়ে এগুচ্ছে। দুমাইল পথ, ভাড়া এক টাকা। বাস থেকে বার্ণেশে নেমে যাত্রীরা এই ট্যাক্সি গুলোতে চড়ে নৌকা বাধা ঘাটে এসে পৌছয়।

কোন মডেলের এ ট্যাক্সি সে কথা আজ ওর মালিকও হয়তো বলতে পারবে না। ইঞ্জিনে অজস্র জোড়াতালি, অধিকাংশ সময়েই ঠেলে ষ্টার্ট দেওয়াতে হয়। বডি বলতে কিছু নেই, উনুক্ত, ছেঁড়া, ভাঙা স্প্রীং সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুতের সমারোহ।

অন্যদিন ঝুমি এসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। আজকে সে অন্য কথা ভাবছিলো যে কথা রতন বুঝতে চায়নি, চায়না। রতন কেন কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের ভাবনাকে এক করে ভাববার। নয়তো পরিষ্কটই বা কেন রাতারাতি উঠেপড়ে লাগলো।

আর একবারের কথা মনে হচ্ছে তার, তখন সে খুব ছোট। ওপাড়ের মওল ঘাটের হারাণ খবরটা দিয়েছিলো। তখনও এদেশে স্বাধীন সরকারের সোড়া পত্তন হয়নি। বৃটিশরা শাসন করছে ভারতকে।

শিলিগুড়ি থেকে সেতক ব্রীজ তৈরী হয়েছিলো তারো আগে। ওরকম ব্রীজ নাকি কোথাও নেই। দুই পাহাড়ের দুই কিনারায় ব্রীজের মাথা। মধ্যে কোন পিলার নেই। আর নিচে, অনেক নিচে তিস্তা নদী। বৃটিশরা ভেবেছিলো যদি ঐ ব্রীজ শত্রুপক্ষ কোন রকমে উড়িয়ে দেয় তবে আসাম এবং সমস্ত উত্তর বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এক আকাশ পথ ভিন্ন। তাই তারা একদিকটায় মন দিয়েছিলো এই বার্ণেশ ঘাটের একটু ওপাশে করলাঘাটে হবে বাধ। তার ওপর দিয়ে রাস্তা। ঐটুকু বয়সে হয়তো কিছু বুঝতে পারতো না ঝুমি তবু আনন্দ হয়েছিলো প্রচুর। হারাণকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলো.

—আরো বাইত্তা হবে না? ও হারাণ কাকা—

হারাণ ওর গাল টিপে বলেছিলো,

—তাইতো শুইনলাম।

বন্যা! একটা বিভিষিকা ঝুমির কাছে। তার আগের বছর উত্তর বাংলায় নদী তিস্তা ক্ষেপে উঠল মস্ত তাণ্ডবে।

রাত তখন কত হবে? অনেক কালো রাতের আঁধারে সাপের ফণার মত কিল বিল করে উঠেছিল নদী। যেন অসংখ্য সাপের মাথা হিস্ হিস্ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা কুটে কুটে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিলো।

এক সময় ওদের ঘরটা দুলে পড়েছিলো একপাশে। একবুক জল, কোথাও তারও বেশী—ঝুমিকে কাঁধে তুলে নিলো নিমাই। পেছন পেছন ওর মা বেরিয়ে এলো। কিছুক্ষণ জল ভেঙে ওরা এগুলো।

ডাঙা তখনও অনেকদূরে। ঝুমিদের নৌকাটার পাত্তা নেই। কখন স্রোতের টানে যে গাছে রশি বাঁধা থাকে সে গাছটা পড়ে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে নৌকাও উধাও হয়েছে।

একটা আর্তচিৎকারে নিমাই থমকে দাঁড়ালো। ঝুমির ভয়ার্ত বুকে আবার একবার ধক করে উঠলো। নিমাই স্ত্রীকে বলে,

—কি হইল্, চিল্লাও ক্যান্? যেন বিরক্তি ফুটে উঠলো তার মুখে।

—পায়ে কি একটা ফুটি গেইছে। বড় জ্বালা—

—ঐ তো ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে। একটু চোখা ভালে চইলবার চাষ্টা কর্। এখুন কোনমতে সহ্য করি যাও—

কিন্তু সহ্য করবে কে! সমস্ত শরীরে তখন তার বিষক্রীয়া শুরু হয়েছে। কেমন একটা কাঁপুনি অনুভব করে। তারপর একটা শব্দ হ'ল। নিমাই একটা অকথ্য ভাষায় গালি দিয়ে পেছন ফিরলো।

—মাসি বড় মাইনষের মাইয়্যা অইছে। হাঁটিলে পায়ে ব্যাথা লাগে।

একি! বিস্মিত হল নিমাই, কাকে সে গালি দিলো—কোথায়, কোথায় সে? নিমাই তুলে এনেছিলো নীল দেহটাকে। ওরা এলো, মন্ত্র পড়লো কিন্তু কিছু হল না।

গাদি গাদি লোহার শিক ফেলেছে কুলিরা। হাওয়ায় বালি উড়ছে। কুলিগুলোকে মরুদার কলের মানুষের মত দেখায়। আরেকটা ট্রাক থেকে সিমেন্ট বালি মেশাবার যন্ত্র নামানো হচ্ছে। পূর্বদিক ঘেঁসে সারি সারি ঘর তৈরী হচ্ছে অস্থায়ী, ওপরে টিন চারপাশে ত্রিপলের বেড়া। যারা কাজ করবে তারা থাকবে ওগুলোতে।

প্রত্যেকদিন একবার করে দেখে যাওয়া ঝুমির যেন নেশার মত হয়েছে। কিছুতেই ঠাট্টা করতে ছাড়াতো না।

ঘরের সামনা সামনি আসতেই থমকে দাঁড়ালো ঝুমি।

—এই……

—কি?……

—একটু সাহায্য করবি……

এতোক্ষণে নজরে পড়ে ঝুমির। সুন্দর ট্যাক্সিটার পেছনের চাকা অর্ধেকটা বালিতে ঢুকে গিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও ট্যাক্সি যাচ্ছেনা। ভদ্রলোকের কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। ভদ্রলোক অসহায় ভঙ্গীতে করুণ ভাবে বলে,

—আশ্চর্য, মেয়েটার একটু দুঃখও নেই।

—সন্দিগ্ধ বিস্ময়ের ভান করে ঝুমি, বলে,

—দুঃখ না থাইকবার কি দেখলে রাজু। বলনা কি হইলবি—

—ঐযে কুলিগুলো ওখানে কাজ করছে ওদের একজনকে গিয়ে বলবি যে ওভারসীয়ারের গাড়ী বালিতে আটকিয়ে গিয়েছে। ডেকে আনবি।

—ও বাবা, ওযে অনেকদূর। এতো রোদ্দুরে যাইবার পারিম না। তুই যা কেনে মুই তোর গাড়ী পাহারা দিম্।

—এই রোদে আমিই বা কি করে যাবো এতটা পথ হেঁটে। তোরা তো এখানকার মানুষ রোদে তোদের কি হবে।

—সে তো বুঝছি। কিন্তু এখানকার মালবিলার কথা আসত্ কেনে ভাবো নাই। রোষে রুশে পুড়িয়া মৌকা ব্যায় কোনমতে পেট চলে আমাদের তাতেও বাধা দিবার আইচ্ছ কেনে। বাঁধ না দিলে কি এমন ক্ষেতি হইত ?

ওভারসীয়ার হাসলো।

—তুই এসব বুঝবি না, কিসে ভালো আর কিসে মন্দ হয়। শোন, একটা টাকা দিচ্ছি ডেকে আন।

—না, পারিম না মুই।

বিরক্ত হল ওভারসীয়ার। মনে মনে মেয়েটার মুণ্ডচ্ছেদ করলো। এই গরম বালিতে বেশীক্ষণ থাকলে টিউব বার্স্ট করবে নির্ঘাৎ। ট্যাক্সি থেকে নেমে চারদিক তাকিয়ে দেখলো। এখান থেকে ডাকলে কুলিরা শুনতে পাবে না। গিয়ে ডেকে এনে যাওয়া সে অনেকক্ষণের ব্যাপার। এদিকটা দেখতে এসে কি ঝিক্কিনাই না হল। সুধীর আসতে চেয়েছিলো, নিয়ে এলেই হত।

ওভারসীয়ারের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বুনি বলে,

—কেমন মজা।

—বেয়াদপ। দাঁতে দাঁতে চেপে উচ্চারণ করে ওভারসীয়ার।

—সত্যি বলতো, বইস্তা আর হবেনা ?··· ··

—আচ্ছা পাগলী তো! নয়তো কি এসব এমনি এমনি হচ্ছে—শোন্ তোদের কোন দুঃখ থাকবে না।

বুনি খিল খিল করে হেসে উঠলো। ওভারসীয়ারটা কি বোকা পেয়েছে তাকে। ভাল ভাল কথা বলে তার মন গলাচ্ছে।

—নে বাবু গাড়ীতে ওঠ—

—তারপর···

—মুই ঠেলিম।

—তুই একা পারবি না। আয় দুজনে দুদিক থেকে ধাক্কা মারি—

কিছুদূর ঠেলবার পর ওভারসীয়ার বলে,

—গাঁড়া আর দরকার নেই।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। বুনির আঁচলটা দরজার ফাঁকে আটকিয়ে গেলো। ওভারসীয়ার তা দেখেনি। গাড়ী স্টার্ট দিয়ে বলে,

—চলিয়ে, বড্ড উপকার করলি।

বালিকোটে ট্যাক্সি এগুলো। ফুটবোর্ডের ওপর বুনি উঠে পড়েছে। তাকিয়ে দেখলো ওভারসীয়ার।

—ভেতরে এসে বসবি ?

—না, থামা।

—তাহ'লে চড়লি কেন।

—তোর চোখ নাই, চড়লাম কি সাধ করিয়া—

ব্রেকে পা রেখে ওভারসীয়ার বলে,

—সত্যি তোদের একটু দুঃখ নাই। আবার এই রোদ মাথায় করে পৌঁছে দিতে হবে? কেন আগে বললি না যে আঁচলটা আটকে গিয়েছে। দরজা খুলে আবার বলে,

আয়, ভেতরে বোস।

—না, ঝুমি বলে।

পরে আমাকেই দুষবি। নে নে তাড়াতাড়ি ঢুকে পর।

—দুই হাটি যাবার পারবো।

—যা তাহলে, পরে যেন বলিস না যে বাবুটা বড্ড স্বার্থপর—শুধু নিজেরটাই বোঝে—দেরী করলো না ওভারসীয়ার, মুখ ঘুরিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিলো। ঝুমি-ঘাড়ীর পথ ধরে।

জানালার বাতায় গাল চেপে দাঁড়িয়ে ঝুমি তাকিয়েছিলো রাস্তাটির দিকে। রাস্তা বলতে বালির পথ, যেটা দূরে হোগলা ক্ষেতের আঁড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এপাশে নদী, কল-কল ছল-ছল শব্দ সবসময়ই বাজছে। দূর থেকে মধ্যে মধ্যে ভেসে আসছিলো যাত্রীদের কোলাহল, মাঝির শেষ খেওয়ার চিৎকার আর সেই অদ্ভুত ট্যাক্সিগুলোর বিকট শব্দ।

সন্ধ্যা এখনও ভাল করে হয়নি। তিস্তা চরে অস্পষ্টতা নামছে একটু একটু করে। হোগলা ক্ষেতে আঁধার জমাট বাঁধবার সুযোগ খুঁজছে। আর ওরই আনাচে কানাচে প্রতিক্ষায় রয়েছে জোনাকির ঝাঁক।

ঘরের ভেতর অন্ধকার নেমেছে। অন্ধকারে মিশে গিয়েছে ঝুমি, ভূতের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

রতন আসছে কিন্তু বড় চুপচাপ। রোজ আসে ভাটীয়ালির সুর মুখে নিয়ে।

ঝুমি বেরিয়ে এসে বলে, গান নাই ক্যান?

আবছা অন্ধকারে ঝুমির দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখবার চেষ্টা করলো রতন।

সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপে মেশানো নিষ্ঠুর হাসি হাসলো সে।

ঝুমি উৎসুক হয়ে। কি, কথা কওনা ক্যান?

—তোর কথা বইলবার মানুষির অভাব নাকি! মোটর-আলা মানষিটা ভাল্ ভাল্ কথা শোনায় তোরে। আমার কথায় কি দরকার—

ভুরু কুঁচকে ঝুমি বলে, স্যাখ রতন বাজে কথা কইবি না।

—সত্যি কথাটা বাজে হয়্যা গেইল!

—কিসের সত্যি কথা?

—ক্যানে, তুই ঐ বাবুটার সঙ্গে গাড়ীতে চড়িস নাই? চলাচলি করিস নাই?...ঐ একটা নয়া মতন লোক হামাক গিয়া কয়্যা আসিল্। উ নিজের চোখে দেইখছে, উটা মিথ্যা কথা হইল্?

এই সময় ওভারসীয়ার এসে পড়াতে ঝুমি কোন কথা বললো না। এবার আর গাড়ীতে আসেনি সে, পায়ে হেঁটে এসেছে। রতনের দিকে তাকিয়ে বলে,

—তোর নাম কি?

—রতন রায়।

—কি করিস মৌজা চালাস নাকি ?

—কৃষিকাজ করি, ঐ হদিক আমার জমি।

—চাকরি করবি ? ভাল মাইনে পাবি, তাছাড়া এখনতো কৃষিকাজ নেই।

রতন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। মনে মনে খুসী না হয়ে সে পারলো না। এখানে যাঁদের কাজ সে করবে, যে বাঁধে এখানকার মরনাগুড়ি-মাধবডাঙ্গা, বাগড়াবাড়ী সব জায়গায় জমিতে সেচ হবে। অন্ততঃ খুমির কাছে তার সম্মান বেড়ে যাবে।

—হ্যাঁ করবো বাবু। কতটাকা দিবি ?

—রোজ একটাকা চার আনা করে পাবি। আর কিছু লোক জোগাড় করে দে। এই শীতের মধ্যে মোটামুটি কাজ শেষ করে ফেলতে হবে নয়তো বর্ষার অসুবিধা হবে।

রতন বলে, আচ্ছা কালি বলিম সর্দারইকে—

খুমির দিকে একবার তাকিয়ে নিজের তাবুর দিকে ফিরে চলে ওভারসীয়ার।

রতন চেঁচিয়ে বলে, একটু সাবধানে যাবি বাবু, শীতকালে কেউ ডাকে ডাবনীক্ষেতে। বালিতে ভুতো ডেবে যায়। পায়ে জোর রাখতে হয়। ক্রমেই রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শীতল হয়ে আসছে বালি।

কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একমনে হাঁটছিলো ওভারসীয়ার। কি বিচিত্র ওদের জীবন। একটা প্রবাদ আছে—নদীর ধারে বাস, তাবনা যারো মাস। নদীর ধারে তো নয়ই বোধহয় একটু জল বাড়লেই ঘরের চৌকাঠ ছুঁয়ে যায় এমন স্থানে ঘর। তবু ওরা সুখী, খুসী। চরকে আঁকড়ে জলে পা দিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে ওভারসীয়ার কেমন বিমনা হয়ে পড়ে।

দুই নম্বর তাবু রঞ্জন ঘোষের। অন্যান্য ওভারসীয়াররা ওপাশের তাবুতে। এখনও সবঘর কমপ্লিট হয়নি তবে কয়েকদিনের মধ্যে হয়ে যাবে।

—সেলাম সাব।

—বাচ্চা সিং—

—জী হুজুর—

—আজ সিমেন্ট কতটুকু এলো।

—কন্ট্রাকটর বাবু বলেছিলেন পাঁচটন।

—শোন, আমি বলে এসেছি আরো কিছু লোকের জন্য। হয়ত কালপরশুই কিছু এসে পড়বে। একটু দেখিয়ে শুনিয়ে নেবে।

—স্যার ··

—কি ?

—মাঝি মাল্লা দিয়ে কি এসব কাজ হবে। তার চেয়ে—

—তর্ক করনা বাচ্চাসিং। যা বললাম তাই হবে।

বাচ্চাসিং আর কথা বলতে সাহসী হল না। মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো! যত নষ্টের গোড়া ঐ মেয়েটি। ওটাই ভজিয়েছে সাহিবকে। দুপুর বেলার ব্যাপারটা বাচ্চার নজরে পড়েছিল—ঐ মেয়েটার সঙ্গে চলাচলি সাহেবের সব কথা বলে এসেছিলো একমাইল হেঁটে রতনের

কাছে। রতনকে উত্তেজিত করতে যতটুকু দরকার বাচ্চা তার কসুর করেনি। মেয়েটার চোখের ঝিলিক বাচ্চাকে প্রথম দিনই বিভ্রান্ত করেছিলো কিন্তু পাশের ঐ উদ্ভা বুকঅলা মানুষটা ওর রক্ষক এটা বুদ্ধিমান বাচ্চা টের পেয়েছিলো বলেই কিছু একটা করে বসেনি।

রজবোস বলে, কাল ট্রেন আসবে দুটো, সব লোক মণ্ডলঘাটে চলে যায়না যেন। কয়েক জনকে এখানে উপস্থিত রাখবে।

বাচ্চাসিং ভেবেছিলো, ওর দেশের লোক এনে সব কাজগুলো করাবে। এতে দুটো কাজ হবে। এক, দেশের আত্মীয়স্বজন চাকরি পাবে আর দ্বিতীয়ত, প্রতি কুলির মাইনে থেকে মোটা রকমের টাকা সে মারতে পারবে। তার আশায় ছাই দিলো ঐ মেয়েটা। সব দোষ যেন বুমির, এমন একটা মতবাদ ওর মনকে সর্বক্ষণ বিষিয়ে রাখলো।

বুমির আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করছিলো রতন। বিমনা হয়ে পড়েছে বুমি। একাগ্র দৃষ্টিতে আরো কিছুক্ষণ রতন তাকিয়ে রইলো ওর মুখের দিকে।

বুমি, বুম বুমি…

হাসলো বুমি, রতনের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বলে,

—ওভারসীয়ারটা বড্ড খারাপ।

—নারে না, আসলে বড্ড ভালমানুষ!

—এই ভাখ, কোচড় থেকে আঁচল খুলে মেলে ধরে রতনের চোখের সামনে,

—বাবুটা ছিঁড়ি দিছে…

—টাকা পাইলে দুই একটা লাল রঙের শাড়ী কিনে দিব। যার ছিঁড়িছে উয়ারটেই উসুল করিব।

নিমাই ওপারের খেয়া দিয়ে এসেছে। এতোক্ষণে অন্ধকার ঢেকে ফেলেছে বার্ণেশ ঘাটকে। অনেকদূরে জলপাইগুড়ি শহরের ইলেকট্রিক বাতিগুলো তিস্তার জলে কাঁপছে। ঠিক তারই ওপরে একরাশ ধোঁয়া জমাট বেঁধে আছে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ছেনা। রাত বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা বাড়বে আর কিছু দেখা যাবে না পরদিন বেলা আটটা পর্যন্ত।

—রতন নাকিরে?

নিমাই নিস্তেজের মত মেঝেতে চটের ওপর গড়িয়ে পড়লো। বাঁশের খুঁটিটায় হেলান দিয়ে রতন একপাশে বসে পড়ে।

ক্ষীণকণ্ঠে নিমাই বলে, ঐযে বাঁধ নাকি, কতখানি তৈয়ার হইল? আর কদ্দিন লাগিবে?

রতন বলে, ওভারসীয়ার কইল, এই শীতে ভাব করিবার লাইগবে। বর্ষা আসি গিলে আর হবারে লয়।

—মোকা যাই আরে তাকায় থাকি ঐ বড় থামটার দিকে, ডর লাগে দেখিয়া। আক্কসের মত চরটাকে যেন গিলিবার চায়। হামাকগিলাকে গিলি ফেলাবে উয়ায়।…

—না কাকা তোমার মনের ঠিক নাই।

—রতন, কি করিম মুই, কোটে যাইব। আমাকে অভিশাপ লাগিছে—সব না খায়া মরিম।

এলায় একবেলা পেটপুরিয়া খাবার জোটেনা, হামার তিস্তা বুড়িনা দুঃখ বুঝিল্ না। চোখপুরুষের কাজের ইখানেই ভাব হয়া যাইবে।

নিঃশব্দে বিদায় নিল রতন। ভাত খেয়ে ঝিমিয়ে পড়লো নিমাই। রাত বাড়লো একটু একটু করে। নদীর ধার ঘেঁসে কয়েকটা কুকুর চিৎকার করলো। বেড়ার ফুটো দিয়ে লাল আলো হুমড়ি খেয়ে পড়লো বার বার। জানালায় এসে দাঁড়ালো বুমি। উত্তর দিকে ভবানীক্ষেতে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। মোটা চালটা পাতাগুলো তাপে কাটছে পট পট শব্দে। সাদা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। মানুষের চিৎকার কোলাহল সমস্ত চরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

তাঁবুর লোকগুলো বেরিয়ে পড়েছে তাবু থেকে। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশের বুকে কাঁপছে। টর্চ আর লণ্ঠন নিয়ে ওরা এগুচ্ছে ব্যাপারটা জানবার উদ্দেশ্যে। ওদিকে যেতে হলে বুমিদের বাড়ি পেরিয়ে যেতে হয়। বাইরে বেরিয়ে এসে বুমি বলে.

—তোমরা কোটে যাছো, আগুন দেখিয়া ভয় পাইছো নাকি? চরে বাঘ আইছে, আগুন দেখিয়া পালে যাইবে। তাই ভাবনীক্ষেতে আগুন লাগাইছে।

অনেকগুলো কুলি সঙ্গে বাচ্চাসিং এসেছিলো। ওরা ফিরে গেল আবার। বুমি ঘরে এসে শুয়ে পড়লো কাঁথা গায়ে দিয়ে দিয়ে। চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলো কিন্তু ঘুম আসছেনা। একটা ভয়াবহ সম্ভাবনা কেবলই থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে তার মনে। সত্যিইতো, তাদের ভবিষ্যৎ কোথায়? কোন অতলে কেউ বলতে পারে না।

পাশ ফিরে শুলো নিমাই। ওর নাকের শব্দ হচ্ছে। ঘুড়োটার জন্ত খুব কষ্ট হয় বুমির, কি পরিশ্রমই তাকে করতে হয় সমস্ত দিন, তবু যদি পেট পুরে খেতে দিতে পারতো সে। আজকাল আরো কম রোজগার হচ্ছে তার। যাত্রীদের যাতায়াত হয়তো কমে গিয়েছে। বালিতে কার পায়ের শব্দ হল। বুমি উৎকর্ণ হয়ে শুয়ে রইলো।

ওদিকে আগুন নিভে এসেছে। আবার অন্ধকার নিবিড় হয়েছে। ধস্ ধস্ শব্দটা ঘরের সামনে এসে থামলো।

—এই আগা আছিস····· ফিস ফিস করে বলে বাইরের মানুষটা।

—লোকটা আর কেউ নয়-বাচ্চাসিং। কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলো বুমি। ওর সমস্ত চেতনায় আগুন জ্বলে উঠলো। এই লোকটাই তার নামে রতনের কাছে বলে এসেছিলো। এতোরাত্রে কি চায় ও! প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো, বুকের ভেতরের ওঠানামাটা স্পষ্ট অনুভব করলো সে।

—বুমি দরজাটা খোল্ না····· লোকটা উসখুস করলো।

দরজা খুলে হাতদুটো পেছনে রেখে বুমি বাচ্চার মুখের দিকে তাকালো। এসো—। ঘর থেকে কিছুটা দূরে ও দাঁড়িয়ে পড়লো। —এতো রাত্রে কেনে আইচিস?

—বাচ্চার চোখে কুৎসিত একটা আবেদন ফুটে বেরুলো।

—কেন এসেছি বুঝিস না? রতনের কাছে শুনেছিলাম বাঘ হলে তোদের খাওয়ার সন্ধান শেষ হয়ে যাবে। এই নে, বাঘ টাকা পাঁচটা—আরো দোবো—চোখ দুটো জ্বল করে জ্বলে উঠলো বুমির। বিদ্যুৎবেগে পেছনের হাতটা বাচ্চার কাঁধে নেমে এলো। আর্তনাদ করে উঠলো বাচ্চাসিং। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করলো বাচ্চা—উঃ ····

কাটারীটা হাতে চেপে ধরে ঝুমি বলে, যা আর কোনদিন আসবি না। আমাদের চিনিস না—

সেই রাতের মত বাচ্চাসিং চলে গেল। বিশেষে ভুল হয়েছিলো তার, চরের কেউটেগুলোকে এতো তাড়াতাড়ি চট করে বশমানানো যাবেনা। বাচ্চ'র অভিজ্ঞতা ছিলো এসব ব্যাপারে তবু কেন জানি হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলো। অতীতে যদিও মেয়েমানুষের সঙ্গে উত্তপ্ত রাত্রি যাপন সে করেছে কিন্তু আজ ব্যর্থতা নিয়ে তাকে ফিরতে হল। এরকম তেজ ছোটলোক মেয়েদের প্রথম প্রথম থাকেই পরে কোথায় উবে যাবে।

পরদিন খুব ভোরে উঠে ঝুমি দোমহানির ভেতর দিয়ে যে সংক্ষিপ্ত পথটা অনেক এঁকে বেঁকে জলপেশ মন্দিরের দিকে গিয়েছে সেইদিকে রওনা দিলে পায়ে হেঁটে।

জলপেশ মন্দির কুচবিহার মহারাজদের। এর সম্বন্ধে কত কি প্রবাদ শোনা যায়। এখানকার মহাদেব স্বয়ং জাগ্রত। তাই উত্তর বাংলার মানুষ তাদের অভিলাষ জানাতে ছুটে আসে বাবা ভোলানাথের কাছে।

—ছোট একটা পাহাড়ী নদী পার হয়ে আধ মাইলটেক কাঁচা পাকা হাঁটা রাস্তা। দুপাশে ফুলের ছোট ছোট ঝোপ। তাতে অসংখ্য ফুলে পাখীর বাসা।

মন্দিরের দক্ষিণ পাশে একটি পুকুর চারপাশে নারকোল আর ইউক্যালিপটাস গাছ। বাঁধানো ঘাট। এ পাশে কর্পুর লিচু হিং দারুচিনি লবঙ্গ এলাচ প্রভৃতি রকমারি গাছের মেলা। ঢোকবার আগে ডাইনে আশোক গাছ, গোড়া সিমেন্টে বাঁধানো। অপূর্ব ছায়া সৃষ্টি করেছে। বিরাট স্থান নিয়ে মন্দিরের চারপাশ বাঁধানো।

সিঁড়ি অনেক নিচে ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে। যত নিচে নামতে লাগলো তত ঠাণ্ডা অনুভব করলো। সিঁড়িগুলো স্যাঁতসেতে, হয়তো বাঁধানো না থাকলে জল উঠতো পাতাল থেকে।

অন্ধকার শেষে এবার একটু আলো দেখতে পেলো ঝুমি। সমতল জায়গায় এসে গিয়েছে এবার, এখানে হাত দিয়ে একটা বড় গর্তের মধ্যে মহাদেবকে স্পর্শ করতে হয়। বেশ কিছুটা স্থান সোপকৃতি করে বাঁধানো, জল চুয়ে চুয়ে প্রায় কাদা হয়ে উঠেছে। ওপরের পৃথিবী কত ওপরে এখান থেকে তা ঠাহর করা যায় না। মন্দিরের মাথা অনেক উঁচুতে, ওপরটা কাচ দেওয়া তাইতেই একটু একটু আলো আসছে এই পাতালপুরীতে।

—বাবা..... আস্তে আস্তে বলে ঝুমি। কিন্তু সেই ছোট অস্পষ্ট কথাটা বহু প্রতিঘাতে প্রতিধ্বনিত হল পাথরে পাথরে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার রেশ গম গম করলো মন্দিরে।

—কি বলতে চায় সে জলপতিভার কাছে?

ঝুমি মনে মনে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করে বার বার। মনে হল নিমাইয়ের কথা, শরীর নিওড়ানো সামান্য পয়সা তাও অনিশ্চিত, অসহায় কুমার গ্রন্থি ধীরে ধীরে খুলবে, বিস্তার করবে, বেষ্টন করবে নিমাইকে, তাকে এবং আরো যারা জলে নৌকা ভাসিয়ে ঝাঁঝিকার্জন করে তাদের সবাইকে। বাবা বিশ্বনাথ দয়া করো আমাদের—মনে মনে কথাগুলো আওড়ালো ঝুমি।

কিন্তু যতন ওস্তারসীতারবাবু সরবমিশ্রের উজ্জ্বল আশা, ঘরে ফলবে সোনা, বাসিতে আসবে স্বচ্ছ পরিতৃপ্তির উল্লাস, এসব কি সব মিথ্যে হবে? মিথ্যেই যদি সব হবে তবে কেন ওরা আজ

পাতলো, কেন এতো ঘরপাতি লোক সম্বল ..... কেন এতো সম্ভাবনার কথা—বুমির সমস্ত চেতনায় একটা ঝড় বয়ে গেলো। কি বলতে এসেছিলো সে আগ্রত দেবতার কাছে, কেন এসেছিলো এখানে, যেন খুঁজে পাচ্ছেনা এর মানে, এর সদুত্তর।

মন্দিরের দেওয়াল গলে গলে জল গড়িয়ে পড়ছে। বুমি চিত্‌কার করে বলতে চাইলো আমি কি ভুল করছি ঠাকুর।

অনেক বেলায় বুমি ফিরে এলো বার্গেশে। এখান থেকে চরের শুরু। দু মাইল গেলে তিস্তা নদী। এখনই ঝড় উঠবে তা বুঝতে পারলো সে। এখানকার বালির ঝড়, দুপুরে মধ্যে মধ্যে বালি যখন খুব তেতে ওঠে তখন হয়। আকাশের মধ্যস্থলে সূর্য প্রচণ্ড উত্তাপে জ্বলছে। বালিতে রূপোলি রং ঝক্ ঝক্ করছে। বুমি যখন কিছুটা এগিয়েছে তখন হঠাৎ নজরে পড়লো ওভারসীয়ার বাবু টুপি মাথায় কোথায় চলেছেন। ওভারসীয়ারের চোখে সান গগলস্।

—ফিরে কোথায় গিয়েছিলি, তোর রতন তো কাজে মন দিয়েছে।

ওভারসীয়ার দাঁড়ালো। অল্প হেসে বুমি মুখটা নিচু করলো।

—কোটে যাছিস বাবু—যাইস না, ঝলিতে ঝড় উঠবে এলায়। তাড়াতাড়ি ফিরি যা।

—ঝড়, মানে হু..... কিন্তু, আমার যে কাজ আছে।

—মোর কথাটা পাছৎ বুঝিবার পাইরবে, বেলা—

—কি বলছিস তুই—

—ঐ স্যাখ, দৌড়া... দৌড়া...। বুমি ওভারসীয়ারের হাত ধরে টান দিলো।

আকাশের উত্তর দিকে সাদা বালিতে সূর্য ঢাকা পড়েছে। শোঁ শোঁ শব্দে বালির সূক্ষ্ম কণাগুলো সূঁচের মত গায়ে এসে বিঁধতে লাগলো। ওভারসীয়ারের টুপি কোথায় পড়ে গেলো। পা বালিতে বসে যাচ্ছে, দৌড়ানো প্রায় অসম্ভব তবু ছুটছে দুজনে...। চোখ বন্ধ করে কানা-মাছি খেলবার মতো ছুট, কিন্তু তৎক্ষণে সামনে থেকেও শুরু হল ঝড়। ঘুরি উঠলো, আকাশের শেষ মাথায় বালির স্তম্ভ ক্ষণিকের জন্য রচিত হল, পর পর এক এক স্থানে। স্থানে স্থানে গর্ত হয়ে গিয়েছে। সেরকম একটা গর্তে ওভারসীয়ার হুমড়ি খেয়ে পড়লো। বুমি কাজের কাছে মুখ এনে বলে,

—আর উঠিস না। দৌড়ায়া পৌঁছিবার পারিবি ত না। ঝড়টা কমুক, মাথা নিচু করি গর্তের ভিতর শুইয়া পড় কেনে।

দ্বিতীয় শব্দের কোন উত্তর পাওয়া গেলা না। ওভারসীয়ারের চোখ বন্ধ সর্বশরীর বালিতে আচ্ছন্ন। চোখের কোলে বালি। ওভারসীয়ারটা কথা বলে না কেনে?

এই বাবু...এই...

এরকম সঙ্কটের জন্য বুমি প্রস্তুত ছিলো না, কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লো সে। অনেক পরে ওভারসীয়ার বলে জল খাবো।

বুমি বলে, এইঠে কোটে পাইম, আর জল খাইলে বাঁচিবু না। অসুখটা বাড়ি যাবে। এইটু সইয়া করেক এলায় ঝড় কমি যাবে—

ঘুমির কোলে মাথা রেখে ওস্তারনীয়ার আবার চোখ বন্ধ করে। ঝড় তখন কমের দিকে। ওস্তারনীয়ার ব্যাকুলভাবে আবার বলে তার জন্যেই বেঁচে গেলাম ঘুমি।

কেমন বিমনা হয়ে পড়েছে ঘুমি। আসলে এই লোকটাকে বাঁচাবার কি এমন দায় পড়েছিলো তার, মরলেই বা কি ক্ষতি হত। হয়তো ভালোই হত, বাঁধের কাজ আরো কিছুদিনের জন্য পেছিয়ে যেতে পারতো, তিস্তা চরের মানুষরা আরো কিছুদিন দুশ্চিন্তার থেকে রেহাই পেতো।—কি যা তা ভাবছে ঘুমি, ছি ছি নিজেকে নিজে মনে মনে ধিক্কার দিলো।

—তরমুজ আনি দিম্, পিপাসা মিটি যাবে।

—এখানে কোথায় পাবি?

—এইঠে চুপচাপ শুইয়া থাক, উঠিবার চেষ্টা করিস না—

ঝড় কমে গেলেও রোদের তেজ কমেনি, অনন্ত কয়লার মত তেজ বালিতে।

বাকালি এখান থেকে বেশীদূর নয়। শুকনো বালিতে তরমুজের চাষ করে পশ্চিমারা। এখান থেকে শহরে চালান দেয় মাথায় ঝাঁকা বেঁধে। গরুর গাড়ীর চাকা এই বালিতে এগুয় না। তাই গরুরগাড়ীর ব্যবহার এখানে নেই।

ক্ষেতের মধ্যখানে মাচা বেঁধে পশ্চিমারা পাহারা দেয়। মানুষের জন্যই এই সতর্কতা না—শেয়াল সজারু প্রভৃতি প্রাণীরা মাঝেমধ্যে রাতের অন্ধকারে তরমুজের মধুর শীতল রসের ওপর আক্রমণ চালায়।

ঘুমিকে দেখে খিঁচিয়ে ওঠে হিন্দুস্থানীটা!

—এই শ্যাড়েকি, ক্যা মাংতা?

ঘুমির আবেদনে গলবার লোক ওরা নয়। ব্যবসা করতে বসে দান খয়রাত করতে তারা রাজী নয়। তারপর একটু আগে যে বালির ঝড় হয়ে গেল তাতে প্রায় অধিকাংশ তরমুজ লতাগুলো ঢেকে গিয়েছে বালিতে। একটু একটু ডগাগুলো দেখা যায়। এখন ফের বালি সরিয়ে দিতে হবে—তাই আগেই হিন্দুস্থানীটা মনে মনে রেগে ছিলো। ঘুমি বলে, বিকালে পয়সা দিয়া দিম, একটা দে—দেনা·····

হিন্দুস্থানীটা বলে, না।

দে একটা, বিশ্বাস না হয় যখুন নৌকায় মাল পার করিবু তখুন দামটা কাটি দিম।

কি ভাবলো লোকটা। হয়তো হিসাব করে নিলো মনে।

তরমুজটা হাতে পেয়ে ছুটে চললো ঘুমি; ওস্তারনীয়ারটার গলা বুক সব শুকিয়ে গিয়েছে। গর্তটার সামনা সামনি আসতেই ঘুমি দেখলো বাচ্চা সিং দাঁড়িয়ে। ওস্তারনীয়ার ঘোলা দৃষ্টিতে তাকালো ঘুমির দিকে। বাচ্চা কোন কথা বললো না।

—যা ঘুমি, তোর বাবার নাকি জ্ঞান নেই। তুই যা, আমি বাচ্চার সঙ্গে যেতে পারবো। বললো ওস্তারনীয়ার।

ঘুমি আর অপেক্ষা করলো না। অজানা আশঙ্কায় তার বুকটা কেঁপে উঠলো। এক্সরকম দৌড়েই চললো সে।

বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটা জংলা গাছের নিচে নিমাই পড়ে রয়েছে। সর্বাঙ্গ বালিতে

আজ্ঞন্ন! কাপড় আর মাথার চুলগুলো নজরে পড়ে বালির ওপরে। বালির নিচে দম বন্ধ হয়েই হয়তো মরে গিয়েছে।

ঝড় আসবার আগেই নিমাই ছুটেছিলো ঐ গাছটাকে লক্ষ্য করে। ওর জানা আছে বালির ঝড়ে চরের ঠিক ঠিকানা হারিয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। এখানকার বালি নিমেষে উড়ে অন্য স্থানে ঢিবি তৈরী করে। আর তাইতেই তার মন করে জমানো রক্তের কণাগুলো যা বুমিকে ফাঁকি দিয়ে আধপেটা খেয়ে সে একটু একটু করে জমাচ্ছিলো বালির নিচে একটা টিনের কৌটাতে সেটায় কি দিশা রাখতে পারবে নিমাই। বিপদ নিয়েও তাই তাকে ছুটতে হয়েছিলো অপুষ্ট জীর্ণ শরীরটা নিয়ে। বালির নিচে নিমাই ভবিষ্যৎ রচনা করছিলো প্রতিদিনের সামান্য আয় থেকে। ছুটেছিলো, সে আপ্রাণ চেষ্টায়, দূরে ঝড়ের ইশারা বেজেছিলো, তারপর শুকনো হাওয়ায় চর দুলে উঠলো, বাতাস চিক্ চিক্ করলো বালিতে। নিতাই কৌটাটা তুলেছিলো কিন্তু আর উঠতে পারেনি, একটা এলোমেলো একরাশ বালি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো সেই মুহূর্তে। বুমিকে ডাকবার একবার ব্যর্থ চেষ্টায় তার শুকনো ঠোঁট বালির নিচে কেঁপে উঠেছিলো। কিন্তু সে ডাক কারু কানে পৌঁছয়নি। তারপর বলিতে বুক রেখে গড়িয়ে পড়েছিলো সে, নাকের ফুটোতে কানে মুখে, হাওয়াতে বালি ঢুকে গেলো। নিমাই আর উঠলো না। আর একটু বেশী বালি উড়লে ওকে আর দেখা যেতো না, খুঁজে হয়রাণ হত বুমি, ভাবতো বুড়ো গেল কোথায় নৌকা পাড়ে বাঁধা, জলেও ডোবেনি—কোথায় গেল!… …

বুমি ততক্ষণে এসে পড়েছে। তার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠলো—

বাপ নাই…বাবা…বা…

রতন বলে, কাঁদিস না বুমি…

ব্যাকুলভাবে কান্না জড়ানো গলায় বুমি বলে, রতন, আমার বাবা কি মরি গেইল।

রতন কি উত্তর দেবে? সেও ঠিক এর জন্য প্রস্তুত ছিলো না। নিমাইটা বুড়ো হয়েছিলো নৌকা বাইতে হাতের কব্জি কাঁপতো থর থর করে, শিরাগুলো দপ দপ করতো ঠেলে উঁচু হত তবু ওরই মধ্যে পয়সা জমাচ্ছিল। তিস্তায় ব্রীজ হলে খেতে হবে ওদের কেউ খেতে দেবে না—দু'টাকা তিন আনা জমিয়েছিলো সে কত জমাতে পারতো, সে টাকাতে ওর শেষ বয়সটা চলে যেতো? কেন, রতন কি বলেনি যে তার চাষ ভাল হলেই সে ওদের নিয়ে যাবে নিজের বাড়িতে যে কয়দিন বুড়োটা বেঁচে থাকে থাকবে সেখানে। কিন্তু নিমাই তা বুঝতে চায়নি, হয়তো আশা করেছিলো এমনি করেই জমিয়ে কেটে যাবে তার ভবিষ্যতের কয় দিনগুলো। হায় দুরাশা!…

আশ্চর্য্যলোক এই রতন বোস। কেন আর কেউ শুশ্রূষাকারী নেই, কি এমন সাংঘাতিক কাজ যার জন্য নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শুধুই কি দুচারটি ছেলেমেয়ে আছে যে অসুবিধে হবে। নিজের মনেই গজ গজ করে শুধু। এ্যাদ্দিন পর একটা চিঠি দিয়েছেন কৃতার্থ করেছেন আমি যেন মানুষ নই। উঃ একা একা দিনগুলো কাটতেই চায় না। হোকনা কোলকাতা খামটা ছিঁড়ে ফেললো সে—

কেমন আছো তুমি, তোমাকে না দেখে মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায় সে কথা

তোমায় কি করে বোঝাবো! আমার কাছ থেকে তুমি চারশো মাইল দূরে রয়েছো। তুমি আছো কোলকাতায়, রাতে আলোর মালা জ্বলে সেখানে, ট্রাম বাস, ট্যাক্সি মাতুষের হট্টগোল আর আরো শুক্লা, তোমার হয়তো কষ্ট হবে এখানে এসে, কিছু নেই এখানে শুধু বালি ছাড়া। সমস্ত চরটা শুধু বালির রাজত্ব অনেকদূরে পাহাড়। তুমি হয়তো ভাবছো পাহাড় যখন আছে তখন জায়গাটা নিশ্চয়ই কত অপূর্ব কিন্তু বিশ্বাস করো, যেন একফোটা করুণা নেই এখানকার আকাশে বাতাসে সব শুকনো। তাই তোমাকে এখানে আনতে সাহস হয় না। এখনো আমরা ভাবতে থাকি। ভালো ঘর উঠলেই তোমাকে নিয়ে আসবো। অভিমান রাগ করোনা যেন।

জানো, এরমধ্যে একদিন দারুণ ঝড় তেড়ে পড়েছিলাম তার জের আজও সামলাতে পারিনি। চরের একটা মাঝির মেয়ে আমায় সেদিন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। অথচ কি আশ্চর্য জানো, মেয়েটার বাবা অর্থাৎ মাঝিটা সেই ঝড়েই মারা গিয়েছিল ঐ দিন। এখন বুপুরটাকে ভেড়ে ভয় করি। শরীরটাও ভাল নেই তবু আগামীকাল ইঞ্জিনীয়ার আসবেন, এই অবস্থায় আবার উঠতে হবে কাজকরতে হবে। তুমি আমার জন্য একটুও ভাববে না। খুব সাবধানে থাকবে। আমার অন্তরের ভালবাসা জানবে। ইতি—

চিঠিটা অনেকক্ষণ ভাবলো শুক্লা। লিখেছে দু বেগে মাঝিটা মারা গিয়েছে। উঃ কি সাঙ্ঘাতিক জায়গা এর মধ্যে চাকরি করা। আরো সাত পাঁচ ভাবলো সে। ঐ দিনই রওনা হওয়া সাব্যস্ত করলো শুক্লা। হরি সঙ্গে যাবে, অচেনা জায়গা কোলকাতা হলে অবশ্য কারুকেই প্রয়োজন হতনা।

ধরমাণ্ডড়ি রোড ষ্টেশন থেকে বাসে বার্ণেশঘাটে যখন নামলো শুক্লা তখন প্রায় বিকেল।

বাস থেকে নামতেই সেই ট্যাক্সিগুলো হর্ন বাজালো পর পর অর্থাৎ আসুন আসুন, এক্ষুনি ছাড়বে।

একটা লোককে জিজ্ঞেস করতে সে বলে দিলো যে এখানেই বাঁধের কাজ হচ্ছে মাইল খানেক আরো যেতে হবে। ঐ গাড়ীগুলোতে ঐ দিকে যাওয়া যাবে না। হোগলা বিছানো রাস্তাটা বাঁধের কাছ থেকে অনেক দূর দিয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সিতে গেলেও অনেকখানি হাঁটতে হবে।

শুক্লা বলে, ঠিক আছে, চল হরি হেঁটেই যাবো।

বেডিংটা মাথায় তুলে নিলো হরি, ক্যাম্প আর সাইড ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো শুক্লা।

অনেকদূরে সূর্য অস্ত যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, শেষবারের মত পৃথিবীটাকে রাঙিয়ে দিচ্ছে একটু একটু করে। হোগলা বনের ভেতর দিয়ে কিছুটা হাঁটতে হল। গাছের ডগাগুলো রাস্তার ওপর এসে পড়েছে বার বার পায়ে আছড়ে পড়ছে। ওর খসখসে ধারগুলোতে হরির পায়ের খানিকটা ছড়ে গেলো। বালিতে হাঁটবার অভ্যাস নেই ওদের কারুরই, তাই জোরে চলেও বেশী এগুতে পারছে না যেন পা আটকে যাচ্ছে বালির ঘুর্কে।

নিমাই মারা যাবার তিন দিন পরেই নৌকাটা বেচে দিয়েছে বুমি। মোহনানী ঘাটের টেপক মণ্ডল কিনেছে পুরো দুকুড়ি টাকা দিয়ে। যখন নৌকাটা খুলে নিয়ে গেল টেপক তখন চোখে জল

ধারতে পারেনি বুমি, একটা বেদনা অনুভব করেছিলো সে। নিমাইয়ের তৈরী—শাল কাঠ আনিয়ে গোপুরে পুড়ে পুরো তিন মাসে তৈরী করেছিলো; সেই বন্যার পরে তখন ওর মা ছিলোনা বুমি কত ছোট; নিমাইয়ের হাতের কাছে এটা ওটা এনে দিয়ে সাহায্য করেছে, একমনে বসে নিমাই কাঠগুলো জুড়ে জুড়ে গড়েছে নৌকাটা।

কিন্তু না বেচেও তো উপায় ছিলো না। কি করবে বুমি ওটাকে রেখে, কে বাইবে! রতনের জমি আছে, আজ না হোক কাল সে পুরোপুরি চাষি বনবে। বুমির আর কে আছে! শেষ সম্বল টাকা কটা বুকে চেপে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলো ঘাটে যতক্ষণ দেখা গিয়েছে নৌকার রেখাটা। টেপরু মণ্ডল ওটায় চড়ে মাছ মারবে তিস্তার বুকে ঘুরে ঘুরে।

রতন বলেছিলো, দুঃখ করি কি করিবু, যার যাবার তার যাবেই—

হু হু করে কেঁদে ফেলেছিলো বুমি রতনের বুকে মুখ রেখে। আর্দ্র গলায় বলেছিলো, ভালে হইল, পাছৎ সইহ করিব পারিল না হয়। না খাংা শুকিয়ে মরি যাবার চেয়ে এই ভাল হইল্।…

পৃথিবীতে জন্ম মৃত্যু আছে, কেউ চিরদিন বাঁচতে আসেনি। যখনই শিশু জন্ম নিলো তখনই সে সঙ্গে করে মৃত্যুর পারোয়ানা বয়ে নিয়ে আসে তারপর ধীরে ধীরে একটি একটি করে বছর বাড়ে কিন্তু ঠিক তার উল্টোদিকে তেমনি একটি একটি করে বছর কমে মৃত্যুর সীমানায় পৌঁছয় সে। সবাই জানে মৃত্যু জীবের ধ্রুবেই, তবে এত কষ্ট পাই কেন আমরা, কেন কাঁদি? যে কাঁদে সেওতো একদিন মরবে। তবে?

বুমিও কেঁদেছিলো নিমাইয়ের জন্য। সমস্ত কিনিসের যেমন শুরু আছে তেমনি শেষ আছে। কান্নারও শেষ আছে। মানুষ ধীরে ধীরে সব শোক ভুলে যায়, ভুলতেই হয় তাকে। যখন শোকটা এসে আঘাত করে, মনে হয় এ শোক কোনদিনই ফুরোবে না কিন্তু একদিন দুদিন তিনদিন তারপর সব ভুলে যায়, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চায়, শোকের আগুন বুকে নিয়ে সে বাঁচতে চায় না।

দুদিন পর বুমিও শোক কাটিয়ে উঠেছিলো অনেকটা। রতনের মুখে শুনেছে ওভারসীয়ার বাবুটার বাতাস লেগে ঐদিন থেকে বিছানায় শোয়া। কোলকাতার মানুষ কিনা একেবারেই সহ্য করতে পারেনি। কাল দেখা করে এসেছিলো বুমি। তাবুর ভেতরে ক্যাম্প খাটে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলো রঞ্জন বোস। বুমিকে দেখে খুসী হয়েছিলো সে। উৎফুল্ল গলায় বলেছিলো,—তুই এসেছিস! এমন অসুখ হয়ে পড়লাম যে তোর ওখানে দেখা করতে যেতে পারলাম না। রতনের মুখেই সব শুনেছি…

বুমি আস্তে আস্তে বলেছিলো,—ভাল আছিস বাবু—

—তোর আমার জন্য খুব চিন্তা না রে?

—প্রথম দিন বইলছিলি আমাদের প্রাণে নাকি দুঃখ নাই, দয়া মায়া নাই—

—তাই বুঝি প্রমাণ করছিস যে তোরা কারু দুঃখ দেখতে পারিস না। আমি অসুখ বলে দেখতে এসেছিস। অথচ কি পাষণ্ড আমি, একবার যাইনি তোর বাড়িতে তোর দুঃখে সান্ত্বনা দিতে—

—দেখ বাবু দুঃখ আমাদের নাই। ছোটলোকদের তুই চিনিস নাই। উয়ারা খাবার পাইলেই খুসী। বাবা-মা খোয়াইতে পারিলেই ছাওয়া-পাওয়া খুসী, বশে থাকে। মানুষটা মরিলে একদিন কাঁদে—তার খোয়াইবে এই ভাবিয়া। বাবু, তুইও তো ছোটলোকের মেয়ে, মোদের দুঃখ কিছু করিবার পারে না।

—আচ্ছা ধর তুমি ঐদিন যদি তোর কোলে মাথা রেখে ঘরে যেতাম—

—কইস না, কইস না এমন কথা। তোর বৌ-ছাওয়া-পাওয়া আছে মরিলে চলিবে কেনে—

—থারে, বেশ কথা বলিস তো, আমাদের মরতে নেই বুঝি ?

—তোরা ভদ্রলোক···বাবু···

—ভদ্রলোক ! চোখের সামনে যেন কতগুলো বছর সরে যেতে থাকে রঞ্জন বোসের। তুমি জানিস, একটা কথা না বলে আর পারছি না। একমাত্র তোকেই বলছি আর কেউ জানে না। তুই কাউকে বলবি না—

তুমি বলে,—না, বলবো না।

রঞ্জন বোস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,

এই যে আমাকে দেখছিস—আমি, আমিও জেলের ঘরের ছেলে। জলঢাকা নদীর নাম শুনেছিস—এখান থেকে খুব বেশী হলে পঁচিশ মাইল দক্ষিণে। ভুটান থেকে বয়ে এসেছে পাহাড়ের কাটল দিয়ে দিয়ে। তারই পাড়ে ঘুপগুড়ির দুমাইল দূরে ছিলো নদীর ধারে জেলের বাস। আনন্দনগর জমিদারদের জায়গা ছিলো ওটা। দুপাশে সবুজ পাহাড় আউ জেবলাঙ আর শালের বন জড়াজড়ি করে বাতাসে দুলতো। আকাশে ছিলো মেঘের খেলা তাতে অসংখ্য বুনো পাখী গান গাইতো। নিচে নদীর স্বচ্ছ জলে ছিলো মাছ। রোদ্দুরের সময় তাদের পিঠগুলো ঝক ঝক করতো। জেলেরা মাছ মারতো সারাদিন ঘুরে ঘুরে তারপর বেলা পড়ে এলে ওখান থেকে দুমাইল ঘুরে গিয়ে বেচে আসতো। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একমাইল হেঁটে গেলে পি ডব্লিউ ডি'র পাকা রাস্তা ছিলো। কেউ কেউ ঐটুকু পথ হেঁটে গিয়ে বাসে চেপে বাজারে যেতো।

আমরা দুভাইবোন ছিলাম। তখন আমার বয়স দশ, ছোট বোনটির বছর দুই। আমার বাবা একদিন—হ্যাঁ সেদিন ছিলো শুক্রবার, ঘুপগুড়ির হাট সেখানে মাছ বেচতে গিয়েছিলো। সন্ধ্যে উৎরে গেলো ধীরে ধীরে শালের গুঁড়ি অস্পষ্ট হল, চাপ চাপ অন্ধকারে ঐ অঞ্চলটা ঢেকে নিলো নিজেকে। জোনকিরা ছড়িয়ে পড়লো আলোর ফুলঝুরি নিয়ে। রাত ক্রমে গভীর হল। সন্ধ্যে লাগতে লাগতেই জেলে পাড়ার সবাই ফিরে এসেছিলো তারা কেউ বাবার খোঁজ দিতে পারলো না।

মা দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে আমি মার মুখের দিকে তাকিয়ে কি সব ভাবছিলাম আর ছোট বোনটা কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার ঐ বয়সে শুধু একটি মাত্র ভাবনা মনকে আচ্ছন্ন করলো—বাবা আসছেনা কেন কি হল তার ? এক সময় কখন আমরা ছোটবোনটার মত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি। যখন আমার ঘুম ভাঙলো তখন পৃথিবীতে সবে আলো ফুটতে শুরু করেছে। মা উঠে বসেছে ছোটবোনটা তখনও ঘুমুচ্ছে। মা ভাঙা গলায় বললো, এবার কি হবে ?

ঐটুকু বয়সে কোন উত্তর আমার মুখে জোগায়নি। ফ্যাল ফ্যাল করে মার মুখের দিকে তাকিয়ে বাবার মুখটার কথা ভাবছিলাম। তারপর ভালো করে সকাল হল একটা লোক খবর নিয়ে এলো—বাবা আর নাই। কালকে হাটে যাবার মুখে জলঢাকা ব্রীজে ধাক্কা লেগে যে বাসটাতে বাবা যাচ্ছিলো তা চুরমার হয়ে গিয়েছে। একটা লোকও বাঁচেনি।

আমি আর মার দিকে তাকাতে পারলাম না। বাইরে এসে একটা উঁচু টিলার ওপর গিয়ে বসলাম। সমস্তদিন পর সূর্য বিদায় নিয়েছে, একদলা ভয় নিয়ে যেন রাত্তির ছুটে আসছে সেহন সেহন। অনেকদূরে বনে আঁধার ঘনিয়েছে। আমার চোখ জ্বালা করছিলো। সামনে দিয়ে একটা শেয়াল ডেকে গেলো। ছোটবোনটা মাকে জড়িয়ে কাঁদছে। বাবার মৃত্যুর জন্য ও কাঁদছে মা, দারুণ ক্ষিদে ওকে কাঁদাচ্ছিলো। মার ওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

ঠিক সেই সময় এল আমাদের পাড়ার রজনী জেলে। লোকটার ত্রিসংসারে কেউ ছিলো না। টেনে টেনে বলে,—কি করবি এবার?

মা বোবা দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকালো। কোলের ওপর ছোট বোনটা কাতরাচ্ছে একটা গাছের আড়ালে থাকবার দরুণ আমাকে মা দেখতে পাচ্ছিলো না কিন্তু আমি তাকে দেখছিলাম।

রজনী আবার বলে, আহা দুধের বাচ্চা সব। কোত্থেকে খাওয়াবি এদের—মা এবারও উত্তর দিতে পারলো না। শুধু ছোট বোনটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। রজনী এবার বিরক্ত হল। মার ঠিক মুখের সামনে গিয়ে বসলো, তারপর—

তাবুর ভেতর গরম হাওয়া ঢুকছে। ওভারসীয়ারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সামনের পর্দার একটা দিক ঝুলে পড়ি দিয়ে বাঁধা। ওদিকে কাজ হচ্ছে তার শব্দ ভেসে আসছে। তাছাড়া দুপুর একেবারে নিঝুম, হোগলাবনে কোথায় একটা ঘাতুক ডেকে উঠলো। তুমি বাইরে উজ্জ্বল বালির দিকে তাকিয়ে রইলো। ওভারসীয়ার বলে,

তারপর, রজনী মার একটা হাত চেপে ধরলো, মা বাধা দিলোনা কিন্তু নিজেকে একেবারে সঁপেও দিল না। রজনী কিস কিস করে কি বলছে শুনতে পেলাম না। উত্তরে মা যা বললো সব শুনলাম। মা বললো, তুমি পরে এসো রজনী, রাত আরো বাড়ুক, ওরা ঘুমিয়ে পড়ুক।

আমি চোরের মত সেই অন্ধকারে ওখান থেকে পালিয়ে চললাম। ওরা বাঁচুক, আমি বাঁচতে চাইনা, চাইনা এভাবে বাঁচতে—জানিনা ঐটুকু বয়সে আমি কি করে ভাবতে পারলাম এসব কথা। মার ওপর একটা দারুণ অভিমান হল। চোখে আমার জল এলো আমি আবার কাঁদলাম।

জলঢাকার পাড়ে আসতেই বন ফাঁকা হয়ে এলো।

এখানে নদী, পাড়ে ছোট ছোট ঘাস। নদীর জল ঘেঁসে একটা পাথরের চাঙ। ছোটবোন ওদের কথা মনে হল। পাথরটাকে ছুঁয়ে আমার চোখে জল ভরে এলো। মনে হল কতদিন দুপুরের সেই দিনগুলোর কথা। বাবা নৌকায় মাছ মারতে গিয়েছে মাঝ নদীতে। আমি আর ছোটবোন পাথরটার ওপর ঠায় বসে থাকতাম যতক্ষণ বাবা না ডাঙায় উঠতো। অনেকদূরে বাবাকে দেখতাম। আমরা ছোট ছোট ঝুড়ি নিয়ে খেলতাম—পাথরটার ওপর বসে কেবলই সেইসব পুরানো কথা মনে হতে লাগলো চিৎকার করে আমার কাঁদতে ইচ্ছে হল।

আকাশে আবছা চাঁদ উঠেছে। জলে তার ছায়াটা ভির ভির করে সরে যাচ্ছে। এখন রাত কত? রজনী আজ কত দেরী করবে? নাকি এসে গিয়েছে আমাদের বাড়ীতে। ছোট বোনটা ওরে ঘুমিয়ে হয়তো মড়ার মত পড়ে রয়েছে—ও কিছুই টের পাবেনা। সকাল বেলায় বাবার সেজেই

ও আবার হাসবে। কে ছিল, কেন ছিল, কিসের পরিবর্তে ছিল—এসব ও ভাববে না; ভগবান, কেন আমাকেও ভাববার মন দিলে? কেন আমাকে অন্ধ কালা করে দিলে না? কেন? কেন?…

চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে আসছিলো। হঠাৎ যেন চমকে উঠলাম, নদীর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে?…

মা কি পালিয়ে যাচ্ছে ঘুমন্ত ছোট বোনকে নিয়ে! কোথায়, কোন অন্ধকারে পালাচ্ছে। আমি যে পড়ে রইলাম মা, তুমি যাও পালিয়ে যাও আমিও যাচ্ছি এই জগত্ থেকে চিরদিনের জন্ত ঐ জলঢাকার কালো জলে আমি হারিয়ে যাবো আমি শেষ হয়ে যাবো।…

আমি মা বলে চিত্কার করতে পারলাম না। কিসে যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। দেখলাম, সব দেখলাম, ঘুমন্ত ছোট বোনটাকে কোলে নিয়ে মা ধীরে ধীরে অদৃশ্ত হচ্ছে জলঢাকায়। তারপর একসময় ওরা মিলিয়ে গেলো নদীর স্রোতে। ছোট বোনটা একবার নিঃশ্বাস নিতে মাথা উঁচু করবার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু মা ওকে টেনে নিয়ে গেলো। আর দেখা গেলনা, জলটা বারকয়েক ঘুরপাক খেলো তারপর নতুন স্রোতে সব ঢেকে দিয়ে গেলো।

আমার কান্না পেলোনা। মনে হল এইতো ভাল হল। মার ওপর যে অভিমান মনে পুষে রেখেছিলাম তা উবে গেল। আমি মাকে প্রণাম করলাম। মনে মনে ভাবলাম রজনীটা আজ্ঞা জব্দ হয়েছে। বড় আশা করেছিলো লোকটা—মাকে ওর বৌ তৈরী করবে।

কি জানি কেন আমি মরতে পারলাম না। একটা ছোট্ট খুটোর মত মানুষের সমুদ্রে ভেসে পড়লাম। কেউ আমাদের খোঁজ করলো না, আমাদের নিজের বলতে কেউ তখন আর ছিলো না। এমনিভাবে ভাসতে ভাসতে একদিন মেদিনীপুর গিয়ে পৌছলাম। সেখানে এক ভদ্রলোক আমায় আশ্রয় দিলেন। তার ব্যবসা ছিলো কাঁথিতে। বাড়িতে ওঁনার আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট একটি মেয়ে ছিলো। আর মেয়েটির মা বাতে শয্যাশায়ী—বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। ওরা উভয়েই কেন জানি আমায় খুব স্নেহ করতেন, হয়তো ওঁদের পুত্রসন্তান ছিলোনা বলে।

আমি কে, কোথেকে এসেছি ওঁরা জানবার আগ্রহ কোনদিন প্রকাশ করেন নি। শুধু শুনেছিলেন আমার বাবা-মা কেউ পৃথিবীতে বেঁচে নেই।

এমনি ভাবে আমি বড় হয়ে উঠলাম। যখন ইন্টারমিডিয়েট দিলাম তখন মেয়েটি স্কুল ফাইন্যাল-এর ছাত্রী। ও পাশ করলো। আমি পাশ করে ভাবলাম, এবার! যতই ওঁরা আমাকে স্নেহ করুন কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করতো অহরহ। অথচ ওঁরা যেন আমাকে ওঁদের মেয়ের থেকে আলাদা ভাবতে পারতেন না।

ভাবলাম ওভারসীয়ারিটা পড়লে তাড়াতাড়ি চাকরিতে ঢুকতে পারবো। তাই করলাম, কেউ মানা করলেন না, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা কোনদিন বলেননি। মেয়েটিকে কলেজে ভর্তি করে দিলাম। ভদ্রলোক ব্যবসার জন্ত বাড়ির সব খোঁজ খবর রাখতে পারতেন না।

বুঝতে পারিনি ঐ দীর্ঘ দিনে ধীরে ধীরে মেয়েটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায় এসে ঠেকেছিলো। একদিন কাঁথি থেকে ফিরে এসে ভদ্রলোক কথাটা আমাকে ডেকে ওঁর স্ত্রীর সামনে বললেন, আমার সঙ্গে ওঁদের মেয়ের বিয়েতে কোন অমত নেই তো?

আমি সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারিনি। ভাবছিলাম, আমি শঠ জোচ্চর ধরপাইশ

আমি কোথাকার মানুষ? আমার শিরায় তার রক্ত বইছে, আমি কোন সমাজের মানুষ! ওদের আভিজাত্যকে আমি কলঙ্কিত করবো! এ অন্যায়ের শাস্তি আমি পাবোই। এতোদিন যে এমনি করে ওদের ঠকিয়েছি। আমার নিজের মুখটাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। হুবহু একটা ঠগের মুখ।

ওরা উত্তরেই অবাক হয়েছিলো আমার ব্যবহারে। আমি বলেছিলাম, কাল বলবো। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবলাম—কেন এতো অন্তর্দ্বন্দ্ব, সব কথা বলে ফেলি শুনে ওরা যা খুশী করুক। আমায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিক—আমাকে গালি দিক অপমান করুক, ওদের এতদিনের অর্থ ব্যয়ের প্রতিটি পাই বুঝে যাক আমার কাছে, আমাকে পুলিশে দিক। চোর বলে · প্রতারক বলে···।

মনে হল মেয়েটির কথা। ওকি আমায় ভালবেসেছে। সব কথাশুনে ভালবাসতে পারবে? কত সরল মেয়েটি। কতদিন পড়া বলে দিতে গিয়ে হাসি ঠাট্টা হয়েছে।

বিছানা ছেড়ে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। মেদিনীপুরের শহরটা ঘুমে অচেতন পাহরাদারের গলা মাঝে মধ্যে শোনা যায় আর অনেকদূরের সমুদ্রের গর্জন, কেমন গুড় গুড় ঢোল ঢোল। চোখ পড়লো মেয়েটির ঘরের দিকে। এগিয়ে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে আওয়াজ করলাম দরজার ওপর। ও জেগেছিলো কিনা জানিনা। বললো, কে?···

আমি।

তুমি। খুব বেশী বিস্মিত হলনা হয়তো।

আমি বললাম, তুমি আমায় ভালোবাসো—

অল্প হেসে দীপা মুখ নিচু করলো।

তুমি আমায় চিনতে ভুল করেছো।

অবাক গলায় দীপা বলে,

চিনতে ভুল করেছি। তুমি কি বলছো, তোমায় কি হয়েছে বলতো।

বললাম, তোমার মা-বাবা আজ বললেন—আমাদের বিয়ের কথা—

জানি সে কথা। আস্তে আস্তে বলে দীপা।

জানো?···

দীপা আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। আমার হাত ধরে বলে, যাও, অনেক রাত্তির হল ঘুমোও গে। নয় তো শরীর খারাপ করবে।

আমার ঘুম আসবে না—আমি ঘুমোতে পারবো না। আমার মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠের কীটগুলো আমাকে ঘুমোতে দেবেনা। —আমি বললাম আমার পুরানো সব কথা তাকে। দীপা ঘরে ঢুকে একটা ডায়েরী বুক নিয়ে এলো।

কিন্তু এটা?... তোমার ঘর থেকে বাবা সংগ্রহ করেছেন।

মিথ্যে—সব মিথ্যে কথা লিখেছি ওতে ব্যাক ডেট দিয়ে, আমি কোন বড় ঘরের ছেলে নই। আমাদের জাত-পেশা হল মাছধরা—

দুজনেই সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে রইলাম নীরবে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর দীপা বললো, তা হোক—বাবার বিশ্বাসকে ভেঙে দিও না। মন থেকে মুছে ফেলো সব অতীত ইতিহাস।

এই ডায়েরীর পাতা অতীতকে যা বলছে তাই হোক সত্যি। বাবার চেয়ে ঠিক করে সত্য স্বপ্নকে তছনছ করে দিওনা……

—অতীতকে মুছে দেওয়া যায় না দীপা।

—যায় যায়—তুমি এখন ঘুমোও, বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছো।

নিজের ঘরে চলে এলাম। দীপা দরজা আটকে দিলো। আমি অনেকক্ষণ পায়চারী করলাম অন্ধকার ঘরে চোরের মত। যখন রাত আরো গভীর হয়েছে তখন দরজা ভেজিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কান পাতলাম—না কেউ জেগে নেই। দীপাও ঘুমিয়ে পড়েছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মনে মনে বললাম, দীপা তুমি সুখী হয়ো। আঁধারে আবার পালালাম। নিজের ভবিষ্যৎটাকে অনেকটা বেঁধে ফেলেছিলাম তাই এবার অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরতে হল না। চাকরি পেলাম। ওদের খবর জানিনা। মনকে এটুকু সান্ত্বনা দিয়েছিলাম—ওরা আমাকে যা খুশী ভাবুক, কিন্তু আমি আর অপরাধের বোঝা বাড়াইনি।

একবছর পর শুভ্রাকে বিয়ে করলাম। ওর বাবা মানুষটাকে দেখলেন. বলেছিলেন, আজে কি এসে যায় কাজ দিয়ে মানুষের পরিচয়।

সোনালী দাশগুপ্তের প্রসাধন হয়ে গিয়েছিলো অনেকক্ষণ। বিরক্ত মনে বার বার ঘড়ি দেখলো। বলে গিয়েছে ঠিক সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ফিরবে সন্দীপন। রাস্তা ভাল হলে নিজেই একটু এগিয়ে দেখতে পারতো সোনালী। চাকরটাও গিয়েছে বাজার করতে পাঁচমাইল ঘুরে।

সখ করে এসেছিলো সোনালী, ভেবেছিলো দার্জিলিং কাছে হয়তো আরামটাও কত ভাল। কিন্তু এ রকম জানলে সে কিছুতেই আসতো না এখানে। আজ ঠিক ছিলো সিনেমা দেখতে যাবে ময়নাগুড়িতে। যাকে তে পুরানো ছবি তবু সময় কাটাতে ওছাড়া আর উপায়ও নেই। সন্ধ্যকাল এসেছে সন্দীপন, পাঁচদিন থাকবে এখানে তারপর সোনালীকে রেখে আবারও ফিরতে হবে। দিন দিন এখন কাজ বাড়ছে। নদীর জলের ধারাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে পাশ দিয়ে, সেখানে কাজ চলছে দিনরাত।

সোনালী একটা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টে চললো কিন্তু তাতে মন নেই। হাতের ঘড়িটায় তার নজর। চাকরটা ফিরে এল বাজার থেকে। সোনালী তাকে ডেকে বলে, সাহেবকে একটু দেখতো, এখনও আসছে না কেন।

চাকরটা বলে, দেখলাম সাইটে ওভারসীয়ার বাবুর সাথে কথা বলছেন।

এইসময় সন্দীপন দাশগুপ্ত প্রবেশ করলো। সোনালীর উল্টোদিকের একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলে সে।

সোনালীর চোখ মাসিক পত্রিকায়, সে এমনি ভাব করলো যেন কেউ এসেছে এটা সে টেরই পায়নি।

সন্দীপন রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো। তারপর হঠাৎ হাতের ঘড়িটায় নজর পড়তেই বলে, ওহো, সোনালী তোমার বোধহয় মনে নেই আজ আমাদের ছবি দেখতে যাওয়ার কথা ছিলো।

সোনালী তবুও নিরুত্তর।

সন্দীপন বলে, রাগ করেছো?...

কথা বোলনা—অভিমান ক্ষুব্ধ গলায় সোনালী বলে।

—মিছিমিছি আমার ওপর রাগ কোরনা। শোন দিনেমার শো আজ বন্ধ, মেসিন বিগড়ে গিয়েছে। মাসের উনত্রিশ দিনই নাকি এমন হয়।

সোনালী বলে, সত্যি বলছো?...

—ওভারসীয়ার তো তাই বললো। তার চেয়ে আজ গাড়ী নিয়ে বেরুবো, চরে ঘুরে ঘুরে দেখবো, তোমার ভাল লাগবে।

চাকরটা চা দিয়ে গেলো। টেম্পোরারী ইলেকট্রিক বাতিটা জ্বলে উঠলো। সন্ধ্যা হচ্ছে। ডায়নামো বসিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে রাত্রে যাতে পুরোদমে কাজ চলতে পারে। বাবুদের ঘরে তার টেনে বাতি ঝুলিয়ে কনেকশন দেওয়া হয়েছে। ওদের চা খাওয়া হল। সন্দীপন কোটটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে ড্রাইভারকে জীপ ঠিক করতে বললে।

জীপে উঠে সোনালী বলে, কোনদিকে যাবে?

—ড্রাইভারকে বলেছি। যেদিকটা দেখবার মত ঐদিকে নিয়ে যাবে।

—কাল আসবার সময় ঐদিকে একটা সুন্দর ট্যাঙ্কি দেখলাম—

—হু, একজন কণ্ট্রাক্টরের। ওরা ঘুরে বেড়ায়। তারপর মুখ নিচু করে বলে, আমার প্রেস্টিজ ওদের চেয়ে বেশী তাই ওদের গাড়ী ব্যবহার করতে ইচ্ছে হয় না।

ওরা দুজনেই হেসে উঠলো।

দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়ে ঝুমি এগিয়ে এলো।

—কিগো তোমরা এই সাঁজে কোটে যাইবু? আঁধারে এইঠে ভয় আছে— বাঘ বিরায়—

—তুমি বুঝি এখানেই কাজ কর। শুধা বলে।

—কাজ করবো কেনে, তা তোমরা কাঁয় কইতো?

—এখানে বাঁধের কাজ হচ্ছে—ওভারসীয়ার—শুধা তাকালো হরির মুখের দিকে।

হরি বলে, রঞ্জন বোস, চিনিস না? কোনদিকে থাকে বলতে পারিস।

—অঞ্জন বোস!...

—অঞ্জন নয় রঞ্জন বোস— বলে হরি।

—এ্যাই তুই চুপ করি থাক। আইচ্ছা বাবুটার মাথার কোঁকড়ানো চুল, সাহিবের মতন জামা কাপড় পিন্ধায়—ঐ বাবুটার কথা বুলছিস নাকি?

হ্যাঁ ঠিক বলছো। আমায় একটু দেখিয়ে দাওনা—

—ও বাড়া সেতো অনেকদূর, তার চেয়ে চল এই আমার ঘর। এইঠে বসিয়া খানিক জিয়ার নাও। ঠাণ্ডার মধ্যে হাঁটিবার পারিবা না। তোরা এঠে অপেক্ষা কর মুই খবর নিয়া আইসো। কি বলিস? ঐ বাবুটা তোর কাঁয় হয়? ঝুমি হেসে বলে, বুঝছি তুই উয়ার বউ হইস। ঠিক কইলায় কিনা বুলতো।

হরি অধৈর্য্য হল। চারদিক তাকিয়ে বলে, পাকামো করিস না। বউ কিরে, যে বাবুর

কথা বলবার ওনার স্ত্রী। গিয়ে বলবি, আপনার স্ত্রী আর হরি, না না বলবি হরিদা কোলকাতা থেকে এসেছে। যা—

গুল্লা বলে, সম্ভব হলে একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করতে বলবি। আমরা এখানে অপেক্ষা করছি। দরজার গোড়ায় মালপত্তরগুলো নামিয়ে রেখে একটু আড়ালে গিয়ে একটা বিড়ি ধরালো হরি। শীতটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। দিনের উত্তাপ কমে গিয়েছে সন্ধ্যার প্রথমেই। এখন যতই রাত বাড়বে শীতও বাড়বে।

গুল্লা মনে মনে ভাবে এভাবে ডেকে পাঠানো উচিত হল কিনা, মানুষটা হয়তো অসুখ হয়ে পড়ে রয়েছে। শুনে হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে আসবে। মেয়েটার কথায় প্রথমে হয়তো বিশ্বাস করতে পারবে না। অবাক হয়ে যাবে এখানে এসে। আনন্দও কম হচ্ছে না গুল্লার। রঞ্জন তাকে নিয়ে আসতে চায়নি নানা অছিলায়। এখানে যদি রঞ্জন থাকতে পারে তবে সেই বা পারবে না কেন।

কোলসা পাতা দিয়ে ঘেরা ঘরটার বড় অন্ধকার। বাইরে ঠাণ্ডা হলেও ভাল লাগলো। শুকনো জিগা গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালো সে। হরিকে দেখা যাচ্ছেনা—সেল কোথায়!…

এ' তো, ছুটছে কেন! গুল্লা ডাক দিলো ওকে। হরি সাড়া না দিয়ে আরো এগিয়ে গেল। পেছন পেছন কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলো গুল্লা, অনেকদূরে একটা মোটরের হেডলাইট দেখে দাঁড়ালো। নিশ্চয়ই রঞ্জন এসে গিয়েছে গাড়ী নিয়ে। যাক্ বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। এসময় হরিটা আবার কোথায় ছুটলো কে জানে… ও হরি … … হরি…

সামনের কোকাস চোখে পড়াতে গাড়ীর ঐ আলো দুটো ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছিলো না। হাত নাড়লো গুল্লা, থামাও…থামাও……।

সঙ্গীপন এবং সোনালী দুজনেই বিস্মিত হল। এই অরণ্যের কৌটি এখানে এলো কি করে! সঙ্গে আর কাউকে দেখা যাচ্ছেনা। সঙ্গীপন বলে,

—ড্রাইভার রোকে—

জীপ থামি দিয়ে দাঁড়ালো। বাসির পর বসে গেল চাকা কটা।

গুল্লা বলে, উনি আসেন নি? আপনারা? ……

সোনালী বলে, আপনি?……

এমন সময় হরি ছুটতে ছুটতে এলো।

—এই যে আমি এসে গিয়েছি। উঃ বাহাদুর এবার তোমায় মজা দেখাবো। হাতে তার একটা বেজীর বাচ্চা। কুচি কুচি দাঁত দিয়ে ওর হাত রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর চিঁ চিঁ করে ডাকছে। মালপত্তরগুলো সে নিয়ে এলো। পেছনে তুলে দিলো মুহূর্তে।

নাও চট করে উঠে পড়। দাদাবাবুকে দেখছিনা—

সবকথা শুনে সঙ্গীপন বলে, আপনি রঞ্জন বাবুর স্ত্রী। তা আসুন, বরং পৌঁছে দিই। গুল্লা বলে, না না, উনি হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বেন। শুধু শুধু আপনারা কষ্ট করবেন কেন। বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?

সোনালী বলে, বিনা আসুন, নির্জন অন্ধকারে চরের মাঝে কতোক্ষণ অপেক্ষা করবেন। তারচেয়ে চলে আসুন—কোথায় আর বেড়াবো তবু আপনার সঙ্গে একটু গল্প করা যাবে।

—রতন বাবুতো এখানে নেই। বিকেলে মেকলিস্কি গিয়েছে আমাদেরই বাজে। এখনও ফিরে আসেনি নিশ্চয়ই আর আপনি আসবেন তাতো রতনবাবু আগে থেকে জানতো না। সঞ্জীপন বলে,—আসুন।

জীপ ঘুরে চললো বালির রাস্তা ধরে। তারপর একসময় ঢোকলো বিহারের রাস্তায় এসে উঠলো। সামনে একটা ট্রাক আগে আগে চলছিলো। জীপের ড্রাইভার বার বার হর্ণ দেওয়া সত্ত্বেও ট্রাক সাইড দিচ্ছে না। সাইড দেওয়া ট্রাকের পক্ষে সম্ভব ছিলো না কারণ রাস্তা থেকে নেমে গেলে হয়তো চাকা বালিতে ফেঁসে যেতে পারে।

জীপের আরোহীরা বিরক্ত হয়ে উঠলো। হরি চিৎকার করে বলে,

—এই ট্রাকওয়া ড্রাইভার, থোড়া সাইড দেওনা। পাশের ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলে, দেখা যায় পশ্চিমা ড্রাইভার কিত্‌না বদমাইশ হ্যায়!

জীপের ড্রাইভারের গোপটা কাঁপলো। চোখ দুটোতে আগুন ঝরিয়ে হরির দিকে কটমট করে তাকালো।

গুরু বলে, হরি কি হচ্ছে—

ট্রাকের পাশ কাটিয়ে জীপ এগুলো।

বাচ্চাসিংএর উপর প্রথম থেকেই একটা রাগ পুষে রেখেছিলো রতন। সেই প্রথমদিন বুদ্ধি সম্বন্ধে সে কত কষ্ট স্বীকার করে দেড়মাইল হেঁটে তাকে খবরটা দিয়ে এসেছিলো। বাচ্চার তাতে লাভ কি হয়েছিলো। অথচ দিন যত যাচ্ছে ওভারসীয়ার বাবুকে তত ভাল লাগছে রতনের এবং প্রতিটি শ্রমিকের। দুটো স্বার্থই তার কাছে সমান যেমন নিজেদের তেমনি শ্রমিকদের। বাচ্চাটা তবু তদারকি করে ওদের গালি খেয়ে পয়সা কাটবার চেষ্টা করে কিন্তু পারেনা বলে মনে মনে রাগ করে লোকগুলোর ওপর।

কয়েকদিন আগে কয়েকটা লোহার রিম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কোথায় গেল! অনেক অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান মেলেনি। সবাই সন্দেহ করেছিলো বাচ্চাকে কিন্তু প্রমান নেই। প্রমাণ না হলে কি করে সাব্যস্ত হবে।

রতন দুপুরের পর থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলো আজ। একটা অচেনা অবাঙ্গালী বাচ্চার পেছন পেছন ঘুরছিলো। সন্ধ্যার সময় এক থোক টাকা যখন খুঁজে দিয়েছিলো বাচ্চার হাতে তখন তা রতনের চোখ এড়ায়নি। লোকটা চলে গিয়েছে তারপরেই। রতন চেপে ধরে বাচ্চাকে—এ কীসের টাকা?…

—কীসের টাকা? ক্রুদ্ধ গলায় বলে বাচ্চা সিং।

—তোর পকেটে ঐ লোকটা দিয়ে গেইল মুই সব দেখিছু। লোহার রিমগার দাম দিয়া গেইল তোক। তুই উয়া চুরি করিয়া বেচি দিছিস—

—রতন।…

—তোক ভয় করি নাকি? এক একটা লোহার কত কাজ হইত। তুই হামাদের শত্রুর। আমাদের চরের ভাল চাইস্ না। মুই ওভারসীয়ার বাবুক কয়া দিম। ইংজিনীয়ার আইচ্ছে তারঠেও কয়া দিম।

বাচ্চা সিং আর লোক। কোথায় কোন দাবাই তার জানা আছে। চোখ দুটো পিট পিট করে বলে, ওভারসীয়ারের সঙ্গে খুব খাতির তাই না? তোর লজ্জা করে না আজ বাদে কাল যাকে বিয়ে করবি তাকে দিয়ে ওভারসীয়ারটাকে—

—চুপ কর, চুপকর—ভাষ করি দিদু। মুখ সামলায়া কথা বুলিস।

—সত্যি কথা শুনলে বুঝি গা চড় চড় করে।

—কিসের সত্যি কথারে মা—

ধারে কাছে কেউ নেই। কুলিরা সবস্ত দিনশর তিনটে ইটের ওপর টিন চাপিয়ে রুটি সেঁকতে ব্যস্ত। আর যারা চরের তারাও চলে গিয়েছে। তাই ভয় পেল বাচ্চা সিং, লোকটা মারবে নাকি তাকে।

এই সময় কিছু দূরে ট্যাক্সির আলো দেখা গেলো। কনট্রাকটরের ট্যাক্সি, মেটার রঞ্জন বোস মেকলিসগঞ্জে গিয়েছিলো। ফিরে আসছে এখন। হঠাৎ বাচ্চার চোখ চক্ চক্ করে উঠলো।

—ঐ ভাখ—

রতনও দেখেছিলো ঝুমিকে মোটরের আলোতে।

ঝুমিকে দেখে রঞ্জন ট্যাক্সি থামালো। মুখ বার করে বলে,

—ফিরে রাত হয়ে গেল এখনও ঘুরছিস নাকি?

মুখ টিপে টিপে হাসছিলো ঝুমি।

—হাসছিস যে। মেয়েমানুষ, বেশী রাত না করে বাড়ি যা। চরে সবরকম লোকই আছে।

ঝুমি বলে, চল কেনে আমার বাড়িতে—

—দূর এতো রাতে নয়।

কপট ভয়মিশ্রিত স্বরে বলে, ভয় লাগে, একা একা যাবার পারবো না। তোর গাড়ীতে পৌঁছি দে—

অসভ্যা রঞ্জন ঝুমিকে তুলে নিলো ট্যাক্সিতে।

—তোর একা একা যেতে ভয় করে আর একা একা ঘরে থাকতে ভয় করে না।

ঝুমি খিল খিল করে হেসে উঠলো।

—ভয়? কেনে?…

—যাঃ এইতো একটু আগে বলছিলি। মুহূর্তকাল কি ভেবে নিয়ে রঞ্জন বলে, রতনকে বিয়ে করে ফ্যাল—

ঝুমি কোন উত্তর দিলো না। কাঁচের সার্সীটা দিয়ে বাইরের ঘোলাটে দিকে তাকিয়ে রইলো।

—কিরে কথা বলছিস না কেন?

—তুই বড্ড অসভ্য।…

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু মোটরের শব্দ আর পেট্রোল পোড়ার গন্ধ।

ঝুমি আবার বলে, ঐ মেয়েটার জন্ত তোর কষ্ট হয় না ওস্তারসীয়ার বাবু

—রঞ্জন বোস ঘাড় ফিরিয়ে বলে, কার কথা বলছিস ?

—ঐ যে দীপা

—কষ্ট করে কি হবে। নিজে ইচ্ছে করে যাকে সরিয়ে দিয়েছি তার জন্ত ভেবে লাভ কি !

—একবারও মনে হয়না ?

রঞ্জন বসু আর কিছু বলতে পারলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ওসব কথা থাক। যে তুই নেমে পড়……

—তুইও আয় কেনে, আয়—ঝুমি বলে।

কৌতুকপূর্ণ হাসি হাসতে লাগলো সে। রঞ্জন গাড়ী থেকে নামলো। ঝুমি অবাক হল—মানুষের চিহ্ন মাত্র নেই। কোথায় গেল ? ওরা কোন দিকে যেতে পারে। চারিদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিলো সে। না, কোথায়ও নেই !

—কি নেই ? কি খুঁজছিস—

—বউটা আর ··

—বৌ, কার বৌ, কোত্থেকে এলো—রঞ্জন বোস অধৈর্য্য হল।

—তোর বৌ আবার কার হবে।

—দেখ ঝুমি ইয়াকি মারিস না।

—সত্যি বলছিগো। সেই যে লোকটা, হরি···

—হরি। মানে আমাদের—কোলকাতার হরি।

—হয় হয়, ঠিক কইছিস। কিন্তু কোটে গেইল……

আবার লোহার শিক চুরি গেল। কাজ এখন অনেক এগিয়ে গিয়েছে সামনে বর্ষা, তার আগেই সব শেষ করতে হবে এর মধ্যে যদি মালের অভাবে কাজ বন্ধ হয়ে যায় তবে মুশকিল। রঞ্জনেরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায় অন্যান্য ওস্তারসীয়াররা বলে, বাচ্চাকে তাড়িয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

পুলিশ আসবার আগে বাচ্চাসিং রঞ্জনকে বলে, সাহাব, আমি জানি কে চুরি করেছে।

—জানো ? আগের বার যে চুরি করেছিলো সেই তো—

—না না, আগের বারের কথা আমি জানি না। কিন্তু এইবার রতন চুরি করেছে।

—রতন !

—হাঁ, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

পুলিশ এলো। ঝুমির বাড়ির কিছুদূরে বালির তলা থেকে বেরুলো চুরি যাওয়া সমস্ত লোহা। রতনকে ওরা ধরে নিয়ে গেল। বাচ্চাসিং দাঁত বার করে হাসলো, ঝুমির দিকে তাকিয়ে।

ঝুমির মনে হল সেই রাতের কথা। কেমন একটা খস্ খস্ আওয়াজ। বালির ওপর ঘুড়বার শব্দ। অন্ধকারে একটা আবছায়ার মূর্ত্তি বালির ওপর বসে কি যেন করছিলো।

লোকটাকে চিনতে পারলো সে একটু এগুতেই।

—সোহাগা চুরি করি নিয়া আইচ্ছিস ··

কিস্ কিস্ করে রতন বলে, চুপ কর। এগুলা বেচিয়া আরো জমি কিনিব।

—চুরি করিয়া জমি করিব ?

রতনের মনে সেদিনকার কথাগুলো আবার জ্বলে উঠলো। বলে,

—কেনে, তোর ওভারসীয়ার বাবু চুরি করে না? সোধার চুরি করে, আমরা করিলেই যেতো দোষ। যা যা বাড়ি যা—ঘুমা গিয়া।

—বাজে কথা কইস না।

—কি বাজে কথা ?

—কি আবার।

—ও, বড় লাগে তোর বুকে। বুক ফাটিয়া যায় উয়ার জন্য লয় ?···

—হাঁ, তাই।

রতনের সন্দেহ যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। দুখের রেখার হিংস্রতা হিস্ হিস্ করে ওঠে। ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেয় ঘুমির গালে।

অন্য সময় হলে ঘুমি হয়তো রুখে দাঁড়াতো। কিন্তু কেন যেন রতনকে রাগাতে ইচ্ছে হল না। ওর এখন মাথার ঠিক নেই। না হলে যে বলতো, চরের উন্নতির কথা বাবুর কাছ যত তাড়াতাড়ি হবে ততই তাদের মঙ্গল—সেই মঙ্গলকে সে নিজের হাতে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। মানুষের মন কত বিচিত্র।

রতন ঘোস জামিনে রতনকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল। আবার কাজে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। চালাইয়ের কাজ চলছে, সামনে বৈশাখ বিকেলের দিকে আকাশ কালো হয়ে ঝড় ওঠে। তিস্তার জলে তার নাচন কেঁপে ওঠে তারপর হুপহুপ শব্দ ওঠে জলে, তির তির করে বৃষ্টি নামে। নদীর নৌকাগুলো তাড়াতাড়ি পাড়ে ভিড়ে পড়ে। একদিন এমনি করে পাড়ে ভিড়তে হবে সব কটি নৌকাকে, জলে ঢেউ না থাকলে, আকাশে মেঘ না থাকলেও এমনি করে যাত্রীহীন নৌকাগুলো পড়ে থাকবে। ওরা বেকার হবে অথচ ঠিক ঐ সময় চোখের সামনে চরটা সৌভাগ্যে ঝলমল করবে, বাতাসে মিঠে আমেজ ভাসবে? একদলের ভাগ্যকে সরিয়ে দিয়ে সৌভাগ্যের স্বর্গ রচিত হচ্ছে। ঐ বজরাগুলো দিনরাত খাটছে যেন মাথা উঁচিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে—নাও তাড়াতাড়ি শেষবেলার খেয়া পার কর, সময় হল। বেকার একদলকে হতেই হবে-এই নিয়ম।

জলের ছাট চোখে মুখে এসে পড়ছে। সমস্ত শরীর বেয়ে জল গড়িয়ে পরছে সাড়ীটা শরীরের সঙ্গে লেপটে গিয়েছে।

ভিজতে ভিজতে রতন এসে ঢুকলো।

ভিজে জলে ভিজি গেইছিস্। এইঠে দাঁড়ে আছিস কেনে ?

ঘুমি নিশ্চুপ। মুখ ঘুরিয়ে রতনকে একবার দেখলো না পর্যন্ত। রতনের পৌরুষে হয়তো আঘাত লাগলো ঘুমি অনেক বদলিয়ে গিয়েছে। সেই ঘুমি আর নেই, রতনের উপস্থিতিতেও সে নির্বিকার রতনের বুকে কেমন একটা ব্যথার সুর বেজে উঠলো। কেন সে তাকে উপেক্ষা করছে। একদিন রতনই তো তার সবকিছু ছিলো। আজ ওভারসীয়ার বাবুটা দুইটা ভাল ভাল কথা শুনাইছে তাইতে উয়ার মন ঝুঁকি পড়ছে। এখন আর রতনের প্রয়োজন নাই!

পেছন থেকে বুমির হাত ধরে এক ঝটকা টান দিলো রতন। তুই কি ভাইবছিস বুমি? ভাবছিলি লোহাচুরির কথা ওস্তারসীয়ারকে কয়া দিয়া মোক জেলে পাঠাবি আর তোয়া দুইজন মোজা লুটিবু! তাই না?…

বুমি চিৎকার করে উঠলো, রতন, খবরদার এমন কথা কইস না।

—খারাপ কথা কইছি না? তাই যদি না হবে তবে চুরির কথা বলি দিছিস কেনে? কেনে হামাক ধরে দিলি পুলিশের ঠে। ওস্তারসীয়ারটার জন্ত ভালবাসা বুঝি উপচি পড়েছে—

—তুই চোর, শাস্তি তোর পাওয়া লাগেই—

—চোর? আর তুই? আমার সঙ্গে তোর বিয়া হবার কথা চুপ করি উয়ার সঙ্গে ভালবাসা, এইটা চুরি নোয়ায়? তোর শাস্তি নাই মাগী?…

—তুই মানষি নোয়ায় রতন। তুই চলি যা এইঠে হতে—

—হ্যাঁ চলি যাচ্ছি, তবে ইয়ার শোধ আমার মনে থাকলো—

ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই রতন বেরিয়ে পড়লো। প্রত্যাখানের রূঢ় আঘাত তার সমস্ত চেতনায় বিষক্রিয়ার মত বিষিয়ে দিতে লাগলো। আর বুমি, সে স্থির, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বৈশাখের শেষ, ঘোগলা বন শুকিয়ে গিয়েছে, কাঠি কাঠি ডগাগুলো রোদের তাপে পুড়ছে। আবার বর্ষার জল পেলেই বালি ভিজে উঠলেই ওগুলো প্রাণ ফিরে পাবে। সবুজ পাতা বেরুবে ঐ কাঠির ভেতর থেকেই।

তিস্তার স্বচ্ছ জল তীরে তীরে কেঁদে ফিরছে। সেও বর্ষার আকাশের দিকে চেয়ে আছে, হাসি উচ্ছলতাতো ওখানেই—তিস্তার রূপ তখন ভিন্ন। একটা কোকিল সমাপ্তি গান গেয়ে গেয়ে ফিরছে।

ওরা আর হরি আবার ফিরে গিয়েছে কোলকাতায়। বেশী দেরী নেই জন্ত সবার চলে যেতে—কুলী ক'জন ওভারসীয়ারবাবু ইঞ্জীনিয়ার সাহেব সবাই যাব যাবেকের মধ্যে চলে যাবে। ওরা কারিগর, তৈরী করে দিয়েই খালাস, ফলভোগ জনসাধারণ করবে।

বালির ওপর বসেছিলো বুমি। দূরথেকে তাকিয়ে দেখছিলো, হরিশবাবুদের নৌকাতে ছাগল চরছে মুসলমান একটা লোক। লোকটার যেমন দাড়ী ঠিক তেমনি ছাগলটার। ছাগলটা কিছুতেই উঠবেনা লোকটাও দাড়ি ধরে টানছে। ঘাড় নিচু করে বালিতে পা চেপে ছাগলটা জলের দিকে তাকিয়ে ব্যা ব্যা করে ডাকছে। জলকে ছাগলের বড় ভয়। কিন্তু যেই একটা হেঁচকা টান দিয়েছে, ছাগলটা একলাফে নৌকাতে উঠে পড়েছে অমনি হড়িতে ঢিলে পড়তেই দাড়িওয়ালা লোকটা হুড়মুড় করে পড়লো জলে। তাই দেখে বুমি খিল খিল করে হেসে উঠলো।

ঠিক এমনি সময় একটা ভয়ার্ত চিৎকার—বুমি……বুমি……

কণ্ঠস্বরটা চিনতে বুমির কষ্ট হল না। রতনের সঙ্গে সেই কথাকাটাকাটির পর আর সে ওভারসীয়ারের সঙ্গে দেখা করেনি, দেখা হলেও পালিয়ে ঘরে গিয়েছে। সেই জন্তই হয়তো তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ডাকুক, বুমি কিছুতেই মুখ ফেরাবে না। সে গম্ভীর হয়ে রইলো।

…বুমি বু…

ঝুমি, আমি যে তলিয়ে যাচ্ছি। তুই কি তাই চাস? দেখ……বাঁচা…ঝুমি, উঃ…… ক্ষিপ্রগতিতে ঘাড় ঘুরিয়ে ঝুমি উঠে দাঁড়ালো।

—ওস্তারনীয়ারেবাবু?… তুই চোরাবালিতে পইড়ছিস্……

ছুটে এলো, কিন্তু একেবারে সামনে গেলোনা। চারদিক তাকালো অসহায় দৃষ্টিতে। অনেকদূরে রতনকে দেখা গেলো, সে হয়তো ওস্তারনীয়ারের পেছন পেছন অনুসরণ করে আসছিলো।

ততক্ষণে রঞ্জন বোসের কোমর অবধি বালির নিচে ডুবে গিয়েছে। ঝুমি চিৎকার করে রতনকে ডাকলো, হাত নাড়লো। রতন যখন এসে পৌঁছলো তখন রঞ্জন বোসের পেটের অর্ধেকটাও বালির নিচে।

রতন এসে ঝুমির সামনে দাঁড়ালো। অদ্ভুত ভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে। তার চোখে প্রতিহিংসার আগুন। নিষ্করুণ রুক্ষতা তার মুখের প্রতিটি রেখায়।

—উয়াক বাঁচা রতন। ঝুমি অনুনয়ে কেঁদে ফেলে।

রঞ্জন বোস বলে, রতন, তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবি আমার মৃত্যু! রতন শুধু নিরুত্তর, নির্বিকার।

এইতো ভাল ভগবান শাস্তি দিয়েছেন বাবুটাকে, মরুক, একটু একটু করে মরুক, দাঁতে দাঁত চেপে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মৃত্যুটা যেন চেখে চেখে খাচ্ছে রঞ্জন বোসকে। অক্টোপাসের মত চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে—নিস্তার নেই। হাত দুটো ওপর দিকে তুলে আপ্রাণ চেষ্টায় দেহটাকে তুলতে চেষ্টা করছে সে। কিন্তু অসাড় হয়ে পড়েছে নিচের অংশ। ঝুমি বলে, রতন, তুই শুধু দাঁড়িয়ে থাকি? বাঁচা বাবুটাকে নয়তো মুই……

—না। টেনে ধরে সে ঝুমিকে বাঁচাল।

—কেনে, সব কি ভুলি গেলি—এই চরের উন্নতির জন্য বাবুটা এতো করিল্, দুইদিন পর এইঠে সোনা ফলিবে, ইখানকার মানুষরা যারা বাঁচিবে। নতুন করি বসা প্যাটে ভাত জুটবে—সব কি ভুলি গেছিস রতন? এগুলা কার জন্য করিছে, আমাদের জন্য এতো করিয়া শেষে আমাদের চোখের সামনেই উয়ার তিল তিল করি মরি যাবে। মানুষ হয়্যা তা তুই দেখিবার পারছিস। রতন…রতন…

সমস্ত চরটা যেন রতনের চোখের সামনে ধানের শীষ নিয়ে নেচে উঠলো। কেমন যেন মনে হল তার। সে দ্রুত এগিয়ে গেলো, দ্রুত হাতে বালি সরাতে লাগলো, তারপর রঞ্জন বসুর হাত দুটো ধরে আপ্রাণ চেষ্টায় টানলো কিন্তু একচুল উঠলো না। বেদনায় কাঁকিয়ে উঠলো রঞ্জন বসু। রতনের মাথা ঝিম ঝিম করে উঠলো, একি। … একি… সেও তো বালির বুকে তলিয়ে যাচ্ছে। ভগবান একি হল উঃ…… নাক চোখ কপাল চুল… না আর দেখা গেলনা রঞ্জন্ বোসকে। আর রতনের, গলাকাটা মানুষের মত মাত্র মাথাটা গলার ওপর থেকে জেগে রয়েছে, আস্তে আস্তে তাও তলিয়ে গেল। পৃথিবীর বুকে দুটি মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিরকালের জন্য।

ঝুমির যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন অনেক রাত। নিজের ঘরে সে শুয়ে আছে। কি করে এল, কখন এল কিছুই সে ভাবতে পারলো না।

হঠাৎ যেন তড়িৎ স্পর্শে সে চমকে উঠলো। ওরা? প্রশ্নটা অন্ধকার ঘরে অনেকক্ষণ ফিস্‌ফিসানির মত শোনালো। বাইরে রাত বাড়তে লাগলো। ঝুমি ঘরে বসে কান পাতলো শোনবার চেষ্টা করলো—

—কে? রতন? ...ওভারসীয়ার বাবু?...

শুধু বিস্তীর্ণ চরে কতকগুলো শেয়ালের পদধ্বনি ছাড়া অন্য কিছু শোনা গেল না। একটা নিস্তব্ধতা যেন বাতাসে মৃদু বিলাপ করতে লাগলো।

পরদিন বাচ্চাসিং ঝুমির কাছে এল। হরিশবাকুন্তীর মেয়েটা বসে ছিলো ঝুমির কাছে। কাল রাত্তিরেও বারে বারে খোঁজ নিয়ে গিয়েছিলো।

মুখ তুলে তাকালো ঝুমি। তার দৃষ্টিতে যেন কোন প্রশ্ন ছিলো না।

—তোকে একটা পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, বলে বাচ্চাসিং ইঞ্জিনীয়ার সাহেব নিজে দেখেছেন তোর—

—কি, কেনে তোরা আমাক পুরস্কার দিবি, ধীরে ধীরে কথাগুলো উচ্চারণ করলো ঝুমি!

—কালকে ঐ সময় একটা কুলি এদিকে কোথায় এসেছিলো সে হঠাৎ তোর চিৎকার শুনতে পায়। ওর খবর পেয়ে আমরা যখন সবাই ছুটে এলাম তখন ওভারসীয়ার সাব আর রতন ডুবে গিয়েছিলো কিন্তু তোর একটা মুঠিতে ধরা ছিলো একগোছা চুল, তোর জানছিলো না। দাঁড়িয়ে থাকলে তুইও ডুবে যেতিস ওদের সঙ্গে। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তোর সাহসে খুব খুসী হয়েছেন তুই নিজের জীবন বিপন্ন করেও ছুটে গিয়েছিলি ওদের রক্ষা করতে। যেখানে ওরা ডুবেছে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওদের স্মৃতি বহন করবে। তখন মানুষরা এই রাস্তা দিয়ে ব্রীজ পার হবে থমকে দাঁড়াবে, জানবে ছুটে মানুষের কথা যারা গড়েছে এই ভিস্তা ব্রীজ কিন্তু জীবন দিয়ে গিয়েছে এখানকার চোরা বালিতে। বাচ্চাসিং থামলো, তার গলাটা ভারী হয়ে আসছে। আমাদের কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যেটুকু বাকি তা এর পরেও করা চলবে। আনুষ্ঠানিক ভাবে আগামী পরশু ব্রীজের উদ্বোধন করবেন আমাদের মন্ত্রী, তাঁর হাত দিয়েই তোকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

ঝুমির বুকের ভেতর একটা কান্না কেবলই আকুলি বিকুলি করে। সে কেন কথা বলতে পারলো না।

হরিশবাকুন্তীর মেয়েটা চলে গেল। বাচ্চাসিং যাওয়ার আগে বলে, তোর দুঃখ সব চেয়ে বেশী কিন্তু দুঃখ করে কি হবে।

নিশ্চল হয়ে বসে রইলো ঝুমি। দিন শেষ হয়ে রাত হল, রাত বাড়লো। তারপর দিন হরিশবাকুন্তীরা টোপলাটুপলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো, কোথায় জমি পেয়েছে সেখানে যাচ্ছে। একে একে সবাই নতুন আস্তানার সন্ধানে চলে গেল। যার যার নিজের জন্য সবাই ব্যস্ত তাই ঝুমিকে কেউ বললো না যেতে তবু হরিশবাকুন্তী একবার মুখের কথা বলেছিলো তাদের সঙ্গে যাবার জন্য কিন্তু ঝুমিই রাজী হয়নি।

ঝুমির কে আছে, কোথায় যাবে সে? রতনের বুড়ি মা আছে সে বুড়ি এমনিতেই ঝুমির সঙ্গে রতনের মেলামেশা দেখতে পারতো না, আর এখন কিসের পরিচয়ে সেখানে গিয়ে উঠবে সে।

শেষরাতে ঝুমি নিজের কাপড়টা বেঁধে নিলো। সঙ্গে নৌকা বিক্রির গোটা কয়েক টাকা। কিছু আগে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

কোথায় যাবে ঝুমি তার ঠিক নেই। তবু তাকে যেতে হবে এখান থেকে। এখানে কিসের টানে আর সে থাকবে!

শূন্য বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তার অনেক কথা এই মুহূর্তে মনে পড়লো। বুড়ো বাবা—মা, তার শৈশবের দিনগুলো।…তারপর জোরে পা চালিয়ে দিলো বালির রাস্তায়। রাত্রি শেষের দিকে আঁধারে চরকে অস্পষ্ট দেখাতে লাগলো সিমেন্ট বাঁধানো জায়গাটায় এসে সে থমকে দাঁড়ালো, বুকের ভেতর একটা অস্ফুট যন্ত্রণা অনুভব করলো ঝুমি। তারপর আবার হেঁটে চললো। থাকুক রতন, ওতারসীতায়, বালুচড়ের ঐ জায়গাটায় ওরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে থাকুক যাত্রীদের মনে, যারা ভাল করতে এসে নিজেদের বিসর্জন দিয়ে গেল তাদের স্মৃতির সাক্ষী হয়ে জেগে থাকুক তিস্তা চরের মাঝে এই বেদী।…দ্রুত, আরো দ্রুত হেঁটে চলে ঝুমি পেছনে তিস্তার অস্বচ্ছ চরকে রেখে…।

[উত্তর বাংলার তিস্তা নদীর উপর বাঁধ হওয়ার কথাছিল ১৯৪৭ সালের পূর্বে। যে কারণেই হোক আজ পর্যন্তও সেখানে বাঁধ হয়নি। যদি কোনদিন হয় তবে চরের মানুষের ভাল মন্দের একটি কাল্পনিক ছবি এই গল্পে এঁকেছি। নেহাতই কাল্পনিক কাহিনী। কোন চরিত্রই সত্যিকার নয়।]

* * * *

টলষ্টয় গৃহিণী রাগ করে চেঁচিয়ে উঠলেন—তোমার মত আলসে তোমার মত অপদার্থ তোমার মত গণ্ডমূর্খ আমি কোথাও দেখিনি। তুমি দূর হও তোমার চাষের জমিতে, সেখানেই থাক সারাদিন।

টলষ্টয় হেসে বললেন; কিন্তু আমি যে তোমার মত কর্মপটু, তোমার মত বুদ্ধিমতী, তোমার মত সুরসিকা আমি যে কোথায়ও দেখিনি। তুমি থাক—চিরদিন থাক আমার ঘর আলো করে। টলষ্টয় গৃহিনী ত অবাক্।

বেসুরো

সুজিতকুমার ভট্টাচার্য্য

ছারপোকা ভর্তি বেঞ্চিতে বসে বসে চিন্তার জাল বুনে চলেন সত্যবাবু।…নেশা ওই একটিই ছিল তাঁর। বেহালা। পান সিগারেটের নেশা কোনদিনই নেই তাঁর। চা দিনে দু'কাপ খান। তাও নেশা নয়। না খেলেও চলে। কিন্তু বেহালা বাজাতে তিনি সত্যিই ভালবাসেন। আর বাজনাও ভাল। এখনও মাঝে মাঝে ধুলো ঝেড়ে বসেন বেহালাটা নিয়ে। চাকরীর প্রথম জীবনে কিনেছিলেন ওটা।

বুঝতে পারেন না। সত্যবাবুর বেহালা দেখলেই স্ত্রী অন্নদা দেবী আজকাল রেগে ওঠেন কেন! অথচ এমন একদিন ছিল যেদিন সত্যবাবুর বেহালা বাজানো তন্ময় হয়ে শুনতেন তিনি। এমন কি পাড়া পড়শীর কাছে বেশ গর্বের সঙ্গেই স্বামীর বেহালা বাজানোর গল্পও করতেন।

আবার ওটা নিয়ে বসেছ? ওটাকে এবার উনুনে পুড়িয়ে দোব আমি। "পেটের ভাতের একটা ব্যবস্থা দেখনা। কোন পার্ট টাইম কাজকর্ম—"স্ত্রীর সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি। প্রথম প্রথম একটু রাগ হয় সত্যবাবুর। এখন আর রাগেন না। শুধু মিনিট খানেকের জন্য বেহালা থেকে হাতটা সরিয়ে রাখেন। স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা আর রান্না ঘরের দিকের জানালাটা বন্ধ করে দেন। আবার বেহালায় হাত দেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! "দাদু, পড়াবে"—প্রথমভাগ বগলে পাঁচ বছরের নাতির ডাকে এবার সত্যিই বেহালা তুলে রাখেন তিনি। ঠাকুমার আদেশ পালন করতেই যে জ্ঞান-পিপাসু বালকটিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বই হাতে করতে হয়েছে তা বুঝতে পারেন তিনি। তবুও না বোঝার ভান করে মনের রাগ মনেই চেপে রেখে বলেন, —এস দাদু।

মাত্র মাস ছয়েক হল চাকরী থেকে অবসর পেয়েছেন তিনি। অবসর এক বছর আগেই পেতেন। অতিকষ্টে ছ'মাসের এক্সটেনসন্ আদায় করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আর পেলেন না। অফিসের দরজা তাঁর কাছে বন্ধ হয়ে গেল।

ছ'মাস আগেও তিনি অফিস যেতেন। সাড়ে ন'টার মধ্যে ভাত খেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতেন। ফিরতেন সেই সন্ধ্যার পর। ছুটি যা হোক কিছু মুখে দিয়ে বাইরের ঘরে বসতেন বেহালা নিয়ে। বিষ্টুবাবু, নন্দবাবু, কানাইবাবু, গোপালবাবু সবাই এসে জুটতেন। ন'টা পর্যন্ত হট্টগোলের মধ্যে কাটিয়ে তারপর বাড়ীর ভেতর আসতেন। বাড়ীর সঙ্গে আর কতটুকু সম্পর্ক ছিল?

চেষ্টার ত্রুটি করছেন না সত্যবাবু। রবিবারের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে অনেক অফিসেই দরখাস্ত করেছেন। ইন্টারভ্যুও পেয়েছেন কয়েক জায়গায়। পঁচিশ বছরের তরুণের পাশে বসে অফিসারের ঘরের সামনে পাতা বেঞ্চিতে ঘণ্টার ঘণ্টা অপেক্ষা করেছেন। শেষে একসময় অফিসারের কতকগুলি বাঁধা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

—কি বলল গো ওরা?

স্ত্রী অম্বা দেবীর সেই একই প্রশ্ন। মেয়ের বিয়ের আগে মেয়েকে যখন কোন পাত্রপক্ষ দেখতে আসত—মেয়ে দেখা এবং সেইসঙ্গে সত্যবাবুর বেশ কিছু পয়সা খরচ করিয়ে যখন তারা বিদায় নিত—সত্যবাবু যখন তাদের ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিষণ্ণ মুখে বাড়ী ফিরে আসতেন, স্ত্রী তখনও ওঁকে ওই একই প্রশ্ন করতেন—কি বলল গো ওরা? সঙ্গে অবশ্য আরও একটু যোগ করতেন—পছন্দ হল?

মেয়েকে পছন্দ একদিন হল। তার বিয়েও হল। কিন্তু পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধ সত্যবাবুকে কোন অফিসারেরই বোধ হয় আর পছন্দ হবে না।

—কি গো বোবা হয়ে গেলে নাকি?

স্ত্রীর ঝংকারে সত্যবাবুর চমক ভাঙে।

—না। হ'ল না।

—অফিসে অফিসে তো অনেক ঘুরলে। টাইপনীর চেষ্টা দেখ না।

সত্যবাবু ভাবেন সেদিকেও তিনি ত্রুটি রাখেন নি। অবসরপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট কেরাণীকে কোন অফিসারই আজকাল ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক রাখতে চান না। শিক্ষকতা লাইনে আছেন এমন লোককেই ওঁরা চান। অথচ বিষ্ণুবাবু, কানাইবাবু, সবাই কেমন একটা না একটা কাজ জুটিয়ে ফেলেছে। নন্দবাবু তো আরও একবছরের এক্সটেনসন্ পেয়েছেন। সত্যবাবু ভাবেন, সবই কপাল। নইলে তিনি দশটা থেকে এক্‌টা পর্য্যন্ত চাকরি হাতে বসে আছেন, আর ওঁর পরে কতলোক এসে টাকা নিয়ে চলে গেল। ওই নীলসার্ট গায়ে পুরু পাওয়ারের চশমা চোখে লোকটা তো ওঁর কাছে কলম চেয়ে (না। না। চায় নি। ছোঁ মেরে পকেট থেকে কলমটা তুলে নিল। রাগ হয়েছিল একটু সত্যবাবুর। চাইলেই তো পারতিস!) এই একটু আগে বিল লিখে জমা দিল। কিন্তু সেও টাকা নিয়ে চলে গেল .....উঃ! অসহ্য! সারা রাজ্যের ছারপোকা এসে কি জুটেছে এই বেঞ্চিটাতে? ছারপোকার কামড়ে চিৎকার করে ওঠেন সত্যবাবু। লেখন নিতে এসেছেন তিনি।

ছারপোকা আর ধুলোয় ভর্তি ভাঙা বেঞ্চিগুলো। এ অফিসের চাপরাসীগুলোই বা কীরকম? একটু ঝাড়তে পারে না ধুলোগুলো? নিজের ফেলে আসা অফিসের কথা মনে পড়ে ওঁর। ওঁর অফিসে ফরাসের কাজ করত মধু। সেই তো সেদিনের কথা! মধুকে তিনি কী ধমকটাই না দিয়েছিলেন ওঁর টেবিলে ধুলো জমেছিল বলে। মধুতো কেঁদেই ফেলেছিল। ভয় পেয়েছিল ক্যাশিয়ার বাবু কথাটা সাহেবের কাণে আবার না তোলেন! ওঁকে ভয় পেত বটে অফিসের চাপরাসীগুলো। শুধু চাপরাসী কেন, ওঁর ক্যাশ সেক্‌সনের কেরাণীবাবুরাও ওঁকে দেখে ভয়ে কাঁপত। আর আজ? .....উঃ! গরমও তেমনি। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মোছেন। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখেন একশ এগারো ডিগ্রির কলকাতা সহরেও এতবড় বারান্দায় যেখানে প্রায় দু'শ লোক বসে-পাখা রয়েছে মাত্র দু'টি—বারান্দার এ প্রান্তে একটি আর ও প্রান্তে একটি। ফুল প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সার্টের কলার তুলে পান চিবোতে চিবোতে একটি ছোকরা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে চলেছে—উমাপদ পাত্র—মণীন্দ্রমোহন দে—অঘোরচন্দ্র তালুকদার—

সত্যবাবু কাণ খাড়া করে বসেন। কখন ওই ছোকরার কণ্ঠে ঘোষিত হবে ওঁর নাম। দশটার সময় এসে জমা দিয়েছেন বিল। আর এখন একটা বাজতে চলল। এখনও তিনি চাকরি

হাতে বসে। চাকতিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। আশে-পাশে বসা ক্ষুদ্রলোকদের আলোচনা শোনেন। দেখলেন অনেকেই পরস্পরের পরিচিত। কোথাও চলছে বাজারদরের উর্দ্ধগতির আলোচনা। কোথাও চলেছে আজকালকার ছেলেমেয়েদের অধঃপতনের আলোচনা। রাজনীতি প্রসঙ্গও বাদ নেই। একজনের হাতের বাসি খবরে কাগজখানি তিনখণ্ড হয়ে হাতে হাতে ঘুরছে বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত। সত্যবাবুও একটুকে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার কর্মখালির কলমে চোখ বুলিয়ে নেন। পকেট থেকে নোটবুক বের করে টুকে রেখে নেন দু'একটি সোইবন্ধ নম্বর।

অফিসের সামনে একজন পানওয়ালী বসে বসে পান সাজছে। অফিসের বাবুরা তাকে ঘিরে ভীড় করেছে—সত্যবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। বেশ বিক্রী হচ্ছে তার।

হঠাৎ সেই পাণ্ট-পরা কলার-তোলা ছোকরার কণ্ঠে নিজের নাম শুনে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন তিনি। এককালে খুবই ভাল স্বাস্থ্য ছিল। ব্যায়াম করা শরীর। তাই এখনও মাঝে মাঝে বয়সের কথাটা ভুলে গিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে যান। লাফাতে গিয়ে বাধা পেলেন। উঃ! সেই ব্যথাটা! বোধ হয় বাতই হল শেষে। কোনরকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে দাঁড়ালেন কাউন্টারে। ক্যাশিয়ারের বাহাত্তর টাকা বাইশ পয়সা গোনার ধরণ দেখে হাসি পেল তাঁর। গুণছে তো গুণছেই। কেবলই গুণছে। ভাবলেন, তিনিও তো একই কাজ করে এসেছেন অফিসে এতদিন ধরে। কত আর সময় লাগত তাঁর? সাড়ে বারোটায় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এনে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সমস্ত পেমেন্ট শেষ করে ক্যাশ মিলিয়ে বাড়ী ফিরতেন তিনি। আর ওঁর পেশনের মত্র বাহাত্তর টাকা বাইশ পয়সা গুণতেই ক্যাশিয়ার বাবুর পাঁচ মিনিট লেগে গেল। ধন্যি অফিস বটে!

টাকা গুণে পকেটে রাখলেন সত্যবাবু। ভাবলেন, এতগুলো টাকা নিয়ে ট্রামে যাবেন কিনা! পরে নিজেরই হাসি পেল। মাসের পয়লা তারিখে এর চেয়ে ঢের বেশী টাকা নিয়ে তো তিনি ট্রামে বসেই বাড়ী ফিরতেন। আর আজ মাসের একুশ তারিখে ট্রামে যেতে ওঁর অতো ভয় কিসের?

ট্রাম ষ্টপেজে গিয়ে দাঁড়ালেন। পানের দোকানে রেডিয়োতে বেহালা বাজছে। অনেক লোক ভীড় করেছে। তন্ময় হয়ে শুনছে বেহালা। সত্যবাবুর পঞ্চান্ন বছরের মরা মনটাও কেমন যেন বেচে উঠল। দোকানটার সামনে আরও একটু এগিয়ে দাঁড়ালেন। না তাঁর ভাল লাগল না আজ। সুরটা যেন বড্ড বেসুরো।

• • •

প্যারিসের লুভের মিউজিয়ামের অধ্যক্ষকে একব্যক্তি প্রশ্ন করেন: আপনি ত আর্টের সমুদ্রের মাঝখানে আছেন, কি পেয়েছেন বলুন ত?

অধ্যক্ষ গুম্ হেসে বললেন: মাসকাবারে কয়েক পাত স্যাভন্, —আর্ট আর কিছু দিচ্ছে না আমাকে।

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

একটি অবিশ্বাস্য ক্রিকেট খেলা

বর্তমানে ক্রিকেট খেলার খুব ধুম চলেছে। কিছুদিন আগে একটা দল হৈ-হৈ করে এদেশে এসে খেলে চলে গেল। অন্য দল আসছে। আগামী মাসে আসছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দলবল। এই সময়ে একটি আশ্চর্য ক্রিকেট ম্যাচের গল্প বলা অপ্রাসংগিক হবে না; ঘটনাটি অনেকদিন আগেকার। লিখে গেছেন বিখ্যাত ইংরাজ লেখক আর্থার কোনান ডয়েল। অদ্ভুত কাহিনী।

উনিশ শতকের শেষভাগে ইংলণ্ডের ক্রিকেট জগতে ওয়াল্টার রাউলাস ছিল একটি সর্বজন পরিচিত নাম। অনেক বছর বড় বড় ক্রিকেট খেলে, দলের ক্যাপ্টেনি করে, নির্বাচক সমিতির সভাপতি হয়ে, অনেক নাম কিনে তিনি অবসর নিয়ে মিউ ফরেস্ট-এ তাঁর গ্রামের বাড়িতে সময় যাপন করছিলেন। সেদিন এই কাহিনীর সূচনা সেদিন তিনি রোজকার অভ্যাসমত প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন। ঘন গাছপালা ঘেরা গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর চলা থেমে গেল। খানিকটা দূরে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তাঁর কৌতূহল হওয়াই খুবই। ব্যাপারটা এই :

অদূরে সদ্য এক ফালি মাঠ, তার দু'ধারে খুব উঁচু দুটো ওক গাছ দাঁড়িয়ে। দুটি গাছের মধ্যে হাত কুড়ি তফাৎ। দেখা গেল, এক গাছের মাথা থেকে আর এক গাছের মাথায় একটা দড়ি বাঁধা হয়েছে। অত উঁচুতে ওইভাবে দড়ি খাটানো সহজ কথা নয়। দড়িটা মাটি থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট উঁচু। সেই দড়ির নীচে দু'ধারে সমান ব্যবধানে দুটি উইকেট পোঁতা—ক্রিকেট পিচের দূরত্ব অনুযায়ীই উইকেট দুটি স্থাপিত হয়েছে। একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাউলাস দেখতে লাগলেন, একদিকের উইকেট থেকে একটি ছোকরা বল দিচ্ছে আর তার বিপরীত দিকে আর একটি ছেলে উইকেট রক্ষকের কাজ করছে অর্থাৎ যে বলগুলো শূন্যমার্গ দিয়ে আসছে তাদের লুফে নিচ্ছে। বোলার বল করছে, কিন্তু সাধারণভাবে নয়, সে এক অদ্ভুত বোলিং—হুচারা পা এগিয়ে এসে সে বলটা শূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে—হাত ঘোরানোর ভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন লেগ ব্রেক বল দিচ্ছে—কিন্তু বল তো মাটিতে পড়ছে না, বল সাঁ সাঁ করে মাঝখানে টাঙানো সেই দড়ি ডিঙিয়ে আরও উপরে উঠে যাচ্ছে, তারপর দ্রুতবেগে খাড়া নেমে আসছে, হয় একেবারে উইকেটের মাথায় না হয় তার খুব কাছে। বোঝা গেল, দড়িটা খাটানো হয়েছে বলকে উপরে পাঠাবার সীমানা নির্দেশ করা এবং তার দ্বারা বল দেবার সেই অসাধারণ পদ্ধতিকে নির্ভুল করার জন্যে।

কৌতূহল আর বিস্ময়ের সঙ্গে রাউলাস সেই আজব বোলিং দেখতে লাগলেন। ছোকরা দুটি অনেকগুলি বল জোগাড় করেছে। আশ্চর্য নির্ভুলভাবে বোলার বলের পর বল দিচ্ছে। হু হু করে প্রত্যেকটি বল উপরে উঠে যেন শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, তারপর ঠিকমত সেই দড়ি পার হবার পর নামতে সুরু করছে—নামবার সময় সেই বলের গতিবেগকে রীতিমত কাটি বোলিং-এর পর্যায়ে ফেলা যায়।

অভ্যাসের ফলে বোলারটি বল দেবার দূরত্ব এবং উচ্চতাকে এমনভাবে আয়ত্ত করেছে যে প্রত্যেকটি বল আকাশ থেকে প্রায় সোজাসুজি একেবারে উইকেটের উপর এসে পড়ছে।

কিছুক্ষণ দেখবার পর ডাউগাল ছোকরা দুটির কাছে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁকে দেখে তারা প্রথমটা রীতিমত হকচকিয়ে গেল এবং অপ্রস্তুত হ'ল।

হাসিমুখে ডাউগাল বললেন—তোমাদের নতুন ধরণের বোলিং দেখছিলাম। তারপর যে ছেলেটি বল করছিল তাকে প্রশ্ন করলেন—তুমি বুঝি তোমাদের ক্লাবের বোলার?

মাথা চুলকে ছেলেটি জবাব দিলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে সব সময় বল করতে পাই না। মাঝে মাঝে সুযোগ পাই।

—কোন্ ক্লাব?

—পাশের গ্রামের। ব্রাম্‌লি।

ডাউগাল জিজ্ঞাসা করলেন—যখন সুযোগ পাও তখন কি এই রকম বল দাও?

ছেলেটি মাথা নেড়ে বললে—আজ্ঞে না। এটা আমার একটা নতুন আইডিয়া। নিরিবিলিতে আমার ভাইকে নিয়ে প্রাকটিস করছি।

ডাউগাল বললেন—আমি একজন পুরণো ক্রিকেটার। তাই তোমার নতুন ধরণের আজব বোলিং দেখে আমার কৌতূহল বোধ করা অস্বাভাবিক নয়। কোন খেলায় তোমার এই বোলিং পরীক্ষা করে দেখেছো?

মাথা নেড়ে ছেলেটি বললে—না। আমি আগে অভ্যাস ক'রে ক'রে নিখুঁত হতে চাই। তা, এবার বোধহয় পরীক্ষা করা যেতে পারে—অবশ্য যদি সুযোগ পাই। অনেকদিন ধরেই একটি নতুন ধরণের বোলিং-পদ্ধতির কথা ভাবছি। বক্স বোলার কোয়েট-এর গুগ্‌লির কথা, আগে তো ভাবাই যায়নি যে বল দেবার সময় তার মধ্যে লুকনো প্যাচ থাকতে পারে, তিনিই প্রথম দেখালেন। আমার হার্ট ভাল নয়, হাঁপানির ভাব আছে, কোনদিন ফাষ্ট বোলার হতে পারবো না। তাই নতুন ধরণের বোলিং কি করা যায় সে সম্বন্ধে ভেবে ভেবে এইটি বার করেছি, একে অব্‌ বা ফুলটস্ না বলে বলতে পারেন—ফ্লপার।

বোলার-এর সঙ্গী ছেলেটি এবার এগিয়ে এলো, বললে—জানেন সার, আমার দাদা ক্রিকেটের অনেক বই মুখস্থ করেছে। ও আমাদের গ্রামের স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার, ওর নাম টমাস স্লেডেগ। আপনি বলছিলেন, আপনি একজন পুরণো ক্রিকেটার, আপনার নামটি জানা হয়নি কিন্তু···

—আমার নাম ওয়াল্টার ডাউগাল।

নাম শুনে বোলার স্লেডেগ প্রথমটা চমকে উঠল, তারপর গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালো।

—নামটা জানো বোধ হচ্ছে?

কতকটা আত্মগতভাবে আবেগের সঙ্গে স্লেডেগ যেন মুখস্থ পড়া বলার মতো বললে—ওয়াল্টার ডাউগাল, অক্সফোর্ড ও হ্যাম্পশায়ার। শেষ খেলেছেন ১৯১৩ সালে। সে বছর ব্যাটিংএর গড়পড়তা ২৭'৪ রাণ প্রতি ইনিংসে-এ। বোলিংএ ২৭ উইকেট, গড়ে ১৬ রাণে প্রতি উইকেট!

—আশ্চর্য স্মরণশক্তি তো! বললেন ডাউগাল। তারপর হাসিমুখে যোগ করলেন—কিন্তু ভাই বল স্লেডেগ, কোন বড় খেলায় তোমার এ বল বোধহয় চলবে না। পাকা খেলোয়াড় তোমার প্রত্যেক বলটাই পার ক'রে দেবে। আচ্ছা, বলতো, ফিল্ড সাজাবে কী ভাবে?

স্পেডেণ্ড উত্তর দিলে—মাত্র একজন থাকবে ডান দিকে, বাকি সব ব্যাটস্‌ম্যানের ধারে, তিনজন বাউণ্ডারীর ধারে একজন মিড অন-এ, দুজন কোয়ার লেগ-এ, একজন ফাইন লেগ-এ আর একজন কখনো একটু বেশী বাঁদিকে কখনো বা কোয়ারের কাছে, অর্থাৎ ব্যাটসম্যানকে জানতে দেওয়া হবে না সে কখন ঠিক কোন্ জায়গায় আছে।

স্কাউগাল-এর মুখ গম্ভীর হল। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা, দেখি বল দাও তো। এই ব'লে হাতের লাঠিটাকে ব্যাটের মতো ধরে এগিয়ে গিয়ে উইকেটের সামনে দাঁড়ালেন।

স্পেডেণ্ড বল দিতে আরম্ভ করল। অব্যর্থ তার কায়দা, নিভুল ভঙ্গী। বল প্রথমে উপরের দিকে উঠে গেল, দড়ি পার হল, তারপর নামতে লাগল সোজা একেবারে উইকেটের মাথায়। নামবার সময় কী প্রবল তার গতি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কাউগাল ভাবতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পরে স্পেডেণ্ডকে কাছে ডেকে বললেন—আসছে রবিবার সার জর্জ সান্‌ডারসনের বাগানবাড়িতে সান্‌ডারসন একাদশের সঙ্গে স্ত্রী কয়েটার-এর একটি প্রীতি-ক্রিকেট খেলা হবে। তুমি সার জর্জের দলে বল করবে দেখতে চাই, তোমার এই ছুপারের কী হাল হয়।

স্পেডেণ্ডর দুই চোখ বিস্ফারিত হল, এত বড় দলের হয়ে খেলা! বললে—আপনার হুকুম তামিল করব। কিন্তু সার, ছুটি পাবো না বোধ হয়। হেডমাষ্টার বড় কড়া লোক।

ওয়াল্টার স্কাউগালের মাথায় যেন ভূত চেপেছে। হেডমাষ্টার তাঁর পরিচিত। ছুটীর ব্যবস্থা করে দিলেন। সার জর্জের দলে তাকে মনোনীত করালেন। তারপর খেলার দিন সকলের আগে মাঠে হাজির হলেন।

নিভুল হল স্পেডেণ্ডর সেই অদৃষ্টপূর্ব বোলিং। বিপক্ষ দলের নাম করা ব্যাটস্‌ম্যানরা সেই আকাশ থেকে পড়া বলগুলো প্রতিহত করতে পারল না। বাগানবাড়ির মধ্যে অল্পসংখ্যক দর্শক আর দুপক্ষের খেলোয়াড়—সবাই সেই রহস্যময় বোলিং-এর মারাত্মক ফলাফল দেখে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। এ কী ভুতুড়ে বোলিং রে বাবা! খেলার শেষে স্কাউগাল সকলকে শপথ করিয়ে নিলেন এই বোলিং-এর কথা যেন এখন ফাঁস না হয়!

তারপর তিনি গেলেন স্পেডেণ্ডর হেডমাষ্টারের কাছে। ঘটনা শুনে তিনি বললেন—বেশ মজার ব্যাপার! কী বলেন?

—ঠিক মজার ব্যাপার মনে করছি না। ভাবছি একটা চরম পরীক্ষা করব।

নিম্নস্বরে স্কাউগাল তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। শুনে, বিস্ময়বিমূঢ় প্রধান শিক্ষক বলে উঠলেন—আপনি পাগল হয়েছেন! দু'তিন সাতের খেলায় হয়ত চলে, কিন্তু···

—ভুলে যাবেন না মাষ্টার মশায় বিপক্ষ দলে দু'জন টেষ্ট খেলোয়াড় ছিল। সেযাই থাক না। আর একটা ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা হবে। তাহলে ওর ছুটি মঞ্জুর তো?

—আপনি যখন বলছেন তখন আর 'না' বলি কি করে!

পরদিন সকালে নার্ভাস দন্তুর স্পেডেণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে স্কাউগাল লণ্ডন রওনা হলেন।

• • •

সারা ইংলণ্ডে তখন আর অন্য কোন কথা নেই। আগামী সপ্তাহে লর্ডস মাঠে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট ম্যাচ। সকলের মুখেই সেই কথা। এই সিরিজে ইংলণ্ডের মাটীতে দু'বার অষ্ট্রেলিয়া জিতেছে। দুবার ইংলণ্ড। সুতরাং এই শেষ খেলার উপর সমগ্র জাতির মান ইজ্জত যেন নির্ভর করছে। আশেজ আছে অষ্ট্রেলিয়ার দখলে। এবারও কি তাই থাকবে? ইংলণ্ডের লোক হাত কামড়াচ্ছে, মাথার চুল ছিঁড়ছে, রাজনীতি, ব্যবসাকর্ম, নূতন ট্যাক্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—সবকিছু শিকেয় উঠেছে। কাল পরশুর মধ্যেই পঞ্চম টেষ্টের মনোনীত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হবে।

সেই সম্বন্ধেই জল্পনা কল্পনা চলছে। এ বছরের প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড অল্পের জন্য দুবার জিতেছে। হেরেছে গোহারণ। ইংলণ্ড দলে বোলারের বড় অভাব। এবার আবার মাত্র পাঁচদিন নয়—কলাকল সমান সমান বলে, এ খেলার দুপক্ষের পুরো দুই ইনিংস শেষ হওয়া চাই, তাহলে আর ড্র হবার সম্ভাবনা থাকবে না। অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাটস্‌ম্যানেরা দরকার হলে এমন মাটি কামড়ে খেলে যে তাদের আউট করা দুঃসাধ্য। কোথায় সেই নূতন বোলার, যে মাথা খাটিয়ে এমন বল দেবে যার গতি বা স্পিন, অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের ব্যূহ ভেদ করবে? নির্বাচন সমিতির তিনজন সদস্য, মার কেমস গিলপিন, মিঃ টার্ডিং এবং ডাঃ গ্রেপার ঠিক এই ভাবনাতেই রাতের পর রাত জেগে কাটাচ্ছেন; যেন তাঁদের তিন জনের উপরেই ঝুলে আছে সারা দেশের সম্মান, তামাম দেশের লোক যেন তাঁদের দিকেই তাকিয়ে আছে। আজকালের মধ্যেই তাঁদের নির্বাচন কর্ম শেষ করে দলের নাম ঘোষণা করতে হবে।

সেদিন অপরাহ্ণ বেলায় তাঁরা তিনজনে যখারীতি কমিটি ঘরে বসে সম্ভাব্য তালিকা নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। চাই নতুন রক্ত, নতুন আইডিয়া, নতুন বোলার। কিন্তু পাওয়া যায় কোথায়?

এমন সময় হুতোর মসমস্ আওয়াজ তুলে ঘরে ঢুকলেন ওয়ালটার স্কাউগাল। আসুন, আসুন। এসো এসো। হঠাৎ গ্রামের বাড়ি ছেড়ে এখানে? নানা প্রশ্ন।

—তোমাদের জন্যে ভেট এনেছি।

ভেট! কী ভেট? বোলার। টেষ্টম্যাচে খেলবার জন্যে! বলেন কি! হ্যাঁ। ঠিক তাই। স্কাউগাল জানালেন, নতুন বোলার। আশ্চর্য আবিষ্কার। না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। তারপর ব্যাপারটা খুলে বললেন। শুনে, সদস্যত্রয়ের মুখে অবিশ্বাসের হাসি দেখা দিল। এ হয় না। এরকম নির্বাচন দেশের লোক কী চোখে দেখবে—হঠাৎ একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে একেবারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টেষ্টম্যাচে!! কিন্তু পরীক্ষা করতে দোষই বা কি! মত দিলেন একজন সভ্য। তাহলে একটা ট্রায়ালের ব্যবস্থা হোক না কেন! স্কাউগালকে প্রশ্ন করে জানা গেল, সেই নতুন বোলার তাঁর সঙ্গেই এসেছে এবং কাছাকাছি একটা হোটেলে আছে, ইচ্ছা করলে তাকে পনেরো মিনিটের মধ্যে এখানে আনানো যায়। আনানো হোক তাহলে। সভ্যরা তার সঙ্গে কথা বলে দেখতে চান। বেশ কথা। স্কাউগাল তাঁর গাড়ি পাঠালেন। এবং তারপর মিনিট পনেরোর মধ্যেই তিনজন বাঘা বাঘা ক্রিকেট পাণ্ডার সামনে এসে দাঁড়াল, কলাবিত দেহ, নার্ভাস, ভয় ভয়দৃষ্টি এক গ্রাম্য যুবক।

তাকে দেখে তাঁরা তো অবাক। এই নির্বোধ, নিষ্প্রভ বোলার ইংলণ্ডের মান বাঁচাবে?

হা হতোস্মি! দু'চার কথার পর তাঁরা তাঁকে পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর সুরু হল চারজনের মধ্যে তুমুল আলোচনা। অবশেষে স্থির হল, পরদিন ভোরে লর্ডস-এর পাঁচীল ঘেরা প্র্যাকটিস পিচ-এ একটি পরীক্ষামূলক খেলা হবে। এই খেলায়, নির্বাচিত হবেই এমন চার পাঁচজন ব্যাটস্‌ম্যানকে ডেকে আনা হবে, বল কুড়োবার ছোকরা থাকবে অন্তত দশবারোজন। স্পেডেও বল করবে এক নাগাড়ে এক ঘণ্টা। স্বচক্ষে তাঁরা দেখবেন, কী রকম সেই বোলিং।

যথাসময়ে ট্রায়াল খেলা সুরু হল। নির্বাচকমণ্ডলী অবাক বিস্ময়ে স্পেডেগুর সেই ভৈরব বোলিং প্রত্যক্ষ করলেন। ধুরন্ধর ব্যাটসম্যান ক'জন তো বিমূঢ়, বজ্রাহত। আকাশ ফুঁড়ে যে বল নিম্নমুখী হাউই-এর মতো উইকেটের মাথায় নামছে তাকে প্রতিরোধ করবার কৌশল তো তাঁরা কোনদিন শেখেননি, এ কী অপ্রতিরোধ্য বোলিং।

ট্রায়াল শেষ হল। সকলের চোখেমুখে চূড়ান্তভাব। ব্যাটস্‌ম্যান ক'জনকে বলে দেওয়া হল, স্পেডেগু এবং তার এই বোলিং সম্বন্ধে তাঁরা যেন কারুর কাছে মুখ না খোলেন।

পরদিন সকালে পরের টেষ্টম্যাচে ইংলণ্ড দলের খেলোয়াড়দের নাম প্রকাশিত হল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে গুঞ্জন উঠল···তালিকার প্রথম দশজনের নাম অপ্রত্যাশিত নয়, কাট বোলার চ্যাপেল আর জোন্স, ব্যাটা স্লিনার উইডমে, ব্যাটসম্যান পিটার, বয়ের, জ্যাকসন উইলসন আর গ্রিভ—এরা সে বছরের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, তারপর দু'জন চৌকস্ খেলোয়াড় হ্যামণ্ডলেগ আর গার্ডন—এরা দু'জনও খুব ভাল। কিন্তু এ কে? একাদশ খেলোয়াড় টমাস স্পেডেগু? এর নাম তো কেউ কখনো শোনে নি? এই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কোথা থেকে উড়ে এসে একেবারে টেষ্ট দলে জুড়ে বসল? চতুর্দিকে হৈ-হৈ পড়ে গেল। ফ্লীট ষ্ট্রীট নীরব। এই নতুন খেলোয়াড় সম্বন্ধে কেউ কিছু জানেনা—খবরের কাগজের সংবাদদাতা বিশেষ প্রতিনিধিও কোন খবর দিতে পারেননি। আশ্চর্য কথা। ফলে, নানারকম আজব গুজব শোনা যেতে লাগল: "টমাস স্পেডেগু হচ্ছে হুমনায়ে এক অতি বিখ্যাত খেলোয়াড়।" "টমাস স্পেডেগু হচ্ছে জামাইকার অধিবাসী, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, লাল রঙের পাৎলুন পরে ইনি মাঠে নামবেন।" "জানা গেছে টমাস স্পেডেগু মালয় দ্বীপে জীবনযাপন করেন। গত বছর বেসুনে এক ক্রিকেট ম্যাচে ইনি বিস্ময়কর দক্ষতা দেখিয়েছিলেন; প্রকাশ ইনি খালি গায়ে ল্যাঙট পরে খেলেন এবং পা দিয়েও বল লুফতে পারেন।" ইত্যাদি।

নির্বাচন সমিতিও রেহাই পেলনা। দেশে এত ভাল খেলোয়াড় থাকতে হঠাৎ এরকম একজন অজানা অনামা ব্যক্তিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টেষ্ট খেলায় নির্বাচন করা হল কোন্ সাহসে বা কোন্ বুদ্ধিতে? দেখা যাচ্ছে, তিনজন পাগল দেশের মুখে চুনকালি মাখালেন। ইত্যাদি।

তারপর। ফ্লীট ষ্ট্রীটের কাছে পার নেই। খবর তারা শেষপর্যন্ত ঠিকই সংগ্রহ করল। স্পেডেগুর কুলুজি কাগজে বেরুলো। তা পড়ে সকলে আর একদফা অবাক। গ্রামের মাঠে খেলে, বোলার, তা-ও বি টিমে খেলে, তার উপর আবার ছোকরার হাঁপানি আছে। এইরকম একজন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বোলারকে টেষ্টম্যাচে! ছি ছি ছি ছি!

রেলময় বিক্ষোভের ঝড় বয়ে গেল। তিনজন নির্বাচকের মুখ শুকিয়ে আমসি। সত্যিই কাজটা খুবই গর্হিত হয়েছে। মুখ দেখাবার জো থাকবেনা আর।

• • •

টেষ্টম্যাচের সকাল। মাঠে তিল ধারণের স্থান নেই। ইংলণ্ড টসে জিতে ব্যাট করতে নামল। পিচ-এর অবস্থা খুবই ভাল। ফলে অষ্ট্রেলিয়ার বৈতাকার কাঁটে বোলার কটস্‌কুর সুবিধা করতে পারলেন না। দিনের শেষে তাঁর পড়পড়তা দাঁড়ালো ১৮২ রাণে ৩ উইকেট। গুডলি বোলার ইর ২০ রাণে ৪টি উইকেট পেলেন। কেড্‌ নিলেন ২টি। ইংলণ্ডের অধিনায়ক মরের ৭৩ রাণ করে রাণ আউট হলেন। সিটার, গ্রিভ, হ্যামণ্ডরেল যথাক্রমে ৬৪, ৫৭ ও ৫১ রাণ করলেন। একজন বাদে বাকি সকলেই ১০ রাণের উপর। শেষ খেলোয়াড় টমাস স্লেডেণ্ড প্রথম বলেই আউট। সে বেচারা খেলবে কি, ব্যাট হাতে মাঠে নামল যেন বলির পাঁঠা, যে বলে সে আউট হল সে বলটি সে দেখতেও পায়নি। যাই হোক দিনের শেষে সবাই আউট হয়ে রাণ দাঁড়াল ৪৩২। রীতিমতো দ্রুতবেগে রাণ তোলা।

পরদিন। এবার অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাট করবার পালা। মাঠে চল্লিশ হাজার দর্শক উত্তেজনায় উদ্বেল। ইংলণ্ড দল ফিল্ড করতে নামল। চারদিকে হাততালি। তারপর মাঠে এলেন দু'জন অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাটস্‌ম্যান, বিখ্যাত ভিক্‌টোরিয়ান মরল্যাণ্ড, যাঁকে তখনকার দিনের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ম্যানরূপে গণ্য করা হত, আর তাঁর জুটি ডোনাল্ড, মাটি কামড়ে খেলায় যাঁর জুড়ি নেই, সারা দিন খেলে তিনি ২৫ রাণ করেন, বোলারদের মেজাজ খারাপ করে দিতে তিনি পয়লা নম্বরের ওস্তাদ।

ফিল্ড সাজান হল। বল আরম্ভ করলেন ইয়র্কশায়ারের চ্যাম্পেন, কামানের গোলার মত যাঁর বলের গতি, যাঁর বাম্পারে অনেক বড় বড় ব্যাটসম্যান কাৎ হয়েছে। পর পর দু'টি বল দিলেন। কোন রাণ হল না।

দ্বিতীয় ওভার। ক্যাপটেন মরের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী স্লেডেণ্ডর হাতে বল তুলে দিলেন। লর্ডস মাঠের সেই গুপ্ত ট্রায়াল খেলায় মরের যোগ দিয়েছিলেন, দেখেছিলেন সেই অলৌকিক বোলিং।

মরের স্লেডেণ্ডর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ফিল্ড সাজাতে হবে। কিন্তু স্লেডেণ্ডর অবস্থা তখন বর্ণনাতীত। লর্ডস এর মাঠ। চল্লিশ হাজার দর্শক। সে যেন এক ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখছে। তার পা কাঁপছে। বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম শব্দ। কোন মতে যখন ফিল্ড সাজানো হ'ল তখন মাঠের সেই চল্লিশ হাজার দর্শকের আশী হাজার চোখ যেন কপালে উঠল। ব্যাটস্‌ম্যান দুজনও অবাক। একী ফিল্ড। অফ্‌-এ মাত্র একজন, কভারের ধারে লিলি করছে। উইকেটকিপার আর বোলার বাদ বাকি আটজন ব্যাটসম্যানের বাঁদিকে যেন জটলা পাকাচ্ছে। শেষ-স্লিপ্‌-এ জন দুই, স্কোয়ার লেগে তিনজন, বাউণ্ডারীর কাছে আর তিনজন।

নির্বাচক তিনজন তাঁদের নির্দিষ্ট চেয়ার জায়গায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। চারদিকে বিস্ময়-মেশানো প্রগাঢ় স্তব্ধতা। স্লেডেণ্ড ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে প্রথম বল নিক্ষেপ করল। অতি সাধারণ মোলায়েম। অন্যসময় হলে মরল্যাণ্ড সহজেই তাকে চারের বাড়ি দিতে পারতেন। কিন্তু নতুন ধরণের রহস্যময় ফিল্ড সাজানো দেখে তিনি কিছু বিমূঢ় বোধ করছিলেন, তাই প্রথম বলটি ঠেকিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন।

দ্বিতীয় বল। একই ধরণের। ক্যাপটেন মরের মনে মনে অসহিষ্ণু বোধ করছেন। কোথায় সেই অদ্ভুত আকাশে-ওঠা বল? কিন্তু যে বল করবে তার স্নায়ু তখন অবশ, মাথা গুলিয়ে সে তখন বিপর্যস্ত, সেই 'ঘিতিকিজিরি' বল ছোঁড়ার সাহস সে হারিয়েছে, ভুলে গেছে হাতের কসরৎ, বল

নিক্ষেপের দূরত্ববোধ আর মাপ। তাই সে নিজের মনে আলোচনা করে সাধারণ ফুলটস দিতে লাগল। তৃতীয় বল ডান দিক ঘেঁসে এলো। আর যায় কোথায়। মরল্যাণ্ড আর বিচলিত হলেন না। বিদ্যুৎবেগে বল চলে গেল কভারের পাশ দিয়ে মাঠের সীমানা পেরিয়ে। পরের লোয়া বলটি বাঁদিকের ভীড়ের মাথার উপর দিয়ে পাঠালেন প্যাভেলিয়ানের ছাদে। চারদিকে তুমুল হাততালি। এরকম দুরন্ত ছক্কা মার দেখে কার না আনন্দ হয়! স্কোর বোর্ডে দেখা গেল পাঁচ বলে চৌদ্দ রাণ।

স্পেডেণ্ডর ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে। চোখে বোধ হয় জল দেখা দিয়েছে। মনে মনে বলছে, হে ধরণী দ্বিধা হও, দ্বিধা হও। মনের তার কাছে গিয়ে উৎসাহ দিয়ে বললেন—ভয় পেওনা, ঘাবড়িওনা, সেদিনকার মত বল দাও।

কিন্তু স্পেডেণ্ড তখন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। বনের নিভৃত প্রান্তে সেই দুটি ওক্ গাছের মাথায় বাঁধা ঘড়ির উচ্চতা, উর্দ্ধগামী সেই অদ্ভুত বলের গতি, সবই যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। নিরাশায় অবসন্ন স্পেডেণ্ড কোনমতে ওভার শেষ করবার জন্যে পরের বল ছুঁড়ল। সজোরে উপর দিকে। সেই বল দেখে চারিদিকে হাসির তুফান। বল পঞ্চাশ ষাট ফুট উপরে উঠল বটে কিন্তু চলে গেল উইকেট ছাড়িয়ে দূরে। উইকেট রক্ষক পিছন দিকে ছুটে গিয়ে বলটি লুফে নিল। আম্পায়ার দুহাত প্রসারিত করে জানালেন—ওয়াইড্ বল।

সারা মাঠ স্পেডেণ্ডর চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। মনের মধ্যে হতাশার হাহাকার। এই খেলায় তাকে বোধ হয় আর বল করতে হবে না। সব শেষ। যাক শেষই যখন তখন শেষ বলটা দেওয়া যাক।

অনেক সময় দেখা গেছে, নিরাশার শেষপ্রান্তে পৌঁছে ডুবন্ত মানুষ অসাধ্যসাধন করে ফেলেছে। স্পেডেণ্ড শেষ চেষ্টায় তার সেই আজব বল ছুড়ল। বল উঠতে লাগল উপর থেকে তারও উপর দিকে। দর্শকের দল হেসে লুটোপুটি। যারা ফিল্ড করছিল তারাও। এমন কি আম্পায়ার দু'জনও হাসতে লাগল।

উপর থেকে বল নেমে আসতে লাগল উইকেটের মাথায়। মরল্যাণ্ড ত্বরিতপদে পিছিয়ে গেলেন, তারপর বলটাকে উইকেট রক্ষকের মাথার পাশ দিয়ে মাঠের সীমানা পার করে দিলেন।

চারদিকে সে কী হৈ-চৈ। এমন তাজ্জব বল করা কে কবে দেখেছে……তার পর হঠাৎ হাসির রোল থেমে গেল। দেখা গেল, মরল্যাণ্ড প্যাভেলিয়ানের দিকে চলে যাচ্ছেন। কী ব্যাপার? না, পিছু হটে সেই অদ্ভুত বল মারতে গিয়ে মরল্যাণ্ড তাঁর উইকেট মাড়িয়ে ফেলেছেন। অতএব আউট। স্কোর-বোর্ডে দেখা গেল, মোট রাণ ১৫, উইকেট ১, শেষ খেলোয়াড় ১৪ রাণ। মনের এগিয়ে গিয়ে বোলারকে বাহবা দিলেন। দর্শকদের মধ্যেও হাততালি পড়ল।

পরের ওভারে চ্যাম্বেল পরপর পাঁচটি গোলা ছাড়লেন। তারপর তাঁর শেষ বলে আবার এক আশ্চর্য ব্যাপার। স্পেডেণ্ড স্লিপ্-এ দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ দেখল একটা লাল ফুল কি তার দিকে ছুটে আসছে। স্পেডেণ্ড ঝুঁকে পড়ে দু'হাত বাড়াল, তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। তার দুহাত উর্দ্ধে উত্থিত, মুঠোর মধ্যে ধরা বলটিকে কিন্তু সে ছাড়েনি।

চারদিকে তুমুল হাততালি আর হর্ষধ্বনি। ক্যাপটেন মনের ছুটে গিয়ে সজোরে স্পেডেণ্ডর পিঠ চাপড়ে দিলেন। ছটো উইকেট পড়ে গেল। আবার স্পেডেণ্ডর বল করবার পালা এলো।

এবার সে যেন এক অন্য মানুষ। নার্ভাস অবস্থা কেটে গেছে, মনে জোর পেয়েছে, বলের কায়দা, দূরত্ব বোধ, সব তার মাথায় ফিরে এসেছে। এবার সে নির্ধাৎ, নির্ভুল। প্রত্যেক বল একই ভাবে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে, একইভাবে বিদ্যুৎবেগে সোজা নামছে একেবারে উইকেটের মাথায়।

অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানরা চোখে সরষেফুল দেখতে লাগল। তারা প্রচণ্ড জোর বলেও স্বচ্ছন্দে খেলে, গুগলি, স্পিন্, কিছুতেই তারা ঘাবড়ায় না। কিন্তু এ কী বল? মাটির সঙ্গে এ বলের সম্পর্ক নেই, আকাশে উঠে যায়, আর আকাশ থেকে নামে একেবারে উইকেটের মাথায়। মরল্যাণ্ডের পর এলেন ব্যাটেন, সজোরে হাঁকড়াতে গিয়ে বোল্ড আউট হলেন। ষ্টেকার কাট্ মারতে গিয়ে নিজের ব্যাট দিয়ে নিজের উইকেট উৎপাটিত করলেন। এদিকে কাট্ বোলার চ্যালেন পঞ্চম ব্যাটসম্যানের লেগষ্টাম্প ছিটকে দিলেন। ৩১ রানেই উইকেট পড়ে গেল।

তার পরের ওভারে স্পেডেস্তর পরপর দু'বলে বোলর্ড এবং হোয়াইটল আউট হলেন, একজন ঠেকাতে গিয়ে উইকেট রক্ষকের হাতে ক্যাচ দিলেন, অপরজন ধরা দিলেন স্কোয়ার লেগ-এর হাতে। মুন ও কাটার কোনমতে কিছুক্ষণ রুখলেন। বিশ রাণ যোগ হল। তারপর দুজনেই স্পেডেস্তর বলে কট আউট। ৭৪ রানে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস খতম।

এতক্ষণ ধরে মাঠের মধ্যে অট্টহাস্য আর হর্ষধ্বনির ঝড় বইছিল। খেলোয়াড়রা সবাই যখন প্যাভেলিয়নে ফিরে গেল তখন দর্শকরা যেন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেল। একী অভাবিত ব্যাপার তারা দেখল! একী অদৃষ্টপূর্ব বল দেবার রীতি। খেলোয়াড়রাও যেন কেমন বিমূঢ় বোধ করতে লাগল, ইংরাজরা যেন কিছু অপ্রতিভ, অষ্ট্রেলিয়ানরা বিস্ময়ে যেন হতচেতন, কিছু বা আপত্তির ভাব তাদের চোখে মুখে। স্পেডেস্তর বোলিংএর ফলাফল দেখা গেল ৩১ রানে ৭ উইকেট।

সকলের মনে প্রশ্ন জাগল অষ্ট্রেলিয়ানদের ফলো-অনে দ্বিতীয় ইনিংসেও এই অলৌকিক ব্যাপার পুনরায় সংঘটিত হবে কিনা।—মিনিট দশকের মধ্যেই অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম জুটি মরল্যাণ্ড আর ডোনাল্ড আবার মাঠে নামলেন। কিন্তু দেখা গেল, স্পেডেস্তকে ঠেকানো তাঁদের সাধ্যাতীত। ডোনাল্ড ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাটি কামড়ে খেলতে পারেন। কিন্তু যে বল মাটি থেকে আসে না, উর্দ্ধে উঠে আকাশে মিলিয়ে যায় তারপর খাড়া উইকেটের মাথায় নেমে আসে তাকে প্রতিরোধ করার কায়দা তো তাঁর জানা নেই। উইকেট বাঁচাতে গিয়ে পড়ন্ত বলের উপর ব্যাট পেতে দিলেন, ফলে বলটি ব্যাটের উপর পড়ে তিন হাত লাফিয়ে উঠল আর উইকেট কীপার হাত বাড়িয়ে তাকে টপ করে লুফে নিল। শূণ্য রাণে প্রথম উইকেট গেল। ব্যাটেন ও ষ্টেকার দুজনেই মরিয়া হয়ে হাঁকড়াতে গেলেন, এবং দুজনেই লেগ-এর দিকে কট আউট হলেন। দুর্ধর্ষ ব্যাটসম্যান মরল্যাণ্ড তখন এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে খেলতে লাগলেন, উল্টো মুখে দাঁড়িয়ে পড়ন্ত বল উইকেট রক্ষকের মাথার উপর দিয়ে মারতে লাগলেন। যেমন অলৌকিক ধরণের বোলিং তেমনি আজব ধরণের ব্যাটিং। হোয়াইটল আর মরল্যাণ্ড দুজনের জুটিতে পঞ্চম উইকেটে নব্বুই রাণ যোগ হল। তারপর ষ্টানওয়েল-এর বলে হোয়াইটল বোল্ড আউট হলেন। তখন রাণ উঠেছে ১৩০।

হোয়াইটল-র পর আর কেউই বেশীক্ষণ টিকতে পারলেন না। যে বল সামনা সামনি মাটি ঘেঁসে আসেনা—আকাশ থেকে সোজা পড়ে উইকেটের মাথায় সে বল খেলা কোন ব্যাটসম্যানের পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব নয়। একমাত্র মরল্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত রইলেন নট আউট ৭৭। দ্বিতীয় দিনে

খেলার সময় শেষ হবার আগেই অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিস ১৭০ রাণে শেষ হল। স্পেডেণ্ডর বোলিং-এর গড়—৮১ রাণে ৮ উইকেট। ইংলণ্ড ১ ইনিংসে ও ১৮৮ রাণে অয়লাভ করল।

মাঠের মধ্যে সে কি হুর্ধ্বনি আর কলনিনাদ। দেখা গেল মানুষের কাঁধে চড়ে স্পেডেণ্ড চলেছে প্যাভেলিয়নের দিকে। প্যাভেলিয়নের সামনে জনারণ্য। ইংলণ্ডের ক্যাপটেন জনতাকে অভিবাদন করে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর এলেন অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ব্যাটেন। বললেন, "আমরা হেরেছি। কিন্তু এখনো ঠিক বুঝতে পারছিনা, এটা কি হল। আমাদের দেশে এরকম বোলিং-এর রেওয়াজ নেই।"

এই ম্যাচের পর স্পেডেণ্ড আর ক্রিকেট খেলেনি, এমনেই তার হার্ট ছিল দুর্বল, তার ওপর এই খেলায় উত্তেজনায় তা আরও অথর্ব ও দুর্বল হয়ে পড়ল, ফলে ডাক্তারের আদেশে তাকে ক্রিকেট খেলা জন্মের মত ছেড়ে দিতে হল।

এই খেলা নিয়ে কাগজে কাগজে কিছুদিন ধরে সে কি কলমবাজী; অষ্ট্রেলিয়ার কাগজে প্রথমে খুব কড়া কড়া কথা লেখা হল। এরকম ছুচুড়ে বোলিং বৈধ নয়—এরকম বোলারকে খেলানো খেলোয়াড়-জনোচিত মনোভাবের পরিচয় নয়, ইত্যাদি। ইংলণ্ডের কাগজের সুর নরম। ব্যাপারটাকে তারা কৌতুককর বলে ধার্য করে সেইমত লিখলে। শেষ পর্যন্ত সবাই একবাক্যে স্বীকার করলে, ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এমন 'অলৌকিক তামাসা' আর কখনো সংঘটিত হয়নি।

* * *

হলিউডে ষ্টুডিওর কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরছিলেন চিত্র পরিচালক ভিকি ক্লিন্স মনে তাঁর নৈরাশ্যের মেঘ,—ছবিটার উপযুক্ত নায়িকা ত পাওয়া যায়নি,—কাজ চালিয়ে নেবার মত নায়িকা অবশ্য পেয়েছেন তিনি, কিন্তু ওতে মন উঠছেনা তাঁর। পথের পাশে একটা ক্লাব। অত রাত্রেও সেখানে হৈ হুল্লোড়।

ভিকি ঢুকে গেলেন ক্লাবে। তখন ষ্টেজে নাচ চলছিল আর দর্শকদের মধ্যে বিয়ার পরিবেশন করছিলেন একজন তরুণী।

ভিকি লক্ষ্য করছিলেন তরুণীকে। একটা দৃশ্যে কতকটা এই রকম সুটিং আছে তাঁর সেখানে বিয়ার শুদ্ধ ট্রে উলটে দেবে নায়ক।

তরুণী কাছে আসতেই ভিকি আচমকা মারল তাকে এক ধাক্কা। ট্রে উল্টে গেল আর তরুণীও মারল তাকে কষে এক চড়।

—পেয়েছি—পেয়েছি চেঁচিয়ে উঠলেন ভিকি। আর মোটা টাকায় চুক্তি করলেন সেই তরুণী মারলিন ডিট্রিচ এর সঙ্গে।

বীরবলের কৌতুক

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একদিন বাদশা আকবরের কি খেয়াল হল, বীরবলকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—দেখ বীরবল, তুমি অনেক বুদ্ধির কসরৎ দেখিয়েছো। কিন্তু তাতে আমার মন সম্পূর্ণ খুসী হয়নি।

বীরবল বুঝলেন, আজ সম্রাটের কথার ধরণ বাঁকা। তিনি যেন কিছু প্যাচোয়া কথা বলবার জন্যেই ভণিতা করছেন।

কণেক নীরব থেকে বীরবল বললেন—জাঁহাপনা, আমি সামান্য লোক। সামান্য আমার বুদ্ধি। তাই দিয়ে সম্রাটকে খুসী করবার চেষ্টা করি।

বাদশা বললেন—তা সে যাই হোক। এবার তোমার কাছ থেকে আমরা কিছু অদ্ভুত আশ্চর্য বুদ্ধির খেলা দেখতে চাই।

বীরবল বললেন—আমি তো বাজীকরের খেলোয়াড় নই জনাব যে অদ্ভুত খেলা দেখাতে পারব।

কোন কথা শুনতে চাই না। তোমাকে অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য কিছু কাণ্ড করে দেখাতে হবে। প্রমাণ করতে হবে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব।

বীরবল দেখলেন, সম্রাট নাছোড়-বান্দা। বললেন—সম্রাটের হুকুম আমাকে তামিল করতেই হবে। কিন্তু আমার সর্ত আছে।

কী সর্ত?

বীরবল বললেন—সেই অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য কাজ দেখে কিন্তু আমায় অপরাধী করতে পারবেন না। আমায় কোন শাস্তি দিতে পারবেন না।

বেশ। তাই হবে। যদি প্রমাণিত হয় যে তুমি যে কাজ করেছো তা সত্যিই অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য, তাহলে তোমার সাতখুন মাপ।

বীরবল বললেন—সেকাজ করতে অনেক সময় লাগবে। আর অনেক টাকারও দরকার হবে।

বাদশা বললেন—বেশ, যত ইচ্ছে টাকা আর সময় নাও। কিন্তু আর দেরী কোরো না। কাজ আরম্ভ কর।

বীরবল বললেন—সম্রাট! আমার তিন লক্ষ টাকা চাই। আর সময় চাই ছ' মাসের।

টাকাটা বেশি নয়। কিন্তু সময়টা বড় বেশি। বেশ। তাই হবে। নিয়ে যাও টাকা খাজাঞ্চির কাছ থেকে।

বীরবল তিন লাখ টাকা নিয়ে বাড়ী এলেন। মাথার মধ্যে এক অদ্ভুত পরিকল্পনা। গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ভাবছেন যদি পরিকল্পনা কার্যকরী নাহয় তাহলে তো তিনি গেলেন।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ সম্রাটের খেয়াল হল, বীরবলকে তো অনেকদিন দরবারে দেখা যায় নি।

বললেন—বীরবল পেটের খবর কেউ জানেন।

একজন সভাসদ বললেন—জনাব। খবর পেয়েছি তিনি খুব অসুস্থ। শয্যাশায়ী।

অসুস্থ! শয্যাশায়ী। তাহলে আমাদের তো তাঁকে দেখে আসা দরকার।

দরবার শেষ করেই বাদশা সপারিষদ বীরবলের গৃহে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, সত্যিই বীরবল খুব অসুস্থ। বাড়ীর মধ্যে যেন বিষাদের ছায়া।

বীরবলের শয্যা পার্শ্বে গিয়ে বাদশা শুধোলেন—কেমন আছ বীরবল?

ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁচি করে বীরবল বললেন—ভাল না সম্রাট। আর বোধ হয় বাঁচবো না।

কী বাজে কথা বলছ। শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবে। আমায় কেউ খবর দেয় নি কেন? যাই হোক, আমি আমার হেকিমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার ওষুধ খেলেই তুমি ভাল হয়ে যাবে।

আর ভাল! বীরবল কাতরাতে লাগলেন—এবার যাই। এদের দেখবেন জনাব। আমি আর বাঁচবো না।

সম্রাট আর এক দণ্ড বীরবলকে সান্ত্বনা আর সান্ত্বনা দিয়ে চলে এলেন। বীরবলের অবস্থা দেখে তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

পরদিনই সম্রাট খবর পেলেন, বীরবল কাল রাত্রেই মারা গেছেন এবং আত্মীয়বর্গ তাঁর সৎকার করে সকাল বেলা শ্মশান থেকে ফিরেছে।

সম্রাট শোকাতুর চিত্তে এক মন্ত্রীকে দিয়ে বীরবলের পরিবারবর্গকে বলে পাঠালেন, তারা যেন টাকার জন্যে চিন্তা না করে, তাদের যত টাকার প্রয়োজন সম্রাট তা দেবেন।

নির্ধারিত দিনে ঘটা করেই বীরবলের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হল। সেই উপলক্ষে চার পাঁচহাজার দরিদ্র-নারায়ণ ভূরিভোজে আপ্যায়িত হ'ল।

তারপর দিন যায়। দিন আসে।

বিষণ্ণ মনে সম্রাট মাঝে মাঝে বীরবলকে স্মরণ করেন। অমন মানুষ আর হবে না।

আরও কিছুদিন অতিবাহিত হল। বীরবলকে হারানোর বেদনা সম্রাটের কাছে আর তেমন তীব্র রইল না।

এমন সময় একদিন এক মহা হুলস্থুল ব্যাপার।

দরবার শেষ করে সম্রাট পারিষদবর্গ নিয়ে মজলিশে বসেছেন এমন সময় এক সভাসদ হন্তদন্ত হয়ে সেখানে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—জনাব। বীরবল।

বীরবল?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি আসছেন।

বীরবল আসছে! সে কি! সে তো কবেই মারা গেছে।

সভাসদটি মাথা নেড়ে বললে—তা তো জানি জনাব। কিন্তু তাঁকে দেখলাম। তিনি আসছেন। এই দিকেই আসছেন।

সকলে একেবারে স্তম্ভিত হল।

ওই যে!

দেখা গেল, দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে সত্যিই বীরবল?

বীরবল। তুমি?

সম্রাট সবিস্ময়ে উচ্চকণ্ঠে হেঁকে উঠলেন।

কুর্নিশ করে বীরবল বললেন—হাঁা জনাব, আমি বীরবল।

তুমি তো মারা গিয়েছিলে। ফিরে এলে কি করে?

সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে মাথা নুইয়ে বীরবল বললেন—মারা সত্যিই গিছলাম সম্রাট। স্বর্গে গিছলাম। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র আমার রঙ্গ-কৌতুকে খুশী হয়ে আমাকে এখানে আসবার অনুমতি দিয়েছেন।

সম্রাট খুশী হয়ে বললেন—বেশ, বেশ! তুমি আসায় সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে। তোমার অভাবে সত্যিই আমরা বড় বিরস বোধ করছিলাম।

বীরবল বললেন—সম্রাট। আমি আপনার জন্যে কিছু উপঢৌকন এনেছি।

তাই নাকি! কী এনেছো? নিয়ে এসো। দেখি, কি এনেছো।

বীরবল বললেন—আমি এনেছি স্বর্গের এক অপ্সরা, একটি ছোট প্রাসাদ আর কিছু দৈব বস্ত্র, যে বস্ত্র দেবতারা পরেন।

তা, এসব জিনিষগুলি কোথায়?

বীরবল বললেন—তারা আছে কিছু দূরে। সেই অপ্সরা আপনা থেকে এখানে আসবে না। সে তার প্রাসাদে অপেক্ষা করছে। আপনাকে নিজে গিয়ে শোভাযাত্রা করে তাকে নিয়ে আসতে হবে।

বাদশা বললেন—বেশ? তাই হবে। তার আগে একজন মন্ত্রী আর দু'চারজন সভাসদ দেখে আসুক, কোথায় আছে তোমার সেই অপ্সরা! আপত্তি নেই তো তোমার?

বীরবল বললেন—মোটেই না। আমিও ঠিক এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। আসুন আপনারা।

একজন মন্ত্রী আর চার পাঁচজন সভাসদকে নিয়ে বীরবল প্রাসাদ থেকে বেরুলেন। তারপর তাঁরা হাঁটতে লাগলেন।

হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। পথ যেন আর ফুরোয় না।

মন্ত্রী বললেন—আর কতদূর যেতে হবে?

এই যে এসে পড়েছি।

শহরের মধ্যেই কিছু দূরে খানিকটা পোড়ো জমি ছিল। তার চারধারে বড় বড় গাছ। অন্ধকার জায়গা। সে জন্যেই কোন বসতি ছিল না বলে কোনদিন সেদিকে কেউ যেতো না।

বীরবল মন্ত্রী আর সভাসদদের সেইখানে নিয়ে গেলেন।

দেখা গেল, সেই বনের মধ্যে চমৎকার একটি তিনতলা প্রাসাদ। তার স্থাপত্য সম্পূর্ণ নতুন ধরণের—যেন একটি মন্দির। ভারী অদ্ভুত দেখতে প্রাসাদটি।

মন্ত্রী আর সভাসদরা সকলে তো অবাক। এমন আশ্চর্য অট্টালিকা রাতারাতি এ জায়গায় গজিয়ে উঠল কি করে?

বীরবল বললেন—দেবরাজ ইন্দ্র এই প্রাসাদটি সম্রাটকে উপহার দিয়েছেন। স্বর্গের শিল্পীরা এসে এটিকে এইখানে বানিয়ে দিয়ে গেছে। এইবার চেয়ে দেখুন। প্রাসাদের তিন তলার পূর্বমুখী জানালায় সেই অপ্সরা বসে আছে। ওই যে। ওই! দেখুন সবাই। কী আশ্চর্য রূপ তার।

সকলে ঘাড় তুলে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। কিন্তু কোথায় অপ্সরা। কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না।

মন্ত্রী বললে—কই! অলিন্দে তো কাউকে দেখছি না। তোমরা দেখতে পাচ্ছো নাকি!

মন্ত্রীর কথায় বাধা দিয়ে বীরবল বললেন—আরো। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। অপ্সরাটি স্বর্গের বাসিন্দা। কেবল মাত্র তারাই তাকে দেখতে পাবে যাদের দেহের রক্তে কোন মিশেল নেই, অর্থাৎ যাদের জন্ম খাঁটি। আর যাদের স্ত্রীরা অসতী নয়। এইবার ভাল করে দেখুন সবাই।

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছি। কী চমৎকার দেখতে।

জন্ম খাঁটি নয়, স্ত্রী অসতী—এ বদনাম কে চায়? তার চেয়ে কিছু না দেখেও, দেখার ভাণ করা ভাল।

সভাসদরাও মন্ত্রীর মতোই সমস্বরে অপ্সরার রূপকীর্তন করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে তারা ফিরল।

আকবর এতক্ষণ কৌতূহলে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। বীরবল বোধ করি কিছু একটা আশ্চর্য ব্যাপার করছে। মনে মনে অতিশয় উৎসুক বোধ করছেন তিনি।

মন্ত্রী আর সভাসদরা তাঁর সামনে আসতেই আকবর বললেন—কি ব্যাপার? কি দেখে এলে? অপ্সরার দেখা পেলে নাকি?

ঘাড় নেড়ে মন্ত্রী বললে—অবশ্যই পেলাম জাঁহাপনা। সে এক আশ্চর্য অপ্সরা।

অন্য সবাই তান ধরে বললে—আশ্চর্য! আশ্চর্য!

আকবর বললেন—আমিও দেখবো। বীরবল, আমি যাব। এখনি। চল সবাই।

তখন সম্রাট আকবর আর তাঁর পিছনে মন্ত্রী আর সভাসদবর্গ, সবাই মিলে শোভাযাত্রা করে বীরবলের সঙ্গে চললেন।

রাজধানীর পথচারীরা তো অবাক। স্বয়ং সম্রাট তাজামে না চড়ে পায়ে হেঁটে কোথায় চলেছেন!

বীরবল সম্রাটকে সেই প্রাসাদের সামনে এনে বললেন—ঐ দেখুন সম্রাট, স্বর্গের রূপপুরী।

আকবর দেখলেন, নতুন ইমারত। সদ্য সদ্য তৈরী হয়েছে। বললেন—চমৎকার বাড়ী। অপ্সরা কোথায়?

ওই যে সম্রাট। অলিন্দের পাশে বসে রয়েছে। চার তলার অলিন্দে। ভাল করে দেখুন।

আকবর বললেন—কই। কিছু দেখছি না তো।

বীরবল বললেন—একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, জাঁহাপনা।

কী কথা?

অপ্সরাকে দেখতে পাবে একমাত্র তারাই যাদের জন্মের কোন গোল নেই আর যাদের স্ত্রীরা বিশ্বাসঘাতিনী না। মন্ত্রী এবং সভাসদরা সকলেই অপ্সরাকে দেখতে পেয়েছেন। আপনিও ভাল করে দেখুন, নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।

একজন সভাসদ বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ যে বসে রয়েছে অপ্সরা।

মন্ত্রী বললে—জাঁহাপনা। ঐ যে দেখুন। মেয়েটি হাসছে। কী সুন্দর হাসি।

আকবর ভাবলেন যে তিনি যদি বলেন যে তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, তাহলে তাঁর ইজ্জত থাকবে না। তাই তাড়াতাড়ি বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এইবার দেখতে পাচ্ছি। চমৎকার! চমৎকার। তাহলে চল বীরবল, আমরা বাড়ীর মধ্যে যাই। অপরার সঙ্গে আলাপ করিগে।

বীরবল বললেন—আপনারা যে পোষাক পরে আছেন সে পোষাক স্বর্গপুরীতে প্রবেশ করা চলবে না। স্বর্গের পোষাক পরতে হবে।

স্বর্গের পোষাক? কোথায় পাবো?

আমি এনেছি সঙ্গে করে।

এই বলে বীরবল তাঁর কাঁধের ঝোলা থেকে চৎকার সূক্ষ্ম জরির কাজ করা একটি আশ্চর্য সুন্দর কাশ্মিরী জামেয়ার বার করে আকবরকে দিয়ে বললেন—আপনি এইটি গায়ে জড়িয়ে নিন, তাহলেই হবে।

জামেয়ারের কারুকার্য সত্যিই দেখবার মত। সম্রাট সপ্রশংস চোখে সেখানি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর গায়ে জড়িয়ে নিলেন।

বীরবল বললেন—এইবার আপনাদের পোষাক বার করি। এই নিন বরুণ সবাই। মন্ত্রীমশাই আগে।

কই। কোথায় পোষাক?

এই যে আমার হাতে। দেখতে পাচ্ছেন না।

মন্ত্রী ভাবল, দেখতে পাচ্ছি না বললে তো মান থাকবে না। বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি বৈকি। দিন।

উহুঁ। তার আগে আপনি যে পোষাক পরে আছেন সেটি ছেড়ে ফেলুন। তারপর পরুন স্বর্গীয় চোস্ত আর পিরান।

মন্ত্রী তখন সত্যিই তার জামা আর পাৎলুন খুলে ফেলল। পরণে রইল শুধু খাটো জাঙিয়া আর গেঞ্জির মতো কতুয়া।

বীরবল বললেন—এইবার স্বর্গীয় পোষাক পরুন।

বীরবল হাত বাড়ালেন। হাতে কিছুই নেই। কিন্তু মন্ত্রী তখন ফাঁদে পড়েছে। বীরবলের হাত থেকে পোষাক নেবার ভান করে হাত বাড়াল। তারপর হাত পা নেড়ে পোষাক পরল।

মন্ত্রীর পর অন্য সভাসদরাও তাদের জামাকাপড় ছেড়েসেইভাবে স্বর্গীয় পোষাক পরিধান করল।

বীরবল তাদের জামাকাপড়গুলো গাঁটরি বেঁধে একপাশে রাখলেন। তারপর বললেন—সম্রাট। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন। আমি অপরাকে বলে আসি যে আমরা যাচ্ছি।

ব্যাপার দেখে আকবর তো মনে মনে রীতিমতো বিভ্রান্ত বোধ করছেন। বীরবল এ করছে কি? অল্প উলঙ্গ অবস্থায় মন্ত্রী আর সভাসদদের রেখে এখনি যে চারদিকে হট্টগোল পড়ে যাবে।

এ যে পাগলা খেলা সুরু হল!

অনেক পরে বীরবল ফিরে এসে বললেন—অত্যন্ত দুঃখের কথা সম্রাট। অপরার শরীর আজ ভাল নেই। বললে, কাল সে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবে—তার নাচ দেখাবে।

তাহলে আজ কি করা?

আজ বাড়ি ফেরা।

মন্ত্রী আর সভাসদদের পোষাকের গাঁটরি কোথায় গেল? বীরবলের কারসাজিতে ইতিমধ্যে গাঁটরি উধাও।

বীরবল বললেন—আপনাদের স্বর্গীয় পোষাক পরা রয়েছে। সুতরাং সেই পোষাক পরেই সবাই চলুন।

অগত্যা মন্ত্রী আর সভাসদরা সম্রাট আকবর আর বীরবলের পিছনে পিছনে চলল।

আকবর আর বীরবল দু'জনেই পুরোদস্তুর পোষাকে আবৃত। কিন্তু মন্ত্রী আর সভাসদরা উলঙ্গ বললেই হয়! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

রাজ্যের এত মন্ত্রী আর গণ্যমান্য অমাত্যরা সব উলঙ্গ হয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে।

রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেল। বিস্ময়ে সবাই হতবাক। সম্রাটের মুখ নিরতিশয় গম্ভীর।

একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—ওরে। আয়, আয়। মন্ত্রীরা সবাই ল্যাংটো!

চতুর্দিকে হাসির হুল্লোড়।

কোন মতে প্রাসাদে পৌঁছে মন্ত্রীরা ফেটে পড়ল—এ সমস্তই বীরবল শেঠের চালাকি আর ধাপ্পাবাজি। আমাদের বেইজ্জত করার ষড়যন্ত্র। সম্রাট! এর বিচার চাই। ছি ছি! উলঙ্গ হয়ে রাস্তা দিয়ে এলাম।

ভালমানুষের মত মুখ করে আকবর বললেন—কেন? তোমাদের পরবার জন্যে বীরবল তো স্বর্গীয় পোষাক দিয়েছিল।

স্বর্গীয় পোষাক না ছাই! সব মিথ্যে! অপরা মিথ্যে। স্বর্গীয় পোষাক মিথ্যে। বিরাট ধাপ্পা।

সভাসদরা সকলেই মহা কলরব করতে লাগল।

আকবর তখন বীরবলের দিকে ফিরে বললেন—বীরবল। এরা সবাই কি বলছে!

আজ্ঞে, ঠিকই বলছে জনাব।

তার মানে। এ সমস্ত ধাপ্পা?

বিলকুল।

বল কি? বাড়ীটাও ধাপ্পা। আমায় যে জামেবার দিয়েছো সেটাও ধাপ্পা?

না জনাব। ও দুটো জিনিষ খাঁটি। বিশেষ কারিগরী কারিগর দিয়ে এই জামেবারটি আমি আপনার জন্যে তৈরী করিয়েছি। এ রকম জামেবার ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই। আর ওই বাড়ীটি আমি তৈরী করিয়েছি সম্রাটের জামাইকে উপহার দেব বলে।

কণেক ভেবে সম্রাট বললেন—তা তো হল। কিন্তু অমরা আর এদের এই উলঙ্গ শোভাযাত্রা—এর মানে কি? আর, তুমি এতদিন "মৃত অবস্থায়" নিরুদ্দেশ হয়েই বা ছিলে কেন? এই সব রহস্য উদ্ঘাটন কর বীরবল।

করব বৈকি সম্রাট!

বলে বীরবল থামলেন। সকলে উদগ্রীব হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সম্রাটের ঠোঁটের কোনে ঈষৎ হাসির রেখা।

বীরবল বললেন—মহানুভব সম্রাট। মাস ছয়েক আগে আমার প্রতি কি হুকুম করেছিলেন, তা কি স্মরণ আছে ?

খুলে বল। বেয়াদবী রাখো।

যথা আজ্ঞা জনাব। ছ'মাস আগে আমার প্রতি সম্রাটের হুকুম হয়েছিল, আমাকে কোন এক অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য কাজ করতে হবে।

মাথা নেড়ে আকবর বললেন—হাঁ, মনে পড়েছে।

আমি সেই অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য কাজ করলাম জনাব।

কি সে অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য কাজ ?

মাথা নুইয়ে বীরবল বললেন—কোন রাজ্যের মহামান্য মন্ত্রী আর গণ্যমান্য সভাসদবর্গ যদি রাজরাজার উলঙ্গ শোভাযাত্রা করে তাহলে সেটা কি একটা অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বলে গণ্য হবে না হুজুর।

মুহূর্তে আকবর ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। হাসি চেপে গম্ভীর ভাবে বললেন—তা অবশ্যই হবে।

তাহলে আমি সেই রকম এক অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য কাজ করেছি তো ?

ঘাড় নেড়ে আকবর বললেন—তাতে আর দ্বিমত নেই।

• • •

জার্মানীর এক সঙ্গীত বিদ্যালয়।

গানের মাষ্টার গান শেখাতে এসে একটা নূতন সুর বেহালায় বাজিয়ে শোনালেন, বল্লেন—এতে নদীর তরঙ্গ কল্লোল শুনতে পেয়েছ তোমরা ?

ছাত্রেরা বললে : আজ্ঞে হাঁ, ঠিক যেন কুলুকুলু বয়ে যাচ্ছে নদী।

শুধু একটি ছেলে বললে নদীতে যখন তুফান জাগে, সে সুর কিন্তু আলাদা।

মাষ্টার মশায় বল্লেন : ঠিক কথা, কিন্তু সে সুর তোলা একটু শক্ত।

ছেলেটি বললে : নদী যখন সাগরে মেশে তখন নদী যোহনায় একসঙ্গে নদী ও সাগর কথা কয়।

মাষ্টার মশায় বল্লেন : সেটা প্রায় অসম্ভব, অন্তত এমন সঙ্গীতজ্ঞ কেউ আছে কিনা জানিনা।

—আমি জানি।

আশ্চর্য্য হয়ে মাষ্টার বলেন : আজিত কোন দিনই তাকে দেখিনি, তার কথা শুনিনি।

এই কথা শুনে ছেলেটি বেহালায় তান তুলল। সত্যিই ত নদী আর সাগর একসঙ্গে গর্জন করছে !

স্তম্ভিত হয়ে মাষ্টার বিটোফেনের মাথায় হাত রাখলেন।

ব্যাপার যা চলছে

(মতামতের জন্য গল্পভারতী সম্পাদক দায়ী নন)

চক্রপাণি

ব্যাপার যা চলছে তাতে আর বেশী দেরী নেই। আমাদের বাঙলাদেশ "বংগাল দেশে" পরিণত হতে আর ক'বছরই বা লাগবে! সাম্প্রতিকতম সংবাদে প্রকাশ, উত্তরপ্রদেশ পুরোপুরী রাষ্ট্রভাষার কবলস্থ হল, অন্য কোন বিকল্প ভাষা আর সেখানে চলবে না, এমন কি কঠিন কঠিন আইন পর্যন্ত লেখা হবে হিন্দিতে। বাঙলা দেশের যা অবস্থা, বিশেষ করে এই শহর কলকাতায় বসে আমরা যা দেখছি তাতে কয়েক বছরের মধ্যে এখানেও যে সেই প্রভাব পুরোপুরী বিস্তৃত হবে না, তাই বা না বলি কেমন করে।

১৩০০ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

"আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে।"

এই কবিতার শত বর্ষ পূর্ণ হতে আর বছর তিরিশ মাত্র দেরী। কল্পনা করা যাক সেই ১৪০০ সালে আমরা কলকাতা শহরে এসেছি। তখন এই শহরে কী দেখবো? দেখবো যে এখানে যেসব আদি বাঙালী পল্লী ছিল সেগুলি আর নেই। সেই সব পল্লীর ছোট ছোট বাড়ী ভেঙে সেই সব জায়গায় আকাশচুম্বী অট্টালিকা শোভা পাচ্ছে, আর বলা বাহুল্য, সেই সব অট্টালিকার বাসিন্দারা বাঙালী নয়। এখনই তো চোখের সামনেই দেখছি এই পরিবর্তন। তাহলে সেই সব বাঙালীরা গেল কোথায়? তারা কি সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? না তা যায়নি। তারা আছে। শহরের আশেপাশে বস্তীতে ছোট ছোট খুপরির মধ্যে। তারা সব যেন নতুন উদ্বাস্তু! সেই ভাবেই তারা নিজেদের তৈরী বানিয়ে নিয়েছে। তাই বলে দু'চারটে বড় বড় বাঙালীদের বাড়ী কি নেই? আছে বৈকি। ওই তো মোড়ের মাথায় বড় সেটওলা বাড়ীটা এক বাঙালীর! তিনি বড়বাজারের "বেওসায়ী"—তাদেরই সমগোত্রীয়। তাই তিনি লক্ষ্মীলাভ করেছেন। তাঁর বাড়ীর দরজায় শ্বেত পাথরের ফলকে গৃহস্বামীর নাম লেখা—হরিদাস মুখ্‌পাধিয়া। হরবিলাস মুখোপাধ্যায় হয়েছেন হরিদাস মুখ্‌পাধিয়া। তাতে আপত্তিই বা কি? ইংরেজ আমলে মুখোপাধ্যায়রা মুখার্জি হয়েছিলেন। এঁদের আমলে "মুখ্‌পাধিয়া"। হরবিলাসবাবুর বাড়ীতে রাষ্ট্রভাষারই প্রচলন। যেমন ইঙ্গবঙ্গদের বাড়ীতে ছিল ইংরেজী। হরিদাসবাবু বলেন, যস্মিন দেশে যদাচার। অর্থাৎ বাঙলাদেশ তো আর নেই, এখন বংগাল দেশ। তাই সেই ভাবেই চলতে হবে তো? তাঁর ছেলেমেয়েরা রাষ্ট্রভাষায় বিলক্ষণ দড়। আর হবে নাই বা কেন! ভাষার চেহারাও তো বদলে গেছে। সেই ভাবেই সব পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত লেখা হচ্ছে। একটি পাঠ্যপুস্তকে বাঙলা ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের জীবনী পড়ছি—

"রবিন্দরনাথ টাগুর এক বহুৎ বড় কবি ছিলেন। তিনি বড়বাজারের বেওসায়ি এলাকা জোড়াসাঁকোয় জনম্ নিয়েছিলেন। তাঁর পিতাজির নাম ছিল দেবেন্দর নাথ টাগুর। তিনি তপস্যা করে মহর্ষি খেতাব পেয়েছিলেন। তাঁর দাদাজি দোয়ার্কানাথ বিদায়েত গিয়েছিলেন। তিনি খুব

বড় বেওসায়ি ছিলেন। সন ১৯১০ সালে রবিন্দ্রনাথ তামাম দুনিয়ার সেরা পুরস্কার বিলায়েত থেকে বিঁচে এনেছিলেন। মহাত্মাজী আর নেহেরুজী তাঁকে খুব পেয়ার করতেন। সন ১৯৪০ সালে তাঁর দেহান্ত হয়।"

সানের জলসা হয়। প্রচুর হয়। তবে সেসব জলসায় বাংলা গান শোনা যায় না। বর্ষশেষ বৈশাখ উপলক্ষে যেসব অনুষ্ঠান হয় তাতে প্রচুর হিন্দি-রবীন্দ্রগীতি শোনা যায়। বাঙালীর ছেলে-মেয়েরাই গায় :—

"তেরে সোড়শর মেরে পিয়
লটব্ দে লটব্ দে।"

এই রূপান্তরের মওকায় বাঙালীরা টাকা কামিয়েছে কম নয়। যে বাড়ীর দাম ত্রিশ হাজার, সেই বাড়ী সত্তর হাজারে বিক্রি করে তারা বনহুগলিতে গিয়ে আছে—টাকা পেয়েছে, সুতরাং আরামেই আছে তারা। ছেলেপুলেদের ভাগ্যে যা হয় হোক। দু'তিন পুরুষ ধরে যেসব কারবার বাঙালীরা গড়ে তুলেছিল সেসব কারবার দশগুণ টাকা পেয়ে তারা ছেড়ে দিয়েছে—আর কত কামেলা পোহানো যায়—এত থোক টাকা—তার প্রলোভন সামলানো কি সহজ? অতএব ব্যবসা জগত থেকেও বাঙালী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—আপদ চুকেছে। বইএর ব্যবসাও বাদ পড়েনি। এখনকার সবচেয়ে বড়ো প্রকাশন প্রতিষ্ঠান—শ্রীগণেশ সাহিত্য-সংস্থা। সারা ভারতে তার শাখা প্রশাখা। যে ক'জন বাঙালী লেখক এখনো বাঙলায় বই লিখছেন তাঁরা সকলেই শ্রীগণেশের কাছে বাঁধা। তাছাড়া যন্ত্রিন দেশে যদাচার—বাঙালীরা এখন বেশীর ভাগই রাষ্ট্রভাষায় বই লিখছে। বড় বড় বইএর দোকান। দোকানের সাজ-সরঞ্জাম অন্যরকম। সেই 'কাউন্টার' আর নেই। তার বদলে গদী আর তাকিয়া। বিপুলকায় অবাঙালী মালিক স্মিতহাস্যে খরিদ্দারকে অভ্যর্থনা করছেন—"আইয়েন, আইয়েন। কোন্ কিতাব চাইয়ে? আরে লাও এক কিলো গীতাঞ্জলি।" মানে, এখন আর প্রতি বইএর দাম নেই। এখন ওজন দরে বিক্রি। আর দামও খুব সস্তা। এক কেজি গীতাঞ্জলির দাম তিন রূপিয়া। কোন পাল্লায় আটখানা উঠছে। কোন পাল্লায় বা দশখানা। "বিসভাতি" এখন সেইভাবে চলছে। বাঙালীর থিয়েটর ছিল সারা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সে থিয়েটর আর নেই। চারটির মধ্যে তিনটিতে বড় বড় হিন্দি গুজরাতি তামিল নাটক। বাঙালীরা সেইসব নাটকই দেখছে। একটি যে বাঙালী থিয়েটর এখনো আছে, সেখানে এখনে বাঙলা নাটক হে হয়, সেটি টিমটিম করছে, খাবি খাচ্ছে। হিন্দি নাটকগুলোতে নাচগানের কি জলুস। সারাক্ষণ প্রেক্ষাগারে "সিটির" আওয়াজ আর বাহবা বাহবা রব। এক একখানা নাচ সারা প্রেক্ষাগারকে যেন জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে! তার পাশে বাঙলা নাটকের প্যানপ্যানানি—আরে ছোঃ। চিত্রজগত থেকে সত্যজিৎ রায় কবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। এখন শুধু "বোল্ রাধা বোল্ সঙ্গম হোগা কি নেই।" বাঙলা ছবি আর তোলাই হয় না। তুলবে কে? বাঙালী চিত্র-প্রতিষ্ঠানই তো আর নেই। বাঙালী চিত্র-তারকারা সবাই হিন্দি ছবির জন্যে আজীবন চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। অতএব ওদিকটাও বিলকুল ফর্সা হয়ে গেছে। চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে জাত-কেরাণী বাঙালীর অন্ন গেছে। সেখানে স্রোতের মতো এসেছে দক্ষিণী পশ্চিমীর দল। রাইটার্স বিল্ডিং এখন তাদের কবলে। মুখ্য থেকে গৌণ—সব মন্ত্রীই দুঁটো অন্নপ্রাণ, দিল্লীর তাঁবেদার। যে মিষ্টান্ন জগতে বাঙালী ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী

সেদ্ধতে এখন ভালের লাড্ডু আর মোহন ভালুয়া, পকৌড়ি আর জিলেবি। কর্তাভজা বাঙালীরা মাছ খাওয়াও ছেড়েছে। তার বদলে দু'বেলা ছাতু খেয়ে শরীরের ভাগদ করছে। বড় বড় সোহে দু'চারজন বাঙালীকে এখনো দেখা যায়, ইংরেজ আমলে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি। আগে তারা বড়দিনের সময় মনিবদের কেট পাঠাতো। এখন পাঠায়, দশেরায়, দেওয়ালীতে, রামনবমীতে। বাঙালী দর্জিরা এখন কেবল চোস্ত, সলায় কলার দেওয়া পাঞ্জাবী, আর অওধ কোট বানাচ্ছে। বাঙালী দোকানদার এখনো পাড়ায় পাড়ায় কিছু আছে। আর আছে বাঙালী ফেরিওলা। এদের সংখ্যা খুব বেড়েছে। ট্রাম বাসের কনডাকটর এখনো বাঙালীই বেশী। বড় বড় শেঠস' ধরণের বাড়ীর মোটর ড্রাইভারও অনেকে বাঙালী। তাছাড়া বাঙালী মহল্লায় যেসব অওনতি অবাঙালী এসে বসেছে তাদের বাড়ীতে চাকরবাকর অনেক। মোটা মাহিনায় বাঙালীরা গৃহ ভৃত্যের কাজে নানাভাবে বেশ দু'পয়সা কামাচ্ছে। মোটের ওপর "নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে" দেখা যাচ্ছে, ১৪০০ সালে, বাঙালীরা দিব্যি আছে। ২।১২।৬৪

• • •

মেয়ে-গুপ্তচর। এরা বড় সাংঘাতিক। শত্রুপক্ষের গোলাগুলি বোমার চেয়ে এরা কম মারাত্মক নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জর্মন গুপ্তনায়িকা মাতাহারির অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি। সম্প্রতি ভারতের মাটিতেও এমনিধারা এক চীনা-মাতাহারির খবর পাওয়া গেছে।

এ তথ্য আজ সুবিদিত যে লেহ্ ও লাদাক অঞ্চলে চীনা আক্রমণের সময় একাধিক সুন্দরী চীন-রমনীর সাক্ষাৎ পাওয়া গিছল যারা আমাদের সৈন্য শিবিরে এসে সৈন্যদের প্রলুব্ধ করতেও পিছপাও ছিলনা। সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে যে তারা নাকি ভারতের প্রস্তাবের থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে।

সামরিক কেন্দ্র হিসাবে পুনা বোধকরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে এক গোপন সার্কুলারে বলা হয়েছে, এই অঞ্চলে অবস্থিত চীনাদের মধ্যে এক মাতাহারির সন্ধান পাওয়া গেছে। ছোকরা অফিসাররা যেন কোন চীনা-মহিলার সঙ্গে না মেলামেশা করে। সাবধান।

যার প্রতি সন্দেহ সবচেয়ে বেশি সেই চীনা-তরুণীটি অসাধারণ সুন্দরী। সুন্দর ইংরেজি বলতে পারে। আদবকায়দায় খুব দুরস্ত। অনেক বছর ধরেই সে নাকি পুনায় আছে। চীনা আক্রমণের পরে এই তল্লাটে যেসব চীনা অধিবাসী আছে তাদের গতিবিধির উপর বিশেষভাবে আইনকানুন আরোপ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, এই চীনা-তরুণী অবাধে অফিসারদের সঙ্গে মিশছে, তাদের সঙ্গে সিনেমায়, নাচে, মজলিসে যোগ দিচ্ছে।

পুনা হেরাল্ড নামে এক ইংরাজী দৈনিকে এক বছর আগে এই সন্দেহময়ী চীনা-রমণীর কার্যকলাপের কথা লেখা হয়েছিল, বলা হয়েছিল, এই স্ত্রীলোকটির জীবন-ধারণপদ্ধতি ও গতিবিধি বিশেষ সন্দেহজনক, এর সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সাবধানতা ও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অতি প্রয়োজন। কিন্তু তখন কর্তৃপক্ষ সে কথায় কান দেননি। আজ এক বছর পরে তাঁদের টনক নড়েছে। তাঁরা সার্কুলার জারি করেছেন। ৫।১২।৬৪

• • • •

উত্তর প্রদেশের এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুনুন। তাঁদের শিক্ষা-মন্দিরের নবাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেবার জন্যে তাঁরা কাকে ডেকে এনেছিলেন জানেন? ফিল্ম-অ্যাকট্রেস নার্গিস-কে।

এলাহাবাদের কাহিনী। পবিত্র শিক্ষামন্দিরের সুমহান অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন মোহময়ী নার্গিস! মোহময় তাঁর বেশভূষা। মোহন তন্বী। কিন্তু ছাত্ররা সে ব্যবস্থা অনুমোদন করল না। তারা চীৎকার করতে লাগল। ফিল্ম-অ্যাকট্রেসের ভাষণ তারা শুনতে চায় না। গো ব্যাক নার্গিস টু বোম্বাই ইউ বিলঙ্। তুমুল কলরব।

শেষ পর্যন্ত পুলিশ ডাকতে হল এবং অপ্রমুখী নার্গিসকে খিড়কি দরজা দিয়ে পার করে দিতে হল। সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে কী বলব ভেবে পাচ্ছি না, কিন্তু এলাহাবাদের ছাত্ররা যে এখনো একেবারে অমানুষ হয়ে যায় নি, সে খবর পেয়ে আনন্দ হল। ৩।১২।৬৪

• • •

থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে না গিয়ে কি ভাবতে ভাবতে চলছিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী এলেন টেরী দারুণ শীতের রাত, তাঁর গায়ে শুধু একটা পশু লোমের ভারী ওভার কোট।

হঠাৎ তাঁর মনে হোল কে যেন তাঁর অনুসরণ করছে।

একটু থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে মিস্ এলেন প্রশ্ন করলেন—"কে আপনি? এমন পিছনে পিছনে আসছেন কেন?

—একটা কথা বলবার জন্যে। —লোকটা এগিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

কি কথা বলুন—রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করে মিস্ এলেন।

—আপনি যখন ষ্টেজে অভিনয় করছিলেন তখন আপনার স্বামী আপনাকে ছুরি মারে—চমৎকার অভিনয় করলেন আপনার স্বামী, —কিন্তু আপনি একটুও চেঁচালেন না কেন? আমি যখন আমার স্ত্রীকে ছুরি মেরে, মেরে ফেলি তখন কিন্তু সে যন্ত্রণায় খুব চেঁচিয়ে ছিল।

এলেন টেরী আর দাঁড়ালেন না, তাড়াতাড়ি পা চালালেন।

শোণপাংশুদের সাথে

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

শোণপাংশুরা থাকে অচলায়তনের পুরীর বাইরে। ওদের পুরীতে প্রবেশের অধিকার নাই ওরা অশুচি, ওরা মন্ত্রহীন। তবু গুরু এলেন ওদেরই মধ্যে। ওদেরই সাথে নিয়ে তিনি অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন।

কবিগুরুর ঐ নাটকটি হিমাদ্রি পড়েছিল কিশোর বয়সে। তার সেই বয়সটা কেটেছে অবশ্য-ঘেরা বহন্ত লোকের পরিবেশে। উত্তরে হিমালয়ের দিগন্ত ঘোরা ঐরাবত পটভূমি। সেই নীল পাহাড়ের শ্রেণীর মাথার ওপরে জেগে আছে চিরতুষারে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার উন্মুক্ত মহিমা। ছেলেবেলা থেকে ওদিকে চেয়ে চেয়ে তার মনের মুকুলগুলি বিকশিত হয়ে উঠছে।

সেখানকার মাঠে, ঘাটে, গ্রামে, চা-বাগানে হাটে বন্দরে নানাজাতের নানা ধরণের মানুষ কাজ করে। কারুর রোদে পোড়া তামাটে চেহারা, মেটে পরে মাঠে চাষ করে আবার মেটে পরেই হাটে বন্দরে চলে আসে। কারুর চেহারা কালো কালো, শক্ত সবল গড়ন, খাটো কাপড় পরা। হিমাদ্রির মনে হত ওরাই বুঝি কবির সেই শোণপাংশুর দল। সেই অরণ্য প্রান্তের ছোট্ট শহরটির ভিতরেও নামগোত্রহীন মানুষেরা বাস করে। ভদ্রলোকেরা কাজে তাদের সংস্পর্শে আসে, হাটে বাজারে অথবা ঘরের কোন কাজে। তা থেকে ওদের কতটুকু পরিচয় বা পাওয়া যায়? হিমাদ্রির কাছে তারা যেন অন্য জগতের মানুষ। সেদিন তার মনে ওদের সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল জন্মালেও কাছে যাওয়ার তাগিদ ছিল না। সে তাগিদ আসে আরো কয়েক বছর পরে আর তা বাস্তব পরিস্থিতিতে রূপায়িত হল এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে। হিমাদ্রি তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কর দৃষ্টি এড়িয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছে।

১৯৩০-৩২ সালের সেই অগ্নিগর্ভ দিনগুলি। হিমাদ্রি বিপ্লববাদের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল তার কয়েক বছর আগে। সে তখন স্কুলের চৌকাট পার হয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। তখন বাংলার গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলির কর্মীদের এক অংশের মনে গণবিপ্লবের একটা আবছা আদর্শ স্থান দখল করে নিয়েছে। বিপ্লব প্রচেষ্টাকে মুষ্টিমেয় ভদ্র তরুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। বিপ্লবের বাণীকে নিয়ে যেতে হবে শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে। সংগ্রামের আগুন জ্বালাতে হবে তাদের বুকে। সেখানে যাওয়ার রাস্তা জানা নেই। পরিচয় নেই তাদের অন্তরের ভাষার সাথে। তবু যেতে হবে।

কলেজের ছুটিতে বাড়ী এসে সে তাই ছুটে চলে যেত বনপ্রান্তরের বিরল বসতি গ্রামাঞ্চলে। ঐ অঞ্চল তখনও সারা দেশের রাজনৈতিক জাগরণের প্রভাব থেকে দূরে সরে রয়েছে। ১৯২১-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের একটি ঢেউ ক্ষণিকের জন্য পাহাড়ের পাদমূলে আছড়ে পড়েছিল এই মাত্র। তাতে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়েছিলেন মাত্র দুই তিনজন কর্মী। হিমাদ্রি তখন বালক। সেই সব দিনের কথা তার ভাল মনে নেই। তবু অল্পকালের জন্য হলেও শহরের নামগোত্রহীন মানুষগুলিই যে সাগ্রহ হয়ে উঠেছিল সেই ছবিটি তার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। আন্দোলনের ঢেউ জোয়ারের জলের মতই হঠাৎ এসে ভাঁটার টানের মত হঠাৎ চলে যায়। কয়দিন পরে হয়ত

সবাই তার কথা ভুলে গেছে শুধু দুই তিনজন কর্মী কংগ্রেস সংগঠনকে শিবরাত্রির সলতের মত জিয়ে রাখেন। তাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন সুমনদিং। নিভীক, বে-পরোয়া অথচ অমায়িক মানুষটি। হিমাদ্রি তাঁকে দূর থেকে দেখে নিজ অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। কাছে যাওয়ার সুযোগ পায় নি। শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। শোষণকারীদের হৃদয়ে কোন ক্ষীণ প্রতিধ্বনি জেগেছিল কিনা তাই বা কি করে বুঝবে? ওদের মন বলে বস্তুটি আছে কিনা তাই ত' ছিল তার অজানা। বহুশতাব্দীর মত নিস্তরঙ্গ জীবনের প্রবাহ মন্থর ভাবে বয়ে চলেছে সমগ্র অঞ্চলে। চা-বাগানের কুলিদের ভাষাহীন বোবাকান্না বিদেশী মালিকের তৈরী বন্দীশালার চৌহদ্দির মধ্যে গুমরে মরেছে। হয়ত মিশে গেছে বনভূমির মর্মরিত দীর্ঘশ্বাসে। চাষীরা অনশনে অর্ধাশনে নিজেদের পুঞ্জীভূত অভিযোগ তুলে ধরেছে সম্ভবত আকাশের দেবতার কাছে। ঐ মানুষগুলিরও অন্তরের নিভৃত তলদেশে যে দেশপ্রেমের ফল্গুধারা লোক চক্ষুর অন্তরালে বয়ে চলেছে সে কথা অতদূর থেকে বোঝার উপায় ছিল না। পরবর্তীকালে যখন তাকে ওদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মাঝখানে গিয়ে পড়তে হয় তখন কত তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে পায় সেই ফল্গুধারার পরিচয়। যেন এক রহস্যপুরীর সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয় তার সামনে।

কলেজের ছুটিতে বাড়ী এলে সুমনদিং তাকে ডেকে নেন, প্রচার অভিযানে সাথী হওয়ার জন্য। ওরা দিন কয়েক ঘুরে বেড়ায়নী, বুড়ী বালাসন আর বালাসন নদীর তীরের কৃষক বস্তীগুলিতে ঘোরে। সেখানকার মানুষগুলির সাথে পরিচয় তখনও বেশীদূর অগ্রসর হয় না, বাইরের মহলেই রয়ে যায়। তবু সূত্রপাত হয় সেখান থেকেই। আরণ্য প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বুঝি প্রসারিত হয় মনের দিগন্ত। ধ্যানগম্ভীর ভূধরের পশ্চাৎপটে 'ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'র একটা অস্পষ্ট রূপরেখা মনের আকাশে মূর্তি পরিগ্রহ করতে থাকে।

তবে পরিশ্রম একেবারে বৃথা যায় না। এমনি ভাবে ঘোরার মধ্যে দিয়েই সে কর্মী সঙ্গী হিসাবে পায় কৃষকের ঘরের দুটি ছেলেকে। নীলকান্ত একটু অবস্থাপন্ন কৃষকের ছেলে। স্কুলে সে হিমাদ্রির কয়েক শ্রেণী নীচে পড়ত। ঘরের বাঁধন তার কম, প্রকৃতিও বে-পরোয়া। হিমাদ্রির কাছে গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপের কথা শুনে সে দারুণ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। হাসিখুসী বুদ্ধিদীপ্ত চটপটে ছেলেটি। নিষিদ্ধ বইগুলি যেন গোগ্রাসে গিলে-খেতে চায়।

হিমাদ্রি এতদিন সমিতির নেতাদের বীরপূজার অর্ঘ দিয়ে এসেছে। এবার সে নিজেই নীলকান্তর মনে পূজার বেদীতে স্থান লাভ করে। যেন সে রূপকথার রাজ্যের রাজকুমার। গর্বে আনন্দে হিমাদ্রির বুক ভরে ওঠে। কত রাত নীলকান্তদের ঘরে বাঁশের মাচার উপরে বিছানো চাটাইয়ের উপর শুয়ে 'দাদা'দের মুখে শোনা অগ্নিযুগের নানা কাহিনী বর্ণনা করে। বলে যায় নানা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস। সে যেন নীলকান্তর মনটাকে ধীরে ধীরে শতদল পদ্মের মত বিকশিত হয়ে উঠতে দেখে। অরণ্য-বলয়িত সেই প্রান্তরে, কলস্বনা গিরিনদীর তীরে, মানুষ-সমান উঁচু পাটক্ষেতের ধারে সেই খড়ে ছাওয়া কুটিরটি যেন কোথায় হারিয়ে যায়। হিমাদ্রি কল্পনার চোখে দেখে যেন নীলকান্ত মাঠের সীমানা পার হয়ে কতদূর এগিয়ে চলেছে। কৃষকের জীবনের স্বপ্নের ঘোর লেগেছে তার দৃষ্টিতে। না বোঝা এক ভাবাবেগের তাড়নায় পাগল হয়ে সে চলতে সুরু করেছে। হিমাদ্রির নিজের যাত্রাও ত' সুরু হয়েছিল ঠিক অমনিভাবে।

অন্ত ছেলেটির নাম ভুঁইচাপু, ভূমিকম্পের সময় জন্ম হয়েছিল বলে তার বাপ মা এ নাম রেখেছিল। সে একেবারে গরীব কৃষকের ঘরের ছেলে, লেখাপড়া কিছুই শেখে নি, কথাও বলে অত্যন্ত কম। হিমাদ্রির কাছে কি পেয়েছে সে বোঝার কোন উপায় নেই। কিসের প্রেরণায় সে এই পথে চলতে চায় তা একমাত্র সেই জানে, অথবা নিজেও হয়ত ভাল করে জানে না। হয়ত নিদারুণ দারিদ্র্য এবং একেবারে গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনের বাইরে মহত্তর এক স্বপ্নের আবেশ তার হৃদয়েও সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে। কেউ না কেন তা অস্পষ্ট, অব্যক্ত। সবাই কি প্রতি পদে নিজের মনের সাথে হিসেব নিকেশ করে জীবনের পথ চলে? ভুঁইচাপু হিমাদ্রির একান্ত অনুগত, নীরবে তাকে অনুসরণ করে। শহরের তন্তুবরের দুটি ছেলেও হিমাদ্রির প্রভাবে গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিতে রাজী হয়েছে। কিন্তু সে ভাবে যে নীলকান্ত আর ভুঁইচাপু তার মানস সৃষ্টি। ভাস্কর যেমন কঠিন পাষাণ কেটে মূর্তি গড়ে তোলে তেমনি ভাবে সে নিজের কল্পনার ছাঁচে ওদের গড়ে তুলবে।

এমনি ভাবে দুই তিনটি বছর কেটে যায়। সুরু হয় দেশ জোড়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন। ওদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন এবং জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে বিপ্লবী তরুণেরা নতুন ইতিহাস রচনা করে। শোলাপুর আর পেশোয়ারে সাম্রাজ্যবাদীশাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী জনতার অভ্যুত্থান সৃষ্টি করে গণ-আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায়। সত্যই 'লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।" সারা বাংলা জুড়ে ছাত্র ধর্মঘটের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। দমননীতির নির্মম রথচক্রের তলায় কত প্রাণ দেয় আত্মবলিদান। চারিদিকে শুধু উন্মাদনা। গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলির এক অংশ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। হিমাদ্রিদের সমিতির নেতারা ঠিক করেন যেটুকু শক্তি আছে তাকে সংহত করে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বড় রকমের আঘাত হানতে হবে। কয়েকটি অঞ্চল বেছে নিয়ে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে খণ্ড খণ্ড আক্রমণের এক পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা কাজ সুরু করবেন। প্রথম আঘাত সুরু হবে হিমাদ্রিদের অঞ্চল থেকে। প্রস্তুতির দায়িত্ব নিয়ে তাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে।

কল্পনার জগত ছেড়ে বাস্তবের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে দেখা দেয় নানা সমস্যা। পরিকল্পনা অনেক বড়, সম্বল সেই তুলনায় কিছুই নেই। নেই অভিজ্ঞতা। সংগঠন খুবই ছোট এমন কি আত্মগোপন করে কাজ করার মত নিয়তম ব্যবস্থাও নেই। তবু তার উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা থেকে পিছিয়ে যেতে সে পারে না, যাবে না। সমিতির নির্দেশকে অমোঘ বলে গ্রহণ করার শপথ নিয়েই ত' তারা এই পথে যাত্রা সুরু করেছে। ভরসা শুধু সুমন সিং। তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী দেশকর্মী হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবীদের উপর তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা। হিমাদ্রিকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে প্রয়োজনের দিনে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হয়ে নামার পর হিমাদ্রি তার আশৈশব পরিচিত শহরে প্রবেশ করে। প্রায় গ্রামের মত সেই শহরের প্রধান পথেও তখন সূচীভেদ্য অন্ধকার। শীতের রাত বলে লোক চলাচল নেই। সে গোপনে সুমন সিংয়ের সাথে দেখা করে জানায় যে তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে, তাকে আত্মগোপন করে এই অঞ্চল কাজ চালিয়ে যেতে হবে। অন্ত পরিকল্পনার

কথা খুলে বলে না। শুধু আপাতত একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সুমন সিং একটু চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। শহরের কোন ভদ্রপরিবারে আশ্রয়ের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। কেউ বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজী হবে না। তার উপর হিমাদ্রি এখানে বিশেষ পরিচিত। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে সে একেবারে গরীব মুটে মজুরের বস্তীতে কি থাকতে পারবে? হিমাদ্রি জানায় যে সে সব কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়েই তবেই পা বাড়িয়েছে। সুমন সিংয়ের দুশ্চিন্তা কেটে যায়। তিনি বলেন যে গরীবের ঘরে থাকলে তবেই তাদের জীবনের সত্যকার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভরসা দিয়ে বলেন যে সে রাতটা এবং পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর ওখানেই সে থাকতে পারে। ইতিমধ্যে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

পরের দিন রাতে হিমাদ্রি তার নতুন আস্তানায় প্রবেশ করে। শুধু আস্তানাই নতুন নয়, জীবনের এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়। একেবারেই অজানা তার রূপ। আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে শহরেরই একপ্রান্তে, একেবারে খেটে খাওয়া মানুষদের বস্তীতে। দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষ। চেরা বাঁশের বেড়া দেয়া আঙিনায় কয়েকটি মাটির ঘর, খড় ছাওয়া। বাড়ীর মালিক বর্ষীয়সী হিন্দুস্থানী মহিলা। তাঁর এক বিপদের দিনে সুমনসিং যথেষ্ট উপকার করেছিলেন তাই বৃদ্ধা সিংজীর কথায় প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। সিংজী হিমাদ্রিকে পৌঁছে দিয়ে যান। হিমাদ্রি প্রথম আলাপেই বৃদ্ধাকে 'মায়ী' বলে সম্বোধন করে সম্পর্কটা নিকটের করে নিতে চায়। 'মায়ী' বলেন 'তুমি যখন বেটা, তখন তোমার যাতে কোন বিপদ না হয় তা আমাকে দেখতেই হবে।' আঙিনায় তিনটি ঘর একটিতে বৃদ্ধা নিজে পরিজন নিয়ে বাস করেন। আর দুপাশে দুটি লম্বা ঘরে অনেকগুলি ছোট ছোট খুপরি। ওরই একেবারে এক কোণেরটিতে হিমাদ্রির স্থান হবে। অন্যগুলিতে নানা ধরণের লোক বাস করে, বাঙালী, হিন্দুস্থানী, পাহাড়ী। কেউ বিড়ি বাঁধে, কেউ চানাওয়ালা। একটি বাঙালী পরিবার রয়েছে স্বামী আর স্ত্রী আর দুটি অবিবাহিত বাঙালী ছেলে, ধর্মে মুসলমান। তারা বিড়ির দোকান করে। হিমাদ্রির খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় হবে তাই নিয়ে 'মায়ী' বড় চিন্তিত। খরচের ভাবনা নেই, সিংজী সে তার নিয়েছেন। কিন্তু গরীবের ঘরের রান্না সে কি খেতে পারবে! অবশেষে বলেন যে ঐ বাঙালী পরিবারটির সাথেই ব্যবস্থা করবেন। ছেলে খুব ভাল ছেলে। তার বৌটিও খুব শান্ত। ঝগড়াঝাঁটি একদম করে না।

হিমাদ্রি নিজের খুপরিতে যেয়ে দড়ির চারপাইয়ের উপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। মেঝে থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। বাড়ীটির পিছনেই কামার কুণ্ড, তারপরে একটি বদ্ধ জলা। তাতে শীতকাল, বর্ষায় নরকে পরিণত হবে। সে নিজের মনকে শাসন করে। বিপ্লবীদের জীবনের যে সব কাহিনী শুনেছে তাতে তাঁরা এর চেয়েও নোংরা পরিবেশে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। বিপ্লবের সাধনায় অনেকক্ষণ কঠিন পরীক্ষায় পার হতে হবে।

পরের দিন সকালে উঠে সে টের পায় যে বাড়ীর বাসিন্দাদের মধ্যে তার সম্বন্ধে জানাজানি হয়ে গেছে। সে নাকি বোমার মামলার ফেরারী আসামী। শুনে সে বড় উৎকণ্ঠা বোধ করে। এমনি ভাবে জানাজানি হলে কথাটা পুলিশের কাণে পৌঁছাতে কতক্ষণ! আর তাহলে এখানেই আপাতত: কর্মজীবনে দাঁড়ি টেনে দিতে হবে। মায়ী চা-রুটি নিয়ে আসতে তাঁকে নিজের আশঙ্কার কথা জানায়। তিনি আশ্বাস দেন যে কেউ তাঁর কথার বিরুদ্ধে যাবে না বা তাঁকে বিপদে ফেলার

মত কাজ করবে না। তবু হিমাদ্রি অস্বস্তি হতে পারে না দেখে তাকে বোঝান। বুধা ধৈর্যবতী মানুষ হলেও তাঁরাও স্বরাজের কথা ভাবেন বই কি! স্বরাজ এলে হয়ত তাঁদের দুঃখের কিছুটা লাঘব হবে। হিমাদ্রির মত বড় ঘরের ছেলে গরীবের জন্য প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে। তাঁরা কি এ কথা বোঝেন না? শুনে মনে অভূতপূর্ব আনন্দ হলেও তার ভয় যায় না। সারাদিন উৎকর্ণ হয়ে থাকে। সদরের দরজায় শব্দ হলেই ভাবে বুঝি পুলিশ এসেছে। বাড়ীটি যে ভাবে ঘেরা তাতে পালাবার পথ পাবে না। দিন যায়, রাত, আসে। উৎকণ্ঠায় অনেকক্ষণ জেগে থেকে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। এমনি ভাবেই দুই তিন দিন অতিবাহিত হয়। কোন বিপদ হয় নি। সে লজ্জিত হয়ে ভাবে তবে কি বেশী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে! এমনি অবস্থায় অন্য কর্মীদের মনেও কি অনুরূপ উদ্বেগ দেখা দেয়?

ক্রমে ক্রমে সবার সাথে তার মেলামেশা সহজ হয়ে আসে। পাহাড়ী মজুর, চানাওয়ালা, সবাই কাজে যাবার আগে তাকে নমস্কার জানিয়ে যায়। সকালের চা-টি নিয়ে আসেন মাস্টার নিজে। অনেকক্ষণ বসে সুখদুঃখের কথা বলেন। বলেন নিজের ছেলেমেয়েদের কথা। হিমাদ্রির বাড়ীতে কে কে আছে? খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তার মায়ের কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন 'দশজনের ভালর জন্য জীবন দিচ্ছ কিন্তু মায়ের মনে দুঃখ দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?" সে কি জবাব দেবে ভেবে পায় না, চুপ করে থাকে। দুবেলা ভাত তরকারী নিয়ে মধু আসে। খেতে খেতে হয় তাকে, বেশীক্ষণ বসতে পারে না। তবু দুবেলা ঐটুকু সময়েই হিমাদ্রিকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে। স্বদেশী বাবুদের কাজকর্ম সম্বন্ধে তার মনে দারুণ আগ্রহ। মাঝে মাঝে আব্বাস আর আনোয়ার দুই ভাইও মধুর সাথে এসে উপস্থিত হয়। হিমাদ্রির কথা তারা কে কতটুকু বোঝে তা জানার উপায় নেই। তবু তারা হিমাদ্রির অনুরাগী ভক্তে পরিণত হয়।

সারাটা দিন কাটে বই পড়ে অথবা স্বপ্ন দেখে। দিবাস্বপ্ন দেখে সে। নিবিড় অরণ্য ভেদ করে দুর্গম পাহাড়ী পথে চলেছে হয়ত সশস্ত্র সৈনিকের বেশে। কখনও বা তাদের পরিকল্পিত 'অ্যাকশনের' মানসচিত্র রচনায় বিভোর হয়ে থাকে। অন্ধকার হয়ে আসার পর আস্তানা ছেড়ে পথে বার হয়। এক এক দিন এক এক রকম ছদ্মবেশে। শহরে বিশ্বস্ত সহকর্মী মাত্র দুজন সীতাপতি আর সত্যব্রত। তাদের সাথে এক একদিন এক এক স্থানে দেখা করে। মধুকে দিয়ে আগে থেকে খবর দিয়ে রাখে। সীতাপতি আর সত্যব্রত এই শহরের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরে যায়নি। গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম তাদের কাছে এখনও রূপকথার রহস্যপুরী হয়েই রয়েছে। একটা বড় রকমের অ্যাকশন্ হতে যাচ্ছে শুনে তারা দুজনে উল্লাসনায় মেতে উঠেছে। উৎসাহের আতিশয্যে, তারা ভুলেই যায় যে কাজ কত কঠিন। ভুলে যায় হিমাদ্রি নিজেও। সে নিজে এখন রূপকাহিনীর নায়কে পরিণত হয়েছে! সেই অনুভূতির সাথে মিশে আছে জীবনের এক সম্পূর্ণ নতুন দিকের সাথে মুখোমুখী পরিচয়ের অভিজ্ঞতা। সে দেখেছে, গায়ের তলায় পড়া মানুষগুলির হৃদয়েও রয়েছে এক দুরন্ত জীবনের জন্য আগ্রহ। পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে বাস করেও ওদের মধ্যে কেউ কেউ আলোকের দিকে মুখ তুলে চাইতে শিখেছে। ওদেরও মনের কুঁড়িগুলি উঠছে বিকশিত হয়ে। তার মধ্যে সে এক পরম সুন্দরের আবির্ভাবের ইঙ্গিত দেখতে পায়।

পঙ্ককুণ্ডের মধ্য থেকে কমলবৃন্ত উপরের দিকে মাথা তুলতে পারে। কিন্তু চারদিকের

ছেলেকে ত' ভোলা চলে না এত সহজে! সেই ছেলের সাথেও হিমাদ্রির মুখোমুখি পরিচয় হয়। পরিবেশের নোংরামি ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে আসে বটে। কিন্তু মানুষের মনের পুঞ্জীভূত গ্লানি যখন বাইরে ছুটে বেরোয় তা অসহ্য ঠেকে। পাহাড়ী শ্রমিকটি প্রায় প্রতিরাতে 'হুকসি' খেয়ে এসে বহুক্ষণ হল্লা করে, বৌয়ের সাথে তারস্বরে ঝগড়া করে চলে। বৌটি চিৎকার করে সবাইকে জানায় যে তার স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত। নিজের স্ত্রী পুত্রের প্রতি তার দৃষ্টি নেই। কর্কশ স্বরে অশ্লীল গালাগালির বর্ষণ চলে। কোনদিন সকালে কুয়ো থেকে জল তোলা নিয়ে সেই মেয়েটির সাথে চানাওয়ালার ঝগড়া বেধে যায়। শেষে মালী এসে দুইপক্ষকে শান্ত করেন। এসবও ক্রমে হিমাদ্রির সয়ে এসেছিল। সে ভাবে যে কি হবে ওদের দোষ দিয়ে। ওরাত' কখনও মার্জিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। কিন্তু একটি ঘটনায় সে মনে কঠিন আঘাত পায়।

মধুর বৌকে সে দূর থেকে দেখেছে। সপ্রতিভ সুশ্রী তরুণী। হিমাদ্রি ভাবে যে মধু তার আপন ভাইয়ের মত হয়ে গেছে। তার বৌ কাছে এলে ছোট বোনের মতই গ্রহণ করবে। একদিন মধু কাজে আটকা পড়ায় মেয়েটিই ভাত নিয়ে আসে। কথা বলে না বড় একটা। হিমাদ্রি ভাবে হয়ত তার সঙ্কোচ এখনও কাটেনি। খেতে খেতে হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে দেখে যে মেয়েটি তার দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে। কিন্তু সে দৃষ্টিতে যেন এক অতৃপ্ত ক্ষুধার উগ্র জ্বালা ধকধক করে জ্বলে। মেয়েটি অপ্রস্তুত হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। হিমাদ্রির মনে একটা খটকা লাগে। আর এক দিনের ঘটনায় খটকা অস্বস্তিতে পরিণত হয়। তার খুপরির বেড়ার ওপারেই কুয়ো তলা। মেয়েরা কাজ সেরে স্নান করতে আসে। তাদের কলকণ্ঠ সে ঘরে শুয়েই শোনে। মেয়েরা চলে যাওয়ার পর সে স্নান করতে যায়। একদিন এমনি ভাবে কুয়োতলায় যেতেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। মধুর বৌ একলা রয়ে গেছে, স্নানের প্রস্তুতি করছে। হিমাদ্রিকে দেখে বেশবাস সামলানোর ভাণ করে আরো আলুথালু করে দেয়। হিমাদ্রি দ্রুতপদে ঘরে ফিরে আসে। মনটা খুব অশুচি বোধ হয় কিন্তু ধমনীতে রক্ত প্রবাহ তোলপাড় করে। নারীকে সে এতদিন মা বোন বৌদি রূপেই জেনে এসেছে। যৌবনের অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার পর মাঝে মাঝে নারী সঙ্গ লাভের কামনা জাগেনি তা নয়। তবে সে কামনাকে দমন করে এসেছে। তাদের ঐ জীবনে ত' নারীর স্থান নেই। যেখানে প্রতিপদে প্রাণ হাতের মুঠোয় মধ্যে নিয়ে চলতে হবে সেখানে রমণীর প্রেমের স্বপ্ন রেখার অবকাশ কোথায়? তবু হঠাৎ দেখা প্রায় অনাবৃত নারীদেহের ছবি যেন বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠতে চায়। সে মনকে সবলে শাসন করে। একটা বিস্বাদ তিক্ততা অনুভূতিকে ছেয়ে ফেলে। মধুর বৌ কি তাহলে বৈরিণী?

রহস্যটা পরিষ্কার হয় দিন দুই পরে মালীর কথায়। মালী তার সঙ্গে পরামর্শ করেন। মধুর বৌয়ের সাথে আনোয়ারের আশনাই হয়েছে। দুজনে পালিয়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটছে। মালীর বড় মেয়ের কাছে মধুর বৌ কথাটা বলে ফেলেছে। মালী বলেন আনোয়ার ত' হিমাদ্রিকে খুব মানে। সে যদি তাকে ডেকে বুঝিয়ে বলে ত' ভাল হয়। হিমাদ্রি খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকে। পরের দিন আব্বাসকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে সেও স্বীকার করে যে কথাটা সত্যি। সে আনোয়ারকে অনেক বুঝিয়েছে। তিন বন্ধু এক সাথে কাজ করে, বন্ধুর ঘরভাঙ্গা কি ঠিক হবে? তার ওপর ওরা পালিয়ে গেলে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা বেধে উঠতে পারে। হিমাদ্রি জিজ্ঞাসা করে

'মধু কি বৌকে ভালবাসে না?' আব্বাস জানায় যে ভাল খুবই বাসে কিন্তু খারাপ রোগে সে বৌকে তৃপ্তি দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। উপরন্তু এক এক সময় মারধোর করে। ফলে সমস্যা জটিল হয়ে গেছে।

হিমাদ্রি কি করবে ভেবে পায় না। মধু, আব্বাস, আনোয়ার তিনজনকে নিয়ে সে যে কত কল্পনা করেছিল। সন্ধ্যায় সুমন সিংহের সাথে দেখা করে সব খুলে বলে। সিংজী বোঝেন যে সে খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েছে। তিনি বুঝিয়ে বলেন যে জীবনে কি শুচিশুভ্রতা রক্ষা করার সুযোগ ওরা পেয়েছে কখনও? তাছাড়া হিমাদ্রির সংসার সম্বন্ধে ত' অভিজ্ঞতা হয় নি। বলে দেখত যে সমাজের উপরের তলায়ও এমন ব্যাপার হামেশা ঘটে। সেখানে হয়ত একটা বাহ্যিক খোলস থাকে, এই যা তফাৎ। সিংজী আরো বলেন 'তোমার আর ওখানে থাকা ঠিক হবে না। যদি এই নিয়ে কোন গোলমাল হয় তাহলে ব্যাপারটা থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়াতে পারে। তার আগেই তোমাকে সরে পড়তে হবে।' হিমাদ্রির মনও হাঁফিয়ে উঠেছে। তাকে যেতে হবে গ্রামাঞ্চলে, বনপ্রান্তের সেই—মানুষগুলির কাছে। তা না হলে দায়িত্ব পূর্ণ করবে কি ভাবে?

বিদায়ের সময় কিন্তু সেই জীর্ণ মলিন কুশ্রী পরিবেশ ছেড়ে যেতে বাধা হয়। মানুষের মন! যাকে ছেড়ে যেতে চায় যাওয়ার সময় তার জন্যই পিছুটান অনুভব করে। মায়ীর দুই চোখে জল ছাপিয়ে উঠেছে। তিনি বলেন 'তুমি আমার নিজের বেটার মতই হয়ে গিয়েছিলে। এখন আবার কোন বিপদের মধ্যে যেয়ে পড়বে কে জানে!' মধু আনোয়ার আব্বাস সবাই বিষণ্ণ গম্ভীর। কারুর মুখে কথা নেই। শুধু জিজ্ঞাসা করে 'আবার কবে দেখা হবে?' হিমাদ্রি বলে 'সে কথা কে বলতে পারে।' চলে আসার সময় মধুর বৌ হঠাৎ তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। বুঝি প্রগলভতার জন্য নিঃশব্দে ক্ষমা চেয়ে নেয়। হিমাদ্রি ভাবে যাত্রাপথে অনেক অচেনার সাথে পরিচয় ঘটবে। অনেক অজানা মানুষ আসবে হৃদয়ের কাছাকাছি। স্নেহপ্রীতি ভালবাসার অদৃশ্য বাঁধনে জড়িয়ে পড়বে। অথচ কর্তব্যের তাগিদে সে সব কিছুকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। ফিরে তাকাবার অবকাশ পাবে না।

• • •

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে একব্যক্তি প্রশ্ন করেন; আপনি এত বড় হলেন কি পথ অবলম্বন করে?

—অর্থাৎ? মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন চার্চিল।

এই রাজনীতি ক্ষেত্রে—উত্তর দিলেন ভদ্রলোক।

হাসতে হাসতে চার্চিল বললেন; এই সিগারই (ciger) আমাকে বড় (bigger) করেছে মশাই,—আর কিছু নয়, আর কিছু নয়।

চাঁদ-এ-আকার

(রসরচনা)

সুশীল মুখোপাধ্যায়

—ক্রীং·····ক্রীং···ক্রীং···

যদি আপনার ইলেকট্রীক কলিং বেল থাকে গেটে।

—কড় কড়···কড় কড়···কড়কড়াকড়···

যদি আপনার দরজায় লোহার বা পেতলের কড়া লাগানো থাকে।

—ঠক্···ঠক্···ঠক্···

যদি দুইয়ের কোনটাই না থাকে।

দরজায় ঘা পড়লো।

খুললেন দরজা। সামনে সব সোনার চাঁদ। মানে, পাড়ার ছেলেরা।

—"দাদু! চাঁদাটা—"

চাঁদ-এ আকার! জুড়িয়ে গেল প্রাণটা!

এক সময় ছিল যখন দাদুরা নাতি কোলে নিয়ে তাকে আকাশের চাঁদ দেখাতে দেখাতে ছড়া বলতো—"আয় চাঁদা আয় চাঁদ···" আর চাঁদকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নাতির কপালের ওপর একটি আঙুলের আলতো ছোঁয়া দিয়ে শেষ করতো—"দাদুর কপালে এসে 'টী' দিয়ে যা"—

চাঁদামামার দিকে দাদুদের হাত বাড়ানোর যুগ শেষ হয়ে গেছে।

এখন নাতির বদলে দাদুর পকেটের চাঁদির দিকে হাত বাড়ায়।

—দাদু!

কী প্রাণমাতানো (না প্রাণমাড়ানো?) মনগলানো (না চাঁদিগলানো) ডাক! আদরের নাতিরা আবদার করে চাইছে—চাঁদা!

চাঁদা!

কথাটা কোথা থেকে এলো বলতে পারেন? চাঁদ-এ আকার দিয়ে? না চাঁদি'র 'ই' তুলে 'আ' বসিয়ে! কথাটা কিন্তু বেশ। মনে করতে আপত্তি নেই যে অমাবস্যার রাতের খালি আকাশের পর প্রতিপদ দ্বিতীয়ার এক ফালি চাঁদ দিনে দিনে ফালি ফালি করে বাড়তে বাড়তে আকারে পুরো একটি সোনার থালিতে পৌঁছল পূর্ণিমার রাতে। থালি একটি থলি এ বাড়ী ও বাড়ী করতে করতে আস্তে আস্তে ভর্তি হয়ে উঠছে—দু'আনা চার আনা, আট আনা, ···আবার দু'আনা! ব্যস, হয়ে গেল ষোল একটা টাকা! পূর্ণচন্দ্রের মতই, নিটোল ঝকঝকে চাঁদির একটি মুদ্রা—চাঁদা! একটাকা উঠলো। কী আনন্দ! এই ত সুরু। আরও উঠবে—

অবশ্য দু'আনা চার-আনার যুগ ঘরে ভূত হয়ে গেছে। চারজনের কাছে খুরে একটাকা চাঁদা উঠলে পাড়ার কচি ছেলেরাও সরস্বতী পূজার সময় পর্যন্ত ভাবে ওঠে না। আর চাঁদির মুদ্রাকেও চন্দ্রলোক প্রাপ্তি ঘটেছে। তবুও 'চাঁদা' কথাটার জন্ম-ইতিহাস এই রকম একটা কিছু কল্পনা করতে আপত্তি কী? সুনীতি চাটুজ্যে মশাই এখন কোলকাতায় নেই। আর পরীক্ষার উত্তর ত লিখছি না—

সুতরাং ধরে নেওয়া যাক চাঁদ থেকে চাঁদা!

চাঁদ আর চাঁদা!

একটা আকারে এত তফাৎ!

আকাশে চাঁদ উঠছে দেখলে আপনার মনে হয়। পাড়ায় চাঁদা উঠছে শুনলে আপনার বুকটা ধড়াস ধড়াস করে। কেন?

—ঐ রে! ওই বুঝি এলো ওরা!

ওরা কিন্তু চাঁদ ওঠা দেখার মতই খুসী! চাঁদা উঠছে—ওরা ওঠাচ্ছে। শুধু আপনিই ভাবছেন কী করে গা ঢাকা দিই। দেখেছেন ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে পাড়ার সোনার চাঁদেরা সামনের বাড়ী থেকে সোল্লাসে বেরুলো। এইবার আপনার ঘাড়ে পড়বে।

—"বাবু বল্লে বাবু বাড়ী নেই"—এ আর ক'দিন চলবে? ভাগ্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে একদিন।

বুকের ভেতরটা কেমন করছে? মাসের শেষ? পকেট গড়ের মাঠ?

উপায় নেই! কমলি নেহি ছোড়েগি।

দিতেই হবে—আজই হোক আর কালই হোক। কাজেই যত তাড়াতাড়ি পারেন দিয়ে কেলুন যেমন করে হয়। তারপর পাঠিয়ে দিন ওদের পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকের কাছে। ওঁর সঙ্গে ত' আপনার সম্পর্কটা খুব মধুর নয়। দিন ওদের ওঁর কাছে পাঠিয়ে। দেখুন ওরা কী রকম হাসতে হাসতে কাজ হাসিল করে আসে……

ক্যাবলা চট্ করে ১৫৲ টাকার একটা রসিদ কেটে দেতো—ক্যাবলা রসিদ কেটে ফেল্লে।

জানা চাই—কাজ হাসিল করতে জানা চাই।

খুব গুরুনো করে কাঁচুমাচু হয়ে ভয়ে ভয়ে, ভদ্রী ভদ্রী প্রাণীর মত গেলে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হবে। ওধার থেকে তখন সাহস পেয়ে বলবে—"হবে না!" যেতে হবে হেসে হেসে, অতি

নিশ্চিত কব্জীমাৎ আবে। মানে, ভাবটা এই রকম। —হুঃ! এ আর কী? আরে এত হাতের পাঁচ! এর জন্যে এত ভাবনা? এত পেরেই গেছি? তাই না দাদু? (দাদুর মুখ শুকিয়েছে) কই দিন ত' দশটা টাকা! ভাবনা! রসিদটা কেটে দে ত'! (দাদুর গলা শুকিয়েছে—এক গ্লাস জল চলে ভাল হয়!) (দাদুর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঘেমে এলো—কোয়ার্টার চলে ভাল হয়!) দাদুর পকেট থেকে দশ বেরিয়ে ম্যাজিসের পকেটে ঢুকলো।— এ হোলো আমাদের মতে অপ্রত্যক্ষ অগ্রসর (approach)। আর এক রকম আছে। মুখ গম্ভীর···চিত্তস্থির···পদক্ষেপ সুদৃঢ়। আমাদের দাবী মানতে হবে মার্কা approach!

—আপনার চালটা।···পুজোর আর দেরী নেই···একটু তাড়াতাড়ি করবেন—আরও পাঁচবাড়ী যেতে হবে।···ভাবলা, রসিদ!···এই যে আসুন!···নমস্কার!

—আপনাকে কথা বলতে দেওয়া হোলো না। লেন-দেন হয়ে গেল। বললেই বা কী হোতো?···পণ্ডশ্রম!

চাঁদা তোলা একটা আর্ট—মানে চারুকলা। সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হলে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করতে হয়। পাড়ার দাদাদের উদাহরণই অবশ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট। আর আজকাল এই সুযোগ সুবিধাটা বেশ ভালই আছে। তেইশ আর তেরোতে সমান আড্ডা চলে পাড়ার রকে। মাপ করবেন—ভুল বললুম—রক কোথায়? রকে ত' পানের দোকান বা চায়ের ষ্টল বসে গেছে। আড্ডাটা তারই সামনে দাঁড়িয়ে। আহা, কারুর বৈঠকখানাও নেই যে বাছারা একটু কোমরটা মাঝে মাঝে ছাড়িয়ে নেয়!—তা না থাকুক! তাতে ক্ষতি কিছু নেই।··· চাঁদা তোলার আর তার সদ্ব্যবহারের জল্পনা কল্পনা (কিংবা পরিকল্পনা) প্লান, ষ্ট্রাটেজী—এ সব দাঁড়িয়েও দাঁড়িয়েও বেশ হয়—

চাঁদা আদায় করার পরামর্শ

আসল কথায় ফিরে আসা যাক। চাঁদা তোলা একটি আর্ট—মানে, ফাইন আর্ট। এত ফাইন যা মিহি অথবা যদি বলেন সূক্ষ্ম, তাই বলুন—যে চোখেই পড়ে না! উচ্চমানের আর্টের ত' এটাই বৈশিষ্ট্য। ইংরিজীতে বলে "Art lies in concealing art"—অর্থাৎ শিল্পীকারের আর্ট হবে একেবারে স্বাভাবিক। আর্টিষ্ট জানতেই দেবে না যে তার কাজের পেছনে কোনো রকম চেষ্টা বা কৌশলের বিন্দু বিসর্গও আছে। পাকা চাঁদা তুলিয়ে যারা তাদের কাজ লক্ষ্য করুন। দেখবেন কত সহজভাবে (সাধনীল বলবো কী?) তারা কাজটা গুছিয়ে নেয়। আপনার পকেটে কী অপূর্ব্ব কৌশলে (অবশ্য বিনা নোটিশে নয়) হাতটা প্রবেশ করিয়ে সেটাকে ফাঁক করে নিজেদের পকেটটা ভর্ত্তি করে কত সহজভাবে প্রস্থান করতে পারে। প্রাচীন গ্রীকদের ন'টী অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিল চারুশিল্পের বিভিন্ন শাখার জন্যে। আমাদের চৌষট্টীর জন্যে একটি মাত্র দেবী। অতি আধুনিক এই পঁয়ষট্টি নম্বরের জন্যে আর একটির খুবই দরকার। চৌষট্টী খানা পোর্টফোলিও একলা মানেজ

করে তার ওপর আরও একখানা সাহসানো একটি মাত্র দেবীর পক্ষে সত্যিই শক্ত। কাজেই আর একটি চাই!—দেবী না হয় অন্ততঃ উপ-দেবী একজন।

তবে আপনি বলবেন 'মশাই, চাঁদা-তোলা ব্যাপারটাকে অতি আধুনিক বলছেন কী হিসেবে? ওটা কী আমাদের ছিল না? গ্রামে বা সহরের পাড়ায় কী বারোয়ারী হোতো না?..... চাঁদা তোলা চিরকালই আছে।'

ঠিক কথা।

তবে গতকালের চাঁদা তোলা আর আজকের চাঁদা আদায়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে ওর চেহারাটাই পাল্টে গেছে।

আগের দিনের চাঁদা চাওয়া আর দেওয়ার মধ্যে কোনরকম অস্বস্তিকর ভাব ছিল না। যে চাইত সে স্নেহের দাবীতে বা বন্ধুত্বের জোরে বা অন্তরঙ্গতার খাতিরেই চাইত। যে দিত সে সানন্দে আর সহজভাবেই দিত। যারা সেদিন আপনার কাছে চাঁদার জন্যে আসতো তাদের আপনি অন্তরঙ্গভাবেই জানতেন। শুধু তাদের যে জানতেন তা নয়। তাদের বাপ-মা'-খুড়ো-জ্যাঠাদেরও জানতেন। পাড়ার সম্পর্কে তারা আপনার খুবই কাছাকাছি—প্রায় আত্মীয়ও বলতে পারেন। ছুবেলা দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে। এবাড়ী-ওবাড়ি যাতায়াত প্রায়ই নিত্য শুধু বারমহলেই নয়, অন্দরমহলেও মেলামেশা—মেয়েদের মধ্যে আনাগোনা। ওরা আপনার সুখদুঃখের ভার নেওয়ার জন্যে বরাবর এগিয়ে এসেছে। আপনিও ওদের বিপদে-আপদে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বয়েসে বড় বলে আপনি ওদের অন্যায় দেখলে ধমক দিয়েছেন। ওরা আপনার কথা শুনুক বা নাই শুনুক আপনার মুখের ওপর কোনদিন কথা বলেনি। দূর থেকে আপনাকে দেখে মুখের সিগারেটটা নামিয়ে ফেলেছে। আপনার পাওনা ওরা দিয়েছে আর ওদের পাওনাও আপনি দিয়েছেন। আর চাঁদা তোলার কথাটা আপনিই ত আর পাঁচজনের সঙ্গে বলে ওদের বলে দিয়েছেন। "ওরে চাঁদাটা তাড়াতাড়ি তুলে ফেল বাবা, আর সময় বেশী নেই!" তারপরই ওরা বেরিয়েছে। ছেলের দল, সঙ্গে মাঝবয়সী দু'একজন মাতব্বরও আছে। সোজা কথাটা হচ্ছে আপনি জানেন যে ব্যাপারটা আপনার নিজেরই। পাড়ার অন্য সবাইও ঠিক তাই জানে। কাজেই দেওয়ার সময় আপনি খুশী মনেই দেন। দেওয়া মানে একরকম নিজেকেই দেওয়া। তাছাড়া অঙ্কটা আপনার নীরঃপীড়ার সৃষ্টি করতো না—সীমার মধ্যেই থাকতো। আর ঐ একবারই দেওয়া। বারোয়ারী বছরে একটা। হয়ত তার সঙ্গে ছেলেদের একটা সরস্বতী পুজো। তবে মাঠে সরস্বতী পুজোর ব্যাপারটাও নতুন। আগে স্কুল-কলেজে চাঁদাটা পাঠিয়ে দিলেই হোতো। দু'আনা থেকে সুরু। যে একটাকা দিত থিয়েটারে তার রাজার পার্ট।

আর আজ?

আজ যারা এসে আপনার দরজায় ঘা দেয়—ঐ চিনে পায়জামা, কোদা পাঞ্জাবী বা হাওয়াই শার্ট আর উদ্ভট ছাঁটের দল—ওদের আপনি জানেন না, চেনেনও না। আজকাল কে কাকে চেনে? যুগ পাল্টে গেছে। আপনার পাশের ফ্ল্যাটের লোকটিকেও আপনি জানেন না। ফ্ল্যাটবাড়ীর একই সিঁড়ি দিয়ে দু-জনে রোজ ওঠা-নামা করেন কিন্তু দুজন দুজনের কাছে অপরিচিত। আত্মিক যোগাযোগ হয়ে থাক মৌখিক আলাপ পর্য্যন্ত নেই। আজ আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। যার যার

নিরুদ্ধ আলাদা জীবন আমাদের। আপনার বাড়ীতে যখন মুমূর্ষু রোগীর করুণ আর্তনাদ, আমার ঘরে তখন বেতারে তারস্বরে জিপ্সী কিম্বা সঙ্গীত চলছে। আওয়াজটা আমি যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিয়েছি। নতুন একটা জোরালো যন্ত্র কিনেছি, পাশের পাঁচটা বাড়ী তার পরাক্রম অনুভব যদি না করল তা'হলে আমার পয়সা খরচ করাই ত' বৃথা—এই পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার মাঝখানে হঠাৎ একদিন সকালে—

মনে করুন আপনি বাজার থেকে ঘুরে এসে পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন যে সেটা প্রায় খালি। মেজাজ আপনার তিরিক্ষি। এমন সময়—

—আপনার চাঁদাটা···

—কিসের?

—পাড়ার কালিপুজো···

বলার কিছু নেই। পাড়ার পুজো! পাড়া?

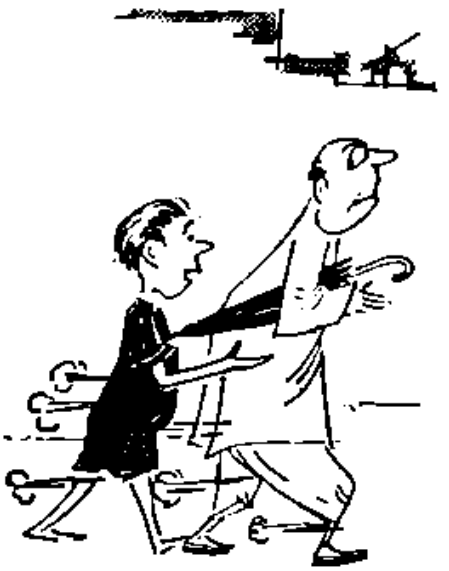

চাঁদাটা দিয়ে যান তো

কোথা সেই পাড়া? সেই বাঁধন, সেই নিবিড় সম্পর্ক, সেই যোগাযোগ? কোথায় সে সব? সদরের যেটা পুরোনো অংশ সেখানে যান, দেখবেন বোসেদের বাড়ীটা বিক্রী হয়ে গেছে দেনার দায়ে—কিনেছে একজন রাজস্থানী। মিত্তিরদের বাড়ীটার ওপর দিয়ে ইংপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের রাস্তা বেরিয়ে গেছে। ওদের এক একজন এক এক জায়গায় গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। কেউ বেলেঘাটায়, কেউ নারকেলডাঙায়, কেউ বরানগরে, কেউ বেহালায়। চাটুজ্যে বাড়ী পার্টিশন হবার পর যে যার অংশ বেচে দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়েছে। কে কোথায় গেছে কেউ তার খবর রাখে না। টুকরো অংশগুলো কিনেছে কাবোয়ারেরা ব্যবসার মাল জমা করবে। বাড়ুজ্যে মশাই পেনসেনের টাকায় সংসার চালাতে না পেরে একতলা-দোতলার পাঁচঘর দক্ষিনী ভাড়াটে বসিয়ে নিজে চিলের ছাদে আশ্রয় নিয়েছেন। দত্তবাড়ীটা ভেঙে খসে পড়ছে। কর্পোরেশনের নোটীশ পড়েছে! সর্বত্র একটা ভাঙনের দাগ। কেউ কারুর খবর রাখে না। অবলুপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে যেন ঝুকছে এই পুরোনো পাড়াটা। নতুন গড়ে উঠেছে যে সব এলাকা সেখানে যান দেখবেন নানাজায়গা থেকে নানারকমের লোক এসে বাসা বেঁধেছে। যে যার সে তার। নতুন জমিতে নতুন মানুষ। সবাই নিজের নিজের গণ্ডীর মধ্যে আটক। কেউ কারুর খবর রাখে না। কেউ কাউকে চেনে না। চিনলেও সেটা জানাতে চায় না। বাইরের কেউ এসে যদি কারুর ঠিকানা খোঁজে বলে 'জানি না'। পাছে জানি বলে প্রেষ্টিজ চিলে হয়, "আমি একটা চ'! হুঁ! আমি ও সব চুনোপুটীর খবর রাখবো?" ভাবটা এইরকম।—এহেন অবস্থায় উগ্র-দুরন্ত কেশ আর অশান্ত বিস্রান্ত বেশ যদি জলন্ত সিগারেটের ধোঁয়াটা আপনার মুখের ওপর ছেড়ে বলে 'পাড়ার পুজো' অর্থাৎ পল্লীর সকলের মঙ্গল কামনায় দেবতার অর্চনা; তাহলে যে কথাটা প্রথম আপনার মনে আসে সেটা হচ্ছে—"তোমরা কে হে বাপু?"

মনে আসে। বলতে পারেন?

না। পারেন না। কারণ আপনি জানেন বলার পর আপনাকে ওখান থেকে বাদ তুলতে হবে। কাজেই বেশী তর্ক না করে টাকাটা আপনি দিয়ে দেন যে করেই হোক। আর আপনার টাকাটা হাতে নিয়ে রসিদ লেখার সময় ওরা যখন আপনার মুখের দিকে সটান চেয়ে জিজ্ঞেস করে "কী নাম লিখবো?" তখন "পাড়ার পুজোর" মাতব্বরী আপনি মর্মান্তিক ভাবেই অনুভব করেন। আপনি তখন বোঝেন আপনিই-বা কোথা আর ওরাই বা কোথা! আপনাদের মধ্যে অর্থাৎ পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে সেতু ঐ চাঁদা! আর সেটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামন্ত্রিক সেতুটা ভেঙে গেল। আপনি আবার একলা। যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্যে আপনার দরজায় ওরা এসেছিল সে অনুষ্ঠানে আপনি গেলেন কী না গেলেন কেউ তার খোঁজ করবে না। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আপনি দেখবেন আলোর মালা আর টের পাবেন গানের জ্বালা, যার খানিকটা খরচা আপনি দিয়েছেন—কিন্তু আপনাকে কেউ চিনবে না! আগের যুগে এমনটি হোত না।

কি নামে রসিদ কাটবো?

এ ছাড়াও আছে।

এই রকম "আলা যেন কতকালের চেনা।" মার্কা পাড়ায় দুলালেরা দলেদলে বিভক্ত।

"ওদের অত দিয়েছেন আর আমাদের বেলা এত কম! আমাদের পুজোটাই আদি, জানেন ত?...আমরা এবার অমুককে আনছি.....একটু বেশী না দিলে....." গতবারে কালিপুজো ছিল একটা এবার দুটো—আগামী বারে তিনটে নিশ্চয়ই। সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যুগ-সম্পাদকের মন-কষাকষি ভাব। কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে বিভাগীয় সম্পাদকদের খরচ নিয়ে হাতাহাতি। সভাপতি আর পৃষ্ঠ-পোষকের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই। কাজেই একটা দল ভেঙে দুটো...দুটো ভেঙে তিনটে। আর যখন পাশাপাশি দুটো জাগোন তখন রেষারেষি অবশ্যই—আর তার মানে বেশীবেশী খরচা। দেনেওয়ালা আপনি। আপনি তিনভাগ হন নি—একই রয়ে গেছেন। এখন দিতে হবে তিন জায়গায়—রেট কমানো চলবে না। ইতিমধ্যে আপনার আয় না বাড়লেও ব্যয় বেড়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বলা কিছুই চলবে না। বলে লাভও নেই। শুধু মুখ নষ্ট করা। ওরা যখন দেখা দিয়েছে তখন না নিয়ে যাবে না। —দিয়েই দিন, ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে পারবেন না।

কিন্তু বলতে পারেন কেন ওরা এমনি করে একটা অনুষ্ঠানের জন্যে দু'মাস ধরে দরজায় দরজায় ঘোরে? পাড়ার জন্যে ওদের এত মাথা ব্যথা? না কি ওদের হাতে করার মত কিছু নেই বলে, কিংবা থাকলেও ওদের মন তাতে নেই বলে? একটা কিছু চায় ওরা, মুক্তাটা ভরিয়ে রাখতে চায় তাই কী? বোধ হয় তাই। কোনরকম একটা উত্তেজনা ওদের চাই, ওরা যে আছে

এইটে অনুভব করার জন্যে। ওরা যে স্বীকৃত এবং কিছু করতে পারে তা কেমন করে ওরা প্রমাণ করবে? তাই ওদের অত উৎসাহ সর্বজনীন পুজোয়, বড়লোকের জন্মোৎসবে, বিচিত্র অনুষ্ঠান কিংবা নির্বাচনী যুদ্ধে, শ্রমিক মালিকের লড়াইয়ে, পথ বন্ধ করায় জোলুষে? বড় বড় হরফে লেখা লাল শালুটা রাস্তার মোড়ে দু'মাস আগে লটকানোর পেছনে কী এই একটা কিছু করতে হবে মনোবৃত্তি? কোন কোনা করে কতটা উঁচুতে শালুটা কোনখানে টাঙানো হবে অন্ততঃ তাই নিয়ে ত' বেশ খানিকটা তর্কাতর্কি নিজেদের মধ্যে হতে পারে। তাতে বেশ কিছুটা উত্তেজনা অনুভব করা যায়। কাকে সভাপতি করা যাবে, উদ্বোধনের জন্যে কাকে ডাকা হবে, প্রধান অতিথির সামনে কাকে এনে বসানো হবে, কোন কোন আর্টিষ্টকে 'বুক' করা হবে—এ সব নিয়ে বেশ কয়েক দিন কথা কাটাকাটি, এদিক ওদিক ছোটাছুটি করা যাবে। এরপর আসল অনুষ্ঠানের সময় হৈ চৈ ত' আছেই। তারপরও তাই নিয়ে দিন কয়েক ধরে আলাপ আলোচনা চলতে পারে—কার গান ভাল হয়েছিল, কে কমিকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়ে গেল, সভাপতির বক্তৃতাটা কী রকম বাজে হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। মন্দ কী? পাঁজিতে বিসর্জনের দিন পেরিয়ে গেলেও প্রতিমাকে যেতে নাহি দিব বলে আঁকড়ে থাকা (যা কিছুদিন আগেও ছিল, পুলিশের কড়াকড়িতে আজকাল কমেছে)—তার পেছনেও কী 'যে কটা দিন হৈ চৈ করা যায়' এই মনোভাব ছিল না?

বয়স যাদের যৌবনের কোঠা পেরোয়নি তাদের আত্মপ্রকাশের একটা পথ চাই-ই। সেই পথটা যদি ওদের আপনার দরজার সামনে নিয়ে আসে তাহলে কী-ই বা আপনি বলতে পারেন? অন্ততঃ কঠিন হয়ে ওদের 'না' বলবেন না। চাঁদা গেলে ওরা যদি চাঁদ হাতে পায় তা হলে সোনার চাঁদের চাঁদি দিয়ে খাতির করার আগে এক কাপ চা অন্তত দিন। ওরা ততক্ষণ গলাটা ভিজিয়ে নিক। কোন সকালে যাহারা বেরিয়েছে। সেই ফাঁকে আপনি পাঁজিটা ফাঁক করে দেখুন কত আছে।

"দাতা শতং জীবতু"

তা'হলে এবার দিয়েই দিন।

বিষ হেমলক্ খাওয়ার পরে সক্রেটিস্ ঘরের মধ্যে একটু হাঁটাহাঁটি করছিলেন। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও তিনি হাসি মুখে শিষ্যদের বললেন: এইবার পা দুটো ভারি হয়ে আসছে। এর পরে কোমর—তারপরে পেট—তারপরে বুক—তারপরে সব শেষ! হো—হো করে প্রাণখোলা হাসি হাসলেন তিনি।

অবধারিত মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক দেখিয়ে গেলেন মৃত্যুর আনন্দ।

একটি আকাশছোঁয়া ইমারত

হামবুর্গ বন্দরের যেখানে দেশ-বিদেশের জাহাজ এসে ভীড় জমায়, ঠিক তার কয়েক পজ ঘুরেই ভবিষ্যতে এক আঠারো তলা আকাশ ছোঁয়া ইমারত উঠবে। এই ইমারতের নামকরণ হয়েছে "ইউরোপয়েন্ট"। এই ইমারত ঘিরে তৈরী হবে পাঁচটি কাঁচের প্যাভিলিয়ন যেখানে নানা জিনিষের প্রদর্শনী হবে। আর থাকবে একটি রেষ্টুরেন্ট, সভা সমিতির একটি কামরা, নানা রকমের খেলাধুলার ব্যবস্থা, ছোটদের পার্ক ও খেলার জায়গা ও বেশ কয়েক শত গাড়ী পার্ক করার জায়গা।

এই ইমারতটি হবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় বস্তুর একটি সঙ্গমস্থল। য়ুরোপ ও বিদেশি কুড়ি তিরিশটি দেশ তাদের উৎপন্ন সেরা সামগ্রী এখানে স্থায়ীভাবে রেখে দেবে ও সেসব সম্বন্ধে, যাবতীয় তথ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করবে। এর ফলে একটি দেশ আর দেশের জিনিষ পত্রের সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যের তুলনা করার সুযোগ পাবে।

তাছাড়াও এই ইমারতের কিছুটা হোটেল হিসেবেও ব্যবহার করা হবে। এই ইমারতের পরিকল্পনা করেছেন হামবুর্গের কুর্ট লাসেক। আটবছরের চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ তাকে এই ইমারত নির্মাণের অনুমতি দিয়েছেন। আগামী বছরে এই ইমারত নির্মাণ শুরু হবে এবং শেষ হবে ১৯৬১ সনে।

আজ আর অসম্ভব নয়

আগামী বছরের মার্চমাস থেকে পশ্চিম জার্মানীতে যাদের টেলিফোন আছে, তারা য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উপগ্রহ মারফৎ টেলিফোনে কথাবার্তা বলতে পারবে। এই ব্যবস্থায় পশ্চিম জার্মানী সমেত মোট তেরটি দেশ যোগ দিয়েছে। আগামী মার্চ মাসে অতলান্তিক মহাসাগরের ওপর মহাকাশে একটি স্বাদু উপগ্রহ স্থাপিত করা হবে। উপগ্রহ মারফৎ টেলিফোন করার জন্যে মোট ২৪০ টি লাইন থাকবে। উপগ্রহ তৈরী ও স্থাপন করায় যে মোট ব্যয় হবে তার ৩০১ শতাংশ খরচ বহন করবে পশ্চিম জার্মানী

এদেশের ধনীরা কি বলেন ?

দূর পাল্লায় সফর করতে হলে য়ুরোপ আমেরিকার ধনী লোকরা তাদের গাড়ির পেছনে একটা চাকাওয়ালা কামরা বেঁধে নিয়ে যান। একে বলা হয় ট্রেলার। এই ট্রেলারে রান্না, খাওয়া, শোওয়া, বসা সবই চলে। এখন এই ট্রেলার এমন কায়দায় করা হচ্ছে যেটা মুড়ে গ্যারেজের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা যায়। মুড়লে এই ট্রেলারের উচ্চতা হয় মাত্র ২০ ইঞ্চি। পশ্চিম জার্মানীতে তৈরী এই ট্রেলারে পুরোনো ধরণের ট্রেলারের সব সুখ সুবিধেই বর্তমান। চাকাওয়ালা এই কামরায় আটজন মানুষ বসতে পারে ও তিনজন শুতে পারে। ভবিষ্যতে যাতে আরও বড় মোড়া ট্রেলার তৈরী করা যায়, তার ব্যবস্থা চলেছে।

ভেবেছেন কি
ওদেশের হাড় কাপানো শীতে আপনার পোষাক কি হবে ?

য়ুরোপ শীতের দেশ। দুর্দান্ত ঠাণ্ডার কবল থেকে বাঁচতে হলে গরম জামাকাপড় সেখানে একান্ত দরকার। এই গরম পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী হয় পশম থেকে কিম্বা জীবজন্তুর লোম থেকে। পৌষীন মহিলাদের কাছে জীবজন্তুর লোম দিয়ে তৈরী শীতের পোশাকের চাহিদা আরও। আর তার ওপর নির্ভর করে একদিন অবিভক্ত জার্মানীর লিপজিগে গড়ে উঠেছিল জীবজন্তুর লোম বা ইংরেজীতে যাকে ফার বলে, তার বিরাট কারবার। ১৯৩৩ সন পর্যন্ত য়ুরোপের চারদিক থেকে "ফার" এসে জমা হ'ত এই লিপজিগে তারপর যখন জার্মানী দু'ভাগ হয়ে গেল। ফার কারবারিরা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল কিন্তু যারা বিদেশে গেলনা, তারা পশ্চিম জার্মানীতে এসে কারবার ফেঁদে বসল। এখন পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুট হ'ল "ফার" ব্যবসার নতুন কেন্দ্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগে পৃথিবীর অন্যান্য শহরেও এই ব্যবসা বেশ ঘাঁটিয়ে বসেছে যেমন ন্যুইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, মিলান, অসলো, কোপেনহেগেন ইত্যাদি। ফার-এর ব্যবসা এখন তাই আর জার্মানীর একচেটিয়া নয়। তবে ফ্রাঙ্কফুটকে বলা চলে ফার ব্যবসায়ের একটি অন্যতম আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। বছরে বছরে এখানে "ফার" সম্বন্ধে মেলা বসে এবং এই মেলা বছর বছর বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

ফ্রাঙ্কফুটের আশেপাশে কম করে—এর ব্যবসায়ী, কারখানা, তৈরী পোশাকের দোকান এবং দালালদের নিয়ে ১৫০টি প্রতিষ্ঠান আছে। বেশিরভাগ দোকানে লিপজিগের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলির পুরোনো নাম বজায় রাখা হয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে পশ্চিম জার্মানীর ৮০ ভাগ "ফার" সরবরাহ করা হয় অথচ আগে লিপজিগে থেকে ৮৫ ভাগ ফার দেশবিদেশে চালান দেওয়া হ'ত। এই ফার-এর ব্যবসায় সারা পৃথিবীর মধ্যে আজ পশ্চিম জার্মানীর স্থান পঞ্চমে এসে দাঁড়িয়েছে।

নানা রকম জীবজন্তুর লোম থেকে "ফার" তৈরী হয় যেমন মিঙ্ক, ইঁদুর, ভেড়া, বেজী, চিতাবাঘ, শিয়াল ইত্যাদি। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান "ফার" হল মিঙ্ক এবং এবছর এটাই সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফ্যাশন—সচেতন মহিলাদের কাছে মিঙ্ক লাগানো পোশাকের আদর এবছর সবচেয়ে বেশি।

বিচিত্র বিজ্ঞান

ব্রিউনিখের শল্য চিকিৎসক অধ্যাপক রুডল্ফ জেরারের মতে হার্টের অস্ত্রোপচারে ইদানীং যে অগ্রগতি হয়েছে তা বহু চিকিৎসকেরও অজানা। হার্টের অস্ত্রোপচারে যে উন্নত পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, তাতে এখন এই অস্ত্রোপচারে পূর্বের মত ভয়ের কোন বিশেষ কারণ আর নেই। অতি সামান্য ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে এখন নানা রকম হার্টের অসুখ সারান সম্ভব। পাঁচ বছরের পর শিশুদের ওপরেও সাফল্যের সঙ্গে অস্ত্রোপচার করা চলে।

যে সব মানুষের হার্টের ধমনী অল্পবিস্তর বিকৃত অথবা কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত তা আধুনিক অস্ত্রোপচারের সাহায্যে কৃত্রিম ধমনী স্থাপনের ফলে স্বাভাবিক কর্মোপযোগী করে তোলা হচ্ছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে যে দুজন নাম করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইঞ্জিনীয়ার এম, লোয়েল এডওয়ার্ডস ও পশ্চিম জার্মানীর হার্ট স্পেশালিষ্ট ডাক্তার অ্যালবার্ট ষ্টার।

১৯৩০ সনে শৈশবে বিকৃত ও বাতগ্রস্থে বিকল একজন ৫২ বছরের রুগীর হার্টে প্রথম কৃত্রিম ধমনী স্থাপন করা হয়। অস্ত্রোপচার করেন ডাক্তার ষ্টার নিজে। কয়েক সপ্তাহ পরেই রুগী নিরাময় হয়ে উঠে স্বাভাবিক চলাফেরা শুরু করে। আজ সে এইভাবে চিকিৎসিত অন্যান্য মানুষদের মত বিনা অসুবিধায় নিজের কাজকর্ম করে চলেছে।

এই কৃত্রিম ধমনীতে থাকে একটি ৩।৪" ব্যাসের প্লাষ্টিকের নল যেটি একটি মেডাইকি ষ্টেনলেস ষ্টীলের ফ্রেমের মধ্যে অবাধে নড়াচড়া করে। বিশেষ তন্তু দিয়ে তৈরী এই ফ্রেমটিকে হার্টের ধমনীর মুখে এমনভাবে সেলাই ক'রে দেওয়া হয় যাতে ঐ নলটি স্পন্দনের স্বাভাবিক ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে হার্টের কুঠরীর মধ্যে রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

'রাণীমুদিনীরগলি
সরাবের দোকান খালি
যত চাবে তত পাবে পয়সা নেবেনা'

গত বছর পশ্চিম জার্মানীতে লোকে চুকচুক করে মদ খায়নি, একেবারে চকচক ক'রে গিলেছে, এত মদ তৈরী হয়েছিল। এত গিলেও গতবছরের অর্ধেক মদ মজুত রয়ে গেছে। এবছর আবার গতবছরের চেয়ে বেশি আঙুর ফলেছে অথচ গতবছরের তৈরী মদ খেকে যাওয়ায় এবছরের আঙুর থেকে তৈরী মদ রাখার সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই এবছরের মদ রাখার জন্যে ভাটিখানাগুলো লোককে ডেকে ডেকে শুধু বিনি পয়সায় মদ খাওয়াচ্ছে তা নয় সঙ্গে সঙ্গে পেটপুরে খাওয়াচ্ছেও। এতে পুরোনো মদের পিপেগুলো যেমন উজাড় হচ্ছে, তেমনি মদের কারবারিদের খানিকটা বিজ্ঞাপনও হয়ে যাচ্ছে। সেকালে জার্মানীতে একটা রীতি ছিল যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে যে সব গাড়োয়ান গাড়ি চালাতো কিম্বা মাল্লমজুর আসতো যেতো, তারা শুল্ক দেওয়া থেকে রেহাই পেতো যদি তারা ভাটিখানার কাঠের চামচে দু'লিটার মদ এক চোকে গিলতে পারতো। তবে এটা ছিল আবগারির লোকদের কর আদায় করার একটু দুষ্ট ফন্দি। পথের ট্যাক্স দেওয়া থেকে গাড়োয়ানরা রেহাই পেলেও মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাবার অপরাধে তাদের ধরে চালান দেওয়া হত ও তখন ট্যাক্স আদায় করা হত।

কবে মধুযামিনী ?

বিয়ের দিনে তরুণ দম্পতীযুগলের কাছে দিনটি হয়ে ওঠে রঙীন, মনে জাগে কত আশা, কত কল্পনা। যদু ভাবে সে কোন অচিন দেশের রাজকন্যা, তাকে নিয়ে যেতে আসবে রূপকথার রাজপুত্র তার স্বপ্নলোকের দুর্গে। তাইতো সেদিনটিতে সে রাণীর মত বেশভূষা করে, রাণীর মতই করে ঘোরাফেরা। কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে সে স্বপ্ন সত্য হয়ে দেখা দেয়! তবে এ স্বপ্ন যাতে সত্য হয়, অন্তত একদিনের জন্যও তারই ব্যবস্থা হয়েছে দক্ষিণ জার্মানীর একটি শহরে। সঙ্গে কিন্তু রাজপুত্র থাকা চাই, নচেৎ নয়।

পশ্চিম জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয় শহর এরলাঙ্গেনের পৌরপিতারা কল্পনা বিলাসী বর ও বধূদের ব্যবহারের জন্যে একটি সত্যিকারের দেকেলে দুর্গ আলাদা করে রেখেছেন। শহর থেকে মাইলটাক দূরে, শান্ত সরোবর ঘেরা সবুজ জঙ্গলের মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঐতিহ্যমণ্ডিত এই দুর্গটির নাম আটেংফেল্‌সবের্গ দুর্গ। এর নীলঘরে রাজকীয় পরিবেশে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবার সমুদয় ব্যবস্থা আছে। আর এর তৃতীয় তলায় অভ্যর্থনা ও নাচঘর থেকে চারিদিকে বিস্তৃত প্রকৃতির এক অপূর্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

এতকাল পর্যন্ত সমরসজ্জার আলবাবে শোভিত বাড়গঠনের আলোক মুখরিত ও দাস ভেদভেটে মোড়া এই দুর্গের নাচঘরে বিশিষ্ট লোকদের সম্বর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হত কিন্তু কিছুদিন আগে পৌরপিতারা এই দুর্গটিকে জনসাধারণের আমোদ অনুষ্ঠানের জন্যে ভাড়া দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভাড়া অতি সৎ সামান্য কেননা পৌরশাসকরা ভাড়াসত্ত অর্থের জন্যে মোটেই লালায়িত নন; তারা চান শহরের সকলে যেন ভাবতে পারে এই দুর্গ তাদের সকলের সম্পত্তি, সকলেই এটা ব্যবহার করতে পারে।

গত ইষ্টারের সময় আটেংফেল্‌সবের্গে প্রথম মধুযামিনী যাপন করে এক তরুণ দম্পতী যুগল। তারপর থেকে এমন একটি দিনও যায়নি যেদিন দুর্গটি বিবাহ উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়নি। অবশ্য এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে বেশ কয়েকমাস আগে থাকতে রিজার্ভ না করলে এই দুর্গটি ভাড়া পাওয়া মুশকিল।

জানেন কি
কারা প্রথম আকাশে উড়েন ?

বর্তমান শতাব্দী সবে মাত্র শুরু হয়েছে। এই মরজগতের একজন মানুষের বহুদিনের স্বপ্ন, পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে আকাশে উড়তে হবে। সত্যিই মানুষটি দিনরাত চিন্তা করে এই নিয়ে। আকাশে ওড়ার কল্পনা তখন বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়! এক শীতের দিনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে প্রবল বেগে। সেইদিন মানুষটির স্বপ্ন সত্যই বাস্তবে পরিণত হল।

কাঠ আর মোটা কাপড় দিয়ে একটি বিমানের কাঠামো তৈরি হল। তার সঙ্গে সংযুক্ত হল পেট্রোলচালিত ইঞ্জিন। যন্ত্রচালনা করা হল। দেখতে দেখতে সেটি মাটি ছেড়ে শূন্যে কয়েক ফুট উঁচুতে উঠল তার চালককে সঙ্গে নিয়ে, মুহূর্তের শূন্যে ভেসে চলল, তারপর নীচে পড়ে গেল।

চালকের নাম অরভিল রাইট। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। অরভিলের

বয়স তখন ৩১। এই যুবক আমেরিকানটিই সর্বপ্রথম যন্ত্রচালিত বিমান নির্মান করে আকাশে উড়ে বিমানযাত্রার ইতিহাসে যুগপুরুষ বলে পরিগণিত হয়েছেন।

অরভিল শূন্যে ছিলেন মাত্র ১২ সেকেণ্ড। তিনি মাটি থেকে ১৪ ফুট উঁচু দিয়ে ১২০ ফুট ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু এই বারো সেকেণ্ডের শূন্য যাত্রাই এক নতুন যুগের সূচনা করল। মানুষ ছাড়পত্র পেল এক রহস্যময় জগতে প্রবেশ করার—এ জগৎ পাখীদের জগৎ, চাঁদ-তারাদের জগৎ। ঐ বারোটি সেকেণ্ড মহাকাশযুগের অভ্যুদয় ঘটাল।

অরভিল আর তাঁর ভাই উইলবার ঐ একই দিনে চারবার শূন্যে ওঠেন—প্রত্যেকে দুবার করে। সবচেয়ে বেশিক্ষণ ছিলেন উইলবার। তিনি শূন্যে ছিলেন ৫৯ সেকেণ্ড এবং ৮৫২ ফুট উঁচুতে উঠেছিলেন।

১৭ই ডিসেম্বর দিনটি তাই সারা যুক্তরাষ্ট্রে "রাইট ব্রাতৃদ্বয় দিবস" নামে প্রতিপালিত হচ্ছে। ঐ দিন পতাকা উত্তোলন, বিমান প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ঐ পুণ্যস্মৃতি ভ্রাতৃদ্বয়ের স্মরণে আরও অনেক কিছু অনুষ্ঠান হয়। এই দুটি ভাইয়ের প্রতিভা ও উদ্যম, পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ভাষায় বলা যেতে পারে "এই পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশকে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এনে ফেলেছে এবং আমাদের জীবনের ধরণ পাল্টে দিয়েছে।"

রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই প্রথম সাফল্যের দিনটি থেকে মাত্র ছয় দশকের মধ্যে মহাকাশ বিজ্ঞানে আজকের এই বিপুল অগ্রগতি সত্যই বিস্ময়কর। বর্তমানে একখানি জেট বিমান মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মানুষকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে আনতে পারে, অথচ এই বিমান যেমন শব্দহীন, তেমনি এই তীব্র বেগে বিমান চলাকালে এতে কোন ঝাঁকানিও লাগেনা।

এই সেদিনমাত্র প্রেসিডেণ্ট জনসন একটি নতুন মনুষ্য চালিত বিমানের কথা ঘোষণা করেছেন। এই বিমানটি শব্দের চেয়ে তিনগুণ বেশি বেগে ৮০ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাবে। কিন্তু এই বিমানটি ইতিহাস সৃষ্টি করলেও এর মূল নীতিগুলি কিন্তু রাইটভ্রাতৃদ্বয় নির্মিত প্রথম বিমানটিরই অনুরূপ।

উইলবার রাইট জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইণ্ডিয়ানার নিউ ক্যাসল থেকে আট মাইল দূরবর্তী একটি ছোট গ্রামে ১৮৬৭ সালের ১৬ই এপ্রিল আর অরভিল জন্মলাভ করেছিলেন ওহায়োর ডেটনে ১৮৭১ সালের ১৯শে আগষ্ট। এঁদের পিতা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপারে খুব আগ্রহশীল ছিলেন এবং একটি টাইপরাইটার তৈরি করে যন্ত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। এঁদের মাও গণিতশাস্ত্রে যথেষ্ট পারদর্শিনী ছিলেন। স্বামীর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কিছুটা অংশ তিনিও লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রদের যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে। এমন কি নিজের রান্নাঘরটি গবেষণাগার রূপে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন পুত্রদের।

অরভিল একবার বলেছিলেন, "আমরা ভাগ্যবান যে এরকম একটা পরিবেশে আমরা বড় হতে পেরেছি। এ পরিবারে শিশুদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের জন্য সর্বদা প্রচুর উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এরকম পরিবেশ না পেলে যা কিছু উৎসাহ ও কৌতূহল আমাদের মনে জেগেছিল তা হয়ত অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত।

শৈশব থেকেই উইলবার ও অরভিল যন্ত্রপাতির দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাড়ীতে তৈরি ছোটখাটো যান্ত্রিক খেলনা বিক্রী করে তাঁরা নিজেদের হাতখরচা জোগাড় করতেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অরভিলের বয়স তখন সাত, আর উইলবারের এগারো, এমন একটা ঘটনা

ঘটল যা শুধু যে তাদের জীবনেই একটা বিরাট প্রভাব রেখে গেল তা নয়, একটা যুগ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে এল।

এদের পিতা একদিন ছেলেদের জন্য একটা উপহার নিয়ে এলেন। উপহারটি হাতের আড়ালে লুকিয়ে রেখে তিনি সেটি ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন কিন্তু সেটি বাতাসে ভর করে সোজা ওপর দিকে চলে গিয়ে ঘরের ছাদে এসে ঠেকল, তারপর মাটিতে পড়ে গেল। এটি একটি খেলনা হেলিকপটার। এই খেলনাটি ঐ দুটি শিশুর মনে যে ছাপ রেখে গেল তা কোনদিন মুছে যায় নি।

অরভিল ও উইলবার হাইস্কুলে পড়াশোনা করলেও ডিগ্রোমার ছাপ তারা পায়নি। কিন্তু বই পড়া ছিল তাদের নেশা। সারা জীবনই তারা অজস্র পড়াশোনা করেছে। তারা ছিল অক্লান্ত কর্মী। আজীবন তারা অবিবাহিত থেকেছে এবং মদ ও তামাকজাত দ্রব্যাদি কখনও স্পর্শ করেনি।

অরভিল আর উইলবার বিমান নির্মাণের স্বপ্নে মশগুল হয়ে রইল। জার্মানীর লিলিয়েন্থালের সেবা পড়ে ওরা খুবই অনুপ্রাণিত হল। লিলিয়েন্থাল গ্লাইডারে দু'হাজার বার আকাশ পাড়ি দেওয়ার পর মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কার্যভার এসে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে।

রাইট ভ্রাতারা নিরলস সাধনা করে যেতে লাগলেন। বহু বাধার সম্মুখীন হতে লাগলেন তাঁরা। শুধু যে একটি জটিল যন্ত্রই তারা তৈরি করতে চলেছেন তা নয়, যে সব যন্ত্রপাতির সাহায্য তারা নিচ্ছেন একাজে সেগুলিও তাঁদের তৈরি করে নিতে হচ্ছে নিজেদের হাতে। কিন্তু দমবার পাত্র তারা নয়। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁরা চালাতে লাগলেন।

অবশেষে ১৯০২ সালের মধ্যে তাঁরা গ্লাইডার ওড়ার সময় তার ভারসাম্য রক্ষা সংক্রান্ত অধিকাংশ সমস্যারই সমাধান করে ফেললেন। তারপর তাঁরা যন্ত্রশক্তির সাহায্যে চালিত বিমান নির্মাণের পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করলেন। ১৯০৩ সালেই তাঁরা একটি যন্ত্র নির্মাণ করলেন। এর জন্য খরচ হল ৫ হাজার টাকারও কম।

কিটিহকে অতলান্তিকের নির্জন উপকূলে সেই ঐতিহাসিক ১২ সেকেণ্ড স্থায়ী ভ্রমণের দু'বছর পরে ১৯০৫ সালের ৫ই অক্টোবর রাইট ভাইয়েরা শূন্যপথে চক্রাকারে সওয়া ২৪ মাইল ঘুরে এলেন ৩৮ মিনিট ৩ সেকেণ্ডে।

প্রথমে বিফল হলেও শেষ পর্যন্ত ১৯০৬ সালের ২২শে মে তাঁরা তাঁদের এই 'উড়ন্ত যন্ত্রের' জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেণ্ট লাভ করলেন। ১৯০৮ সালে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের সমর দপ্তরের পক্ষে প্রথম বিমান নির্মাণ করলেন।

অরভিল ও উইলবার এর পর আকাশ পাড়ি দিয়ে কয়েকবার ইউরোপ ঘুরে এলেন। মানুষের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। নানা সম্মান পুরস্কারে তাঁরা ভূষিত হলেন। প্রেসিডেণ্ট টাফট হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানে তাঁদের পদক দান করলেন।

১৯১২ সালে বিমান নির্মাণ যখন অগ্রগতির পথে চলেছে ঠিক সেই সময়ে উইলবার টাইফয়েড রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। অরভিল একা গবেষণা চালাতে লাগলেন। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিমানের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করায় ১৯১৩ সালে অরভিল "কোলিয়ার ট্রফি" লাভ করলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে অরভিল সিগন্যাল কোর এভিয়েশন সার্ভিসে মেজর পদে অভিষিক্ত হলেন। বিমান বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য অরভিল্ ১৯২৯ সালে ড্যানিয়েল গুগেনহাইম পদক লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে অরভিলের মৃত্যু হয়।

নকল সমুদ্রে জাহাজ !

মোটরগাড়ী বা সিগারেটের মত ছলে একটার পর একটা জাহাজ তৈরী করা যায়না কারণ বিরাট বিরাট জাহাজ সমুদ্রে যাবার আগে ভাসিয়ে পরীক্ষা করা তো সম্ভব নয়। তাহলে না ভাসিয়েই কি বড় বড় জাহাজ তৈরী হয়, না ভাসলে তো সবকিছুই বরবাদ যাবে। সে তো বিরাট লোকসান। তাই পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গে যেখানে সমুদ্রগামী সব জাহাজ তৈরী হয়, সেখানকার পরীক্ষামূলক জাহাজনির্মাণ প্রতিষ্ঠানে বড় বড় জাহাজের ১২ থেকে ৩৬ ফুট লম্বা মডেল জাহাজ তৈরী করে ছোটখাট নকল সমুদ্রে আগে ভাসিয়ে চালিয়ে দেখা হয়। নকল সমুদ্রে সবরকম ব্যবস্থা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা আছে। দেড় হাজার ফুট লম্বা চৌবাচ্চায় মডেল জাহাজ কিরকম চলে তা দেখার জন্যে জটিল বৈদ্যুতিক জরিপ যন্ত্র আছে। মডেল জাহাজ ঐ চৌবাচ্চার সেকেণ্ডে ১২০ ফুট অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইল বেগে চালিয়ে দেখা হয় আর তখন মডেল জাহাজের প্রতিটি চালচাল খুব স্পর্শকাতর নানারকম যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করা হয়। পরীক্ষায় সফল হলে তবেই ঐ মডেল জাহাজের মাপজোক হিসেব করে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরীতে হাত দেওয়া হয়।

স্বপ্ন কি সত্য ?

এতদিন সবার ধারণা ছিল যে যখন খুব তাড়াতাড়ি নিশ্বাস প্রশ্বাস করে তখনই মানুষ স্বপ্ন দেখে, ঘুম ভেঙে গেলেই স্বপ্ন ভেঙে যায়। পশ্চিম জার্মানীর মহিলা মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার ইভেস্ট্রাউথ সে ধারণা ভেঙে দিয়েছেন।

বেশ কিছু দিন হল জানা গেছে যে মানুষ যখন ঘুমোয় তখন একটা নিয়মিত সময় বাদে বাদে ঘুমের গাঢ়ত্ব বাড়ে কমে। বর্তমানে ঘুমের সময় মস্তিষ্কের কর্মপ্রবাহ থেকেও প্রমাণ হয়েছে যে দেড় ঘণ্টা অন্তর ঘুমের গাঢ়ত্বের তারতম্য ঘটে এবং ঘুমের মাত্রার এই তারতম্য ঘটার সময় মস্তিষ্কের তরঙ্গ দ্রুততর হয়, যাকে বলা হয় "বেটা রদম বা ছন্দ"। এই সময় আরও দেখা যায় যে চোখের পাতা নড়ে উঠছে কিম্বা অন্য কোন অঙ্গ নড়ছে যাতে বুঝতে হবে যে মনের মধ্যে কোন জোর মানসিক আলোড়ন চলেছে।

ঘুমের এই পরিবর্তন ও দেহের এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করার তিন থেকে তিরিশ মিনিট পরে মনোবিজ্ঞানী স্ট্রাউথ তার পরীক্ষাধীন ঘুমন্ত ব্যক্তিদের জাগিয়ে তুলে শুনেছেন যে তাদের প্রত্যেকেই ঠিক ঐ সময় কোন না কোন স্বপ্ন দেখছিল। পরের দিন সকালে অবশ্য তারা আর বলতে পারেনি কি স্বপ্ন তারা দেখেছিল কিন্তু এটা তাদের স্মরণে ছিল যে রাতে তাদের জাগানো হয়েছিল এবং তখন তাদের দেখা স্বপ্ন তারা বলেছিল। এই ধরণের পরীক্ষা বহুবার চালিয়ে প্রমাণ হয়েছে যে স্বপ্ন দেখা একটা নিয়মিত ছন্দে ঘটে। ঘুমন্ত মানুষের ঘুম প্রতি ৯০ মিনিট অন্তর পাতলা হয় ও ঠিক তখনই সাধারণত সে স্বপ্ন দেখতে থাকে।

স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাদের আরও একটা ধারণা ডাক্তার স্ট্রাউথ ভেঙে দিয়েছেন। এতাবৎ ধারণা ছিল যে স্বপ্ন কেবল কয়েক সেকেণ্ড বা তার কয়েকাংশ স্থায়ী হয় কিন্তু পরীক্ষায় তিনি দেখেছেন কোন কোন স্বপ্ন আধঘণ্টা পর্যন্ত দেখা চলতে থাকে। অবশ্য স্বপ্নতত্ত্বের আর কোন নতুন অর্থ আবিষ্কার করতে না পারলেও, বৈজ্ঞানিক স্বপ্ন বিশ্লেষণের প্রতিষ্ঠাতা সিগমণ্ড ফ্রয়েড ও অন্যান্য স্বপ্ন বিশ্লেষকদের ফলাফলের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে তাঁর অনুসন্ধানের ফলের মিল দেখা গেছে।

অন্তরীক্ষে

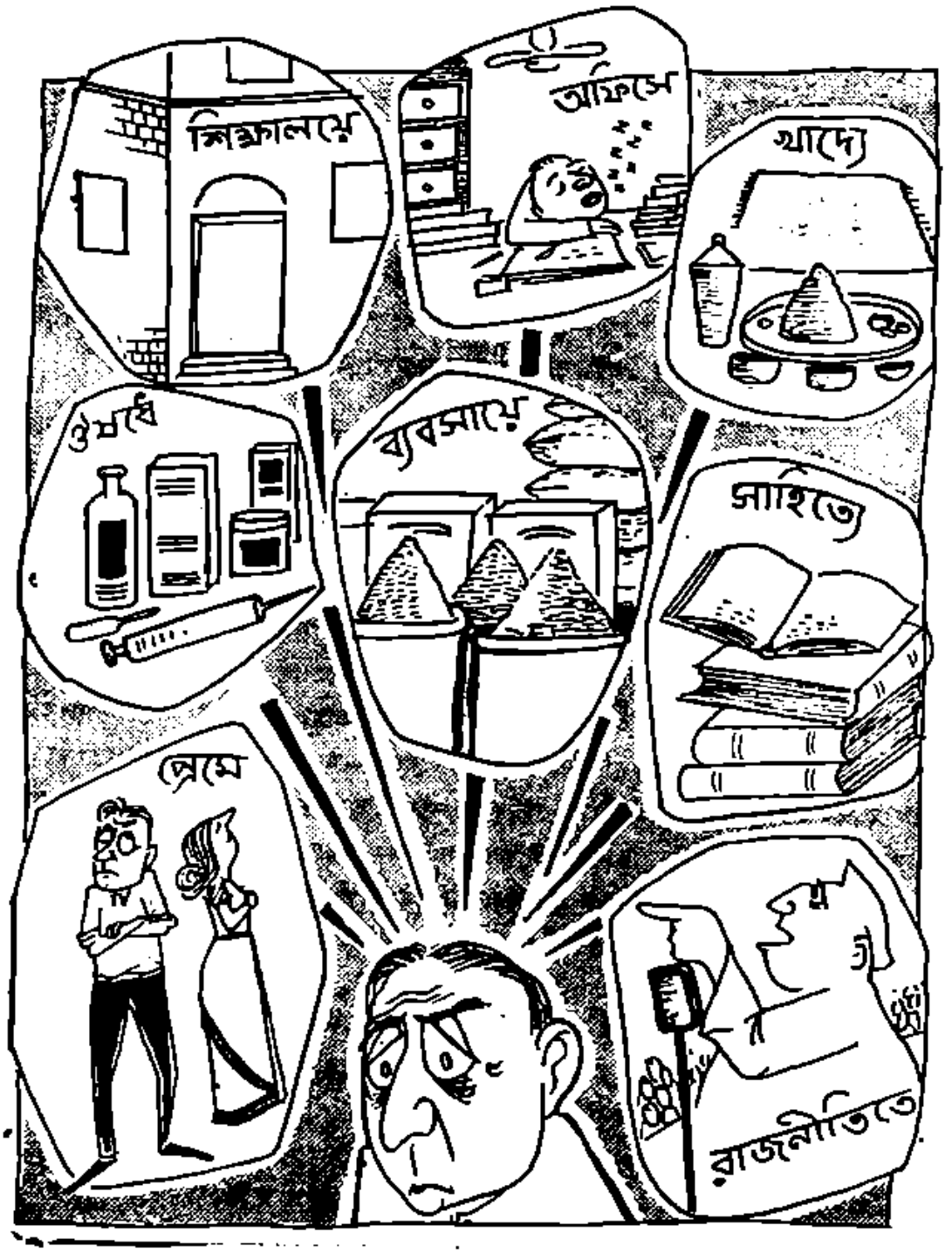

ভেজাল—কোথায় নেই।

অন্তরীক্ষে

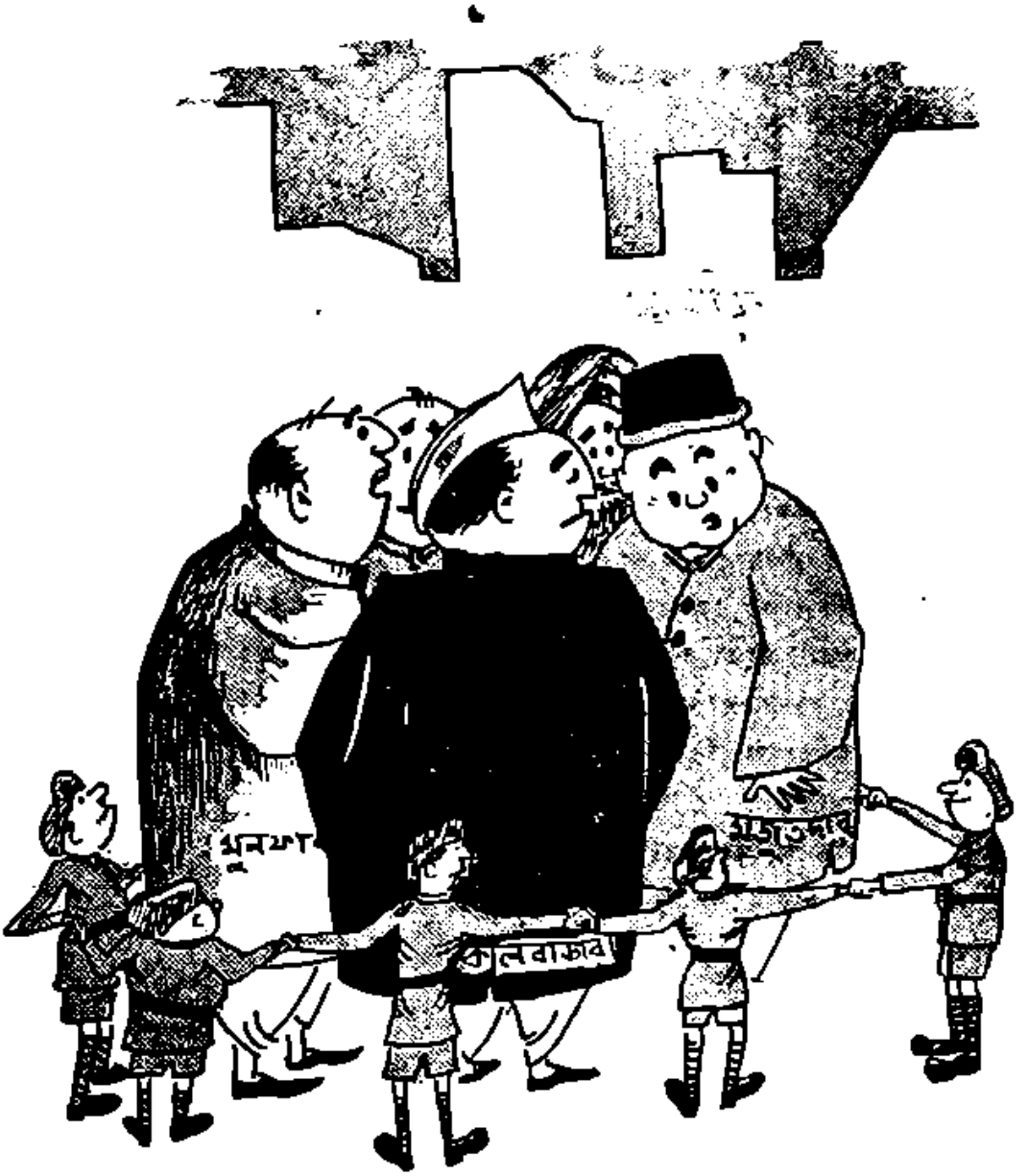

ত্র্যহস্পর্শ।

তাই না?

হ'য়ে ওঠেন এর জন্যে তাঁর মায়ের প্রভাব কম দায়ী নয়। তরুণবিলা নিজে 'সাভোনারোলা' নামে একখানা নাটক লিখেছিলেন।

১৯০৬ সালে এলিয়ট হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিন বছর পড়াশুনোর পর চতুর্থ বছরে পেলেন এম. এ. ডিগ্রি। এর পরে প্যারিসের সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর কাটিয়ে আবার ফিরে এলেন হার্ভার্ডেই। নিলেন সংস্কৃত ও পালি ভাষা আর ভারতীয় দর্শনের পাঠ।

এলিয়টের মাতৃ-দেশ আমেরিকা, দত্তক দেশ ইংল্যাণ্ড। উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি ভর্তি হলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মেটন কলেজে। এখানে থাকার সময় তাঁর মনে হয় কবিতা লেখার জন্যই ইংল্যাণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া দরকার। বিয়ে করলেন ভিভিয়ান হে-উডকে। এলিয়ট প্রথমে কাজ নিয়েছিলেন শিক্ষকতার, পরে ব্যাঙ্কের। আচার-ব্যবহারে তিনি ছিলেন সংযত আর নিয়মানুবর্তী। দিনের বেলা কাটাতেন জীবিকার কাজে আর রাত্রিবেলা পড়াশুনো করতেন, লিখতেন। প্রায় রুটিন মাফিক। বেড়াল পছন্দ করতেন। একটা বই-ও লিখেছিলেন বেড়ালদের বিষয়ে: 'অল্ড পোসুমস বুক অব প্র্যাকটিক্যাল ক্যাটস' (১৯৩৯)।

১৯১৫ সালে কবিতা-পত্র 'পোয়েট্রি' এলিয়টের প্রথম বিশিষ্ট কবিতা 'দি লভ সং অব জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক' প্রকাশ করে। এর পরে প্রকাশিত হয় 'পোর্ট্রেট অব এ লেডি'। ১৯২২ সালে 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড'। অনেকের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে টি. এস. এলিয়ট কবিতার রাজ্যে নতুন এক দিকপাল ব'লে স্বীকৃত হলেন। প্রায় চারশ লাইনের এই কবিতায় 'ভাঙা চিত্রকল্পের স্তূপ'—এর মধ্য দিয়ে তিনি উপস্থিত করেছেন যুদ্ধোত্তোর যুগের অবসাদ। আদর্শবাদ, মূল্যবোধ, আর আশা-ভরসার মর্মান্তিক বিপর্যয়ের চিত্র। এমন এক সভ্যতার আলেখ্য কোনো কিছুতেই যার আস্থা নেই, আছে শুধু অতীত। যে সভ্যতা প্রজ্ঞার চাইতে শুধু বিস্তার, বাণীর চাইতে কথাকে বেশি প্রাধান্য দেয় 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' তার বিরুদ্ধে বিষণ্ণ প্রতিবাদ। বিগত সমস্ত যুগের উত্তরাধিকারী, পরাক্রান্ত বিজ্ঞানের প্রভু, যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞানের অধীশ্বর হয়েও এ-কালের নাগরিক-মানুষ যেন কাণা গলিতে অবরুদ্ধ। 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' গল্পের নায়কের মতো তার অসহায় অবস্থা। বিপুল বৈভব পায়ের কাছে ছড়ানো, কিন্তু তা কাজে লাগাবার উপায় নেই। অন্ততঃ য়ুরোপের মানুষদের কাছে ১৯২২ সালে এই সমস্যা ছিল সবচেয়ে জরুরী। পরের দশকে সমস্যাটি আরো তীব্র হ'য়ে ওঠে। এলিয়টের 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' কবিতায় আছে সমস্যা-পীড়িত সেই য়ুরোপের চেহারা। একজন সমালোচকের ভাষায় কবিতাটি আয়নার মতো ঘুরছে, একবার স্মৃতি একবার বর্ণনায়, একবার অতীত একবার বর্তমানে, একবার সামনে একবার পেছনে। মূল সুর অবসাদ হলেও, শেষ পংক্তিতে আছে আশার সংকেত।

কবিতার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড'। যারা না বুঝেও কবিতা বোঝার ভাণ করেন এই কবিতা তাদের পক্ষে সত্যি আতংকের কারণ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন: কবিতা হবে সরল-সহজ, সকলের বোধগম্য। সেই 'আদর্শ' থেকে কবিতা যে দূরে স'রে এসেছে 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' তারই পরিচয়।

এলিয়ট 'ক্রাইটেরিয়ন' নামে একখানা সাময়িক-পত্রের প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। এর পরে তিনি একটি প্রকাশনী সংস্থার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইংল্যাণ্ডের নাগরিক হয়েছিলেন

১৯২৮ সালে। এই বছরই তিনি যোগ দেন অ্যাংলিকান চার্চে। ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ যে ক্রমশ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে তার পরিচয় পাওয়া যায় 'অ্যাশ ওয়েডনেসডে' কাব্যগ্রন্থে।

এলিয়টের প্রথম নাটক 'দি রক' (১৯৩৪)। একটি সমাবোহময় নাটক। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় 'মার্ডার ইন দি ক্যাথাড্রেল।' ১৯৩৯ সালে 'দি ফ্যামিলি-রি-ইউনিয়ন' আর ১৯৪৯ সালে 'দি ককটেল পার্টি।' শেষ নাটকটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৯৪৮ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল এলিয়টকে।

আধুনিককালে কবি ডান যে নতুন ক'রে আবিষ্কৃত হয়েছেন এর পেছনে এলিয়টের কৃতিত্ব অনেকখানি। কবি ডান-এর মতো মন আর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নিয়ে আধুনিক জগৎকেও দেখতে হবে—এই কথাই বললেন এলিয়ট। তবে ডান-এর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য অনেক। ডান-এর কবিতা আবেগ-উষ্ণ, তুলনায় অনেক ঠাণ্ডা এলিয়টের কবিতা।

চিরায়ত সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, জ্ঞানের ব্যাপকতা ও গভীরতা, অতি আধুনিক চিত্রকল্পের প্রয়োগ, স্বল্প ভাষণ—এলিয়টের কাব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। এই কারণে সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর কবিতা রীতিমতো দুর্বোধ্য। তা সত্ত্বেও সমকালের একটি অধ্যায়ের কবিতা আর কাব্য—সমালোচনার ইতিহাসে টি, এস, এলিয়টের একচ্ছত্র প্রভাব। বিশেষ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তিনি যেন সম্মোহিত ক'রে ফেলেছিলেন। অভিভূত করেছিলেন তাদের, যাঁরা কবিতা লিখছে। তারা তাঁকে সমকালীন সাহিত্যের দুর্দান্ত বিচারক ব'লে গণ্য করতে শুরু করে, যদিও বিচারকের ভূমিকা নিতে তিনি কোনো দিনই ইচ্ছুক ছিলেন না।

এলিয়টের সামনে শেষ পর্যন্ত খোলা ছিল দুটি পথ : জগতের সমস্ত সত্য আর মহত্বকে অস্বীকার, অথবা খ্রীষ্টান ধর্মের আশ্বাসে আত্মসমর্পণ। তিনি দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর অনুরাগী পাঠক যেমন অসংখ্য, তেমনি তাঁর সমালোচকের সংখ্যাও কম নয়। সাম্যবাদীরা তাঁকে বলেছেন প্রতিক্রিয়াশীল লেখক। সব সমালোচনার পরেও 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' এর কবি টি, এস, এলিয়টকে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। ১৯৬৫ সালের শুরুতেই সাহিত্য-জগতে ইন্দ্র-পতন হল।

ইংলণ্ডের কবি টেনিসন রাস্তায় যেতে যেতে শুনতে পেলেন এক ছড়া-গায়ক (ballad singer) টুং টাং করে গাইছেন—

I Come form Reunts of Southampton ইত্যাদি—

সুরটি চমৎকার লাগল তাঁর। তখনি বাড়ী ফিরে এসে তাঁর অমর গীতি কবিতা 'নদী' লিখে ফেললেন।

কোথা থেকে কী প্রেরণা আসে, কেউ বলতে পারে কি ?

টি. এস. এলিয়টের কবিতা

। প্রস্তাবনা ।

ঘনিয়ে এলো শীতের সন্ধ্যা
পথ ছড়িয়ে ধূসরানো মাংসের গন্ধ,
এখন বিকেল ছটা।
ধূসর দিবসের অবাবশেষ
আর দমকা-হাওয়ায় এক পশলা বৃষ্টি
ঝরে-পড়া বিবর্ণ পাতার দল
তোমার পদপ্রান্ত করলো স্পর্শ
যেমন নাকি খলিত সংবাদ-পত্রের খবরগুলি ছিন্নভিন্ন।
বৃষ্টি হানছে—
ঝাপটা হাওয়ায়
ভাঙা শার্সি আর চিম্‌নিতে আঘাত,
এবং পথপ্রান্তে
পরিত্যক্ত গাড়ির একটা ঘোড়া
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকছে,—
ভাপ উঠছে ওর গা থেকে।

ঘনিয়ে এলো শীতের সন্ধ্যা
আর এইবার বাতি জ্বালবার পালা॥

। ফাঁপা মানুষ ।

১

আমরা সব ফাঁপা মানুষ
খড়গর্ভ
পরস্পর জড়িয়ে আছি
হতচেতন বুদ্ধির জটে।

আমাদের শুকনো গলা
আমাদের আলাপন,
নিষ্ক্রিয় আর অর্থহীন।

হায়, আমরা সব ফাঁপা মানুষ!
বাতাস যেমন শুকনো ঘাসে বয়
কিংবা
মেটে ঘরে ভাঙা কাচের উপর দিয়ে ইঁদুর যেমন
দৌড়োয়,

আমরা তেমনি!
আমাদের অমূর্ত গঠন
বর্ণহীন ছায়ার শরীর,
পঙ্গুত্ব জড়িয়ে আছে শিরায় শিরায়,
পদক্ষেপে নেই গতির বিদ্যুত।

এই অসাড়বকে ছাড়িয়ে যাদের তির্যক দৃষ্টি
মৃত্যোত্তীর্ণ কোনো রাজ্যভূমিতে স্থিত প্রজ্ঞ।
যাবে মাঝে তাদের স্মরণে আসি আমরা
হয়তো আসি
বিপ্লবী আত্মার মৃত সৈনিকরূপে নয়,
স্মরণে আসি
নিতান্তই অবলুপ্ত প্রাণ,—খড়গর্ভ।
হায়,
এ যুগে আমরা সব ফাঁপা মানুষ।

। কাঁপা মানুষ।

২

আমার চোখে স্বপ্ন মেলার সাধ নেই
মৃত্যুর স্বপ্নময় রাজ্যে আমি চোখও মেলি না।
না, স্বপ্ন আমার নেই।

যদিও আমি দেখি
সূর্য-আলোর ভাঙা ভাঙা বিন্যাস
গাছের ফোলার শিহরণ
দূরাগত কণ্ঠধ্বনিতে
বাতাসের গান
ভাসমান ঘুমের,—
একটি নিভৃত তারকার চেয়েও
যা আরও মনোরম।
না, মৃত্যুর স্বপ্নময় রাজ্যে
আমাকে নিয়ে যেওনা।
আমাকে দেখতে দাও
স্বপ্নের ওপরেকে নয়,

আমি দেখি
ইঁদুর আর কাক
আড়াআড়ি গান গায়
বাতাসের সুরে সুরে।
না, কাছাকাছি নয়।
গোধূলি মায়ার অঞ্জনে
এই কিন্তু শেষ দেখা নয়॥

অনুবাদ : অমিলকুমার ভট্টাচার্য

• • • •

পার্কের কোনের বেঞ্চিটায় বসে কবিতার খাতা পড়ছিলেন আমেরিকান কবি হুইটম্যান বইখানার কি নাম দেওয়া যায় ঠিক করতে না পেরে মন তাঁর খুবই চঞ্চল।
ভেবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে তিনি উঠ্‌ব উঠ্‌ব করছেন এমন সময় একটি বছর দশেকের মেয়ে এসে তার ছোট ভাইটির সঙ্গে সেখানে খেলা করতে লেগে গেল। ছোট ভাই কিন্তু বড় দুষ্টু। সে সেখানে ঘাসের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিদির গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।
দিদি রেগে গিয়ে বললে—ছিঃ নটন বড্ড নোংরা তুমি,—যে জিনিষ কেউ ছোঁয় না,—তা-ই নিয়ে তোমার খেলা!
—কি জিনিস?—ছুট্‌ ভাই নটন জিজ্ঞাসা করল।
—কেন ঐ Leaves of grass।
হুইটম্যান খুব রেগে তার কবিতার বইয়ের ঐ নামই দিলেন।

খেলাধূলা

"জগৎ জুড়ে খেলার মেলা"

—বিমল দেব

১৯৬৪ সালে ভারতের খেলাধূলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা—টোকিও অলিম্পিকে হকি প্রতিযোগিতায় ভারতের বিশ্বজয়ীর খেতাব পুনরুদ্ধার—বোম্বাইতে টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের জয়লাভ—বিলিয়ার্ড খেলায় ভারতের উইলসন জোন্সের বিশ্বখেতাব অর্জন। আশাকরছি ১৯৬৫ সালে ভারতের ক্রীড়াবিদগণ নূতনতর কৃতিত্বের সন্ধান নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের সুনাম বৃদ্ধি করবেন।

দেশে

নয়াদিল্লী

ভারতের পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আয়োজিত প্রথম বার্ষিক নেহেরু স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতায় নর্দার্ন রেলদল বিজয়ী হয়। বিজয়ীদল ফাইন্যাল খেলায় অপর রেলদল সাউথ ইষ্টার্নকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। টোকিও অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের কীর্তিমান খেলোয়াড় পৃথিপাল সিং নর্দার্ন রেলের পক্ষে গোল দুটি করেন।

• • • •

কলিকাতা

এশীয় জুনিয়র টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যালের খেলায় ভারতের টেনিস তারকা রামনাথন কৃষ্ণান ৬-২, ৬-১ ও ৬-৪ সেটে অষ্ট্রেলিয়ার রড হিউইটকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণান এইবার নিয়ে উপর্যুপরি তিনবার এশীয় টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ীর আখ্যা লাভ করলেন। সেমিফাইন্যাল খেলায়ও তিনি আর একজন অষ্ট্রেলীয় খেলোয়াড় মার্টিন মুলিগ্যানকে পরাজিত করেন। মহিলাদের সিঙ্গলস খেলায় বিজয়িনী হন কুমারী নিরুপমা বসন্ত। ফাইন্যাল খেলায় ইনি গতবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন কুমারী লক্ষ্মী রঙ্গাদেবনকে পরাজিত করেন।

• • •

আহমেদাবাদ

ভারত সফরে এসে সিংহল ক্রিকেটদল তৃতীয় বা শেষ টেষ্ট খেলায় ভারতকে চার উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে। ভারতের খেলোয়াড়রা এই খেলায় শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত প্রথম টেষ্টে ভারত এক ইনিংস ও ৪৩ রানে এবং হায়দ্রাবাদে দ্বিতীয় টেষ্টে ৭ উইকেটে সিংহলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল।

• • • •

ব্যাঙ্গালোর

জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগের ফাইনালে হায়দ্রাবাদ ১৫-৮, ৪-১৫, ১৫-১১ ও ১৫-৬ পয়েন্টে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। মহিলা বিভাগে জয়ী হয় পাঞ্জাব দল। এই বিভাগের ফাইনালে পাঞ্জাব ১৫-১৩, ৩-১৫, ৯-১৫, ১৫-৯ ও ১৫-১২ পয়েন্টে হায়দ্রাবাদকে পরাজিত করে।

• • • •

কটক

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগীয় ফাইনালে সার্ভিসেস দল ৮১-৪৮ পয়েন্টে চির প্রতিদ্বন্দ্বী মহীশূরকে পরাজিত করে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আখ্যা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। মহিলা বিভাগে পশ্চিম বাঙ্গলা ৪৪-১৯ পয়েন্টে দিল্লীকে হারিয়ে দিয়ে অষ্টমবার বিজয়ী হয়। বালক বিভাগে জয়লাভ করে মাদ্রাজ।

• • • •

মণিপুর

ভারত সফরে এসে টেষ্ট খেলায় ফরাসী হকি দল ১-০ গোলে ভারতকে পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ভারতীয় দলে কয়েকজন অলিম্পিক্ খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও ফরাসী খেলোয়াড়দের দৃঢ়তার বিরুদ্ধে তাঁরা সুবিধে করতে পারেননি।

বিদেশে

ব্রিটেন

ইংলণ্ডের বিখ্যাতনাম ফুটবল খেলোয়াড় স্ট্যানলী ম্যাথুজ ইংরেজী নববর্ষের দিনে "স্যার" খেতাব পেয়েছেন। ব্রিটেনে এই প্রথম একজন ফুটবল খেলোয়াড়কে "নাইটহুড" সম্মানে ভূষিত করা হোল। ব্রিটেন ও কমনওয়েলথ দেশের ক্রীড়াবিদদের মধ্যে আর যাঁরা ইংলণ্ডেশ্বরীর খেতাব পেয়েছেন তাঁরা হলেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রাক্তন টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ফ্রাঙ্ক ওরালকট (ও. বি. ই), অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সে সিগুস্যাল্ড (এস. বি. ই)। "ও. বি. ই" খেতাবের পুরো কথা হোল—অর্ডার অফ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার—এবং "এম. বি. ই" বলতে বোঝায় মেম্বার অফ্‌ই ব্রিটিশ এম্পায়ার। টোকিও অলিম্পিকে দুটি স্বর্ণপদক বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা দৌড়বীর পিটার ফেক ও 'ও.বি.ই.' খেতাব

পেয়েছেন। এম. বি.ই খেতাবের তালিকায় আছেন ব্রিটেনের খ্যাতনামা তিনজন এ্যাথলীট—রবি ব্রাইট-ওয়েল ও তাঁর পত্নী-অ্যানা পাাকার এবং মেরী য়াাত। এরা তিনজনেই টোকিও অলিম্পিকে সাফল্য অর্জন করেন।

খেতাব-তালিকার সর্বপ্রথমে রয়েছে ট্রানেলী ম্যাথুজের নাম। অনন্য সাফল্য ও কৃতিত্বে ভরা ম্যাথুজের খেলোয়াড়ী জীবন। সারা বিশ্বের কত সম্মান ও গৌরব লাভ করেছেন তিনি। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি ইংলণ্ডের ষ্টোক সিটি দলের হয়ে খেলা আরম্ভ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ব্লাকপুল ক্লাবে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালে এফ. এ. কাপের ফাইন্যাল খেলায় তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ ক্রীড়ানৈপুণ্য ফুটবল ইতিহাসে অমরীয় হয়ে থাকবে। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর নৈপুণ্যের জন্যই ব্লাকপুল দল সে বছর এফ. এ. কাপ জয়ী হয়েছিল। রাইট আউটের খেলোয়াড় ট্রানেলী ম্যাথুজ অন্ততঃপক্ষে ৯০ বার ইংলণ্ডের হয়ে খেলেন। বয়সে প্রবীন হলেও ম্যাথুজ মনের দিক থেকে এখনও তরুণ। এই সেদিন ও তিনি নবীনদের সঙ্গে মাঠে খেলতে নেমেছিলেন। বলা বাহুল্য সে ক্রীড়া-নৈপুণ্যে অনেক তরুণ খেলোয়াড়ও তাঁর সঙ্গে পেরে ওঠেনি। তাঁর প্রাচীন ক্লাব ষ্টোকসিটির-সঙ্গেই তিনি বর্তমানে জড়িত। সারা বিশ্বের ফুটবল ক্রীড়া-মোদী ম্যাথুজের এই সম্মান লাভে আনন্দিত।

• • • •

আমেরিকা

গত টোকিও অলিম্পিকে সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ১২টি বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া বহু অলিম্পিক রেকর্ড তো ছিলই। আন্তর্জাতিক সন্তরণ নিয়ামক সংস্থা "ইণ্টারন্যাশনাল সুইমিং ফেডারেশন" সম্প্রতি এই ১২টি বিশ্বরেকর্ড অনুমোদন করেছেন। প্রতিষ্ঠিত ১২টি রেকর্ডের মধ্যে আমেরিকার প্রতিযোগিরাই ১০টি রেকর্ড সৃষ্টি করেন। রেকর্ডের তালিকা :—

পুরুষ বিভাগ

৪০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল :—ডন শোলাণ্ডার (আমেরিকা)—সময়—৪ মিঃ ১২'২ সেঃ ;
২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক :—আরান ও' ব্রিয়েন (অষ্ট্রেলিয়া)—সময় ২ মিঃ ২৭'৮ সেঃ ;
২০০ মিটার বাটারফ্লাই ষ্ট্রোক :—কেভিন বেয়ী (অষ্ট্রেলিয়া)—সময় ২মিঃ ০৬'৬ সেঃ ;
১০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক :—টনসন ম্যান (আমেরিকা)—সময় ৫৯'৬সেঃ ;
২০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক :—ষেড গ্রায়েক (আমেরিকা) সময়—২মিঃ ১০'৩সেঃ ;
৪০০ মিটার মীডলে :—রিচার্ড রথ (আমেরিকা)—সময় ৪মিঃ ৪৫'৪ সেঃ ;
৪×১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল রীলে :—আমেরিকা—সময়—৩মিঃ ৩৩'২ সেঃ ;
৪×২০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল রীলে :—আমেরিকা—সময়—৭মিঃ ৫২'১ সেঃ ;
৪×১০০ মিটার মীডলে রীলে :—আমেরিকা—সময় ৩মিঃ ৫৮'৪ সেঃ।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই ষ্ট্রোক :—জ্যান ষ্টোডার (আমেরিকা)—সময়—১মিঃ ০৪'৭ সেঃ ;
১০০ মিটার ব্যাকষ্ট্রোক :—ক্যাথি ক্যাওসন (আমেরিকা)—সময়—১মিঃ ০৭'৭ সেঃ
৪×১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল রীলে :—আমেরিকা—সময়—৪মিঃ ০৩৮ সেঃ

• • • • •

রাশিয়া

নতুন বছরে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদদের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন একজন মহিলা—নাম লিডিয়া স্কভ্‌লিকোভা। "বিদ্যুৎ কন্যা" নামে সমধিক খ্যাত লিডিয়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ৬টি স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। মেয়েদের নিয়ে একটি আদর্শ ক্রীড়াদল তৈরীর জন্য তিনি বর্ত্তমানে শিক্ষাদানে রত আছেন।

• • • •

আগামী বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জনের আশায় রুশ খেলোয়াড়রা পুরোদমে অনুশীলন করে চলেছেন। প্রথম শ্রেণীর খ্যাতনামা দশটি ক্লাবের ৩২ জন খেলোয়াড় বর্ত্তমানে প্রধান "কোচ" মোরোজোভের শিক্ষাধীনে আছেন। বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার 'গ্রুপে' আছে ওয়েলস্, ডেনমার্ক এবং গ্রীস। মোরোজোভের মতে এই গ্রুপে গ্রীসই বিশেষ শক্তিশালী দল।

• • • •

জাপান

আগামী ২৩শে এপ্রিল থেকে ৫ই মে পর্য্যন্ত টোকিওতে এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার সপ্তম অনুষ্ঠান হবে। ভারত, ইস্রায়েল, তাইওয়ান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড ও জাপান—এই নয়টি দেশ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। টোকিওর পাঁচটি ক্রীড়াকেন্দ্রে এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে। গত অলিম্পিকের সময় নির্ম্মিত দুটো ষ্টেডিয়াম ও এই প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবহার করা হবে।

• • • •

হংকং

গত ১০ই জানুয়ারী থেকে হংকং-এ প্রথম এশীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কিন্তু ভারত এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে না পারায় উদ্যোক্তারা প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেন। ভারত সরকার ভারতীয় মহিলা হকি ফেডারেশনকে উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদানের অনুমতি দেয়নি। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মাত্র কয়েকদিন আগে ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত জানা যায়। পূর্বে ঠিক ছিল যে সিংহল, মালয়েশিয়া, ভারত, হংকং ও জাপানের মহিলা হকি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। কিন্তু সূচনায় সিংহল ও মালয়েশিয়া নাম প্রত্যাহার করে নেয়। তবুও উদ্যোক্তাদের আশা ছিল যে ভারত, হংকং ও জাপানকে নিয়ে প্রতিযোগিতা চালানো যাবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভারত যোগদান করতে অক্ষম হওয়ায় প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মাত্র দুটো দল নিয়েতো এশীয় প্রতিযোগিতা চালানো যায় না।

সোভিয়েত সাহায্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

ভারতের কারিগরিবিদদের ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সহায়তা শুধুমাত্র পাওয়ার ইনস্টিটিউটে বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রপাতি সাহায্যের মধ্যে কিংবা ভারতীয় ছাত্রদের সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে শিক্ষালাভের জন্য বৃত্তিপ্রদান বা সোভিয়েত ও ভারতীয় বিজ্ঞানী ও অধ্যাপকদের বিনিময়ের কর্মসূচীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। ভারতকে প্রদত্ত সামগ্রিক সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহায়তার অন্যতম প্রধান অংশই হল ভারতের নিজস্ব ইনজিনিয়ার ও কারিগরিবিদ কর্মীদল শিক্ষিত করে তোলা। এই দিকটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে যথেষ্টসংখ্যক প্রযুক্তিবিদ গড়ে তোলা, সম্ভবতঃ, মেশিন ও যন্ত্রপাতি সাহায্যের চেয়েও ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই, লক্ষণীয় এই যে, ভারতের সোভিয়েত সহায়তায় নির্মিত প্রকল্পগুলিতে কিংবা সরাসরি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলিতে ভারতীয় ইনজিনিয়ার ও কারিগরিবিদদের বিশেষজ্ঞের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার প্রক্রিয়াটি হল প্রতিটি সোভিয়েত সাহায্যে নির্মিত প্রকল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যদিও একদিকে সোভিয়েত সরকার ভারতকে প্রভূত মেশিন, যন্ত্রপাতি ও সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদল পাঠিয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য করার কোনও ত্রুটিই করছেন না; তবু ভারতকে প্রদত্ত সোভিয়েত সাহায্যের মূল কথাটি হল যে, দেশের বুনিয়াদী ভারী শিল্পগুলিকে যাতে ভারতীয় ইনজিনিয়ার এবং কারিগরিবিদরা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারেন—সেগুলির নক্সা করা থেকে সুরু করে পূর্ণোদ্যমে চালু করা পর্যন্ত সমস্ত কাজই স্বহস্তে করতে পারেন—এমনভাবে তাঁদের সম্পূর্ণ সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ করে তোলা। বস্তুতঃ, যে সমস্ত সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা ভারতে আসেন, তাঁরা শুধু প্রকল্পের নির্মাণকার্য, কারখানা প্রতিষ্ঠা ও চালু করার কাজেই সহায়তা দিতে আসেন না, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা আরও যা করেন তা হল সহযোগী ভারতীয় ইনজিনিয়ার ও শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার বিনিময়, প্রযুক্তিবিদ্যার সাম্প্রতিকতম বিকাশ ও কারিগরি জ্ঞান ভারতীয় সহকর্মীদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া।

ভারী ইনজিনিয়ারিং-বিশেষজ্ঞদল

সোভিয়েত সহায়তায় ভারতে যে ক'টি ভারী ইনজিনিয়ারিং প্রমখিন প্রকল্প গড়ে উঠছে, সেগুলি হ'ল—৮০ লক্ষ টন যন্ত্রপাতি বার্ষিক উৎপাদনক্ষম রাঁচীর ভারী মেশিন তৈরির কারখানা (পরে যার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ১,৬৫,০০০ টন বার্ষিক উৎপাদন করা হবে); দুর্গাপুরের বছরে ৪৫,০০০ টন খনিযন্ত্র উৎপাদনের উপযোগী কোল মাইনিং মেশিনারী কারখানা; এবং হরিদ্বারে রানীপুরে ভারী

"সেদিন একজন ধনী জাপানি তাঁর বাড়িতে চা-পান অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম জাপানিদের পক্ষে এটা ধর্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা।

• • • •

"বাগান জিনিসটা যে কী, তা এরা জানে। জাপানের চোখ এবং হাত দুইই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্যের দীক্ষালাভ করেছে—যেমন ওরা দেখতে জানে, তেমন ওরা গড়তে জানে।"

• • • •

(গৃহস্বামীর) "মেয়ে এসে নমস্কার ক'রে চা তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ ক'রে চা তৈরির প্রত্যেক অঙ্গ যেন ছন্দের মতো। ধোয়া মোছা, আগুন জ্বালা, চাদানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংযম এবং সৌন্দর্যে মণ্ডিত যে, সে না দেখলে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আসবাবটি দুর্লভ ও সুন্দর। অতিথির কর্তব্য হচ্ছে, এই পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একান্ত মনোযোগ দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র নাম এবং ইতিহাস। কত যে তার যত্ন, সে বলা যায় না।

সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীরকে মনকে একান্ত সংযত ক'রে, নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর ভোগোন্মাদ নয়—কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতা বা অমিতাচার নেই; মনের উপরতলায় সর্বদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে, নানা প্রয়োজনের হাওয়ায়, কেবলই ঢেউ উঠছে, তার থেকে দূরে, সৌন্দর্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত ক'রে দেওয়াই হচ্ছে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য। এর থেকে বোঝা যায়, জাপানের যে সৌন্দর্যবোধ সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসব– য়ুরোপের শেষ সীমান্তে

গৌরীশংকর দে

য়ুরোপের শেষ সীমান্ত, নিশীথ সূর্যের দেশ নরওয়ে। কিনলাণ্ড আর সুইডেনের সঙ্গে এর অন্তরঙ্গ যোগ। গ্রীষ্মের উষ্ণ আমেজটুকু ছাই-ছাই ক'রেও থেকে যায় পুরো তিনটি মাস। একদিকে গভীর খাদ, অন্যদিকে খাড়া পাহাড়—এই হল দেশটির ভৌগোলিক চেহারা। অবিস্মরণীয়, অতুলনীয় এর নিশীথ সূর্যের দৃশ্য। মে থেকে আগষ্ট—এই ক'টি মাস আকাশের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে দিগন্ত রেখার ওপর ঝুলকে আছে সূর্য। অস্তে যাবার নামটিও করছেনা। সূর্যের রং দেখে মনে হয় সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত যেন এক সঙ্গে মিশে গেছে।

সমস্ত দেশটিতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সবুজ বন। আর মাঝে-মাঝেই চোখে পড়ে ঝর নদী। প্রকৃতির কোলে মানুষ তাই নরওয়ের প্রতিটি বয়স্ক লোকই শিকারী, আর প্রতিটি কিশোর দক্ষ জেলে। অরণ্য, হ্রদ, নদী, পর্বতের আহ্বানে সাড়া দিতে সব-সময়েই যেন উন্মুখ এখানকার মানুষ।

নরওয়েবাসীদের সবচেয়ে প্রিয় ঋতু বসন্ত। বছরের সেরা দিনটি হল 'সংবিধান দিবস'। প্রতিবছর ১৭ই মে উৎসব ক'রে এই দিনটি ওরা উদযাপন করে। সেদিন ওরা হৈ-হল্লা আনন্দ করে মনের সব আগল খুলে দিয়ে। কার্নিভালের মেজাজ নিয়ে। রঙ বেরঙের পোশাক পরে শিশুরা, আর সেকেলে সব মজার পোশাক গায়ে দিয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বেরিয়ে পড়ে পথে। প্রতি বছরই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল ক'রে যায় ওস্লো-র রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে। তাদের আগে আগে থাকে ব্যাণ্ড পার্টি। মিছিলটি প্রাসাদের কাছে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজা এবং রাজ-পরিবারের অন্য সব লোক প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে গ্রহণ করেন ছেলে-মেয়েদের অভিনন্দন। নরওয়েতে এই প্রথাটি চ'লে এসেছে বহুকাল আগে থেকে।

নানা রঙের ফুলের পসরা সাজিয়ে প্রকৃতি রাণীও যেন মেতে ওঠে উৎসবের মাস মে-তে। চালু খাদের গায়ে তাকালেই চোখ ছুড়িয়ে যায় নানা ফুলের মেলা দেখে। এই সময়ে অনুষ্ঠিত হয় 'বার্জেন আন্তর্জাতিক উৎসব'। গ্রীগ-এর নিজের বাড়িতে ২৩শে মে থেকে ৭ই জুন পর্যন্ত চলে গান—বাজনা, কনসার্ট, অপেরা ইত্যাদি বিচিত্র অনুষ্ঠান। এতে যোগদান করেন বিশ্ব-বিখ্যাত সব কণ্ডাকটার, শিল্পী, এবং অর্কেষ্ট্রার দল।

শীতের নরওয়ে তো ছুটির দেশ। বরফে তখন ঢাকা হয়ে যায় এখানকার মাটি। দেশ-বিদেশের লোকেরা ছুটে আসে আনন্দের সন্ধানে। এখানে—ওখানে জমে ওঠে খেলা-ধুলোর আসর, মনোজ্ঞ উৎসব। শুরু হয় বরফের ওপর স্কি খেলা। ফেব্রুয়ারীর ৬ থেকে ১৩ আর ১৩ থেকে ২০—এই দুই সপ্তাহ তো 'স্কি-র সপ্তাহ'। জগদ্বিখ্যাত স্কি-খেলোয়াড়রা নানা রকম কলা-কৌশল দেখিয়ে এ ক'দিনে সম্মোহিত ক'রে রাখেন উপস্থিত দর্শকদের। এই সময়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কার্নিভাল খেলার প্রতিযোগিতাও দেখবার মতো। স্কি—কার্নিভাল, ঘোড়া-বাঁধা, হাসিমুখী সজ্জা, স্লেজ-গাড়ি,

ইত্যাদি নিয়ে শীতের নরওয়ে হ'য়ে ওঠে পর্যটকের স্বর্গ। বড়-বড় হোটেলগুলিও সরগরম হ'য়ে ওঠে এই সময়ে। প্রতি সন্ধ্যাতেই হোটেলে—হোটেলে বসে নাচের আসর, কার্নিভাল উৎসব। পিয়ানোর টুং টাং আর বেহালার করুণ সুরে ভরে পথ! দু-একটি হোটেলে পুরস্কৃত করা হয় সকল দিন—খেলোয়াড়দের। গৃহস্থের ঘরে এসেও লাগে সেই আনন্দের দোল'। হাতে,—সিটার, বেহালা ইত্যাদি বাদ্য-যন্ত্র। গ্রামোফোনের গানে মুখর হয়ে ওঠে বাড়ি। হাত ধরাধরি ক'রে নাচে ছেলে-মেয়েরা। সেই পরিবেশে সত্যি হয়তো মনে হয় কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু নেই। আছে শুধু অফুরন্ত প্রাণ, অফুরন্ত জীবন, অফুরন্ত আনন্দের হিল্লোল।

য়ুরোপের ক্রীড়াঙ্গন নরওয়ে। প্রকৃতির লীলাভূমি নরওয়ে। ছুটির শাঁখাই বেজে চলেছে এখানকার আকাশে-বাতাসে। উনিশ শতকের পর থেকে অসংখ্য কল-কারখানা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে য়ুরোপের বহু দেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সেই সব দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে বলসেই চলে। কিন্তু নরওয়ে আজো শিল্প-সভ্যতার কালিমা থেকে মুক্ত। প্রকৃতির কুমারী সত্তা আজো সেখানে অম্লান, অমলিন। তাই অন্য দেশের উৎসবের থেকে স্বতন্ত্র রূপ সে দেশের উৎসবের।

• • •

ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছেলেটির অঙ্কের খাতা দেখে শিক্ষক প্রশ্ন করলেন—এ অঙ্কের নিয়মটা কে বলেছেন, বলত?

ছেলেটি বলল আমাদের এক প্রতিবেশী, লোকটা বুড়ো, আর মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

—এ নিয়ম ত দেখছি একেবারে নূতন। আচ্ছা তাঁকে এই অঙ্কটা করতে দিয়ো তো।

পরদিন সে অঙ্ক দেখে শিক্ষক অবাক। তিনি আবার সবচেয়ে শক্ত এমন একটা অঙ্ক দিলেন যেটা করতে খাতার পাঁচ ছয় পাতা লাগে।

পরদিন শিক্ষক ত হতভম্ব। পাঁচ পাতার অঙ্ক পাঁচ লাইনে। তাও আবার আশ্চর্য নিয়মে।

শিক্ষক বললেন: চল তো তোমার সেই প্রতিবেশীকে দেখে আসি। এমন গণিতজ্ঞ যে পৃথিবীতে আছেন তা' তো জানতাম না!

ছাত্র শিক্ষককে নিয়ে এলেন তাঁ[illegible]ছে। তাঁকে দেখেই শিক্ষক থমকে উঠলেন, তারপর হেসে বললেন আমি আবার [illegible]পনার কথাই ভাবছিলাম ডঃ আইনষ্টাইন্—আপনি ছাড়া এমন অবাক আর কে করবে।

জাপানের চা-উৎসব

নীলিমা দে

জাপানীদের শিল্প-বোধ আর সুকুমার রুচি জগদ্বিখ্যাত। সব চেয়ে বড় কথা, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাদের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। বাড়ী-ঘর, উদ্যান-চর্চা, বেশ-ভূষা—সব কিছুর ভেতর থেকেই যেন উপচে পড়ছে তাদের সৌন্দর্য-বোধ। জাপানী মনের এই বৈশিষ্ট্য আবার স্বাভাবিক ভাবেই সব চেয়ে বেশি ধরা পড়ে তাদের উৎসবের দিনে—বিশেষ ক'রে চা-উৎসবে। ওই উৎসব উপলক্ষ্যে তারা পান করে মিহি সবুজ চা।

প্রামাণ্য ইতিহাস থেকে জানা যায় চীন থেকে জাপানে চায়ের প্রথম আবির্ভাব ৮০০ খৃষ্টাব্দে। অবশ্য চীনে চায়ের ব্যবহার ছিল বহুকাল আগে থেকেই (২৭-২২০ খৃঃ)। তখনও চা-উৎসবের চল হয়নি। সুং বংশের সম্রাটরা যখন চীনে রাজত্ব করছেন সেই সময়ে চীন থেকে জাপানে চা-উৎসবের প্রচলন হয়। তখন পর্যন্তও চা মহার্ঘ বস্তু, সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। পূর্ব প্রাচ্যের লোকেরা তখন ওষুধ হিসেবেই চা ব্যবহার করছে। পানীয় হিসেবে চায়ের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়নি। কেবল মাত্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটি সম্প্রদায় পানীয় ব'লে চা পান করতেন। বহুক্ষণ ধ'রে ধ্যান যাতে করা যায় আর সেই সময় ঘুম এসে উৎপাত না করে তার জন্যই এরা মাঝে-মাঝে চায়ের সাহায্য নিতেন।

জাপানে চা জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে খৃঃ চৌদ্দ শতকে। শুরু হয় চা-প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানটির আমদানী হয়েছিল চীন থেকে। অতিথিদের সামনে অনেকগুলি কাপে ক'রে গরম চা রাখা হত। সেরা উৎপাদন-কেন্দ্রের চা সেই কাপগুলির কোনটিতে আছে খাঁরা চুমুক দিয়ে তা ব'লে দিতে পারতেন প্রতিযোগিতায় জয়ী হ'য়ে তাঁরা পুরস্কার পেতেন। এই অনুষ্ঠানের ফলে জাপানের কয়েকটি অঞ্চলে, বিশেষ ক'রে কিয়োটোর কাছে উজি জেলায় চা উৎপাদন বেড়ে যায়। ওই জেলার চা এখনো জাপানের সেরা চা।

ক্রমে প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার দানের রীতিটি উঠে যায়। জাপানী চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেখা দেয় উৎসবের আবহাওয়া। শান্ত, আনন্দ-ঘন পরিবেশে চা-পরিবেশন——এই হ'য়ে ওঠে জাপানী গৃহকর্তা আর অতিথিদের লক্ষ্য। সেই সময়ে জাপানের সমাজে সব চেয়ে বেশি প্রতিপত্তি ছিল সামুরাই বা যোদ্ধা-শ্রেণীর। এদের ইচ্ছাক্রমে স্থির হয় যে চা-পান অনুষ্ঠানে বিশেষ কতকগুলি নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।

নিয়ম কানুনের বাঁধন বজায় রেখেও যিনি চা-পান অনুষ্ঠানকে চা-উৎসবে প্রথম রূপায়িত করেন তাঁর নাম মুরাটা জুকো (১৪২৩-১৫০২)। ক[illegible] কয়েকজন জাপানী ভদ্রলোক এই উৎসবটিকে আরো প্রাণবন্ত ক'রে তোলার ব্যবস্থা [illegible]। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে চা-উৎসব বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। চা পানের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা আর আত্মার বিশুদ্ধতা ঘটে—এমন বিশ্বাস ধীরে ধীরে দেখা দেয় জাপানীদের মনে। সরলতার মাঝখানেই যে সুন্দরের অধিষ্ঠান—এই

সত্যের অনুসন্ধানও জাপানীরা করেছে চা-উৎসবের ভেতর দিয়ে। এই উৎসবের খুটিনাটি নিয়ম কানুন আপাতদৃষ্টিতে বিরক্তিকর মনে হলেও, যখন ওই সব নিয়ম যথাযথ মেনে একজন অভিজ্ঞা জাপানী চা তৈরী করতে থাকেন তখন তা দেখে অতিথিদের বেশ ভালোই লাগে। যেন তাঁরা কোনো নিপুণ শিল্পীর শিল্প রচনা দেখছেন।

জাপানীদের সৌন্দর্য-বোধ অনুসরণে চা-উৎসব অনেক খানি সহায়তা করেছে। কারণ যেখানে সেখানে, যেমন তেমন ক'রে চা পরিবেশন করলে তো চলবে না। যে ঘরে তা পরিবেশন করা হবে, যে ঘাদিচা পাশে থাকবে, যে সব বাসন-পত্র চা তৈরীর জন্য দরকার—সব কিছুই হতে হবে সুন্দর, ছিমছাম। উৎসবের দিন ঘরটিকে সাজাতে হবে নানা বর্ণের ফুল দিয়ে। জাপানের স্বাপত্য, ছবির মতো উদ্যান রচনার রীতি, চীনামাটি-শিল্প, পুষ্প শিল্প—এ সবই চা-উৎসবের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী।

চা-উৎসব উপলক্ষ্যে নিয়ম-কানুন মানতে শিখে জীবনের অন্য পাঁচটি ক্ষেত্রেও জাপানীরা পরিচয় দেয় তন্ময়তা, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা আর সুরুচির। এক কথায়, চা-পান উৎসব জাপানীদের সুসভ্য ক'রে তুলেছে। সেই জন্য বিবাহের আগে প্রতিটি জাপানী তরুণীকে অবশ্যই শিখতে হয় চা-উৎসবের রীতি-নীতি।

• • •

হোটেলের কোণের ঘরটার সামনে এসে এক তরুণী বললেন, ভিতরে আসতে পারি?

—নিশ্চয়ই,—পর্দার ওপাশ থেকে উত্তর এল।

তরুণী ঘরের মধ্যে ঢুকেই রাগত স্বরে বললেন—আপনিই কি মিঃ সমারসেট্ মম্?

—আপনি কি তাঁকেই খুঁজছেন?

—হাঁ। লোকটাকে আমি চাবুকে দিতে এসেছি।

—কেন বলুন ত?

—কারণ যা' সত্য নয়, সে কথা তিনি নারী জাতির সম্বন্ধে লেখেন কেন?

—নারী জাতির প্রেম সম্বন্ধে কি আপনি ও-কথা বলছেন?

—নিশ্চয়ই। আপনি কি সত্যিকারের নারী দেখেন নি?

—এই মাত্র দেখ্‌ছি—আপনার মত নারীর দেখা পেয়ে সত্যিই আমি ধন্য,—আপনার হাতের চাবুক খেতেও আমার খুব ভাল লাগে।

এক গাল হেসে তরুণী তখন ঘরের [illegible] ঢুকে পড়লেন।

জাপানী পুতুল

পারুল মিত্র

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"এক আছে মিবিদিদি,
আর আছে তার ঘরে জাপানি পুতুল—
নাম তামাসান।
পরেছে জাপানি পোশোয়াজ,
কিমোনোর পরে ফুল-কাটা সোনালি রঙের।"

বাস্তবিকই জাপানি পুতুল ভারি সুন্দর। যেমন তার চেহারা, তেমনি তার বেশভূষা। আছে বাস, আছে তার বাহুল্য। জগৎ পারাবারের তীরে যেখানেই শিশুরা খেলা করে সেখানেই আছে পুতুলের সমাদর। কিন্তু জাপানি ছেলে-মেয়েদের কাছে পুতুল শুধু পুতুল নয়, তার চেয়ে আরো বেশি কিছু। তারা মনে করে প্রতিটি পুতুলের প্রাণ আছে। তারাও হাসে, কাঁদে, কথা কয়। জাপানি বালিকাদের এই বিশ্বাসের কথা চমৎকার ক'রে বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর একটি লেখায়।

পুতুলকে শুধু খেলার ছলেই জাপানীরা ভালোবাসে না, পুতুল নিয়ে তারা উৎসব ও করে। উৎসবের দেশ জাপানে পুতুল-উৎসবের মধ্যে যথেষ্ট সমীচীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

জাপানের পুতুল-নাচেরও আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এতে নানা ভূমিকায় অভিনয় করায় জন্য ব্যবহার করা হয় ঠিক মানুষের মাপের বড় বড় পুতুল। অভিনীত নাটকগুলির কোনোটিই কৌতুক-নাট্য নয়, সবগুলিই ট্রাজেডী। যারা পুতুল নাচায়, অন্য দেশের নাচিয়েদের মতো তারা নেপথ্যে থাকেনা, থাকে দর্শকদের চোখের সামনে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এতে বুঝি দর্শকদের চোখে পুতুলগুলি নেহাৎই পুতুল বলে হবে, কখনোই মনে হবে না ওগুলো জ্যান্ত; ফলে অভিনয় মনে হবে নেহাৎই যান্ত্রিক। বাস্তবে কিন্তু হয় তার একেবারে উল্টো। জাপানি পুতুলদের অভিনয় দেখতে-দেখতে মনে হয় ওরা জ্যান্ত, দারুণ রকম জ্যান্ত। ওদের জীবনীশক্তি এত প্রবল যে তা সংহত রাখার জন্যই নাচিয়েরা ব'সে আছে, মাঝে-মাঝে যাদু টেনে ওদের থামাচ্ছে। গতির মাঝে মাঝে বিরতি ঘোষণাই যেন ওই ক'জন পরিচালকের লক্ষ্য।

সৌন্দর্য-সাধনাই বোধ হয় জাপানের জাতীয় সাধনা। জাপানিদের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডেই আছে এর স্বাক্ষর। পুতুল তৈরিতেও। পুতুলের দেশ জাপান রূপকথার দেশ।

ভারত-সোভিয়েত
মৈত্রীর সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা

সোভিয়েত দেশ

গ্রাহক হোন ও পড়ুন। গ্রাহকরা বিনামূল্যে পাবেন
বহুবর্ণে ছাপা সুদৃশ্য রঙিন ক্যালেণ্ডার ও ডায়েরী

● বিশেষ সুবিধাজনক চাঁদার হার ●
১৫-১১-৬৪ হইতে ৩০-৪-৬৫

ইংরাজী সংস্করণ			অন্যান্য ভাষার সংস্করণ		
	হ্রাসকৃত	স্বাভাবিক		হ্রাসকৃত	স্বাভাবিক
বাৎসরিক	৫·০০	৬·০০	বাৎসরিক	৪·০০	৫·০০
দ্বি-বাৎসরিক	৯·০০	১১·০০	দ্বি-বাৎসরিক	৭·০০	৯·০০
ত্রৈ-বাৎসরিক	১২·০০	১৬·০০	ত্রৈ-বাৎসরিক	৯·০০	১৩·০০

আপনার এজেন্টের নিকট চাঁদা জমা দিন অথবা নিম্নঠিকানায় পাঠান:
সোভিয়েত দেশ, ১।১ উড স্ট্রীট, কলিকাতা -১৬

প্রকাশিত হয়: ইংরাজী, রুশ, হিন্দী, তামিল, তেলুগু, মারাঠী, গুজরাটী, বাংলা, উর্দু, কন্নড়, মালয়ালম, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, অসমীয়া ভাষায়

শ্রাবণ, ১৩৭১

"কথা প্রসঙ্গে"

। ভাষা ।

স্বাধীন ভারতে সমস্যার অন্ত নেই। নিত্য নতুন সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এই সমস্যাজর্জরিত দেশে আজ আবার নতুন সমস্যা-ভাষা। সাধারণ লোকের দুঃখ কষ্টের শেষ নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য গগণস্পর্শী। অভাব-অনটন আতঙ্ক দেশের মানুষকে প্রতিদিন বিহ্বল করছে। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, চিকিৎসার এবং শিক্ষার সুব্যবস্থা নেই,—গৃহে অশান্তি, বাইরে শত্রু। প্রতিক্ষণে ঐক্যের অভাব, এই অবস্থা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অথচ দেখতে দেখতে স্বাধীনতার সতের বছর কেটে গেল।

এমন সময়ে সরকার সরকারী ভাষায় হিন্দী চালু করতে গিয়ে আকস্মিক আবার একটা সঙ্কট ডেকে আনলেন কেন, এ প্রশ্ন আজ সবারি মুখে।

সরকারের বক্তব্য ১৯৫৮-৫৯ সনেই ভারতীয় সংবিধানে সরকারী ভাষার বিধান গৃহীত হয়েছে; সুতরাং সংবিধানের মর্যাদায় 'হিন্দী' চালু করা অত্যাবশ্যক।

এ-সম্পর্কে জনমত সম্পূর্ণ বিপরীত। সরকারী ভাষা হিন্দীরূপে সারা ভারতে চালু করার মধ্যে যথেষ্ট মতের পার্থক্য গণভোটের সময়ও ছিল আজও আছে। বরং দিনে দিনে বাড়ছে! কেননা, তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান এই চারটে অঙ্গরাজ্য হিন্দীভাষী—এই হিন্দীভাষীর সংখ্যা বড়জোর দশ-বারো কোটি! অপর পক্ষে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের জনসংখ্যা কমের পক্ষে বত্রিশকোটি। কিন্তু তা হলে কি হয়,—উগ্র হিন্দীপন্থীরা তা মানতে রাজি নন। ফলে, ভাষা আন্দোলন এবং সারা দক্ষিণ ভারতে অশান্তির দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, যার ফলে কতকগুলি মূল্যবান জীবন নষ্ট হল।

দেশে যখন ঐক্য, অখণ্ডতা এবং সংহতির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন,—সেই সময়ে ভাষা নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। উগ্র হিন্দীবাদ যে কতখানি উদ্ধত, তা বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে এবং তাকে তিরস্কার করতে স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিতজী পর্যন্ত কুণ্ঠিত হন নি। আর এই কারণেই তিনি জাতিকে ভাষা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই সরকারের মাথায় হিন্দী ভাষা চালু করার খেয়াল চাগাড় দিয়ে উঠল কেন? সংহতির

নামে এতবড় অ-সংহতি দেশের মধ্যে ডেকে আনার কোন সঙ্গত কারণই ছিল না। ইংরেজি পরদেশী এবং সংহতি নাশক এই কি কোন যুক্তি ?

পরাধীন ভারতে ইংরেজ আমাদের অপ্রিয় ছিল ; কিন্তু তাদের ভাষা ইংরেজির প্রতি আমাদের কোন বিরাগ ছিল না। কেননা, এই ইংরেজি ভাষার চেতনাতেই আমরা আমাদের দেশকে চিনতে পেরেছিলাম। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, এমনকি আমাদের ধর্মবোধ পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার কোলেতেই নবরূপ পরিগ্রহ করেছিল। সর্বোপরি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা এসেছিল ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এবং দেশে ও বিদেশে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনকে সফল ক'রে তুলেছিলাম ইংরেজি ভাষার সাহায্যে। সেদিন 'English for unity' এ কথাটাই সত্যিকার সত্য ছিল। সেই ভাষার সঙ্গে আমাদের এতখানি অন্তরের যোগ যে আমরা তাকে আর কিছুতেই বিদেশী বলে ভাবতেও পারি না। বরঞ্চ, নানা অঞ্চলের মধ্যে ভাবনা, ভাব-বিনিময়ের আধান প্রদান ইংরেজি ভাষাই সহজ করে দিয়েছে। রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে নব ভারতের যে জাগরণ সে জাগরণের মূলে ইংরেজি ভাষা। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাগান্ধীর বাণী ও ভাবধারা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সারা ভারতে ও বহির্ভারতে পরিবেশিত না হলে দেশের ধর্মবোধ একত্রে গ্রথিত হতে পারতোনা আর বিশ্বের দরবারে ভারতের উচ্চাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হত না। এই ইংরেজি ভাষাকে পরদেশী বলে যাঁরা সরাতে চান তাঁদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা এবং উগ্রতা ছাড়া আর কিছুই নাই। তাকে বাড়তে দিলে আগাছারই সৃষ্টি হবে—মহীরুহের বিশালতা থাকবে না। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-শিল্পে আজ আমরা পৃথিবীর মধ্যে শুধু একটা আলাদা জাতি নই। ইংরেজি একটা আন্তর্জাতিক ভাষা। ইংরেজি না শিখলে, না জানলে, এই প্রগতির যুগে বর্তমান জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা কূপমণ্ডুক-জাতিতে পরিণত হব। আর প্রদেশে প্রদেশে আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি আর ভাষায় ভাষায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব। অতএব মুক্ত বাতাসের মতন ভাষাকেও মুক্ত রাখতে হবে। ইংরেজি যেমন ছিল তেমনি থাকবে আর প্রাদেশিক ভাষাগুলি নিজ নিজ প্রদেশে পল্লবিত এবং পুষ্পিত হ'য়ে সমগ্র ভারতের গৌরব এবং ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করুক। এই পথেই গড়ে উঠবে ভারতের সংহতি, শক্তি ও সমৃদ্ধি।

। উপেন্দ্রনাথ।

আজ কয়েক বছর হল সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন।

দেহী উপেন্দ্রনাথ নেই, কিন্তু স্রষ্টা উপেন্দ্রনাথ আজও বেঁচে। মহৎ সৃষ্টি তাইই, যা চিরকালই স্রষ্টাকে স্মরণ করায়। উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যের উপাদানে মহৎ সৃষ্টির দিকটিই উদ্ভাসিত!—তাই তাঁকে আমাদের স্মরণ করতে হয়।

সাহিত্যার্থে সাহিত্য। অর্থাৎ বিস্তার। ভাবের বিস্তার, অন্তরঙ্গতার বিস্তার—যা কালে কালে বেড়েই চলে ; তা কখনও ক্ষয়িষ্ণু নয়। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, সহৃদয়তা এবং একাত্মবোধ এবং মহৎ বাণী এবং দর্শন -এই হচ্ছে প্রকৃত মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ।

এই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সাহিত্যের যুগে মানব প্রেমিক উপেন্দ্রনাথকে তাই আমাদের বার বার মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঁর সৃষ্টিকে, মনে পড়ে তাঁর দৃষ্টিকে।

সংসারে শুধুই মৈত্র নেই, শুধুই হাহাকারের রিক্ততা নেই, শুধুই মানুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মন নেই—শুধু অংশকে ঘিরেই আমরা বসবাস করি না। পরিপূর্ণতার প্রোজ্জ্বলতাকে আমরা দেখি, আমরা বিশ্বাস করি। উপেন্দ্রনাথ এই আদর্শের মানুষ। তাই আজও তিনি সবারই প্রিয় উপীনদা।

হৃদয়ের যে পরিপূর্ণ দিকটাকে মেলে ধরে উপেন্দ্রনাথ আমাদের আত্মীয়, তাঁর সাহিত্যের মধ্যেও সেই হৃদয় প্রসারী দিক-বাঞ্জনা। উপেন্দ্রনাথ তাই মৃত্যুহীন।

তাঁর মৃত্যু তিথি উদযাপনে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা নিবেদন করছি।

পাঠক পাঠিকার কলম

[পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক গ্রাহিকাদের কাছ থেকে আমরা প্রায়শই নানা ধরণের পত্র পাই। অনেক পত্রে চিন্তাশীলতা এবং নানা সমস্যা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও সচিন্তিত মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন থেকে আমরা সেই ধরণের প্রকাশ যোগ্য এক বা একাধিক পত্র প্রতি সংখ্যায় দেব। এই বিভাগে শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে সমসাময়িক জীবন ও তার সমস্যা সম্পর্কে মতামত আহ্বান করা হচ্ছে।

গল্পভারতী সম্পাদক]

শ্রীযুক্ত, গল্পভারতী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

গত পৌষ সংখ্যার গল্পভারতীতে পাঠক পাঠিকার কলমে অধ্যাপক কমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত আলোচনার সময়োপযোগী মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

স্বাধীন ভারতবর্ষে নানা সমস্যা। সমস্যাগুলি রাষ্ট্রীয় দরবারে সবিশেষ মীমাংসিত হচ্ছে না। অথচ পরিকল্পনার কোন অভাব নেই। জাতীয় কংগ্রেস যখন পরাধীন ভারতে বিরোধীর ভূমিকায়, তখন তাঁদের কাজে দেশের জনসাধারণের পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। কেননা, 'স্বাধীনতা জীবনের কে বাঁচিতে চায়।' সকল লোকেরই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাই। স্বাধীনতা পাওয়ার পর কংগ্রেস আজ দীর্ঘকাল ধরে শাসকের ভূমিকায়। এই ভূমিকায় কংগ্রেসের ব্যর্থতা আজ সাধারণ লোকের চক্ষে বেদনাদায়ক। বিশেষ বেদনাদায়ক এই কারণে যে, একমাত্র কংগ্রেসই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশাল জনগণের মানস-প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠান যদি জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে ব্যর্থকাম হয় তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে নৈরাশ্যবাদ আসতে বাধ্য।

দেশে অভাব আছে—অভিযোগ আছে, কিন্তু প্রতিকার নেই। সরকারের মুখে প্রতিকারের আশ্বাসবাণী; কিন্তু কাজে তা রূপায়িত হয় কৈ?

চোরাকারবারীদের রাস্তার গ্যাস পোষ্টে ঝোলানো হবে,—এই ছিল স্বাধীন সরকারের আশ্বাস বাণী; কিন্তু চোরাকারবারের জয় জয়কার দেশে। তারাই সমাজের মাথা হয়ে বিত্তশীল, ডেমোক্র্যাটিক সরকার তাদের এঁটে উঠতে পারলেন না আজও। সাধারণ মানুষ এই থেকে কী আশ্বাস লাভ করতে পারে?

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায়—'গোটা জাতটাই আজ পথে বসেছে—লাইন দিচ্ছে।' আর কিছু লোক কালোবাজারে স্ফীত হয়ে ব্যাঙ্কস্টোরিড্ বিল্ডিং তুলছে। কী করে সম্ভবপর হচ্ছে এই বৈষম্যের?

সাহিত্যের মধ্যেও 'বেলাক'— এ সম্পর্কে কয়েক মাস পূর্বে গল্পভারতীতে চুটকীতে একটি সুন্দর ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

একদিকে কংগ্রেসী সরকার মেজরিটির বলে বলীয়ান হয়ে মনে করছেন 'King can do no wrong.' অপরদিকে দেশে কোন সুস্থ এবং গঠনমূলক বিরোধীদল গড়ে উঠলোনা এই সতের বছর স্বাধীনতা পাওয়ার পরও। এর চেয়ে দুঃখময় পরিস্থিতি আর কী হতে পারে? জনসাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই। এই দেখুন না কেন, সাম্প্রতিক ক'লে রাষ্ট্র ভাষা নিয়ে সরকারের কী গোয়ার্তুমি! সংবিধানের দোহাই পেড়ে বলা হচ্ছে—হিন্দী রাষ্ট্রভাষা রূপে অচিরে চালু না হলে সংবিধানের মর্যাদা থাকে না। দেশের মানুষের পেটে ভাত নেই, অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, রোগে বিনেজাসে ওষুধ নেই,—চারিদিকে শুধু নেই—আর নেই। এতে কী সংবিধানের মর্যাদা থাকছে?

দেশের স্বাধীনতার মূল মর্যাদাকে আগে রক্ষা করা হোক—তারপর অন্য কাজে হাত দেওয়াই সমীচীন। মানুষ খেয়ে পরে বাঁচুক—তারপর সুরু হোক অধিবেশন, বক্তৃতার মঞ্চ,—নেতাদের এই কথাটাই আগে ভেবে দেখা দরকার নয় কী? সাধারণ মানুষকে বলা হচ্ছে—রহু ধৈর্যং;—সব মিলেগা!

কিন্তু কতদিনে?

সাধারণ মানুষের কানে ত্যাগের প্রশস্তিবাণী তখনই কার্যকরী হবে, যখন তারা দেখবে তাদের নেতারাও ত্যাগ এবং আদর্শের প্রকৃত প্রতিমূর্তি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে কংগ্রেস নেতাদের সেই চেহারা দেখেই তো দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা তেরঙ্গা ঝাণ্ডার তলায় সমবেত হতে পেরেছিল। আজ দেশের নেতাদের মধ্যে সে আদর্শের চরিত্র কোথায়? গল্প ভারতী এই কথাটিই নানা ভাবে বলতে চেষ্টা করছেন দেখে—আমরা আপনাদের প্রকৃতই সাধুবাদ জানাচ্ছি।

আর পাঁচটা কাগজের মত আপনারাও যে শুধু সস্তু আর কৃত্রিম সাহিত্য এবং সংবাদ পরিবেশন করে দেশের মানুষকে কানুষের রঙে তোলাচ্ছেন না—এটা সত্যিই আশার কথা। পরিশেষে আপনাদের আদর্শবাদকে অভিনন্দিত করছি।

নমস্কার।

বিনীত—
হারাধন ভট্টাচার্য্য
ব্যারাকপুর, ২৪পরগণা

পুরাতন পাতা

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, শ্যামবাজার নিবাসী নবীনচন্দ্র বসু নামক—জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি বিস্তর অর্থব্যয়ে তাঁহার বাটীতে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করাইয়া অভিনয় আয়োজন করেন। তৎকালীন ইংরাজি থিয়েটার বা আধুনিক নাট্যশালার ন্যায় অঙ্কিত দৃশ্যপটাদি ব্যবহৃত না হইলেও এই অভিনয়ে বিশেষ নূতনত্ব ছিল। নাট্যোল্লিখিত—দৃশ্যগুলি সেই বৃহৎ ভবনে নানাস্থানে সজ্জিত হইয়াছিল। একস্থানে—বীরসিংহ রাজের রাজসভা, একস্থানে—সুন্দরের—বসিবার জন্য বকুলতলা, একস্থানে—মালিনীর গৃহ, বাটীর শেষ ভাগে মশান,—এইরূপ সজ্জিত হইত এবং প্রত্যেক দৃশ্যের সম্মুখে আসনের ব্যবস্থা থাকিত। দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণকেও অন্য দৃশ্যের সম্মুখস্থ আসনে গিয়া উপবেশন করিতে হইত। এই অভিনয়ে স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকাগুলি বারাঙ্গনা কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব অভিনয় দর্শনে সাধারণে মুগ্ধ হইলেও ইংরাজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা এবং বেশ্যা লইয়া অভিনয় সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আন্দোলন করেন।

পরবৎসর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ৺প্রসন্ন কুমার ঠাকুর তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের প্রফেসর উইলসন সাহেব কর্ত্তৃক "উত্তররাম চরিত" নাটকের ইংরাজী অনুবাদ—তাঁহার গুঁড়োর বাগানে অভিনয় করান। স্বয়ং উইলসন সাহেবের শিক্ষকতায় সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ইহাতে অভিনয় করিয়াছিলেন।

ক্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে ইংরাজী অভিনয় সংক্রামিত হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতায় সেই সময় হিন্দুকলেজ ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারী—এই দুইটা বিদ্যালয়ই বিখ্যাত ছিল। কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব হিন্দু কলেজ এবং হায়মান্ জেক্স নামক জনৈক ফরাসী ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে সে সময় প্রধান শিক্ষক ছিলেন, ইহারা উভয়েই নাট্যকলাবিদ ছিলেন। ইঁহাদেরই উৎসাহ ও যত্নে ছাত্রগণের হৃদয়ে অভিনয়ানুরাগ সঞ্চারিত হইতে থাকে।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত—'ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের আদর্শে কয়েক বৎসর ধরিয়া নানাস্থানে ইংরাজীতে সেক্সপীয়রের নাটকগুলি অভিনীত হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় অভিনয় হওয়ায় জনসাধারণ নাটকীয় রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইত। অভিনয়োপযোগী সে সময় বাঙ্গলা নাটকও ছিল না। বিধবাবল ও ভদ্রার্জ্জুন নামক দুই একখানি নাটক ছিল, তাহাতে আবার দৃশ্য-বিভাগ বা প্রবেশ প্রস্থানও লিখিত ছিল না, ভাষাও মার্জ্জিত নহে—পাশ্চাত্য নাটক সমূহের রসাস্বাদ করিয়া শিক্ষিতগণের তাহাতে তৃপ্তি না হওয়ায় কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজ নিজ গৃহে ইংরাজী নাটকের অভিনয় করাইতে লাগিলেন।

ততক্ষণে সুবিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সাধারণের নিকট এই নাটকখানি অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। যে মহান উদ্দেশ্যে এই নাটকখানি বিরচিত হয়, তাহার ইতিহাস এইরূপ :—

রঙ্গপুর জেলার কুণ্ডীগ্রামের জমিদার দেশহিতৈষী, সহৃদয় কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় তৎকালীন কৌলিন্য ও বহু বিবাহ প্রথায় বঙ্গ সমাজের দিন দিন অধঃপতন দর্শনে বিশেষরূপ ব্যথিত ও চিন্তাকুল হন। তিনি দেশের এই অনিষ্টকারিতা সাধারণের মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধির নিমিত্ত একটি কৌশল অবলম্বন করেন। কালীবাবু "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" সংবাদ-পত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন :—

॥ বিজ্ঞাপন ॥

৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণ তত্রত্যবিজ্ঞ – মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি মুসলিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নামক একখানি মনোহর নাটক রচন করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব দর্শাইতে পারিবেন, তাহাকে সঙ্কল্পিত ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

রঙ্গপুর পং কুণ্ডী—শ্রীকালীচন্দ্র রায় চৌধুরী – কুণ্ডী পং জমীদার। বঙ্গাব্দ ১২৬০ সাল তারিখ ৯ই কার্ত্তিক।"

পণ্ডিতবর রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ই সগৌরবে এই পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা, চড়কডাঙ্গার জয়রাম-বসাকের বাড়ীতে উক্ত নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। অভিনয় সর্ব্বসাধারণের এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, ধনাঢ্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ভবনে ইংরাজী নাটকাভিনয়ের পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা নাটকাভিনয়ে উৎসাহিত হইয়া উঠেন।

— · —

চিঠি শুধু চিঠি নয়

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত পত্র

শ্রীচরণেষু—

মা, আজ আপনার এই ঘোর বিপদের দিনে আমরা কয়েকজন প্রবাসী কারারুদ্ধ বাঙালী আপনার নিকট সান্ত্বনার বাণী প্রেরণ করিতেছি। যে বিপদ আজ আপনাকে অভিভূত করিয়াছে তদপেক্ষা মহান বিপদ কোন মহিলার জীবনে ঘটিতে পারে না। যে শোক আজ আপনার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছে, তদপেক্ষা গভীর শোক কোনও হিন্দু নারীর জীবনে কল্পনা করা যায় না, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আপনার এই দুর্দিনে আমরা আপনার এবং আপনার পরিবার বর্গের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। বিপদের ঘন কৃষ্ণটিকায় শোকের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া আমাদের হৃদয়ের বাণী যদি আপনার চরণে পৌঁছায় তাহা হইলে আমরা ধন্য হইব।

যিনি গিয়াছেন তিনি আমাদেরও খুব আপনার জন ছিলেন। আজ আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকল ভারতবাসীই কাঁদিতেছে—কিন্তু সবচেয়ে বেশী কাঁদিতেছে বাংলার তরুণ সম্প্রদায়।

তাঁহার আত্মীয় স্বজন—তাঁহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ের বন্ধুরা—আজ তাঁহার জন্য কাঁদিতেছেন। সাহিত্য ও কলাজগতের মহারথীরা এমন কি সকল ক্ষেত্রের ভাবুক সম্প্রদায়—আজ তাঁহার জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন। অভাগা তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিরা আজ তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে। যাহাদের জন্য তিনি তাঁহার সঞ্চিত ধন ও যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন—যাহাদের সেবার জন্য তিনি তাঁহার প্রাণ, মান, আত্মা, ও আয়ু উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন—সেই দেশবাসীরা আজ তাঁহার শোকে অবসন্ন। কিন্তু বাঙলার যে সব তরুণ প্রাণ তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের যৎকিঞ্চিৎ সম্পদ উৎসর্গ করিয়া তাঁহার উদ্ভূত পতাকার তলে সমবেত হইয়াছিল—যাহারা সুখে দুঃখে আঁধারে আলোয় তাঁহার আদেশ বাণী অনুসরণ করিয়াছে—সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা কখনও বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছে কখনও বা কারার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে—নৈরাশ্যের রজনীতে অথবা সফলতার প্রভাতে যাহারা কখনও তাঁহার পার্শ্ব ছাড়ে নাই—যাহারা তাঁহার মধ্যে পিতা, সখা ও গুরুর অপূর্ব সমাবেশ পাইয়াছিল—আজ সেই সব তরুণ প্রাণের অবস্থা কি কথায় বর্ণনা করা যায়?

দেশবন্ধু গিয়াছেন। যশোরশ্মি মণ্ডিত পূর্যরবির ন্যায় তিনি জীবন মধ্যাহ্নেই অস্ত গিয়াছেন। সিদ্ধিদাতার বরপুত্র তিনি বিজয় মুকুট পরিয়াই ভারতের বিশাল কর্মক্ষেত্র হইতে দিব্যলোকে যাত্রা করিয়াছেন। অত্যন্ত ত্যাগের মধ্য দিয়া তিনি আজ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন! কিন্তু আজ আমাদের বাহিরে তিমির, অন্তরে শূন্যতা। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল মেঘের পরে মেঘ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে; সে তিমির প্রাচীরের মধ্যে আলোক প্রবেশের তিলার্দ্ধ স্থানও নাই।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে—যেদিন বাঙলার আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, বাঙলার বীর কেশরী কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত। সেদিন নৈরাশ্যের আঁধার ভেদ করিয়া এক অপূর্ব মোহনীয় মূর্তি বরাভয় হস্তা মহাশক্তিরূপে বাঙলার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যেদিন বাঙালী আপনার স্বরূপ

চিনিয়াছিল ; সেদিন বাঙালী আপনাকে শুধু দেশনায়িকা নয়—দেশ মাতৃকার আসনে বসাইয়াছিল। সেই গৌরবের, সেই আনন্দের, সেই উন্মাদনার দিন বাঙলা ভুলে নাই, ভুলিতে পারেনা। সে দিন বাঙালী আপনাকে যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও মানের সিংহাসনে বসাইয়াছিল, আজও বাঙালীর হৃদয়ে আপনার সেই সিংহাসন অটুট রহিয়াছে। সেদিন হইতে আপনি শুধু চিত্তরঞ্জন মাতা নন,—আপনি বঙ্গমাতা।

তাই বলি আমাদের এই বিপদের দিনে আপনিই আমাদের শক্তি, সাহস ও সান্ত্বনা দিন, যে নিবিড় নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আজ সমগ্র দেশ নিমগ্ন—যে বিষাদ ও হাহাকারে আজ সোনার বাংলা শ্মশান প্রায়—তার মধ্যে, নূতন আলোক বিকিরণ, নব শক্তির উন্মেষ ও নূতন উৎসাহ সঞ্চার—আপনি ভিন্ন আর কে করিতে পারে? যে আহ্বানে আপনি একদিন বাঙালীর শিরায় শিরায় নব জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, সেই আহ্বানে আপনি আর একবার বাঙালীকে আসান। যে মন্ত্র বলে আপনি একদিন বাঙলার ঘরে ঘরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—সেই মন্ত্র লইয়া, মহাশক্তি রূপে, আপনি আর একবার আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হউন। মুহূর্ত্তের মধ্যে অবসাদ ঘুচিবে প্রাণে নূতন প্রেরণা, নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহ আসিবে—আশার অরুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া দশদিক আবার সুখে হাসিয়া উঠিবে। বাঙলার সকল তরুণ-প্রাণ আপনার চরণে ভক্তির অর্ঘ অর্পণ করিবে; আপনার আহ্বান লভিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে এবং অর্জ্জিত জয়মাল্য আপনাকে ভূষিত করিয়া গাহিবে "বন্দে মাতরম্"।

ইতি—

আপনার সেবকবৃন্দ

শ্রীসত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র
শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরঞ্জনমোহন ভৌমিক
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
শ্রীহরিকুমার চক্রবর্ত্তী

ব্যাণ্ডেলে সেণ্ট্রাল জেল
ইং ৬।৭।২৫

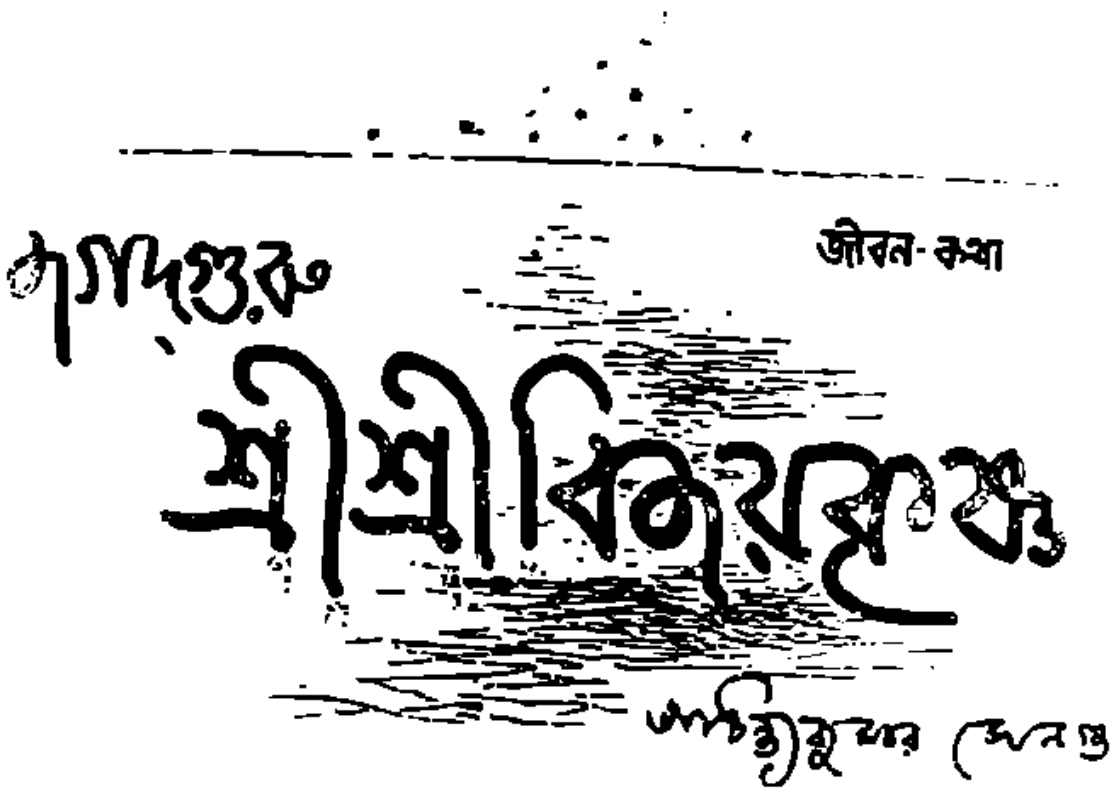

২৭

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন এসেছেন।

বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে উদার বন্ধুতার সম্বর্ধনা করলেন। 'আসুন আসুন, কী মনে করে?'

বিদ্যারত্ন গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আপনাকে আমার নির্জনে কিছু বলবার আছে।'

'বেশ তো বলুন।'

ঘরে যারা উপস্থিত ছিল বারান্দায় চলে গেল।

নির্জন দেখে বিদ্যারত্ন বললে, 'গঙ্গোত্রী গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে কিছুদিন ছিলাম হিমালয়ের উপরে। ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি আপনার কাছ থেকে আমাকে গৈরিক বস্ত্র নিতে বললেন। বললেন যেন বাকি জীবন আপনার উপদেশ মত চলি। দয়া করে আমাকে গৈরিক বস্ত্র দিন।'

গোসাইজি তাঁর একখানা বহির্বাস বিদ্যারত্নকে দিলেন।

'আর উপদেশ!'

'এই গৈরিক বস্ত্রই মূর্তিমন্ত উপদেশ।' বললেন গোসাইজি, 'সত্যকে লক্ষ্য রেখে সরল ভাবে চলাই গৈরিকবস্ত্র।'

বেশ শীত পড়েছে। ঠাণ্ডা ঘরে আসনে একটানা বসে থাকার দরুণই হয়তো গোসাইয়ের পায়ে বাত ধরেছে। বৃন্দাবন একটা উলের টাউজার কিনে এনে গোসাইকে বললে, এটা পরুন, আরাম পাবেন।

গোসাই রাজি হননা পরতে।

বৃন্দাবন পিড়াপিড়ি করতে লাগল। 'আপনার জন্যে কিনে আনলাম আর আপনি একটুও গায়ে ঠেকাবেন না ?'

আচ্ছা দাও। গোসাইজি পরলেন ট্রাউজার। পাঁচ সাত মিনিট গায়ে রেখে ফিরিয়ে দিলেন বৃন্দাবনকে। বললেন, 'তুমি পর, তুমি পরলেই আমার পরা হবে।'

কোথায় ট্রাউজার মাথায় বেঁধে রাখবে, তা নয়, পা ঢুকিয়ে দিয়ে কোমরে আঁটল বৃন্দাবন। পরমুহূর্তেই কাঁপতে লাগল। এ কী, সমস্ত শরীরে যে আমার বিদ্যুৎ-তরঙ্গের শিহরণ হচ্ছে। তাকাল গোসাইয়ের দিকে। এ কী, অচেতন বস্তুতেও বিদ্যুৎশিহরণ!

তাড়াতাড়ি ট্রাউজার ছেড়ে ফেলল বৃন্দাবন।

নগেন চাটুজ্জের স্ত্রী মাতঙ্গিনীকে গোসাই 'আনন্দময়ী' বলেন, 'মা আনন্দময়ী।' গোসাইয়ের আহারান্তে রাত্রে একদিন এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, এস তোমাকে গান শোনাই। তানপুরা বাজিয়ে গান শোনাতে বসলেন মাতঙ্গিনী। আর সে কী গান! সে তো গান নয় অমৃতনির্ঝর। যে শুনল সেই কাঁদল, ভাবে বিভোর হয়ে গেল, রাত ভোর হয়ে গেলেও কেউ ঘুমুতে গেল না।

আর গোসাই মাঝে মাঝে ভাবাবেশে হুঙ্কার ছাড়তে লাগলেন। তাঁর শব্দের সেই শক্তি সকলকে ভাবোদ্দীপ্ত করতে লাগল। সে বুঝি গানের চেয়েও শক্তিশালী।

সত্য কীভাবে হয়!

'গণ্ডির মধ্যে থাকলে জীবনে সত্য লাভ হবেনা।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'সত্য অনন্ত, সত্যের ভাব অনন্ত, সত্যের রূপ অনন্ত, সত্যলাভের উপায়ও অনন্ত। সর্বসংস্কার বর্জিত হলেই সত্যে সন্নিহিত হওয়া চলে।

আর ব্রহ্মচর্য কী!

আত্মসত্যই ব্রহ্মচর্য।'

বিজয়কৃষ্ণ কালীঘাটে গেলেন। কালীকে মালা-ডালি দিয়ে মা, মা বলে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে কেউ রাখতে পারলনা চোখের জল।

'মার কত দয়া! সকলকেই মা দয়া করছেন।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ, আমার মায়ের দয়ার তল নেই সীমা নেই। মা, মা,—

এস বাবা, এস আমার জন্ম আজ সার্থক হল।' এক বৃদ্ধা কাঙালিনী ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে পড়ল, একটি পয়সা দিতে হাত বাড়াল, বললে, আমার কাছে এই একটিমাত্র পয়সা আছে, এটি তুমি নাও।'

বিজয়কৃষ্ণ পয়সাটি হাতে নিয়ে মাথায় রাখলেন, মহেন্দ্রকে দিয়ে বললেন, এটা রাখুন। কারু অযাচিত দান অগ্রাহ্য করতে নেই।'

নমস্কার করে কোথায় কোন পথে চলে গেল ভিখারিনী কেউ জানল না।

'উনি কে?' শিষ্য জিগগেস করল।

'মায়ের সঙ্গিনী। মাই পাঠিয়ে দিয়েছেন অভ্যর্থনার জন্যে।'

মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীটের বাসা ছেড়ে শ্যামবাজারে ভে-মাথার উপর একটা তেতলা বাড়ির উপর তলায় উঠে এলেন গোসাই।

রামকুমার বিস্তারিত এসে বললে, 'কালাকৃষ্ণ ঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'আমার সঙ্গে? কেন?'

'জানেন তো উনি প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা দান করেন—'

'আমাকেও কিছু দিতে চান বুঝি?'

'হ্যাঁ, লক্ষ টাকা।'

'বলো কী!' প্রভুর দু'চোখে জল এসে গেল।

'হ্যাঁ, তিনি আপনার সমস্ত খবর রাখেন।' রামকুমার বললে, 'আপনার উপর ওঁর অটল শ্রদ্ধা। যদি একবার আপনি ওঁর বাড়ি গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করেন তাহলেই ঐ টাকাটা আপনাকে উনি অর্পণ করেন! আমাকে তাই বলে দিলেন অনেক করে।'

গোঁসাই হাত জোড় করে ভগবানকে প্রণাম করলেন। অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন, 'ঠাকুর মশাইকে বলবেন আমার এখানে যা যথার্থ প্রয়োজন ভগবান তা কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে প্রত্যহ পাঠিয়ে দেন। একটি কাণাকড়িরও অভাব রাখেন না। ভগবানের নাম নিয়ে ওঁর দ্বারে দীনহীন কাঙাল হয়ে যেন পড়ে থাকতে পারি ওঁকে এই আশীর্বাদ করতে বলবেন—'

রামকুমার অভিভূতের মত তাকিয়ে রইল।

নবীন ঘোষ সরকারী ডাক্তার। চাকরিতে থাকলে যথাবিহিত ধর্ম করা যাবে না এই যুক্তিতে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন, গোঁসাইজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে পরমবৈষ্ণব হয়ে গিয়েছেন, এখন তাঁর দিন-রাত মানেই একটানা সাধন ভজন।

নিয়মিত আহ্নিক সেরে অবসরক্ষণটি বেছে নিয়ে রোজ তিনি চন্দন তুলসী হাতে গোঁসাইয়ের কাছে আসেন ও পুজো করেন। বলেন আপনি আমার ইষ্ট, আমার পুরুষোত্তম।

প্রথম দিন যখন আসেন চন্দন তুলসী গোঁসাইয়ের পায়ে দিতে চেয়েছিলেন। গোঁসাই বললেন, 'না, তুলসী পায়ে দেবেন না, আমার মাথায় দিন।'

যথারিষ্ট তুলসী দিতেই মুহূর্ত মধ্যে গোঁসাইজি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

এই বিজয়কৃষ্ণই তো একদিন ব্রাহ্মভক্তদের পায়ের ধুলো দিতেন বলে কেশবচন্দ্রের প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু আজ? আজ তো তিনিই ইষ্টের আসনে বসে পুজো নিচ্ছেন। কোনো কোনো ব্রাহ্ম হয়তো টিপ্পনী কাটল।

হ্যাঁ, তিনি তো আজ ব্রাহ্মনিয়মে অনুশাসিত নন, তিনি আজ সনাতন হিন্দুধর্মের সম্পূজিত গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। তিনিই আজ গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। অক্ষর পরব্রহ্ম।

'এ কী, নোংরা কাপড়ে ঠাকুরকে খাবার দিচ্ছেন?' গুরুভাই বৃন্দাবন রাত্রিবাস কাপড়ে গোঁসাইকে খাবার দিতে যাচ্ছে দেখে নবীন ঘোষ তিরস্কার করে উঠলেন।

বৃন্দাবন থমকে গেল। খাবার দিল না গোঁসাইকে।

পরে বৃন্দাবন জিজ্ঞেস করল গোঁসাইকে, 'এটা কি ডাক্তারবাবু ঠিক করলেন?'

সব শুনে গোঁসাইজি বললেন, 'তাঁর ভাবের দিক থেকে তিনি ঠিকই করেছেন। তুমি তোমার ভাবমত কাজ করলেনা কেন? তুমি তো ঠকে গেলে।'

'কী জানি। শেষে আপনি যদি না খান!'

'আমি না খেলেও তুমি ছাড়বে কেন?' করুণাসুন্দর চোখে গোঁসাইজি হাসলেন, তুমি আমার মুখ টিপে জোর করে খাইয়ে দেবে। তোমার ভালোবাসার কাছে কিসের শুচি-অশুচি?'

ভালোবাসাই তো নিয়ম ভুলিয়ে দেয়। আচারের বিচার করতে দেয় না।

একটি নামহীন সরির ভক্ত দু'আনামাত্র জোগাড় করেছে। ইচ্ছে হয়েছে গোঁসাইজিকে কিছু খাবার খাওয়াবে। কিন্তু দু আনায় কী কিনবে কিছু ঠাহর করতে পারছে না। এ-দোকান ও-দোকান ঘুরছে তবু কিছুই মনোমত হচ্ছে না। হয় মনে হচ্ছে, নিতান্ত বাজে নয়তো নিতান্ত তুচ্ছ। এ কি কখনো দেয়া যায়, কিংবা এই এতটুকু? সকাল সাতটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ঘুরছে পথে-পথে, দোকানে-দোকানে, তবু সুরাহা নেই। আর, এমন আশ্চর্য, সম্বলও ত্যাগ করতে পারছে না। শেষকালে, যা থাকে অদৃষ্টে, দু আনার খাবার দিন তো, বলে দাঁড়াল শেষ দোকানীর দুয়ারে। কী দোকানী জিনিস চেয়েও দেখল না, ঠোঙাটি হাতে করে গোঁসাইজির বাসার সিঁড়ির নিচে দাঁড়াল কুণ্ঠিত হয়ে। সমস্ত মুখে সন্দেহ আর ভয়, এই কীট উপচার প্রভু নেবেন কিনা।

অকস্মাৎ তেতলার ঘরে গোঁসাইজি তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ভক্তের কাছে। 'ওগো আমার জন্যে কী এনেছ! কী এনেছ!' মুখে এই গদগদ ভাব: 'ওগো শিগগির আনো, শিগগির। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

ভক্তের হাত থেকে নিজেই ঠোঙাটি তুলে নিলেন। খেতে লাগলেন তৃপ্ত মুখে। চোখ ছলছল করে উঠল। দেখল ভক্তও অঝিরল কাঁদছে। খাবারের প্রায় সবটাই খেয়ে বাকিটা ভক্তকে খেতে দিলেন। বললেন, 'চমৎকার খাবার। চমৎকার খাবার।' বলে ভক্তের চোখের জল মুছে দিলেন যত্নে।

নির্ধারিত সময়ে গোঁসাইয়ের আহার। কিন্তু ভক্তের অনুরাগ তাঁকে যেন নিয়মে ঘরে রাখতে পারল না, করুণাধারায় নিয়ে টেনে নিয়ে গেল।

'কিন্তু ওরা যে আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে ছাড়বে দেখছি।' একদিন মনোব্যথায় বললেন গোঁসাইজি।

'কারা তাড়াবে?'

'নবীন বাবুরা।'

'কেন আমরা কী করলাম!' নবীনবাবু ঘরে পড়লেন।

'এত অঢেল খরচ করছ। দিনরাত এত ভক্ত সমাগম, পঞ্চাশ-ষাট জন তো এখানেই রয়েছে, সকলের খাওয়াবার ভার নিয়েছ।' গোঁসাইজি কাতরস্বরে বললেন, 'আর কিছুদিন আমি এখানে থাকলে তোমরা যে একেবারে রাস্তায় দাঁড়াবে।'

'টাকা বুঝি আমাদের!' বললেন নবীন ঘোষ, 'সব আপনার টাকা। আপনার টাকা আপনারই প্রয়োজনে লাগছে। আমরা তো শুধু হাতে করতে পেরে ধন্য হচ্ছি। আপনি থাকতে কে আমাদের রাস্তায় দাঁড় করায়।'

ভাববাজারের বাসায় পাগলী মা ধর্মমণী এসে হাজির।

এসেই প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকলেন। ভক্ত মেয়েরা রান্না করছিল, তাদের লক্ষ্য করে হুঙ্কার দিয়ে

উঠলেন : 'তোরা কে ? তোরা এখানে কেন ? গোসাই বাড়ির রান্নাঘরে ছুঁচুর ! তোরা তো এঁটো মুক্ত করবি আর বাসন মাজবি। তোরা রান্নার কী জানিস ! যদ্দিন বিজয়ের একটা বিয়ে না দেব আমি নিজেই রান্না করব। তোরা দূর হ।'

সবলকে তাড়িয়ে দিলেন স্বর্ণময়ী। ফেলে দিলেন সব কুটনো-বাটনা। নিজেই খোলাগুঁড় তরকারী কুটলেন, রাখলেন সব আঁচলেঢ় করে। আধোয়া চাল ফুটিয়ে পিণ্ড পাকালেন। ডাল আর জল আলাদা হয়ে রইল।

বিজয়কে খেতে দিয়ে স্বর্ণময়ী জিজ্ঞেস করলেন, 'বল দিকিনি কেমন রেঁধেছি।'

হাসিমুখে গোসাই বললেন, 'ঠিক যেন জগন্নাথের ভোগ ! কিন্তু, আশ্রমবাসীদের লক্ষ্য করলেন 'ওরা সব কেমন আছে ?'

'ওরা সব পাতে ফেলে রেখেছে।' ঘামটা দিয়ে উঠলেন স্বর্ণময়ী : 'ওরা খাবে কী ! ওদের কি ভক্তি আছে ? আমরা হলুম শান্তিপুরের গোসাই, আমাদের হাতে দেবতারা খায় ! আমরা তেল-ঘিও দিই না বাটনা-কুটনোরও বাদ যায় না—যা সাদা জলে সেদ্ধ করে দি, তারই কত স্বাদ !'

'জগন্নাথের রান্না তো সাদা জলেই হয়।'

রান্নাঘরের ভাঁড়ারের ভার নিয়ে স্বর্ণময়ী বিপর্যয় কাণ্ড সুরু করলেন। একদিনের জিনিস অন্য দিনের জন্য রাখবেন না কিছুতেই, সেদিনই সব খরচ করে ফেলবেন। যা কিছু উদ্বৃত্ত চাল ডাল তরকারি থাকবে সব নতুন করে রান্না করে কাঙাল দুঃখীদের ডেকে এনে খাওয়াবেন। আশ্রমে কিছুই সঞ্চিত হতে দেবেন না।

'সবারই তো খাওয়া হয়ে গিয়েছে, আবার কেন রান্না করছেন ?' কেউ হয়তো বাধা দিতে চাইল।

স্বর্ণময়ী ঝুঁখিয়ে উঠলেন : 'তোরা কি মানুষ না পশু ? ভগবান একমুঠো দয়া করে দিলে তার থেকে একগ্রাস অন্যকেও দিতে হয়। ভগবানের দান যার প্রয়োজন তারই জন্যে, সকলের জন্যে, পুঁজি করবার জন্যে নয়।'

'কিন্তু একটু হিসেব করে না চললে চলবে কী করে ?' শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবন এসে শাসন করতে।

স্বর্ণময়ী বললেন, 'দেখ আমরা গোসাই বাড়ির বউ, আজকের যা এল তো হল, কালকে—কালকে গোবিন্দ আছেন।'

গোসাইয়ের জন্যে এক সের দুধ বরাদ্দ করা আছে। সেই দুধই স্বর্ণময়ী সকলকে এক হাতা করে বিতরণ করেন। বিজয়ের জন্যেও এক হাতা।

বাসায় কি কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাচ্ছে, স্বর্ণময়ী তাকে আটকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এত শিগগির পালাচ্ছিস যে ?'

'না, ছেলেটার বড্ড অসুখ, তার জন্যে একটু দুধ জোগাড় করতে হবে। তাই একটু সকাল-সকাল বেরুচ্ছি দেখি পাই কিনা।'

'আচ্ছা, দাঁড়া।' স্বর্ণময়ী টের পেয়েছেন কে একজন লুকিয়ে বিজয়ের জন্যে বাড়তি দুধ জোগাড় করছে সেই বাড়তি দুধের সমস্তটাই ঝিয়ের হাতে তুলে দিলেন। বললেন, 'এই নিয়ে যা। কোথায় খুঁজে মরবি, পাস কি না পাস তা কে জানে।'

'এ তুমি কী করলে।' একটি ভক্ত মেয়ে আপত্তি করল : 'দুধ না পেলে তোমার ছেলের যে কষ্ট হয়, তা তুমি জানো না?'

'যা, সব জানি।' রুখে উঠলেন স্বর্ণময়ী! 'অসুখ হলে কি বিয়ের ছেলের কষ্ট হয় না? বিজয়ের তো তবু তোরা দশজন আছিস, দরকার হলে দশদিকে ছুটোছুটি করবি, কিন্তু বিয়ের ছেলের কে আছে, কে তার জন্যে করতে যাবে?'

ভক্ত মেয়েও ছাড়ে না, স্বর্ণময়ীও গলা চড়ান। শেষে এসে ছেলেকেই সালিশ মানলেন। জিগগেস করলেন, 'বিজয়, তোর সঙ্গে সর্বদা থেকেও এদের এমন বুদ্ধি হল কেন? ওদের কি দয়ামায়া বলে কিছুই থাকতে নেই?'

গোঁসাইয়ের দুচোখ জলে ভরে উঠল। বললেন, 'আমার মায়ের মত এত দয়া আর কারুতে দেখলাম না।'

কিন্তু কলকাতায় থাকবার দিন সংক্ষিপ্ত হয়ে এল। খবর এল যোগজীবনের স্ত্রী বসন্তকুমারী কঠিন অরবিকারে ভুগছে।

খবর শুনেই ছেলেকে চাকার পাঠিয়ে দিলেন গোঁসাই। বললেন, 'যা, স্ত্রীর সেবা করগে। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি রাখিসনে। চিকিৎসাতেই দৈহিক ভোগের প্রায়শ্চিত্ত হয়। যা, আমিও শিগগির যাচ্ছি।'

কদিন পরে গোঁসাইজিও যাত্রা করলেন।

গোয়ালন্দে স্টিমারে উঠে গোঁসাই বললেন, 'পদ্মার প্রবলতর ধারাটিই পদ্মা। ওর হাওয়ায় শরীরের জড়তা দূর হয়ে যায়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সতেজ হয়ে ওঠে। জলের অশেষ গুণ। পদ্মার বিস্তৃতি দেখলে চিত্তে আপনিই প্রশান্তি জাগে।'

ডেকে আসন করে বসেছেন গোঁসাই, ধ্যানের গাঢ়তায় চলে চলে পড়ছেন। একটা সাহেব দূর থেকে দেখতে পেয়ে ভেবেছে বুঝি মাতালের কাণ্ড। কাছে এসে রসিকতা করে জিজ্ঞেস করছে, 'ক্যা জী, দারু পিয়া? কেৎনা পিয়া?'

'হাঁ সাব, দারু পিয়া, বহুত পিয়া।'

'ক্যায়সা দারু পিয়া?'

গোঁসাইজি হাসিমুখে বললেন, 'তুমহারা যীশুখৃষ্ট যো দারু পিতে থে হামভো আজি ওহি দারু পিয়া।'

সাহেব হতচকিয়ে গেল। টুপি তুলে গোঁসাইকে সেলাম ঠুকে স্বস্থানে প্রস্থান করল।

গ্যাণ্ডেরিয়ার আশ্রমে পৌঁছে দেখলেন বসন্তকুমারীর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

বসন্ত কুমারী জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, আর কত দুঃখ দেবে?'

'মা, তোমার ক্লেশের অবসান হল বলে।' গোঁসাইজি আশ্বাস দিলেন।

'এ কষ্ট আর তো দেখা যায় না।' স্বয়ং ডাক্তারই অনুনয় করল গোঁসাইকে : 'তিনদিন যাবৎ শ্বাস চলছে, এখন যবনিকাপাত হয়ে গেলেই পারে।'

'হবে। একটু শুধু বাকি আছে। বুড়োঠাকরুন মাঝে মাঝে বউমাকে গালিগালাজ করতেন তারই জন্যে বুড়োঠাকরুনের উপর বউমার এখনো একটু বিরক্তি ভাব আছে, সেটুকু, কেটে গেলেই আর বাধা থাকবে না।'

'সে তার যাবে কিসে ?'

'যদি বুড়োঠাকরুন একটু হঠাৎ দয়া করে বসেন।'

সঙ্গে সঙ্গেই বুড়োঠাকরুন কাঁদতে কাঁদতে বধূর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'বউ, আমি যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, আমাকে ক্ষমা করো।'

বসন্তকুমারী পরমতৃপ্তিতে হাসল। বুড়োঠাকরুনের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'দিদিমা, আপনি তো কোনো অপরাধ করেননি। অপরাধ আমার হলে আমাকেই আপনি ক্ষমা করুন।'

ধীরে ধীরে চোখ বুজল বসন্তকুমারী। শ্বাস মৃদু হতে হতে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বসন্তকুমারীর অকাল মৃত্যুতে সবাই বিষণ্ণ কিন্তু যোগজীবন নির্বিকার। 'এবার সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হলাম। এখন থেকে ঠাকুরের সঙ্গে নিরুদ্বেগে থাকতে পারব।' এই বলে সে বরং আনন্দ করে বেড়াচ্ছে।

একটু কি মিটুর ঠেকল গোঁসাইয়ের কাছে ? একদিন নিরালায় যোগজীবনকে পেয়ে গোঁসাইজি বলে উঠলেন : 'ওরে যোগজীবন জেনে রাখিস ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও বড়জোর সাময়িক একটা আনন্দের ঢেউ প্রাণে তুলে দিতে পারেন, প্রারব্ধের ভোগ নষ্ট করে দিতে পারেন না। সে শুধু একজনেরই হাতে।'

স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করল যোগজীবন। কন্যার ঘরে স্বয়ং গোঁসাইজি মন্ত্রপাঠ করলেন। বসন্তকুমারী দুটি হাত বাড়িয়ে পতিমন্ত্র পিও গ্রহণ করল। [ক্রমশঃ

• • • •

জার্মানী ও ফ্রান্স থেকে কয়েকজন সাহিত্যিক দেখা করতে গেছেন ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের সঙ্গে।

তাঁকে তাঁর বাড়ীতে না পেয়ে তাঁরা চলে আসছিলেন, হঠাৎ রাস্তায় এক ল্যাম্পপোষ্টে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে তাঁদের ডিকেন্স বলে সন্দেহ হোল।

কাছে গিয়ে তাঁরা দেখেন সত্যই তিনি ডিকেন্স। তবুও একবার জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা।

—ক্ষমা করবেন, আপনিই কি চার্লস ডিকেন্স।

তিনি আপন মনে কি ভেবে বললেন—আমার নাম নিকোলস নিকল্‌বি—

—সে কি!

বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন আগন্তুকেরা।

এবার ডিকেন্স হাসলেন, বললেন—আপনারা আমার অপরাধ নেবেন না। আমি আমার আগামী উপন্যাসের এক চরিত্রের কথা ভাবছিলাম আর তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমার নামটাও ভুলে গেছি।

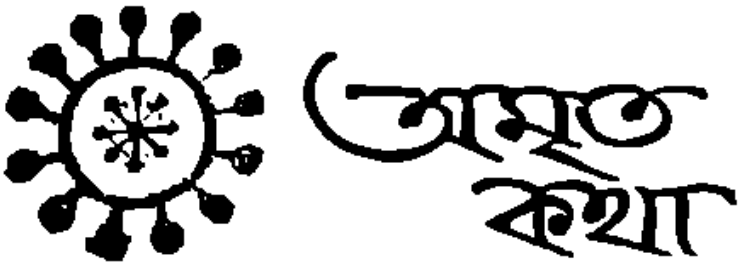

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা :

শ্রীরঙ্গদেশে এক অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রত্যহ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতেন আর অনবরত কাঁদিতেন। গীতার সমুদয় শব্দ তিনি শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না এবং অর্থও বুঝিতেন না। এজন্য সকলে তাঁহাকে উপহাস করিত। কিন্তু তিনি তাঁদের উপহাস বা নিন্দার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আপন মনে প্রতিদিনই পাঠ করিতেন ও পুলকে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপু! কোন্ অর্থে তোমার এত আনন্দ হয়?" তিনি বলিলেন "গুরুর আজ্ঞায় আমি গীতা পাঠ করি এবং যতক্ষণ পাঠ করি, ততক্ষণ দেখি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথে বসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। তাই আমার আনন্দ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'তুমিই গীতার সারমর্ম বুঝিয়াছ।'

ঘুণির ভিতর চিক চিক করিয়া জল যায় দেখে পুঁটি মাছগুলি আনন্দে তার ভিতর ঢুকে যায়, কিন্তু তাহারা আর বাহির হইতে পারে না, একেবারে প্রাণে মরে। সংসারের বাহ্য চাকচিক্য দেখে লোকে তার ভিতর ঢুকে মারা পড়ে। ঘুণির মত সংসারে ঢোকা সহজ কিন্তু বাহির হওয়া কঠিন।

ভিজে দেশলাই হাজার ঘসিলেও জ্বলে না, কেবল ধোঁয়া ওঠে, কিন্তু শুকনো দেশলাই একটু ঘসিলেই দপ করে জ্বলে ওঠে। শুষ্ক শুকনো দেশলাইয়ের মত, হরির প্রসঙ্গ হইবামাত্র তাঁর প্রাণে প্রেমাগ্নি জ্বলে উঠে। কিন্তু কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত মন ভিজে দেশলাইয়ের মত, হাজার হরির কথায়ও উত্তপ্ত হয় না।

সোনের নীচে সহজে জল আসে যায়, জমে না, তেমনি মুক্ত পুরুষদের হাতে যেই টাকা পয়সা আসে অমনি খরচ হয়ে যায়, জমে না!

জুতো পায়ে থাকলে কাঁটার উপর দিয়ে অনায়াসে চলে যাওয়া যায়। ঈশ্বরে জ্ঞান লাভ করে সংসারে থাকলে কোন ক্ষতি হয় না।

সংসারে সং সেজে থেকেই কি সাধু ত্যাগ করতে পারে? খানিকক্ষণ খেলা করুক তারপর আপনি সাজ ছেড়ে ফেলবে এখন।

জীব যখন বলে "হে ঈশ্বর, আমি কর্তা নই—তুমিই কর্তা, আমি যন্ত্র—তুমি যন্ত্রী, তখনই জীবের সংসার যন্ত্রণা শেষ হয়, জীবের মুক্তি হয়। তখন এই কর্মক্ষেত্রে আর আসতে হয় না।

———

॥ অসমাপ্ত ॥

ছোট গল্প

শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎকালের ভাসা ভাসা হালকা মেঘের মতই বিক্ষিপ্ত চিন্তার টুকরোগুলো মনের আকাশে এক এক সময় অকারণে ঘুরে বেড়ায়। দানা বাঁধবার কোন অবকাশই পায় না। তখন প্রতিটি চিন্তার মধ্যে একটি সঘন দুঃখের আর্দ্রতা থাকে। বিচিন্তাগুলো একীভূত না হতে পেরে আমাকে অস্থির করে তোলে। উন্মুক্ত মনের আকাশকে শুধু এক ছায়া ছায়া মায়ায় ঘিরে থাকে। ঠিক তখনই প্রয়োজন হয় একটি সূত্রের। এক একটি বিশিষ্ট ফুলের মত, এক একটি চিন্তার টুকরোকে নিয়ে গাঁথা মালার মতই একটি পূর্ণাঙ্গ চিন্তার মালার রূপ পাওয়া যায়।

মনের মধ্যে যখন এই চিন্তার দ্বন্দ্ব চলে ঠিক তখনই মনে প্রাণে একটি চিন্তাসূত্র খুঁজে চলি। অনেক মানসিক অবসাদের তরণী বেয়ে অনেক যন্ত্রণার উত্তাল তরঙ্গ পার হয়ে শেষে একটা নিশ্চিন্ততার ঘাটে পৌঁছতে পারি।

ক'দিন ধরে এই মানসিক চিন্তাতে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। মনে যখন এই বিবাদ চলে, ঠিক তখনই প্রয়োজন হয় একজন মনের মত মানুষের। যার সংস্পর্শে এলে মনের গ্লানি কিছুটা লাঘব হয়—সময় সময় উপরিলাভ হিসাবে একটা চিন্তাসূত্রও খুঁজে পাওয়া যায়।

প'ওয়ালেশ কোম্পানীর ভবানন্দ রায়কে আমার খুব ভাল লাগে। এই সংসারে এক এক জন এমন মানুষ আছে যাদের সংস্পর্শে এলে যেন বসন্তের দ্বার খুলে যায়। নানা ফুলের সমারোহের মত কচি কচি নবপত্রের মত, সবুজ মসৃণ তৃণোদ্যানের মত প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে। চারিদিকের চিরপরিচিত পরিবেশটাকেই অপরূপ মনে হয়। মনে একটা আনন্দের শিহরণ জাগে।

ভবানন্দের সংস্পর্শে এলে মনে হয় না পৃথিবীতে দুঃখ আছে, শোক আছে বেদনা আছে। সব সময় মনে হয় এক আনন্দের হাটে এসে উপস্থিত হয়েছি। প্রাণখোলা হাসিতে আবেগভরা আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণই মনে হয় এক অভিনব আনন্দালোকে আছি।

এর বিপরীত দিকও আছে। এই পরিবেশের পট যখন পরিবর্তন হয় ঠিক তখনই মনে হয় যেন চির অজানা শ্মশানের এক রুক্ষ চিন্তার রাজ্যে এসে পড়েছি। গাছগুলো যেন ডালপালা বিছিয়ে মানুষের কঙ্কালের প্রতিভূ হয়ে ওঠে। তৃণগুল্মহীন কাঁকর বিছান মাটিকে দেখলে নিরস যাত্তবের কথা মনে পড়ে।

আমি আমার মূল প্রসঙ্গ থেকে বহুদূরে চলে এসেছি। শৈলেনদার অকাল মৃত্যুতে মনটা ক'দিন কেবলই ওমরে ওমরে কেঁদে চলেছে। সাধারণতঃ শৈলেনদা পূজার সময় কলেজষ্ট্রীটে বাস চাপা পড়ে মারা গেলেন। বৌদির জন্য কতদিন নীরবে চোখের জল ফেলেছি। মানুষের প্রয়োজনটা

.যখানে বেশী ঈশ্বরের হাত বোধ হয় সেখানে সব চেয়ে আগে পড়ে। মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি ; কিন্তু সমুখ ধরণী মনকে বোঝাতে পারিনি।

মনের যখন এই অবস্থা, কিছুতেই অস্থির মনটাকে শান্ত করতে পারছি না, তখনই প'ওয়ালেশ কোম্পানীর ভবানন্দ রায়কে মনে পড়েছে। অফিসের ছুটির পর সোজা চলে এসেছি ভবানন্দের কাছে। তারপর মহুয়া রেষ্টুরেন্টে দুজনে চা-পর্ব শেষ করেছি।

তখন কথার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ভবানন্দকে হাওড়াগামী বাসে তুলে দিয়ে শালদীঘিতে চুপচাপ এসে বসেছি। মানুষের কর্মস্রোত অলস হয়ে আসছে। মি, পি ওর মাথায় ঘড়িটা নীরব কবীর মত চুপচাপ আমাকে দেখছে। নতুন টেলিফোন অফিসের নিওন সাইনগুলো বেশ লাগছে। অফিস পাড়াটা ফাঁকা হয়ে আসছে। একটু পরে ফুটপাতের ওপর দড়ির খাটিয়া পড়বে। চাপরাশীরা একটু পরে রাজবেশ ছেড়ে রাখাল বেশ পরে তরকারি কুটবে। তোলা উনুনের ধোঁয়া চারিদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠবে। অন্ধকার এক সর্বগ্রাসী রাক্ষসের মত সবকিছুকে গ্রাস করতে এসেও পিছু হেঁটে চলে যাবে। তখন চারিদিকে আলোর মেলা বসবে।

এই রকম এক অন্ধকারের রাজত্বে আমার মনে চিন্তার দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে গেল। উঠে পড়েছি। বাড়ী যেতে হবে। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল একটা জিনিষ। ব্যস! চিন্তাসূত্র পেয়ে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে চলেছি ডালহাউসি থেকে ধর্মতলায়। হঠাৎ স্পোর্টস সিগারেটের বেলুনটা চোখে পড়ল। দড়ি ধরে কার যেন বেলুনটাকে নামিয়ে আনছে। অস্পষ্ট আলোতে বেশ বোঝা যায়।

আমি চিন্তাসূত্র পেয়ে গেলাম। স্পোর্টস সিগারেট থেকে মনে পড়ে গেল উডবাইন সিগারেটের কথা! আর উডবাইন সিগারেটকে মনে করার সঙ্গে সঙ্গে শিবতোষ বাবুকে মনে পড়ল। আর শিবতোষ বাবুকে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ল।

অনেক দিন আগেকার কথা একটা সান্ধ্য মেঘলা আকাশ। সখের বাজারে টুকিটাকি জিনিস কেনবার জন্য বেরিয়েছি। মাধব বাবুর বিড়ির দোকানে জোরে রেডিও চলছে। কাঠের প্যাকিং বাক্সের মধ্যে তোলা উনুন। তার ওপর সরু জাল। জালের ওপর থরে থরে বিড়ির বাণ্ডিল সাজান। দোকানের প্রতি ধাপে সিগারেটের প্যাকেট। সানলাইট, লাক্স সাবান, স্নো, ইত্যাদির বেশ পাওয়া যাবে। দেওয়ালের গায়ে অজন্র দেওয়াল পঞ্জী। নারীর নগ্ন রূপের সমারোহ। কারিগররা ঝুলে ঝুলে বিড়ি পাকাচ্ছে।

উডবাইন সিগারেটের নতুন একটা প্যাকেট নেবার অদম্য কৌতূহল হল। পকেট থেকে কটা খুচরো নয়া পয়সা বার করলাম। সিগারেট কেনার চেয়ে আমার খালি প্যাকেটের প্রয়োজনটা বেশী। পুত্রের মনোরঞ্জনের বস্তু। সামান্য একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট তাতেই আমার ছেলে সন্তুষ্ট।

ঝুল ঝুল চোখে আমার অফিস থেকে ফেরার সময় অপেক্ষা করে। বারান্দা থেকে একদৃষ্টে পথের দিকে চেয়ে থাকে। প্রতিটি লোককে খুঁটিয়ে দেখে। কীইবা আমার কাছ থেকে পায়! দুটো খালি সিগারেটের প্যাকেট, কটা বাসের টিকিট, দু'চারটে চানে বাদাম, দুটো সন্দেশ, আশ্চর্য! ছেলেটা এরই মধ্যে চিনে নিয়েছে পৃথিবীতে দুটো জাত আছে। জানালার ধারে বসে বসে রাজপথের মেলা দেখে, চলন্ত বাস, সম্পত্তিপন্ন মানুষের ঘুসিতে উপচে পড়া জোয়ার দেখে আর দেখে

রাজপথে মানুষের মিছিল। গাড়ীগুলোর নাম জানে। ট্রাম্‌ব্যাসাডার, লাক্সমাটার, হাওড়ার সব গাড়ীর নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে। আবার মিছিলের স্লোগানের নাম শুনে। শুনতে শুনতে এক ফাঁকে গম্ভীর হয়ে যায়। উড়োজাহাজের শব্দ শুনে মুখ তুলে আকাশের বুকে কী যেন খুঁজে বেড়ায়। খুঁজে পেলে খুশিতে ডগমগ করে। এক সময় ঘুমন্ত নতুন কোন খেলাতে মেতে পড়ে।

অহির চিন্তার ভাসা ভাসা টুকরো সিগারেটের প্যাকেটের সূত্র ধরে বুঝি এবার জানা বাঁধবার অবকাশ পাবে।

মাধব বাবুর দোকানের সস্তা আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠলাম! মুখটা লম্বাটে হয়ে গেছে। বিকট আকার ধারণ করেছে। নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। ঐ আয়নার মধ্যেও দেখতে পেলাম কপালে বলিরেখার ছাপ। দাঁড়িগুলো খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে। চুলগুলো ভলো ঘাসের মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। দোকানী আমাকে চেনে। কম পয়সার খদ্দের হলেও আমাকে মান্য করে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে নতুন সিগারেট উডবাইনের প্যাকেটের কথা বলে রেখেছি।

মাধববাবুর দোকানে সেদিন উডবাইনের প্যাকেট থরে থরে সাজান ছিল। দোকানের ভীড়টা পাতলা হতেই মাধববাবুকে বিনতি করলাম। ঠিক সেই সময় চিন্তার আর একটি বিশিষ্ট মূল প্যাকেটের সূত্র ধরে ধরা দিল। এবার রঙ্গমঞ্চে এলেন শিবতোষবাবু। মাধববাবু আর আমার কথার মাঝখানে সস্তা আয়নায় শিবতোষবাবু বুঝি নিজের মুখ দেখছিলেন। আয়নার একটি অপূর্ব আকর্ষণ আছে। চিরদিনের দেখা মানুষটাকেই বার বার মানুষ খুঁটিয়ে দেখে। দেখার আর শেষ বুঝি হয় না। আমরা জানতে পারিনি শিবতোষ বাবুর উপস্থিতির কথা।

শিবতোষবাবু সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকালেন। মুখটা দেখেই মনে হল সদালাপী পরোপকারী। এ ধরণের মুখ দেখলেই আলাপ করার একটা অদম্য ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগে। মনে বিতৃষ্ণা জাগে না। বিরক্তির রেশ আপনা থেকেই মিলিয়ে যায়। আমি তখনও মানুষ চিনতে পারিনি। সংসারে সব জিনিষের মধ্যেই একটু একটু খাদ মেশান থাকে। কিন্তু শিবতোষবাবুকে কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল অকৃত্রিম। কোন মেকী নেই, সে সব কথা পরে হবে। আগে শিবতোষ বাবুর প্রশ্নটা শেষ করে নিই। আমাকে সরাসরি তিনি সেদিন প্রশ্ন করলেন,—

—'উডবাইনের প্যাকেট খুঁজছেন বুঝি'?

প্রশ্নটা সরাসরি বলে আমার মত মারকাওয়া মধ্যবিত্তের চেতনাতে তরঙ্গ উঠল! কানে একটু জ্বালা অনুভব করলাম। শেষে সেই সদালাপী মুখের জয় হল। রাগ কিংবা দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়েও প্রকাশ করতে পারলাম না। আমার সমাহিত ভাব দেখে শিবতোষবাবু হাঁক-ডাক সুরু করে দিলেন। আমি নিশ্চল পাথরের মত চুপ করে রইলাম।

শিবতোষবাবুর মত দুচার জন ছিটকে পড়া খদ্দের মাধববাবুর দোকানে যে আসে না তাও নয়। এরা বুঝি দৌসুমী পাখীর মত। সংসারে শীতের প্রখরতা সহ্য করতে না পেরে মাঝে মধ্যে মানুষের ভীড়ের উষ্ণ আবহাওয়াতে ছুটে আসে। এসেই এরা সজীব হয়ে ওঠে। এদের দেখলেই বোঝা যায় এদের পেছনে একটা কান্নার ইতিকথা আছে। বাইরে যে উচ্ছ্বাসের ছটা সেটা শুধু সরীসৃপের খোলসের মতই ক্ষণস্থায়ী। এদের চিন্তা অভিনব। ব্যবহার মার্জিত। কথার অভিব্যক্তি অতিসুন্দর।

হাজার মানুষের হিহিহি এদের ভোলা যায় না। বর্ষার মেঘে ঢাকা আকাশে সূর্য নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য যেমন যন্ত্রণায় কাতর হয়—এরাও তেমনি মনের মেঘলা আকাশে আপনাকে উন্মুখ করার নেশায় মেতে ওঠে। আবার সেই প্রশ্ন করলেন শিবতোষবাবু,

—'উড্‌বাইনের প্যাকেট খুঁজছিলেন বুঝি?'

আর চুপচাপ থাকা যায় না। একটা উত্তর দিতে হয়। আমাকে মুখ খুলতেই হ'ল। তৃতীয় পক্ষকে সরাসরি উত্তর দেবার প্রচলিত রীতি আমি সেদিন জানতে পারিনি। একটা অবজ্ঞা মিশ্রিত উত্তর আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হল,

—'ছেলেদের কথা আর বলবেন না স্যরীবের ঘোড়া রোগ মশাই, বাপের যে সব জিনিষ কেনবার সম্বতি নেই তবু ছেলে বোঝে কই। সব সময় নাছোড়বান্দা।'

'খালি সিগারেটের প্যাকেটগুলো কেটে নষ্ট করবে—আমি জোগাড় করতে হিমশিম খাই মশাই'—আমার ছেলের প্রতি এইরূপ ইঙ্গিতে যে এতটা ফল পাব তা আমি কল্পনা করতে পারিনি। যদিও নিজের কানে নিজের কথাগুলোই বেসুরো শোনালো—আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। চোখ তুলে দেখি শিবতোষ বাবু তখনও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু পরে মুখ খুললেন,

—'আপনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে একটা কথা বলি—সন্তান সম্বন্ধে কোন অবান্তর কথা অন্তত: আমার কাছে বলবেন না—আমি দুঃখ পাই।'

—'সন্তানকে প্রশ্রয় না দিয়ে মাঝে মাঝে একটু কঠোর করে উঠতে হয়—নাহলে আকাশের চাঁদ চেয়ে বসে ওরা। শাসন চাই।'

আমাকে আমার কথাটা শেষ করতে দিলেন না শিবতোষবাবু। সুরু করলেন,

—"দয়া করে ছেলেদের সম্বন্ধে ওরকমের কথা বলবেন না। দেশের ছেলেরা একেই অবহেলায় অযত্নে পড়ে আছে। তারপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মত আপনারা খড়্গ-হস্ত হবেন না মোহাই।"

লক্ষ্য করলাম শিবতোষ বাবুর মুখটা কেমন নিষ্প্রভ ম্রিয়মান হয়ে গেল। সারাটা মুখ বেদনার ছায়ায় ভরে উঠল। বটের পূর্বাভাষের মত থম থমে হয়ে গেল। তখনও মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে যদি একটুও খোঁজ পেতাম। মানুষ কত অভিনয়ই না করতে পারে। সেই সময় একটা ভর-পাওয়া মানুষের মতই, একটা জের সম্পূর্ণ একটা প্রেতযোনির মত মগজে চেপে বসল। উনি যত প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চান আমার জেদের মাত্রাটাও সেই অনুপাতে বেড়ে চলে।

সঙ্গে সঙ্গে শিবতোষবাবুর একটা অবরুদ্ধ চাপা কান্নার ঘর ঘুলে গেল। সুপ্ত থাকতে পারল না। আমারও মস্তিষ্কের হল বলা চলে। যে ব্যক্তি তার গোপন কান্নাকে সযতনে মনের মনিকোঠার অভ্যন্তরে তুলে রেখেছিল—তাকে কেন বাস্তবের মরুভূমিতে নামিয়ে আনতে চাইলাম।

কাজটা আমি মোটেই ভাল করিনি; তবু এটা আমার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ছিল। প্রথমে আমি জানতঃ শিবতোষবাবুকে কোন জুলুম করিনি। জানবার জন্য বিন্দুমাত্র কৌতূহলও প্রকাশ করিনি। তবু শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমিই যেন অন্ত মানুষ হয়ে গেলাম। যার যার পীড়াপীড়ি করলাম। আর শেষে শিবতোষবাবুর চোখের ভাষা পড়ে বুঝে নিলাম—আমার কথাকে কোন শক্তিতেই প্রতিরোধ করতে পারলেন না। মন্ত্রপড়া সাপের মত একসময় নিস্তেজ হয়ে গেলেন।

আবার প্যাকেটের সূত্র ধরে চিন্তার গতি ঘুরে চলে। কখনও ঘুর পথ ধরে কখনও বা পথের

নিশানা ছুঁয়ে ছুয়ে আমার চিন্তার গতি এগিয়ে চলে। বৃষ্টি ধরে এল। সবের ঝাপ্সায়ে আবার লোকে অন্ধকারে ঢেকে গেল। এ যেন সাদা আকাশ। এই থাকে একটি তারা—তারপর দুটি—তারপর হঠাৎ চোখে পড়ে তারার মেলা। একটু আগেও চলছিল বৃষ্টি খেলা। যেন কুমারী মেয়ের সোপন কান্না। চোখ দুটো লাল অবাধ্য। কান্নার সবকিছু আয়োজন আছে অথচ বহিঃপ্রকাশ নেই—সেই প্রস্রবণের ধারা।

সাহেবদের ঘাট। ঘাটের সামনে এক একটা প্রকাণ্ড গাছ। সিমেন্ট দিয়ে গোড়াটা বাঁধান। বেশ বসবার জায়গা। সামনে ডায়মণ্ড-হারবার রোডটা কাল সরীসৃপের মত পড়ে আছে। আমাদের হাতে প্রচুর সময়। শিবতোষ বাবুকে ছাড়তেও মন চাইছে না। শেষে দুজনেই নিজেদের অজান্তে সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরে সাহেবের ঘাটেতে এসে পৌছলাম।

সরকারী-বেসরকারী বাসের দুরন্ত বেগটা আমাদের মনের আবেগকে মাঝে মাঝে ছিন্নভিন্ন টুকরো টুকরো করে দিচ্ছিল। তবু ওটার প্রয়োজন আছে। মনোনিবেশ করার আগে একটা বিরক্তিকর যন্ত্রণার প্রয়োজন হয়। প্রণীড়নের যন্ত্রণার ফলেই অসল জিনিসকে আঁকড়ে ধরা যায়। যান্ত্রিক ঐকতান টেম্পোর একটানা গো গো শব্দ-চলন্ত মোটরের হঠাৎ উচ্চকিত হাসি! এসব আমাদের বাধার সৃষ্টি না করে বরং সুযোগ করে দিল।

গলার স্বর উচ্চগ্রামে না তুলতে হলেও—একেবারে ফিস ফিস করে কথা বলা চলল না। রাত্রির কান্নার মত পাতা থেকে চুঁইয়ে পড়া টুপ টাপ জলের ধারা পড়তে লাগল। অশথ গাছের কোটরে পেঁচার আর্তনাদ—শিবতোষ বাবুকে কথা বলবার সুযোগ করেদিল।

—"বলছিলাম কী, ছেলেদের প্রতি কখনও নির্দয় হবেন না—কখনও রাগের মাথায় এমন কিছু করবেন না যাতে জীবনভোর পরিতাপ করতে হয়। তার ফল আমি জীবনের সব সময় পেয়ে চলেছি। অথচ শান্তিকে কেউ কোনদিন রাগতে দেখেনি। মেজাজ কী জিনিষ তা শান্তি জানত না। একদিন সামান্য একটু ভুলের জন্য শান্তি এমন একটা কাজ করে ফেলল—পৃথিবীর হাজার হাজার ঘটনার সঙ্গে তার তুলনা হয়না। শান্তির মনে চিরটা কালের জন্য একটা দুঃখ রয়ে গেল।

চুপ করে গেলেন শিবতোষবাবু। একটা প্রাইভেট গাড়ী হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য বিকল হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। চার্চের ওদিক থেকে পেটা ঘড়ির একটানা শব্দ ভেসে এল। সামনের পুকুরটায় একটা টুপ করে শব্দ হল। বাদুড়ের মুখ থেকে একটা ফলের টুকরো বুঝি পুকুরের অন্ধকারে পড়ে গেল। দুটো শিয়াল রাস্তা পার হওয়ার সময় আমাদের দিকে ফিরে তাকাল। অন্ধকারে তাদের চোখগুলো জ্বল জ্বল করে উঠল। হঠাৎ একটা বাচ্চা শিয়াল কোথা থেকে মা-শিয়ালের কাছে ছুটে এল। মা-শিয়ালের সেকী আদর!

সে দৃশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, দাঁড়িয়ে থাকা বিকল গাড়ী থেকে, একটি ছেলে হঠাৎ কঁকিয়ে উঠল। উল্টো দিক থেকে ছুটে আসা বাসের তীব্র আলোতে ছেলেটিকে দেখা গেল। মা নিবিড় ভাবে ছেলেকে আদর করছেন। তারপরই চুপচাপ। ছেলেটি অমৃতের স্বাদ পেয়ে বুঝি চুপ করে গেল। সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে শিবতোষবাবু বলে চললেন।

—"অফিসে কাজ করছি। হঠাৎ ফোন এল। ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি হাসপাতালের এমারজেন্সী বিভাগে এলাম। পরিচিত পাড়ার উপকারী ছেলেদের দেখলাম। ওদের দেখেই আমার যেন রক্তশূন্য হয়ে গেল। তখনও শান্তির দিকে নজর পড়েনি। একটি বৃদ্ধের আশ্চর্য-বিহ্বল দৃষ্টিকে

অনুসরণ করতে গিয়ে শান্তির দেখা পেলাম! নার্স শান্তিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। শান্তি তার কর্তৃকদের অনুশোচনায় একভাবে কেঁদে চলেছে। সে নিজেকে খুনী হিসাবে জাহির করতে চাইছে।

শেষে শান্তি আমাদের দেখল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল। আমার অবস্থাটা বুঝুন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ জানবার আগেই—আমার দুশ্চিন্তার মাত্রাটা বেড়ে গেল। শেষে কিছুক্ষণ পরে মর্ম উদ্ধার করতে পারলাম। হঠাৎ উত্তেজিত হবার ফলেই বাড়ীতে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। তারজন্য ছেলেকে হয়ত জীবনের মত হারাতে হতে পারে এমনি একটা ভাব।

ছেলেকে জীবনের মত হারাতে হল না। শাস্তির ভয়ে ছেলে ছাদ থেকে লাফাতে গিয়ে একটা পা জীবনের মত হাসপাতালে রেখে এল।

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি সুরু হল। অগত্যা আমাদের উঠতে হল। বাড়ী ফেরার পথে শিবতোষ বাবু আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন। তার আহ্বান শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারলাম না। সাহেবদের মাঠ পেরিয়ে সাবর্ণপাড়ার পথ ধরলাম আমরা। শেষে আমরা একটা একতালা বাড়ীর সামনে হাজির হলাম। আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে শিবতোষবাবু ভিতরে গেলেন।

গ্যাস-পোষ্টের আবছা আলোতে দেখতে পেলাম ছাদের কার্নিশে বট অশ্বত্থের চারা উঠেছে। বাইরে দেওয়ালের পলস্তরা খসে গেছে। একটা স্যাঁতলার ছোপ ধরেছে। জায়গাটাতে ছায়া ছায়া একটা স্যাঁত সেঁতে ভাব আছে। সোঁদা সোঁদা একটা গন্ধ। সূর্যের আলো বুঝি কমই আসে। মানুষগুলো যেন প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে আছে। বাড়ীর সদর দরজার ভিতরে পায়রার ডানা ঝটপটানির শব্দ শোনা যায়। পাশের ড্রেন থেকে একটা চিমসে দুর্গন্ধ ভেসে আসে। হঠাৎ শিবতোষ বাবুর ডাকে সংবিৎ ফিরে পেলাম।

ক্রাচে ভর দিয়ে একটি বছর ছয়েকের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারিকেনের আলোতে ছেলেটির সরল-মায়া মাখান মুখটা দেখে বড় ভাল লাগল। আমাকে পেয়ে ছেলেটির সে কী আনন্দ। বাড়ীর ভেতরে গিয়ে বসলাম। ঘরের ভেতরটা দেখে বড় আনন্দ হল। বেশ সুন্দর ছিম-ছাম লাগল। ছেলেটি আমার সঙ্গে অনর্গল বকে শেষে এক ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়ল। ক্রাচ দুটো সরিয়ে রেখে ভাল করে শুইয়ে দিলাম! ঘুমন্ত ছেলেটির মুখে একটা অপরূপ হাসি ফুটে উঠল। শিবতোষ-বাবু বাড়ীতে এসে যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেলেন।

ঘরের ভেতর চুড়ির টুংটাং শব্দ। শাড়ির খস-খস শব্দ। শেষে সুর করে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়াও শুনলাম। চুপ চাপ বসে থাকা যায় না। শেষে একটা অজুহাত দিয়ে উঠতে যাব দেখি দরজার সামনে সাক্ষাৎ প্রতিমার মত একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। সরলের লালপাড় শাড়ি, আঁচলের চাবির গোছাটি কলায় একটা বেড় দিয়ে এসে ঝুলছে। হাতে রেকাবি তাতে কয়েকটা বাতাসা। একটা সন্দেশ। উনিই মুখ খুললেন।

—'শুধু মুখে যাবেন না—গৃহদেবের অকল্যাণ হবে। আমি প্রণবের মা। আপনার ছেলেকে একদিন আনবেন। রোজই তো বেড়াতে যান দেখি ওকে নিয়ে।' অন্দরে চলে গেলেন। আবার সেই স্তব্ধতা আমাকে চেপে ধরল। শিবতোষবাবু যেন আমাকে চেনেন না। কোনদিন আমাকে দেখেছেন বলেও মনে করতে পারলাম না। হঠাৎ চোখে পড়ল ছেলেটির মুখে কয়েকটা

মশা বসেছে। রক্ত খেয়ে বেশ ফুলে উঠেছে। লক্ষ্য করলাম শিবতোষ বাবু নেই। কোন ফাঁকে উঠে গেছেন। অন্দর থেকে শুধু উত্তেজিত মহিলা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—'তুমি আমার ছেলের গায়ে হাত দিতে গেলে না—তুমি সব পায় একটা পায়ের লক্ষ্য রক্ষা করেছ মনে নেই।'

শিবতোষবাবু যেন মহিলাটিকে চাপা দেওয়ার জন্য খালা বাসন ফেলতে সুরু করলেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মহিলাটির সম্বন্ধে কত খারাপ ধারণা না করেছি—আগেও শিবতোষ বাবুকে প্রচুর সহানুভূতি জানিয়েছি। বৃথাই তাকে উঁচু আসনে বসিয়েছি।

ছাতাটা খুলে বাইরে আসতে গিয়ে দেখি জানালার পরাদে ধরে শিবতোষবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। মূর্তিমতি মহিলার কোলে প্রণব শুয়ে আছে।

কে যে প্রকৃত অপরাধী তা আজও বুঝতে পারলাম না।

• • • •

ফরাসী দেশের বিখ্যাত অভিনেতা মরিস্ দেভালিয়র প্রথম জীবনে জীবিকা সংগ্রহের জন্যে কি পরিশ্রমই না করেছেন! কিন্তু কোন কিছুতেই ফল পেলেন না।

শেষে একদিন ঠিক করলেন নদীর জলে পুলের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন,—হোক্ আত্মহত্যা, কিন্তু আর যে সহ্য হয় না।

পুলের ওপর গিয়ে দেখেন অত ভোরেও দুই ছেলের দল সেখানে ভিড় করতে গেছে। মরিস্ ভাবলেন, ওদের সামনে ত আত্মহত্যা করা চলে না।

শেষে তিনি তাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে এক নূতন কসরৎ করলেন, বললেন : ওহে ছোকরারা, আমি কেমন নাচতে পারি জান?

—দেখলাম না আপনার নাচ,—ছেলের দল ত মজা পেয়ে তাঁর চার দিকে ঘিরে দাঁড়াল। মরিসের ইচ্ছা পুলের উপর নাচতে নাচতে তিনি নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

কিন্তু আর একজন লোক মরিসকে লক্ষ্য করছিলেন, তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, তুমি সিনেমায় নামতে চাও?—তোমাকে আমি পেয়েছি ঠিক সময়ে। বুঝেছি তোমার প্রতিভা অসাধারণ।

উড়ন্ত মানুষ

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

সার্কাসের খেলা'র 'ফ্লাইং ট্রাপিজে' উড়ন্ত মানুষের খানিকটা আভাস পেলেও পাওয়া যেতে পারে। কিংবা ম্যাজিক বা স্বপ্নোজন কৌশলের মজাদার খেলাতে উড়ন্ত মানুষকে দেখা গেলেও খুব বিস্মিত হওয়ার কারণ থাকে না।

কিন্তু নৃত্যশিল্পে শিল্পী পাখির মতন ডানা মেলে মনোহারী হওয়ার প্রয়াসী—শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন উৎকর্ষ তেমনি দর্শকের কাছেও তা চমকপ্রদ।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার পাখির মতন ডানা মেলে উড়বার কল্পনা কত কাব্যের উপজীব্য—বাস্তব শিল্পে তা রূপায়িত হতে দেখলে নিশ্চয়ই আমরা বিস্মিত হবো বৈ কি! রাশিয়ার ব্যালে-নৃত্যে হাঁস হয়ে পাখা মেলার কলা-কৌশল পৃথিবীর নৃত্য-শিল্পের বিস্ময়!

মেক্সিকোর গ্রামীন উৎসবে লোক নৃত্যে "উড়ন্ত লগি নৃত্য" এক অপূর্ব বিস্ময়। পাখির মতন আকাশে উড়বার যে অতীত কালের স্বপ্ন—সেই স্বপ্ন সফল করার চেষ্টা দেখা যায় এই নৃত্যে।

মেক্সিকোর সুদূর গ্রামে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে নানা উৎসবে এই নৃত্য আজও প্রচলিত। বহু শতাব্দীর পুরোনো বিচিত্র ওই রূপ শিল্পীদের বংশধারায় প্রবাহিত।

প্রাচীন যুগের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকেই এর প্রবর্তন। পুরুষরাই এই নৃত্যের শিল্পী।

শূন্যে ঘোরাফেরাকারী মেক্সিকোর আদিবাসী জাহাজের মাস্তুলের মতন উঁচু একটা বাঁশের লগির মাথায় উঠে যায়। পাখিদের মতন তাদের সাজ পোশাক। আবহ সঙ্গীত হিসাবে বাজতে থাকে তখন এদের নিজস্ব বাঁশি এবং ঢাক। বাঁশের মাথায় উঠে গিয়ে তারা তাদের পায়ের গাঁট শক্ত করে বাঁধে। আর সেই দড়ি ঝুলে দেয় এক ঘূর্ণায়মান কিলকের সঙ্গে। তারপর তারা লাফিয়ে পড়ে মহাশূন্যে,—কণ্ঠে তখন তাদের ঘন চীৎকার।

এমনি করে দু'তিন মিনিট তারা বিদ্যুৎগতিতে পাখির মতন উড়তে থাকে এবং লগিকে কেন্দ্র করে তারা যে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করে সেই চক্রের ব্যাসার্ধ ক্রমে হয়ে ওঠে ক্রমবর্ধমান। মনে হয় তারা যেন নাগর দোলায় চড়ে ঘুরছে আর উড়ছে।

কিলকের সঙ্গে যে দড়ি জড়ানো থাকে তা উড়ন্তকারী শিল্পীদের দেহের ওজনের ফলে সেই দড়ির পাক ক্রমশঃ খুলতে থাকে আর তারই ফলে লগির মাথা ঘূর্ণমান হতে দেখা যায়।

যখন এই উড়ন্ত নৃত্যশিল্পীরা শূন্য থেকে মাটির নিকটতর হয় তখনস্তারা পাখিদের তীক্ষ্ণ স্বরের অনুকরণ করে!

উপরের দিকে তাকিয়ে এই উড়ন্ত মানুষ-পাখিদের নাচ দেখতে নীচের মাটির দর্শকরা বিপুল উত্তেজনা অনুভব করে—চোখে তাদের বিস্ময়ের ঘোর।

সার্কাসের খেলোয়াড় নয়—'তালাডোর' শিল্পীদের এই পক্ষী-নৃত্যের কলা-কৌশল কী অপূর্ব।

কিন্তু এই নৃত্যশিল্পের খেলায় কতো 'তালাডোর' নৃত্য-শিল্পীর যে মৃত্যু ঘটছে তার হিসাব রাখে কে? তবুও শিল্পের প্রতি যাদের অনুরাগ তাদের কাছে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য।

মেয়ে মজলিশ

রূপে ভরল দিঠি

সুরঞ্জনা সেন

বৈষ্ণব কবিতায় যুগের রূপবতীরা শুধু নয়—যুগে যুগে মেয়েরা চেয়েছে রূপসজ্জা। সেই রূপসজ্জার কথাই আজ কিছু বলি।

রূপের সাধনা চলেছে যুগ যুগ ধরে। এই সাধনায় সব চেয়ে বেশি মন দিয়েছে মেয়েরা। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তো ব'লেই গেছেন—সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। তাই, প্রসাধনের সাহায্যে সৌন্দর্য লাভের জন্য মেয়েরা চিরকালই উৎসাহী। যারা এমনিতেই সুন্দর তারাও চায় আরো সুন্দর হতে।

আজকের দিনের মেয়েদের মতো প্রাচীন এশিরানাইনর, মেসোপটেমিয়া, চীন, ভারত, পারস্য, ফিনিশিয়া, গ্রীস, রোম ইত্যাদি দেশের মেয়েরাও নানা রকম প্রসাধন-দ্রব্য ব্যবহার করত। দেহ আকর্ষণীয় ক'রে তোলার জন্য মিশরের মেয়েরা বিভিন্ন রঙের সাহায্য নিত। তারা চোখের নিচে লাগাত সবুজ রং আর চোখের পাতায় কাল রং। নখ, করতল আর পায়ের পাতা রাঙাত হেনার রঙে। মিশরে প্রসাধন-চর্চার স্বর্ণযুগ আসে রাণী ক্লিওপেট্রার সময়ে। নৃশংস সম্রাট হিসেবে পরিচিত নীরো ও তাঁর স্ত্রী পপিয়া অঙ্গ-সংস্কারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। রোমের রাজ-পরিবারের মেয়েরা কেশ-সংস্কারের জন্য ব্যবহার করতেন এক রকম সাবান। স্কটল্যাণ্ডের পরমাসুন্দরী রাণী মেরীর একটি প্রিয় প্রসাধন ছিল সুরাস্নান। তখনকার রাজপরিবারের তরুণীদের সাবন্ত বিলাসের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল দুগ্ধ-স্নান। প্রসাধন কলার অনুরাগিনী ছিলেন অষ্ট্রিয়ার রূপসী রাণী অ্যান। ফরাসী রাজকুমারীরা গায়ের রং ফর্সা করার জন্য ব্যবহার করতেন শেনের কোকো আর ভ্যানিলা ক্রিম। সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন ও সম্রাজ্ঞী জোসেফাইন প্রসাধন ব্যবহারে ছিলেন অকৃপণ। কালিদাসের 'রঘুবংশ', 'কুমার সম্ভব', ও 'ঋতু-সংহার' কাব্য থেকে জানা যায় গুপ্তযুগে মেয়েরা কালাগুরু, গুগ্গুলু, হরিচন্দন, হরিতাল, সোরেণু, ধূপ, কুমকুম, গোরোচনা, অলক্তক প্রভৃতি প্রসাধন-দ্রব্য ব্যবহার করত। বাৎস্যায়নের 'কাম সূত্রে' এর সমর্থন পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের বহু আগে, রাজা বিম্বিসারের স্ত্রী কোশল-দেবী প্রসাধনের ব্যয় নির্বাহের জন্য কাশীর কিছু অংশ যৌতুক হিসেবে পেয়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় প্রসাধনে অনুরাগ সেকালেও কতটা ছিল।

ভারতে মধ্যযুগে, মুঘল বাদশাহদের দরবারে আর হারেমে প্রসাধন—দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সুগন্ধির ছড়াছড়ি আর ঘরের ভেতরে গোলাপ জলের ফোয়ারা এক মোহময় পরিবেশ রচনা করত। সম্রাট শাহজাহানের বিলাসী মন ব্যক্ত হয়েছে স্থাপত্য-শিল্পে; সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের বিলাসী মন প্রকাশ পেয়েছে সাজ-সজ্জা আর প্রসাধন-চর্চায়। তিনিই নাকি প্রথম গোলাপের আতর আবিষ্কার ক'রেছিলেন। পারলৌকিক মুক্তির চাইতে আক্ষরিক ভোগ-সুখের দিকেই ছিল মুসলমান বাদশাহ আর ওমরাহদের দৃষ্টি। তাই তাদের সময়ে যে প্রসাধন-কলা উৎকর্ষ লাভ করবে এতো খুবই স্বাভাবিক। হারেমের মেয়েরা তো বটেই, বাদশাহেরাও চোখের কোণে দিতেন সুর্মার রেখা, স্নান করতেন গোলাপ-জলে, আর তাদের মূল্যবান পোশাক মণির চাইতেও দামী আতর আর গন্ধদ্রব্যে। সম্রাট আকবরের জন্ম উপলক্ষ্যে তার পিতা হুমায়ুনের কস্তুরী বিতরণ তো অতি বিখ্যাত ঘটনা।

একালের প্রসাধন—দ্রব্য

সেকালের প্রসাধন-দ্রব্যের অনেকগুলিই অবশ্য এখন আর ব্যবহৃত হয় না এখনকার দিনে ব্যবহৃত হয় কোল্ড ক্রিম, ভ্যানিশিং ক্রিম, স্নো, কেশ পাওডার, কেশ তৈল, 'লপস্টিক, নেল পলিশ নখরঞ্জন, চুলের রং, কলপ, শাম্পু, স্নানের সুগন্ধি তৈল, সুগন্ধি দাঁতের-মাজন ইত্যাদি। পয়সা দিলেই, আজকাল এ-সব জিনিস পাওয়া যায়। আগের দিনের প্রসাধন—সামগ্রী বেশির ভাগই আসত বন, খনি আর সমুদ্র থেকে, এখন আসে কল-কারখানা থেকে।

কিছু-কিছু প্রসাধনদ্রব্য কিন্তু মেয়েরা নিজেরাই সহজে সংগ্রহ ক'রে ব্যবহার করতে পারেন। বাজারের জিনিসের চাইতে তার উপকারিতা বেশি ছাড়া কম নয়। ক'য়েকটি সাধারণ জিনিসের কথা এখানে বলবো।

১। ২ ভাগ গ্লিসারিন ও ১ ভাগ গোলাপ জল একসঙ্গে মিশিয়ে হাতে মালিশ করলে হাত নরম আর রং ফর্সা হয়।

২। সামান্য পরিমাণ লেবুর রস জলের সঙ্গে মিশিয়ে হাতে, মুখে, ও ঘাড়ে ভালো ক'রে মেখে নিলে রং ফর্সা আর ত্বক কোমল হয়।

৩। সামান্য দই মুখে নিয়মিত মর্দন করলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মুখের সুষমা বাড়ে।

৪। রাতে শোবার আগে বেসন দিয়ে মুখ ধুয়ে, শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে, একটু কচ্ তৈল মর্দন করলে মুখ উজ্জ্বল হয়।

৫। কাঁচা হলুদ বেঁটে দুধের সরের সঙ্গে মিশিয়ে মাখলে মুখ সুষমামণ্ডিত হয়।

৬। রাতে, ঘুমোবার আগে মুখে নিয়মিত চন্দনের প্রলেপ দিলে মুখশ্রী বাড়ে, কালো দাগ, ব্রণের চিহ্ন ইত্যাদি মিলিয়ে যায়।

৭। মহুয়ার ভাল মধু ক'রে বেঁটে শোবার আগে মুখে মেখে রাখলে মুখের লাবণ্য ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। কালো দাগ, মেচেতা, ব্রণের দাগ ইত্যাদি দূর হয়।

৮। সমান পরিমাণ সরষের তেল আর জল নিয়ে তার সঙ্গে কমলালেবুর খোসা আর কাঁচা হলুদ বাঁটা মিশিয়ে এক সঙ্গে ফুটিয়ে নিতে হবে। জলীয় অংশ শুকিয়ে যাবার পর ওই মিশ্রণ নামিয়ে নিয়ে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় ভালো ক'রে শরীরে মেখে নেয়া দরকার। এই মিশ্রণ নিয়মিত ব্যবহারে শরীর পেলব ও শ্রীমণ্ডিত হয়।

৯। বিশুদ্ধ শঙ্খ-ভস্ম নিয়মিত ব্যবহারে গালের নানা রকম বিশ্রী দাগ মিলিয়ে যায়, গাল মসৃণ আর ফর্সা হয়।

১০। শিমুলের কাটা চন্দনের পাটে ঘষে প্রলেপের মতো মুখে লাগালে শ্রী ও লাবণ্য লাভ করা যায়।

১১। ডাবের জল মুখে নিয়মিত ব্যবহার করলে গাল থেকে বসন্ত-রোগের দাগ পর্যন্ত উঠে যায়। মুখে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আসে।

এর পরের বার ত্বকের যত্ন সম্পর্কে আরো আলোচনা করা যাবে। মুখ ব্রণ, মেচেতা আর ছুলি নিবারণ সম্পর্কে কিছু বলার ইচ্ছাও রইল।

এই প্রথম

মনে মনে

মুকুতি রায় চৌধুরী

(গল্প)

জানালার ওপর একটা ছোট ঘুলঘুলি। প্রথম রোদের মিষ্টি আমেজ উপভোগ করে মিতা তার কলরব। সে কথা জানাতে চায় সে শুধু ঘরের লোককে নয়—পরকেও। ঘুলঘুলিতে রোদ এলে আর বসে না সে। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে ঘরে চক্কর মারে—জানালার সামনে আলসেতে একটু বসে। খুঁটে খুঁটে কিছু খাবার সংগ্রহ করে কিংবা রাস্তার ওপারের বাড়ীর ছাদে চলে যায়। আর মাঝে মাঝে ফিরে আসে নিজের ঘুলঘুলিতে। চড়ুই পাখীটার কলরবে ঘুম ভাঙ্গে অমিতার। ইচ্ছে করে মুখে 'হুস হুস' শব্দ করে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু পারে না। চেয়ে চেয়ে দেখে ঘুলঘুলির দিকে। তারপর রোদ নেমে আসে; জানালা দিয়ে সরাসরি রোদ পড়ে অমিতার বিছানায়। শীতকালে বেশ ভালো লাগে—কিন্তু গ্রীষ্মকালে ভাল লাগে না। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, রোদ গায়ে লাগলেই উঠে পড়ে সে বিছানা ছেড়ে। চড়ুই পাখীর মত তাকেও একটু পরে বেরুতে হবে কিছু সংগ্রহ করতে—আর রসদ সংগ্রহ করতে হলে চাই পুঁজি। বি. এ. ও বি. টি. পাশ করে অবধি চলেছে তার চেষ্টা।

স্কুলের চাকরী নেবার সময় বন্ধুরা বলেছিল—বিয়ে করলেই তো পারিস। সারা জীবন কি নিজে নিজে রোজগার করে খাবি নাকি?

উত্তর দিয়েছিল অমিতা মনের মত মানুষ পেলে বিয়ে করব বৈকি। চাকরী করব কিনা সেটা পরে ভাবা যাবে।

বিয়ে করতে সে যে অনিচ্ছুক, এমন কোন রকম আভাস সে কখনও দেয়নি। সিনেমার হলে অপরিচিত ভদ্রলোক যখন তার পাশে বসেছে, সে হাতল থেকে হাত সরিয়ে নেয়নি—বরং আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। স্পর্শে পেয়েছে রোমাঞ্চের আস্বাদ।

বিছানা ছেড়ে উঠে অমিতা একদণ্ড সময় নষ্ট করে না। সাড়ে সাতটার মধ্যেই তার সব কাজ শেষ। বেরিয়ে পড়ে টিউশানী করতে। সেখান থেকে সোজা ইস্কুল। স্কুলের শেষে আবার টিউশানী। তারপর ক্লান্ত শরীরে নিজের ডেরায় ফিরে এসে শরীরকে এলিয়ে দেয়।

এমনই চলেছে আজ কয়েক বছর। মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে সাধারণ ভাবেই। ওরই সহকর্মীনী শিক্ষিকা দেবা প্রস্তাব এনেছিল তার ভাই মনিময়ের জন্য। মনিময় একটা বিজ্ঞাপনের কোম্পানীতে আর্টিষ্ট। অমিতার ছবি দেখে মনিময় পছন্দ করে দিয়েছিল। মনিময় দেবাকে

বলেছিল, তোর বন্ধুর এত প্রশংসা করিস, কিন্তু দেখতে তো ভাল নয়। রেবা বলেছিল, বাইরের রূপটা যে তোমরা কেন দেখ দাদা। মানুষের সত্যিকারের রূপ তার চেহারা নয়।

বোধ হয় শিল্পীর চোখে অমিতা সুন্দরী নয়। সত্যিই কি তাই! অমিতা কিন্তু তার রূপ সম্বন্ধে সচেতন। তার রং ময়লা তবে চেহারা ভাল। শ্যামাবতী বলা চলে। আর যাকে বলে স্মার্ট।

রেবা লজ্জিত হয়েছিলো মণিময়ের কথা অমিতাকে জানাতে। অমিতা বলেছিলো—ঠিকই তো। আমি সুন্দরী নই। তবে দেখিস্ বিয়ে আমি করবই। বলা তো যায় না, কারো চোখে লেগেও যেতে পারি।

দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করেছিলো অমিতা—কিন্তু তার অপ্রতিভতা কারো কাছে দামী মনে হয়নি। সে যে পাশকরা, চৌকস, ও চটপটে, সেটা কারও কাছে মূল্যবান বলে প্রতিভাত হয়নি।

দুরন্ত তরীর কাছে লাইটহাউসের নিশানার মত একটি দুটি সম্বন্ধ আসত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশাহজাদী তার নিরাশ বুকে টেনে নেয় অমিতাকে।

মণিময়ের জীবনে কি ঘটল। আসলে ওরা হচ্ছে সেই জাতের ছেলে, যারা একবার বিয়েতে সম্মতি দিলে হাজার হাজার সম্বন্ধ আসে। যেমন সাদা মনে সে অমিতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এমন অনেককেই সে করেছে। ভাবখানা হচ্ছে, যখন ইচ্ছে হবে, যাকে ইচ্ছে হবে বিয়ে করব।

আর্টকে কেন্দ্র করে তার স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল। সে শিল্পী—তার চোখ দিয়ে সে বোধহয় সুন্দরীর অনুসন্ধান করছিল। অথচ সে সন্ধানে যে যৌবন শেষ পেরিয়ে—যাত্রা শেষে বুঝি নিশানা পেল। নক্ষত্র বুঝি নেমে এল মর্তের আবর্জনায়।

তবু পেলো না তার মনের মত পাত্রী মণিময়। পাত্রী স্বয়ং না কি অমত জানিয়েছে মণিময়ের সঙ্গে বিয়েতে। অমতের কারণটা সত্যি ভাববার মত। ভাবতে গিয়ে আয়নার দাড়ি কামাতে গিয়ে নিজের চেহারা দেখে মণিময় বুঝতে পারে সে সত্যিই বুড়িয়ে গেছে। তার বয়স হয়েছে।

সন্ধ্যে হলে চড়ুইগুলো ফিরে আসে ঘুলঘুলিতে। থেমে যায় কলরব। কতদিন ধ'রে সেই একই ধারা তাদের রকম সকম দেখেছে অমিতা! তারও জীবনে বুঝি ঘনিয়েছে সন্ধ্যা—থেমেছে কলরব। একাকী থাকতে ভালবাসে সে। কাজকর্ম যেটুকু করে অনেকটা অভ্যাসের বশে করে। কাজের মধ্যে দিয়ে সে অন্যের সঙ্গে জড়ায় কিন্তু সেটা শুধু ওপরে ওপরে। মনের গভীরে কেউ নেই, নিস্তব্ধ হয়েছে কামনার উগ্র রূপ।

ছাত্রীরা যখন বয়ফ্রেণ্ড নিয়ে বেড়াতে যায় তারই চোখের সামনে দিয়ে, একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করে সে। তবু তাদের কিছু বলতে পারে না। নিজের জীবনে যা পাইনি তাকে অন্যে পেয়েছে বলে তার অন্তর্জ্বালা যতই হোক শান্তির নীড় রচনায় ছোট চারাগাছে হিংসের সার লাগাতে চায় না সে।

কাজ আর কাজ। আর কাজ না থাকলেই একা। ঘুলঘুলিতে চড়ুই ঘুমোয়।

বিজ্ঞাপনের কোম্পানীতে আর্টিষ্ট মণিময়ের উন্নতি হয়েছিল। একাউন্ট এক্সিকিউটিভ হয়ে ভারতের নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছে। তুলিতে যা আঁকা পড়েনি, তাই সে এঁকেছে মনের ক্যানভাসে কল্পনার তুলি দিয়ে। তবু বুঝি তার প্রার্থিত বস্তুকে পাওয়া গেল না।

কাশীতে ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে বসে ভাবছিল নিজের কথা। ভাবছিল তার এই উপচীয়মান বয়সে কেউ যদি হাত ধরে বলে—থাকব তোমার পাশে পাশে—তাহলে বড় ভাল হয়। একটা অবলম্বন, একটা সঙ্গী, এর জন্য মানুষের কামনা তো স্বাভাবিক। কিন্তু তা কি কেউ বলবে। কতক্ষণ এমনি বসেছিলো জানেনা। চমকে উঠল কলরবে। সন্ধ্যায় ঘাট অনেকটা নির্জন। স্নানার্থীদের ভীড় কমে গেছে। এমন সময় হৈ হৈ করে এল কয়েকটি মেয়ে। তারা যেমন সজীব তেমনই প্রাণোচ্ছল। সঙ্গে একজন মহিলা, বয়সে ওদের চেয়েও বড়—একটু যেন স্বতন্ত্র। মনে হয় মেয়েগুলির অভিভাবিকা। মেয়ে-কটি চলল ছুটে।

জলের দিকে চেয়ে বসেছিল মণিময়। প্রায় পাশে এসে বসলেন ভদ্রমহিলা। কেউ কাউকে চেনে না। বেড়াতে এসেছেন বুঝি—জিজ্ঞাসা করে মণিময়। হ্যাঁ স্কুলের মেয়েরা এডুকেশানাল ট্যুর করতে বেরিয়েছে—আমি ওদের ক্লাসটিচার।

আরোও দুএকটা কথা হয়েছিল ওদের মধ্যে। তারপর মেয়েরা হৈ চৈ করে সমস্ত ঘাট দাপাদাপি করা শেষ করে ফিরে এল। একজন বললে, অমিতাদি, আপনি বড় চুপচাপ। চলুন নৌকা করে বেড়িয়ে আসি।

গঙ্গা বয়ে চলেছে ছলছল করে। অমিতার মনেও চিন্তার ঢেউ উঠছে।

'কাল আসব'—কথা দিল সে মেয়েদের। তারপর মণিময়ের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এল। তাকে একা চলতে হবে এ জীবনে। অমিতা না হয় চিনতে পারেনি, মণিময়ের কিন্তু চিনতে ভুল হয়নি। স্কুলে কাজ করেন শুনে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল পরে তার ছাত্রীর মুখে 'অমিতাদি' ডাক শুনে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল এই সেই মহিলা, তার বোন মেরার সহকর্মীনি। মেরা অবশ্য বিয়ে করে স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়েছে বহুকাল। সত্যিই তো এতকাল মণিময় কোন খোঁজই রাখেনি অমিতা নামে সেই মেয়েটির যাকে দেখতে ভালো নয় বলে সে বিয়ে করতে রাজী হয়নি।

মণিময় কিছু বলতে চেয়েছিল কিছু জানতে চেয়েছিল, কিন্তু তবু প্রকাশ করতে পারেনি কিছু। মনে মনে যে কথার উদয়, মনেই রাখতে হল তাকে।

আর অমিতা। সে জানলও না তারই মতো একাকী ওই মানুষটাই মণিময়—তার জীবনে একদা আসতে পারত—কিম্বা আজও বুঝি পারে। রূপ হয় অপরূপ, তবু চড়ুইর মত পারে না কলরব করতে। কথা থাকে মনে মনে।

চিত্র বিচিত্র

"শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ"

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

এমন মানুষ মাঝে মাঝে পৃথিবীতে আসেন, যিনি কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষ জাতের নন, যিনি সকল দেশের সব মানুষের আত্মীয়, যাঁর প্রতি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মানুষ শ্রদ্ধায় আনত মস্তক হয়। জার্মান দেশের সন্তান ডাক্তার অ্যালবার্ট সুইৎজার তেমনি এক মানুষ। সম্প্রতি তাঁর নব্বইতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পৃথিবীতে এমন দেশ নেই যেখানে তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপ্লুত প্রশস্তি উচ্চারিত হচ্ছে না।

বেশ কয়েক বছর আগে এই মানুষটির সম্বন্ধে বিলাতী সংবাদপত্রে পড়েছিলাম: "ইউরোপ থেকে বহুদূরে আফ্রিকার এক অখ্যাত জনপদে ডাক্তার অ্যালবার্ট সুইৎজারের কাছে খবর পৌঁছল যে এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। পুরস্কার-লব্ধ অর্থের পরিমাণ ১২ হাজার পাউণ্ড। ৭৮ বছর বয়সে ফরাসী-আফ্রিকার এক দুর্গম অঞ্চলে কুষ্ঠ রোগীদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করে ডাঃ সুইৎজার যুবজনোচিত শক্তি ও উদ্যমে তাঁর হাসপাতাল পরিচালনা করছেন। প্রায় ৪০ বছর আগে তিনি এখানে এসে কুষ্ঠ রোগীদের সেবায় জীবন কাটাবার সঙ্কল্প করেন। তদবধি তিনি বহু সহস্র রোগীর সেবা করেছেন এবং প্রায় তিন শ' কুষ্ঠরোগীর বসবাসের জন্য একটি গ্রাম স্থাপন করেছেন। নোবেল পুরস্কার লব্ধ অর্থ তিনি কিভাবে ব্যয় করবেন সে সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায়। কুষ্ঠরোগীদের জন্য আর একটি গ্রাম নির্মাণের পরিকল্পনা তিনি বহুদিন ধরেই চিন্তা করছিলেন। এবার সে আকাঙ্খা পূর্ণ হবে।"

সংবাদটি পাঠ করে শ্রদ্ধা জাগা স্বাভাবিক। আত্মীয়স্বজন ছেড়ে স্বদেশের মায়া পর্যন্ত পরিত্যাগ করে যে মানুষ সুদূর দুর্গম দেশে গিয়ে রোগীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি যে জগতের একজন নমস্য ব্যক্তি, তাতে সন্দেহ নেই। ডাঃ সুইৎজার ডাক্তারি বিদ্যায় পারদর্শী হবার আগে দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সম্বন্ধে পাশ্চাত্য লেখকরা বলেছেন যে, পৃথিবীর বিশিষ্টতম দার্শনিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর মতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাধি হচ্ছে, মানুষ, পশু, এমন কি উদ্ভিদ, এরা সকলে মিলে আত্মরক্ষার মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি ক'রে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। শতাব্দীবিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে মরণ-বাঁচনের এই সংগ্রাম দুঃস্বপ্নের মতো সকলকার বুকে চেপে বসেছে। এই দুঃস্বপ্নের কবল থেকে রক্ষা পাবার মহৌষধ হিসাবে তিনি যে তত্ত্ব প্রচার করেছেন তাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, "জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা" (Reverence for life)। তাঁর মতে, প্রত্যেক মানুষের মনে এই ধারণা থাকা উচিত যে, যাকিছু জীবন্ত যা-কিছু প্রাণময় তাদের প্রতি মানুষের সীমাহীন কর্তব্য আছে এবং তার স্বজাতীয় অন্য মানুষের প্রাণধারণের প্রচেষ্টায় তার সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত। জীবনকে লালন করা, তার

সম্প্রদায়কে তাকে উৎসাহিত করার মধ্যে মহত্ত্ব আছে ; তাকে বাধা দেওয়া বা বিনাশ করার চেষ্টার মধ্যে আছে অপার নীচতা।

তাঁর দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুইৎজার বলেছেন—"জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা" মানুষকে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই নীতিকে মানুষ যদি স্বীকার করে তাহলে যে কোন অবস্থাতেই মানুষ তার আশে পাশে যে জীবন প্রবাহ বয়ে চলেছে সে সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় অবহিত থাকবে এবং প্রয়োজন হলেই সে তার প্রতিবেশীর সাহায্যার্থে এগিয়ে যাবে, এই নীতিকে মেনে চললে, পণ্ডিত ব্যক্তি শুধু তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যেই বেঁচে থাকবেন না, শিল্পী শুধু তাঁর শিল্প নৈপুণ্যের জন্যে সম্মানলাভ করবেন না, ব্যবসায়ী শুধু তাঁর ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্যেই প্রতিষ্ঠা পাবেন না। তাঁদের প্রতি মানুষের আরও দাবী থাকবে। মানুষের সেবায় তাঁদের জীবনের অন্ততঃ কিছু অংশও নিযুক্ত হওয়া চাই, তবেই তাঁদের পাণ্ডিত্য, শিল্পনৈপুণ্য আর ব্যবসায়িক সাফল্য চরম চরিতার্থতা লাভ করবে।"

যুদ্ধজর্জর, ক্ষমতামুগ্ধ এবং ভোগমত্ত পাশ্চাত্য জগত যে তাঁর এই প্রাণধর্মী মতবাদের কথা কান পেতে শুনেছে তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে, জগতের যাঁরা হিতৈষী, যাঁরা দার্শনিক বা শিক্ষা বিস্তারক তাঁরা প্রেরণা পেয়েছেন তাঁর কথা শুনে, তাঁরা কামনা করেছেন, এই বাণীর যিনি উদ্গাতা তাঁর জীবনের আশা হয়ত একদিন সফল হবে, কলিযুগ শেষ হয়ে জগতের বুকে নামবে "শান্তিযুগ"।

১৯৫০ সালে ন্যাশনাল আর্টস নামক এক ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আহূত এক কনটিনেন্ট ব্যাপী নির্বাচনে ১৭টি দেশের লেখক, শিল্পী এবং সঙ্গীতজ্ঞ সম্প্রদায় "শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ" হিসাবে সুইৎজারকে মনোনীত করে ঘোষণা করেন যে, তাঁর মতবাদকে মেনে নিলে জগতের সকল সমস্যার সমাধান হবে।

ছেলেবেলা থেকেই সুইৎজার সকল জীবের প্রতি অসীম মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। পাড়ার গরীব ছেলেরা জুতো কিনতে পারতো না, তাই তিনি ইস্কুলে যাবার সময় নতুন জুতো ব্যবহার করতে লজ্জাবোধ করতেন। মাছ ধরায় তাঁর চিরকালের বিরাগ। মাছের মুখে বঁড়শী বিঁধিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। প্রতি রাত্রে শোবার আগে প্রার্থনা করবার সময় মনে মনে বলতেন, "হে স্বর্গের পিতা! যাদের বুকে প্রাণ স্পন্দন রয়েছে তাদের সকলকে তুমি কৃপা কর, আশীর্বাদ কর।"

এক জার্মান ধর্মপ্রচারকের পুত্ররূপে অল্পবয়সেই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাইবেল পাঠ করেছিলেন এবং ১৯০৬ সালে বাইবেলের বিচার সম্বন্ধে এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, The quest of the historical Jesus.

লেখাপড়া শেষ করে তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় মনোনিবেশ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সঙ্গীত জগতে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দান করেন। ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্গ্যান বাদকরূপে তাঁর খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু জীবনের মানবক্ষেত্রে খ্যাতির প্রসারে তাঁর চিত্ত তৃপ্ত হল না। মানুষের সেবায় জীবন যদি সার্থক না হ'ল তা হলে বৃথাই প্রাণধারণ। ত্রিশ বছর বয়সে জীবনের সবচেয়ে বড় সংকল্প গ্রহণ করলেন ; চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে, নিয়োজিত করতে হবে নিজেকে আর্তের সেবায়। সাত বছরের সাধনায় ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি উপাধি লাভ করলেন। তারপর নববিবাহিতা পত্নী, ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শিনী মহিলা অ্যামি হেলমকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন সুদূর করাসী আফ্রিকায়। ব্যাধির প্রকোপে যে স্থানের মানুষ সবচেয়ে বেশী আর্ত সেই স্থানকেই

তিনি নিজের কর্মক্ষেত্ররূপে নির্বাচিত করলেন সেখানকার হাজার অসুবিধা আর ভীষণ অস্বাস্থ্যকর জলহাওয়া সত্ত্বেও। ১৯১৩ সাল থেকে সস্ত্রীক তিনি সেখানেই বসবাস করছেন।

কাজের ফাঁকে তাঁর চিন্তাশীল মন বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় তাঁর বহু রচনার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ হল The Philosophy of Civilization. এই গ্রন্থে তিনি তাঁর "জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা' শীর্ষক মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতবাদের মূল কথা হল এই :

"চতুর্দিকের এই ক্রমবর্ধমান গণপ্রতিষ্ঠান, গণপরিকল্পনা এবং গণমতবাদের কবল থেকে আধুনিক মানুষকে মুক্ত হতে হবে। নিজের মন এবং নিজের চিন্তা দিয়ে তাকে নিজেকে বাঁচাই করতে হবে, কোনটা ভাল এবং কোনটা মন্দ তার বিচার করতে হবে এবং তার বিশ্বাসে, আচরণে আর সমস্ত কর্মে এই কথা প্রমাণিত হওয়া চাই যে, আধুনিক মানুষ তার প্রতিবেশীর জীবনাকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এবং সাহায্যোদ্যত। এই ভাব মনে যদি জাগ্রত না হয় তাহলে পাশ্চাত্য সভ্যতার লয় অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্যসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করবার সময়, সমাজ ব্যবস্থাপনা যাতে নিখুঁত হয় শুধু সেই চিন্তা করলেই চলবে না, সেই সমাজে যারা বাস করবে তারা প্রত্যেকে যাতে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সে বিষয়ে সদা সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে। মানুষের মনের মধ্যেই নিহিত আছে সমাজের তথা জগতের কল্যাণ।"

আর্তবন্ধু মানবপ্রেমিক ডঃ অ্যালবার্ট স্বাইৎজার জগতকে যে বাণী শুনিয়েছেন তা স্মরণ করলে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও মনের মধ্যে একটি মালিন্যমুক্ত প্রশান্তি অনুভব করা যায় তাতে আর সংশয় নেই।

• • • •

অতলান্তিক মহাসাগরের কূলে বহু পুরাতন এক লাইট হাউস,—কেউ সেখানে থাকে না, একেবারেই পরিত্যক্ত।

কাছাকাছি থাকে জেলে ম্যালকম্ তার ছোট পরিবার নিয়ে। একটি মেয়ে বয়স বছর বারো আর একটি ছেলে বয়স বছর দশ।

ওরা মাঝে মাঝে ঘুরানো সিঁড়ি দিয়ে লাইট হাউসের চূড়ায় ওঠে। ঘুরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে।

এক ভীষণ দুর্যোগের রাত্রে মেয়েটি বললে তার ভাইকে—দেখ ফ্রেড্, বাবা সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে, এখনও ফেরেনি। হয়ত দিকভুল করেছে। আর ঘুরে একটা বিপন্ন জাহাজের বংশীধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এ সময় আলো দেখালে ভাল হয়।

ভাই ছোটে উঠল গিয়ে লাইট হাউসের চূড়ায়। শুকনো পাতা আর কেরোসিন দিয়ে আগুন জ্বালল। সেই আগুনের আলো ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রে।

বিপন্ন জাহাজ বাঁচল আর ম্যালকমও ফিরে এল। তারপর থেকে সত্যই লাইট হাউসটিকে চালু করা হল।

বীরবলের কৌতুক

বরুচি

কঠিন এবং অদ্ভুত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে বীরবলের জুড়ি ছিল না।

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারতেন তিনি। তাঁর সেই ক্ষমতাই ছিল সব চেয়ে বিস্ময়কর। এরকম মুখে মুখে জবাব আর কেউ দিতে পারতো না।

একদিন বাদশা আকবর সভায় এসে বললেন—আজ আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করব। সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর চাই।

সভাসদরা উৎকর্ণ হল। আকবর প্রশ্ন করলেন :

১। সবচেয়ে দামী ফুল কোন্‌টি।

২। কার দাঁত সব চেয়ে ভাল।

৩। সবচেয়ে বড় গুণ কি।

সভাসদরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল। তখনো পর্যন্ত বীরবল সভায় আসেন নি। পরামর্শের শেষে তাদের মুখপাত্র উঠে দাঁড়াল।

প্রশ্নের জবাব তৈরী, জনাব।

ভাল কথা। উত্তর দাও।

সভাসদ উত্তর দিল :

১। গোলাপ হচ্ছে সব চেয়ে দামী ফুল।

২। হাতির দাঁত সব চেয়ে ভাল।

৩। বিদ্যাই সব চেয়ে বড় গুণ।

সভাসদ্‌দের বিশ্বাস ছিল, সম্রাটের প্রশ্ন তিনটির এর চেয়ে ভাল উত্তর আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু বাদশার উত্তরগুলি মনোমত হল না। তিনি তাদের সরাসরি নাকচ করে দিলেন।

এমন সময় বীরবল এলেন। সম্রাট বললেন—এই যে বীরবল। তুমি বলতে পারবে?

আজ্ঞে না জনাব।

তার মানে? কী বলতে হবে, না জেনেই বলে দিলে, 'আজ্ঞে না জনাব।'

আজ্ঞে তা তো বলিনি।

তবে?

বীরবল বললেন—আপনি যেমন কি বলতে হবে, তা না বলেই বললেন আমি বলতে পারবো কি না, আমিও তেমনি বললাম, আজ্ঞে না জনাব, অর্থাৎ প্রশ্ন না শুনে আজ্ঞে না জনাব!

ওঃ তোমার কথার জুবড়িতে আমার মাথা ঘরে গেল।

চুপ করলাম জাঁহাপনা।

চুপ করলে চলবে না। প্রশ্নের উত্তর দাও।

বীরবল বললেন—কী প্রশ্ন সম্রাট।

আকবর বললেন—এদের যে তিনটে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমাকেও সেই তিনটে প্রশ্ন করছি। এদের উত্তর আমার মনোমত হয়নি। দেখি তুমি পারো কি না।

বীরবল বললেন—বলুন, আপনার প্রশ্ন।

আকবর প্রশ্ন তিনটির পুনরাবৃত্তি করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বীরবল জবাব দিলেন—শিমুল তুলা হচ্ছে সবচেয়ে দামী তুলা, কারণ তা দিয়ে মানুষের কাপড় তৈরী হয় এবং আরও নানা ব্যবহার্য জিনিষ তা দিয়ে উৎপন্ন হয়। তারপর, লাঙলের দাঁতই সবচেয়ে ভাল। কারণ তা জমি কর্ষণ করে, তার ফলে আমরা খেতে পাই। সব শেষের প্রশ্নের উত্তরে বলব, সাহস-ই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ। কারণ দেখা গেছে, ভগবান সাহসী মানুষকেই সবচেয়ে বেশী আশীর্বাদ দিয়েছেন।

ঘনঘন মাথা নেড়ে সম্রাট বললেন—হ্যাঁ, এতক্ষণে উত্তরের মতো উত্তর পেলাম বটে।

• • • •

একবার বারানসী থেকে এক মস্ত পণ্ডিত আকবরের সভায় এসেছিলেন। তাঁরও ছিল যত সব কূটকচালে প্রশ্ন। তিনি নাকি ভারতবর্ষের বহু হিন্দু মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞকে প্রশ্নের ধাঁধাঁয় কাবু করেছেন।

সভায় এক আসরে পণ্ডিতের প্রশ্নযুদ্ধের আয়োজন করা হল।

বজ্রনির্ঘোষের মতো হুঙ্কার দিয়ে পণ্ডিত প্রশ্ন করলেন—যৌবনকালে মানুষের কি করা উচিৎ।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর চাই।

একজন সভাসদ বলে উঠল—তার সৎকাজ করা উচিৎ।

মাথা নেড়ে পণ্ডিত বলে উঠলেন—হল না। সৎকাজ মানুষ সব বয়সেই করবে, শুধু যৌবনে নয়।

বীরবল উঠে দাঁড়ালেন।

পণ্ডিত বললেন—আপনি বলুন।

বীরবল জবাব দিলেন—পণ্ডিত, আমি মনে করি, বৃদ্ধ বয়সে যাতে সুখ-শান্তি লাভ করা যায়, যৌবনকালে মানুষের সেই বিষয়ে অবহিত হয়ে সেই মত কাজ করা উচিৎ।

বিরাট ব্যাপক উত্তর। মাথা নেড়ে পণ্ডিত বললেন—মানতে হল। আচ্ছা, বলুন।

তার পর মুখে মুখে প্রশ্ন এবং তার উত্তর শোনা যেতে লাগল!

প্রশ্ন: কোন্ বস্তু পরে আসে আগে যায়?

উত্তর: মানুষের দাঁত। জন্মাবার পর আসে, মৃত্যুর আগে যায়।

প্রশ্ন: কোন্ জিনিষকে ধ্বংস করা যায় না?

উত্তর: দুনাম।

প্রশ্ন: সব চেয়ে ভাল পেশা কি?

উত্তর: কৃষিকর্ম। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

ব্যস। পণ্ডিত প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বীরবলকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—সাবাস বীরবল শেঠ! আপনি আমার দর্পচূর্ণ করলেন আজ।

বীরবল বললেন—মানুষের দর্প তো চূর্ণ হবেই পণ্ডিতজী! আপনি তো জানেনই ভগবান নিজের দর্প নিজে চূর্ণ করেছিলেন।

হিন্দু পুরাণের গল্পটি সম্রাটের জানা ছিল। তিনি বলে উঠলেন—সাবাস!

• • • •

একদিন সম্রাট বীরবলকে প্রশ্ন করলেন—বীরবল, এ পৃথিবীতে সুখী কে?

সঙ্গে সঙ্গে বীরবল উত্তর দিলেন—কেউ নয়, জাঁহাপনা।

তার মানে?

তার মানে, এ পৃথিবীতে কোন জীবন্ত মানুষই পরিপূর্ণ সুখী নয়। মানুষ সুখী হয় মৃত্যুর পরে।

বুঝিয়ে বল।

বীরবল বললেন—খুব সোজা হিসেব জনাব। মানুষ আজ সুখী, কাল কোন বিপদে পড়ে দুঃখী। আজ তার অতুল বৈভব কিন্তু তবুও তার মনে সুখ নেই। এ বৈভব যদি যায় তাহলে কি হবে, এই চিন্তায় তার চিত্ত ভারাক্রান্ত। এই যে মানুষের জীবন, এ জীবন দিয়ে সুখ ভোগ করা যায় না। তাই আমি বলছিলাম, সুখ আসে মৃত্যুর পরে, যখন সকল দুঃখের অবসান হয়, পৃথিবীর সব যন্ত্রণা শেষ হয়।

• • • •

আর একদিন মজলিশে বসে সম্রাট সভাসদদের প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, এখন এই মুহূর্তে তোমাদের প্রত্যেকের মনের কথা কি, তা কি কেউ বলতে পারো?

প্রশ্ন শুনে সভাসদরা তো ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক। কারুর মনে খুব পাবার আশা, কারুর মনে উপরি রোজগারের প্রত্যাশা, কারুর মনে বা অবৈধ কুর্তি করবার বাসনা। এই সব ফাঁস হয়ে যাবে নাকি?

সবাই নীরব। বাদশা বীরবলের দিকে তাকালেন—বীরবল তুমি বলতে পারো?

পারি বৈকি সম্রাট! আমি জেনে ফেলেছি ইতিমধ্যেই।

বল কি! আচ্ছা বলতো শুনি?

বীরবল বললেন—আলাদা আলাদা হয়ে বলব সম্রাট, না, সকলকার মনের কথা এক করে সারাংশে বলব?

এক করে সারাংশে বল! তাতেই বোঝা যাবে।

বীরবল বারেক সকলকার মুখের পানে তাকালেন। মনে মনে হাসলেন। অনেকেরই মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।

ক্ষণেক নীরব থেকে ঈষৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে বীরবল বললেন—এখন এঁদের প্রত্যেকের মনে একটি কথাই গুঞ্জরন করছে।

কী সে কথা?

বীরবল বললেন—সম্রাটের সাম্রাজ্য, সম্রাটের সুখ, সম্রাটের যশগৌরব যতদিন সূর্য চন্দ্র থাকবে ততদিন যেন অক্ষুণ্ণ না হয়, সম্রাটের স্বাস্থ্য যেন অটুট থাকে, সম্রাট যেন শতায়ু হন—এঁদের প্রত্যেকের মনের কথা এই। বিশ্বাস না হয়, এঁদের প্রত্যেককে জিগেস করে দেখুন সম্রাট।

আকবরের মুখ দিয়ে নির্গত হল—জবর উত্তর। জিগেস করবার প্রয়োজন নেই।

• • • •

আকবর প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, বীরবল, মানুষের মধ্যে মৃত্যুর পর কারা স্বর্গে যায়, আর কারাই বা নরকে যায়, বলতে পারো?

বীরবল বললেন—পারি বৈকি সম্রাট। এ তো আমার জানাই আছে।

বলতো শুনি।

বীরবল বললেন—মৃত্যুর পর যে মানুষ মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র হয়, মানুষ যার যশ গায়, জানবেন, সে মানুষ নিশ্চয়ই স্বর্গে গেছে, আর মৃত্যুর পরে যে মানুষকে মানুষ আর স্মরণ করেনা বা তার সম্বন্ধে ভাল কথা বলে না, জানবেন সে নরকে গেছে। এর আর ভুল নেই সম্রাট।

তাতো বটেই। তোমার যুক্তির ভুল ধরবে কে বল? হেসে বললেন সম্রাট।

• • • •

ইটালীর নেপল্‌স্ সহরে এক মেলায় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ক্যারুসো বেড়াতে গেছেন।

মেলার এক পাশে এক বৃদ্ধ গায়ক প্রাণপণে গান জুড়েছে দুটো পয়সা পাবার জন্যে, কিন্তু গান তার জমছে না। শ্রোতা কেউ আসছে না।

একটু দূরে আর একজন সুবেশ তরুণ গায়ক বেহালা হাতে হাসি মুখে গান ধরেছে,—লোকের ভিড় সেখানেই বেশী।

বৃদ্ধের করুণ মুখ দেখে ক্যারুসোর মনে দুঃখ হোল। তিনি ভাবলেন: এখানে ত লোকে আমাকে চেনে না,—দেখা যাক, বৃদ্ধের একটু সাহায্য করা যায় কিনা।

ক্যারুসো গান ধরলেন বৃদ্ধের পাশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মেলার লোকজন যেন চমকে গেল।

এ কী কণ্ঠস্বর! ছুটে এল তারা বৃদ্ধের পাশে। শেষে এমন হোল, সব কিছু ফেলে লোকে ছুটে এল সেখানে। সেই তরুণ গায়কটিও।

টাকা পয়সা পড়তে লাগল বৃদ্ধের টুপিতে। টুপি উথলে উঠল।

বৃদ্ধ আনন্দে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে দেখে কখন ক্যারুসো চলে গেছেন! তাঁর পরিচয় কেউ সেখানে পায় নি।

বৃত্ত

সরোজ রায়

রেডিওগ্রামে রেকর্ড বাজছে। ইংরেজী বাজনার তালে তালে চিত্রিত মেঝের উপর নেচে চলেছে কেকা। রোজই নাচে। রাস্তায় একটা ডবল-ডেকার বাস বিশ্রী শব্দ ক'রে থামল। আবার চ'লতে শুরু ক'রল। সে-শব্দে নাচের কোন ব্যাঘাত ঘটল না। কেকার বিয়ে হ'য়েছে আঠারো বছর বয়সে। ঘড়িতে তিনটে চল্লিশ। ইংরেজী বাজনা বিচিত্র সুরের জাল রচনা ক'রে বেজে চ'লেছে। বাইরের আবহাওয়াটাও বেশ সুরেলা।

কেকার পায়ে অদ্ভুত গতি এসেছে। সে নাচছে। সে নাচ কলেজ জীবনে নেচেছে। সে নাচ বিয়ের পর সন্তকাল পর্যন্তও নেচেছে। কেকা নাচেই বিভোর। আজ কেন জানি নাচের মাদকতা তাকে বেশি মাত্রায় পেয়ে বসেছে। তার স্বামী অশোক, অধ্যাপক। কেকার দোসর। নাচ গানে তারও অরুচি নেই। উজ্জ্বল, উদ্দাম তার গতি। তবে ইদানীং কিছুটা ঢিলে হ'য়েছে। ন'টার সময় স্বামীকে বাইরে দাইরে কাজ শেষ ক'রেছে কেকা। অশোককে ব'লতে ভুল করেনি: ফেরবার পথে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট থেকে একটা ঘম দেওয়া পুতুল কিনে এনো। এটা তার নিত্যকার ফাইফরমাসের মধ্যে না প'ড়লেও সপ্তাহ ফাঁক যায় না। ঘর সাজানো কেকার 'হবি'। বিশেষ ক'রে পুতুল দিয়ে। নাচ নাকি আনন্দের ইন্ধন যোগায়। অঙ্গসৌষ্ঠব বাড়ায়। তাই সে নাচে। কখনও একা। কখনও অশোকের সঙ্গে। মাঝে মাঝে দীপক এসে বড্ড জ্বালাতন ক'রত। দীপক চিরদিনের বেপরোয়া গোছের। কী ছেলেদের কাছে, কী মেয়েদের কাছে।

অশোক কলেজে বেরিয়ে যাবার পর প্রায় দেড়মাস পর গৃহচিকিৎসক দীনেশ লাহিড়ী এসেছিল। অনেকক্ষণ কথোপকথন হ'য়েছে। কেকার শরীরটা নাকি ভাল যাচ্ছে না। তবু নাচা চাই-ই। 'ভাঙা ঘটি বাটি সারাবে' তার কানে ঢুকল না। সে নেচেই চ'লল। নাচের সময় ওকে যা সুন্দর দেখায়—তা আর বলার কথা নয়। দেহের ভাঁজে ভাঁজে সুর ও ছন্দের সৌকুমার্য যখন খেলা করে তখন ওকে পাশ্চাত্যদেশীয় নৃত্যপটিয়সী ব'লে ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। দীনেশ লাহিড়ী চলে যাবার পর কেকা অনেকক্ষণ চুপচাপ চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে কি যেন ভেবেছিল। তারপর হারমনিয়ম নিয়ে বসেছিল। গানের পর গান গেয়ে চ'লেছিল। একটা পাগলকে ঘিরে রাস্তায় ভিড় জমেছে। ছেলে থেকে বুড়ো সবাই মজা দেখছে। পাশের ঘরের ভাড়াটের ছেলেটা কেঁদে উঠল। অন্যদিন হ'লে কেকা এসব লক্ষ ক'রত। আজ তার কোনদিকে খেয়াল নেই। সে নাচছে। নাচই যে তার পরমায়ু।

দীপক ঘরে ঢুকল। দিল্লী থেকে—এক বছর পর আজই বাড়ি ফিরেছে সে। সে দেখল, লাবণ্যময়ী কেকা ঠিক আগের মতই অপরূপ ভঙ্গিমায় নেচে চ'লেছে। চেয়ার পর্যন্ত দীপক এগিয়েছে। আর একটু গেলেই কেকার হাত ধ'রে নাচবার সুযোগ পাবে সে। কিন্তু তার আগেই কেকার নিষেধ এগিয়ে এল। মুখে মৃদু হাসি এনে ইসারা ক'রল চেয়ারে বসতে। দীপক সুর বদলে বলল: কতদিন পরে এলাম বলতো! আর আজ তোমার সঙ্গে নাচতে পাব না? কেকার ঘাড় নড়ে উঠল। দীপকের আশা থেমে গেল। চিন্তা নেমে এল। কী হ'ল কেকার! এক বছর আগেও রেওয়ার আমার সঙ্গে নেচেছে। ব'লেছে: অশোককে বিয়ে ক'রেছি এইমাত্র। আমার আনন্দকে বাধা দেবার চেষ্টা ক'রলে যাচ্ছেতাই একটা কিছু ক'রে ব'সব। আমি বলেছি: তুমি সন্তান-সন্ততির আশা

করনা ? উত্তর দিয়েছে : ওসব না হওয়াই ভাল। লাইফটা একেবারে 'হেল্' হ'য়ে যাবে।···তবে কি কেকার সঙ্গে অশোকের কিছু মিটিমিটি হয়েছে! অশোক কি জানতে পেরেছে, সে যখন কলেজ যেত সেই অবসরে আমি কেকার সঙ্গে নাচে যোগ দিতাম ?

দীপক কেকার দিকে তাকিয়ে দেখল সে থামছে। তবু থামছে না। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘরটার আশপাশতলা লক্ষ ক'রল দীপক। সবই ঠিক সাজানো রয়েছে। খাট, আলমারী, আলনা, টেবিলের উপর নানান্ রকমের পুতুল—কিছু এলোমেলো নেই।

দুর্বার গতি এসেছে কেকার পায়ে। যদিও তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে তবু বোধ হয় থামবে না—তাই তো মনে হ'চ্ছে। দীপক রেডিওগ্রামের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নতুন ক'রে দেখতে থাকল এক পরিচিতাকে।···গান গেয়ে গেয়ে যখন আর মন ভরেনি তখন নাচতে শুরু ক'রেছিল কেকা। সাড়ে তিনটে বাজতে কিছু দেরি ছিল। দীপক আরও কতকগুলো রেকর্ড চাপিয়ে দিল। অধিকের জন্যে পায়ের গতি থামিয়েছিল কেকা। আবার বাড়াল। দীপক অনুরোধ ক'রল তাকে নাচতে দেবার জন্যে। কেকার বাঁকা হাসিতে সে-অনুরোধ শুকিয়ে গেল। অনন্যোপায় দীপক আবার চেয়ার গ্রহণ ক'রল। না পাওয়ার সুরে বিস্ময় ফুটে উঠল তার গলায় : তুমিই কি সেই কেকা মৈত্র ? জবাব এল না। তাড়াটের ছেলেটা এখনও কাঁদছে মাই দুধের জন্যে। ইংরেজী বাজনার তালে তালে কেকার শরীরে ঢেউ উঠছে, নামছে ; ভাঙছে।

: মনে পড়ে কেকা, তুমি কলেজ-জীবনে আমাকে কি রকম ভালবাসতে ? পার্কে, রেষ্টুরেন্টে, সিনেমায় যখন যেখানে ইচ্ছে, দুজনে গিয়েছি। এই নিয়ে তোমাদের পাড়ায় চিচি প'ড়ে গেছল। তোমার মা বাবা পর্যন্ত জানলেন। অনেকে ব'লল, তুমি নষ্ট হ'য়ে গেছ। এত সহ্য ক'রেও তুমি কিন্তু আমার সঙ্গ ত্যাগ করোনি।

কেকা নাচছে। থামছে। তবুও নাচছে।

: তারপর একদিন নীলরতন সেনের বাগানবাড়িতে এর আংশিক যবনিকা টানা হ'ল। তোমার সঙ্গে অশোকের পরিচয় করিয়ে দিলাম। অশোক আমার 'ইন্‌টিমেট্ ফ্রেণ্ড'। ওকে দেখে তোমার ভাল লেগেছে বুঝলাম। তোমাকে দেখে অশোকেরও ভাল লেগেছে জানলাম। তোমরা দুজনেই প্রাণচঞ্চল। সেখানে যেন আমাকে বেমানান মনে হ'ল—নিজেরপক্ষে প্রেমিকের দিক থেকে। কেমন ক'রে জানিনা একটু একটু ক'রে আমি তোমার কাছ থেকে সরে এলাম। যথাসময়ে তোমাদের বিয়ে হ'ল—যথানিয়মে নয়। বিয়ের ভোজ সভায় কিন্তু ঠিক গিয়েছিলাম। আর গিয়েছিলাম ব'লেই অবাক হ'য়েছিলাম সেদিন। ভোজসভার নিভৃতকোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে তুমি আমাকে প্রাণের কথা শোনালে ; অর্থাৎ আবার তোমার সঙ্গে নাচতে পাব, বেড়াতে পাব। আবার অবাক হলাম। আজ ?

বাইরে পায়ের শব্দে দীপক থেমে গেল। তার কথা কেকা বোধহয় বিন্দুমাত্র শোনেনি। ঘড়িতে চারটে পনেরো। অশোক ঘরে ঢুকল।

: দীপক ! তুই কখন এলি ?

: অনেকক্ষণ। দীপক কেকার দিকে তাকিয়ে ব'লল।

দু' বন্ধুর উপস্থিতিতে নাচ থামছে না দেখে অশোক কিছু ব'লতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কেকা এগিয়ে এসে তার হাত ধ'রল। 'ড্যান্সিং স্পার্ট' নিয়ে গেল।

একটা রেকর্ডে আস্তে আস্তে বাজনা বাজছিল। সেটা শেষ হ'য়ে পরের রেকর্ডটার জোর বাজনা বাজতে শুরু ক'রল। আর সঙ্গে সঙ্গে কেকার পায়ের গতিও বাড়ল। অশোকের হাত ধ'রে এক পাক ঘুরিয়ে দিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।···অশোক নিশ্চল। কেকা চলমান। সে নাচছে। কোন হেলদোল্ নেই। অশোক ভাবতে থাকে। এমন তো কোনদিন হয়নি।···দেশের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর এই একটা বছর কেকা যেন কেমন হয়ে গেছে। সে যেন আরও আনন্দের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চেয়েছে। নাচে, গানে, উল্লাসে। এর একমাত্র কারণ বোধ হয়—ছেলেপুলে না হওয়ার জন্যে প্রতিবেশীদের আঁটকুড়ি অপবাদ। সে-অপবাদ কেকা মুছে দিতে চায় আনন্দের মধ্যে থেকে। কেকা চিরকালটাই ব'লে আসছে: ওসব ছেলেপুলের ঝিক্কি আমার সহ্য হবে না। আজ এত বাড়াবাড়ি কেন। কি হ'য়েছে ওর? ঠিক সজ্ঞানে আছে তো! দীপকের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল অশোক। এবার, সে যেন কিছুই চিন্তা ক'রছিল না—এই ভাব নিয়ে দীপকের পাশের চেয়ারে এসে বসল।

: তোর মনে পড়ে অশোক, কলেজ থেকে যখনতখন কেকা তোর সঙ্গে শহরে চক্কর দিতে বেরোত! এক একদিন অনেক রাত পর্যন্ত তোর ঘরে কাটাত। আমি একদিন বলেছিলাম - এতটা কি ভাল হচ্ছে কেকা! তোমার বাবা জানতে পারলে আর কি বাড়িতে ঠাঁই দেবেন? তখন কেকা হেসে বলেছিল—

কূল মরিযাদ　　কপাট উদ্ঘাটনুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ　　সিন্ধু সঙ্কে পঙারনু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥

ভাখ্, আজও ওকে সেইরকম উচ্ছল মনে হ'চ্ছে। মনে হ'চ্ছে কেকা তোর আমার থেকে স্বতন্ত্র।

অশোক গম্ভীর হ'য়ে গেল। দীপক তা লক্ষ ক'রল। কেকা নাচছে। থামছে। থামছে না। ওকে আজ নাচে পেয়েছে। নাচতে নাচতেই আগের মত এগিয়ে এল অশোকের কাছে। হাত বাড়াল। দীপক ঘর ছেড়ে চলে গেল। আবার আসবে কিনা বলে গেল না। অশোক উঠে দাঁড়াল। হাত ধরল। নাচবার জন্যে নয়, যেন দম দেওয়া পুতুলটাকে থামিয়ে দেবার জন্যে। কেকাকে থামিয়ে দিয়েছে অশোক। আর সে নাচছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে হাসছে। মৃদু মৃদু। হাসতে হাসতেই অশোকের বুকে মাথা লুকালো কেকা। তার বুকের দ্রুত স্পন্দন অনুভব ক'রল অশোক।

: তোমার আজ কী হ'য়েছে বলতো? দীপক এতদিন পর এল, তার সঙ্গে কথা কইলে না। আমি কলেজ থেকে এলাম, চা ক'রে দেবার নাম নেই!

ঘর্মাক্ত দেহটা অশোকের দেহ থেকে সরিয়ে নিয়ে কেকা ব'লল: পেলিল কম্পাসটা এনে দাও।

তার কথামত অশোক কাজ ক'রল। কেকা টেবিলে-রাখা কাগজের উপর কম্পাসটা সামান্যই ঘুরিয়ে ধ'রল।

: কি হ'ল বলতো?

: ওটা তো একটা বৃত্তচাপ। অশোক বিস্ময়ের সঙ্গে উত্তর তুলে ধ'রল।

: ডঃ লাহিড়ী এসেছিলেন। তাঁর কথামত বৃত্তচাপ বৃত্তে রূপ নেবে।

কেকার বুকে মাতৃত্বের আনন্দ। আর অশোকের বুকে কেকার-আনন্দ শতধিয়ে শতধিয়ে উঠছে।

আপসহীন সংগ্রামের প্রতীক

উইন্‌স্টন চার্চিল

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সকাল থেকেই ক্লেমেন্‌টাইনের সঙ্গে কফিনই করছেন। আজ মনটা খুব হালকা আর খুশী। স্ত্রী শেষ পর্যন্ত বললেন, বুড়ো বয়সে রঙ্গ রাখো। পার্লামেন্ট থেকে সোজা বাড়ি ফিরো। অয়েষ্টার আনিয়ে রেখেছি। রান্না করব। ডিনার আজ বাড়িতেই।

ক্লেমি-কে আর একবার আদর করে, হাতে লাঠি আর মুখে সেই চিরন্তন চুরোট নিয়ে উইনস্টন চার্চিল পার্লামেন্টের সভায় গিয়ে বসলেন। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল মনের ভঙ্গী, মুখের কোমল আভা, বিপক্ষ দলের মুখপাত্ররূপে যে গর্জন শুরু করলেন তার দাপটে কাঁপতে লাগল পার্লামেন্টের ঘর, কাঁপতে লাগলেন প্রধান মন্ত্রী! চোখা চোখা ইংরাজী শব্দের অতুলনীয় প্রয়োগে চমৎকৃত হল দল নির্বিশেষে সকল পক্ষ। একটিও অশালীন শব্দ নেই তাঁর বক্তৃতায়, কিন্তু তার তীব্র শ্লেষ আর ব্যঙ্গ বোধ করি কোন কটু গালাগালের চেয়েই কম নয়। সেই আশ্চর্য বাগ্মিতা পার্লামেন্টঘরে যেন প্রতিধ্বনি তুলেছে বিগত দিনের বাগ্মীদের ভাষণ—পীল, পিট, গ্ল্যাডস্টোন, বার্ক, ডিসরেলি। তাঁদের বিদেহী আত্মা যেন পার্লামেন্টঘরে এসে শুনছে সেই ভাষণ।

তাঁদের থেকেও বুঝি এক ধাপ এগিয়ে গেছেন উইন্‌স্টন। না। আপস নেই তাঁর অভিধানে। কোন অবস্থাতে, বিশেষ করে অবস্থা যখন কোনঠাসা, তখনও আপস নেই। হেস্তনেস্ত চাই। এস্পার ওস্পার। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। জার্মান ব্লিৎসক্রিগের তলায় গুঁড়িয়ে সারা ইংলণ্ড যখন কাঁপছে, যখন দেশবিদেশের বহু বিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে, এমন কি শত্রুপক্ষের কাছ থেকেও সন্ধির প্রস্তাব আসছে, তখনও উইনস্টন চার্চিল বলছেন, না, আপস নয়, সন্ধি নয়, আমরা লড়ব, আমরণ লড়ব, পথে ঘাটে লড়ব, পাহাড়ে পর্বতে লড়ব, এ লড়াই থামবে না।

তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তির শেষে যে কথাটি যোগ করেছিলেন তা বিশেষ কোথাও প্রকাশ পায়নি। বলেছিলেন, হাতিয়ার ফুরিয়ে যাবে? কুছ পরোয়া নেই। বীয়ারের বোতল তো হাতের কাছে থাকবে। তাই দিয়ে শত্রুকে আঘাত করব। প্রাণ থাকতে লড়াই থামবে না।

এই মানুষ উইনস্টন চার্চিল। প্রাণ থাকতে লড়াই থামান নি। জীবনের শেষ ন'দিন মৃত্যুর সঙ্গে যে লড়াই করলেন, তাতে মৃত্যুর দেবতাও বোধ করি আশ্চর্য হয়েছেন। কী অপরিমেয় প্রাণশক্তি। কী তেজ! কী দম্ভ! কী আত্মপ্রত্যয়!

আপস নেই। মেকি কথা বলতেও জানতেন না কোনদিন। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপে ইংরাজ নেতারা ভারতবর্ষের সঙ্গে কিছু আপস করতে মনস্থ করেছেন। হুঙ্কার দিলেন চার্চিল, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে লাটে তুলে দেবার জন্যে যে বৈঠক হবে তাতে সভাপতিত্ব করতে আমি রাজী নই। ভারতবর্ষের অর্ধনগ্ন রাজদ্রোহী ফকিরের সঙ্গে এক টেবিলে বসে কোন আলোচনা করতেও আমি প্রস্তুত নই।"

সাফ সাফ কথা! চিরকাল এই ছিল তাঁর স্বভাব। সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড যখন রাজ্যত্যাগ করলেন, তখন বলডুইনের মন্ত্রীসভায় ছিলেন চার্চিল, কিন্তু রাজার প্রতি বলডুইনের সেই নির্মম বিরুদ্ধাচরণ তিনি সমর্থন করেন নি। বরং অষ্টম এডওয়ার্ডকেই সাহায্য করেছেন, সমর্থন করেছেন। "এক বুড়ো বিদূষকের জন্যে দেশের রাজা চললেন রাজা ছেড়ে বনবাসে"—চার্চিলের সেই বিখ্যাত উক্তি সে সময়ে বহুজনের মুখে মুখে ফিরেছিল।

পছন্দের প্রতি যেমন প্রাণঢালা ঔদার্য, অপছন্দের প্রতি তেমনি তীব্র বীতরাগ। প্রাণের অধিক প্রিয় পত্নীর শত অনুরোধেও মেয়ে সারা-র মুখদর্শন করেন নি শেষ জীবনে। মেয়েটা মদ্যপান করে রাস্তা ঘাটে বমি করে পুলিসের হাতে পড়েছিল একাধিকবার এবং কোর্টে দাঁড়িয়ে ফাইনও দিয়েছিল।

তাঁর সমসাময়িক কালের পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি যে কারুর চেয়ে কম ছিলেন না, এজ্ঞান তাঁর পুরোমাত্রায় ছিল। নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হবে সে সম্বন্ধেও তিনি নির্দেশ রেখে গিয়েছেন। কিন্তু বোধ করি একথা যে তাঁর সম্বন্ধে বলা হবে তা তিনি কল্পনা করেন নি, বর্তমান ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী তাঁর সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন—তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্যে পার্লামেন্ট-সভায় সমবেত হয়েছেন। সব আসন ভর্তি—কেবল সামনের সারিতে একটি আসন খালি। সেই আসনে বসতেন উইনস্টন চার্চিল গত দশ বছর ধরে। প্রধানমন্ত্রী বললেন, এখন থেকে এই আসনটি খালি থাকবে—কেউ তাতে বসবে না, শূন্য আসনটি স্মরণ করিয়ে দেবে সেই অনন্যসাধারণ বিরাট পুরুষকে!

এ সম্মান ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এতাবৎ আর কাউকে দেয়নি।

• • •

ইংলণ্ডের উত্তরাংশে একটি স্কুল পরিদর্শন করতে গেছেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার আর্থার কোনান ডয়েল।

তাঁর খ্যাতি কতদূর ছড়িয়ে পড়েছে সেটা জানবার জন্যে তিনি স্কুলের কর্তৃপক্ষকে তাঁর পরিচয় ছেলেদের কাছে গোপন রাখতে বললেন।

একটা ক্লাসে ঢুকে তিনি একটি ছেলেকে বললেন: তুমি স্কুলে আসবার সময় পথে একটা ছোট ছেলের সঙ্গে মারামারি করেছ।

ছেলেটি আশ্চর্য হয়ে বললে, আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

—তোমার জামার ডানদিকে ছেঁড়া পকেট দেখে। বাড়ীতেই যদি ছিঁড়ত তা'হলে তুমি নিশ্চয়ই জামা বদলে আসতে, আর রাস্তায় মারামারী না হলে ওটা ছিঁড়বেই বা কেন? আর যে ছিঁড়েছে সে তোমার চেয়ে মাথায় ছোট, তাই উপরের দিকে হাত না পেয়ে পকেট ছিঁড়েছে।

ছেলেটি তখন হেসে বলল: আপনি নিশ্চয়ই সার আর্থার কোনান ডয়েল।

ফানুস মানুষ

দিবেন্দু দাশগুপ্ত

ইয়াসিন মোল্লার শিরদাঁড়াটা ভয়ানক টনটন করছিল ঘাড়া চার ঘণ্টা বসে থেকে থেকে। একটা কোটের ডেলিভারী তাকে আজই দিতে হবে। হুমড়ি খেয়ে সে কোটটাকে হাতে সেলাই করছিল অনেকক্ষণ ধরে। পুরু কাচের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখটাও কদর্য ঝাঁপে ভরে উঠছিল। ইয়াসিন বিড়বিড় করে গালাগাল করল তার অনুপস্থিত সহকারীকে। কোটের কাজ খুব কম-ই পায় সে। সেবার শীতে মাত্র দশটা কোটের কাজ হয়েছিল। কোটের কাজে খাটুনী বেশী হলেও মজুরীটা ভালো। আজকের এটা তার এক অত্যন্ত পুরোনো খদ্দেরের।

শীত আসে নি এখনও।

কার্তিকের শেষ। তবু ভোরে ঘাসের ডগায় শিশির জমে থাকে সাদা কেনার মত।

এবার যাত্রা তার ভালই। এখনই বেশ ক'একটা, বলতে নেই, সে কাজ পেয়েছে কোটের। ইয়াসিন মোল্লার ডেলিভারী নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে। তা থেকে এক মুহূর্তও নড়চড় নেই। এ জন্যেই ইয়াসিনের নাম খুব।

শুধু কি তাই?

ইয়াসিন ভাল খলিফা। তার কাজে ফাঁকী নেই। হাতে সেলাই মজবুত বেশী কোনো কোনো জায়গায়। সেখানে সে হাতেই কাজ করে। তার ওস্তাদ তাকে ফাঁকী দিতে শেখায় নি। সাচ্চা কাজ শিখিয়েছিল তার ওস্তাদ। সাচ্চা ওস্তাদের সাচ্চা সাকরেদ। ইয়াসিনের ওস্তাদ তার কাজ দেখে খুশী হয়েছে। 'তোর আর চিন্তা নেই! যে কাজ শিখেছিস্ তাতে তুই অনেক নাম করবি। ভালভাবে চলে যাবে তোর। তোর হিল্লে হবেই।' সেদিন আর নেই।

ওস্তাদ কবে গোরের অতলতায় শান্তি খুঁজে পেয়েছে। আজ সে বুড়ো। তার-ও ডাক এসেছে। সে-ও যাবে। যাবে দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু তার—একটা ভাল কারিগর সে তৈরী করতে পারল না। ফুলপ্যাণ্টের কিম্বা ব্লাউজের দু' একটা কাটছাট শিখে সাকরেদের দল সরে গিয়ে স্বাধীন ব্যবসা ধরছে। ভেবেছে সব শেখা হয়ে গেল।

তার সাম্প্রতিক সহকারী ধরত বলে, 'চাচা কি দরকার এত খেটে? পয়সা তো আর বেশী দেবে না। তবে?'

ইয়াসিন চটে যায়। 'পয়সাই চিনেছিস্ শালারা। তা-ও যদি পয়সার মুখ দেখতিস। ইমান বড় আসলি জিনিষ। ইমান ঠিক রেখে ব্যবসা করলে সে ব্যবসা কোনোদিন নষ্ট হবে না।' মফস্বল শহর। ছোট্ট অথচ জমজমাট। মহানগরী যারে কাছেই। নিত্য নতুন কাটছাটের জামা কাপড় বেরোয় আর হুহু করে তা অনুকরণ করবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলে এখানকার মানুষদের। কলকাতার চলমান আধুনিকতার ঢেউ তাদের জীবন-যাত্রা আর পোষাক পরিচ্ছদের ওপরও প্রভাব ফেলে বৈকি! ইয়াসিন খলিফাও নতুন নতুন ফ্যাশান দেখে। যে যেমন বলে তেমনটিই বানায়।

ইয়াসিনের হাত ভালো, নিখুঁত কাজ আর মিষ্টি সময় জ্ঞান দেখে চেনা-জানারা এখানেই আসে। এসে আবদার করে। স্কুল ওপরানের চাক দিটিয়ে ভাল কাজ আদায় করে নেয়। ইয়াসিনের কাজ ভাল বললে ইয়াসিন খুশীও হয়। এই দুর্বলতাটুকু জানা আছে স্কুল কলেজের ছেলে ছোকরা আর স্কুলবাবুদের।

ইয়াসিনের সহকারী চটে ওঠে মাঝে মাঝে।

'তোমার বড়া বড়া বাত, রাখো তো চাচা। এত খাটুনীর দাম যদি একই হয় তবে লাভ কি সে খাটুনী খেটে? তোমার এই বদ্ মেজির জন্যেই সবাই তোমাকে ছেড়ে গেছে। কেউ কাজ করতে চায় না তোমার সাথে।'

ইয়াসিন ছেড়ে ওঠে কাঁচি থামিয়ে।

'তবে রে শালা। শেখা হয়ে গেছে বুঝি সব? তাই এত ছটফটি! যা না বেরিয়ে। যা। ভুইও যা। শালা বেইমান। বেইমানের জাত।' ইয়াসিনের দুঃখ হয়। আজকালকার ছোকরাগুলো মান রাখতে জানে না। জানে না ওস্তাদকে সম্মান করতে। তার ওস্তাদ গজকাঠি দিয়ে তার নরম হাত মেরে মেরে শক্ত করে দিয়েছিল। তবু সে এক ওস্তাদ ছেড়ে অন্য ওস্তাদ ধরে নি। কাজ শিখে তাকে খুশী করে তার অনুমতি নিয়ে তবেই ছেড়েছে ওস্তাদের সংগ।

অথচ এখন?

ইয়াসিন বুড়ো মানুষ। তাই মেয়েদের কাছ থেকেও ডাক আসে প্রচুর। বিবাহিতা কিম্বা কুমারী মেয়ে সবাই ডাকে তাকে। তার দুর্নাম শুধু কৃপণ বলে। তার অনেক টাকা আছে। ভোগ করবার কেউ নেই। বউ ছিল সে মরে গেছে অনেকদিন হল। আর বিয়ে করেনি সে। টাকা জমানোটা তার বাতিক। সাধারণ দর্জির কাজ করে করে সে নিজে এই দোকান খুলেছে তা-ও অনেক বছর হল। ইয়াসিন ধর্মভীরু। পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে। ঈদের দিনে আর-ও পাঁচ জনের সাথে ময়দানে যায়। প্রতি শুক্রবারে মোম জ্বালায়। কোরাণ শরীফ পড়ে শোনায় একজন। এই পুণ্য পেতে তাকে কিছু টাকা খেসারৎ দিতে হয়। অবশ্য এটাকে সে খেসারৎ বলে ভাবে না। এটা পুণ্য করবার দাম। জমা কাপড়ের মজুরীর মত-ই। ইয়াসিন শাসি দিচ্ছিল কজলুকে। সে জানে আজকে এটা ডেলিভারীর দিন। অথচ বেতোমিজ্ ছোকরা এখনও এল না। কী দায়িত্ব জ্ঞানহীন! চোখে আজকাল কম দেখে বলে কজলুকে দিয়ে বেশী কাজ করায় সে। আর তাইতে ব্যবসাটাও বেশ ভালোই চলছে।

ইয়াসিন শ্রান্ত হয়ে পড়ছিল। ক্লান্তিতে চোখ দুটো বুঁজে আসছিল। আমাকে এটা আর দু'ঘন্টা পরে দিতে হবে। কথার খেলাপ আমার কখনও হয়নি। এ বয়েসে আর বদনাম হতে দেব না। কাজটা আমি করবই। এই তো শেষ হয়ে আসছে। আর কেবল কাঁধ আর জমারটা বাকী। তারপর বোতামগুলো লাগাতে পনের মিনিট। ইস্ত্রিতে দশ মিনিট। কোটের এতগুলো কাজ নিয়ে ভুল করেছি। কজলুকে আর চটানো উচিত নয়। সেও বিগড়ে গেলে ভয়ানক ক্ষতি হবে আমার। অনেক বদনাম কুড়োতে হবে শেষ বয়েসে। তার চাইতে মিষ্টি কথায় তোয়াজ করে করে কাজগুলো শেষ করতে দোষ কি? আজ এল না কেন শালা হারামী? আবার বিড়বিড় করল ইয়াসিন। দু'ঘন্টা লাগল না। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে কাজটা শেষ করল যন্ত্রের মত দ্রুত হাতে। শেষ করে

এত ক্লান্ত হল যে শুয়ে পড়ল সটান। খানিকক্ষণবিশ্রামকরে ইয়াসিন চাংগোহল। উঠে রাস্তার উল্টোদিকের চায়ের দোকানটাতে তার কলাই করা মগটা দিয়ে এল। বেশী চা না খেলে এসব কাজ করা যায় না। অন্যান্য দর্জির মতই ইয়াসিনেরও চায়ের নেশা প্রবল। চা খেয়ে ইয়াসিন পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করল।

খুলিয়ে রাখা কোটটা একটা লম্বা কাঠির মাথায় করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কোথাও ভাজ নেই তো? লাইনিং মজবুত হল কি? সুতোগুলি দাঁত দিঁচিয়ে নেই তো? কোটটা হাতে নিয়ে ইয়াসিন ভাবল তার ওস্তাদের কথা। তখনকার আমলে কি এসব কোট তৈরী হত? এগুলো হাল ইয়াংকি কাট্। শুধু এক বোতামের। নুচ ফিটিং আর ভিন্ন কাটিং এর। মন্দ নয় জিনিষটা। ইয়াসিন হাসে মৃদু মৃদু।

ইয়াসিন বসেবসে অনেকক্ষণ রাস্তার চলমান প্রবাহ দেখল। তার নামাজ পড়া হয়ে গেল। কজন্ এল এক সময়। তাকেও অনেকক্ষণ গালাগাল করে যখন সে চুপ করে বসে আছে তখনও কোটের মালিক এল না।

না আসুক।

তার কাজ তো সে ঠিক করে রেখেছে। করেছে সুসম্পন্ন।

• • • •

সন্ধ্যের শহরটা স্বাভাবিকভাবেই ঘুমে ওঠে। দোকান পশারে ভীড় থাকে প্রচুর। রাস্তায়ও লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। মাঝে মাঝে দু' একটা মোটর বা ট্রাক হুসহাস করে বেরিয়ে গিয়ে প্রমাণ করে শহরটার আভিজাত্য।

চশমার কাঁচ মুছছিল তার মমতা দিয়ে ইয়াসিন। এমন সময় মেয়েটি এল। ইয়াসিন চশমাটা ঠিক করে লাগিয়ে ভ্রূ উঁচিয়ে তাকাল। তার তামাটে গালে 'ধ'র মত একটা গহ্বর, সাদাপাকা চুল, ভোঁতা নাক আর এক শতাব্দী আগের দেখাপ্পা চশমা সব মিলিয়ে তাকে উজবুকের মত দেখাচ্ছিল।

ইয়াসিন তাকিয়ে দেখল মেয়েটিকে। সুন্দর দুটি চোখ, সুডৌল হাত পা, শাম্পু করে চুল ফাঁপানো। ভ্রূ দুটিতে অল্পই কালো রং-এর ছাপ একটু এদিক ওদিক সরে গেছে। হাতে একটা বটুয়া—আজকালকার ফ্যাশানের প্রতীক।

ইয়াসিন জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই মা?'

মেয়েটি হাসল ঠোঁটের কোণায়। হাতের বটুয়া থেকে এক টুকরো দামী কাপড় বের করে তার সামনে রাখল। বলল, 'আমার ব্লাউজের মাপটা নিন তো চাচা।' কিতে নিয়ে উঠল মুড়ো। তার কাছে লজ্জা কি।

ডাক্তারের কাছে যেমন রোগীর লজ্জা নেই তেমনি ইয়াসিন একটি যুবতী মেয়ের তরাট বুকের মাপ নেবে তাতে কি লজ্জা। ইয়াসিন যুবক নয়। সে বুড়ো।

মেয়েটি বলল, 'প্যাটার্নটা কিন্তু পুরোনো হবে না চাচা। তোমার শেফালী দিদিমনিরটা যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনি।'

তারপর থেমে বলল, 'কবে আসব?'

ইয়াসিন একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'বিষ্যুতবার এমনি সময়ে।' অপসৃয়মান মেয়েটির শুধু সুখ মেহটি তার বড় ভাল লাগল। শেফালী দিদিমনি ঢাকানীতে ভোগে। ভুবন উকিলের বউ

শেফালী সিমিনিকে বহুই পর্যন্ত চাকা আর কলার দেয়া ব্লাউজে কি বিশ্রীই না দেখায়। অথচ এ মেয়েটিকে কি অদ্ভুত ভালই না দেখাবে। খুব মন দিয়ে অত্যন্ত দামী ব্লাউজের টুকরোটা কাটল।

মেয়েটি বলল, 'কেমন লাগছে চাচা? শেফালী সিমিনির চাইতে খারাপ?'

আজকালকার ছেলেমেয়েদের লজ্জাশরম নেই। ইয়াসিন ভাবল। তার খুপরীতে ঢুকে ব্লাউজটা পরে তাকে দিয়ে, প্রথম পুরুষ দর্শক দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে মেয়েটা। বড় ছেনাল। একটা বিরক্তির ভাব জাগাতে গিয়েও ব্যর্থ হল ইয়াসিন। আসলে অপূর্ব মানিয়েছে। লোভীর মত তাকিয়ে আছে কমলু তার দেহের দিকে। একটা চকল কটাক্ষে তাকে ধরাশায়ী করল মেয়েটা। মজুরীর জন্যে দশটাকার নতুন নোট বের করে বলে, 'খুচরো নেই আমার কাছে।'

খুচরোটা হাতে নিয়ে মেয়েটি বলে, 'আসি চাচা।'

ইয়াসিনের কেন যেন ভাল লাগে, 'এসো মা।'

কাজে ফাঁক পেলেই চশমাটা মোছা এক বন্ধুভোল ইয়াসিনের। একটি ছেলে এল। তাকে চেনে না সে। মেয়েটিকেও চিনত না। শহরে আজকাল নতুন মুখের বেশী আনাগোনা। শহরটা আরো জমছে। পুরোনো দিনের কথা ভেবে এটাই মনে জাগল তার। বগল থেকে একটা প্যাকেট থেকে প্যান্ট সার্টের কাপড় বের করল। বেশ দামী।

আমার মাপটা নাও তো চাচা। তাড়াতাড়ি দিতে হবে কিন্তু আগেই বলে রাখছি। সতের ইঞ্চি বেড় দেয়া আমেরিকান প্যান্ট। লুজ যেন না হয়।'

চোখাচোখা নাক মুখ। মাপসই লম্বা আর বুকটাও বেশ চওড়া।

ইয়াসিনের তাকেও ভাল লাগল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। ঠিকমত তৈরী করে দেব। ভেবো না তুমি।'

• • •

মেয়েটা আবার এল। এবার অন্যরকম। বুকের মাঝে চকচকে কাটার মত অনেক কাটা আর পিঠে চৌকো বরফি ফাঁক। কাজটাও শক্ত। তবে তার কাছে নয়। অন্য খলিফার কাছে। এবারও চটুল হাসল। কমলুর দিকে তাকিয়ে তেরছা চাউনি দিয়ে কমলুর উপবাসী কামনাকে সুড়সুড়ি দিল। আর বুড়ো ইয়াসিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাজটা যেন ভাল হয় চাচা।'

বুড়ো সাদাপাকা চুল নেড়ে বলল, 'তা আর বলতে!'

এবারও তেমনি দশটাকার নোট এগিয়ে দিল। 'খুচরো নেই।'

ছেলেটিও এল একদিন। 'আমার কোটের মাপটা এও চাচা। স্পোর্টিং ধরনের যেন হয়।'

ইয়াসিন চওড়া বুক পিঠের মাপ নিয়ে আবার খুশী হল। বলল, 'ঠিক আছে।'

কল চালাতে চালাতে অন্যমনস্ক দৃষ্টি ফেলল ইয়াসিন রাস্তায়। সেই ছেলে মেয়ে দুটি হাত ধরাধরি করে যাচ্ছে। ইয়াসিনের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। দুটি স্বাস্থ্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি দেখে তার অত্যন্ত আনন্দ লাগছিল। ইয়াসিন বলল আপন মনে, 'কী সুন্দর মানিয়েছে জোড়া।' কমলু একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তার অস্ফুট কথায় সে-ও তাকাল রাস্তায়।

ওই মেয়েটি না? হ্যাঁ সেই তো! ছেলেটিকেও তো সে চেনে। দুজনে হাসছে। হাসির উচ্ছ্বাসে সর্বাঙ্গে কাঁপছে। মেয়েটার মাথার চুলগুলো দুলছে সাপের কুণ্ডলীর মত। হাসিতে উজ্জ্বল দুটি মুখ দেখে, তার মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

এবার এল তারা দুজন একসাথে। ছেলেটি বলল মেয়েটির হয়ে। 'এর মাপটা নাও তো চাচা। মেয়েটি এবার প্রগলভ্ নয়। অনুরাগের ভাবে ভারী দুটি আঁখি মেলে তাকাচ্ছিল প্রেমিকের দিকে বারবার।

মেয়েটি বলল, 'এর পাঞ্জাবীটা হাই কলারের হবে কিন্তু। কলার ছাড়া পাঞ্জাবী আমার কাছে ক্যাবলা ক্যাবলা লাগে।'

তারা বেরিয়ে গেল। ফজলুর দিকে একবারও তাকাল না। ভুলেও নয়।

মহা উৎসাহে কাজ করল ইয়াসিন। বারবার বলল, 'বাঃ, কি সুন্দর মানিয়েছে জোড়াটা।'

ওরা এল। মেয়েটা ব্লাউজ পরল। এবারেরটা বগল কাটা। বগল পর্যন্ত ওঠানো এ্যাংলো মেয়েদের মত। পেছনে রেশমী দড়ি দিয়ে বাঁধা আর ছোটো ছোটো কাচ বসান। মেয়েটা বলল, এ-কি এত আঁট হয়েছে কেন বগলের কাছটা?'

মেয়েটার বুকের অর্ধেকটাই খোলা ছিল। খোলা ছিল সুডৌল বাহুদুটো। আর চেপে বসা ব্লাউজটার ফাঁক দিয়ে পরিমিত লোভনীয় মেদমাংস দেখা যাচ্ছিল। আধখোলা মসৃণ বুকটার দিকে শুধু দৃষ্টিতে তাকাল যুবকটি।

ফজলু তাকাল চোরাদৃষ্টি হেনে।

তারপর অনেকদিন হয়ে গেছে। ইয়াসিন আরো বুড়ো হয়েছে। তবু কাজ ছেড়ে দেয়নি সে। অল্প সল্প কাজ করে। মাঝে মাঝে মনে হয় সেই ছেলেমেয়েটির কথা। তাদের আর দেখে নি সে। হয়ত বিয়ে করে নতুন কোথাও গিয়ে সংসার পেতেছে ওরা। জুটটা খুব সুন্দর ছিল দেখতে। ইয়াসিন এখন ফজলুর সাথে ঝগড়া করে না। আসলে কিছুটা মুখরা হলেও ছেলেটা মন্দ নয়।

ইয়াসিন চোখে আরো কম দেখে। সন্ধ্যের নামাজ পড়ে সে বসে বসে চা খাচ্ছিল। এমন সময় একটি লোক এল। গলাটা চেনা চেনা। 'আমার জামা পাজামার মাপটা নাও তো চাচা।'

ইয়াসিন পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। হ্যা, সেই ছেলেটি-ই কি চেহারা-ই না হয়ে গেছে। চেনাই যায় না হঠাৎ। ময়লা জামা কাপড়ে তাকে বড় মলিন দেখাচ্ছিল। দেখাচ্ছিল বিপর্যস্ত। ছেলেটা জামা কাপড়ের প্যাকেটটা বের করে রাখল কলের ওপর। বুকের মাপ নিতে গিয়ে ইয়াসিন থতো খেল হঠাৎ। আটত্রিশ ইঞ্চি বুকটা এখন চৌত্রিশ। আর হাড়গুলোর প্রকট উপস্থিতি জামার ওপর দিয়েও অনুভব করছিল সে।

ছেলেটি বলল, 'পাজামাটা খুব ঢে লঢালা করো। এখনকার ফ্যাশান মত। আর জামাটা হাটু অবধি নামিয়ো না যেন।'

ছেলেটার সুরটা বড় করুণ। জামা পাজামার কাপড় দেখে আরেক ধাক্কা খেল বুড়ো ইয়াসিন মোল্লা। নয় বাকিংহাম, নয় পপলিন, নয় নিউশরক,—বাজে একটা লংক্লথের টুকরো। বুড়ো ভাবল এরই জন্যে পানামা টুপিকেল দিয়ে কোনোদিন সে স্যুট তৈরী করেছিল কিনা! আমার স্মরণশক্তি চোখের দৃষ্টি-শক্তির মতই ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। ইয়াসিন মোল্লা ভাবল। কিন্তু খুশী হল এই ভেবে যে রুচিটা তার মরে যায় নি এখনও। সাধারণ পাজামাটা যাতে সরু আর চিপা না হয় সে দৃষ্টিটুকু এখনও আছে।

জামা পাজামা ডেলিভারী দিতে গিয়ে মোল্লার হাত কাঁপল। বিষাদে ভরে উঠল মন। কিন্তু খুশীতে চকচক করে উঠল ফজলুর দুই চোখ। ইয়াসিন মোল্লার ইচ্ছে হল মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু পারল না। ইয়াসিনের স্বপ্ন ভেঙে গেছে।

• • •

ইয়াসিন এত বুড়ো হয়েছে যে কাজ করতে ভারী অসুবিধে হয়। কাজ আজকাল করে না সে। কজলুই সব দেখাশোনা করে। নীরব দর্শকের ভূমিকায় কাউন্টারে বসে ইয়াসিন রাস্তার জনস্রোত দেখে।

ইয়াসিনের ঘরে সেদিন খুব বেশী ভীড়। কজলুর আজকাল অনেক নাম ডাক। ওস্তাদের নাম রেখেছে সে। বেইমানি ও করে নি।

ভীড়টা কমলে ইয়াসিন দেখল একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোলে একটা বাচ্চা নিয়ে। ইয়াসিন ডাকে, কি চাই মা ?'

'একটা ব্লাউজ করাব।'

ইয়াসিন চমকে ওঠে। চমকে তাকায় পূর্ণ যৌবনের একটি ছেলে কজলু। ইয়াসিন বলে, 'তুমি মা ? কতদিন পর ? কেমন আছ ?

'ভাল। আমার মাপটা নিন তো।' ভদ্র সংযত কণ্ঠস্বর।

কোলের ছেলেটাকে কাউন্টারে রেখে মাপ দিল সে। ইয়াসিন শেষ বয়সে আবার ধাক্কা খেল। আটত্রিশ ইঞ্চি বুকের কথা এখনো ঝলমল করছে মনের মনিকোঠায়।

ব্লাউজের কাপড়টা মেপে নিয়ে আবার ধাক্কা খেল সে। বাজে একটা ছিটের কাপড়। এবার ভাল করে তাকাল ইয়াসিন মোল্লা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। ডাক্তার যেমন মুমূর্ষু রোগী পর্যবেক্ষণ করে। ছোট অস্পষ্ট ভ্রূর নীচে কোথায় সেই চটুল চোখ ? শুকনো মুখে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। চুলগুলি শ্যাম্পু করা নয়। তেল দিয়ে আঁচড়ানো। উদ্ধত বুকের আভাসও নেই কিছুমাত্র। এ মূর্তি দেখতে চায় নি মোল্লা। কখনই নয়। স্বাস্থ্য আর যেন কি অপূর্বই না লাগতো মেয়েটাকে। একটু উগ্র হয়ত দেখাতো তাহলেও সেটা দোষের নয়। ইতিমধ্যে বাচ্চাটা কাউন্টার নোংরা করে ফেলল। মেয়েটা লজ্জা পেয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি মুছে দিচ্ছি।' বুড়ো হা হা করে উঠল। 'তাতে কি হয়েছে, আমার ঘাড়ু তো।'

ইয়াসিন বলল, 'কি প্যাটার্নের করব মা ?

'যেমন খুশী আপনার।' কুণ্ঠিত স্বর।

'এখনকার চল্‌তি ফ্যাশান না সাধারণ ?'

'সাধারণ।' স্বরটা প্রায় বুজে এল।

অনেকদিন পর নিজের হাতে অনেক যত্ন করে কাজটা করল ইয়াসিন। মেয়েটাকে বলল, 'একটা কথা মা। ব্লাউজটা একটু গায়ে দিয়ে এস না, দেখি কেমন মানিয়েছে।'

সাধারণ ব্লাউজেও মেয়েটাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে ইয়াসিনের চোখে। ইয়াসিন তার পরিশ্রমের সার্থক মূল্য পেল যেন। মজুরী দিতে গিয়ে এবার আর দশটাকার নোট এগিয়ে ধরল না। গোনাগুন্তি দুটাকা মজুরী দিয়ে মেয়েটি চলে গেল।

কজলুর চোখ এবার আর আনন্দে ঝিকিয়ে উঠল না। চোখ তুলে তাকাতেই পারল না যেন সে। ইয়াসিন ভাবল কেন এমন হয় ? কেন ওরা সুখী হতে পারল না ? ওদের কি বিয়ে হয়েছিল ?

কে জানে ?

'এই আমার শেষ কাজ। আর কাজ করব না আমি। কিছুতেই নয়।' ইয়াসিন মোল্লার ঝুলে যাওয়া চোয়াল দুটো জাঁট হয়ে এল। স্বচ্ছ কাচের ফাঁকে জলের রেখা দেখতে পেল কজলু। ইয়াসিন মোল্লা, তার ওস্তাদ—কাঁদছে ছেলেমানুষের মত। কজলু বলল, 'রাত অনেক হয়ে গেছে চাচা। বাড়ী চল।' ইয়াসিন মোল্লা আর কাজ করে না।

———

ভুজন

কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়

একদিন আমি আমার ঘরে বসে সেলাই করছি এমন সময় একটা হৈহল্লোড় আরম্ভ হয়ে গেল আমাদের বাড়ির উঠানে। আমি বাইরে গিয়ে দেখি একটা মাটির পুতুল উঠানের মাঝে রাখা আর আমার খুকু একটা অচেনা লোকের সঙ্গে, ছুটোছুটি চেঁচামেচি করে খেলা করছে। আমাকে দেখেই লোকটা খুকুর সঙ্গে খেলা ফেলে আমার কাছে এসে দড় হয়ে প্রণাম করে দেহাতি হিন্দীতে বললে। "মাইজি! আবকো নোকর চাহি বা! নোকর কা কাম হাম্ করব!"

আমার তো চাকরের খুবই দরকার ছিল কিন্তু তাকে দেখেই আমি চমকে উঠলুম। অমন কদাকার মানুষ আমি জীবনে কখনো দেখিনি! আমি আবার কুৎসিত মানুষ মোটে সইতে পারি না। তার খাঁদা নাক, সিটকে শরীর, বেঁকা পা, কুঁজো পিঠ আর মিশমিশে কালো রং দেখেই আমি মুখ ফিরিয়ে বললুম, "জরুরৎ নাহি, যাও!"

কিন্তু মনে হল সে যেন আমার কথা কানেই নিলে না। ঘরে গিয়ে সেলাই আরম্ভ করলুম আবার উঠল উঠানের সেই চেঁচামেচি। গিয়ে দেখি আবার ওদের খেলা সুরু হয়ে গেছে। আমি তো অবাক। খুকু ওকে দেখে ভয় পায় না! আমার দুধে-আলতা রঙের চার বছরের মেয়েটি যেন একটি বিলিতি ডল, যে দেখে সেই ওকে আদর করতে চায়। কুঁজোটার কোনো কুমতলব নেই তো! আমার কেমন ভয় হল। বেটাকে এক ধমক দিয়ে হেঁকে বললুম, "ফাটক কা বাহার যা!"

"যাইত, হাম যাইজী।"

এই বলে তার ভেড়াবাঁকা পা দুটো আস্তে আস্তে ফেলে, যেন যেতেই চায় না, সে বাড়ির ফটক পেরিয়ে চলে গেল।

সে ফটক পার হতেই আমার খুকু কিনা চেঁচিয়ে উঠল "আরে ভুজন কাঁহা যাওয়ত? না যাও!"

আর বিদঘুটে কুজোটা কিনা পাঁচিলের পাশেই দাঁড়িয়ে গিয়ে তার কোদালের মত মোটা মোটা হলদে দাঁত বার করে খিঁখিঁ হেসে বললে,

"আরে খোকী দিদি, ঘবড়াও মাৎ! হাম্ ফির্ আওয়ব, হাঁ!"

"জলদি আওগে, হাঁ!"

"জলদি আওয়ব্, খোকী দিদি, জল্দি আওয়ব্।"

তারপর হাত নেড়ে নেড়ে খুকু তাকে বিদেয় দিলে। আমি তো ভয়ে কাঁটা! এইটুকু সময়ে ঐ বিশ্রী কুঁজোটা আমার খুকুর সঙ্গে এমন ভাব জমিয়ে বসল! তাড়াতাড়ি খুকুকে কোলে নিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, "ও খুকু! ছেলে ধরা খুকু, হাঁ! ওর সঙ্গে আর কথা বলো না, কেমন!" খুকুর ঘাড় নাড়া দেখে তো মনে হল ও বুঝেছে। ভাবলুম, "বাব্বা! আপদ বিদেয় হল! বাঁচা গেল!"

লক্ষ্ণৌ শহরে আমরা থাকি। গোমতী নদীর ওপারে আমাদের বাড়ি। বাড়িটা বাংলো ধরণের, একতলা। তার সামনে পাঁচিল ঘেরা একটু বাগান, তাতে কিছু ফুল গাছ লাগিয়েছি। পেছনে খানিকখানি পাঁচিল ঘেরা উঠান। তাতে জলের কল, যার তলায় বাসন মাজার জায়গা।

পাচিলের মাঝখানে খিড়কি দরজা, আর তার পাশেই পাচিলের ওদিকে ভৃত্যের ঘর। এখানে ও জীবটি পাওয়া শক্ত। রান্নার একটা ঠিকে লোক ছিল বটে, কিন্তু রাতদিনের কাজের লোকটা মার অসুখ বলে সেই যে চলে গেল আর ফেরেনি। তার জায়গায় বাসন মাজার আর ঘর ঝাঁট দেবার একটা ঠিকে ঝি রেখেছিলুম বটে কিন্তু এ দু'দিন সেও কাজ করতে আসেনি! উঠনের কলতলায় দুদিনের এক ডাই এঁটো বাসন জমা হয়ে রয়েছে! রান্নার লোক তো এঁটো বাসন ছোঁবেও না। ভাবছিলুম, যাইবার আগে নিজেই এ-সব মেজে নেব, নইলে তো আর সংসার চলে না! এমন সময়ে কানে গেল খস্ খস্, খস্, বাসন মাজার আওয়াজ। আর খুকুর বকর, বকর! উঠনের দিকে তাড়াতাড়ি গিয়ে অবাক হয়ে দেখি, সেই মিসকালো কুচ্ছিটা বাসন মাজছে, আর তার সামনে বসে আমার খুকু অনর্গল ব'কে যাচ্ছে! লোকটা মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে উত্তর দিচ্ছে, "হাঁ খোকী দিদি!" আর দাঁত বার করে হাসছে!

তাই দেখে আমার মনটা কেমন নরম হল। সত্যিই তো শিশু যাকে এতো বিশ্বাস করে সে কখনো খারাপ হতে পারে না। খারাপ মনের কোনো লোক এলে, শিশু কেমন বোঝে, সে তার ত্রিসীমানায় থাকতে চায় না। ভুজনকে শেষ পর্যন্ত রাখাই ঠিক হল। সকালে আসবে সারাদিন বাড়ির কাজ করবে, সন্ধ্যের সব কাজ সেরে নিজের বাড়ি ফিরে যাবে। সেখানে ওর বউ আছে। ওর বউ আছে শুনে আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলুম! ভাবলুম, অমন রূপের মানুষকেও কোনো মেয়ে বিয়ে করতে পারে। বয়েস জানতে চাইলে বললে, ঠিক জানে না তবে দুকুড়ি হবে। যাক, দেখতে যেমনই হ'ক এখনো বুড়ো হয়নি! বললে, ওরা বরবউ নিশাখগঞ্জে থাকে আমাদের বাড়ির প্রায় এক মাইল দূরে। আমি বললুম, অতদূরে না থেকে তারা বরবউ তো আমাদের চাকরের ঘরে থাকতে পারে, আমি নয় দুজনকেই খেতে দেব। এ কথা শুনে সে তারি খুশী হয়ে দাঁত বার ক'রে হেসে বললে, "এ তো বহৎ আচ্ছা হেয় মাইজী। লেকিন—" কী একটা ভেবে বললে, "ও তো, নাহি হোয়বা" এই বলে সে বড় বিমর্ষ হয়ে গেল। আমি আর কিছু বললুম না।

ভোর হতে না হতে সে রোজ কাজে আসত। সারাদিন ভূতের মতন খাটত। কাজে কোনো খুঁত ছিল না। কিন্তু তার আসল কাজ হল খুকুর। ঘড়ির কাঁটার মত সে কাজ চলত। সঙ্গে সঙ্গে চাকরের আর সব কাজও সে নিখুঁত ভাবে করে যেত। আর তাতে আর খুকুতে বক্ বক্ তো সব সময়ে লেগেই থাকত কখনো কখনো ছুটোছুটি, চেঁচামেচি! ওদের আবার কখনো ভাব, কখনো ঝগড়া! ঝগড়া বাধত দুধ খাওয়ান নিয়ে। খুকু দুধ খাবে না, ভুজন ভুলিয়ে যে রকম করে হ'ক দুধ খাওয়াবেই! খুকুকে ঘোড়ায় চড়াবে বাজি দেখাবে এই রকম নানা লোভ দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত দুধ ঠিক খাওয়াত। আমার সাধ্য কি খুকুকে দুধ খাওয়ানো! সন্ধ্যের পর খুকুকে ঘুম পাড়িয়ে আমার কাছে এসে একটা প্রণাম ঠুকে বলত "যাইত্ হাম মাইজী!"

"যাও, কির কাল সুবে আওগে!"

"হাঁ, মাইজী!"

এই বলে তার ইঁটের মত শক্ত, সাতভালি, তেলচিটে, লম্বা নাগরা জুতোজোড়া চড়িয়ে খটাং খটাং করে ঝাঁকাবাঁকা পা ফেলে বাড়ির বাইরে গিয়ে ফটক বন্ধ করে চলে যেত। রোজ এই চলত আমার আর কষ্ট ছিল না।

ভাল চাকর পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা। ভাবলুম, এইবার বুঝি ভাল চাকরই পেলুম। আশ্চর্য ওর বিশ্রী চেহারা আর আমার নজরেই পড়ে না! সত্যি, অমন সরল, সৎ আর কাজের চাকর আমি জীবনে কখনো দেখেনি। মিথ্যে কথা বলা বা বাজে দেওয়া বা চুরি করা যেন ওর ধাতে ছিল না। ওর সকলের ওপর দরদ আর খুকুকে তো প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। আস্তে আস্তে ও আমাদের সংসারের আপন লোক হয়ে গেল। ও থাকাতেই আমার সংসার সুন্দর চলছিল। আমাদের কী চাকর সুখই না হল!

একদিন সকালে ফুজন তার বউকে নিয়ে আমার কাছে হাজির। কিন্তু তার বউকে দেখে আমার মোটে ভাল লাগল না। অল্প বয়েসের মেয়ে, দেখতে বেশ, কিন্তু কী সাজগোজ আর কী বিশ্রী হাবভাব! আমার কেমন গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল। সরল ফুজন তাকে এনে এক গাল হেসে বললে, "মাইজী এই আমার বউ!"

"বেশ।"

"ও এখন রাজী হয়েছে মাইজী।"

"কিসে রাজী হল?"

"কেন, এখানেই আমার সঙ্গে চাকরের ঘরে থাকতে!"

"হঠাৎ যে ওর মত বদলাল!"

"নিশাবগঞ্জে তো ওর মার বাড়িতে আমরা থাকতুম ওর মা তাই চেয়েছিল। এখন কিন্তু ওর "মা"-র সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়ে গেছে। ওর 'মা' তাই আমাদের তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল আর আমরাও জিনিস পত্তর নিয়ে এখানে চলে এলুম।" এমন সময়ে খুকু সেখানে এসে ফুজনের বউকে একটু খুঁটিয়ে দেখে সেখান থেকে ছুট দিল। ফুজন তার পেছনে পেছনে ছুটে বলতে থাকল, "আরে খোকী দিদি! শুন তো—শুন তো—কিন্তু খুকু ফুজনের ডাকেও সাড় দিল না। আমি বুঝলুম! ফুজনকে বললুম "তোমার শাশুড়ীর কাছে যাও চেয়ে ঝগড়া মিটিয়ে নাও আর তোমরা দুজন তার কাছেই থাকো।"

ফুজন প্রথমটা হকচকিয়ে গেল! পরে আমার কথার মানে বুঝে আমার পায়ের ওপর কেঁদে পড়ল, "মাইজী! আমার বউ-কে বাঁচাও! ও ভাল মেয়ে ওকে দিয়ে ওর 'মা' যা তা করায়! ও তা করতে চায় না! তাই তো ওর 'মা'-র সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়েছে। আবার যদি ও সেখানে যায় তো মাইজী ওর আর কিছু থাকবে না! মাইজী! ওকে বাঁচাও! ওকে তোমায় খেতে দিতে হবে না, ও কখনো তোমার বাড়িতে ঢুকবে না, ওকে শুধু আমার কাছে থাকতে দিয়ে ওকে বাঁচাও! মাইজী ওকে বাঁচাও মাইজী ওকে বাঁচাও—" এই বলে আর আমার পায়ে মাথা কুটতে থাকে। আমার মন মেল গলে! ভাবলুম সত্যিই তো, স্বামী স্ত্রী একত্রে থাকবে, তাতে আবার দোষ কি? অমন মেয়ে আমার বাড়ীতে না ঢুকলেই হল। স্বামীর সঙ্গে ঘর করে হয়তো ও ভাল হয়ে যাবে। মেয়ে হয়ে আর একটা অল্প বয়েসের মেয়েকে এ সুযোগটুকু আমার দেওয়া উচিত। এই ভেবে ওদের চাকরের ঘরে থাকতে দিলুম। বউ কাছে থাকতে ফুজন যেন বদলে গেল! আগে ও কাজ করতে করতে প্রায় অন্যমনস্ক হয়ে যেত, প্রায়ই মুখ ভার করে থাকত, এমন কি কখনো কখনো মনে হত ও বুঝি কোথাও লুকিয়ে কেঁদে এল। যে বুকের ব্যথায় ওর এই দশা হয়েছিল তা যেন এখন ভরে গেল। এখন ওর মুখে কী হাসি, কাজে কী ফুর্তি! আমিও খুশী হলুম।

বিকেলে একটু বিশ্রাম করে সবে উঠেছি, এমন সময়ে চাকরের ঘরের দিকে একটা চেঁচা-মেচি উঠল! যেন ভুজনের চিৎকার আর কোনো খাওার মেয়েমানুষের তাদ্দাগলার উঁচু মোটা আওয়াজ নিয়ে একটা ঝড় উঠেছে! তাড়াতাড়ি গেছনের উঠনে পৌছতে কানে গেল একটা লোকের বিশ্রী টিটকারি, "আরে ভাখ, ভাখ, ঐ বুড়ো কুঁজোটা অমন খাপসুরত ছুঁড়ীকে আটকে রাখতে চায়! সাবাশ!" আর অনেক লোক হো হো করে হেসে উঠল। খিড়কি দরজা খুলে দেখি, একদিকে ভুজন আর অন্য দিকে অসম্ভব মোটা মেয়েমানুষ যার হাত ধরে ভুজনের বউ! দুই পক্ষে তুলকালাম ঝগড়া লেগেছে আর রাস্তার অনেক লোক তাদের ঘিরে ঠাট্টা টিটকারি করছে। আমাকে দেখে ভুজনের বউ ছুটে গিয়ে চাকরের ঘরে ঢুকল, রাস্তার সব লোক মিলিয়ে গেল, আর ভুজন এসে আমার পায়ের ওপর পড়ে বললে, "মাইজী, ঐ মোটা মাগি! ঐ মাগিই আমার বউ-এর মা! ও শয়তান মাইজী, শয়তান! আমি আমার খেতখামার, ভিটেমাটি সব কিছু বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছি আর সারা জীবন কাজ করে যে টাকা জমিয়েছি এসব একত্তর করে ওর হাতে তুলে দিয়ে তবে ওর মেয়েকে বিয়ে করেছি। তবু ওর খাঁই মেটে না। তাই ওর নিজের মেয়েকে দিয়ে পয়সা রোজগার করায়। আমার কাছ থেকে ওর মেয়েকে ছিনিয়ে নিতে চায় সেই কাজ করবে ব'লে। তুমি আমার বউকে বাঁচাও মাইজী বাঁচাও!" এই ব'লে সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল! আমি রেগে গিয়ে ওর বউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, "তুই কী চাস্? স্বামীর ঘর করবি না তোর 'মা'-র সঙ্গে যাবি?"

"স্বামীর ঘর করব মাইজী।"

এই শুনে আমি সেই খাওার মেয়ে মানুষকে জোরে ধমক দিয়ে বললুম, দূর হ এখান থেকে রাক্ষুসী। এখুনি দূর হ! নয় তো এখুনি পুলিশ ডাকব।" সে রাক্ষুসী তখন চোখ দিয়ে যেন আগুন ছোটাতে ছোটাতে সেখান থেকে চলে গেল! আমি বুঝলুম, এ পর্বের শেষ এখনই হল না। বেচারী ভুজন!

এর কিছুদিন পরে আবার ভুজন এসে কেঁদে পড়ে জানাল তার বউ পালিয়েছে। সে লক্ষ্ণৌ শহরের সব জায়গা খুঁজে এসেছে, তাকে আর তার মা-কে কোথাও পাওয়া গেলনা। আমার পায়ের উপর মাথা কুটে কুটে তার সে কি কান্না। শেষে আমার খুকু এসে তাকে অনেক সান্ত্বনা দিতে সে থামল। এরপর দেখতুম ভুজনের ওপর খুকুর দরদ গেল বেড়ে! ক্রমেই মনে হল ভুজন যেন তার মস্ত বরাত মেনে নিল। আমিও ভাবলুম, বাঁচা গেল, ওর ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেল!

দেখতে দেখতে পুজো এল। এই সময়ে উত্তর প্রদেশের জল হাওয়া বড় সুন্দর হয়। জমি, গাছ, জল জানোয়ার, নদী নালা সব যেন হাসে! মানুষের মুখেও হাসি ফোটে। আমরা প্রতি বছরে এই সময়ে কাশীতে গিয়ে আমার শাশুড়ীঠাকরুণের কাছ থেকে পুরো একটা মাস কাটিয়ে আসতুম। তাঁর স্নেহে এ একমাস বড় আনন্দে কাটত। আমার কোনো সংসারের ঝামেলা থাকত না। ঐ সময়ে কাশীর গঙ্গার বুকে বজরায় করে বেড়ান, ঘাটে কীর্তন আর কথকতা শোনা, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া, চকে গিয়ে মুসকি বরফ আর ভাল পান খাওয়া সিনেমা দেখা এই করে বড় ফুর্তিতে আমোদে সময় কাটত। এবারও কাশীতে গেলুম, আর খুকুর জন্যে ভুজনকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম। ভালই হল, কারণ ঠিক তখনই আমার শাশুড়ীঠাকরুণের ঝি চলে গিয়েছিল। আমার শাশুড়ী

ঠাকরুন ভুজনের চেহারা দেখে প্রথমটা চমকে উঠেছিলেন, বললেন, "তোমাকে তো জানি বউ মা, এই চেহারার লোককে চাকর রেখেছ!"

"যেমন চেহারাই হ'ক মা, ও লোক ভাল! আর কাজ করে খুব ভাল।"

"মানুষের শুধু রূপ নয়, গুণ দেখেও যে বিচার করতে শিখেছ দেখে খুশী হলুম বউমা! বেশ, ওকে সব কাজ বুঝিয়ে দাও।" পরে আমার শাশুড়ী ঠাকরণও তাকে স্নেহ করতেন, তার কাজে খুশী হয়েছিলেন।

বড় আনন্দে বৈহল্লোড়ে কয়েক হপ্তা কেটে গেল। একদিন সকালে ভুজন আমার কাছে এসে কাঁদতে সুরু করলে! কী হলরে? না সে স্বপ্ন দেখেছে, তার বউ লক্ষ্ণৌ-এ আমাদের চাকরের ঘরে ফিরে এসে তাকে না দেখতে পেয়ে কান্নাকাটি করছে সে শিগগির সেখানে না গেলে তার বউ বিষ খেয়ে মরবে। আমি হাসব না কাঁদব ভেবেই পাই না। অনেক চেষ্টা করলুম তাকে বোঝাতে স্বপ্ন সত্যি নয়। কিন্তু কোনো ফল হল না। কাজে-কাজেই খবর দিয়ে তাকে লক্ষ্ণৌ-এ পাঠাতে হল। কয়েক দিন পরে আমরাও লক্ষ্ণৌ-এ ফিরে এসে দেখি, ভুজন সেই চাকরের ঘরেই রয়েছে। এখন হয়তো সে বুঝেছে, স্বপ্ন সত্যি নয়। ও আগের মতন আমাদের কাজ করতে থাকে।

আগের মতনই ওর আসল কাজ ছিল খুকুর কাজ। দেখতে দেখতে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। এখন আমার খুকু হয়েছে পাঁচ বছরের একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে যার বুদ্ধি অসাধারণ, যার কথা শুনলে মনে হয় ইতিমধ্যেই দুনিয়ার অনেক কিছু সে বোঝে আর সেই রকম কথাবার্তা করে। লোকে অবাক হয়ে যায়, তার পাকা পাকা কথা শুনে।

একদিন সকালে এক গাল হেসে ভুজন আমাকে বললে, "মাইজী। আমার বউ ফিরে এসেছে

"কোথায় রে! আমাদের বাড়িতে উঠল নাকি?"

"না মাইজী, নিশাবগঞ্জে ওর মা-র বাড়িতে।"

"তা, তুই কি করবি?"

"কেন, আগের মতনই রাতে ওখানে থাকব আর ভোরে এখানে কাজ করতে আসব।"

"যা ভাল বুঝিস কর। সাবধানে থাকিস বাপু, ওরা লোক ভাল নয়।"

"না মাইজী, আমার বউ খুব ভাল। ও যে হলফ, করে বললে আর কখনো এমন কাজ করবে না! আর ওই যে আমাকে বললে ওখানে থাকতে!"

আমি হেসে উঠলুম।

দেখতে দেখতে উত্তর প্রদেশের ভয়ংকর গরম এসে গেল। সে যে কি ভীষণ তা যারা ঐ সময়ে লক্ষ্ণৌ-এর মতন শহরে কখনো থাকেনি তাদের বলে বোঝান শক্ত! যত বেলা বাড়ে সেই সোঁ, সোঁ, সোঁ "লু"-র বুক কাঁপান গর্জন! সন্ধ্যের বাড়ির মেজে বারান্দা দরজা, জানলা, বিছানা পর্দা আসবাবপত্তর এমন কি বাসন পত্তরও ধুলোবালিতে ঢেকে যেবার "আঁধি", আর উঃ! সেই গা-ঝলসানো গরম—একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে। এমন কি দুপুরে বিদ্যুতের পাখা চললে মনে হয় আগুনের হলকা ছুটছে। লোকে হা-পিত্যেশে চেয়ে থাকে কখন বর্ষা নামে! তার ওপর সেবার হল দারুণ অনাবৃষ্টি, বিশেষ করে বস্তিগুলিতে—আর সুরু হয়ে গেল গরিব লোকদের মরা—শুকিয়ে, সর্দি গর্মিতে, কলেরায়।

এই দুর্যোগের মধ্যে একদিন সকালে ভুজন কাজ করতে এল না, আমার মন বলল এমন তো কখনো হয়নি। বস্তিতে থাকে, ওর-ও ত্রী সাংঘাতিক অসুখ হল না তো! ভয়ে ভয়ে রান্নাঘরে বসে টুটনো কুটছি, হঠাৎ যেন তাদের গলার একটা আওয়াজ শুনলুম! মনের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভুজন নয় তো? আবার শুনলুম তাদের গলার স্পষ্ট ডাক, "খোকী দিদি।" টুটনো কোটা ফেলে ফটকের বাইরে গিয়ে দেখি, কেউ নেই! বাড়ির ভেতর সব ঘরে খুঁজে দেখি, খুকু নেই! আমি আতঙ্কে উঠলুম, বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকল। উঠনে এসে দেখি খিড়কি দরজা হাট করে খোলা তাই দিয়ে ছুটে চাকরের ঘরে ঢুকে যা দেখলুম তাতে আমার দম আটকাবার যোগাড় হল! আমার অন্তর আত্মা শিউরে উঠল!

দেখলুম, ভুজন তার নোংরা বিছানায় শুয়ে, আর আমার নয়নের মণি, প্রাণের পুতুল খুকু কিনা তার মাথার কাছে ব'সে তাকে বাতাস করছে! কোনো সন্দেহ নেই ভুজনের কলেরা হয়েছে। ঘরের মেঝের এক কোনে নোংরা আর তার দুর্গন্ধ বার হয়েছে। তার এসব অসুখটি মাঝি বলেছে। ভুজনের চোখ দুটো কোটরে বসে গেছে। সে তেষ্টায় আর পায়ের জ্বালায় ছট ফট করছে আর কাতরাচ্ছে, "খোকী দিদি।" আর আমার খুকু কিনা তাকে মাঝে মাঝে জল খাওয়াচ্ছে পাখার বাতাস করছে আর কেবল বলছে "না ডর ভুজন। মাইজী আতি আরেসি।

আমাকে দেখেই খুকু চুকরে কেঁদে উঠে বললে, "মা! শিগগির ডাক্তার ডাক না হলে ভুজন মরে যাবে। আমি পাগলের মতন খুকুকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম, সে ভুজনের গলা ঝাঁকড়ে ধ'রে চিৎকার করে উঠল, 'মা! ডাক্তার ডাক!' তাকে নড়াতে পারলুম না। পাগলের মতন ছুটে গিয়ে সংক্রামক রোগের হাসপাতালে খবর দিলুম আমার বাড়ির চাকরের কলেরা হয়েছে শিগগির অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ক। আমার যে কী হচ্ছে লাগল তা আর এখন বলতে পারি না!

অ্যাম্বুলেন্স-ভ্যান এল। তার লোকেরা যখন ভুজনকে ষ্ট্রেচারে তুলতে গেল, ভুজন উঠবে না আর খুকু আবার তার গলা জড়িয়ে ধরলে, তাকে ছাড়বে না। ভুজন বলে হাসপাতালে গেলে সে মরে যাবে, আর খুকু আমাকে কেঁদে কেঁদে বলে, মা! ভুজনকে নিয়ে যেতে দিও না, ও তাহলে মরে যাবে।' আমি তখন খুকুকে বুঝিয়ে বললুম, ও হাসপাতালে গেলে ঠিক সেরে যাবে সেখানে ভাল ভাল ডাক্তার আছে। এখানে থাকলেই ও মরে যাবে। তখন খুকু ভুজনকে বুঝিয়ে বললে হাসপাতালে গেলেই সে সেরে যাবে! শেষে ভুজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাতরে বললে, 'হাঁ খোকী দিদি? আচ্ছি যাত।"

ভুজনকে তারা অ্যাম্বুলেন্স ভ্যানে তুললে। তাকে গাড়িতে তোলা পর্যন্ত খুকু তার হাত ছাড়লে না, আর ভুজন যে করুণ দৃষ্টিতে খুকুর দিকে চেয়ে রইল তা আমি জীবনে ভুলব না। হঠাৎ ভুজন বলে উঠল খোকী দিদি। হাম্ তোমহার সাথিয়ে আওয়র।" খুকু চুকরে কেঁদে উঠল। গাড়ি ছাড়ল। যতক্ষণ না গাড়ি চোখের আড়াল হল ভুজনের সেই করুণ দৃষ্টি খুকুর ওপর পড়ে রইল, আর খুকু কেঁদে কেঁদে দুহাত তুলে চেঁচাল "ভুজন—ও ভুজন! ভুজন—ও ভুজন! ভুজন—ও ভুজন!—

খুকুর কান্নাকাটি দেখে আমার বড় ভয় হল, কয়েক ঘণ্টা পরে ভুজন ভাল আছে এই খবর এনে তাকে শান্ত করতে পারব ভেবে আমি নিজেই হাসপাতালে গেলুম। গিয়ে শুনলুম ভুজন মারা

গেছে। মন বড় খারাপ হয়ে গেল মনে হল যেন কত আপন লোক চলে গেল! হাসপাতালের ডাক্তার বললেন স্যালাইন ইন্‌জেকশন দিয়ে ওর কলেরা তো বশে আনা হয়েছিল কিন্তু ওর হার্টিল বুক অবাধ্য দিল! অসুখের মধ্যে ও নিশ্চয় কোনো দরকারী কাজ কিছুক্ষণ ধরে করেছিল। জিজ্ঞাসা করলুম "ওকি কোনো নালিশ করেছিল?" 'না! শেষ পর্যন্ত শুধু কাতরে কাতরে ডেকেছে খোকী দিদি।" আমার চোখ জলে ভরে গেল!

পরের দিনে ভুজনের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় এল ওর মাইনে চুকিয়ে নিতে। সেও নিশাথগঞ্জে থাকত। সে খবর দিলে নিশাথগঞ্জে গুজব রটে গেছে, খাণ্ডারী-বউ-এ মিলে ভুজনকে বিষ খাইয়েছে। ঐ লোকটাই আবার বললে এ গুজব মিথ্যে, কিন্তু যা আসলে হয়েছিল তা আরো খারাপ। ভুজন রোজ সন্ধ্যেয় আমাদের বাড়িতে না খেয়ে, ভুজনের মতন খাবার নিয়ে বউ-এর কাছে যেত। কিন্তু ওর দজ্জাল গিন্নী সে সব খাবার ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মারে ঝিয়ে গিলত আর ভুজনকে দিত বাসী-পান্তা খেতে। তাতেও ভুজনের আপত্তি ছিল না, ও শুধু বউ-এর কাছে থাকতে পেলেই খুশী হত। কিন্তু নিশাথগঞ্জে কলেরার মড়ক এলে ঐ বাসী পান্তা খেয়েই ভোরের দিকে ভুজনের কলেরা হয়েছিল। ওর খাণ্ডারী তাই টের পেয়ে ওকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ির বার করে দিয়েছিল।

বুঝলুম অমন সাংঘাতিক অসুখের মধ্যে ঐ এক মাইল পথ অনেকক্ষণ ধরে কষ্ট করে হেঁটে আসার ফলেই ওর বুকের অবস্থা অত খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার চোখে জল এসে গেল ভেবে, তবু ও কারও নামে নালিশ করেনি, বা কাউকে শাপ দেয়নি, শুধু দেখতে চেয়েছিল একজনকে—সে তার "খোকী দিদি!"

* * * *

হাইড্ পার্কের এক বেঞ্চিতে এক ভদ্রলোককে সকাল বেলা বসে থাকতে দেখা গেল। শীতের কুয়াশা ভেদ করে তখন সবে একটু সূর্যালোক দেখা দিয়েছে।

হঠাৎ এক বৃদ্ধা তাঁর দিকে চেয়ে বললে: মশাই কি আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

—কি সাহায্য বলুন ত?

—আমার এই ব্যাগটা আমি আর বইতে পারছি না। আপনি যদি দয়া করে আমার এই ব্যাগটা নিয়ে গিয়ে একটা ভাড়াগাড়ীতে তুলে দেন।

ভদ্রলোক কি ভাবলেন, তারপর হাসমুখে বৃদ্ধার ব্যাগটি হাতে করে নিয়ে এগিয়ে চল্লেন। তখনি দেহরক্ষীরা ছুটে এল, তাঁর হাত থেকে ব্যাগটা নিতে চাইলে, বৃদ্ধার দিকে চেয়ে বলল, সর্বনাশ! কার হাতে ব্যাগ দিয়েছেন তা আপনি কি জানেন না? ইনি যে ইংলণ্ডেশ্বর। ব্যাপার দেখে বৃদ্ধা ত ভয়ে অস্থির।

ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড বললেন: মাজাও ত একজন ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের উপযুক্ত কাজ করেছি।

ব্যাপার যা চলছে

(মতামতের জন্য সম্পাদকীয় সম্পাদক দায়ী নন)

চক্রপাণি

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখেছিলাম, ভারতবর্ষ যেন একটা খোলা মাঠ অথবা বেওয়ারিস বাড়ী,—যারা ভারতবিরোধি কার্যকলাপে রত বা যারা গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত তাদের পক্ষে এদেশে অবাধে বিচরণ করার ও তথ্য সংগ্রহ করার কোন বাধা নেই।···দেখা যাচ্ছে আমাদের কথা ভিত্তিহীন নয়।···পাকিস্তানের গুপ্তচর-চক্র বহুদিন ধরেই গোপনে (?) তার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল, বর্তমানে তাদের গতিবিধি এবং কার্যকলাপ এমনি স্পষ্ট বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে তাদের সংবাদ আর চেপে রাখা যায়নি, পত্রিকায় পত্রিকায় ফলাও করে সেই সব সংবাদ ছাপা হয়েছে। আরে মশায়, এ তো বহুদিন ধরেই চলছে।···যদিও শাসনকর্তারা কী জানেন না, বা জানতেন না? জানতেন সবই। কিন্তু দৃঢ়হস্তে তাদের নিবৃত্ত করবার মতো সাহস তাঁদের নেই, তাঁরা যেন নির্বীর্য, নির্বিবেক, নিঃসহায়। একদিকে পাকিস্তানি গুপ্তচর, ওদিকে শেখ আবদুল্লা, অন্য (পাকিস্তান) প্রকাশ নারায়ন, ওদিকে পাদ্রী স্কট্! সরকার কাউকেই সামলাতে পারছেন না! কেউ কেউ সরকারকে সাবধান করে দিচ্ছেন, জানিয়ে দিচ্ছেন, চারিদিকে মেঘ ঘনাচ্ছে, তার উত্তরে সরকার, রবীন্দ্রনাথের রাজোরাণীর রাজা বিক্রমের মতো বলছেন :

"কোন দুঃখ নাই আমাদের
প্রজা সুখে আছে
রাজকার্য চলিছে অবাধে।
এ কেবল তুচ্ছ কথা লয়ে
দিল্লু বৃদ্ধ অমাত্যের অতি সাবধান।"

যারা জেগে ঘুমোয় তাদের জাগাবে কে?

• • • • •

যবে থেকে কালোবাজার আর মুনাফা-লুটেরাদের অত্যাচার সুরু হয়েছে (সে তো অনেকদিনই হয়েছে) তবে থেকে মাঝে মাঝে আমরা শাসকদের হুঙ্কার শুনছি—"কালোবাজারীরা হুঁসিয়ার। তাদের আমরা সাবেস্তা করবই, তাদের কখনই টিকতে দেব না।" ইত্যাদি।

শুনেই আসছি দিনের পর দিন। কালোবাজারীরা শোনে আর হাসে। তারা জানে নিজের গদী বজায় রাখবার জন্যে শাসকদের মাঝে মাঝে ঐ ধরণের লম্বা চওড়া কথা বলে প্রজাদের স্তোক দেওয়া দরকার। তাই তাঁরা কাগজে মাঝে মাঝে বুলি ছাড়েন। কিন্তু তাদের অঙ্গ স্পর্শ করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। মাঝে মাঝে দু'চারজনকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করা হয় বটে। কিন্তু সে-ও ওই লোক দেখানো ব্যাপার। আসল কথা, সহরে কারা কুকর্মে লিপ্ত তাদের খবর সরকারের দপ্তরে অজানা নয়; চোর পকেটমার গুণ্ডা থেকে সুরু করে মজুতদার কালোবাজারি সবাইকার কুলুজিই

সরকারের সোচ্চেষ্টা হওয়ার আছে। ইচ্ছে করলে একদিনেই এই সব কালোবাজারিদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। কিন্তু করবে কে?

• • • •

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হুঙ্কার ছেড়েছেন—"খাদ্যাপরাধীদের ক্ষমা নেই।"

তারপরেই তিনি যে স্বীকারোক্তি করেছেন তা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি আতঙ্কজনক। "সমাজদ্রোহী লোকেদের মধ্যে খাদ্যের বিষয়ে মুনাফা শিকারীরা নিকৃষ্টতম। ইহাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও, আশানুরূপ অবস্থার উন্নতি হয় নাই। ইহা আশঙ্কা করা হইতেছে যে, অসাধু ব্যবসায়ীরা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।"

বুঝুন ব্যাপার। ওদিকে মাথার ওপর চীন আর ডাইনে বাঁয়ে পাকিস্তান তো যুদ্ধ ঘোষণা করেই আছে, এদিকে ঘরের মধ্যে অসাধু ব্যবসায়ীরাও সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং অবস্থার উন্নতি হয়নি!!

• • • •

সরকারের চোখে ভারতবাসীদের জীবনের সর্বোচ্চ মূল্য কত জানেন? এক হাজার টাকা। কাহিনীটি এই: ভাগলপুরের একোজারি গ্রামের মহাদেব মণ্ডল রেলে কাজ করত। লোকটি চরিত্রে অদ্ভুত কর্তব্যজ্ঞান ছিল। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমনের সময় রেল লাইনের ধারে টহল দেবার সময় সে দেখতে পায় যে একস্থানে লাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে। সর্বনাশ কাণ্ড। এখনি তো ট্রেন আসবে এই লাইন দিয়ে। বলতে বলতেই দূরে ট্রেনের শব্দ! একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসছে এই দিকেই। মহাদেব ছুটতে শুরু করে দিল। যে কোনমতেই হোক ট্রেনকে থামাতে হবে। কিন্তু কি উপায়ে? মহাদেবের মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল! বাঁচাতেই হবে এতগুলো লোকের প্রাণ। ট্রেনবোঝাই শিশুবৃদ্ধ নরনারী। কিন্তু আর তো কোন উপায় নেই। তখন মহাদেব কি করল? সে ঝাঁপিয়ে পড়ল লাইনের ওপর। ড্রাইভার তাই দেখে শিউরে উঠে ব্রেক কষল। মহাদেবের উপর দিয়ে এঞ্জিনের চাকা চলে যাবার পর ট্রেন থামল। এবং কিছুক্ষণেই মর্মান্তিক প্রকৃত ঘটনা জানা গেল। জানা গেল একটি মানুষ তার প্রাণ দিয়ে এতগুলি লোকের জীবন রক্ষা করল। .....এই উপলক্ষ্যে ভাগলপুরের জেলা শাসক খুব ঘটা করে সভা করলেন। বক্তৃতা দিলেন। তাঁর নাম আর সেই ছেঁদো বক্তৃতা ফলাও করে কাগজে ছাপা হল। তারপর তিনি কী করলেন, না, মহাদেবের বিধবা স্ত্রীর হাতে এক হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিলেন। সরকারের অনেক টাকা বেঁচে গেল। মহাদেবের মতো একজন নগণ্য মানুষের জন্যে সরকার হাজার টাকা গ্রাস অনুষ্ঠানের জলুসের জন্যে আরও অনেক টাকা খরচ করে ফেলতেন—এ কী কম কথা!

আমরা কাগজে পড়েছি, অন্য একটি দেশে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল এবং সেখানকার সরকার সেই আত্ম-বিসর্জনকারী দরিদ্র শ্রমিকটির বিধবা স্ত্রী যাতে যাবজ্জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিল। শুধু তাই নয়। তাদের নাবালক পুত্রকন্যার ভরণপোষণের ও শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল এবং পুত্ররা বড় হলে যাতে সরকারী দপ্তরে উপযুক্ত কাজ পায় তারও বিধি ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কোন দেশে বা ভগবান নেই কিন্তু মানুষ আছে, আবার কোন দেশে বা ভগবান আছে, কিন্তু মানুষ নেই। ১৮.২.৬৫

এখনকার মানুষের মুখ্যতম অর্থাৎ একমাত্র কাম্য কি? না, টাকা। যে কোন রকমেই হোক টাকা কামাতে পারলেই হল। সেজন্যে ন্যায়নীতি চরিত্র—এসবের কোন বালাই যেন না থাকে—অর্থাৎ এদের খুঁড়ে যদি টাকা পাওয়া যায়—তাতে আমি নারাজ নই। শুধু তাই নয়—অর্থাৎ নিজের চরিত্র বিসর্জন দিয়েই নয়—দেশবাসীর সর্বনাশ করেও যদি টাকা পাই তাতেও আমি পিছপাও নই। মানুষকে কুপথে নিয়ে গিয়ে, মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, মানুষকে ধোঁকা দিয়ে, মানুষকে প্রলুব্ধ করে যদি আমি টাকা কামাতে পারি, সেটা তো আমার বিশেষ বাহাদুরি বলতে হবে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতিও যেন তাই। সংবাদ-পত্র এবং সংবাদ-সাহিত্যেও ওই বিষ ঢুকেছে। যৌনাপরাধের কাহিনী, বীভৎসরসের উত্তেজক সংবাদ—এরূপের মুখরোচক খাদ্য পরিবেশন করাটাই আজকালকার কয়েকটি সংবাদপত্রের বিশেষ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ তারা জানে, অপরিণত, অল্পবয়স্ক এবং বয়স্ক নরনারীরাও তাদের চরিত্রগত দুর্বলতা বশে এই সব কাহিনী সবচেয়ে বেশি আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। তার দ্বারা ক্ষতিটা হবে, বয়স্কদের তত নয় কারণ তারা তো সব পোড়খাওয়া নায়িক, ক্ষতি হবে অল্পবয়সী ছেলে মেয়েদের! কিন্তু ওসব ভাবতে গেলে কি আমাদের চলে—আমাদের কাগজের বিক্রি বাড়াতে হবে না? শিকেয় তুলে রাখুন আপনার ধর্মজ্ঞান। সাহিত্যের প্রচারক যে সব প্রকাশক, তারাও অনেকে এই পথ ধরেছেন—পাঠকদের কে কত বেশি প্রলুব্ধ করতে পারেন তারই প্রতিযোগিতা চলছে। কী অশ্লীল সব বই বেরুচ্ছে—আর তাদের কী চটকদার বিজ্ঞাপন। আইন আছে, অশ্লীল বিজ্ঞাপন দেওয়া অপরাধ! আচ্ছা, অশ্লীল বা আপত্তিকর বা দোষাবহ বলতে কী বুঝবো?—যা মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করে, যা মানুষকে প্রলুব্ধ করে তা কি আপত্তিকর বলে গণ্য হবে না? তা যদি হয় তাহলে নীচেকার বিজ্ঞাপনটি পড়ুন। এক ছদ্মনামী লেখকের একটি বই সম্বন্ধে এক প্রকাশক এই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন:—

সভ্যতার নিওন আলোর আড়ালে
অন্ধকারের তারা নায়িকা,
তারা দেশবিদেশের কামনারাজ্যে
নাইট ক্লাব, ক্যাবারে, ব্রথেলে
দেহপসারিণী।
কলাবিলাসিনী প্যারিস থেকে
মধ্যপ্রাচ্যের রোমাঞ্চকর ঘুঘও ঘুড়ে
লালসার পঙ্কিল আবর্তে
পাপের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য।
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ।

বিজ্ঞাপনটি একটু তলিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে যে এক লাম্পট্য-লালসা-পঙ্কিলচরিত্র ব্যক্তি (তাকে লেখক বা সাহিত্যিক বলতে বাধছে) তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছে—দেশবিদেশের কামনা রাজ্যের দেহপসারিণী নায়িকাদের নিয়ে লালসার পঙ্কিল আবর্তে পাপের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে যেসব অঘন্য কাণ্ড লেখক প্রত্যক্ষ করেছে বা সেই সব কাণ্ডে অংশ নিয়েছে তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী ছ'টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে। এবং খুব সম্ভবত প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। এই যে বিজ্ঞাপন, অঘন্য পর্নোগ্রাফির

বইএর বিজ্ঞাপনও এর চেয়ে আপত্তিকর হতে পারতো না। অথচ এক প্রকাশক এই নাকারজনক বিজ্ঞাপনও ছেপেছে সর্বাধিক প্রচারিত এক সাপ্তাহিকে। অশ্লীল বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং তাকে ছাপা—দুইই কি সমান নিন্দনীয় নয়? অন্য দেশ হলে এতক্ষণে ওই প্রকাশক, লেখক এবং পত্রিকার মুদ্রাকর তিনজনকেই আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হত। এই বিষয়ে নজর রাখবার জন্যে লালবাজারে একটি বিভাগ আছে বলে শুনেছি। আমরা উক্ত বিজ্ঞাপনটির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এরূপ বিজ্ঞাপনের প্রচলন, এরূপ বই-এর প্রচার কঠোর হাতে দমন করা উচিৎ।

• • • •

কিছুকালের মধ্যে বাঙলা ভাষার চেহারা যে কী রকম বদলে যাবে তার কিছু নিদর্শন দেবার চেষ্টা করেছি গত সংখ্যায়! এসম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যে কী অদ্ভুত দূরদৃষ্টি ছিল সম্প্রতি তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর লেখা একটি কবিতায়। কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন রহস্য ছলে—কৌতুক করে। কিন্তু সেই রহস্য আর কৌতুকের মধ্যে যে লুকিয়ে ছিল তাঁর দিব্যদর্শন তা কে জানতো। ১৮৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন পুরীতে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিছুদিন দু'জনে একসঙ্গে থাকবার পর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর এই চলে আসায় ক্ষোভ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এক পদ্য-পত্র লেখেন। পত্রটি এই :—

কলকাতাতে চলা গয়ো যে
সুরেন বাবু মেরা
সুরেনবাবু আসল বাবু
সকল বাবুর সেরা।
প্রবাসকো এক সীমাপর হম
বৈঠকে আছি একলা—
সুরি বাবুকো বাতে আঁখসে
বহৎপানি নেকলা।
সর্বদা মন কেমন করতা
কেঁদে উঠতা হির্দয়
ভাত খাতা, ইস্কুল যাতা
সুরেনবাবু নির্দয়।

মনকা দুঃখে হু হু করকে
নিকলে হিন্দুস্থানী—
অসম্পূর্ণ ঠেকতা কানে
বাংলা কো জবানী।
তুম ছাড়া কোই সমজে নাতো
হমরা দুরবস্থা
বহিন তেরি বহুৎ Merry
খিল খিল করে হাস্যা।
চিট্টি লিখিও মাকে দিও
বহুৎ বহুৎ সেলাম।
আজকের মত তবে বাবা
বিদায় হোকে গেলাম॥

• • • •

ভেজাল সরষের তেল খেয়ে দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাট শহরে দুই ব্যক্তি ঘুসী এবং শোথ রোগে মারা গেছে। মারা গেছে মাত্র দু'জন—তাদের খবর বেরুলো। আধমরা হোয়ে যারা ঘুঁকছে তাদের খবর বেরোয়নি। সংখ্যায় তারা অনেক। এই ধরুন না কেন, আমার বাড়িতে, পাড়ায় অনেকেই তো ঘুসী আর শোথ রোগে ভুগছে। তামাম জাতটাকেই তো ঘুসীতে ধরেছে।

• • • •

কলকাতায় তীব্র জলকষ্ট। সকাল বেলায় প্রত্যহ দেখছি রাস্তার কলে বিরাট লাইন। পাড়া প্রতিবেশীর বালতি হাতে ছুটোছুটি। কলকাতায় পৌরসভার দায়িত্ব আছে, নাগরিকদের

কাছে ট্যাকসর বদলে জল দেবার। কিন্তু গৌরবাবাদের দাহরক্ষার কী রকম প্রথর তার এক সংবাদ সম্প্রতি বেরিয়েছে। কয়েকদিন আগে কোরামের অভাবে জলসংরোধ কমিটির সভা হয়নি —অথচ এই সভায় জলের জন্যে কলকাতার দাহকার সম্পর্কে আলোচনার কথা ছিল—বিষয়টি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাতে আর সন্দেহ কী! কিন্তু সভার চেয়ারম্যান সহেত সদস্যরা আসেননি। তাঁরা সে সময় দুর্গাপুর বন্ধলিখে বেহালা বাজারের জন্যে কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন।

• • • •

গত সংখ্যায় ভারতের অভ্যন্তরে চীনা গুপ্তচরবৃত্তির ব্যাপার যা চলছে সে সম্বন্ধে কিছু কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছি। এসংখ্যায় আর একটি সংবাদ জানাচ্ছি।

বিশ্বাস করতে পারেন, চীনা ফৌজের এক বড় অফিসারের ছোট ভাই আমাদের দেশের সেনানায়কদের চীনাভাষা শেখাবার কাজে নিযুক্ত হয়েছে এবং সে ব্যক্তি আর তার সুন্দরী স্ত্রী উভয়ে মিলে অবাধে আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্যাবলী সহজেই সংগ্রহ করতে পারছে?

ট্যান চাং এবং তার স্ত্রী দুজনেই কমুনিষ্ট চীনের প্রজা। তারা চীনের কমুনিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পেয়েছে এবং তারপর বিদেশের গুপ্তচর পদের কাজ নিয়েছে। ১৯৫৮ সালে এই চীনা দম্পতী ভারতে আসে কমুনিষ্ট পাসপোর্ট নিয়ে।

ট্যান চাং-এর পিতা ট্যান ইয়ান সাং শান্তিনিকেতনের চীনাভবনের অধ্যক্ষ। সুতরাং ট্যান চাং-এর পোয়া বারো। এমন কি পণ্ডিত নেহরুর কাছেও তার প্রবেশাধিকার ছিল।

ট্যান চাং কাজ জোগাড় করলে। যা তা কাজ নয়—পুনার অন্তর্গত খড়কোয়াসলার জাতীয় প্রতিরক্ষা আকাদেমির শিক্ষক! সেখানে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর বহু উচুপদের অফিসারদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ট্যান চাং তাদের চীনা ভাষা শেখাতে লাগল। সঙ্গে তার রূপসী স্ত্রী। কী খাতির তাদের! সব কাজেই তারা হাজির। এমন কি অফিসরদের স্ত্রীদের রান্নাঘরে ঢুকে ট্যান চাং-এর স্ত্রী চীনা রান্না করা পর্যন্ত শেখাতে লাগল।

ওদিকে তখন চীনাদের মুখে "হিন্দি চিনি ভাই ভাই"-এর কপট বুলি আর এদিকে তারই সুযোগ নিয়ে এই চীনা দম্পতি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের দেশে পাঠাচ্ছে।

১৯৬৯ সালে ট্যান চাং প্রতিরক্ষা বিভাগের দিল্লীর বিদেশী ভাষা শিক্ষালয়ে নিযুক্ত হল। এখানে তার ছাত্র হল স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনীর অফিসরবৃন্দ, তাছাড়া বেতার এবং রাজস্ব বিভাগের বড় বড় কর্মচারী। ট্যান চাং এবং তার স্ত্রী দু'জনেই খুব তৎপরতার সঙ্গে তাদের কাজ করতে লাগল। চীনাভাষায় লেখা গুপ্ত দলিল ভারতসরকারের হাতে আসতে লাগল তাদের তর্জমা করবার ভার দেওয়া হল এই চীনা দম্পতীকে অর্থাৎ এক কথায় ভারতীয় সামরিক গুপ্ত বিভাগের কোন গুহ্য তথ্যই এই চীনা দম্পতীর কাছে গুপ্ত রইল না।

তারপর ১৯৬৩ সালে পার্লামেন্টে মেকা-বিতর্কের সময় বিরোধীদলের চাপে ট্যান চাংকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হল ভারত সরকার। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! সঙ্গে সঙ্গে সে ভারতীয় বেতারে কাজ পেয়ে গেল। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিরোধীপক্ষের সরব আপত্তিতে তাকে বেতারে রাখা গেল না। যাই হোক, সরকার যাকে রাখবেই তাকে ঠেকাবে কে। ট্যান চাংকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা বিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে সেই পদেই সে বহাল আছে।

প্রশ্ন উঠেছে যে ব্যক্তিকে বিশেষ কারণে সরকারী কাজ থেকে সরানো হয়েছে তাকে কোন্ অজুহাতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কাজ দিলেন। শুধু তাই নয়, যে ব্যক্তি নকলপক্ষের পাসপোর্ট নিয়ে এদেশে এসেছিল তাকে এখনো সেই পাসপোর্টে এদেশে থাকতেই বা দেওয়া হয়েছে কেন?

কিন্তু কে দেবে উত্তর?

• • • •

অন্য কোন সংবাদ-পত্র বা সাময়িক পত্রে বেরোয়নি এমন একটি ব্যাপার নয়া দিল্লীর এক ইংরাজী সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের নিউ দিল্লীর সংবাদদাতা আইভর কোল্ সংবাদটি তাঁর সাপ্তাহিক সমীক্ষায় বিবৃত করেছেন। তাঁর বিবৃতিতে প্রকাশ লণ্ডনের ২২৫ নং অ্যাসন রোড থেকে গুরুচরণ দাস নামে এক ভারতীয় ভদ্রলোক ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এক পত্র লিখে প্রশ্ন করেছেন, ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির বন্যার মুখে ভারতবর্ষের সংহতি আর কতদিন বজায় থাকবে? এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কি অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়? এই প্রশ্নের পর উক্ত ভারতীয় ভদ্রলোক তাঁর কয়েক দফা অভিযোগ পেশ করেছেন। যথা—

(১) ভারতের মধ্যে প্রায় এক কোটি সরকারী কর্মচারী এবং রাজনৈতিক চাঁই নানা দুর্নীতিতে লিপ্ত। তাদের প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যে এযাবৎ কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়নি।

(২) এমন কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারি লাল নন্দের সঙ্গে যারা দেখা করতে যান তাঁদের প্রত্যেককে সাক্ষাৎ—দপ্তরের কর্মচারীকে (যারা এই সব সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে) এক টাকা করে দক্ষিণা (!) দিতে হয়।

(৩) এই সব সাক্ষাৎকারীদের নাড়ী নক্ষত্র জানার পর তবে তাদের নন্দজীর কাছে পাঠানো হয়। যারা কোন বিশেষ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাতে আসে অনেক সময়েই তাদের নন্দজীর কাছে যেতে দেওয়া হয় না।

(৪) সরকারী পরিকল্পনার কাজে নীতির চেয়ে ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বেশী।

(৫) অনেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং ওই ধরণের কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সাক্ষ্য প্রমাণ থাকলেও তাঁদের প্রতিপত্তির জোরে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে না।

উপসংহারে উক্ত পত্র লেখক বলেছেন যে ভারত রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক কোন খবরই বিদেশে অজানা থাকছে না। এবং বর্তমানে ভারতের রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির জগতে যে ব্যাপার চলছে তা ভারতকে বিদেশের কাছে হেয় এবং হাস্যাস্পদ করে তুলেছে।

• • • •

বিদেশে গিয়ে সেই দেশের ভাষা কিছুটা অন্তত রপ্ত না করলে পথে ঘাটে সিনেমা রেস্তোরাঁয় যে কী রকম বিড়ম্বনা ঘটতে পারে তার একটি মুখরোচক গল্প শুনিয়েছেন, চিত্র পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়। কিছুদিন আগে তিনি ভারতীয় সিনেমাশিল্পের প্রতিনিধিরূপে ফরাসীদেশে গিয়েছিলেন। এক বান্ধবীকে নিয়ে একদিন এক রেঁস্তোরাঁয় খেতে গেছেন। দু'জনের কেউই ফরাসী ভাষা জানেন না। ওয়েট্রেস লম্বা চওড়া মেনুকার্ড এনে সামনে ধরেছে। প্রভাতবাবু নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে বান্ধবীকেই খাবার অর্ডার দিতে বললেন। বান্ধবীর অবস্থাও তদ্রূপ। বললেন, শরীর ভাল নেই, তিনি শুধু সূপ খাবেন। প্রভাতবাবুও চালাক লোক বললেন, তিনি শুধু মিষ্টি খাবেন। এখন উভয়েরই ধারণা যে,

সব জায়গাতেই যেমন মেন্যুর প্রথমে থাকে সুপ আর শেষে থাকে মিষ্টি এই মেন্যুতেও তাই আছে। সেটাই সভ্য জগতের প্রচলিত রীতি। সেই অনুসারে প্রভাতবাবুর বান্ধবী ওয়েট্রেসকে বললেন, মেন্যুলিষ্টের প্রথমটা তিনি খাবেন, শেষেরটা খাবেন প্রভাতবাবু। শুনে ওয়েট্রেস-মেয়েটি তো হেসে অস্থির। বান্ধবী উত্তেজিত হলেন। এতে হাসবার কী আছে? ম্যানেজার এলো। শুনে সেও হাসতে লাগল। প্রভাতবাবু তখন চটে ম'টে পকেটে যত পয়সা ছিল সব বার করে টেবিলের ওপর রেখে বাংলাতেই বলে উঠলেন, যা পয়সা লাগে দেব—ওই দুটো জিনিষ আমাদের চাই। ব্যাপারটা অন্য টেবিলেও চাউর হল। হাসাহাসি পড়ে গেল। কোনের টেবিলে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ। তিনি উঠে এসে ইংরাজীতে বললেন—"সাহায্য করতে পারি?" প্রভাতবাবু মেন্যুকার্ড দেখিয়ে বললেন, প্রথমটা তাঁর সঙ্গিনীর চাই, শেষটা চাই তাঁর। যত পয়সা লাগে তিনি তা দিতে রাজী। শুনে বৃদ্ধ হতচকিয়ে গেলেন, তারপর বললেন, "এ দুটো জিনিষ নিয়ে কি করবেন?" প্রভাতবাবু বললেন—"তাও বলতে হবে? খাব।"

ভদ্রলোক আবার থতমত। আমতা আমতা করে বললেন—খাবেন?

—হ্যাঁ খাব।

বৃদ্ধ তো অবাক। —কোথায় দেশ আপনার?

প্রভাতবাবু চটে গেলেন। খেতে এসেছেন রেস্তোরাঁয় পয়সা দিয়ে খাবেন, তার জন্যে এত কৈফিয়ৎ কিসের। এদিকে ভীড় জমে যাচ্ছে। প্রভাতবাবু জবাব দিলেন —এত কথায় দরকার কি? পছন্দ হয়েছে, আমাদের চাই।

— পাবেন না।

— পাবো না কেন?

ভদ্রলোক বললেন—আপনার সঙ্গিনীর যেটি পছন্দ সেটি হচ্ছে ম্যানেজার। আর আপনার যেটি পছন্দ, সেটি হচ্ছে ওই ওয়েট্রেস। গল্প করতে চান, আসুন কথা। খাওয়া চলবেনা।

• • • •

এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় হিন্দি শেখানোর নমুনা দেওয়া হয়েছে :—

দশরথের চার ছেলে—
　　দশরথকা চৌথাচ্চা।
Sandwitch—
　　বালুকা মাধাবী।
All India Lawn Tennis Associaion—
অখিল ভারত ঘেত্তুয়া খেলনেকা খানিয়া সমিতি।

আশা করি Vanity Bag এর হিন্দি (ছুটানিকা ডিব্বা) সবাইকার মনে আছে।

সেই মত উপরের হিন্দিগুলিও চমৎকার।

———

অন্তরীক্ষে

মোদের গরব মোদের আশা

অন্তরীক্ষে

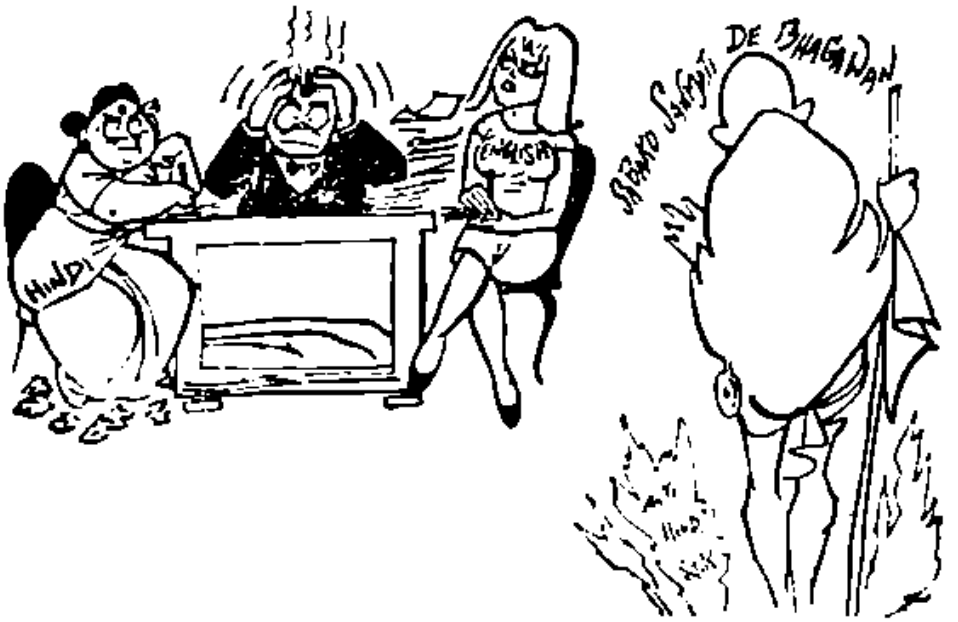

[ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সৌজন্যে

"PROBLEM OF EDUCATION"

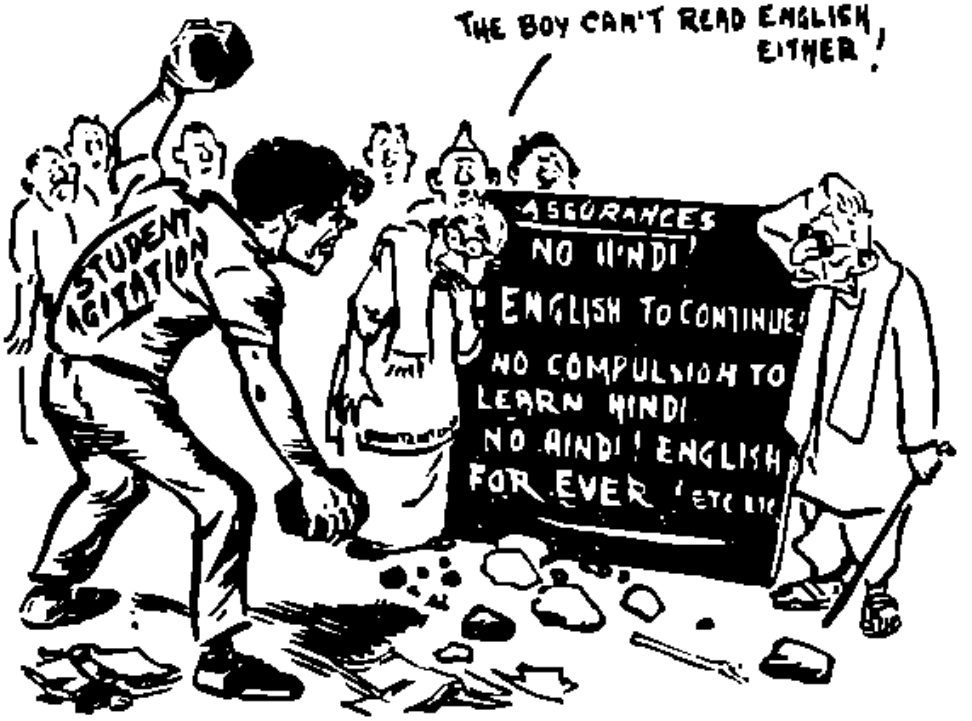

[টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে

দ্বীপান্তরের যাত্রী

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

গত একমাসের আশ্রয় ছেড়ে হিমাদ্রি পথে বার হয়ে পড়ে। তবে এবার একেবারে একলা নয়, বিশ্বস্ত সহকর্মী সীতাপতি রয়েছে সাথে। শহরের সীমানা পিছনে ফেলে রেখে দুজনে হিলকার্ট রোড ধরে উত্তরের দিকে চলা সুরু করে। কৃষ্ণপক্ষের রাত, চাঁদ উঠতে অনেক দেরী আছে। চারিদিক অন্ধকারের ঘন কালো যবনিকায় ঢাকা। হিমালয়ের উদার পটভূমিও যেন সেই আঁধারে লেপে মুছে গিয়েছে। পর্বতমালার শীর্ষদেশে যেখানে আকাশ ছুঁয়েছে শুধু সেই রেখাটি পরিচিত চোখে ধরা পড়ে। আর তার কিছু নীচে দেখা যায় কার্শিয়ং শহরের লাভণ্যবাড়ী রোডের বিদ্যুতিক দীপালোক মালা। চারিদিক নিস্তব্ধ, নির্জন। পথে শুধু ওরা দুজন। পরিচিত পথঘাট, মাঠ, টিলা নদীর বাঁক অন্ধকারে ঠাওর করে ওরা অগ্রসর হয়। হাতে টর্চ থাকলেও নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করে না। যদি কোথাও পুলিশের গুপ্তচর লুকিয়ে বসে থাকে তবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার আশঙ্কা আছে। পরাধীন দেশে রাজ-বিদ্রোহী, মাথার উপরে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে চলেছে তারা। তাই ত' অন্ধকারেই তাদের যাত্রা, বিপদের সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্ত্তে তাদের পথের সঙ্গী।

রহস্যময় যাত্রা সেই পরিবেশে আরো রহস্যজনক হয়ে ওঠে। সীতাপতির পক্ষে এই অভিজ্ঞতা একেবারে নতুন। সে মৃদুস্বরে বলে 'সেই গানটির কথা মনে পড়ছে, দুর্গম গিরিকান্তার মরু, দুস্তর পারাবার। ইচ্ছে হয় গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠি।' হিমাদ্রি বলে 'তাহলে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে কারা যাচ্ছে।' সীতাপতি গুণগুণ করে যে সুর ধরেছিল তা বন্ধ করে। হিমাদ্রি বলে 'তোমাকে দোষ দিই না। আমিত' আগেও এই নির্জন পথে রাতে যাতায়াত করেছি। তখন মনে ছিল শুধু রোম্যাটিক কল্পনা আর আজ সত্যি এক দুঃসাহসিক অভিযানে ব্রতী হতে চলেছি। কানে যেন সেই অনুভূতির স্পন্দন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।'

এমনি টুকরো টুকরো কথাবার্তায় দীর্ঘপথ অতিবাহিত হয়ে যায়। নীলকান্তদের গ্রামে যাওয়ার পথটি বড় রাস্তা ছেড়ে গভীর বনের মধ্য দিয়ে বাঁদিকে চলে গেছে। আগের ব্যবস্থা মত কথা ছিল যে সে পথের মোড়ে লণ্ঠন নিয়ে অপেক্ষা করবে। ওরা দুজন মোড়ের কাছে যেতে সে লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসে। হিমাদ্রি পাহাড়ীদের মত বেশ ধারণ করে এসেছে। নীলকান্ত প্রথমে তাকে চিনতে পারে না। তাই হিমাদ্রি পূর্ব নির্দিষ্ট সাঙ্কেতিক কথাটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সে সচকিত হয়ে ওঠে। ভালভাবে লক্ষ্য করার পর তাকে চিনতে পেরে তার বিস্ময়ের সীমা থাকেনা। বিস্ময়ের প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে যাওয়ার পর সে বলে 'হিমাদ্রি দা! এই বেশ নিয়ে ভালই করেছেন। গ্রামে এই বেশেই আপনাকে থাকতে হবে।'

গভীর বনের মধ্য দিয়ে পথ চলতে গা ছমছম করে। একটানা একটা ঝিমঝিম শব্দ শোনা যায়। নিশাচর পাখীর আওয়াজ মাঝে মাঝে কানে আসে। হিংস্র জন্তুর সাথে দেখা হয়ে যাওয়াটা বিচিত্র নয় এই পথে।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ওরা কুটিরের মধ্যে বাঁশের মাচানের উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে পাশাপাশি শুয়ে পড়ে। নীলকান্ত ব্যবস্থা করেছে যে ভোর হতে না হতে সীতাপতি তার সাইকেল নিয়ে সহরে ফিরে যাবে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে হিমাদ্রি সীতাপতিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রাখে। কলকাতার সমিতির গোপন কেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝে লোকমারফত চিঠিপত্র আসবে। হিমাদ্রির ব্যবহারমত বার্তাবহ আসবে সীতাপতির কাছে। পরে নীলকান্ত শহরে গেলে সে সব নিয়ে আসবে। সংবাদপত্র আনার ব্যবস্থা করতে হবে সেই সাথে। সীতাপতি যেন সব কিছু গুছিয়ে রাখে। সে নিজে কখনও গ্রামে আসবেনা কেন না পুলিশের পক্ষ থেকে হয়ত তার উপরে সন্দেহ হতে পারে। নীলকান্তই সপ্তাহে দুই দিন নির্দিষ্ট সময়ে তার কাছে যাবে।

নীলকান্ত আগের রাত্রে তার বেশ সম্বন্ধে যে কথা বলেছিল তার তাৎপর্য হিমাদ্রি উপলব্ধি করে পরের দিন সকালে। গ্রামে আত্মগোপন করে থাকার ধারণা একেবারে আলাদা। প্রকৃতির তাগিদ মেটাতে যেতে হবে কুটির থেকে অনেক দূরের মাঠে। স্নান করতে যেতে হবে নদীতে। গ্রামে নতুন লোক এসেছে সে কথা জানাজানি হয়ে যাবে অল্পকালের মধ্যেই। পথে লোকজনের সাথে দেখা হয়ে যাওয়াটা অনিবার্য। তাই তাকে এখানে থাকতে হবে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে। সে যে আত্মগোপন করে রয়েছে তার বিন্দুমাত্র আভাষ যেন কেউ না পায়। মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলের স্বাভাবিক বেশ এখানে একেবারেই বে-মানান অথচ রাজবংশী কৃষকদের মত লেংটি পরে তার চেহারার বৈশিষ্ট্য লুকানো যাবে না।

নীলকান্ত বলে যে পাহাড়ী লোকেরা মাঝে মাঝে নানা কাজে এখানে এসে থাকে। মেচীনদীর ওপারে নেপাল তরাইতে তার বাবার কিছু জমি আছে। সেখান থেকেও লোকজন আসে। সুতরাং সেই পরিচয় থাকাটা কারুর চোখে অস্বাভাবিক বলে ঠেকবে না।

সৌভাগ্যক্রমে হিমাদ্রির চেহারায় পাহাড়ীদের সঙ্গে বেশ মিল আছে। সেদিক থেকে কোন অসুবিধা হয় না। অনভ্যস্ত জীবন কয়েকদিনেই অভ্যস্ত হয়ে আসে। শহরের সেই দরিদ্র বস্তীর আশ্রয়ের তুলনায় এখানে জীবন বন্ধনহীন। সেখানে সারাদিন অন্ধকার ঘরের কোণে বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছে। এখানে প্রকৃতির অকৃপণ স্নেহের দাক্ষিণ্য। কুটিরের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় কলনাদিনী গিরিনন্দিনীর তীর পর্যন্ত প্রসারিত সোনালী ধানে ভরা মাঠ। নদীর ওপারে শ্যামল বনরাজি আর তার মাথার উপরে আত্মপ্রকাশ করে আছে নীল পাহাড়ের শ্রেণী। মনে হয় যেন নীল সাগরের একটা অতিকায় তরঙ্গ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ার আগে জমাট বেঁধে পাথরে পরিণত হয়ে গেছে।

কিন্তু অসুবিধা সৃষ্টি হয় নীলকান্তর বাবার দিক থেকে। হিমাদ্রি তাঁর পূর্ব-পরিচিত, আগে কয়েকবার এসে এখানে থেকে গেছে। তাই নীলকান্তর পক্ষে তাঁর কাছে হিমাদ্রির এভাবে উপস্থিতির কারণ সম্বন্ধে আভাষ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বৃদ্ধ ছেলের কথায় আপত্তি না করলেও মনে মনে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ভীতিও আছে সেই সাথে। একদিন হিমাদ্রির সাথে কথায় কথায় তিনি মনোভাব প্রকাশ করে ফেলে, বলেন 'এতবড় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট, তার বিরুদ্ধে আপনারা কয়টি ছেলে কি করতে পারেন? শুধু শুধু নিজেরা ত' মরবেনই, আমাদের উপরও বিপদ ডেকে আনবেন।' হিমাদ্রি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে কিন্তু বিশেষ ফল হয় না। সে বুঝতে পারে যে এখানে বেশীদিন ঠাঁই হবে না, নীলকান্তকে বলে অন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে। নীলকান্ত বলে 'বাবার তত স্বদেশী আন্দোলনের

উপর একটু সহানুভূতি আছে। কিন্তু অন্যেরা অহিংস আন্দোলনের সাথে কোন রকম সংস্রব রাখতেই ভয় পায়। আপনি বিপ্লবী দলের লোক বলে এতটুকু আভাষ পেলে কেউ ঘরে কাছে ঘেঁষতে রাজী হবে না।'

নীলকান্তর মনেও রোমান্টিক স্বপ্নের প্রভাব কম নয় তবু সে কৃষকের ঘরের ছেলে। কৃষকদের মনোভাবের সাথে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সে বলে যে তাদের মনের আঁধার কাটতে অনেক সময় নেবে। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের সক্রিয় ভাবে টেনে আনার আগে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে সহিষ্ণু পরিশ্রম আর দীর্ঘদিনের সাহচর্যে। অদূর ভবিষ্যতে কোন জঙ্গী কার্যকলাপে তাদের টেনে আনা দূরের কথা, সমর্থনও পাওয়ার আশা নেই।

নীলকান্তর কথা শুনে হিমাদ্রি হতাশ হয়ে পড়ে কিন্তু তার যুক্তি খণ্ডন করতে পারে না। ভেবে দেখে যে কিছুদিন আগেও সে নিজে এই ধরণের চিন্তাই করেছে। তারপর অবশ্য অন্য সহকর্মীদের রোমান্টিক আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। যে দুঃসাহসী পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে তার অবাস্তবতা ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে গুপ্ত আক্রমণ চালাতে হলেও গ্রামের মানুষদের সহযোগিতা প্রয়োজন। যা অবশ্য দেখা যাচ্ছে তাতে সে সহযোগিতা দূরে থাক, এখানে বহিরাগত অন্য কর্মীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হওয়াই দুঃসাধ্য, তাকে নিজেকেই শীগ্‌গির কঠিন সমস্যায় পড়তে হবে।

এদিকে সংবাদ পত্রে বিপ্লবীদের কয়েকটি কার্যকলাপের খবর দেখে তার সন্দেহ হয় যে তাদের সমিতিও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ করেছে। অথচ এই ধরণের বিচ্ছিন্ন কার্যকলাপের ফলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে যে পাল্টা আক্রমণ সুরু হবে তাতে তাদের মূল কর্মসূচী বানচাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ইতিমধ্যে সমিতির বার্তাবহ দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে আসে। পুলিশ অতর্কিতে তাদের একটি গোপন আস্তানার হানা দিয়ে জঙ্গী বিভাগের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্রও ধরা পড়েছে তাঁদের সাথে। পুলিশের আবির্ভাব এমনই অকস্মাৎ হয় যে কর্মীরা আত্মরক্ষার কোন সুযোগ পাননি। হিমাদ্রির ধারণা হয় যে পুলিশ নিশ্চয়ই তাদের গোপন সংগঠনের সূত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর পেয়েছে নতুবা ঐ বিশেষ আস্তানাটিতে হানা দেওয়া সম্ভব ছিল না।

এদিকে হিমাদ্রির নিজের সামনেও আশু সমস্যা খুব জটিল হয়ে ওঠে। নীলকান্তর বাবা যে তার উপস্থিতি পছন্দ করছেন না তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই গ্রামে সে রয়েছে প্রায় মাসখানেক হয়ে। কে জানে হয়ত গ্রামের কোন লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে কিনা। পাহাড়ী মানুষ, মেচী নদীর ওপারের ক্ষেতখামার ছেড়ে এতদিন ধরে বসে আছে কি কারণে। পুলিশের গোপন জাল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে তাই বা কে জানে! নীলকান্ত বলে যে সে দুই একজন অচেনা শহুরে মানুষকে সন্দেহজনকভাবে গ্রামে যাতায়াত করতে দেখেছে।

সে স্থির করে যে নিরাপত্তার জন্য অবিলম্বে এই আশ্রয় ছেড়ে যেখানে হোক যাওয়া প্রয়োজন। নীলকান্ত বলে যে আপাতত একটা ব্যবস্থা হতে পারে পাশের গ্রামে তার বন্ধু ভুঁইচাষীর ঘরে। সেও হিমাদ্রির একজন অনুরাগী ভক্ত। কিন্তু তারা বড় গরীব, একবেলা কোনমতে খাওয়া

ঘোরে। সেখানে বড় কষ্ট হবে। হিমাদ্রি বলে 'কষ্ট হলেও সইতে হবে, কিন্তু এখানে আর দেরী করাটা আদৌ নিরাপদ হবে না।'

সেইদিনই সন্ধ্যায় নীলকান্ত তাকে ভুঁইচালুদের ঘরে পৌঁছে দেয়। ঘর বলতে একটি জীর্ণ কুটির আর উঠোনের একপাশে একটি চালাঘর। চালাঘরটির তিনদিকে বাঁশের বেড়া, একদিক খোলা। ভিতরে এককোণে স্তূপীকৃত পাটকাটির বোঝা আর এক কোণে প্রায় চালের কাছাকাছি বাঁশের তৈরী মাচান। মই বেয়ে মাচানে উঠতে হয়। সেটাই হবে হিমাদ্রির শয্যা এবং বাসস্থান। ভুঁইচালুর ঘরে স্ত্রী এবং দুটি শিশু রয়েছে। তাই এই ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। ভুঁইচালু যেন নিজেকে সেজন্য অত্যন্ত অপরাধী বোধ করে। হিমাদ্রি তাকে প্রবোধ দিয়ে বলে যে এইটুকু ঠাঁই মেলাইত' কঠিন। তবু ভুঁইচালুর মন মানে না। সে হিমাদ্রিকে একলা ওখানে থাকতে দেবে না। মাচানের নীচে খড়ির খাটিয়া বিছিয়ে নিজের শোয়ার ব্যবস্থা করে।

কুটিরটি গ্রামের একপ্রান্তে, চালাঘরের পিছনেই জোপকাড়, তারপরে নদী। নদীর ঠিক ওপারেই বন। সেখান থেকে ঘরে আসে কনকনে ঠাণ্ডা হাড় কাঁপানো হাওয়া। মাচানের উপর ভুঁইচালু পুরু করে খড় বিছিয়ে দিয়েছে। খড়ের উপরে একখানা কম্বল পেতে আর একটা কম্বল দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে হিমাদ্রি শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে তার খেয়াল হয় যে বন থেকে হিংস্র জন্তুর আগমন হওয়াটা অসম্ভব নয়। রয়েল বেঙ্গলের স্বগোত্র বড় বড় বাঘ আছে এদিকের বনে। ভুঁইচালু নীচে শুয়ে, বিপদটা তারই বেশী। সে ভুঁইচালুকে মাচানের উপরে উঠে আসতে বলে। ভুঁইচালু সে কথাকে আদৌ আমল দেয় না, বলে 'এদিককার বাঘত মানুষখেকো নয়। আমার ঘরে যখন গরুবাছুর নেই, তখন বাঘ আসবে কেন! আর যদি নেহাৎ এসেই পড়ে আমি তাকে ঠিক শায়েস্তা করতে পারবো। আপনার কোন ভয় নেই।'

ভূমিহীন কৃষকের দুঃখ কষ্টের জীবনের সাথে হিমাদ্রির অন্তরঙ্গ পরিচয় সুরু হয় প্রথম দিন থেকেই। সকালে ভুঁইচালুর বৌ একটা বাটিতে চালভাজা আর গুড় চিনিবিহীন একপাত্র চায়ের জল হিমাদ্রির সামনে এনে দিয়ে বলে 'গরীবের বাড়ীতে কষ্ট হবে আপনার। কিন্তু এর বেশী আর কি দিতে পারি!' উপচারের অভাব পুষিয়ে দিতে চায় গৃহকর্ত্রীর মিষ্ট আতিথেয়তা দিয়ে। ভুঁইচালু কাজে চলে যায়। সারাদিনের জন্য এই ওদের আহার। আর সেই সন্ধ্যায় ফিরে ভাত খাবে। দুপুরবেলায় হিমাদ্রির জন্য কোনমতে দুটি চাল ফুটিয়ে দেয়, শুধু নুন আর আলুসিদ্ধ ছাড়া আর কোন উপকরণ নেই।

সন্ধ্যায় নীলকান্ত এসে খবর দেয় যে হিমাদ্রি আগের রাতে স্থান পরিবর্তন করে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। আজই সকালে তার বাবার কাছে সাদা পোষাক পরা দুজন পুলিশের লোক এসেছিল। তারা জিজ্ঞাসা করে যে এই গ্রামে কোন 'বদেশীওয়ালা' বাবু এসেছে কিনা। হিমাদ্রি যে ঘরটিতে থাকত' তার ভিতরেও তারা উঁকি দিয়ে দেখেছে। যাওয়ার সময় বলে গেছে যে ঐ ধরণের কোন লোকের উপস্থিতির সন্ধান পেলেই যেন পুলিশে খবর দেয়। আর শাসিয়ে গেছে যে বদেশীওয়ালাদের আশ্রয় দিলে খুব কঠিন শাস্তি পেতে হবে। নীলকান্তর বাবা স্বভাবতই খুব ভয় পেয়েছেন এবং তাকে কঠোর ভর্ৎসনা সহ্য করতে হয়েছে।

রাতে ভুঁইচালু বলে 'হিমাদ্রিদা! আমার ঘরের মানুষটারও বড় ভয়। যদি পুলিশ আসে, আমাকে ধরে নিয়ে যায় তাহলে ছেলেমেয়ে নিয়ে কি উপায় করবে, এই সব কথা বলে।' হিমাদ্রি

জিজ্ঞাসা করে 'তুমি ভয় পাও নি ত?' শুনে ভুঁইচাপু খুব খুশি হয়। সে বলে যে ঘরের মানুষটাকে খুব ধমকে দিয়েছে আর বলেছে যে সে প্রাণ দিয়েও হিমাদ্রিদাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে। হিমাদ্রি বলে যে 'যদি পুলিশ এসেই পড়ে তাহলে আমি চেষ্টা করবো যাতে অন্তত তোমার ঘরে ধরা না পড়ি।'

সেই রাতে কাজের ধারা নিয়ে দুজনে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। ভুঁইচাপু বলে, 'আপনি যা করতে চান তাতে কৃষকদের সাড়া পেতে এখনও বহু দেরী। প্রথমে তাদের দুঃখকষ্ট নিয়ে আন্দোলন সুরু করতে হবে। তাতেও তারা যোগ দেবে না সহজে। বহুদিন ধরে তাদের মনে যে ভয় আর অবিশ্বাস জমে আছে তা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে অনেক।'

ভুঁইচাপুকে হিমাদ্রি বরাবর খুব চাষা মানুষ বলে জানত। তার মুখ থেকে এতগুলি কথা এর আগে কখনও শোনে নি। এখন তার সহজাত অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়।

বহুক্ষণ ঘুম নামে না হিমাদ্রির চোখে। ভাবী কর্মপন্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু চিন্তা করে। গণ বিপ্লবের যে রোমান্টিক পরিকল্পনা নিয়ে এ পথে পা বাড়িয়েছিল তার অ-বাস্তবতা অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। সে সঙ্কল্প করে যে নীলকান্ত এবং ভুঁইচাপুকে আর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাথে জড়িত করবে না। তারা নিজেদের চেষ্টায় যতটুকু পারে কৃষকদের ঘুম ভাঙাবার কাজ করে যাক। সীতাপতিকেও তাই বলে দেবে। নতুন ভাবে কাজের গোড়াপত্তন হোক এখন থেকে।

সকালে উঠে ভুঁইচাপু কাজে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ নীলকান্তকে সঙ্গে নিয়ে সীতাপতি এসে উপস্থিত হয়। হিমাদ্রির বুকের ভিতরটা দুঃসংবাদের আশঙ্কায় ধক্ করে ওঠে। এভাবে দিনের বেলায় আসা সম্বন্ধে তার কড়াকড়ি নিষেধ ছিল। তবু যখন সীতাপতি এসেছে তখন নিশ্চয়ই কোন বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে গেছে।

আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়। কলকাতা থেকে বার্তাবহ এসেছে অকরী খবর নিয়ে। পুলিশী অভিযানে সমিতির গোপন কেন্দ্র বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। আগে যারা ধরা পড়েছিল তাদের মধ্যে কেউ নির্যাতনের ফলে স্বীকারোক্তি করেছে। তারই সূত্র ধরে পুলিশ একসঙ্গে অনেকগুলি আশ্রয়-স্থানে হানা দেয়। এক জায়গায় পুলিশ বাহিনীর সাথে বিপ্লবীদের সংঘর্ষ হয়ে গেছে।

সব চেয়ে বড় দুঃসংবাদ, প্রধান নেতা মাষ্টারমশায় ধরা পড়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর কাছে থেকে সাঙ্কেতিক লিপিতে লেখা এক তালিকা পুলিশের হস্তগত হয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগ সেই লিপির মর্ম উদ্ধার করে সমিতির বহুদূরব্যাপী সংগঠনের যোগসূত্রগুলির সন্ধান পেয়ে গেছে। নেতাদের মধ্যে যারা এখনও টিকে আছেন তারা খবর পাঠিয়েছেন যে এই বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে উঠতে অনেক সময় লাগবে। এখন সংগঠনের কাঠামোকে বাঁচিয়ে রাখাই হয়েছে প্রধান সমস্যা। বহু কর্মীর নাম পুলিশ টের পেয়ে গেছে।. সম্ভবত সীতাপতির নামও ছিল সেই তালিকায়।

হিমাদ্রি প্রথমটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এতদিনের স্বপ্ন, প্রতীক্ষা, প্রস্তুতি, কষ্টস্বীকার, দুঃখবরণ-সব এক নিমেষে এমনি ভাবে ধূলোয় মিশে যাবে! নিষ্ফল আক্রোশে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করে। কি করতে পারে সে? তবু পরাজয়ের সামনে আত্মসমর্পণ করা ত' চলবে না। ভবিষ্যতের আশায় বুক বেঁধে যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কঠিন পরীক্ষা সামনে।

সে সীতাপতিকে অবিলম্বে শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে নির্দেশ দেয়। সেখানে গেলে কিভাবে তার সাথে যোগাযোগ করবে তাও বলে দেয়।

সীতাপতি আর নীলকান্ত চলে যাওয়ার পর সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে খুঁটিয়ে চিন্তা করে। হয়ত সীতাপতি সম্বন্ধে স্থানীয় পুলিশের কাছে ইতিমধ্যেই খবর এসে গেছে। কে জানে গুপ্তচরেরা হিমাদ্রির সন্ধান পাবার আশায় গোপনে তার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখেছে কিনা! সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তারা সীতাপতিকে অনুসরণ করে তার বর্তমান আশ্রয়ের খোঁজ পেয়ে গেছে। তাকে অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করতে হবে। কোথায় যাবে ঠিক জানে না। পথে ধরা পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। ভুঁইচাপু কাছে থাকলে তাকে সাথে নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে যাওয়া যেত। সেজন্য দেরী করার সময় এখন নেই।

ঝুঁকি নিয়েই তাকে পথে বার হয়ে পড়তে হবে। ভুঁইচাপুর বৌকে ডেকে শুধু বলে যায় যে সে ফিরলে আজ রাতেই যেন নীলকান্তর সাথে দেখা করে।

গ্রামের পথে কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই জন কয়েক সাদা পোষাক পরে পুলিশের লোক হঠাৎ তাকে ঘিরে ফেলে। আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে সে পাহাড়ী ভাষায় তাদের জেরার জবাব দেয়। কিন্তু কিছুতেই কাজ হয় না। ওদের একজন হেসে বলে 'বৃথা চেষ্টা হিমাদ্রিবাবু! আমি আপনাকে ভাল করেই চিনি।'

দেখা গেল তার জন্য সশস্ত্র পুলিশবাহিনী অদূরে অপেক্ষা করে রয়েছে। বন্দীশালার ডাক এসে গেছে। রাজদ্রোহীর সম্মানচিহ্ন-স্বরূপ হাতকড়া পরতে হল হাতে। এবার আর পথ চলায় অনিশ্চিত কিছু নেই।

হিলকার্ট রোডের মুখে পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে। হিমাদ্রি দেখে সীতাপতি শৃঙ্খলিত অবস্থায় এক কোণে বসে। গোয়েন্দা কর্মচারী তাদের শুনিয়ে দেয় যে কলকাতায় সম্রাটের বিরুদ্ধে গুপ্ত প্রচেষ্টার অভিযোগে এক ষড়যন্ত্রের মামলা সুরু হচ্ছে। তারা দুজনেই সেই মামলার আসামী।

হিমাদ্রি কোন জবাব দেয় না। কর্মচারিটি বলে চলে 'গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন আপনারা কয়টি ছেলে ভাঙা পিস্তল দিয়ে! এবার টের পাবেন মজাটা। অন্তত দশ বছরের জন্য দ্বীপান্তরের জলে কারুর সাজা হবে না।'

হিমাদ্রি ভাবে, দ্বীপান্তর সে ত' পরাধীন দেশের মুক্তি সৈনিকের তীর্থক্ষেত্র। সেই পরিণতির জন্য প্রস্তুত হয়েই ত' তারা এ পথে পা বাড়িয়েছে। তবু আফশোস হয়, বিরাট পরিকল্পনা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল আকস্মিক ভূমিকম্পে।

গোহাটি জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে সতৃষ্ণ দুই চোখের দৃষ্টি মেলে ধরে। বিদায় নেয় উন্মুক্ত আকাশ বাতাসের কাছে। পিছনে পড়ে থাকে তরাইয়ের বন প্রান্তর, ঘাসল অরণ্যে ঢাকা হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ। পিছনে পড়ে রইল কাঞ্চনজঙ্ঘার অভ্রভেদী উত্তুঙ্গ মহিমা। কতদিনের জন্য কে জানে!

তাই বলে সংগ্রাম ত' শেষ হয় নি। কারাগারের অন্তরালে নির্যাতনের বিরুদ্ধে পতাকা উঁচুতে তুলে ধরে রাখতে হবে। রুদ্ধ রিক্ত দিনগুলি কাটাতে হবে ভবিষ্যতের পানে চেয়ে।

মহাসংগীত

মূল :—আর্থার সি. ক্লার্ক

অনুবাদ : গৌরীশংকর দে

(লেখক পরিচয় : আর্থার সি. ক্লার্ক 'গল্প-ভারতী'র পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অপরিচিত নন। মাত্র দু মাস আগে তাঁর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এই সাময়িক পত্রেরই পাতায়। বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প লিখে যারা ইদানীং নাম করেছেন ক্লার্ক তাঁদের অন্যতম। তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক, ঔপন্যাসিক ও আবিষ্কারক। তাঁরই একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প উপহার দেয়া হল পাঠক-পাঠিকাদের। আশা করি তাদের ভালো লাগবে।)

কখনো কি লক্ষ্য করেছেন এক ঘরে বিশ কি ত্রিশ জন লোক হয়তো কথা বলছে, একটা মুহূর্তে এল যখন সবাই হঠাৎ একসঙ্গে চুপ হ'য়ে গেল? আকস্মিক লজ্জিত শূন্যতা যেন গ্রাস ক'রে নিল সব ধ্বনি, সব শব্দ? এ রকম মুহূর্তে অন্যদের মনে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় আমার জানা নেই, তবে আমার নিজের মনে হয় সমস্ত শরীর যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। অবশ্য, সমস্ত জিনিসটা হয়তো নিয়মের ব্যতিক্রমেরই রকম ফের। তবু কাক-তালীয় নিয়মেই সবাই কথা বলতে বলতে এক সঙ্গে চুপ ক'রে গেছে এমন কথা মেনে নিতেও আমার মন সায় দেয় না। আমার তো মনে হয় সেই সব নিঃশব্দ মুহূর্তে সবাই কান পেতে আছে কী যেন শুনবে ব'লে—কী তা নিজেরাই জানে না। এই সব মুহূর্তে আমার শুধু একটি কবিতাই মনে পড়ে :

আমার পশ্চাতে আমি সর্বদাই শুনি
সময়ের পক্ষীরাজ আসে কাছে, তার পক্ষধ্বনি ··

মজলিশ যতই জমাট হোক, একথাই আমার মনে হয়। এমন কি 'হোয়াইট হার্ট'-এর বৈঠকেও।

এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল এক বুধবারের সন্ধ্যায়। সে-দিন অবশ্য আমাদের বৈঠকে অন্য দিনের মতো ভিড় ছিল না। অন্যান্য সময়ে যেমন ক'রে আসে তেমনি একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে নেমে এল স্তব্ধতা। সেই অস্বস্তিকর উৎকণ্ঠার ভারটুকু কাটাবার জন্যই চার্লি উইলিস ইচ্ছে ক'রেই একেবারে আধুনিক আর জনপ্রিয় একটা সুর শিস্ দিয়ে গাইতে শুরু করল। সুরটা কী তা-ও আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে ওই সুরের মাহাত্ম্যেই হ্যারি পার্ভিস-এর গল্পের ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল আরেকটি গল্প।

মোটামুটি অনুত্তেজিত গলায়ই ও শুরু করল : চালি, ওই সোফার ছাই সুর শুনে আমার মাথাটা বিগড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। গত হপ্তায় যখনই রেডিয়োর সুইচটা টিপেছি তখনই শুনতে পেয়েছি ওই সুর।"

জন ক্রিস্টোফারের গলায় রীতিমতো ঝাঁজ ফুটে উঠল : "তোমার উচিত ও কেত্রেই সন্তুষ্ট থাকা। তা হ'লে আর বিপদের কোনো আশঙ্কা রইবে না।"

হ্যারি পাল্টা আক্রমণ চালাতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। বলল : "দেখ, একটা কথা ক'বে দাও দেখি। ঈশ্বরের দোহাই। তোমাদের কখনো মনে হয়েছে জনপ্রিয় সুরগুলির মধ্যে কী একটা মৌলিক ব্যাপার লুকিয়ে আছে?"

"বলতে চাও কী?"

"ওই সুরগুলো হঠাৎ যেন আকাশ থেকে পড়ে। ক'য়েক হপ্তা ধ'রে সবাই সুর ভাঁজে। যেমন চালি একটু আগে ভাঁজছিল। এদের মধ্যে আবার যে সুরগুলি একটু ভালো সেগুলো তো মনের ওপর এমন জাঁকিয়ে বসে যে মগজ থেকে তাদের তাড়ানোই যায়। দিনের পর দিন ওরা ঘুরতে থাকে মাথার মধ্যে। তারপর একদিন হঠাৎ বেমালুম হাওয়া হ'য়ে যায়।"

আর্ট তিনসেন্ট ব'লে উঠল : "এবার বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাচ্ছ। কতগুলো সুর নেয়া না-নেয়া আমাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এমন কতগুলি সুরও আছে যে-গুলি লেগে থাকে চিটাগুড়ের মতো। চাইলেও, না চাইলেও।"

"ঠিক এই কথাটাই আমি বলতে চাই। জনপ্রিয় সুরগুলির ভেতরে কিছু হয়তো সত্যি মহৎ। বাকিগুলি হয়তো একেবারেই ঝুটি। তবে ভালোই হোক আর মন্দই হোক একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু এই দু দলের মধ্যেই বর্তমান।"

চালি ব'লে উঠল : "চালিয়ে যাও। আমরা আছি।"

হ্যারি উত্তর দিল : "ওই বৈশিষ্ট্য কী পরিষ্কার ক'রে বলতে পারব না। বলার চেষ্টাও করব না। তবে আমি একজন লোককে জানি যে ওই বৈশিষ্ট্য ধ'রে ফেলতে পেরেছিল।"

গল্পের ধারা যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য একজন তার হাতে তুলে দিল বিয়ারের পাত্র। পাত্র আবার ক'রে নেবার জন্য গল্পের মাঝখানে তাকে থামতে হলে উপস্থিত সবারই খারাপ লাগবে।

আবার শুরু করল হ্যারি পার্ভিস : "জানি না কেন অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই সংগীত সম্পর্কে দারুণ উৎসুক। তবে তারা যে উৎসুক এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি ক'য়েকটি নাম-করা বিজ্ঞান-সংস্থার কথা জানি। এদের প্রত্যেকটির নিজস্ব একটি ক'রে সৌখিন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা রয়েছে। ক'য়েকটি অর্কেস্ট্রা তো রীতিমতো উঁচু দরের। আর অঙ্কের লোকেরা যে গান-বাজনা ভালোবাসবে এতো খুবই স্বাভাবিক। সংগীত, বিশেষ ক'রে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আবিক তো অনেকটা গণিতেরই মতো। তা ছাড়া আছে আরো গূঢ় সব তত্ত্ব : সুর-সঙ্গতির সম্পর্ক, তরঙ্গ-বিশ্লেষণ, কম্পন, ইত্যাদি। এ সব নিয়ে পড়াশুনো করে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক তো এ সব বিষয়ে আকৃষ্ট হবেনই। তাছাড়া একান্ত আনন্দের দিক তো রয়েছেই।

"সে-সব কথা না তুলে সোফাতেই স্বীকার ক'রে নিচ্ছি সংগীতে সিলবার্ট সিষ্টারের ঔৎসুক্য ছিল নিতান্তই বৈজ্ঞানিক কারণে। সে ছিল মূলত একজন শরীর-তত্ত্ববিদ। আবার সবচেয়ে আগ্রহ ছিল তার মগজের কলা-কৌশল বিষয়ে। ধ্বনি নিয়ে তার একটুও মাথাব্যথা ছিল না। ধ্বনি কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশার পর মগজে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা জানার জন্যই আগ্রহী ছিল।

"মনজের ছন্দ এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে গিয়ে নিজের অজান্তেই সে সংগীতেও আসক্ত হ'য়ে পড়ে। সংগীতের ছন্দ আর মানুষের মনের ছন্দের মধ্যে যে একটা যোগাযোগ রয়েছে এ বিষয়ে তার একটুও সন্দেহ রইল না। গবেষণা করতে গিয়ে ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর স্তরে উপস্থিত হল সে।

"সিলবার্ট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল বিশেষ-বিশেষ গান বা সুরের জনপ্রিয়তার বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কার করতে। অবশ্য ঠিক সচেতনভাবে এই উদ্দেশ্য তার গবেষণার পেছনে হয়তো কাজ করেনি। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা ধরা পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় খেলে গেল ব্যবসায়ী বুদ্ধি। মনে হল লক্ষ-লক্ষ টাকা রোজগারের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত।

"সিলবার্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে কিছু-কিছু গান বা সুর যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এর কারণ মনজের মৌলিক বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সঙ্গে সেই সুর বা গানের তরঙ্গ অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। যেন তালার সঙ্গে খাপ খায় আসল চাবিটি।

"এই ধারণা প্রমাণিত করার জন্য সে ক'য়েকশ বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সংগীত আর জনপ্রিয় আধুনিক গানের সুর বিশ্লেষণ ক'রেও দেখেছিল।

"সিলবার্ট-এর তত্ত্বটা ছিল এই যে আমরা যে সব গান-বাজনা শুনি সেগুলি আসলে প্রকৃত মহাসংগীতের, পরম রাগিণীর নিতান্তই ক্ষুদ্র প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। সেই মহাসংগীতকে সঠিক রূপে প্রকাশের আকুতি নিয়েই তো হাজার বছর ধরে অক্লান্ত সাধনা ক'রে চলেছে সংগীত-শিল্পীরা। তবু তারা যে আজো সফল হল না এর কারণ সংগীতের সঙ্গে মনের সম্পর্ক কী আজো তারা জানে না। সেই সম্পর্ক এখন যখন জানা যাচ্ছে তখন সে মহা-সংগীত আবিষ্কারও সম্ভব হবে।

"প্রায় এক বছর লাগল সিলবার্ট-এর বিশ্লেষণ শেষ হতে। এরপর শুরু হল নির্মাণের কাজ। একটা যন্ত্র তৈরি করলে সে। তার আবিষ্কৃত তত্ত্ব অনুযায়ী যন্ত্রটা কাজ করবে। যদি ঠিক মতো কাজ করে তবে সুরের জগতে হাতড়াতে হাতড়াতে যন্ত্রটা ঠিক একদিন মহা-সংগীতকে স্পর্শ করবে।

"আমার একবার মাত্র সুযোগ হ'য়েছিল যন্ত্রটার কাজ-কর্ম পরখ করার। ব্যাপারটা সত্যি ঘুলঘুলে। মাঝে মাঝে দু একটা ভালো সুর বেরিয়ে এলেও বেশির ভাগ বাজনাই মনে হল শিশুদের বাজনার মতো। যন্ত্রটা আমার মনে সেদিন একটুও দাগ কাটতে পারল না।

"সিলবার্ট বুঝিয়ে দিলে যন্ত্রটা এখনো পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে। কল-কব্জা এখনো কিছু বাকি রয়েছে। কাজ যখন শেষ হবে তখন যন্ত্রটার সুর নির্বাচনের ক্ষমতা জন্মাবে। তখন তো যন্ত্রটির অনন্ত সম্ভাবনা।

"সেই সিলবার্ট-এর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। কথা ছিল পরের হপ্তায়ই তার সঙ্গে দেখা করব। নিশ্চয়ই এর মধ্যে তার কাজ আরো এগুবে। সেদিন যেতে ঘণ্টা খানেক দেরি হ'য়ে গেল। অবশ্য তাতে ভালোই হয়েছিল।

"আমি যখন গিয়ে তার বাড়িতে পৌঁছলুম তখন সিলবার্টকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার পরীক্ষাগারের বুড়ো আর কালা সহকারীটি মনিনমুখে ব'সে আছে চেয়ার-টার যন্ত্রটার সামনে। কিছুক্ষণ পরে সমস্ত ঘটনাটাই জানতে পারলুম।

"আর সন্দেহ নেই। যন্ত্রটা শেষ পর্যন্ত সত্যি কাজ করেছে। সহকারীটি বাইরে গিয়েছিল

দুপুরের খাবার খেতে। গিলবার্ট তখনো যন্ত্রটা নিয়ে টুকঠাক করছিল। সহকারীটি ফিরে এসে দেখে অদ্ভুত আর জটিল একটা সুরে সমস্ত ঘরটা কাঁপছে। হয় যন্ত্রটা সেই সুরে এসে নিজে থেকেই থেমে গেছে, নয়তো গিলবার্ট নিজেই 'আবার' লেখা জায়গাটায় সুইচ টিপে রেখেছে। যাই হোক, ক'য়েকশ বার সে ওই একই সুর শুনেছে। সহকারীটি এসে দেখে গিলবার্ট-এর সম্মোহিতের মতো অবস্থা। তার চোখ দুটি খোলা, অথচ কিছুই যেন সে দেখছে না। শরীর একেবারে শক্ত। সুইচ টিপে যন্ত্রটা বন্ধ করা সত্ত্বেও গিলবার্ট-এর একটুও পরিবর্তন হল না। সে তখন সব সাধারণের নাগালের বাইরে।

"কী ঘটেছিল এখন তা অনুমান করা শক্ত নয়। চিরকালই চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। সামান্য আঙুলের সাহায্যে সুরকার যে সুর সৃষ্টি করেন তা একবার শুনলেই বহুদিন ধ'রে মনের ওপর চ'লে তার প্রতিক্রিয়া। সে-ক্ষেত্রে গিলবার্ট যে মহা রাগিণীর সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া যে দারুণ হবে সে তো বলাই বাহুল্য। মনের স্মৃতি-লোকে তার অনুরণন, তার ঝংকার রইবে আজীবন। মুছে যাবে অন্য সব চিন্তা। সেই মহাসংগীতের তুলনায় আগেকার সব সংগীতই মনে হবে তুচ্ছ। চেতনার পরতে পরতে গাঁথা হয়ে যাবে সেই সুর। একেবারে সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। গিলবার্ট-এর বেলায় ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটেছিল।

"সব রকম চিকিৎসাই তার করা হয়েছে। কিন্তু কাজ হয়নি কিছুই। তার মনে দাগ প'ড়েছে তা আর কিছুতেই মুছে ফেলা সম্ভব নয়। বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোনো বোধই এখন তার নেই। অন্য লোকে খাইয়ে দিলে তবে সে এখন খায়। বাইরের কোনো উত্তেজনা, কোনো উদ্দীপনাতেই আর সাড়া দেয়না সে। কেবল মাঝে মাঝে তার শরীর অদ্ভুত ভাবে বেঁকে যায় যেন সে তান দিচ্ছে···

"বলতে বাধ্য হচ্ছি তার আরোগ্যের আর কোনো আশাই নেই। তবু আমি জোর দিয়ে বলতে পারছিনা তার বর্তমান অবস্থা ভয়ংকর, না ঈর্ষা করার মতো। গ্রেটো প্রমুখ গ্রীকদের যে পরম সত্যকে পাওয়ার সাধনা ক'রে গেছেন হয়তো সেই সত্যকে পেয়েছিল গিলবার্ট। আমি অবশ্য পরিষ্কার কিছু বলতে পারবনা। নিজেই মাঝে-মাঝে অবাক হ'য়ে ভাবি সেই মারকী সংগীত কেমন ছিল। যদি একবার শুনতে পেতুম। কোনো বিপদ না ডেকে এনেও বোধ হয় শুনতে পাওয়া সম্ভব। ইউলিসিস সাইরেনদের গান শুনবার পরেও তো স্বদেশে ফিরতে পেরেছিলেন···? কিন্তু, সে সুযোগ আর হবে না।"

চার্লস উইলিস বিদ্রি ভঙ্গিতে ব'লে উঠল : "তুমি যে এই কথা বলবে তা আগেই জানতুম। এটা বোধ হয় বিগড়ে গিয়েছিল। আর সে-রকম একটা ব্যাপার যদি হয়ে থাকে তবে তো তোমার গল্পের সত্যতা প্রমাণের কোনো উপায়ই আর রইল না।"

হ্যারি ওর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে— বলল : "ঠিক তা নয়। সবেতথা চালাতে গিয়ে প্রচুর দেনা হয়ে যায় গিলবার্ট-এর। দেনাদাররা এসে ক্রোক করে ওর বিষয়-সম্পত্তি। তারাই একে একে খুলে নেয় গিলবার্ট এর যন্ত্রের সব তার।"

আর কেউ কোনো প্রশ্ন করলনা। স্তব্ধতা নেমে এল আমাদের টেবিলে। তারপর আবার শুরু হল কথাবার্তা। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলুম প্রায় প্রতি দশ মিনিট পর পরই চার্লি শিস দিয়ে সেই অনপ্রিয় গানটি গাইছে।

বিচিত্র বৈঠক

বলতে পারেন কেন আজ জার্মান তরুণীদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ?

অপরিচ্ছন্ন, মোটা, একরোখা, বিদেশে এইসব ছিল জার্মান নারী-সমাজের বিশেষণ। কিন্তু আজ কি কেউ তাদের সেসব বলতে সাহস পাবে ? পাবেনা, কারণ আজ দেশবিদেশের কাগজ পত্রে, ছবিতে, সিনেমায় সেরা রূপসী বলে জার্মান নারীসমাজ স্বীকৃতি পেয়েছে।

পিঠে মোটা বেণী ঝোলানো বা খোঁপা-বাঁধা খাবড়া পা মোটা মেয়ে আজ আর জার্মানীতে বিশেষ দেখা যায়না। তাদের স্থান আজ দখল করেছে সুন্দরী, সুশ্রী, ছিপছিপে মেয়েরা। ফ্যাশানের রাজ্যে, চলচিত্রে, মাসিক পত্রে তাই আজ জার্মান মেয়েদের এত সুখ্যাতি, এত আধিপত্য। বিদেশের পুরুষরা আজ জার্মান রূপসীদের পাণিপ্রার্থী। একা মার্কিন সৈন্যদের সঙ্গেই লাখ খানেক জার্মান তরুণীদের বিবাহ হয়েছে।

আজকাল পোশাকের মডেলের জন্যে পৃথিবীর বড় বড় শহরে জার্মান মেয়েদের বেশিরভাগ নিয়োগ করা হয়। এদের এক একজনের একদিনের উপার্জন শুনলে আশ্চর্য হবেন ; কেউ পায় দিনে ১২০ ডলার, কেউ পায় ঘণ্টায় ৬০ ডলার। হলিউডে জার্মান অভিনেত্রী এল. কে সোমেরকে সাপ্তাহিক শুটিংয়ের জন্যে প্রেফ্ হাত খরচা বাবদ দিতে হয় ৫০০ ডলার। প্রথম তিনটি মার্কিন চিত্রে অভিনয় করার জন্যে এল. কে সোমের পেয়েছিলেন সোয়া দু'লাখ ডলার। কিন্তু খ্যাতিলাভের পর সেদিনের সেই সোয়া দু'লাখ ডলার আজ তার উপার্জনের কাছে নেহাৎই হাত খরচার সামিল।

বিবাহ ও ফ্যাশানের বাজারে আজ জার্মান মেয়েদের এত চাহিদা কেন ? শুধু কি তাদের রূপ, গুণ নয় ? বিদেশী বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে রূপ ছাড়াও জার্মান মেয়েদের মধ্যে তারা দেখেছেন মাতৃত্বভাব, সংসারের প্রতি মমতা, বিশ্বস্ততা ও স্বামীর প্রতি অনুরক্তি। এসব গুণের মূল্য আছে বৈকি ! বর্তমানে জার্মানীর নারীসমাজ রাজনীতির দিকেও ঝুঁকেছেন। জার্মানীর পার্লামেন্টে দুজন নারী সদস্যার উপস্থিতি তারই প্রমাণ।

শুধু ঘরদোর সামলানো ও ছেলেমেয়ে মানুষ করা ছাড়াও জার্মান মেয়েরা আজ নানা পেশায় নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছে। একালে সাজপোশাক ও প্রসাধনের প্রতি নিরাসক্ত জার্মান মেয়েরা প্রতিবেশী ফরাসী মেয়েদের অপেক্ষা এখন এসব দিকে বেশি খরচ করে।

অনেক আকাদেমির নাম শুনেছেন, সাহিত্য আকাদেমী তো বটেই কেমন ? এবারে শুনুন "নির্বোধের আকাদেমি"।

বড় বড় শহরের নামডাক তো আছেই কিন্তু অনেক ছোট ছোট শহর বা গ্রাম আছে যাদেরও এক একটা বিশিষ্ট খ্যাতি আছে যেমন এক জায়গার সরপুরিয়া বা অন্য জায়গার কাঁদার রসগোল্লা ইত্যাদি। তেমনি এক ছোট্ট জনপদ পশ্চিম জার্মানীর ডুইসবুর্গে। এখানে এমন একটি সংস্থা আছে যা জগতের অন্যত্র বিরল। সংস্থাটি হল "নির্বোধের আকাদেমী"।

ছোট ছোট গ্রামের জীবনযাত্রা যেমন চলে এখানেও তার বিশেষ কোন তফাৎ নেই তবে ১১ই নভেম্বর যখন কার্নিভালের মরশুম শুরু হয় তখন দেখা যায় গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোকরা বিচিত্র সাজ সজ্জায় সজ্জিত ঘোড়ার চড়ে একটা পুকুরের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে।

এই বিচিত্র অশ্বারোহীরা সবাই ডুইসবুর্গের আকাদেমীর সভ্য এবং পুকুরের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো মান্ধাতা আমলের রীতি সেদিনেরই চলে আসছে। পুরোনো দলিল পত্রে দেখা যায় ১২৬৭ সন থেকে কৌতুক প্রিয় রসিক মানুষজন রসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গ্রামের বাইরে এই পুকুরের পাড়ে এসে জমা হ'ত। চতুর্দশ শতাব্দীতে ক্লীভের জমিদার কাউন্ট অ্যাডল্ফ রসিকপ্রবরদের খেতাব দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন ও সেই দেখাদেখি ১৫৫৩ সনে ডুইসবুর্গের রসপ্রিয় মানুষরা এই "নির্বোধের আকাদেমি" প্রতিষ্ঠা করে।

তখন থেকেই এই আকাদেমি দেশের সংসদীয়িক গুণীজানী ব্যক্তিদের "রসিকপ্রবর" এই খেতাব দিয়ে আসছে। খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জার্মান কবি গোটে, প্রাক্তন চ্যান্সেলার কনরাড আদেনুয়ার ও অতিবাস্তব স্যালভাডোর ডালি।

স্প্রে, স্প্রে, স্প্রে—কেবল স্প্রে আর স্প্রে

এই যুগকে বলা চলে স্প্রে যুগ। পশ্চিম জার্মানীর লক্ষ লক্ষ মহিলারা কোন না কোন কারণে প্রত্যহ স্প্রে ক'রে চলেছে। কেউ চুলে স্প্রে করছে, কেউ পেটিকোট টান টান রাখার জন্যে স্প্রে করছে, কেউবা স্প্রে করছে আসবাবপত্র পালিশ করতে, আবার কেউবা রৌদ্র-দগ্ধতা থেকে বাঁচার জন্যে দেহে স্প্রে করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই, এখন পশ্চিম ইয়োরোপ বিশেষত পশ্চিম জার্মানীতে এই স্প্রে করার হিড়িক পড়েছে।

স্প্রে-ক্যান বা স্প্রে করার কৌটার আবিষ্কারক কে জানেন? এরিক রথাইম নামে নরওয়ের একজন ইঞ্জিনীয়ার। প্রায় চল্লিশবছর আগে রথাইম স্প্রের কৌটো উদ্ভাবন করলেও তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জিনিষটা ব্যবহার হয়নি। তারপর এই স্প্রের কৌটোর জয়যাত্রা শুরু হল অসীম সম্ভাবনার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। প্রথম প্রথম সে দেশে চুলে স্প্রে করার কয়েকটা জিনিষ কৌটায় ভরে বিক্রি করার

ব্যবস্থা হয়েছিল। পশ্চিম জার্মানীতেও চুলের স্প্রে হিসেবেই প্রথম স্প্রে কৌটোর আবির্ভাব হয়। এখনতো পশ্চিম জার্মানীর প্রত্যেক বাড়ীতে গড়ে অন্তত স্প্রে কৌটোতে তরা আটরকম জিনিষ ব্যবহার করা হয়।

ভবিষ্যতে হয়তো কোন জিনিষ নেই যা স্প্রে কৌটোতে ভরে পাওয়া যাবেনা। এখনইতো স্প্রে কৌটোয় ভরে দাড়ি কামাবার সাবান, চুলের উপকরণ, প্রসাধনী নানারকম পেইন্ট ও কীটনাশক বিক্রি হচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়তো খাবারদাবার পানীয় সবকিছুই স্প্রে কৌটোয় ভরে বিক্রি হবে। দরকার মত কৌটো টিপলেই প্রয়োজনীয় জিনিষটি পাওয়া যাবে।

ওষুধপত্তরের জগতে স্প্রে এখন পশ্চিম জার্মানীতে যে কতরকম ভাবে ব্যবহার হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ইঁপানী, ইনফ্লুয়েঞ্জা, একজিমা, অ্যালার্জি, পোড়া, ডিপ্থেরিয়া প্রভৃতির ওষুধ এখন স্প্রে হিসেবে পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে যাতে স্প্রে করে ইন্জেক্শন দেওয়া যায় ও প্রাথমিক চিকিৎসা করা যায় তারও ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রসবের ব্যথা উপশমের জন্যে স্প্রে ওষুধের ইতিমধ্যেই পরীক্ষা মূলকভাবে পশ্চিম জার্মানীতে ব্যবহার শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে দাঁত তোলার স্প্রে করলেই চলবে। সাধারণের জন্য একদিন হয়তো ক্যান্সার, বহুমূত্র রোগের জন্যও স্প্রে ওষুধ পাওয়া যাবে। হয়তো অপারেশনকে শান্ত করার জন্যও স্প্রে ওষুধের অভাব হবেনা।

সাবধান, বেশীগাড়ি চালাবেন না।

মানবদেহে কয়েকটি গ্রন্থি আছে যেগুলি থেকে রসক্ষরণ হয়। প্রত্যেকটি থেকে পরিমাণ মত রসক্ষরণ শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিন্তু কমবেশি হলে অপকার হয়। আড্রেনাল এইসব গ্রন্থির একটি। এথেকে যেসব হরমোন উৎপন্ন হয়, বেশী গাড়ি চালালে তার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। গাড়ি চালাবার সময় শুধু যে চালকের আড্রেনাল হরমোন বৃদ্ধি পায় তা নয়, সহযাত্রীর দেহেও এই হরমোন বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয় বরং চালক অপেক্ষা অনেক বেশি হয়। রক্তস্রোতে এই হরমোনের অনুপাত বৃদ্ধি পেলে হার্টের অপকার হয়। তাই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে যাদের হার্ট খারাপ সেরকম লোকদের পক্ষে চালক বা সহযাত্রী হিসেবে বেশিক্ষণ গাড়ী নিয়ে ঘোরা সুবিবেচনার কাজ নয়।

এমন একটি অদ্ভুত লোকের কথা নিশ্চয়ই পূর্বে শোনেননি।

অদ্ভুত লোক এই কাদার শোয়েনিক। য়ুরোপের পাঁচটি দেশে ঘুরে ঘুরে তিনি সার্কাসের লোকদের ধর্মোপদেশ দেন। সার্কাসের কোন লোক অসহায় হয়ে পড়লে তিনি তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন, পীড়িত হলে সেবা করেন।

সারাবছর বছর কাদার শোয়েনিকের কাটে এখানে ওখানে। বছর শুরু হয় স্পেনের জাতীয় সার্কাসে পৌরহিত্য ক'রে, সেখান থেকে তিনি যান পশ্চিম জার্মানীর অ্যালটহক সার্কাসে। সেখানে কাজ সেরে তিনি চলে যান বেলজিয়ামের রাজধানী এন্টওয়ার্পে। তারপর কিছু সময় ক'রে তিনি চলে

আসেন অগস্টবার্গে যেখানের সির্জার তিনি যাজক। সেখানে এসে তাঁর অবর্তমানে যত চিঠিপত্র আসে সেগুলি দেখেন ও চাঁদাপত্র তোলার ব্যবস্থা করেন। সেকাজ সেরে তিনি চলে যান ব্রেমেনে ও ব্রেমেন থেকে হামবুর্গের শীতকালীন মেলায়। সেখান থেকে আসেন ব্রিউনিখে যেখানে ক্রোনের সার্কাসে গাধা, টট হাতি নিয়ে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব পালিত হয়। তারপর নববর্ষের উৎসবে সৌরভিত্তা করতে আসেন বার্লিনে। উৎসবান্তে তিনি চলে যান রোমে পোপের সন্ধর্শনে। এই হল কাদার শোয়েনিকের সারাবছরের সূচী যেখানে কোন ছেদ নেই, ছুটি নেই।

সার্কাসের বিয়াট তাঁর মনে যখন বাজনা বেজে ওঠে, যখন রঙ্গমঞ্চে সার্কাসের খেলোয়াড়রা নানা কঠিন খেলা দেখায়, যখন সার্কাসের ঘোড়ারা বাজনার তালে তালে নাচতে থাকে কিম্বা ক্লাউনরা নানা অঙ্গভঙ্গী মেখিয়ে দর্শকদের আনন্দদান করে, তখন কাদার শোয়েনিক সার্কাসের কাউকে উপদেশ দেন, কাউকে সান্ত্বনা দেন, কাউকে বা আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা ক'রে দেন। শুধু তাই নয় সার্কাসের যুবক যুবতীদের বিবাহের যন্ত্র পড়ান, তাদের ছেলেমেয়েদের খ্রীষ্টধর্ম মতে আশীর্বাদ করেন।

যৌবনে তার বাড়ীর কাছেই এক সার্কাস দল তাঁবু ফেলেছিল। কিভাবে যেন তিনি তাদের দলে ভিড়ে পড়েন ও সার্কাসের নানা কলকৌশল আয়ত্ত করেন। সেই থেকেই সার্কাস তাঁকে আকর্ষণ করে ও পরবর্তী জীবনে যাজকবৃত্তি অবলম্বন করা সত্ত্বেও সার্কাসও তাঁকে ছাড়েনি, তিনিও সার্কাসকে ছাড়েননি।

জানেনতো ঋণের শেষ রাখতে নেই।

আজ থেকে ২০০ বছর আগে অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাত সাত বছর ধরে প্রুশিয়া ও ইংরেজরা একনাগাড়ে এক লড়াই চালিয়েছিল। তখন ইংরেজ সেনাপতি পশ্চিম জার্মানীর ওয়েস্টফালিয়ার এক চাষীর কাছে সৈন্যদলের ঘোড়াদের খাবার জন্যে খড় কিনেছিলেন কিন্তু দাম আর দেওয়া হয়নি।

সেই চাষীর এক বংশধর এতদিন ধরে পুরোনো কাগজপত্তর ঘাঁটতে ঘাটতে তদানীন্তন ইংরেজ সেনাপতির সেই হাতচিঠাখানি পেয়ে জার্মানীতে অবস্থিত বর্তমান ইংরেজ সেনাপতির কাছে সেটি দাখিল করেন। মহারাজা মহারাণীর গভর্নর এতদিন খড়ের দাম শোধ করেননি দেখে তিনি ভীষণ লজ্জা পেয়ে তক্ষুণি তা পরিশোধ করার হুকুম দিলেন। চাষীর বংশধর টাকা পাবার আনন্দের চেয়ে এক ঐতিহাসিক দলিল আবিষ্কার করার গর্বে আজ বেশি আনন্দিত।

দাঁড়িপাল্লায় বাড়ি ওজন কখনও শুনেছেন কি।

আনন্দ আতা। —পৃথিবীর যে কোনো বস্তুর ওজন মাপা যায় মহাশূন্যলোক থেকে ছুটে আসা রহস্যময় মহাজাগতিক রশ্মির "মিউ-মেসন" কণার সাহায্যে। —গত ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সোভিয়েত মহাশূন্য ভৌত-পদার্থ বিজ্ঞানীদের যে সম্মেলন শেষ হয়েছে; সেই সম্মেলনে একথা ঘোষণা করেন মস্কোর অধ্যাপক গার্সি জুদানভ। তিনি জানান: এই পদ্ধতিতে সোভিয়েত রাজধানীর "হোটেল মস্কো" কে ওজন করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে এর ওজন ৪৫,০০০ টন। কসমিক রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে এক বিশেষ যন্ত্র ব্যবস্থার সাহায্যে এই ওজন করা হয়েছে। এ ধরণের ইমারত বা কোনো বিপুলকায় বস্তুর ওজন মাপার জন্যে ইতিপূর্বে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত, সেই পুরাতন পদ্ধতিতে পাওয়া ওজন থেকে এই নতুন পদ্ধতিতে পাওয়া ওজনের অঙ্কে যৎসামান্য তফাৎ রয়েছে।

অধ্যাপক জুদানভ জানান: ভূগর্ভের কয়েক কিলোমিটার গভীরের বিভিন্ন প্রস্তর—স্তরের স্তর নির্ধারণ করার কাজে মহাজাগতিক রশ্মির মিউ-মেসন কণাকে ব্যবহার করার একটি পদ্ধতি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের প্রস্তর ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিউ-মেসন কণা "শোষণ" করে—এই তথ্যটির ভিত্তিতেই এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটানো হয়েছে! ওদেসার চুনা-পাথর তরাই অঞ্চলে এখন এই পদ্ধতিটিকে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

ভাবতে পারেন? কয়েক হাজার বৎসর ধরে পড়ে থাকা মাংস আজও টাটকাও সুস্বাদু!

নরিলস্ক্ (সাইবেরিয়া)। — সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর প্রান্তের তৈমুর উপদ্বীপের নরিলস্ক্ শহরের প্রাণীবিজ্ঞানী অধ্যাপক সিও মিচুরিন একটি প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণীর মাংস রেঁধে খেয়েছেন এবং সেই মাংস খেতে বেশ সুস্বাদু বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই ম্যামথটি সাইবেরিয়ার একটি চিরতুষারাচ্ছন্ন জায়গায় কয়েক হাজার বছর ধরে বরফের গভীরে অতি-নিম্ন তাপাঙ্কে হিমায়িত অবস্থায় ছিল এবং সেই জন্যেই তার মাংসে কোনোরকম পচনক্রিয়া দেখা যায়নি।

অধ্যাপক মিচুরিন বলেন, এই মাংস খেতে অনেকটা গোমাংসের মতো—কিন্তু তার চেয়ে একটু বেশি ঝাঁঝযুক্ত।

সাইবেরিয়ার যে অংশ উত্তর-মেরুবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত, সেখানকার পিয়াসিনা নদীর উত্তর তীরে একদল জেলে এই ম্যামথটিকে আবিষ্কার করে এবং তার দেহের একাংশ তুষারস্তূপ খুঁড়ে উদ্ধার করে। নরিলস্ক্ শহরের বিজ্ঞান আকাদমির কর্তৃপক্ষের কাছে খবর পাঠাতে এবং সেখান থেকে অধ্যাপক সিও মিচুরিনের এখানে আসতে দিন কয়েক কেটে যায়। সেই সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলের বিখ্যাত ক্ষুধার্ত নেকড়ের পেয়ালের (সিল্ভার ফার ফক্স্) দল ম্যামথটির দেহের একাংশ খেয়ে ফেলে। এর থেকেই অধ্যাপক মিচুরিনের মনে হয় যে ম্যামথটির মাংসে পচনক্রিয়া ধরেনি। এ ধরণের "অক্ষতদেহ" ম্যামথ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায় ইতিপূর্বে আর পাওয়া যায়নি বলেই, অধ্যাপক সিও মিচুরিন বিশ্বের প্রথম "প্রাগৈতিহাসিক-প্রাণীমাংস-ভোজী" হবার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন।

ম্যামথটির বাকি অংশ লেনিনগ্রাদের প্রাণীবিদ্যা মিউজিয়মে এনে রাখা হয়েছে

খেলাধূলা

বিমল দেব

পরলোকে সামাদ

ফুটবলের যাদুকর সামাদ গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পার্বতীপুরে (রংপুর—পূর্ব পাকিস্তান) ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ফুটবল সাধনায় সামাদের নিষ্ঠা ও কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। আজকের ভারতীয় ফুটবল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থান পেয়েছে—এর মূলেও রয়েছে সামাদের অনুপ্রেরণা। ফুটবলের ক্রীড়াচাতুর্যে সামাদ এক নূতন ইতিহাসের স্রষ্টা। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের পরাভূত করে দ্রুতগতিতে বল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বিস্ময়কর কৌশলে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর ঐ এক জোড়া শুধু পায়ের মধ্যেই লুকোনো ছিল ফুটবলের যাদু। এই বিস্ময়কর যাদুর জন্যই সামাদ ফুটবলের যাদুকর আখ্যা লাভ করেন। ফুটবল বিশারদদের মতে সামাদ ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেফট-আউট। কলকাতার এরিয়ান্স ক্লাবে গুরু দুঃখীরাম মজুমদারের কাছে সামাদ ফুটবলের শিক্ষা নেন। দিনাজপুরের তাজহাট দলের পক্ষ নিয়ে তিনি খেলা আরম্ভ করেন। এর পরে তিনি এরিয়ান্স, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দল, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের হয়ে লীগ, শীল্ড ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক খেলায় খেলেন। সামাদ ১৪ বছর রেলদলের পক্ষে খেলেন। ভারতীয় দলের হয়ে সামাদ ১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে জাভা, সিঙ্গাপুর, সিংহল সফর করেন।

• • • •

ক্রীড়া প্রকল্প

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে নিখিলভারত ক্রীড়াপরিষদের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ভারতীয় খেলাধুলো সম্বন্ধে বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়। ভারতীয় খেলোধুলোর মান উন্নয়ন এবং নবীন খেলোয়াড়দের উৎসাহদানের জন্য ক্রীড়াপরিষদ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে :—

(ক) এপ্রিল মাসে জাপানে যে এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তাতে ভারতীয় যুব ফুটবল দল পাঠান হবে।

(খ) মার্চ মাসে লণ্ডনে অল ইংলণ্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। চারজন কুশলী নবীন খেলোয়াড় এবং একজন ম্যানেজার—শিক্ষক নিয়ে ভারতীয় দলটি গঠিত হবে।

(গ) ম্যাঞ্চেষ্টারে আগামী জুন মাসে বিশ্ব ক্রিকেট ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসবে। ভারতের আটজন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন।

(ঘ) আসন্ন ডেভিসকাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারত অংশগ্রহণ করবে।

(ঙ) যুগোস্লাভিয়ার লুব্লজানা শহরে এপ্রিল মাসে বিশ্ব টেবিলটেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। চারজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা খেলোয়াড় ও একজন ম্যানেজার নিয়ে ভারতীয় দল গঠন করা হবে।

এছাড়াও ক্রীড়াপরিষদ নিখিলভারত ফুটবল ফেডারেশনকে এই মর্মে অনুমতি দিয়েছে যে তারা (ফুটবল ফেডারেশন) মার্চ মাসে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিতব্য সাদার্ণ পেস্টাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতার পঞ্চম ক্রীড়ানুষ্ঠানে সিংহলের একটি ফুটবল দলকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। ভারতের বিভিন্নস্থানে কয়েকটি প্রদর্শনী খেলার জন্য ডেনমার্কের একটি ফুটবল দলকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য ফুটবল ফেডারেশনকে অনুমতি দেওয়া হয়। এ বছরের শেষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারত সফর করবে। এই সফরে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদনের জন্য ক্রীড়া পরিষদ ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের কাছে সুপারিশ জানাবে বলে স্থির করেছে। ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতি বিনিময় পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যাধারাও মোটামুটি অনুমোদন করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে সোভিয়েত থেকে ফুটবল, এথলীট ও টেনিস দল ভারত সফর করবে এবং বিনিময়ে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দল সোভিয়েত দেশ পরিভ্রমন করবে। যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী ও যুক্তরাজ্য সফরের জন্য ভারতের টেনিস তারকা রামনাথন কৃষ্ণনকে অনুমতি দেওয়া হয়।

• • • •

মূক ও বধিরদের খেলাধুলা

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে নয়াদিল্লীর জাতীয় ষ্টেডিয়ামে মূক ও বধিরদের সর্বভারতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৫০০ প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। প্রতিযোগিতার বিষয়সূচী :—পুরুষ ও মহিলাদের জন্য—হকি বাস্কেট বল, ভিলবাইক, টেনিস, সাইকেল চালনা এবং টেবিল টেনিস, কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য—ফুটবল, কুস্তি ও রাইফেল চালনা (শুটিং) এবং কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য—ব্যাডমিন্টন। আগামী জুনমাসে ওয়াশিংটনে মূক ও বধিরদের দশম আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় একটি ভারতীয় দল প্রেরণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে।

• • • •

স্কুলছাত্রের বিশ্ব-রেকর্ড

সম্প্রতি জাপানের একজন স্কুল ছাত্র সুগুনুন ওয়াতানাবী ভারোত্তলনে নূতন বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ওয়াতানাবী ১২০·৫ কিলোগ্রাম ভার উত্তোলন করে। রুমানিয়ার প্রতিযোগী ১২০ কিলোগ্রাম ভারোত্তোলনে পূর্বতন বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন।

• • • •

নতুন, আরো নতুন

অষ্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা চিকিৎসক রন ক্লার্ক গত ১৩ মাসের মধ্যে নতুন তিনবার নিজের বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ করেন। তিনমাইল, ছয় মাইল এবং দশ হাজার মিটার দৌড়ে তিনি রেকর্ড ভঙ্গের গৌরব লাভ করেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক প্রতিযোগিতায় রণক্লার্ক পাঁচ মিটার দৌড়েও নিজের রেকর্ড ভেঙেছেন।

বাংলা উপন্যাসের বিস্মৃত অধ্যায়

[প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সব দেশে সব কালে উপন্যাস-পাঠকের মধ্যে দুইটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণীতে সচেতন পাঠকগোষ্ঠী যাঁরা গল্পের অন্তরালে জীবনের ভাষ্য প্রত্যাশা করেন। অপর শ্রেণীতে সাধারণ পাঠকগোষ্ঠী যাঁরা গল্পরস-পিপাসু, জীবনের ভাষ্য অপেক্ষা জীবনের রূপদর্শনে আগ্রহী। উপন্যাস মাত্রেই প্রথমোক্ত শ্রেণীর উপন্যাস নয়, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর উপন্যাসও প্রচুর পরিমাণে লেখা হয়। ঔপন্যাসিক সর্বত্রই জীবনের ভাষ্যকার নন, জীবনের রূপকারও। বস্তুত ইচ্ছে করলেই জীবনের ভাষ্যকার হওয়া যায় না। দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর ঔপন্যাসিক এক বিরাট পাঠকসমাজের চাহিদা মিটিয়ে থাকেন—জীবনের রূপ অংকনেই তাঁদের শিল্পসিদ্ধি।

গল্পপ্রিয় পাঠক ও জীবনের রূপকার ঔপন্যাসিক অবজ্ঞের নন। সাহিত্য সংসারে এঁদেরও প্রয়োজন আছে। বাংলা উপন্যাসে এই শ্রেণীর পাঠক ও ঔপন্যাসিকের অভাব কোনদিন ঘটে নি, ঘটা উচিতও নয়। একালেও তাঁদের দেখতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ নামক মহৎ জীবনশিল্পী উপন্যাসে জীবনের ভাষ্য রচনা করেছেন। অল্পসংখ্যক সচেতন পাঠক তা অনুধাবন ও আয়ত্ত করতে পেরেছেন। শরৎচন্দ্রের হাতে মানবজীবনের যে ভাষ্য রচিত হয়েছে, তা উপলব্ধি করতে পারেন এমন পাঠকসংখ্যা বাংলাদেশে কম নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মাঝে আর একদল লেখক আছেন যাঁরা জীবনের রূপ অংকন করেই পরিতৃপ্ত হয়েছেন। আমরা এঁদের কথা ভুলে যাই, সাময়িক তৃপ্তিলাভের পর এঁদের উপন্যাস অবহেলায় বিস্মৃতির রাজ্যে নিক্ষিপ্ত করি। মনে হয় এখানে আমাদের পাঠক-কৃত্য সম্পূর্ণ হল না।

'মানসী'-'মর্মবাণী'-'ভারতী'-'বিচিত্রা' পত্রিকার আমলে এই ধরণের ঔপন্যাসিক আমাদের মনের খাদ্য জুগিয়েছেন তা স্বীকার করতেই হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই শ্রেণীর তিন জন সার্থক প্রতিনিধিরূপে আমরা গ্রহণ করতে পারি। এঁদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আমাদের অবহেলা প্রশংসাযোগ্য নয়, কারণ এই অবহেলার দ্বারা পাঠক হিসেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হই। বস্তুত এই দায়িত্ব-সচেতনতাই বক্ষমাণ আলোচনার প্রেরণাস্থল।

ব্যক্তিজীবনে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-অনুরাগী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু লেখকজীবনে তিনি রবীন্দ্রানুসারী নন। তাঁর উপন্যাস রবীন্দ্র-উপন্যাসের অনুকৃতি বা অনুস্মৃতি নয়। সেখানে তিনি অন্য এক জগৎ গড়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রকাব্যের রোমান্টিক প্রভাবে ভারতী-গোষ্ঠির লেখকরা যে রোমান্টিক কল্পলোক গড়ে তুলেছিলেন, চারুচন্দ্র তার অন্যতম শিল্পী। তাঁর উপন্যাসের জগতে বিদেশী প্রভাবে নির্মিত প্লট ও পরিস্থিতি গড়ে তোলা হয়েছে। 'চোর কাঁটা', 'যমুনা পুলিনের

ত্রিধারিণী', 'দোটানা' উপন্যাসের সমস্তা বৈদেশিক, প্লট ও ট্রিটমেণ্ট বৈদেশিক। রোমান্স-প্রবণতা এই সকল উপন্যাসের প্রধান গুণ। চারুচন্দ্রের হাতে পড়ে পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক জীবনের বাঙালি রূপান্তর সাধিত হয়েছিল। আজ সে-সব উপন্যাস পড়ে আমাদের কাছে অবাস্তব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু একদিন তা অসংখ্য বাঙালী পাঠকের মনোরঞ্জন করেছিল, তা স্বীকার করতেই হয়। সমাজের অভিজাত প্রেম-বিরহ-মিলন কথা চারুচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান উপাদান। তার নিপুণ চিত্রণে তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন। এই সব উপন্যাসে জীবনের কোন গভীর দ্বন্দ্ব নেই, জীবনের কোন দুরন্ত প্রশ্নের আলোচনা নেই, নায়কের আত্মজিজ্ঞাসা নেই, জটিল দুশ্ছেদ্য প্রশ্নসংকুলতায় লেখকের অশান্তি নেই। আছে আবেগপূর্ণ সরস বর্ণনা, চরিত্রগুলির প্রতি লেখকের অসীম মমতা, বর্তমান মুহূর্তের তীব্র উপলব্ধি। আর সবার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে জীবনের যমুনা—সে নীল যমুনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে বাঙালির বাস্তব-জীবনের ছবি নয়, পাশ্চাত্ত্য জীবনের ছবি। চারুচন্দ্রের উপন্যাসের আকাশ ভারতবর্ষের আকাশ নয়, তা ইওরোপের আকাশ, সেখানে পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক জীবনের নানা রঙের মেঘের রঙ্গক্রীড়া। হোক তা অবাস্তব, তবু ত্রিশের যুগে বাঙালি পাঠককে তা মুগ্ধ করেছিল।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। এঁদের উপন্যাসে বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছায়ার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিকতা এঁদের উপন্যাসের মূল উপাদান নয়। তবে একটি বিষয়ে তিনজনের রচনার ঐক্য আছে—তা হল পারিবারিক জীবনের প্রতি নিষ্ঠা। ভাবগভীরতা এঁদের রচনায় নেই, কিন্তু আছে সজীবতা, আছে জীবনের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি, আছে সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি স্নেহশীলতা।

যে মনন ও চিন্তাশীলতা থাকলে উপন্যাসে মানবজীবনের ভাষ্য রচনা করা যায়, তার অনুপস্থিতি প্রভাতকুমারের উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। তবু বাস্তবতার অভাব তাঁর উপন্যাসে কখনো ঘটে নি। প্রভাতকুমার জীবনবাদী এই অর্থে যে তিনি উপন্যাসে স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার এক চিরন্তনী ফল্গুধারা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। জীবনের প্রতি তীব্র তীক্ষ্ণ নিরাসক্ত দৃষ্টি নয়, সহজ সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টি তাঁর উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রভাতকুমার মানব হৃদয়ের সংশয় বেদনা জিজ্ঞাসার শিল্পরূপায়ণে অগ্রসর হন নি, মানব হৃদয়ের অন্তঃপুরে সনাতন বিরহ-মিলন-লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'রমাসুন্দরী', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ', 'জীবনের মূল্য' 'সিন্দুর কৌটা', 'মনের মানুষ', 'আরতি', 'সত্যবালা' 'সুখের মিলন', 'সতীর পতি', 'প্রতিমা', 'গরীব স্বামী', 'নবদুর্গা', 'বিদায়বাণী' উপন্যাসের নামকরণেই প্রভাতকুমারের মনোবৃত্তি প্রতিফলিত। জীবনে তিক্ততা নয়, আশাভঙ্গ নয়, হতাশা নয়, সমবেদনা ভালবাসা প্রীতিই তাঁর উপন্যাসের ফলশ্রুতি। একদিন এইসব উপন্যাসের ভক্তপাঠক সংখ্যা কম ছিল না। শরৎচন্দ্র ছাড়া প্রভাতকুমারের মতো জনপ্রিয় লেখক বাংলায় বিরল ছিল না।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসের বর্ণনীয় বাঙালির পারিবারিক জীবন। তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে

যে জীবন-নদী প্রবাহিত, তার উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গে জীবনের আনন্দগান ধ্বনিত হয়েছে। জীবনের দুর্ভেদ্য সমস্যা সংকুলতাপূর্ণ বাঁক ও চড়া সেখানে অনুপস্থিত। চরিত্রসৃষ্টি অপেক্ষা ঘটনাবিন্যাসেই তাঁর ঝোঁক, বিশ্লেষণ অপেক্ষা আলেখ্য রচনায় তাঁর নৈপুণ্য, জীবনের বিস্তার ও গভীরতা সৃষ্টি অপেক্ষা অপ্রশস্ত অগভীর জীবনচিত্র অংকনেই তাঁর সিদ্ধি। জীবনের গভীর তলদেশ মন্থন করে হলাহল বা সুধা কিছুই তিনি আহরণ করেন নি, মন্দ মন্থর রঙ্গে জীবন নদীর উপর দিয়ে ভেসে যাওয়াতেই তাঁর আনন্দ। সুখপাঠ্য, চিত্তাকর্ষক, মনোরঞ্জন উপন্যাস রচনাতেই তাঁর শিল্পসিদ্ধি। তাঁর হাতে সবাই ক্ষমা পেয়েছে, এমনকি 'রত্নদীপে'র খগেন ও 'নবীন সন্ন্যাসীর' গদাধরও তাঁর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত নয়। নীতিবাদের কঠোর শাসন তাঁর উপন্যাসে নেই, গভীর বিশ্লেষণ নেই, আছে সহৃদয় ক্ষমাপরায়ণ পিতৃ-হৃদয়ের স্নেহের স্নিগ্ধতার। 'রমাসুন্দরী'ও 'সিন্দুরকৌটা' পড়তে পড়তে মনে হয় একি উপন্যাস, না সরস ভ্রমণ-কথা। 'রত্নদীপে'র বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্রই প্রভাতকুমার এই পরিচয়ে দেখা দিয়েছেন। আখ্যান বৈচিত্র্য ও ঘটনাসৃষ্টিতে তাঁর শিল্পিসত্তা মুক্তি লাভ করেছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

তবু প্রভাতকুমারের উপন্যাস অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তা থেকে প্রমাণ হয়, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাঙালি পাঠক যা পায়নি তা প্রভাতকুমারের উপন্যাসে পেয়েছিল। তিনি গল্পপিপাসু বাঙালি পাঠকের তৃষ্ণা মিটিয়েছিলেন। 'সিন্দুরকৌটা' উপন্যাসের পরিণতি আজকের কোনো উপন্যাসিক বা পাঠক মেনে নেবেন না, কিন্তু সেদিন বিনা প্রতিবাদে পাঠক তা মেনে নিয়েছিল। একমাত্র 'রত্নদীপ' উপন্যাসে ব্যক্তিকে একটা নির্দিষ্ট পটভূমিতে স্থাপন করে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রূপায়ণের সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু লেখক সে পথে অগ্রসর হননি, বৌরাণীর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট রেখে ঐ বক্রতা থেকে তিনি পাঠককে সরিয়ে নিয়ে এলেন। বৌরাণীর প্রতি রাখালের শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে তিনি পাঠককে ভোলালেন। আসল কথা, আমরা একালে উপন্যাসের সার্থকতা যে ক্ষেত্রে দেখতে চাই, সেকালের লেখক ও পাঠক সেক্ষেত্রে দেখতেন না। তাই 'রত্নদীপ', 'সিন্দুর-কৌটা'ও 'রমাসুন্দরী'র সুলভ সমাধানে সেদিনের পাঠক পরিতৃপ্তি লাভ করেছিল। জীবনের প্রতি এই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিকে আমরা মেনে নিতে পারি না, কিন্তু এর আন্তরিকতাকে অস্বীকার করতে পারি না।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে এই জীবনসৃষ্টি আরো পরিণত রূপলাভ করেছিল। যে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণকে প্রভাতকুমার এড়িয়ে গেছেন, উপেন্দ্রনাথ তাকে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর জীবনদৃষ্টিতে গভীর চিন্তাশীলতার অভাব ঘটে নি কিন্তু তিনিও জীবনকে আমাদের মতো বঞ্চনা ও হতাশার রঙ্গস্থল মনে করেন নি। জীবনের লঘু সরলতা ও সুস্থ পরিমার্জনাকে উপেন্দ্রনাথ বিশেষ মূল্য দিয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র অনুরাগী, কিন্তু তিনি শরৎ-অনুসারী লেখক নন। শরৎচন্দ্রের জীবন-সমালোচনাকে তিনি গ্রহণ করেন নি। জীবনে বঞ্চনা প্রতারণা হতাশাকে তিনি

অধিক মূল্য দিতে রাজি ছিলেন না। ভাবগভীরতার অভাব তাঁর উপন্যাসে আছে, কিন্তু তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ তিনি করেছেন। 'রাজপথ' উপন্যাসের সমাধান একালের পাঠক ও লেখক মেনে নেবেন না, কিন্তু উপেন্দ্রনাথ জীবনে সাধনা-পুরস্কারের মূল্যকে অস্বীকার করেন নি।

উপেন্দ্রনাথও প্রধানত পারিবারিক জীবনের শিল্পী। আমাদের পারিবারিক জীবনের সনাতন বিরহ-মিলন কথা রচনায় তাঁর শিল্পিসত্তা তৃপ্তিলাভ করেছিল। আমাদের পরিচিত পারিবারিক জীবনের মধ্যে প্রেমের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু সে প্রেম কোথাও উদ্দেশ্য হয়ে পারিবারিক জীবনের তটভূমিকে উল্লঙ্ঘন করেনি। 'শশিনাথ', 'রাজপথ', 'অমূল তরু', 'অভিজ্ঞান', 'আশাবরী', 'বিধুরী ভার্যা', 'অন্তরাগ', 'ছদ্মবেশী', 'বিকশিত' প্রভৃতি উপন্যাসে উপেন্দ্রনাথ মানবজীবনের সনাতন বিরহ মিলন না থাকাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। পাঠক মনোরঞ্জনকে নিম্নশ্রেণীর শিল্পকলা বলে উপেন্দ্রনাথ মনে করতেন না।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরে উপন্যাস লিখেছেন। চারুচন্দ্র মণীন্দ্রলালের মতো বিশুদ্ধ রোম্যান্সের রাজ্যে তিনি ভ্রমণ করেছেন, আবার সত্যের কঠোরতর উপাদানে নির্মিত জীবনের রাজপথেও তিনি পদক্ষেপ করেছেন। তিনি কোথাও জীবন সম্পর্কে একপেশে দৃষ্টি গড়ে তোলেন নি। উপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রধান কথা হ'ল—তাঁর শিল্পজীবনের সঙ্গতি বোধ। মানুষের জীবনে ক্রুর নিয়তির লীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু তার ফলে তিনি মানব জীবন সম্পর্কে বিশ্বিষ্ট হন নি। জীবনের রঙ্গমঞ্চে নরনারীর আপন কর্মের ফলাফল তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু কোথাও মানুষ সম্পর্কে হতাশ হন নি। মানব জীবনের মধ্যে হাসির ফল্গুধারা তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং সহানুভূতি বলে সকল দুঃখহতাশা পেরিয়ে গিয়েছেন। মানবজীবন সম্পর্কে এক সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী উপেন্দ্রনাথ বরাবর তাঁর উপন্যাসে রক্ষা করেছেন। ফলে মানবজীবন তাঁর কাছে হাসিকথার রঙ্গমঞ্চ বলে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর শিল্প দৃষ্টিতে এমন একটি অনাসক্তিযোগ ছিল যা তাঁকে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের হাত থেকে রক্ষা করেছে। এর বলেই তিনি জীবনের জটিল গ্রন্থিমোচন করতে পেরেছেন। মানুষের শুভ বুদ্ধিতে তিনি কখনো আস্থা হারান নি। জীবনের মহত্ত্ব ও মহিমার প্রতি তাঁর ছিল অটুট বিশ্বাস। এর জোরেই তিনি 'বিধুরী ভার্যা' ও 'অমলা' উপন্যাসে জীবনের জটিল গ্রন্থি মোচন করতে পেরেছেন। আবার 'অন্তরাগ' ও 'বিকশিত' উপন্যাসের রমণীয় পরিণতি চিত্রণে সক্ষম হয়েছেন। জীবনের হাসিকান্নাকে তিনি সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন ও উপন্যাসে তাকে শিল্পসুন্দর মূর্তি দিয়েছেন।

চারুচন্দ্র, প্রভাতকুমার, উপেন্দ্রনাথ-সৃষ্ট জগৎ আজ আমাদের কাছে দূরতর হীন, কিন্তু তা একদিন বাঙালি পাঠককে ক্ষণেকের আশ্রয় দিয়েছিল, একথা অবশ্যস্বীকার্য।

কোরামে ভাষণ দান প্রসঙ্গে কলিকাতায় সোভিয়েত কন্সাল জেনারেল শ্রীএন. আই. তোইনক নবীন বিকাশশীল দেশগুলিকে সোভিয়েত সাহায্য দানের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের উপর জোর দিয়া বলেন : "সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে তাহারা সৃষ্টিকারী বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে, রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের পর স্বাধীন অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া তোলার ব্রত নবীন ও জাতীয় মুক্তি—সংগ্রামী বিকাশশীল দেশগুলির প্রতি সর্বপ্রকার সাহায্য—সমর্থন দেওয়াকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র তাহার আন্তর্জাতিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করে।"

বিগত ১৯৫৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় তিলাই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়া সোভিয়েত-ভারত অর্থনৈতিক সহযোগিতার যে ঐতিহাসিক দশক সুরু হয় এবং অতি সম্প্রতি বোকারো ইস্পাত প্রকল্প নির্মাণের জন্য সোভিয়েত-ভারত চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়া যাহা ক্রমেই অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, কোরামের বক্তাদের ভাষণে ভারতের শ্রমশিল্পায়নের পথে সেই ফলপ্রসূ সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতার এক দশক পূর্ণ হওয়ায় আন্তরিক আনন্দ ও গর্ব ফুটিয়া উঠে।

কোরামের আলোচনায় খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, সোভিয়েত-ভারত প্রকল্পসমূহের প্রধান ও বিশিষ্ট জননেতাগণ বক্তৃতা করেন।

আলোচনা-কোরামে আগত অতিথিবর্গকে স্বাগত জানাইয়া কলিকাতায় সোভিয়েত দূতাবাসের বার্তা বিভাগের প্রধান শ্রীভি. এ. মাখোতিন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, সোভিয়েত-ভারত অর্থনৈতিক সহযোগিতার দশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে শুধু ভারতেই নহে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও সভা-অনুষ্ঠানাদি হইতেছে। এই সহযোগিতার বার্ষিকীতে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও অন্যান্য নেতৃবর্গ যে বাণী দিয়াছিলেন উহা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি জানান যে, সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতায় নির্মিত প্রকল্পগুলিতে যুক্তভাবে এই বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ভারতের প্রধান প্রধান ১২টি ভাষায় এবং ইংরেজী ও বেসালী ভাষায় প্রকাশিত "সোভিয়েত দেশ" পত্রিকার উদ্যোগে কলিকাতায় যে আলোচনা-কোরাম অনুষ্ঠিত হইতেছে, উহাকে কার্যত এই সহযোগিতা-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের এক কেন্দ্রীয় উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বলা যায়। কারণ এখানে উক্ত অঞ্চলের প্রকল্পগুলির বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত রহিয়াছেন।

একমাত্র লক্ষ্য—ভারতীয় জনগণের কল্যাণ

সোভিয়েত কন্সাল জেনারেল শ্রীএন. আই. তোইনক আরও বলেন যে, স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি ও শ্রমশিল্প গড়িয়া তোলার জন্য ভারতের প্রচেষ্টার প্রতি সোভিয়েত জনগণ সর্বদাই অত্যন্ত সাগ্রহে তাকাইয়া আছেন। ভারত যাহাতে তাহার স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতে পারে এবং পরনির্ভরশীলতা হইতে মুক্ত হয় তজ্জন্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপকভাবে ভারতকে মূল ও ভারীশিল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। এই সাহায্য—সহযোগিতা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ও প্রকল্পগুলিতে করা হইতেছে। ভারতের সহিত সোভিয়েত দেশের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার একমাত্র লক্ষ্য হইল বন্ধু ভারতীয় জনগণের উন্নতি ও বিকাশ, আধুনিক শ্রমশিল্পায়নের যুগে ভারতের দ্রুত অগ্রগতি।

———

উদাত্ত আহ্বান

ইংরাজী শিক্ষার আমদানী Patriotism—স্বাদেশিকতা। স্বামিজী সেই খাতে আনিতে চাহিলেন National Regeneration, National Integration। এই রাজসিকতার দীক্ষা দিয়া খুলিতে চাহিলেন শক্তির উৎস। স্বামিজী বলিলেন, "আমি স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী। স্বদেশ-হিতৈষিতা সম্বন্ধে আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎ কার্য করিতে হইলে তিনটি জিনিসের আবশ্যক। প্রথমত হৃদয়বেত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি বিচার শক্তি আমাদের কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েক পদ অগ্রসর করে মাত্র; কিন্তু হৃদয় দ্বার দিয়া মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে। জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশ-হিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও, তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছনা যে অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত গগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় কি নিদ্রা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম, যশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয় সম্পত্তি এমন কি শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশ হিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ—"

—বিবেকানন্দ

শ্রীআয়ুর্বেদমের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

* মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে
* নিদ্রাহীনতা দূর করে
* কেশপতন রোধ করে
* অকালপক্কতা বন্ধ করে

দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত

মানে ও গন্ধে অতুলনীয়
একবার ব্যবহার করুন।

বড় বড়
ষ্টেশনারী দোকানে
পাওয়া যায়।

শ্রীআয়ুর্বেদম.

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

বিশ্ব-উৎসব

॥ সচিত্র সংযোজন ॥

হিমগিরি থেকে এল উত্তরে হাওয়া...

গ্রামে এখন তুষতুষলি ব্রত করার সময়। শীতে মরণাপন্ন সূর্য ঠাকুর! মানুষ ডাকছে—
'উঠ, উঠ, সূর্য ঠাকুর, কিকিমিকি দিয়া।
সূর্য ঠাকুর কুয়াশায় চাপা পড়ে আছেন।
ডাক শুনেও উঠতে পারেন না। করুণভাবে
নিজের অক্ষমতার কথা জানান—'উঠিতে
পারি না আমি ইষলের লাগিয়া।' কিন্তু
আপনি নির্ভয়। কেননা আপনার আছে

বোরোলীন

অ্যাডেপ্‌স্‌ল্যানের আশ্চর্য উপাদানে তৈরী
সেই ভেষজযুক্ত ক্রিম, যা শীতের দিনে
হবে আপনার ত্বকের বরাভয়। গা দিয়ে
খড়ি ওঠা, ত্বক ফাটা, ত্বক কুঁচকানো বন্ধ
ক'রে আপনাকে দেবে অম্লান রূপলাবণ্য।

বোরোলীন
হাউস,
কলিকাতা-৩

॥ নিউইয়র্কের ভ্রাম্যমান অভিনয় উৎসব ॥

অগ্নিপক্ষ

পাড়ায় পাড়ায় যেমন সার্বজনীন উৎসবের মেলা—পল্লীর পথ পার্ক কিংবা মুক্ত অঙ্গন ঘিরে শামিয়ানা টাঙানো, ফুলপাতা আলোর উৎসাহ, তোরণদ্বার নির্মাণ, বহু দর্শকের মেলা একটি উৎসবের প্রস্তুতি—তেমনি আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের গ্রীষ্মকালীন সময়ে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক উৎসবের প্রস্তুতি আজকাল হচ্ছে মুক্ত অঙ্গনে ভ্রাম্যমান থিয়েটারের মেলা।

থিয়েটার বলতে আমরা বুঝি কোন নির্দিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ। হেথা সাজানো গুছানো অডিটোরিয়াম—আলো আর দৃশ্য ঝলমল একটি রঙ্গমঞ্চ। সেখানে বিজ্ঞাপিত নির্দিষ্ট কোন নাটকের অভিনয়। সাজগোজ, দৃশ্যসজ্জার আলোকসম্পাত বিখ্যাত নট নটী—কলসার্ট আরো কতো কী!

আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে ব্রডওয়ে কিংবা ব্রডওয়ের আশেপাশে কোন বিখ্যাত রঙ্গালয়—সেখানে নিউইয়র্কবাসী নিয়মিত থিয়েটার যাওয়ার জন্যে মোটা অঙ্কের দর্শনী দিয়ে থাকেন। সে অভিনয় সম্পর্কে ওদেশের দর্শকদের একটা আলাদা মন আছে। কিন্তু—সাধারণ ঘরের মেয়েরা হয়তো রান্না বান্নার কাজে ব্যস্ত, কিংবা স্বামী পুত্র পরিজনের জন্যে ঘর করার কাজ নিয়ে গৃহিনীপনায় হয়তো মাথা ঘামাচ্ছেন—ব্রডওয়ের কোন ঐতিহ্যমক আলো ঝলমল রঙ্গালয় সেক্সপীয়ারের কী নাটক অভিনীত হচ্ছে তা জানবার অবকাশ তারা পাচ্ছেন না। কিংবা তরা গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে ঘরের কর্তা হয়তো সবে কাজের মেশিন থেকে মুক্ত হয়ে সংসার বন্ধনে আবার পীড়িত হয়ে উঠছেন, তখন যদি দক্ষিণের বাতাসে খোলামেলা জায়গায় জীবনের একটু বিরতিকে উপলব্ধি করা যায়—তা হলে সত্যিই তো মনে হয় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ থেকে নবীন মেঘের সঞ্চারিত নীল নবঘন সুন্দর রস অনুভূতি। হৃদয় দোলায় তখনি তো পাখির ছন্দ সঞ্চারিত হয়ে ওঠে,—'হৃদয় আমার আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে!'

প্রতিদিনের জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তির জন্যেই তো উৎসবের আয়োজন। আর সে উৎসবে ব্যয়ের জন্যে কানাকড়িটি পর্যন্ত দিতে হয়না, সে উৎসবের মতন উৎসব আর আছে নাকি কিছু।

আমেরিকার ভ্রাম্যমান থিয়েটার দল গ্রীষ্মের ঋতুতে ঋতুতে আজ কয়েক বছর ধরে সেই উৎসবের আয়োজন করছেন।

বড়ো বড়ো নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রয়োজন নেই। সমৃদ্ধশালী পোষাক আশাক কিংবা দৃশ্যসজ্জার—না, তারও দরকার নেই। দরকার দর্শকদের মুগ্ধ করার মতন অভিনয়ের উপাদান। আর তা দিয়েই বশ করা হয় সব রকমের দর্শকদের।

শহরের খেলবার মাঠ, পার্ক কিংবা প্রশস্ত রাস্তা—সেইখানেই সুরু হয় অভিনয়। আর সে অভিনয়ের জন্যে কোনো রকমের দর্শনীর বালাই নেই। জীবনরসে আপ্লুত এই অভিনয়ের আঙ্গিক কলা কৌশল এতোই সহজ আর মনোজ্ঞ যে সাধারণ দর্শকমাত্রই এর অভিনয় ধারার সঙ্গে একাত্ম হবার সুযোগ পান। যেমন—আমাদের দেশের যাত্রা বা অপেরা, কিংবা বহুরূপী কথকথা—

সেই ধরণের পরিকল্পনায় এই যাযাবর অবৈতনিক থিয়েটার—দর্শক আর অভিনেতাদের মধ্যে অভিন্ন এক সখ্যতা স্থাপন করে চলেছে। বিনা দর্শনীতে থিয়েটার দেখানোর পরিকল্পনা আমেরিকার এই প্রথম প্রয়াস নয়। প্রযোজক জোসেফ পাপ ১৯৫৭ সালে প্রথমে সেক্সপীয়র উৎসবে নিউয়র্কের সেণ্ট্রাল পার্কে বিনা দর্শনীতে সেক্সপীয়রের নাটক মঞ্চস্থ করলেন। ওদেশের নাগরিক প্রতিনিধিগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকদল এবিষয়ে আগ্রহী হয়ে মিষ্টার পাপের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। সেক্সপীয়র উৎসব জাতীয় উৎসবে পরিণত হলো।

তারপর থেকে প্রতিবছরই এই নাটকউৎসব গ্রীষ্মকালীন একটি সংস্কৃতিমূলক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু প্রযোজক মিষ্টার পাপের এতে মন ভরলো না! বছরে একবার, আর বিশেষ করে সেক্সপীয়রের নাটক—তার গণ্ডিও যেন সীমাবদ্ধ। নাটক দেখার মন নিয়ে তা যেন দেখতে যেতে হয় দর্শকদের। শুধু তাইই নয়,—মহাকবি সেক্সপীয়রের নাটক.—তা প্রসাদী। তার আবেদন রসিকচিত্তে যেমন সমাদৃত,—অত্যন্ত সাধারণ আজকের মানুষের কাছে সে নাটক ততখানি সাড়া জাগাতে পারে না।

মিষ্টার পাপের চিন্তায় তাই এই ভাবনা,—কেমন করে দৈনন্দিন জীবনের ধারায় সহজ সরলভাবে মানুষকে নাটক দেখানো যায়—যা নাকি অভিনয় বলেই মনে হবে না। যেখানে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি—এমন কোন মন থাকবে না।

মিষ্টার পাপ উদ্ভাবন করলেন ভ্রাম্যমান অবৈতনিক থিয়েটার। এর জন্যে রঙ্গমঞ্চের দরকার নেই, যেখানে সেখানেই এই থিয়েটার হতে পারে। ধরুন,—পাড়ার কোন ইস্কুলের বড় ঘরে কিংবা মাঠে, রাস্তার কোন জায়গায়—দু'খানা ট্রাক এসে থামলো। সেই ট্রাক থেকে থিয়েটারের সাজ-সরঞ্জাম নামলো, নামলো অভিনেতা অভিনেত্রীর দল। মাত্র কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যেই সুরু হয়ে গেলো অভিনয়। সেই ট্রাকগুলিই হলো ষ্টেজ, গ্রীণরুম, আলোক সম্পাতের জায়গা। কী আশ্চর্য কৌশল! যেন মাঠের মাঝখানে তাঁবু ফেলে বেদুইন দলের পরিস্থিতি।

এই কলা কৌশলে শুধু যে আজকের নাটকই অভিনীত হচ্ছে,—তা নয়,—সেক্সপীয়র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকারের নাটকও স্বচ্ছন্দে অভিনয় করা হচ্ছে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে।

দু'খানা ট্রাকের ভ্রাম্যমান নাটুকে দল পৌঁছবার আগে প্রচার পত্রে বিজ্ঞাপিত করা হয় তাদের আগমন বার্তা। ভ্রাম্যমান গাড়িতে লাউডস্পীকার যোগেও ঘোষিত হয় নাটকের বিষয় বস্তু, নাটক অভিনয়ের নির্দিষ্ট স্থান। আর সে-স্থান পাড়া-পড়শীদের ঘর বাড়ির কাছাকাছিই।

শেষ ট্রাকে থাকে ফোল্ডিং চেয়ার, কাঠের বেঞ্চি, হাজার দুই লোকের বসবার মতন উপাদান নিয়ে। তা ছাড়াও শ'দেড়েক দাঁড়াবার জায়গা। মনে করুন—পাড়ার পার্কটার প্রকাণ্ড মাঠে মাত্র কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যেই সুরু করা হবে জনপ্রিয় কোন নাটক অনুষ্ঠান। রান্নাঘর থেকে বাড়ির বৌ-ঝিরা শুনলেন,—আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভ্রাম্যমান নাটুকে দল আসছেন। বৌ-ঝিরা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে নিলেন। পুরুষরা কাজ-কর্ম থেকে বাড়ি ফিরে জিমুচ্ছিলেন—গ্রীষ্মের সন্ধ্যার দুর-দুরে বাতাসের আমেজ তাঁদের মনেও দোলা লাগালে। প্রসূতি মা—কোলের বাচ্চাকে ফিডিং বোতলে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন—তাঁদেরও থিয়েটার যাওয়ার কোন বাধা নেই।

গ্রীষ্মের রাত। আটটায় অভিনয় আরম্ভ হবে। পূর্বাহ্নে ঘোষিত হয়েছে গ্রীষ্মকালীন নাট্য-উৎসবে "A Midsummer Night's Dream'—অভিনীত হবে।

খোলা মেলা জায়গা। ভ্রাম্যমান ট্রাকগুলি অভিনেতা অভিনেত্রী আর অভিনয়ের সাজ সরঞ্জাম এসে পড়লো বলে।

দর্শকদের ভিড়ের আর অন্ত নেই। এক একটি পরিবারের সকলেই উপস্থিত হয়েছে—বাপ-মা, ভাই বোন, স্ত্রী-পুত্র কন্যা—পরিবারের সবাই। মায়েরা এসেছেন কচি বাচ্চা বুকে নিয়ে, ব্যাকুলনেত্রে যুবক যুবতীরা অপেক্ষা করছে—কখন অভিনয় আরম্ভ হয়। দর্শকদের মধ্যে আগ্রহের আর অন্ত নেই। সময় কাটাবার জন্যে কারুর পকেটে পকেট-রেডিও, কারুর সঙ্গে খাবার দাবার, কেউবা গল্প গুজবে আসর মাতিয়ে রেখেছে।

ভ্রাম্যমান থিয়েটারের দল এসে পড়লো। নিমেষেই ট্রাকের উপাদানে উন্মুক্ত মাঠে আরম্ভ হলো 'A Mldsummer Night's Dream' অভিনয়। পরীর দেশের স্বপ্নময় রোমাঞ্চকতায় আসর ভরে উঠলো। দর্শকরা স্তব্ধ। ভুলে গেছে তারা বাস্তবের পরিবেশ।

মায়ের কোলে শিশু, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী—দর্শকদের সবাই নিগ্রো অভিনেত্রী এলেন হোলির পরীর রাণীর অভিনয়ে মুগ্ধ। তাদের সবার আজ মহাকবি সেক্সপীয়রের রূপকথার সোনার কাঠির ছোঁওয়া।

সেক্সপীয়র উৎসবে অবৈতনিক অভিনয়-উৎসব এতো জনপ্রিয় হ'য়ে উঠলো যে এক জায়গায় একবার দু'বার অভিনয়ে দর্শকদের চাহিদা মেটানো যাচ্ছেনা আর। বাইশটি প্রদর্শনী করেও দর্শকদের আগ্রহকে প্রশমিত করা যায় না।

ভ্রাম্যমান অবৈতনিক থিয়েটারের দল বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পাড়ার স্কুল বাড়ি থেকে খেলার মাঠ, এমনকি সদর রাস্তার জায়গায় জায়গায় অভিনয় শুরু করতে হচ্ছে।

শুধু সেক্সপীয়র নয়,—কতো রকমের বই। প্রহসন থেকে আধুনিক, রোমান্স থেকে পরিপূর্ণ বাস্তবতা কষাঘাত থেকে কৌতুক—ব্যঙ্গ থেকে সরল হা'স,—বিভিন্ন ধরণের ছোটো বড়ো সব নাটক। 'The shoe maker's prodigious wife', 'The Puppet play of Don Ceristobal' এবং মলিয়ের 'The Doctor inspite of Himself'—আরো কত রকমের নাটক নিত্য অভিনীত হচ্ছে।

অভিনেতা রঙ্গমঞ্চের ওপরে সাজ পোষাকে আর আলাদা মানুষ নয়—অভিনেতা এখন দর্শকদের কাছাকাছি—হৃদয়ের অত্যন্ত সন্নিকট।

আমেরিকার এই ভ্রাম্যমান নাটুকে দলের অভিনয় সেখানকার বৈজয়ন্তি উৎসবেরই অঙ্গ।

॥ চির নূতন কাবুকী ॥

হাসি ভট্টাচার্য

সৌন্দর্যের দেশ জাপান। প্রশিয়ান শিল্প সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ জাপানের ছবিতে, কবিতায়, গানে, নাচে এবং নাট্যকলায়।

কাবুকী জাপানের নিজস্ব ঐতিহ্যগত নাট্যশিল্প। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কাবুকী নাটের প্রথম পরিকল্পনা, তারপর বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কাবুকী অধুনা জাপানের প্রধান নাট্যশিল্পে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে নাট্যশিল্প প্রগতিপন্থী—তার আঙ্গিক রীতিনীতিও আধুনিক কালের, কিন্তু তবুও ক্ল্যাসিক্যাল কাবুকীর আবেদনও আধুনিককালে জাপানের নাট্যানুরাগীদের কাছে বড়ো কম নয়। কাবুকীর নামে আজও জাপানে নাট্যরসিকদের চিত্ত আপ্লুত।

আমাদের দেশে যাত্রার যেমন সামাজিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক জমজমাটই বেশি—কাবুকী নাটেও সেই রকম ঐতিহাসিক রাজা-রাজড়াদের জাঁকজমক—বেশভূষা এবং দৃশ্যাবলীতেও তেমনিই রঙের সমারোহ। অধুনা 'ওয়াগাতা' অর্থাৎ পুরুষ অভিনেতারাই কাবুকী নাটে মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন। সাজপোষে, চেহারায় এবং ভঙ্গিতে কে বলবে তাদের পুরুষ! কিন্তু প্রাচীনকালে কাবুকী শুধু মাত্র মেয়ে অভিনেতাদের দ্বারাই অভিনীত হতো। সে সব মেয়েদের অভিনয় এবং মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে দর্শক সমাজ কাবুকী অভিনেত্রীদের 'দেহিপদ বল্লভে' আত্ম-সমর্পণ করতে থাকায় জাপান রাষ্ট্র বাধ্য হলেন আইন করে কাবুকী অভিনয়ে মেয়েদের অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ করায়।

১৬২৯ সাল থেকে আড়াইশো বছর পর্যন্ত এই আইন বলবৎ থাকলো; তারপর কাবুকী যখন সুসংস্কৃত হলো তখন জাপান সরকার এই নিষেধ-আজ্ঞা তুলে নিলেন। কিন্তু 'ওয়াগাতা' অর্থাৎ স্ত্রী ভূমিকায় পুরুষ অভিনেতার দল এতোদিনে এতো চমৎকার মেয়েলিপনা শিখে নিয়েছে যে—কাবুকীর স্ত্রী-অভিনয়ে মেয়েদের আসার পথ একেবারে বন্ধ। 'ওয়াগাতা'দের সঙ্গে তাদের আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস নেই।

কাবুকীরা প্রসঙ্গতিতে অনেক বিবর্তনবাদ। সামন্ত-তন্ত্রের কথা কাহিনী, জাঁকজমকপূর্ণ আসর উজ্জ্বল ঝলমলে বেশভূষার যাত্রাভিনয় থেকে কাবুকীর অগ্রগতি সামাজিকতায়। খোলা জায়গা থেকে স্টেজে। কতো রকমের পরিবর্তন। পরিবর্তন অভিনয় আঙ্গিকে—নাটক রচনায়, দৃশ্য সম্ভারে,—আলোক সম্পাতে। পরিশেষে অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভূমিকায় পুতুলের সংযোজনায়। মনস্তত্ত্বিদ চিকাম্যাৎসু যাঁকে জাপানের সেক্সপীয়র বলে অভিহিত করা হয়, তিনি কাবুকী অভিনয়ের ধারা একেবারে পালটে দিলেন। কাবুকী অভিনয়ের জন্যে পূর্বে নির্দিষ্ট নাটকের ভাণ্ডার ছিলো। প্রায় তিনশো কাবুকী নাটক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনীত হতো। কিন্তু জনপ্রিয়তার চাহিদায় সে ভাণ্ডার পরবর্তীকালে বেড়ে যেতে লাগলো। শুধু যে কাবুকী রীতির নাট্যকারই বিশেষ পদ্ধতিতে নাটক

লিখতে সুরু করলেন, তা নয়—বিখ্যাত লেখকরাও কাবুকীতে আকৃষ্ট হতে লাগলেন। তাঁদের রচনা সম্ভারে কাবুকীভাণ্ডার পরিপূর্ণ হতে লাগলো। কাবুকীতে নতুন আস্বাদ, নতুন চিন্তাধারা,—আর আজিকের নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কাবুকীর নিজস্ব ঘরোয়ানা আর সীমাবদ্ধ রইলো না!

কাবুকীর বিশেষ ধরণের নৃত্যনাট্যকে শোসা-গোটো (Shosa-goto) বলা হয়। প্রথমে এটা শুধু নাচেরই মেলা ছিলো। নৃত্য-নাট্যের বিষয় বস্তুতে থাকতো পরিপূর্ণ গল্প এবং কতকগুলি আবার বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়। নৃত্য-শিল্পীরা নাচের অভিব্যক্তিতে বস্তু সঙ্গীতের আবহ সঙ্গীতে তার যথাযথ রূপ দিতেন। তারপর নৃত্যের সঙ্গে গীতেরও সংযোজনা করা হলো। নৃত্য-গীত আবহ বস্তু সঙ্গীত এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের সংযোজনায় কাবুকীর নৃত্যনাট্য এখন দর্শক সমাজকে সম্মোহিত করে রাখে।

আমাদের দেশে যেমন দেবদাসী নৃত্য, কাবুকীতে তেমনি মাসুমে ডোজোজি (maiden of the Dojoji temple)—নৃত্যে আত্ম-নিবেদনের মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি।

আরো অনেক রকমের গীতিনাট্য কাবুকীর সম্ভার। রূপ আর সৌন্দর্য, ছন্দ আর সুর—কাবুকী নৃত্য-নাট্যের বলিষ্ঠ অভিসার। এই অভিসারে শিল্পী আর দর্শক একাত্ম হয়ে সৌন্দর্য এবং নন্দনতত্ত্বে আত্ম-বিভোর হয়ে ওঠে। মনে জাগে বসন্তের। নবীন বসন্তউৎসব চৈনন্দিন বাস্তব জীবনকে সুরে সুরে, ছন্দে ছন্দে অনুরঞ্জিত করে তোলে—

'শিছন পানের বাঁধন হতে
চল্ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিণ হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে দিগন্তে।'

নাটক রচনায় আজিকে এলো নতুন দিন। অভিনেতা অভিনেত্রীদের বদলে এলো পুতুলের দল। অভিনব পারিপার্শ্বিকতায় কাবুকী পুতুল নাচ অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ কলারূপে দর্শকদের চিত্ত অভিভূত করে ফেললে। তবে প্রাচীন কাবুকী ধারা তা বলে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। গীতি-নাট্যে কাবুকীর অবদান বিশেষভাবে সমাদৃত এখনো। তার পারিপার্শ্বিকতায় সঙ্গীতের মূর্ছনা,—ভাবের দ্যোতনা, কবিতায় আবেদ।

জাপানে আধুনিক নাট্যকলার অনেক আবেদন—আধুনিক শিল্পানুরাগীদের কাছে তা নিশ্চয়ই আদৃত; কিন্তু কাবুকী,—কাবুকীর আবেদন স্বতন্ত্র। তার আবেদন সর্বজনীন। কালের চার দেওয়ালের সীমানা টপ্‌কিয়ে চিরায়ত নাট্য-রসের রসধারায় কাবুকী সে-কাল, এ-কাল, সবকালের নাট্যরসিকদের মন ভরিয়ে রেখেছে। আধুনিক কাবুকীর পাদপ্রদীপ পাশ্চাত্তের নাট্যরীতির প্রভাবযুক্ত বটে, কিন্তু 'হানামিচি', 'মাওয়ারি বুটাই—সেই প্রাচীনকালের ঐতিহ্য শিল্প।

বর্ণ আর শুধু বর্ণের সমারোহ কাবুকীর পরিবেশ মণ্ডলীতে। রঙের দেশ জাপান, সেই রঙ শুধু জাপানের বেশভূষায় নয়, তার ফুল ফলে—তার প্রাকৃতিক পরিবেশে।

কাবুকীতেও সেই রঙ। রঙ্গমঞ্চেরঙের মেলা, তার স্ক্রীনগুলি ওঠান নামানো হয় না,—পাছে রঙগুলি দর্শকদের চোখের সামনে থেকে সরে যায়। স্ক্রীনগুলি পাশে গোটানো থাকে অভিনয় চলবার কালে।

এতরঙ, এতো ঝলমলক, এতো উত্তেজনা, আর নিবিড় অন্তরের শিল্প আবেদন—যে কাবুকীকে সরিয়ে আধুনিক নাটক প্রাধান্য লাভ করবে—সে সময় কই?

কাবুকী তাই জাপানের নাট্যশিল্পে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আমাদের সুনিপুণ কারুশিল্পীগণ

হাজার হাজার বছর ধ'রে ভারতের কারুশিল্পীগণ পুরুষানুক্রমে নিজেদের শিল্পক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রে আসছেন, ফলে তাঁরা নিজেদের পরম্পরাগত শিল্প কুশলতায় এতো নিপুণ হয়ে উঠেছেন যে তাঁদের সৃষ্ট কারুশিল্পগুলি বিশ্বে অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। তাঁরা তাঁদের কুশলী হাতে নানা রকম বস্তুর এতো সুন্দর ও অনুপম সামগ্রী তৈরী করেন যে প্রত্যেকটি জিনিস শ্রেষ্ঠতম শিল্প নিদর্শনে পরিণত হয়। এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ ক'রে তোলার জন্য, ভারতীয় কারুশিল্পকে আরও সুন্দর, আরও বেশী উপযোগী ক'রে তোলার জন্য বর্তমানে ব্যাপকভাবে নতুন নক্সা ও কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে।

আমাদের সাংস্কৃতিক ও সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান যোগানোর স্বীকৃতি হিসেবে এই প্রথম বার দেশের বিশিষ্ট কারুশিল্পীগণকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

অখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ড

DA 44/560 - Bengali

ফাল্গুন, ১৩৭১

"কথা প্রসঙ্গে"

সমস্যা

পরাধীন ভারতে আমাদের কাছে প্রধানতম সমস্যা ছিল কেমন করে স্বাধীনতা লাভ করা যায়। সেই সমস্যার সমাধানে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের নেতারা আমাদের সামনে কর্ম এবং ত্যাগের মহান আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন, লড়েছে ইরে মরেছে।

শুধু নিজের ত্যাগ, দেশসেবা এবং আত্মোৎসর্গ দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবন্ধু মৃত্যুহীন হননি, তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে অনেক সহকর্মী এবং অনুসারী শিষ্য গঠনে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। নিজের ভাবনাকে জাতির শিরায় সঞ্চারিত করতে তদানীন্তন নেতাদের প্রধানতম কাজ ছিল সংগঠনমূলক। আপন ব্যক্তিত্বকে জাতীয় ব্যক্তিত্বে প্রতিফলিত করতে তাঁরা জনসমাজের দিকেই দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তাই দেশের সেবায় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সেবক, কর্মী এবং শহীদের অভাব ঘটেনি। এক একটি চরিত্র থেকে দেশের বহু চরিত্রের বিকাশ হয়েছিল।

স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ সে ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। ব্যক্তির মহত্ত্ব, ত্যাগ। এবং চরিত্র অপহ্রিয়মান; তাই জাতির চরিত্রও গড়ে উঠছে না। দেশের মধ্যে তাণ্ডবের ছবি, হতাশার অভিব্যক্তি; নেই নেই, শব্দের হাহাকার।

নেই। আজ আমাদের মধ্যে চরিত্রের মহিমা নেই। তাই আজ আমরা রিক্ত নিঃস্ব। আমাদের নৈস্ব আমাদের অসন্তোষ বৃদ্ধি করছে। কোন পরিকল্পনাই সার্থক হয়ে উঠছে না। ফলে সমস্যা দেখা দিচ্ছে—নিত্য নতুন সমস্যা। আর সেই সব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে আমাদের নেতারাও দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন।

অন্ন নেই, শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, শান্তি নেই, গৃহ নেই, যান-বাহনের স্বাচ্ছন্দ্য নেই, দেশপ্রেম নেই,—গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে শুধু নেই আর নেই।

অপর পক্ষে লোভ আছে, হিংসা আছে, পরশ্রীকাতরতা আছে, প্রাদেশিকতা আছে, ঘৃণা আছে। সত্য নেই, মিথ্যা আছে।

এই বিরুদ্ধ অবস্থায় আমাদের সর্বপ্রধান কার্য হচ্ছে—চরিত্রগঠন। ব্যক্তি থেকে সমষ্টি জাতির চরিত্রকে আজ গড়ে তুলতে হবে। মানুষ তৈরী করার পরিকল্পনাকে সর্বপ্রথমে গ্রহণ করতে হবে।

দেশের মানুষের চরিত্রশুদ্ধি চাই সর্বাগ্রে। চরিত্রবান জাতির পক্ষে সকল সমস্যাই সমাধানযোগ্য।

জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্বে সেই কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, তাই স্বাধীনতা সংগ্রামে চরিত্রবলই ছিল প্রধানতম।

শাসক কংগ্রেসের সরকারি দপ্তরে ভিড়ের সংখ্যা বেশি। সংগঠনের কাজে কর্মীর অভাব। জনসমাজের সামনে সর্বত্যাগী আদর্শবান সেই চরিত্রের আবির্ভাব আজ কোথায়? কোথায় সেই কবি, কোথায় চারণের মন্ত্রধ্বনি, 'আবার তোরা মানুষ হ!'

জাতীয় কংগ্রেসকে আজ অতীত চারণ করতে বলি,—ফিরে যান তাঁরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে শহরতলীতে, শাসকের পাশে এসে দাঁড়াক সেবক ও সংগঠক। জাতীয় পতাকাকে তারা তুলে ধরুন সকলের সঙ্গে। আশ্বাস দিন, শিক্ষা দিন জনে জনে, আমরা মানুষ হবো!'

আত্মবিশ্বাস

আমাদের মধ্যে আজ আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। এই অভাবের মধ্যে আমাদের স্বভাবের প্রত্যয়হীনতা। ফলে, শুধু নিজের মধ্যে নয়, সংসারে এবং সমাজে দিন দিন আমরা নৈরাশ্যবাদী হয়ে উঠছি। নিরাশার ঝড় চতুর্দিকে।

আত্মবিশ্বাস শুধু ব্যক্তির নয়, সমাজ এবং দেশেরও দৃঢ়তার ভিত্তি। আত্মবিশ্বাস হারানোর ফলে আজ আমরা দুর্বল। এই দুর্বলতা আমাদের ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশকে নৈরাশ্যপন্থী করে তুলছে। দেশের মানুষের মানসিকতায় সাহিত্যে শিল্পে সর্বত্রই প্রত্যয়ের অভাব। এ-অভাব সুস্থ জাতির লক্ষণ নয়।

সবলতাই হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। সবলতাকে জাগিয়ে তুলতে সকলকেই আজ আত্ম-বিশ্বাসের প্রত্যয়কে গ্রহণ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মহান বাণী অনুসরণ করে আমরা বলি, 'আমাদের প্রধান কর্তব্য আপনাকে ঘৃণা না করা। উন্নত হতে হলে প্রথম নিজের প্রতি, তারপর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আবশ্যক। যার নিজের প্রতি বিশ্বাস নাই, তার ঈশ্বরের প্রতি কখনই বিশ্বাস আসতে পারে না।

———

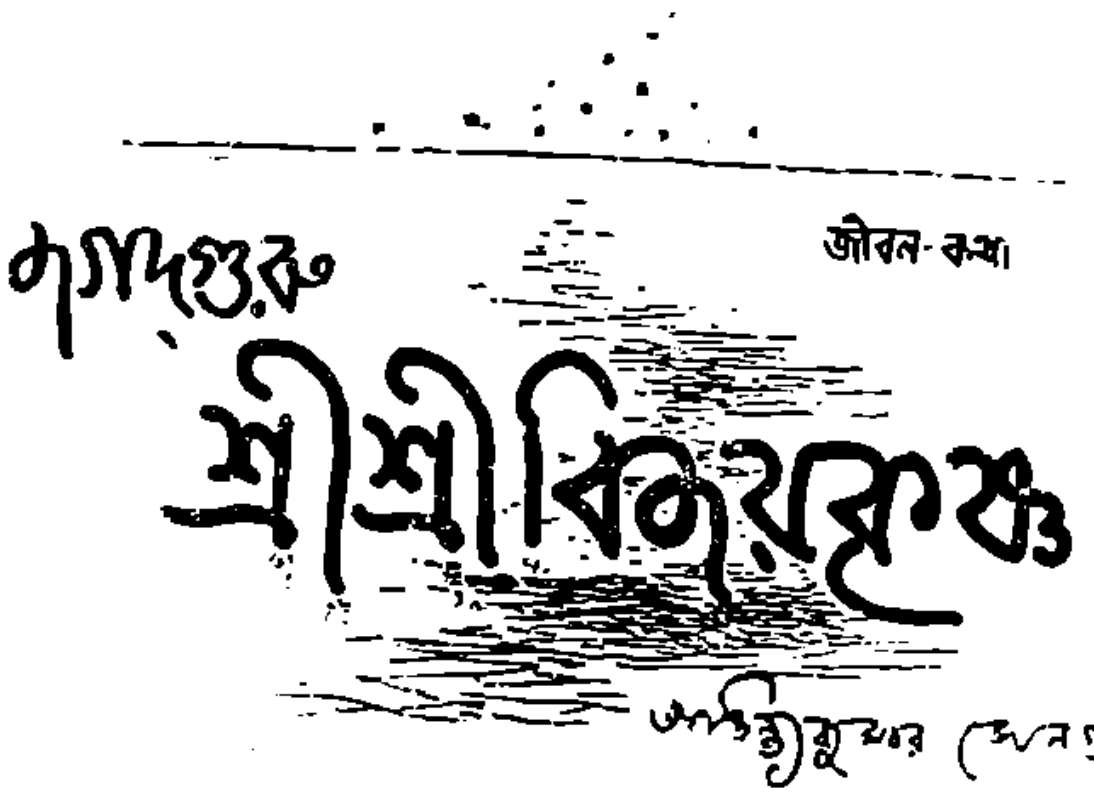

২৮

গোসাই-প্রভু মৌনাবলম্বন করলেন।

মৌনীবাবার চিঠি এসেছে। লিখেছেন, 'নির্জন পাহাড়ে-পর্বতে এতকাল সাধন-ভজন তপস্যা করে কাটালাম, কিন্তু আসল বস্তু কোথায়? নিদ্রা জয় করেছি, সারাদিনে আধসেরা দুধ আমার একমাত্র আহার। চল্লিশ ঘণ্টা মৌনে একাসনে বসে আছি। সবই তো হল কিন্তু যার জন্যে এলাম সে কোথায়? কোথায় তার সন্ধান? সবলে বলে, সদগুরুর আশ্রয় নাও, নইলে আর এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবেনা। কৃপা করে আপনি আমাকে উপদেশ করুন, কী করে আমার ব্রহ্মদর্শন হবে?'

কে এই মৌনীবাবা?

মৌনীবাবার পূর্বাশ্রমের নাম প্যারীলাল ঘোষ। আগে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ছিলেন, গোসাইজির সঙ্গে প্রচারের উদ্দেশ্যে একবারে গিয়েছিলেন হিজলে-কাঁথি। সেখানে সেবার কী কাণ্ড!

বেড়াতে-বেড়াতে দুজনে এক দীঘির পারে এসে দাঁড়ালেন, বিজয়কৃষ্ণ আর প্যারীলাল। জলে অসংখ্য রক্তকমল ফুটে আছে। পদ্মের দিকে অনিমেষে তাকিয়ে আছেন বিজয়, খানিক পরে দেখলেন পদ্মের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন কামিনী। এই সেই 'কমলে-কামিনী'—শ্রীমন্ত সওদাগরের দৃষ্ট দেবী প্রতিমা।

দেবীচরণসাহিত সেই পদ্মটি ধরবার জন্যে বিজয়কৃষ্ণ জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাঁতার কেটে এগুলেন পদ্মের দিকে। যেই পদ্মটি ধরলেন তাঁর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হল। উপায়? প্যারীলাল তখুনি লাফিয়ে পড়ল, বিজয়কৃষ্ণকে ধরে টেনে নিয়ে এল পারে। দেখ দেখ বিজয়ের মুঠোর মধ্যে সেই পদ্মটি ধরা।

প্যারীলালেরও দেবীদর্শন হল। তার সেই দেবীদর্শন বিজয়কে দর্শন করে। স্পর্শে কী এক প্রচণ্ড শক্তি বিজয় সঞ্চারিত করে দিয়েছে। পায়ে এসে বিজয় মুক্ত হলেও প্যারীলাল মুহ্যমান।

সেই থেকে প্যারীলালের মনে তীব্রতর বৈরাগ্য উপস্থিত হল। ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারলনা। নির্জন তপস্যার আকাঙ্ক্ষায় চলে গেল সে ওঙ্কারনাথে, নর্মদাতীরে। সেখান থেকেই তার চিঠি: কী করে ঈশ্বর দর্শন করব?

গোস্বামী-প্রভু নিজ হাতে উত্তর লিখলেন:

বাইরে ধর্মলাভের জন্যে যা প্রয়োজন সবই হয়েছে, সাক্ষাৎভাবে জীবন্ত সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত না হলে ঈশ্বরদর্শনে অধিকার হয় না। ধ্রুব পাঁচ বছরের শিশু, বনে বনে পদ্মপলাশলোচন বলে কাঁদলেন, তবু গুরুকরণ না হওয়া পর্যন্ত দর্শন পেলেন না। যীশু জন দি ব্যাপটিস্টের কাছে দীক্ষিত, চৈতন্য ঈশ্বর-পুরীর কাছে। আমি নিশ্চয় বুঝেছি গুরুকরণ ছাড়া ব্রহ্মদর্শন হয় না।

আহার যাবে, নিদ্রা যাবে, মৌনী হবেন, লোকে সাধু বলে ভক্তি করবে, তাতে প্রকৃত বস্তু লাভ হবে না। যদি ব্রহ্মদর্শন করতে চান তবে অন্তরের সমস্ত পূর্ব সংস্কার দূর করুন। গুরুকরণেই সমস্ত বাসনা দূরীভূত হবে আর তখনই দর্শন সম্ভব।

এখন, এ অবস্থায়, অন্তরে যে বাসনা আছে তা পাবেন, ব্রহ্ম পাবেন না। ধর্মপ্রচার প্রভৃতি বাসনাও ছাড়তে হবে। নিজের ইচ্ছের কোনো কার্য করবেন না। যতক্ষণ নিজের ইচ্ছে আছে ততক্ষণ ব্রহ্ম-সহবাস অনেক দূর।

আপনার পত্র পেয়ে সুখী হলাম। মানুষ নিজের চেষ্টায় যতদূর করতে পারে তাই আপনি করেছেন। এখন গুরুকরণ ছাড়া অগ্রসর হতে পারবেন না। ভগবান সমস্ত কাজ নিয়মে করেন। বাহ্যজগতে কোন কাজ যেমন অনিয়মে চলে না, সেরূপ অন্তর্জগতেও নিয়ম ছাড়া চলেনা। ব্রহ্মদর্শনের পক্ষে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ অবশ্য নিয়ম। 'আপনাকে বড় ভালোবাসি, তাই এত লিখলাম।'

প্যারীলালের—মৌনীবাবার কোথায় সেই সদ্গুরু?

কয়েক বছর পর গোঁসাইজি যখন প্রয়াগে এসেছেন কুম্ভমেলায় যোগ দিতে তখন মৌনীবাবার আরেকখানা চিঠি এসে পৌঁছুল। সে চিঠি আদি থেকে অন্ত এক অকূল আকুলতার চিঠি।

'তিনিই বর্তমানে আমাকে এই অবস্থায় এনেছেন। তিনিই আমার সম্পূর্ণ রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিধানকর্তা, শিক্ষাদাতা, উপদেষ্টা—এক কথায় তিনিই আমার সর্বস্ব। প্রতিদিনের ঘটনা-দ্বারা তাই জানাচ্ছেন। আমার কল্পনাকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করেছেন। আমার জন্যে তপস্যাস্থান প্রস্তুত করে দিয়েছেন। নিজে প্রত্যহ আমার জন্যে আধসের দুধ আর আধসেরা চিনি আমার স্থূল শরীর রক্ষার্থে প্রেরণ করেন এবং এই আহারেই আমার পক্ষে উপযুক্ত করেছেন। আমার হৃদয়ের অপবিত্রতা দিন দিন অপসারিত করছেন। আমার নিদ্রা প্রায় পূর্ণরূপে হরণ করেছেন। বদ্ধ পদ্মাসন আমার আসন করে দিয়েছেন। আমার মনের উদ্বেগও আর নেই, কেবল ভক্ত সঙ্গে প্রেমভরে মেতে তাঁর নাম-গান করবার প্রবৃত্তি, ধর্ম প্রচার করবার প্রবৃত্তি আর এই পাঁচবছর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁর যে অপূর্ব করুণা লাভ করেছি তা বলবার প্রবৃত্তি আমার মনকে চঞ্চল করছে। আপনি বলে দিন আমার প্রতি আমার পিতার আদেশ কি? কি হলে আমি তাঁতে নিমগ্ন হয়ে যেতে পারব? আপনি ধ্যানযোগে আমার মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই জানতে পারছেন। আপনি ছাড়া আর কারু উপর বিশ্বাস আনতে পারছি না। এ পর্যন্ত

ভগবানের কৃপা ছাড়া গুরুরূপে আর কাউকেও গ্রহণ করিনি, পিতা স্বয়ং না দিলে গ্রহণ করতেও ইচ্ছা নেই। এই পাঁচ বছর আপনার অঙ্গে কেঁদেছি, কিন্তু কোথায়, সন্তানকে তো দেখা দিলেন না।

এখন আবার আপনার চরণে পড়ে কাঁদছি, কি হলে হৃদয়মাঝে ভগবানকে দেখতে পাব তা বলে দিন। কত মহাত্মা মহাপুরুষের কাছে পিতা চোখের জল ফেলেছি কথাও বলেননি, আপনার কাছেও কত কাঁদলাম, আপনিও নীরব। বুঝেছি পিতার দয়া না হলে কেউই দয়া করে না। মূল প্রস্রবণ থেকে যতক্ষণ ধারার স্রোত না আসে ততক্ষণ সমস্ত স্রোতই বন্ধ থাকে। আমার শরীরের যে অবস্থা, তাতে বেশি-বেশি শুরু-শুরু করে বেড়াতে পারব না। আপনি যদি না দেখেন তবে এ স্থানেই দেহরক্ষা করে পিতার রাজ্যে চলে যাব।

অধিক লেখা বাহুল্য। মৌনব্রতও প্রায় আড়াই বছর গ্রহণ করেছি। গীতাজী, রামায়ণ, উপনিষদ এবং বাইবেল পাঠ, একবার দুগ্ধপান, একবার ফলত্যাগ এবং শৌচাদি কর্ম ভিন্ন আর কর্ম নেই। শয়ন করে নিদ্রা যাওয়া প্রায় পরিত্যাগ করেছি। সমস্তই পিতা করাচ্ছেন কিন্তু যার জন্যে এ সমস্ত, তিনি কোথায়? তিনি কোথায়? ইতি আপনার—অনুগত সন্তান, প্যারীলাল—মৌনীবাবা।'

মৌনীবাবার চিঠি আদ্যন্ত পড়লেন গোঁসাই। বললেন, 'মৌনীবাবা অত্যন্ত শীড়িত, এখানে আসবার তাঁর ক্ষমতা নেই। আমাকেই ওঙ্কারনাথে যেতে হবে।' বলে চোখ বুজে স্থির হয়ে রইলেন।

ওঙ্কারনাথে যাবেন! সে কবে?

পরদিন ভক্তসেবক জিজ্ঞেস করল, 'ওঙ্কারনাথে কবে যাবেন?'

গোস্বামী-প্রভু মৃদু হাসলেন, বললেন, 'আর যাবার দরকার নেই। মৌনীবাবার দীক্ষা হয়ে গিয়েছে।'

বিঘ্ন কী? বিঘ্ন এই যে নামে রুচি হয় না। চারদিকে দুঃখকষ্ট রোগশোক অভাব দারিদ্র্য—সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বসেই নাম করতে হবে। প্রহ্লাদচরিত্রই তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। আহারে বিষ, আগুনে সমুদ্রে হস্তী পদতলে নিক্ষেপ—চারদিকে বিপক্ষ, অস্ত্রাঘাত, দৌর্জন্য—সহায় কেবল হরিনাম।

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'প্রথমে বরফার শুকিয়ে-শুকিয়ে নীরস হবে। বিষয়রস একবিন্দু থাকতে ব্রহ্মানন্দ আসে না।'

'বিষয়রস যাবে কিসে?' কে একজন প্রশ্ন করল।

'শুধু নাম করে, শ্বাসে-শ্বাসে নাম করে।'

বালক নরেন ঘোষ প্রভুতে খুব অনুরক্ত, বয়সে অল্প হলেও অনেক জ্ঞান রাখে। দিব্যকান্তি বদনে সুধা ঢালা, ভক্তিতে ভরপুর। যা প্রশ্ন করে প্রভু তাই গম্ভীর মুখে উত্তর দেন।

'আপনাকে যখনই স্মরণ করি আপনি বুঝতে পারেন?' প্রশ্ন করল নরেন।

'পারি।' উত্তর দিলেন গোস্বামী।

'গুরু কি সর্বত্র বিদ্যমান?'

'হ্যাঁ, সর্বত্র।'

'আচ্ছা, আপনার কাছে সাধন নিলে নাকি বিপুর উত্তেজনা বাড়ে?'

'যেমন নির্বাণকালে আগুনের তেজ বাড়ে।'

'বিপুর উত্তেজনা বাড়লে উপায়?'

'নামের উত্তেজনা বাড়ানো। নামের কাছেই কাম জয়।'

'দেখুন, কেউ-কেউ আপনার নিন্দে করে।' বালক বললে কাতর মুখে, 'শুনলে আমার বুক ফেটে যায়, কিন্তু কি ভাবে এর প্রতিকার করব বুঝতে পারি না।'

গোসাঁইজি বললেন, 'চুপ করে শুনে যাবে, কিছুতেই প্রতিবাদবাক্য আনবে না। যদি একান্তই অসহ্য হয় স্থানান্তরে চলে যাবে। শুধু নামাশ্রয় করে থাকবে। যে নামাশ্রয়ী তার কেউ ক্ষতি করতে পারে না। না, সাপ-বাঘও নয়, প্রেত-পিশাচও নয়।'

'আচ্ছা, শ্রীচৈতন্য কে?' বালকের সরল অথচ অগাধ প্রশ্ন: 'তিনি কি স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ?'

'হ্যাঁ, তিনিই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি নারায়ণ, যোগমায়া অবলম্বন করে মানুষরূপে পৃথিবীতে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।'

'নিত্যানন্দ কে?'

'অংশাবতার। বলরাম।'

'অদ্বৈত কে?'

'অংশাবতার। মহাবিষ্ণু। দুইজনেই গৌরাঙ্গলীলার সাথী।'

'গৌরাঙ্গলীলাই বোধহয় শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তখন দুই অংশাবতার আর স্বয়ং অবতীর্ণ।'

'হ্যাঁ,' বললেন গোস্বামী-প্রভু, 'এমন লীলা আর হয়নি।'

'কিন্তু পৃথিবীর কতটুকু জায়গা জুড়ে।'

'সে লীলার শেষ এখনো হয়নি। দেখছ সকল সম্প্রদায়েই এখন কেমন মৃদঙ্গ বাজছে। সমস্তই মৃদঙ্গময় হয়ে যাবে।'

'আপনি একবার আমাদের দেশে চলুন।'

'ভগবান যখন নেবেন তখন যাব।'

বালকের বাড়ি বানরিপাড়া, বরিশাল। বাড়ির লোক যখন জানল নরেন বিজয়কৃষ্ণের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে এসেছে, সবাই ক্ষেপে গেল। যেহেতু বিজয়কৃষ্ণ একদা ব্রাহ্ম ছিলেন সেহেতু ঘোষ পরিবার ওঁর প্রতি সন্ত্রস্ত ছিল না। নরেনের উপর নিগ্রহ সুরু করল। চরমতম হল যখন বিজয়কৃষ্ণের ফটো নরেনের ঘর থেকে সরিয়ে নিল। শুধু তাই নয়, ভেঙে দিল টুকরো টুকরো করে।

কান্নায় ভেঙে পড়ল নরেন। প্রভুকে বললে, 'আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।'

নরেনের জ্বালেয়া হল।

মৃত্যুকালে প্রভু সন্ন্যাসীরূপে দেখা দিলেন।

'জয়গুরু। জয়গুরু।' উচ্চে ধ্বনি তুলে চিরতরে নীরব হয়ে গেল নরেন।

তখন শোকে সমস্ত পরিবারের টনক নড়ল। বাপ নারায়ণ ঘোষ পাগলের মত হয়ে গেলেন। পিতৃব্য যোগেন ঘোষ প্রভুর চরণে গিয়ে পড়ল। বললে, 'আমরা অবিশ্বাসী, আমরা আপনার মহিমা বুঝতে পারিনি, আমাদের মার্জনা করুন। পাষণ্ডদের শাস্তি দেবার জন্যেই আপনি কেড়ে নিয়েছেন নরেনকে। আপনার চরণে আমাদের শুধু এই ভিক্ষা, একবার তাকে দর্শন করিয়ে দিন।'

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'তা হয় না। আপনাদের এখন শোক সংবরণ করা দরকার। তাকে দেখলে আপনাদের শোক আরো বেড়ে যাবে। যাকে আর ফিরে পাবেন না তাকে আর অনুসন্ধান কেন?'

এক বাউল আসে আশ্রমে। অহঙ্কারের পুতুল। কুতর্কের কণ্টক।

'জানেন আমার কুড়ি-পঁচিশ হাজার শিষ্য।'

'হবে।'

'তারা সকলেই আমাকে অবতার বলে।'

'ভালো কথা।'

'কিছু না জেনে শুনেই যে বলে তা বলা যায় না।'

'না তা কি করে বলা যায়?'

'আপনার দৃষ্টি অনেক পরিষ্কার হয়েছে।' বাউল এগিয়ে এল: 'আপনি আমার মধ্যে কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন?

'কই, বিশেষ কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।' গোসাইজি বললেন।

'দেখতে পাচ্ছেন না? তাহলে আপনার দৃষ্টি এখনো পরিষ্কার হয়নি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান? এই দেখুন।' বাউল আরো এগিয়ে এসে তার নাকের ডগায় একটি ছোট্ট তিল দেখাল। বললে, 'কী, পেলেন তো প্রমাণ?'

গোসাইজি স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কিন্তু আশপাশের লোক উচ্চ হাস্য করে উঠল। বাউল লজ্জিত মুখে প্রস্থান করলে।

বাউল ক্ষান্ত হয় তো তার শিষ্য ক্ষান্ত হয় না।

'তোমার বুঝি শহরে কলকে মিলল না তাই এই জঙ্গলে আশ্রম খুলে বসেছ!' গোস্বামী-প্রভুর উপর সে বুঝিয়ে এল: 'বেহুজ্জতী আবার সাধু সেজেছ। অদ্বৈতবংশের কুলাঙ্গার, পৈতে ফেলে জাতি-ধর্মভ্রষ্ট হয়ে লোকের সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছ! গোঁসাইরা কে কবে পৈতে ফেলেছে?'

চোখ বুজে বসে ছিলেন গোসাইজি, হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড স্বরে ধমকে উঠলেন: পৈতে নেই বলছ, সোনার পৈতে আছে। দশ গণ্ডা পৈতে এখুনি বের করে দিতে পারি। কিন্তু তুই কী করে দেখবি? তুই যে অন্ধ।'

যদুবাবু নামে একটি সাধু প্রকৃতির লোক সেখানে বসে ছিল। হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন: এ কি রে! আর সঙ্গে-সঙ্গেই পড়লেন মূর্ছিত হয়ে।

আর সেই বাউল শিষ্য সোজা ছুটে পালাল।

যদুবাবু সুস্থে স্বাভাবিত হয়েছে, সবাই আশ্রমে শান্তি ফিরে এসেছে, সবাই প্রভুকে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার এ রুদ্র রূপের কারণ কী?'

গোস্বামীজি হাসলেন, বললেন, 'এ আমি নয়, আরেকজন। ভগবানের আশ্রিতজনের উপর কোনো প্রকার অত্যাচার অপমান হলে মহাপুরুষেরা তা সহ্য করেন না, শুরুতর শাসন করেন। যখন ঐ লোকটা এসেছিল তখন একজন মহাপুরুষ আসনের কাছে বসে ছিলেন। তিনিই বৃদ্ধকণ্ঠে আমার মুখ দিয়ে ঐ লোকটাকে শাসন করেছিলেন, ওঁর একটা কথাও আমার নয়।'

পরদিন যদুবাবু এসে তাকে জিজ্ঞেস করা হল: আপনি কী দেখলেন?

'ওরে বাবা, সে কী ভীষণ মূর্তি! লোকটা যখন গোসাইকে গালাগালি করছিল দেখলাম এক গৌরবর্ণ তেজস্বী ব্রাহ্মণ গোসাইয়ের ডান দিকে এসে দাঁড়িয়েছে আর প্রচণ্ড কণ্ঠে বলছে, পৈতে নেই,

সোনার দৈতে আছে। তুই দেখবি কী করে, তুই যে অন্ধ। এ দাউ-দাউ করে জ্বলা আগুনের মত লোকটা কোত্থেকে এল! দেখে শুনে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম!'

স্বর্ণময়ীর পাগলামি দিনে দিনেই বেড়ে চলেছে। সেদিন আশ্রমের আমতলায় বহু গণ্য-মান্যের সমাগম হয়েছে, গোস্বামী প্রভু সকলের সঙ্গে ধর্ম প্রসঙ্গ করছেন, হঠাৎ সেখানে পাগলী গান গাইতে গাইতে এসে পরিধানের বস্ত্র মাথায় বেঁধে নাচতে সুরু করলেন। প্রভুর হর্ষোৎফুল্ল চোখ ছল ছল করে উঠল। আর দেখ কী অপূর্ব দৃশ্য, ভক্তিগদগদ ভাবে প্রভু উলঙ্গ মায়ের নৃত্যের সঙ্গে তুড়ি দিয়ে তাল দিচ্ছেন!

কতক্ষণ পরে স্বর্ণময়ী চলে গেলেন অন্য দিকে। সকলেই এই দৃশ্য দেখে অবাক। গণ্যমান্যদের মধ্যে ছিলেন হরিনারায়ণ রায়, বললেন, 'এই একটি ঘটনা দেখেই আমি গোসাইকে চিনে নিলাম। আর কোনো সংশয় বা পরীক্ষা করবার প্রবৃত্তি রইল না। মানুষ কখনো কি এরকম করতে পারে?'

কুলদানন্দকে প্রায়ই তাড়া করেন স্বর্ণময়ী। 'যেমন সেট ভরে খাস না, ভালো জিনিস খাস না, মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিস, মৃত্যুকালে মহাপ্রাণী তোর মুখে লাথি মেরে চলে যাবে। ব্রাহ্মণের ছেলে, সারাদিন উপোস করে থাকিস? আমার ছেলের অকল্যাণ হবে। যাঃ, আশ্রম থেকে চলে যা।'

শেষে নিজেই তিনি চলে গেলেন।

বলে গেলেন তাঁর শ্রাদ্ধ যোগজীবন করবে।

আর সেই উপলক্ষে গোস্বামী-প্রভু চলে এলেন কলকাতা।

(ক্রমশ)

• • • •

স্মৃতি-লেখ

একটি সমাধিস্তম্ভের গায়ে লেখা ছিল:—"এইস্থানে এমন একজনের দেহাবশেষ সমাধিস্থ হয়েছে, যার সৌন্দর্য ছিল; কিন্তু অহঙ্কার ছিল না; শক্তি ছিল, কিন্তু ঔদ্ধত্য ছিল না; সাহস ছিল, কিন্তু হিংসা ছিল না; যার মধ্যে মানুষের সকল সদ্‌গুণ বর্তমান ছিল, ছিল না মানুষের দুষ্প্রবৃত্তির পরিচয়।"

লর্ড বায়রণের প্রিয় কুকুরটি যখন মারা যায় তখন তিনি গভীর শোকে মুহ্যমান হোয়েছিলেন। পরম যত্নে ওকে সমাধিস্থ কোরে তার সমাধির ওপর উক্ত লেখাটি দিয়ে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

['শীতকালে তো সবাই যেতে যায়, আপনি একবার গ্রীষ্মকালে গিয়ে দেখুন না!' এই কথা না শুনে শ্যামবাজারের হরেন চাটুজ্যে লাফিয়ে উঠলেন। মধুপুরে তাঁর মস্ত বাড়ী পড়ে রয়েছে, আলসে কুঁড়েমির জন্যে কলিকাতা ছেড়ে যাওয়াই হয় না। স্ত্রী তাঁর পা বাড়িয়েই ছিলেন। বড় ছেলে রবি রইলো কলিকাতার বাড়ীতে, ছোট ছেলে রবিকে সঙ্গে নিয়ে বরদাসুন্দরী আর হরেনবাবু গেলেন মধুপুরে।

জ্যৈষ্ঠমাসের প্রচণ্ড গরম তখন মধুপুরে টেঁকে কার সাধ্য! হরেনবাবু পয়সাওলা মানুষ। বড়লোকের স্ত্রী বরদাসুন্দরী বলেন, 'মোটা মানুষের জ্বালা কি কম! এখানে আসাই আমার ভুল হলো। চল—কলকাতায় ফিরে যাই।'

ফিরে যাবার ব্যবস্থাই হচ্ছিল, এমন দিনে বৃষ্টি নামলো। অসময়ে বৃষ্টি। সে বৃষ্টি আর থামে না কিছুতেই।

সেই বৃষ্টি বাদলার দিনে একটা অঘটন ঘটে গেল। হরেনবাবুর ছোট ছেলে রবিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। বর্ষাতি নিয়ে ছাতি মাথায় দিয়ে হরেনবাবু নিজেই বেরুলেন খুঁজতে। খুঁজতে গিয়ে দেখা হলো আর-এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনিও হন্যমত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর মেয়েকে। ন' বছরের মেয়ে লক্ষ্মীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সকাল থেকে। তিনিও কলকাতা থেকে চেঞ্জে এসেছেন তাঁর কন্যা স্ত্রীকে নিয়ে।

কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না তাদের। দু'জনে থানায় গিয়ে ডায়েরী লিখিয়ে এলেন।

হরেনবাবু বাড়ী ফিরে এসে দেখেন ছেলেকে পাওয়া গেছে। ছেলে কোথাও যায়নি। পাশের বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গে ধরে বসে খেলা করছিল নিজেদেরই বাড়ীর পেছনে।

বাড়ীর পেছনে ছিল একটা মস্ত বড় নালা। সেই নালায় বর্ষার জল জমেছিল। সেই জলে তারা কাগজের নৌকো ভাসিয়েছিল। একটি নৌকোয় ছিল বর। আর একটি নৌকোয় ছিল কনে। পথে নৌকোডুবি হয়ে বর-কনে দু'জনেই গিয়েছিল জলের তলায় তলিয়ে। সেই তাদেরই উদ্ধার করবার জন্যে দু'জনেই নেমেছিল নালার জলে। কনে ছিল প্লাষ্টিকের। তাকে পাওয়া গেল অক্ষত অবস্থায়। কিন্তু বরটি ছিল কাঁচা মাটির। জলের তলা থেকে সে যখন উঠলো তখন আর তাকে চেনা যায় না। নাক মুখ চোখের রং গেছে উঠে। মাটির চেলা তখন মাটি হয়ে গেছে।

বয়টি ছিল লক্ষ্মীর। তার কান্না আর থামে না কিছুতেই।

বরদাসুন্দরীর খুব ভাল লাগলো মেয়েটিকে। ন' বছরের ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে। একটি মেয়ের বড় সাধ ছিল বরদাসুন্দরীর। কিন্তু সে সাধ তাঁর মেটেনি। দুটি মাত্র ছেলে। ছবি আর রবি।

বড় ছেলে ছবির বয়স তখন পনেরো কি ষোলো। হঠাৎ তাঁর মনে হলো এই মেয়েটির সঙ্গে ছবির বিয়ে দিলে কেমন হয়!

বরদাসুন্দরী লক্ষ্মীকে কোলের কাছে টেনে এনে তার কান্না থামালেন।

'তোমার একটা মাটির ঘর গেছে। যাক্‌গে। তোমাকে একটি ঘর আমি দেবো।'

লক্ষ্মী অতসব বোঝে না। বললে, 'দেবে তো? ঠিন সত্যি কর।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'নিশ্চয়ই দেবো।' এইবার পড়ুন—]

[৪]

ষ্টেশনে যাবার সারা পথটা বরদাসুন্দরীর সেই এক কথা।—হ্যাগা, ছবি একা-একা ট্রেনে চড়ে কলকাতা থেকে আসতে পারবে তো ঠিক?'

হরেনবাবু বললেন, 'খুব পারবে।'

'যদি ঘুমিয়ে পড়ে?'

'না, ঘুমোবে না।—তুমি একটু তাড়াতাড়ি হাঁটো। গাড়ী যে এসে পড়লো।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'বেশ মানুষ যা-হোক্। আমি মোটা মানুষ, তোমার সঙ্গে হাঁটতে পারি কখনও?'

হরেনবাবু বললেন, 'একটা রিক্‌শা নিলেই তো পারতে!'

ছবি তার মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। বললে, 'একটা রিক্‌শা ডাকবো?'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'না। তোর বাবা হেঁটে হেঁটে যাবে আর আমি রিকশায় চড়ে যেতে পারবো না। চল্—আমার একটু হাঁটা ভাল। ডাক্তার বলেছে।'

হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছিল তারা। সবার আগে যাচ্ছিলেন হরেনবাবু, রবি ছিল মাঝখানে আর বরদাসুন্দরী ছিলেন সবার পিছনে। মোটা মানুষ। হাঁটতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল নিশ্চয়ই।

ডাক্তারই বলুক আর যেই বলুক, হরেনবাবু শুনলেন না। রাস্তা দিয়ে ফাঁকা রিকশা যাচ্ছিল দু'খানা। দু'জনকেই থামালেন। রবিকে বললেন, 'তোর মাকে ডাক্ তাড়াতাড়ি। উঠে পড় একটাতে।'

'ভাখো আবার রিক্‌শা ডেকে বসলো!'

থপ্ থপ্ করে এগিয়ে এলেন বরদাসুন্দরী। মুখে বললেন বটে, কিন্তু রিকশায় উঠে বসতেও দেরী হলো না। রবি উঠতে যাচ্ছিল তার মার সঙ্গে। বরদাসুন্দরী বললেন, 'না বাবা, তুই যা তোর বাবার সঙ্গে। আমাকে একটু হাত-পা মেলে আরাম করে বসতে দে।'

সত্যিই আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসলেন তিনি। বসে বললেন, 'ভালই হলো একটু আগে যাওয়াই ভালো। আমাকে আবার একটা পুতুল কিনতে হবে।—ওগো শুনছো?'

হরেনবাবুর রিকশা যাচ্ছে আগে-আগে। বললেন, 'কি বলছো ?'

'অমূল্যবাবুর দোকানের সামনে একবার দাঁড়াবে। মেয়েটার জন্যে একটা পুতুল কিনে নেবো।'

হরেনবাবু বললেন, 'পুতুলের কথা তোলোনি দেখছি।'

'ভুলবো কি গো! মেয়েটা আমাকে অত করে বললে।'

রবির কিন্তু রাগ হয়েছিল লক্ষ্মীর ওপর। চুপি চুপি বললে তার বাপকে—'না বাবা, পুতুল কিনতে হবে না।'

'কেন ?'

রবি বললে, 'ওর দাদাটা ভারি বজ্জাত। ওকে আসতে দিলে না আমাদের সঙ্গে।'

হরেনবাবু হাসলেন।—'রবি কি বলছে শুনছো ?'

'কি বলছে ?'

'বলছে পুতুল কিনতে হবে না।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'কেন রে ? কিনতে হবে না কেন ?'

রবি বললে, 'লক্ষ্মী আর আসবে না আমাদের বাড়ীতে। ওর দাদা আসতে দেবে না।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'আমি নিজে গিয়ে ডেকে আনবো।'

আগে গিছে দুটো রিকশা চলেছিল। ছুঁড়ে ছুঁড়ে কথা হচ্ছিল। বরদাসুন্দরী বললেন, 'আমার একদিন যাওয়া দরকার। লক্ষ্মীর মার অসুখ শুনলাম। কিরকম অসুখ রে ?'

রবি বললে, 'আমি দেখিইনি ওর মাকে।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'আমি দেখে আসবো। তবু একটা কথা বলবার মানুষ পাব।'

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। অমূল্যবাবুর ষ্টেশনারী দোকান থেকে চমৎকার একটি পুতুল কিনে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই কলকাতার ট্রেনখানা এসে গেল। ছবি নামলো গাড়ী থেকে। ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে। ধপ্ ধপ্ করছে গায়ের রং। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশবাস। হাতে একটি চামড়ার সুটকেস।

বরদাসুন্দরী বললেন, 'আসতে পেরেছিস তো ? আমার যা ভাবনা হয়েছিল !'

'কেন ? ভাবনা কিসের ?' ছবি বললে।

'ভাবনা নয় ? একা-একা সেই কলকাতা থেকে এই এতটা পথ—'

ছবি একটু হেসে তার বাপের মুখের দিকে তাকালে একবার। হরেনবাবুও হাসলেন। বললেন, 'তোর মা ভেবেছে বুঝি তুই হেঁটে হেঁটে আসছিস কলকাতা থেকে।'

হাসতে হাসতে ওরা বেরিয়ে এলো ষ্টেশন থেকে।

হরেনবাবু বললেন, 'তোমরা দাঁড়াও এইখানে। আমি একটা গাড়ী ঠিক করি।'

এই গাড়ী ঠিক করতে গিয়েই দেখা হয়ে গেল হরেনবাবুর সঙ্গে। হরেনবাবু একা ন'ন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সরলা, ছেলে শঙ্কর আর মেয়ে লক্ষ্মী। সবাই মিলে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

বেড়াতে বেরিয়েছেন না লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীকে খুশী করবার জন্যে ইচ্ছে করে ষ্টেশনের দিকে এসেছেন কে জানে।

রবি তাদের দূর থেকে দেখতে পেয়েই ছুটলো লক্ষ্মীর কাছে। লক্ষ্মীও ছুটে ছুটে এগিয়ে আসছিল।

রবি তার হাতখানা চেপে ধরে বললে, 'এসো। বাবা তোমাকে ডাকছে।'

'আমার বর-পুতুল এনেছেন?'

রবি আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে।—'হ্যাঁ, ওই ত্যাখো।'

লক্ষ্মী দেখলে রবির বাবা মা ষ্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছেন।

লক্ষ্মী দেখলে তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর একটি ছেলে। বললে, 'ওই বুঝি তোমার দাদা?'

'হ্যাঁ।'

একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে ছিল লক্ষ্মী। এমন সময় গুণধর এগিয়ে এসে লক্ষ্মীর মাথার ওপর মারলে এক চড়।

'ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এলি কেন? আয়।'

রবি বললে, 'বাবা ওকে ডাকছে।'

গুণধর বললে, 'ও যাবে না। ছেড়ে দাও ওকে।'

রবি বললে, 'না ছাড়বো না। ওকে মারলে কেন তুমি?'

'আমার খোন, আমি মারবো—তোমার কি?'

আবার চড় তুলেছিল গুণধর।—'আয় বলছি—নইলে আবার মারবো।'

রবি আগলে দাঁড়ালো।

'কই মারো তো দেখি।'

হরেনবাবু এসে দাঁড়ালেন পুতুলের বাক্সটি হাতে নিয়ে।

'এই নাও মা, তোমার বর নাও।'

পুতুল পেয়ে লক্ষ্মী ভারি খুশী! এই তার হারিয়ে-যাওয়া বর-পুতুল। ছেলেমানুষ—পুতুল পুতুলই সই!

লক্ষ্মীর মা রুগ্না—জোরে জোরে হাঁটতে পারেন না, তাই তখনও সে একটু দূরে। পুতুলের বাক্সটি নিয়ে মাকে দেখাবার জন্যে সে ছুটলো।

গুণধর সেল তার পিছু-পিছু।

'কই দেখি দেখি কেমন পুতুল!'

বাক্সটি লক্ষ্মীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গুণধর খুলে ফেললে।

'এটা তুই নিলি কেন? পরের জিনিস নিতে নেই। তা জানিস?'

লক্ষ্মী বললে, 'নেবো বেশ করবো। তোমার কি? তোমার বুঝি সহ্য হচ্ছে না।'

লক্ষ্মী পুতুলটা কেড়ে নিতে সেল তার হাত থেকে। গুণধর দিলে না।

দু'জনে কাড়াকাড়ি সুরু হয়ে সেল।

গুণধর বললে, 'এই নে তবে।'

বলেই রাস্তার ওপর দিলে পুতুলটা ছুঁড়ে।

যেই ছুঁড়ে দেওয়া, ওদিক থেকে আসছিল একটা মালবোঝাই লরি। লরির চাকায় তলায় পুতুলটা তক্ষুনি চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে গেল।

সবাই দেখলে ব্যাপারটা।

লক্ষ্মীর বাবাও দেখলেন। মাও দেখলেন।

এদিক থেকে হরেনবাবুও দেখলেন, বরদাসুন্দরীও দেখলেন।

বরদাসুন্দরী এগিয়ে যাচ্ছিলেন লক্ষ্মীর কাছে। যেতে কিন্তু হলো না। লক্ষ্মীর মাকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মীর বাবা হরেনবাবু তখন এসে পড়েছেন ঘটনাস্থলে।

'নমস্কার। ওই বুঝি আপনার বড় ছেলে?'

হরেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, কলকাতা থেকে এলো। ওকেই নিতে এসেছিলাম ষ্টেশনে।'

'সব জানি। সবই শুনেছি লক্ষ্মীর কাছ থেকে।'

লক্ষ্মী ততক্ষণ রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে ভাঙা পুতুলটিকে। তারপর সেই পুতুলটি হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে দাঁড়ালো তার মার কাছে।

'মা, এই ছাখো। দাদা কি করলে।'

বরদাসুন্দরীও তখন এসে দাঁড়িয়েছেন সরলা দেবীর কাছে।

'আমি নিজেই যাব ভেবেছিলাম। ভালই হলো, আজ দেখা হয়ে গেল।'

সরলা বললে, 'আমার ভাই শরীর ভাল নয়।'

'আমারও তো ভাই। সেইজন্যেই তো এখানে আসা।'

লক্ষ্মী আবার বললে, 'এই ছাখো মা, দাদা পুতুলটা—'

কথাটা তাকে শেষ করতে দিলেন না বরদাসুন্দরী। বললেন, 'থাক্‌গে। ওটা ফেলে দাও।'

এই বলে হাত থেকে পুতুলটা নিয়ে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। হেসে বললেন, 'পুতুল-বরে দরকার নেই। তোমাকে আমি আস্ত বর দেবো।'

সরলা বললে, 'ওর জন্যেই আমার যত ভাবনা ভাই। আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না। তার আগে মেয়েটার একটা ব্যবস্থা যদি করে দিয়ে যেতে পারি—'

সে ব্যবস্থা বরদাসুন্দরী বোধকরি মনে মনে করে রেখেছিলেন। বললেন, 'ওর ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। সে ভাবনাটা আমাকে দিয়ে দাও।'

'আপনি' থেকে একেবারে 'তুমি'তে নেমে এলেন বরদাসুন্দরী। হাতের ইশারায় ছবিকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'এইটি আমার বড় ছেলে, ছবি। রবিকে তো তুমি দেখেছ। ওটি আমার ছোট। একটি মেয়ের সাধ আমার চিরদিনের। কিন্তু তা আর মিটলো না। লক্ষ্মীকে তুমি আমাকে দাও ভাই। রবির সঙ্গে ভাল মানাবে না। ছবির সঙ্গে আমি বিয়ে দেবো।'

একেবারে স্পষ্ট পরিষ্কার প্রস্তাব। এবং মধুপুর শহরের রাস্তার ওপর। একটানে অনেক-গুলো কথা বলে তিনি তখন হাঁপাচ্ছেন।

লক্ষ্মীর মা সরলা খুশীই হলো। মেয়ের মা—খুশী হবার কথাই।

'ওগো, শুনছো?'

লক্ষ্মীর বাবা কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। বুঝলেন—লক্ষ্মীর মা তাকেই ডাকছেন।

বললেন, 'কি বলছো ?'

'শোনো।'

হরেনবাবু তখন গাড়ী ডাকবার জন্যে যাচ্ছ। বললেন—'রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলে না। আমি দুটো গাড়ী ডাকি।'

হরেনবাবু গাড়ী ডাকলেন। আর হরেনবাবু শুনলেন একটি বিচিত্র সংবাদ। ন'বছরের মেয়ের সঙ্গে পনেরো-ষোলো বছরের একটি ছেলের বিয়ে।

'শরৎ আইনে-বরবে যে!'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'বরে বরবে আমাকে বরবে।'

আপনি বলে নেবেন—অমুকবাবুর স্ত্রী তার ছেলের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিয়েছে আমার মেয়ের।

হরেনবাবু হাসলেন একটুখানি।

দু'খানা গাড়ী ধরেছিলেন হরেনবাবু।

একটা টাকায় সবাইকে ধরলো না। যে যেটায় পারলে উঠে পড়লো।

ছেলেমেয়ের সামনে বিয়ে-থার কথা বলা উচিত নয়। কথাটা উঠতেই হরেনবাবু বরদাসুন্দরীকে থামিয়ে দিলেন।

বরদাসুন্দরী কিন্তু উতলা হ'য়ে উঠেছিলেন এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে।

মেয়ের মা উতলা হবে কোথায়, ছেলের মা'র ছটফটানি বেশি। লক্ষ্মীদের সবাইকে তিনি নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুললেন।

প্রকাণ্ড বাড়ী। সুমুখে নয় বাগান, ইঁদারা, আম, আতা আর পেয়ারার গাছ। যেমন বাড়ী, তেমনি বাড়ীর আসবাবপত্র। দেখলেই বুঝতে পারা যায়—হরেনবাবু বড়লোক। দুটিমাত্র ছেলে। দু'জনেই রাজপুত্রের মত দেখতে।

লক্ষ্মীর মা সরলা—হাতে যেন স্বর্গ পেলে। দেখতে শুনতে মেয়ে তার ভাল হলে কি হবে, এত বড়লোকের বাড়ীতে মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ্য তার স্বামীর নেই। মেয়ে অয়েছে, বিয়ে তার একদিন হবেই। কিন্তু কার বাড়ীতে কার হাতে গিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে—

ছেলের মার যখন এত আগ্রহ তখন এইখানে বিয়ে দেওয়াই ভালো। মেয়ে সুখে থাকবে, কলকাতাতেই বাস করবে। শ্যামবাজার আর ভবানীপুর। যখন খুশী দেখতে পাবে।

স্বামীকে বললে, 'তুমি আর আপত্তি কোরো না বাপু। কটু করে কোন্‌দিন মরে যাব তার ঠিক নেই। তার চেয়ে লক্ষ্মীর বিয়েটা নিজের চোখে দেখে যাই।'

'তাই বলে ওই ন'বছরের মেয়ের বিয়ে ?'

'তাতে দোষ কি ? ন'বছরে তো গৌরী দান হয় এখনও।'

হরেনবাবুর ভয় ছিল টাকার। বললেন, 'হরেনবাবু বড়লোক। ছেলের বিয়েতে কত টাকা চেয়ে বসবেন আগে জানো। তার পর তো বিয়ে।'

সরলা বললে, 'কত টাকা তুমি খরচ করতে পারবে বল না। তারপর আমি বলে কয়ে দেখি। ছেলের হাতে মেয়ে আমার খুব ভালমানুষ বলে মনে হচ্ছে।'

লক্ষ্মীর মা রাজী হলো। কিন্তু লক্ষ্মীর বাবা বরেনবাবু কেমন যেন তক্ষুনি-তক্ষুনি সম্মতি দিতে পারলেন না। বললেন, 'বাড়ী চল। সেখানে গিয়ে একটু ভেবে দেখি।'

মেয়ের বিয়ে বলে কথা। একটু ভাবতে হবে বই-কি!

মেয়ের বিয়ে—আমাদের দেশে চিরকাল একটা সমস্যা। প্রথম ভাবনা টাকার। তার পরের ভাবনা মেয়ের ভবিষ্যতের। পরের মেয়ে—গিয়ে পড়বে একটি নতুন সংসারে। কে যে কি চোখে দেখবে কে জানে।

সরলা বললে, 'অত বড় লোকের বাড়ীর বৌ হবে, তুমি আর বাধা দিও না। তোমার একটি পয়সা খরচ হবে না। আমি কথা বলেছি রবির মায়ের সঙ্গে।'

বরেনবাবুর সেই এক কথা। তখনও তিনি বলছেন, 'ওইটুকু মেয়ের বিয়ে দেবে, লোকে বলবে কি?'

সরলা জেদ ধরে বললো।

—'যে যা বলে বলুক। বিয়ে আমি দেবোই।'

বরেনবাবু বললেন, 'ভাখো, ছেলেমানুষী কোরো না।'

সরলা তখন তার মনের কথা খুলে বললে।

'মানুষের মরা-বাঁচার কথা কিছু বলা যায় না। কে যে তখন মরে যাব তার ঠিক নেই। আমি মারা গেলে ক্ষতি নেই। তুমি রইলে। মেয়ের বিয়ে যেখানে হোক দেবে। কিন্তু ধরো, আমরা দু'জনেই মারা গেলাম। তখন কি হবে বলতে পারো?'

বরেনবাবু বললেন, 'কী আর হবে? শুশুর রয়েছে। বড় দাদা—বোনের বিয়ে দেবে।'

সরলা বললে, 'ওইখানেই আমার ভয়। শুশুর বোনের বিয়ে দেবে বলে আমার মনে হয় না। শুশুরের সঙ্গে ওর একদণ্ড বনে না। তাইএ বোনে যদি ভাব থাকতো—আমি ভাবতাম না।'

বরেনবাবু হাসলেন একটুখানি।

'ছেলেবেলায় ওরকম হয়। বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'বিয়ে তা'হলে এখানে তুমি দেবে না?'

বরেনবাবু বললেন, 'না। লোকে হাসবে। বাল্যবিবাহ আগেকার যুগে হতো। এ-যুগে বাল্যবিবাহ অচল।'

সরলা অনেক করে বুঝাবার চেষ্টা করলে তার স্বামীকে। বললে, 'জানি আজকাল মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে, বড় হচ্ছে, সেয়ানা হচ্ছে, তারপর তাদের বিয়ে দিচ্ছে। কেউ কেউ-বা নিজেই নিজের বর ঠিক করে নিচ্ছে। কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীও কম হচ্ছে না। ভাল হচ্ছে না যদ্দ হচ্ছে জানি না বাপু আমার কিন্তু মনে হয়—ছেলেবেলায় বিয়ে দেওয়াই ভালো।'

সরলা সেই যে ধরে রইলো কথাটা তার আর নড়-চড় হলো না।

শেষ পর্যন্ত তার কথাই বজায় রইলো।

পরের মাসেই তারা মধুপুর থেকে ফিরে এলো কলকাতায়।

তারপর একটি ভাল দিন দেখে বিয়ে দিলে লক্ষ্মীর।

বিয়ে দিলে রবির সঙ্গে নয়—বরদাসুন্দরীর বড় ছেলে হরির সঙ্গে।

দুটিতে মানালো চমৎকার।

যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে।

রবি ছিল তার খেলার সাথী। এখন হলো দেওর।

এখনও সে তেমনি খেলার সাথী হয়েই রইলো।

বরদাসুন্দরীর মনের সাধ মিটলো। একটি মেয়ে চেয়েছিলেন, মেয়ে পেলেন।

ছোট বৌ। গয়না পরিয়ে শাড়ী পরিয়ে সাধ যেন আর মেটে না।

পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে নিমন্ত্রণ করে ডাকেন বাড়ীতে। তারপর বৌ দেখিয়ে বলেন, 'কেমন বৌ হলো ভাখো। বৌকে আমার আশীর্বাদ কর তোমরা।'

আশীর্বাদ অবশ্য করে সকলেই কিন্তু আড়ালে গিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতেও ছাড়ে না।

'তোমরা বড়লোক বাবা, তোমাদের সবই সাজে। তোমরা যা করবে তাই। তাই বলে গাল টিপলে দুধ বেরোয় ওই মেয়ের বিয়ে দেয় কখনও! বিয়ে তো নয়—ছেলেখেলা!

'পুলিশে একটা উড়ো চিঠি দিয়ে দিলে কেমন হয়!

'নাম-ঠিকানা দিয়ে যে না লিখে!' কয়েকটা মেয়ে ঠিক করলে—লিখবে।

'হ্যাঁ, বলুক ওদের শরদা-আইনে। মজাটা বুঝুক একবার!' (ক্রমশঃ)

• • • •

বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক মেরি করেলি একবার দুষ্কর রাত্রে এক গোরস্থানে ঢুকে পড়েন। গোরস্থানটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আর নির্জন স্থানে অবস্থিত।

গোরস্থান রক্ষকেরা তিনি যে সেখানে আছেন সেটা না জানতে পেরে গেটে চাবী দিয়ে বাড়ী চলে গেল।

একাকিনী সেই নির্জন গোরস্থানে থাকতে হোল মেরি করেলিকে। সারা রাত কি এক মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে রইলেন তিনি। অপূর্ব সে অনুভূতি, কি এক বিভীষিকাময় চেতনা। একটা গভীর বৈরাগ্যের কালোছায়া।

ভোরবেলা রক্ষকেরা গেট খুলে তাঁকে দেখে অবাক্।

কিন্তু মেরি করেলির মুখে তখন উল্লাসের হাসি। তিনি পেয়ে গেছেন কিছু সাহিত্য সম্পদ।

তার কিছুদিন পরেই প্রকাশিত হোলো তাঁর Sorrows of Satan.

সুরলোকে

রামপ্রসাদ সেন

পুরানো দিল্লী। আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখনো ভোর হয়নি। মোয়াজ্জিন আজান ডাকতেও শুরু করেনি। মিনার সমুজ মসজিদের নীচে ঘুমন্ত শহর তখন নিস্তব্ধ, নিঝুম। সহসা লালকেল্লার ময়দান থেকে সুরের লহরী বইতে থাকে। মহানগরীর মহল্লায় মহল্লায় গলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়ে সেই সুর। ছড়িয়ে পড়ে প্রাসাদে, প্রমোদ কাননে, শ্মশানে, কবরস্থানে। জুম্মা মসজিদের সিঁড়ির ধাপে ধাপে উঠে আসিয়ে তোলে সোপানশায়ী ভিখারী ফকিরদের। আসিয়ে তোলে টাঙাওয়ালা, এক্কাওয়ালাদের। তোরণে, কীর্তিস্তম্ভে, কেল্লায়, মানমন্দিরে ঠোক্কর খেতে খেতে আলোর খোঁজে আকুল হয়ে বেড়ায় সেই সুর। তারপর হতাশায়, অবসাদে লুটিয়ে পড়ে দিল্লীর ধুলোয়। ওদিকে লালকেল্লার আড়ালে আলোর খবর নিয়ে জ্বল জ্বল ক'রে ওঠে শুকতারা।

• • • •

গদি-আঁটা চেয়ারখানা কার্পেট-পাতা মেঝের ওপর উলটে ফেলে উঠে দাঁড়াল জুলেখা। বলল, পড়তে আর ভাল লাগছে না মনোহা। যচ্ছ ঘুম পাচ্ছে। সোফা থেকে একটা কুশন তুলে, টেবিল ঘুরে মন্মথর দিকে এসে শুয়ে পড়ল তার পায়ের তলায়। চপল আবেশে খানিকটা লুটোপুটি খেল কার্পেটের ওপর। আলুথালু হ'ল তার বেশবাস। তৃপ্তিতা তরুণীর দিকে চেয়ে ক্ষণকাল উপবিষ্ট হ'ল মন্মথ। অর্ধেক চিত হয়ে অর্ধেক পাশ ফিরে লীলায়িত ভঙ্গীতে শুয়ে রইল জুলেখা।

দরজার দিকে এগিয়ে অস্ফুট স্বরে মন্মথ বলল, আমি নীচে যাচ্ছি জুলেখা!—সাতটা বাজে! রাহুবাবু আজ বেরোবেন বলেছেন। —আমায় 'ক্যাশ'-এ বসতে হবে।

মুখের ওপর থেকে একগোছা চুল সরিয়ে জুলেখা বলল, দাদা তোমার হাতে 'ক্যাশ' ছেড়ে দেন, লোভ হয় না তোমার?

উত্তর না দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল মন্মথ।

চকিতে তার কাছে উঠে এসে দাঁড়াল জুলেখা। বলল, 'বুজদিলের' বাংলা সেদিন কি শিখিয়ে ছিলে? ভুলে গেছি মনোহা। 'গ্রিজ'! আর একবার বল না।

ঘাড় নীচু করে আস্তে আস্তে মন্মথ বলল, ভীরু—কাপুরুষ।

খিল খিল ক'রে হেসে উঠল জুলেখা।

সতীর ধাপের পুরানো আমলের সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেবে এল মন্মথ।

ফোয়ারার মোড়ে, চৌধুরী মেডিকেল এ্যাণ্ড প্রভিশন স্টোর্স। দিল্লীর প্রখ্যাত বাঙালী প্রতিষ্ঠান। প্রকাণ্ড বাড়ি। ওপর তলায় বাস করেন চৌধুরী পরিবার। একতলায় বিরাট দোকান। ম্যাটিং পাতা হল্ ঘর। ঝকঝকে আলমারি, 'শো-কেস'। ঘরে ঘরে পণ্য দ্রব্য সাজান। সন্ধ্যার দিকে

মেম সাহেবের ভিড় হয় বেশী। 'সেলস্‌ম্যান'রা সেলাদার হাসি হেসে তুষ্ট করে ক্রেতাদের। মন্মথ এই খানেই কম্পাউণ্ডারের কাজ করে।

দোকানের স্বত্বাধিকারী চৌধুরীরা দিল্লীতে দু পুরুষ ধরে আছেন। খ্যাতি প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। চৌধুরীদের আদি নিবাস ছিল কলকাতার কাছে পানিহাটীতে। মন্মথও সেই গ্রামের ছেলে। বছর দুই হল রাধাকান্ত নিয়ে এসেছে তাকে দিল্লীতে।

প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা বেশীর ভাগই অবাঙ্গালী। কেবল জন পাঁচেক কম্পাউণ্ডার আছে বাঙ্গালী। স্বজাতিপ্রীতি থেকে তারা বঞ্চিত নয়। পাশেই আর একটি বাড়িতে তাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা আছে। তাদেরই সঙ্গে থাকে মন্মথ। স্টোর্স থেকে সন্ধ্যা বেলাটা সে ছুটি পায় রাধাকান্তর বোন জুলেখাকে বাংলা পড়াবার জন্যে। কারণ আজন্ম দিল্লীতে প্রতিপালিত হওয়ায়, বাংলা বলতে কইতে পারলেও, লিখতে পড়তে সে একেবারেই পারত না।

মাস ছয়েক হ'ল মন্মথ এই ভারবহ কাজটি নিতে বাধ্য হয়েছে তার অন্নদাতার হুকুমে। ভয় তার অমূলক নয়। দৃঢ় ভিত্তির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত; —জুলেখা কুমারী। জুলেখা লক্ষপতি রাধাকান্ত চৌধুরীর একমাত্র বোন। তার ওপর গত বছরে আই. এ. পাস করেছে সে। তার নাম অদ্ভুত! তার কথা অদ্ভুত! তার ব্যবহার অদ্ভুত! তার শাল আলোর মতো লাল! চাঁদনীচকের কোয়ারার মতো অফুরন্ত তার প্রাণোচ্ছ্বাস! তাই সকল সময় তটস্থ হয়ে থাকে মন্মথ।

মন্মথর পূর্ব ইতিহাস ঔৎসুক্য জাগায় না কারো মনে। 'কেরাণীর ছেলে' এই দুটি কথাতেই তার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ, নিজামউদ্দিনের কুয়োর মতো একবার উঁকি মারলেই বোঝা যায়। পাষাণ-গাঁথা বদ্ধ জলাশয়—গতিহীন, আবর্তহীন তেপসা জলে ভেসে উঠেছে মরা পায়রা। কন্যাদায়, ঋণভার প্রভৃতি বহুবিধ ভার বহন করে স্বর্গারোহণ করেছেন তার জনক। প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে বিশ্বনাথ দর্শন করতে গিয়ে জননীরও ঘটল কাশীপ্রাপ্তি। ছেলে পড়িয়ে খাচ্ছিল মন্মথ। গ্রামে এলেন রাধাকান্ত চৌধুরী। যোগাযোগ করিয়ে দিলেন মামুখুড়ো। চুনবালি খসা ভিটেবাড়ির দরজায় তালা বন্ধ করে, সার্ভেন্টস্ কম্পার্টমেণ্টএ চড়ে, দিল্লী চলে এল সে।

দুরু দুরু বুকে ওপর থেকে নেবে এসে প্রতিক্ষণ স্টোর্স-এর রকে দাঁড়াল মন্মথ। সন্ধ্যায় ডিউটী তার ছিল না। জুলেখার ভাবগতিক দেখে ভয়ে সে পালিয়ে এসেছিল। কোলাহল-মুখর চাঁদনীচকের দৃশ্য তার ভয়ের কথা দিল ভুলিয়ে। ইলেকট্রিকের আলোয় ঝলমল করছে বাজার। সামনের প্রকাণ্ড ফোয়ারা থেকে ঝরছে অজস্র ধারা। কাছ দিয়ে গেলে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো ভিজিয়ে দেয় গা। একখানে ট্রামগাড়ি ছুটপাত ঘেঁষে চলেছে। উৎকট ঝন্‌ঝনানি শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দু' পাশের বাড়িগুলো থেকে। একা, টাঙ্গা, ভুলি, ভাড়ায়, ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো, ভ্যান, মোটর, নানা সৌখিক ও আধুনিক যান বাহন ছুটোছুটি করছে রাস্তায়। কারো গতি কূর্মের মতো মন্থর, কারো বা শশকের মতো ক্ষিপ্র। এই মানব-পশু-যন্ত্রের অদ্ভুত বিচরণ কৌশল অবাক হয়ে দেখছিল মন্মথ। এদের মধ্যে টাঙ্গাওয়ালারাই তার মন হরণ করে বেশী। এরা যেন রোমান এরিনা-র চ্যারিয়ট রেস-এর প্রতিদ্বন্দ্বী। দৌড় দেবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে সারথির সঙ্গে বাহনও। সালোয়ার, লম্বা কামিজ পরা অল্পবয়সী টাঙ্গাওয়ালারা পিছনের সীট-এ হাঁটু মুড়ে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে, চাবুক ঘুরিয়ে হাঁকছে—

এক সওয়ারী—ঘণ্টাঘর—কতেপুর—সদরবাজার। গলায় তাদের রেশমী রুমাল, মাথায় ফেল্ট-ক্যাপ মুখে পেডরো সিগারেট। আরোহী ছুটলে, রাস টেনে ঘোরায় টাঙ্গার মুখ। তেজী ঘোড়া হ্রেষাধ্বনি করে দাঁড়িয়ে ওঠে পিছনের পায়ে। তারপর ঘোরাবার পাশ দিয়ে তীর বেগে অদৃশ্য হয় বড় রাস্তায়। সাজের ঘুঙুর দ্রুত লয়ে বেজে উঠে কোলাহল সমুদ্রে যায় মিলিয়ে। বাঁ দিকে রাম থিয়েটারে জ্বলছে রঙ বেরঙের আলোর মালা। গাড়ি বারান্দার নীচে বিক্রি হচ্ছে উর্দুতে ছাপা প্রোগ্রাম। ঘোরপা ঢাকা অভিনেত্রী জনারণ্যে রহস্য ছড়িয়ে পাশের গলি দিয়ে চকিতে অদৃশ্য হয় সাজঘরে। নাটক হচ্ছে "বাগ এ-ই-মিলর"। দেখতে ইচ্ছে করে মন্মথর। ফুটপাতের ধারে ধারে ফেরিওয়ালা, খুকাওয়ালারা বসেছে তাদের পসরা নিয়ে। বিক্রি করছে দহিবড়া, চাট্, পাতাশা, ছোলাবটর, আলুকী-টিকিয়া। হালওয়াইয়ের দোকান থেকে গন্ধ আসছে 'বড়ওয়াই' তাজার। ইসলামী হোটেল থেকে আসছে কোপ্তা, কাবাবের কড়া 'খুশবু'। 'ইভনিং-ইন্-প্যারী' সেন্ট সে বিক্রি করে স্টোর্সে। জানে না প্যারিসের সন্ধ্যা কিরকম। তবে দিল্লীর সন্ধ্যার তুলনা সে খুঁজে পায় না!

কী ভায়া, বাঙলা পড়ানো হ'ল? আজ যে এত সকাল সকাল?

পথের দৃশ্যে তন্ময় হয়েছিল মন্মথ। হেড-কন্ডাক্টারের বঙ্গলাচরণের গলা শুনে চমকে উঠল সে। পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, যাঁ দাদা, এই এলাম পড়িয়ে।

বঙ্গলাচরণ বলল, যত্তি তোমার বুকের পাটা ভায়া। আমরাও অত দূর সাহস করিনি। প্রফেসর ভদ্র পাগল হয়ে যাবার পর যাদুবাবু আমাকেই পড়াতে বলেছিলেন। জেনে শুনে কুকুরের ওপর থেকে কে আর ঝাঁপ খেতে চায় বল? পড়িয়ে এলেই ভদ্র সাহেব এক ডোজ সিডেটিভ মিক্সচার খেতেন। শেষে তাতেও ফল হয় না। ঘুম আর কিছুতেই আসে না। এখন তাঁকে বেঁধে রাখতে হয়। তার আগে পড়াতেন ভঙ্গু সাহেবের ছেলে বিশ্বজিৎ। মস্ত পালোয়ান। ওস্তাদ নীকারী। ধরা ছাড়ি। এই হাতের গুলো। এখন পণ্ডিচেরীতে আছেন 'মাদার'-এর হেফাজতে। —তুমি ভায়া দরিদ্র মানুষ। বহু দূর থেকে এসেছ দুটো ভাতের আশায়। তাই তোমার মঙ্গলের জন্যেই সাবধান করে দিচ্ছি। কি জান ভাই, দিল্লীর সিঁড়িগুলো বড় খাড়া খাড়া। একবার পা ফসকালে ধরবার আর কিছু নেই।

মন্মথর চোখের সামনে থেকে 'ইভনিং-ইন-দেল্লী'-র অপূর্ব শোভা নিমেষে অন্তর্হিত হ'ল। তার অদৃষ্ট যেন বঙ্গলাচরণের রূপ ধরে ভবিষ্যৎ বাণী শোনাল তাকে। শো-উইনডোর সবুজ জলভরা প্রকাণ্ড কাচের বোতল থেকে প্রতিফলিত আলোয় বঙ্গলাচরণকে প্রেতমূর্তির মতোই মনে হচ্ছিল। মহা আতঙ্কে মন্মথ বলল, তাহলে কি করব দাদা।

পৈশাচিক হাস্যে বঙ্গলাচরণ বলল, করবে আর কি? 'ঝটকা-কি-কালিয়া' (এক কোপে কাটা মাংস) হবার জন্যে সব সময় তৈরী থেকো! অথাই না হলেই হ'ল!

প্রতিজন স্টোর্স-এর পিছনে টিনের শেড্ ঢাকা বড় উঠান। সেখানে তৈরি হয় নানা ওষুধপত্র। কলের নীচে মুরুশ দিয়ে শিশি ঘুতে ঘুতে গান গাইছিল মন্মথ। 'ম্যাগনাল্ক্'-এর একটা খালি শিশে

বাজিয়ে তাল দিচ্ছিল রাজেন কম্পাউণ্ডার। পেয়ারে মিস্ত্রী, সেই তালে তাল মিলিয়ে ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ শব্দে কাঠ চিরছিল করাত দিয়ে। মন্মথ গাইছিল—

(তুমি) না দিলে সোহাগ না দিলে মান,
না দিলে আসন না দিলে গান।
(তবু) এই অভাগারই হৃদয়-শোনিতে
রাঙালে আঁচল খান।
ভিখারী কাঙাল হ'ল লালে লাল
আপন শোনিতে ভিজে।
কিরাতীর মতো ধেয়ে এলে ক্রত
আঁচল রাঙাতে নিজে।
গাহিলে উষার গান।
সে সুরে রাঙালো পুরব আকাশ,
রাঙালো বনের ফুল।
কণাটুকু তার দিঁবিমূল্যে দিতে হ'ল বুঝি তব ভুল।
(তাই) পরমে রাঙালো গোধূলির আলো
হেরি মিথ্যার ভান॥

হঠাৎ পেয়ারে মিস্ত্রীর করাত বেতালে চলতে লাগল। গিপের মুখর হ'ল বন্ধ। ঘাড় ফিরিয়ে মন্মথ দেখে, পিছনে রাধাকান্ত দাঁড়িয়ে, আর তার সঙ্গে সেই অতিথি ভদ্রলোকটি যিনি কদিন হ'ল দিল্লীতে এসেছেন। করসা তাঁর রঙ, বেতের মত লকলকে তাঁর চেহারা।

ভদ্রলোক মন্মথকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কার লেখা গান? অপ্রস্তুত হয়ে মন্মথ বলল, আজ্ঞে, এ কারুর লেখা গান নয়—এ এমনিই।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সুর কে দিলে?

মন্মথ বলল, আজ্ঞে, এমনিই!

রাধাকান্ত হেসে বলল, চলুন চলুন প্রবনাথ বাবু। —এ হচ্ছে ওর শিশি-বোতা গান!

প্রবনাথ বাবু বললেন, আপনার কর্মচারী বুঝি? একে আজ একবার আসতে বলবেন তো ক্লাবে। আপনাদের অন্ধ বাউলের সমস্যার হয়তো সমাধান হতে পারে।

ভেতরের পথ দিয়ে তাঁরা দোকানের শো-রুমের দিকে চলে গেলেন।

দু'বছরের ওপর হ'ল মন্মথ দিল্লীতে এসেছে। পেয়ারে মিস্ত্রী আর রাজেন কম্পাউণ্ডার ছাড়া আজ পর্যন্ত তার গানের তৃতীয় সমঝদার জোটেনি। প্রবনাথ বাবু সেই হোন। তার গান সম্বন্ধে ওই দু'টি কথা জিজ্ঞাসা করাতেই সে নিজেকে ধন্য মনে করল। তবে অন্ধ বাউলের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। আর ক্লাবের নামে মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেল তার। —মিউজিক্ ডিরেক্টার নন্দী সাহেব, গত বছরে হারমোনিয়াম থেকে উঠিয়ে দিয়েছিলেন তাকে। রাধাকান্তকে বলেছিলেন,—ওহে, এসব কম্পাউণ্ডার-কম্পাউণ্ডারকে ক্লাবে ঢুকিও না। দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের একটা নাম আছে—আভিজাত্য আছে! লাঞ্ছিত, অপমান হয়ে ক্লাবে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল মন্মথ। আজ আবার এ কি বিভ্রাট!

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল তার। —জ্যাঠামশাই বলতেন, হিজ মাস্টারস্ ভয়েসের সেই কুকুরটার মতো সুরের গানের ঝোঁক! —দিল্লীতে এসেই কি ওস্তাদ মহলে সে কম ঘুরেছে! বাঈ, জান, খাঁ, উজির বাদ দেয়নি কাউকেই। দেখেছে তাদের ঘরাণা নিয়ে মেয়ারেষি। সুরের নাম ধাম গোত্র নিয়ে মাথাফাটাফাটি। দেখেছে তাদের আতরদান, পানদান, পিকদান। মখমলের ঘেরাটোপ ঢাকা, হাতিরদাঁতের কাজ করা তানপুরা, সারঙ্গীও দেখেছে সে অনেক। কেবল তানের সন্ধানটিই পায়নি সে কোনো ওস্তাদের কাছে। অর্থ না থাকায় আশীর্বাদে সাগরেদ আর কেউ তাকে করল না। তাই গুরু পাবার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে, ভাবে, জলসায় গান গাওয়ার মোহ পরিত্যাগ করে, ভোর রাতে লালকেল্লার ময়দানে সে জমিয়ে তুলত তার একলার আসর। নিবে আসা কোটি কোটি তারা শুনত তার গান। আর শুনত ভিখারী, ফকির, টাঙ্গাওয়ালার দল।

মুন্নরা, বম্বেবর্গী অনেক বার হয়ে গেছে দিল্লীতে। শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ বাবু আসায় বিদ্বোৎসমাজ এবার স্থির করলেন কবিগুরুর 'ফাল্গুনী' অভিনয় করবেন তাঁরা। পরিচালনা করবেন রবীন্দ্রনাথ বাবু স্বয়ং। নন্দী সাহেবের 'মিউজিক্ ডিরেকশন্' এ ক্ষেত্রে অচল। ক্লাবের হোমরা চোমরা সভ্যদের মধ্যে অনেকেই ক্ষুণ্ণ হলেন। কয়েক জন অফিসার-পণ্ডিত যুক্তিবাণে ধরাশায়ী করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ বাবুকে। কিন্তু তাঁদের শরসন্ধান, প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তর-ভল্লের মতোই হাস্যকর বলে প্রমাণিত হ'ল। দিল্লীওয়ালারা তাঁর নির্দেশ শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন। অন্ধ বাউলের ভূমিকায় গান গাইবে মন্মথ কপ্পাউণ্ডার।

রিহার্সাল শুরু হ'ল। আশ্চর্য হয়ে রবীন্দ্রনাথ বাবু দেখলেন, শিশি ঘোষের সময় মন্মথর যে উদাত্ত কণ্ঠ তিনি শুনেছিলেন, ভাবে, রিহার্সালের সময় সে সুর আর তার গলা থেকে বেরোচ্ছে না! —সভ্যরা মাথা নেড়ে বললেন, শেষে একটা কেলেঙ্কারি হবে। —মন্মথর অবস্থা দেখে ভয় রবীন্দ্রনাথ বাবুও পেয়েছিলেন। তবু জেদের মাথায় বললেন, হোক কেলেঙ্কারি। মন্মথই গাইবে অন্ধ বাউলের গান। আমি শেখাব ওকে।

আলাদা ঘরে শিক্ষার ব্যবস্থা হল। রবীন্দ্রনাথ বাবু ছাড়া আর কোনো লোকই রইল না সেখানে। —বললেন, শোনো মন্মথ। মনে কর তুমি একজন অন্ধ। ভীষণ একটা বনের মধ্যে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছ। কেউ নেই তোমাকে সাহায্য করবার। হাত ধরে নিয়ে যাবারও কেউ নেই। বুঝতে পারছ তোমার অবস্থা? সাপের মাথায় পা দিতে পার। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পার ঘুমন্ত বাঘের ঘাড়ে। একটু এদিক ওদিক হলেই পা ফসকে তলিয়ে যেতে পার অতল গহ্বরে নীচে—নীচে, অনেক নীচে! এখন, কি করবে তুমি? আচ্ছা। কান খাড়া করে শোনো। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে শোনো! ওই! কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না? ও তোমার বন্ধু। ও-ই তোমায় পথ দেখাবে! ওই শব্দ লক্ষ্য ক'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও। গন্ধ পাচ্ছ কিছু? অদ্ভুত, সুন্দর একটা গন্ধ? ওই গন্ধ লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও।

মন্মথ চোখ বুজে গাইল—

"ধীরে বন্ধু গো ধীরে ধীরে
চলো তোমার বিজন মন্দিরে। —"

হাসিতে উদ্ভাসিত হ'ল ঞ্রবনাথ বাবুর মুখ। শিশি বোতল গলা দিয়ে গেয়েছে মন্মথ।

স্টেজের ভেতর, উইংস্-এর পাশে নন্দী সাহেব, সেন সাহেব আর রাধাকান্ত সাহেব মতো হিস্ হিস্ করে বলছেন, ইস-স্! সব মাটি হল। রাজা মহারাজারা এসেছেন, লালা সাহেব, শেঠ সাহেবেরা সব এসেছেন। 'ডোনেশন' দিয়েছেন মোটা মোটা টাকা! আর এই মন্মথ সর্বনাশ করল। গলা দিয়ে ওর একটু আওয়াজ বেরোচ্ছেনা। —এক কাজ কর! ঞ্রবনাথ বাবুকে বলে আমরা ড্রপ্ ফেলে দিই।

ওদিকে দুটাকার সীটের ছোকরা দর্শকরা, বেঞ্চি বাজিয়ে শিটি দিয়ে মহা গণ্ডগোল শুরু করে দিয়েছে। ব্যালকনিতে মেয়ে মহলে শুরু হয়েছে কচি ছেলের কান্না। আর মঞ্চের মাঝখানে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধ বাউল। চন্দ্রহাসের দল হাঁ করে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। অন্য কোনো নাটক হলে ওস্তাদ অভিনেতারা যা হোক কিছু বানিয়ে বলতে পারত। কিন্তু ফাল্গুনীতে সে উপায়ও নেই।

হঠাৎ মন্মথ গেয়ে উঠল—

"তোমার চরণ শব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্য গভীরে—
বী—রে বী—রে।"

বরণার মুখ থেকে কে যেন সরিয়ে দিল আবর্জনা রাশি। অবাধ সঙ্গীত ঝরতে লাগল মুক্ত ধারায়। বন্ধ হ'ল দুটাকার সীটের নির্লজ্জ কোলাহল। স্তব্ধ হ'ল শিশুর ক্রন্দন। প্রত্যেকটি দর্শক গভীর অরণ্যে পথ হারিয়ে যেন শুনতে পেল তার পায়ের শব্দ! অদ্ভুত, সুন্দর গন্ধ পেল কার উত্তরীয়ের।

অভিনয় শেষে অভিনন্দিত, মালাভূষিত হয়ে নির্বোধের মতো হাসছিল মন্মথ। চাবুকের মতো এলেন ঞ্রবনাথ বাবু। বললেন, শোনো মন্মথ। এদের স্তুতি-নিন্দায় যদি অভিভূত হয়ে পড়, তাহলে গান শিখবে কি করে? সাধনা যে তোমার সমস্তই বাকি রয়েছে। এ সফলতা সফলতাই নয়। সুর-স্রষ্টার মুখোমুখি বসে যদি তাল ধরতে না পারলে, যার গান তাকেই যদি না শোনালে তবে তোমার কিসের সার্থকতা? শোনো মন্মথ, উপদেশ দেবার অধিকার দিয়েছ তাই বলছি, দেহ-মনের সংযম শাসন করে চলবে। নইলে ব্যর্থ হবে তোমার সাধনা। কামনা করি, আলোর সুর, ঝড়ের সুর, বজ্রের সুর যেন বেজে ওঠে তোমার কণ্ঠে।

স্বরলিপির অনেকগুলি বই উপহার দিয়ে কিছুদিনের মধ্যে শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন ঞ্রবনাথ বাবু। মন্মথ দেখল, যে কম্পাউণ্ডার সেই কম্পাউণ্ডারই আছে সে। এই ক'দিনের সম্মান শুধু হুজুকের সম্মান। নন্দী সাহেবেরা তার কণ্ঠস্বরের মর্যাদা দেন নি। ঞ্রবনাথ বাবুর খাতিরে কেবল খাতির করেছিলেন তাকে। অন্ধ বাউলের ভূমিকায় কেউ মনে রাখল না তাকে। মনে রাখল মন্মথ কম্পাউণ্ডার বলে।

পড়ার ঘরে রুখে উঠে জুলেখা বলল, ছিঁড়ে ফেলে দেব তোমার স্বরলিপির বইগুলো! পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেব সব! শুধু গান, গান আর গান। কে শোনে তোমার গান? মেহাত ঞ্রবনাথ বাবুর কৃপায় সেবার তোমায় গাইতে দিয়েছিল। আর কোনো 'ফাংশানে' নন্দী সাহেবেরা ঢুকতে দিয়েছেন

তোমাকে? ওস্তাদেরা কেউ পৌঁছে। পর মুহূর্তে মন্মথর গলা জড়িয়ে ধরে মিনতিভরা কণ্ঠে বলে, তুমি আমায় ভালবাস না মনোদা? —আমি তোমার জন্যে সব ছাড়তে পারি। চলো, তোমার সেই পানিহাটীর ভাঙা বাড়িতে গিয়ে আমি থাকব। পয়োয়া করি না আমি কারো। এখনি চলে যেতে পারি তোমার সঙ্গে। —সাবালিকা হয়েছি আমি। বাবা ব্যাঙ্ক-এ টাকা রেখে গেছেন আমার নামে। দাদা বাধা দিতে পারে না! বল, তুমি আমায় ভালবাস?

মন্মথর মাথার ভেতরটা কিরকম যেন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। জুলেখার পুষ্ট দেহের স্পর্শে যেন আগুনের স্রোত বইতে লাগল তার শিরা উপশিরায়। মহাশক্তিতে নিজেকে মুক্ত ক'রে দরজার দিকে ছুটে গেল সে।

তড়িৎবেগে কাছে এসে মন্মথর হাত ধরল জুলেখা। মুক্তকেশী, প্রলয়ংকরী মূর্তি তার। আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে। হুঁসে উঠে বলল, এখন যদি চেঁচিয়ে উঠি, তুমি আমায় অপমান করেছ ব'লে? আমি যাদো দেশের ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে নই! তোমার স্পর্ধা আমি সহ্য করব না।

মন্মথর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বাইরের দালানে যেন রাধাকান্তর স্ত্রীর গলা শোনা গেল। হয় তো এঘরেই এসে পড়বে? চরম ভয় বুঝি নির্ভীক করে তুলল তাকে! আস্তে আস্তে বলল, আমি তো স্পর্ধা করিনি জুলেখা। আমি গান শিখছি সুরস্রষ্টাকে শোনাব বলে। সাধনা করতে গেলে, সংযমের প্রয়োজন আছে জুলেখা! আমার মনের বল তোমার চেয়ে কিছু কম নয়। তুমি আমার ওপর রাগ ক'রো না।

জুলেখা ছেড়ে দিল মন্মথর হাত।

কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল জুলেখার। সমান ঘর। সুশ্রী বর। চলে গেল সে কলকাতায়।

অসুস্থ হয়ে পড়ল মন্মথ। হাঁপানির টান ধরতে লাগল তার। সুরসাধনায় পড়ল ব্যাঘাত। দেখতে দেখতে জীর্ণ, অকালবৃদ্ধ হয়ে পড়ল সে। কম্পাউণ্ডারদের কোয়াটারে দু পাশে হাত রেখে, সোজা হয়ে বসে দিনরাত কেবল হাঁপায়। হাঁপ যেদিন কম থাকে, স্বরলিপি দেখে গুণগুণ ক'রে গান ভাঁজে, কোনো বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে। ক্রমে অকর্মণ্য হয়ে পড়ল সে। রাধাকান্ত বসিয়ে খাওয়াতে আর রাজী হ'ল না তাকে।

স্বরলিপির বইগুলি, বিছানা আর টিনের পেটরা নিয়ে একদিন তাকে বেরিয়ে আসতে হ'ল চৌধুরী কোম্পানী ছেড়ে। কাছেই লছমীনারায়ণ কাটরায় বিনা ভাড়ায় একতলায় একখানা ঘর পেল। আর পেল বাড়িওয়ালার ছেলে দুটিকে পড়িয়ে।

সেদিন দুপুরে কাশতে কাশতে প্রায় দম আটকে যাবার মতো হ'ল তার। কাশি থামলে নির্জীব হয়ে শুয়ে রইল দড়ির খাটিয়ায়।

—মনোদা।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল মন্মথ। কোনো কথা ফুটলো না তার মুখে।

ছেঁড়া চিক তুলে ঘরে ঢুকে জুলেখা বলল, তোমার সব খবরই পেয়েছি মনোদা। নিয়ে যাবো তোমায় আমি কলকাতায়। থাকবে তুমি আমার কাছে নির্ভাবনায়। আমার স্বামী তোমার কথা জানেন সব। গুণীকে সম্মান দেবার শিক্ষা তাঁর আছে। তোমায় নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা

রওনা হব। এর চাইতে অনেক বড় একটা খবর তোমায় দিতে এলাম আজ! তোমার সাধনা ছিল সুরস্রষ্টাকে গান শোনানর। তিনি এসেছেন দিল্লীতে। আমার স্বামী আর ধ্রুবনাথ বাবু এখনি আসবেন। তুমি তৈরি হয়ে নাও! প্রথম গান তোমাকেই গাইতে হবে তাঁর সামনে বসে। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

ককিয়ে উঠল মন্মথ। বলল, গান আর আমি গাইতে পারি না জুলেখা। হাঁপানি আমার টুঁটি চেপে ধরেছে। —সাধনায় আমার ত্রুটি ছিল। নিষ্ঠায় ছিল অভাব। মনের সংযম আমি রক্ষা করতে পারিনি! সঙ্গীতের চেয়ে তোমার দিকেই আমার আকর্ষণ ছিল বেশী। তোমাকে আমি ভাল বেসেছিলাম জুলেখা!

হেসে জুলেখা বলল, বেশ করেছিলে ভালবেসেছিলে। সেই জন্যেই আমি বলছি, তুমি নিশ্চয়ই গাইতে পারবে। ওঠো! কিচ্ছু ভয় নেই! এ হাঁপানি তোমার মনের! আমি বলছি তুমি ঠিক গাইতে পারবে।

ঘোর সন্দেহে মন্মথ বলল, নন্দী সাহেব যদি উঠিয়ে দেন আমাকে সভা থেকে?

জুলেখা বলল, পাগলের মতো বোকো না। চিরদিন নন্দী-ভৃঙ্গীর ভয়েই কাঠ হয়ে রইলে। দেখলে না কোনো দিন কৈলাসপতির বৈভব!

তেল মাখিয়ে, মাথা মুইয়ে চুল আঁচড়ে দিল জুলেখা। কয়সা জামা কাপড় বার করে দিল টিনের পেটরা খুলে।

মন্মথর মনে হ'ল যেন কোনোদিন তার হাঁপানি হয়নি। কেউ তাকে কোনোদিন অসম্মান করেনি। দুঃখ দুর্দশার লেশমাত্র নেই এই পৃথিবীতে।

বিরাট মণ্ডপ লোকে লোকারণ্য। শ্রেষ্ঠী, রাজপ্রতিনিধি, আচার্য, পণ্ডিত, কবি, শিল্পী, নর্তক, গায়কের দল নানা বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে অলঙ্কৃত করে আছেন সভা। সকলেই কৃতকর্মা, কৃতবিদ্য। নরোত্তম পুরুষকে বরণ করবার যোগ্য অধিকারী। কিন্তু মন্মথর মনে হ'ল, বিকৃত আকৃতির মহা ভয়ংকর এক দল দৈত্য যেন হাঁ করে গিলতে আসছে তাকে। তাদের লালাসিক্ত জিব বেরিয়ে আসছে থেকে থেকে। তাদের অট্টহাসিতে কানে তালা লেগে যাচ্ছে তার! এই রক্ষ, রক্ষ, দানবের ব্যূহ ভেদ করে কেমন করে সে পৌঁছবে পুরুষোত্তমের বেদীর নীচে! আতঙ্কে চোখ বুজল মন্মথ।

—মনোদা! দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? এগিয়ে চল! বেদীর নীচে ধ্রুবনাথ বাবু যে অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে। —হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল জুলেখা। ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল বিপুলকায় শ্রেষ্ঠীদের। আঁচলের হাওয়ায় বিকল গম্ভীর প্রকৃতির অমাত্যদের। পণ্ডিতদের পা দিল মাড়িয়ে। 'সরী' বলে অতিক্রম করে গেল গুণীদের। একেবারে বেদীর নীচে এসে থামল। আলপনা কাটা সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে ছিলেন ধ্রুবনাথ বাবু। হাত ধরে টেনে নিলেন তাকে ওপরে। বসিয়ে দিলেন যুগশ্রেষ্ঠ পুরুষের সামনে।

মন্মথ ধন্য হ'ল না মুগ্ধ হল, ঘনীভূত হ'ল না বিগলিত হ'ল, কিছুই সে বুঝতে পারল না। কেবল অবাক হয়ে চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে।

সহসা আলোর সুর ঝঙ্কৃত হ'ল তার কানে:

—"তোর কথা ধ্রুব আমাকে বলেছে। অন্ধ বাউলের গান গেয়েছিলি তুই। তোর গান শুনতেই তো আমি দিল্লীতে এসেছি।"

কথা ফুটল মন্মথর মুখে। শুষ্ক কণ্ঠ সরস হ'ল তার। বলল, বড়লোকেরা যদি বিরক্ত হন? এঁদের বড় ভয় করে আমার। এঁদের তর্জন গর্জনে আমার গান তো শোনা যাবে না।

পুনর্বার ধ্বনিত হ'ল আলোর সুর:

—"আমাকে গান শোনাবি, তাতে আবার ভয় কিসের। ওদের কলরব এখনি বন্ধ হয়ে যাবে। আমি বলছি, তুই গা।"

মন্মথর মনে হ'ল সে যেন এক হয়ে মিশে গেল সেই আলোক উৎসের সঙ্গে। তাকাল বেদীর নীচে। দেখল অগণিত শিশুর ভিড়। বীভৎস মুখোশ পরে এরাই তবে সারাজীবন ভয় দেখিয়ে এসেছে তাকে? রঙিন কাগজ আর রাংতা মোড়া এদের বর্ম কিরীট! পিচবোর্ডের ঢাল? গদা, মুষল সব খেলার?

আশ্বস্ত হ'ল তার মন। সে গাইল—

"এই শ্রাবণের বুকের ভিতর—
আগুন আছে রে—
সেই আগুনের কালো রূপ যে
আমার চোখে—
ওরে আমার চোখের পরে নাচে—
আগুন আছে রে—"

মেঘ বজ্র বিদ্যুতের মহাসঙ্গীত শুনে স্তম্ভিত হয়ে রইল সকলে। বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করে ধ্বনিত হতে লাগল—"আগুন আছেরে।"

শ্রবণ বন্ধ ক'রে মন্মথ শুনল:

—"তোকে আমি নিয়ে যাব আমার কাছে। ধ্রুবর চিঠি পেলেই চলে আসিস!"

সুরলোক থেকে নীচে নামল মন্মথ। অসুরকুল মুহূর্তে ঘিরে ফেলল তাকে। রসাতলের গহ্বর থেকে হু হু শব্দে বেরোতে লাগল রাশি রাশি অন্ধকার। আড়াল করে দাঁড়াল অপরাহ্ণ সূর্যের প্রশান্ত দীপ্তি। অট্ট হাসি হেসে উঠল পিশাচ, অঘোরপন্থীর দল। দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল মন্মথর। গান গেয়েছে সে আজ প্রাণের সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করে। অবশিষ্ট আর কিছু নেই তার। এই শিশু পিশাচদের কাছে পরাজয় স্বীকার করাই ভাল। স্বরূপ এদের দেখে নিয়েছে সে। —রাংতার বর্ম-কিরীট, খেলার অস্ত্রশস্ত্র। —হাঃ হাঃ হাঃ! —চোখটা যেন কিরকম ঝাপসা মনে হ'ল তার। জুলেখার কাঁধে ভর দিয়ে কোনো রকমে সে বেরিয়ে এল বাইরে।

অল্পদিন পরেই ধ্রুবনাথ বাবুর চিঠি এসে পৌঁছল জুলেখার হাতে। সুরের গুরু ডাক দিয়েছেন সুরশিল্পীকে। কিন্তু মন্মথর জীবন সঙ্গীত তখন বিশ্বের মহাসঙ্গীতের সঙ্গে চিরদিনের জন্যে গেছে মিশে।

চমক

মানুষের দাম কত ?

কালিদাস, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইনের মতো মানুষের মূল্য কি আমরা নির্ধারণ করতে পারি ? জগৎকে তাঁরা যা দিয়েছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠধনী তার সমস্ত সম্পদ দিয়েও তা শোধ করতে পারেন না।

তবে যদি নেহাৎই পদার্থ-বিজ্ঞানীর চোখ নিয়ে একজন মানুষকে দেখা যায় ? তাহলে কিন্তু গান্ধীজী কিংবা ইকবালেরও তেমন মূল্য আছে মনে হবে না। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে যে-সব পদার্থ আছে তার দাম মাত্র ক'য়েক টাকা। সেই বিচারে প্রতিভাবান আর মূর্খ—দু'য়েরই মূল্য সমান। এমন কি মূর্খের দৈহিক মূল্য বেশিও হতে পারে।

একজন বিজ্ঞানী মানুষের দেহের নানা জিনিসের একটা হিসেব দিয়েছেন। তাঁর হিসেব অনুযায়ী একজন মানুষের দেহে যে পরিমাণ চুন আছে তা দিয়ে একটা মুরগির ঘর রং করা চলে। যে ম্যাগনেসিয়ম আছে তা দিয়ে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বেলে দু' তিনবার ফোটো তোলা যায়। আছে দশ গ্যালন জল, এক প্যাকেট টেবলেট বানাবার মতো গন্ধক, একটা পেরেক বানাবার মতো লোহা, এক ডোজন নিশাদল, খান সাতেক বড় সাবান বানানো যায় এমন চর্বি, এক বেলা রান্নার কাজ চালাবার মতো নুন, তিন ডজন দেশলাই বাক্সের কাঠির ডগায় লাগানো যেতে পারে এমন ফসফরাস, আর একটা ছোটখাট টি-পার্টি-দেবার মতো চিনি।

গাছের লুকানো অংশ

পুরো গাছ কি আমরা দেখতে পাই ? মোটেই না। গাছের যতখানি মাটির উপরে, ঠিক ততখানি মাটির ভেতরে। তার অসংখ্য শিকড় এদিকে ওদিকে, সবদিকে বেরিয়েছে জলের সন্ধানে। উপরে ডালপালা যে পরিমাণ জায়গা জুড়ে আছে, মাটির ভেতরে শিকড়ও দখল ক'রে আছে ঠিক ততখানি এলাকা।

শেক্‌স্‌পীয়র কিম্বদন্তী

সৌরেন্দ্রনাথ বসু

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার লাগামছেঁড়া উৎসাহকে পরিহাস করে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—কয়েক শ' বছর পরে হয়ত কোন পণ্ডিত প্রমাণ ক'রবেন রবীন্দ্রনাথ মুঘলের লোক ছিলেন,—কিংবা ও নামে কেউ ছিলেনই না। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র রচনাকারকে আঠার শতকের কবি প্রমাণ ক'রে এক পণ্ডিত জার্মানির কোন এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানও পেয়েছেন।

পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা অতি সরল এক কর্মযজ্ঞ। কত তাতে কল্পনার প্রলেপ, কত কিম্বদন্তীর ছড়াছড়ি। রবীন্দ্রনাথ এখনও চোখের আড়ালে সরে যান নি। কিন্তু শেকসপীয়র চার শ' বছরের পুরানো ইতিহাস। তাঁকে নিয়ে জল্পনা আর কিম্বদন্তীর তাই শেষ নেই। সেই কিম্বদন্তীর সুরু নামটি থেকে। শেকসপীয়র নামের বানানটি কেমন হবে? প্রচলিত বানান Shakespeare। নথিপত্র ঘেঁটে আরও কয়েকটি বানান হাজির করা হয়েছে—Shaksper, Shakspur, Shakspeyer, Shaxberd-এমনি অগণিত শব্দের রকমফের।

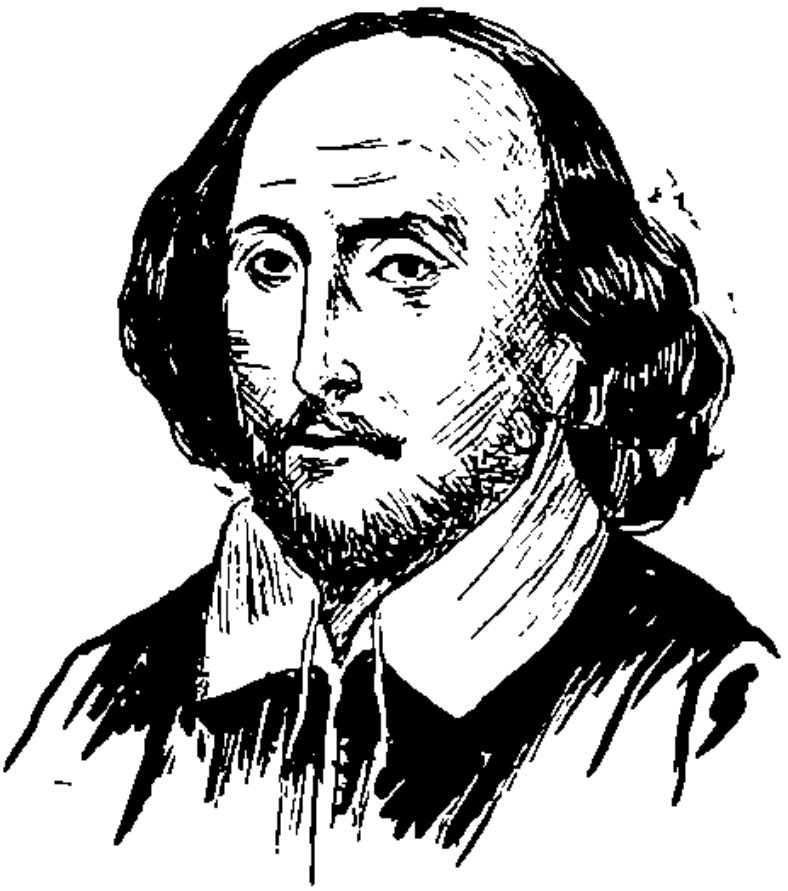

নামটি যেমনই হোক লোকটি জন্মেছিলেন চারশ' বছর আগে ১৫৬৪ সালের ২৩শে এপ্রিল। এখানেও তর্ক শেষ হবার নয়। স্ট্রাটফোর্ড চার্চে ২৬শে এপ্রিলে তাঁর নামকরণ হয়। কিন্তু ২৩শে এপ্রিল তারিখেই যে তিনি জন্মেছিলেন এমন কথা হলপ ক'রে বলা যায় না। ৫২ বছর পরে ২৩শে এপ্রিল তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। কিম্বদন্তী জন্মদিন ও মৃত্যুদিন মোটে একাকার ক'রে দিয়েছে।

কিছু নথিপত্র ঘেঁটে, কিছু কল্পনা ক'রে অনেক তর্কে ও পাণ্ডিত্যে শেকসপীয়রের জীবনের গল্প সৃষ্টি হ'য়েছে। কোন একটি বিষয়ও সংশয়ের অতীত নয়। ছেলেবেলায় কতদূর লেখাপড়া করেছিলেন, কখন নিজের দেশ ছেড়ে লণ্ডনে এলেন, কেন এলেন সবই কিম্বদন্তীর অংশ। তরুণ বয়সে চার্লকোটে

জমিদার টমাস লুসির হরিণ চুরি ক'রে লণ্ডনে পালিয়েছিলেন এ-রকম একটা গল্প লোকের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে। কেউ কেউ একথা মানেন না। তারা বলেন অমন ছোট কাজ কি তিনি ক'রতে পারেন! গল্প প্রচলিত আছে টমাস লুসির কাছে শাস্তি পেয়ে ক্ষুব্ধ হ'য়ে যে ব্যঙ্গ কবিতাটি তিনি রচনা করেন সেটিই মহাকবির প্রথম কাব্য প্রয়াস। সে কবিতাটিও আবিষ্কৃত হ'য়েছে। স্ট্রাটফোর্ড অঞ্চলের এক বৃদ্ধ, নাম তার টমাস ফোল্স। এই কবিতাটি নব্বুই বছরেরও বেশী বয়সে স্মৃতি থেকে শুনিয়েছেন। কারও কারও ধারণা বিবাহিত জীবনের অশান্তি তাঁকে দেশছাড়া করেছিল। তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাঁর চেয়ে আট বছরের বড়। তরুণ স্বামীটিকে তিনি প্রয়োজনবোধে মারধরও ক'রতেন। কেউ কেউ বলেন লণ্ডন যাবার আগে তিনি কিছুদিন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। জনশ্রুতিতে নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। জনশ্রুতি আরও বলে, তিনি তাঁর বাবার দোকানে কসাই-এর কাজও ক'রতেন। কেউ কেউ কল্পনা ক'রেছেন প্রাণীহত্যার নৃশংস কাজটিকে তিনি কাব্যময় ক'রে তুলতেন দীর্ঘ কাব্য প্রশস্তি রচনা করে। সবই কল্পনা—সবল কিছু লোকমুখে শোনা গল্প, ক্ষীণ কয়েকটি ঐতিহাসিক সূত্র।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত শেকসপীয়র লণ্ডনে এলেন এবং রঙ্গমঞ্চে স্থান ক'রেও নিলেন। লণ্ডনে কি পায়ে হেঁটে এসেছিলেন? নাকি-একশ' কুড়ি মাইল পথ ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন? অক্সফোর্ডের পথে এসেছিলেন কি? ঘোড়ায় চড়ে এসে সেই ঘোড়াটা কি বিখ্যাত অভিনেতা রিচার্ড বারবেজের বাবা জেমস্ বারবেজকে বিক্রয় করেছিলেন? জেমস্ বারবেজের অশ্ব ও রঙ্গমঞ্চ উভয়েরই ব্যবসা ছিল। তারই সহায়তায় প্রাথমিক জীবিকা হিসাবে রঙ্গমঞ্চ-রসিক ভদ্রব্যক্তিদের ঘোড়া রেখে জীবন সুরু করেন তিনি, এই রকমই প্রচলিত ধারণা।

আসলে শেকসপীয়রের কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ তর্কাতীতভাবে পাওয়া যায়নি। তাই অদ্ভুত সব গল্প কাহিনী ঘিরে তাঁর জীবনের ইতিহাস সৃষ্টি হ'য়েছে। এমন কি লোকটি দেখতে কেমন ছিলেন তাও সঠিক বুঝবার উপায় নেই, যে দু'টি নির্ভরযোগ্য ছবি পাওয়া যায় দু'টিই তার মৃত্যুর পর তৈরী হ'য়েছে। তাঁর সমাধিক্ষেত্রে যে মূর্তিটি স্থাপিত হয়, তার স্রষ্টা কে জানা যায় না। আর একটি হেমিঞ্জ ও কণ্ডেলের উৎসাহে প্রকাশিত শেকসপীয়রের প্রথম ফোলিও এডিশনের রচনাবলীতে ড্রোসাউটের আঁকা খোদাই-এর মূর্তি। ড্রোসাউটের সৃষ্টির উৎস জানা যায় না। তবে এটি সমসাময়িক কালে প্রশংসা আদায় ক'রেছিল। বেন জনসনও নাকি জীবিত শেকসপীয়রের সঙ্গে এর সাদৃশ্যের তারিফ করেছিলেন।

ঘোটকথা শেকসপীয়র অতিসরস এক কিম্বদন্তী—তা' সে যেমন তার জীবনীতে, তেমনই তাঁর সৃষ্টিতে। ভক্ত পণ্ডিতের দল শেকসপীয়রের বিশুদ্ধকরণের কাজে লেগেছেন অনেকদিন থেকে। যেহেতু শেকসপীয়রের সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় নাটক লেখা হ'ত তাঁর নিজের নাটকেও সে রকম সহযোগিতা স্বাভাবিক। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য, কাব্যসৃষ্টির কলা কৌশল, ছন্দ—এসবের দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা ক'রে দুঃসাধ্য সব সিদ্ধান্ত ক'রেছেন তারা। 'পেরিক্লিস' নাটকে চ্যাপমানের কিংবা কোন এক জর্জ উইলকিনের হাত আছে নিশ্চয়। 'সিম্বেলিন', 'টেম্পেস্ট', 'হেনরি দি এইটথ্' এ রেচারের হাত আছেই। একদল পণ্ডিত রায় দিয়েছেন 'এ মিডসামার নাইটস ড্রিম' তাঁর প্রথম ও একমাত্র নাটক যেটি তিনি নিজে লিখেছেন। 'জুলিয়াস্ সিজারে' অন্ততঃ জন তিনেকের হাত আছে। আর একদল তাঁর নাটকের প্রথম প্রকাশের কলা কৌশল আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত ক'রেছেন যে চৌদ্দটি মিলনান্ত নাটকের মধ্যে মাত্র চারখানি তাঁর নিজের সৃষ্টি। কৌতুকের বিষয় একদল যেখানে 'এ মিডসামার

নাইটস ড্রিম' কে তাঁর একমাত্র নিজস্ব নাটক ব'লেছেন আর একদল সেখানেও অন্ততঃ জন ডিনেকের সহযোগিতা খুঁজে পেয়েছেন।

বিতর্কমূলকের উদ্ভাবনা নিতান্তই তর্কাতীত। খাঁটি শেক্সপীয়রকে পণ্ডিতেরা খুঁজে পেয়েছেন। ফলে হেমিঞ্জ ও কণ্ডেল শেক্সপীয়রের মৃত্যুর আটবছর পরে যে প্রথম ও প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী প্রকাশ ক'রেছিলেন সেগুলি বারংবার নানা আক্রমণের মুখে পড়েছে। সে আক্রমণের শেষ আজও হয় নি—হবেও না।

তর্ক যদি এখানেই শেষ হত, খুব বলবার ছিল না। কেবল নাটকগুলি নিয়ে নয়, নাট্যকারকে নিয়েও নানাভাবে টান পড়েছে। শেক্সপীয়র নামে সত্যিই কি কেউ ছিলেন? অনেকে অনেক রকম কল্পনা ক'রেছেন—বিচিত্র সব সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। সেই আঠার শতকে স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভনের উত্তরে কটন-অন-দি-হিথের রেক্টর অনুমান ক'রলেন শেক্সপীয়র নামে কেউ কখনও ছিলেন না। আসলে বেকনই শেক্সপীয়র। এরপর উনিশ শতকে মিস ডেলিয়া বেকন শোনালেন চমকপ্রদ উপন্যাস। তার প্রতিপাদ্য যেহেতু শেক্সপীয়রের বিদ্যাবুদ্ধি বিশেষ কিছুই ছিল না ও নাটকগুলি পণ্ডিত বেকনেরই লেখা হবে। মহিলা দীর্ঘদিন স্ট্রাটফোর্ডে কাটান, সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁজে বেড়ান। একদিন দেখা গেল শেক্সপীয়রের সমাধির কাছে তিনি পড়ে আছেন—দেহ প্রাণহীন, হিম শীতল।

বিশ শতকে শেক্সপীয়রের নাটকের দাবীদার আরো বেড়েছে। ১৯১৮ সালে টি. জে. গ্লাসি প্রচার ক'রলেন আর্ল অব অক্সফোর্ডই তাঁর নাটকের আসল স্রষ্টা। কেউ বা বললেন, আসলে নাটকগুলি মার্লোর রচনা। আটাশ বছর বয়সে মার্লো যে অসিযুদ্ধে মারা যান এটি মিথ্যা খবর। উনিই গোপনে ছদ্মবেশে নাটকগুলি লিখেছেন। ১৯৪৩ সালে এই সব দাবীদারদের হিসাব কষে দেখা গেল যে তারা সংখ্যায় অন্ততঃ সাতাশ জন। এদের মধ্যে রাণী এলিজাবেথ এবং কার্ডিনাল উলসিও আছেন। এমন কি 'রোজিক্রুসিয়ান' এবং 'জেসুইট' এই দুটি প্রতিষ্ঠানও এই নাটকগুলির দাবীদার। যাঁরা এই সব তত্ত্বের স্রষ্টা তাঁরা জ্ঞানী, পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান। নিতান্ত দু' এক জনই অর্থের প্রয়োজনে এই রকম তত্ত্ব প্রচার ক'রে থাকবেন। রসিক পাঠকের কাছে এ সব পণ্ডশ্রমের মূল্য আছে তা নয়, তবুও কৌতূহল তাদের কম নয়। শেক্সপীয়রের জন্মস্থান, জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব নয় এটা ঠিক—তবুও কিম্বদন্তী সৃষ্টিতে কিছু ঐতিহাসিক দলিল পত্রের ত' অভাব নেই। ওয়ারইকশায়ারের সবুজ বন আর অ্যাভন নদী যে তাঁর কাব্যের অনেকখানি জুড়ে ছিল এতে সন্দেহ নেই। ইংলণ্ডের গ্রাম ও গ্রাম্যজীবনকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। বিতর্কবাদীরা বলেন, তাই যদি হবে তবে রাজদরবারের ভাঙাগড়ার কাহিনী এমন জীবন্তভাবে তিনি জানলেন কি করে। তিনি নিশ্চয় দরবারের আমীর ওমরাহ কিছু ছিলেন। কেউ বা বলেন—তিনি নিশ্চয়ই সৈনিক ছিলেন, নইলে যুদ্ধের অমন বর্ণনা দিলেন কি করে। অন্যেরা বলেন, তিনি নিশ্চয় নাবিক ছিলেন নইলে সমুদ্র যাত্রার এমন নিখুঁত ছবি আঁকলেন কি করে। প্রতিভার যে নিজস্ব এক সৃষ্টি রহস্য থাকে এই সহজ কথাটি তারা বুঝতে চান না। নইলে খুঁতখুঁতে বাস্তিকগ্রস্ত, রবির বিশ্লেষণের পক্ষে অমন সুরসৃষ্টি সম্ভব হ'ত না। প্রতিভার কোন শারীরিক বা ভৌগোলিক বাঁধাধরা সীমা নেই।

স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভনের শেক্সপীয়রের প্রতিভায় অনেকেই সন্দিহান। কিন্তু কোন এক, কিংবা অনেক লেখককে তারা অবশ্য স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে সেই প্রতিভাধর লেখকটিকে তারা

শেকসপীয়র ও বেকনের সব রচনার স্রষ্টা বলে ধরতে চান। আবার এমন পণ্ডিতেরও অভাব নেই যারা কেবল নাটক নয়, 'প্যারাডাইস লষ্ট', 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস', 'রবিনসন ক্রুসো', 'গ্যালিভার্স ট্রাভেলস', 'সারটার রিসারটাস', 'ডন কুইকজোট' রচনার দায়ও তার উপর চাপিয়ে দেন। এমন কি বাইবেল সম্পাদনার ভারও তার উপর দিয়েছেন। বিচিত্র সব তথ্য, আশ্চর্য্য সব বয়ান। শেকসপীয়র মেমোরিয়াল লাইব্রেরীতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এমনি কত ধরণের টুকরো অংশ যে জমা আছে তার ইয়ত্তা নেই। হালে এক পণ্ডিত প্রমাণ ক'রেছেন যে স্ট্রাটফোর্ডের শেকসপীয়র নামীয় লোকটির জীবন এবং রচনা আলোচনা করে অন্ততঃ দুটি ভিন্ন চরিত্রের লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব, শেকসপীয়র সংখ্যায় একক নন।

শেকসপীয়রের নিজের দেশে তাঁর সম্বন্ধে জনশ্রুতি ও ইতিহাসের রকমারি তথ্য আবিষ্কৃত হ'য়েছে। তারা সময় সময়ে আসর মাৎ করেছে নিশ্চয়, কিন্তু তাঁর নিজের দেশের বাইরে তাঁর সম্বন্ধে যে সব তথ্য পেশ করা হয়েছে তা বিস্ময়কর।

আমাদের দেশও পিছিয়ে নেই। ১৯১৮ সালে ভারতীয় এক শিক্ষাবিদ চমকপ্রদ একটি খবর দিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতীয় এক অধ্যাপক শেকসপীয়রকে ভারতীয় বলে দাবী ক'রেছেন। তার নাম ছিল নাকি "শেসেপ্পা আয়ার"। তিনি করাচীতে চলে আসেন। নতুন নাম নেন "শেখপীর"। সেখান থেকে ইংলণ্ডে পাড়ি দিয়ে তিনি "শেকসপীয়র" নাম নেন। নিউজিল্যাণ্ডের 'ক্রাইষ্ট চার্চ স্টেমান' পত্রিকায় খবরটি "বোম্বাইএর কবি" নামে ফলাও ক'রে প্রকাশিত হয়।

১৯৬২ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত খেতাববারী ডঃ লাকা-আল-খুলুশি জানান যে, শেকসপীয়র আরব দেশীয়। তাঁর বিশাল দুটি চোখ, ঘন ভ্রু, পূর্ণ মুখের গড়ন, আরবী নাক, উন্নত ললাট, আর ছোট ছোট কর্ণ যুগল—এ সব অনিবার্য্য ভাবে প্রমাণ করে তিনি আরব দেশীয়। এমনও বলা হয়েছে যে, তিনি আরবের নাবিক ছিলেন—নাম ছিল "শেখ জুবেয়ার"। কাইরোর শ্রীমতি খাদিজা কড এই তথ্যে বিশ্বাস করেন। তবে নামটিতে একটু ভুল দেখিয়েছেন তিনি। তার মতে নামটি হবে "শেখ বীয়ার"। ১৯৬২ সালে লেবাননবাসী এক আমেরিকান টেলিভিশান পরিবেশক "শেখ এসপীর" তত্ত্বে নতুন বয়ান দিয়েছেন।

রুশ দেশীয়েরাও কম যান না। গত নভেম্বর মাসে "সাইপ্রাস মেল" পত্রিকায় এক অপরূপ সংবাদ পরিবেশিত হ'য়েছে। সম্প্রতি রাশিয়ায় নাকি শেকসপীয়রের নতুন পরিচয় আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর নাম ছিল "ভ্লাদিমির শিকোলপুরভ"। ইসলাম তাতার দেশে অনেক ঘুরেছেন তিনি; অনেক ইসলাম কাহিনী রুশ ভাষায় অনুবাদ ক'রেছেন। দেশে বিদেশে ভ্রমণ শেষ ক'রে তিনি পারস্য উপসাগরে এসে পৌছান। সেখান থেকে আফ্রিকা হ'য়ে দেশে ফিরবেন স্থির করেন। কিন্তু পথে তাঁর জাহাজ ডুবে যায়। কোনমতে রক্ষা পেয়ে তিনি ইটালীতে আসেন—সেখান থেকে ইংলণ্ডে। সে সময়ে স্প্যানিশ আর্মাডা ধ্বংস হ'য়েছে। এদেশে এসে উইলিয়াম শেকসপীয়র নাম নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটান। মৃত্যুর কিছু কাল আগে লণ্ডনে আগত এক রুশ দেশীয় জাহাজের নাবিকের হাতে নয় শত পৃষ্ঠার এক দিনপঞ্জী সমর্পন করেন। প্রবাসী দেশপ্রেমিক তাঁর আত্মীয়স্বজনদের হাতে এই দিনপঞ্জীটি পৌছে দিতে অনুরোধ করেন নাবিককে।

শেকসপীয়রের নিজের দেশও হটবার নয়। কেনেথ বাউও নামে এক ইংরেজ শিক্ষক নতুন এক

তত্ত্ব উপস্থিত ক'রেছেন। তার মতে শেকসপীয়র ছিলেন বেকন ও অনসন দুই-ই। তাঁর উইলের নাম সই উলটে দেখলে নাকি উইলিয়ামের মধ্যে বেকন এবং শেকসপীয়রের মধ্যে অনসনকে আবিষ্কার করা যায়। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসের "ওয়েষ্টার্ণ মর্ণিং নিউজ' পত্রিকায় খবরটি বেরিয়েছে। কেনেথ রাউতের বক্তব্য বিষয়টি কৌতুকপ্রদ। বেকন ও অনসন উভয়েই শেকসপীয়রের ছদ্মনামে লিখতেন। উইলিয়াম শেকসপীয়র এবং তাঁর অমল ভাই এডমাণ্ড উইলিয়ামকেই লেখক হিসাবে খাড়া করি দেবার জন্যে তাদের উপর অত্যাচার করতে থাকেন। বেকন ও অনসন স্বীয় রচনার সত্যতা প্রমাণের অনেক চেষ্টা করেন এবং পরিশেষে উইলিয়ামের দ্বিপঞ্চাশত্তম জন্মদিনে তাঁকে গলা টিপে হত্যা করেন।

নামেতে কি এসে যায়। নাম ত' নামমাত্র। মহাকবি লিখেছেন, গোলাপকে যে নামেই ডাকা যাক তার সুগন্ধ একই রকম থাকে। মহাকবির জানা ছিল না নামেতে অনেক কিছু এসে যায়। তাঁর নামের বানান থেকে সুরু ক'রে তাঁর জন্ম, দেশ, কাল, রচনা সব কিছুতেই কি বিপত্তির সৃষ্টি হ'তে পারে তিনি তা ভাবতেও পারেন নি। তাঁর রচনা অবশ্যই রইল। কিন্তু তাও ত' অক্ষত নয়। পণ্ডিতের পণ্ডশ্রমে আর অলসের কল্পনাবিলাসে মহাকবির শেষ পরিণতি কি হবে মহাকালই তা জানে।

এক সুরসিক ইংরেজ লেখক বলেছেন—অনেক ত' হ'ল। এখনও ত' তাঁকে নিয়ে আবিষ্কারের সম্ভাবনা শেষ হবার নয়। "মিডসামার নাইটস ড্রিম" এর সেই দুটি চরণ—

"I will put a girdle round about the earth
In forty minutes"—ত' রইল।

মহাশূন্যে বস্তুর ভ্রমণের দিন আগতপ্রায়। এ থেকে কেউ হয়ত কোনদিন আবিষ্কার করবেন মহাকবি চল্লিশ মিনিটে মহাশূন্যে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে এ চরণ কটি লিখে থাকবেন। দিন ত' ফুরিয়ে যাবে না, উর্বর কল্পনায় মহাকবিকে হটিয়ে দেবার লোকের ও অভাব হবে না।

• • • •

হেলেন কেলারকে একবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করেন—আচ্ছা আপনি অন্ধ হয়ে নিজে কি কোন রকম কষ্ট অনুভব করেন না?

—কিছুমাত্র না,—উত্তর দিলেন এই মহীয়সী।

—কেন বলুন ত?

—কারণ আমার যে সব অন্ধ ব্যক্তি পৃথিবীতে আছে, তাঁদের কথা ভেবে আমার এতটা সময় যায়, যে নিজের কথা ভাববার আর সময় থাকে না।

এই প্রথম

অবিশ্বাস্য

প্রফুল্ল বসু

সেদিন আর তাস খেলা হোল না। ভূপেনবাবু একাই বসেছিলেন বাড়ীতে, আমাকে ডেকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন···তারপর এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বললেন, ওরা খবর পাঠিয়েছে আজ খেলতে পারবে না—কাজ আছে। তাসই হোল আসুন গল্প করা যাক।

তাসই হোল। এমন সুযোগ সহজে মেলে না। চাল, ডাল ও তেলের প্রসঙ্গ ছেড়ে ভূপেনবাবু নিজের ফেলে আসা জীবনে ফিরে গেলেন। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, এককালে পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট জমিজমাও ছিল আর বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম বলে নাম ডাকও ছিল। বর্তমানে সওদাগরী অফিসে কেরাণী।

আমার বয়স তখন বছর আটেক, বরিশালের গ্রামের স্কুলে পড়ি। বাড়ী থেকেপ্রায় দু'ক্রোশ দূরে স্কুল, বাবা ছেলেবেলায় মারা গেছেন। আর জানেন তো ওখানে হয় হাঁটাপথ অথবা জলপথ, ভূপেনবাবু বলে চললেন, সেদিনও স্কুলে গেছি শনিবার। ছুটি হবার পর সবে বাড়ীর পথে পা দিয়েছি এমন সময় এক বন্ধু বলল, এই চলনা আমাদের গ্রামে·····কালীপূজা উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে নামকরা যাত্রাদল আসবে, ভয় কি কালতো স্কুল ছুটি। তুই কাকুকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দে, এমন সুযোগ আর পাবি না। ভূপেনবাবু একটু থামলেন তারপর চা'র কাপ সরিয়ে দিয়ে আবার বললেন, আমিও হঠাৎ রাজী হয়ে গেলুম। আমাদের গ্রামের একজনকে দিয়ে মাকে খবর পাঠিয়ে দিলুম····· জানেন প্রফুল্লবাবু সেই প্রথম মার কাছ থেকে দূরে যেতে রাজী হলুম।

আমি গায়ের কাপড়টাকে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে চেয়ারে পা তুলে বসলুম। আজ ঠাণ্ডাটা যেন—একটু বেশীই মনে হচ্ছে তার ওপর পৌষালী হাওয়া।

যা হোক সেই বন্ধুর সঙ্গে সোজা ষ্টীমারে করে ওদের গ্রামে গিয়ে হাজির···তাড়ার পয়সা আমার কাছে ছিল; মা কি যেন একটা জিনিষ সেদিন স্কুল ফেরত কিনতে বলেছিলেন। সন্ধ্যার সময় জমিদার বাড়ীতে গিয়ে দেখলুম খুব জাঁকজমক ভাবে আটচালা সাজান হয়েছে, ছাজাক জ্বলছে অনেকগুলো। আলোয় জায়গাটা প্রায় দিন হয়ে গেছে···লোকজনও প্রচুর এসে জমেছে এবং আশপাশের গ্রাম থেকে আরও লোক তখনও আসছে···অল্পক্ষণেই জনসমুদ্রে পরিণত হোল স্থানটা। আমিও তার মাঝে কোন রকমে সামনের দিকে এগিয়ে গেলুম···মনে আনন্দ কোলকাতার বিখ্যাত যাত্রাদলের অভিনয় প্রথম দেখব···আর সে যা-তা যাত্রাদল নয় জমিদার স্বয়ং তাদের গান শুনে তবে বায়না করেছেন। সেকি উল্লাস···বন্ধু আমায় বসিয়ে দিয়ে তার বাড়ী গেল···যাবার সময় বলল, তুই বস আমি মাকে সঙ্গে নিয়ে আসি।

কি যাত্রা ছিল? আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

নামটা ঠিক মনে নেই। বোধহয় "নদীয়া বিলাস" কি ঐ ধরণের একটা কিছু। আরে মশাই বসে আছি তো বসে আছি।

সকলেই চুপচাপ। এদিকে রাত বাড়তে বাড়তে এগারটা, এমন সময় জমিদার স্বয়ং এসে জানালেন, দেখুন এই মাত্র আমি খবর পেলুম সীমার মাঝ রাস্তায় খারাপ হয়ে গেছে, সেজন্য কোলকাতার যাত্রার দল আজ আসতে পারবে না। আপনারা বাড়ী ফিরে যান, কাল সন্ধ্যায় আবার আসবেন। কথাটা শুনে আমিতো চমকে উঠলুম···ভীড়ের ঠেলায় কোন রকমে রাস্তায় নামলুম। আর অত রাতে বন্ধুর বাড়ীও খুঁজে পেলুম না। সোজা ঘাটের দিকে এলুম।

নাম জিজ্ঞাসা করে বন্ধুর বাড়ী খুঁজলেন না কেন? আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম।

প্রথমতঃ বন্ধুর বাড়ী অন্যগ্রামে যদিও কাছাকাছি, দ্বিতীয়তঃ বন্ধুর নাম জানতুম ওর বাবার নামতো জানতুম না। তার ওপর সে আমার এক শ্রেণী উঁচুতে পড়ত সুতরাং ঘনিষ্ঠতা বেশী ছিল না। তারপর জানেন, ভূপেনবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলতে লাগলেন, ঘাটে এসে খানিকটা বসলুম···তবে তখন আমার শরীর কাঁপছে। দু'চারজন লোক রয়েছে কিন্তু আমার বয়সী একজনও নেই।

···আমি একা···যদি···তখন খালি মার কথা মনে হচ্ছে। ভয়ে ক্ষিধে-তেষ্টা সব লোপ হয়ে গেছে···মনে হচ্ছে মা হয়ত সারারাত জেগে কাটাবেন। বাবা মারা যাবার পর মা আমার কাছ ছাড়া শুতেন না। যা হোক অনেকের সঙ্গে নৌকায় চড়ে বসলুম আড়া বোধহয় এক পয়সা নিয়েছিল। একে বড় নৌকা গঙ্গার স্রোতের টানের বিরুদ্ধে যেতে হবে···বুঝতেই পারছেন, বলে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন ভূপেনবাবু। যা হোক রাত প্রায় একটা নাগাদ আমাদের গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগল। উঃ তখনকার অবস্থা আপনাকে ব'লব কি···হাফ প্যান্ট, গায়ে ফতুয়া তার ওপর একটা চাদর···পায়ে জুতোও নেই। নদীর তীরে নেমে আমি হাঁপাচ্ছি। সমস্ত শরীর আমার কাঁপছে··এই দেখুন সেই ঘটনা মনে হলে আমার লোমকূপগুলো আজও খাড়া হয়ে ওঠে।

এগিয়ে এলেন ভূপেনবাবু, আমিও দেখলুম সত্যিই লোমগুলো খাড়া হয়ে রয়েছে····· তারপর—বলে আমি সিগারেটে শেষটান দিয়ে এ্যাস্ট্রেতে ফেলে ওনার মুখের দিকে তাকালাম।

আমি তখন ঘামছি। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। অন্ধকার মাঠের আলের ওপর দিয়ে গেলে বাড়ী পৌঁছতে সময় একটু কম লাগবে। কিন্তু জীবনহানির সম্ভাবনা আছে, সাপতো আছেই তা ছাড়া শেয়াল কুকুরও তাড়া করতে পারে। এমন সময় দেখলুম আমার সামনে দিয়ে জন চারেক লোক একটা হ্যারিকেন নিয়ে রাস্তা দিয়ে আমার গ্রামের দিকেই যাচ্ছে। কথা শুনে মনে হোল তারাও যাত্রা শুনতে গিয়েছিল, ফিরে আসছে। আর সেখানে অন্যকোন যানবাহন নেই বা আসাও সম্ভব নয়। একটি মাত্র রাস্তা খানিকটা গেলে তবে নমশুদ্র গ্রাম, তারপর মুসলমান পাড়া···সবশেষে আমাদের গ্রাম! আমি আর দেরী না করে ওদের পেছন পেছন হাঁটতে আরম্ভ করলুম।

ওরা আপনাকে কি বলল? আমি ভূপেনবাবুর মুখের দিকে চোখ তুললুম।

ওরা নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তায় এত ব্যস্ত যে আমার দিকে তাকালও না। আমি তবুও,

পেছনে দেখলুম আর কেউ আলো নিয়ে আমাদের পথে আসছে কিনা···না তাও না। খানিকটা এসে ওরা সকলেই নমশুদ্র পাড়ায় চলে গেল, আর আমায় যেতে হবে উত্তর দিকে···চেয়ে দেখলুম হ্যারিকেনের আলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলুম · ঠিক সামনেই একটা উঁচু পোল · পাটের সময় বড় বড় নৌকা যায় বলে পোলটাই উঁচু করে করা হয়েছে। ঐ দিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। আশেপাশে কাছাকাছি কোন বাড়ীও নেই · খাঁ খাঁ করছে মাঠ · পোল পেরুলে তবে মুসলমান পাড়া···তারপর···কোথা থেকে কারুর আসারও সম্ভাবনা নেই, আসতে গেলে আমার পাশ দিয়ে যেতেই হবে ··কারণ পথ একটাই···রাত দুপুর···অল্প হাওয়ায় গাছের পাতা গুলো ধীরে ধীরে নড়ছে···সে যে কি অবস্থা আপনাকে বোঝাতে পারব না।

তারপর···আমি চাদর খুলে আবার জড়ালুম, ইতিমধ্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে।

চারদিকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। মাঝে মাঝে জোনাকি···আকাশে কৃষ্ণপক্ষের তারা···হঠাৎ আমি দেখতে পেলুম পোলের ওপর সাদা চাদর গায়ে, কাপড় পরা একজন লোক আমাদের গ্রামের দিকেই যাচ্ছে···আর চিন্তা করতে পারলুম না ···গলার স্বরও তখন বন্ধ হয়ে আসছে তাই ডাকাডাকি না করেই এক দৌড়ে একেবারে তার কাছে···আরে এ যে জমিদার বসুরায়দের বাড়ীর গোমস্তা। আমরা দাদামশাই বলে ডাকি···আমি কাঁদ কাঁদ স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, দাদামশাই আপনি এতরাতে কোথাথেকে···দাদা-মশাই উত্তর দিলেন, খাজনা আদায় করে ফিরছি। দাদামশাই মাঝে মাঝে অবশ্য রাতে ফিরতেন কিন্তু তা বলে অতরাতে ফিরতেন বলে শুনিনি। আমার তখন সাহস বেড়ে গেল, দাদামশাইয়ের পাশে পাশে চলতে লাগলুম। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, এত রাতে তুই কোথায় গিয়েছিলি···বললুম কোথায় গিয়েছিলুম। তখন ভয় আমার কেটে গেছে হাঁটতে হাঁটতে মুসলমানপাড়া পার হয়ে গেলুম। দাদামশাই আরও বললেন, ভয় নেইরে আমি যখন সঙ্গে আছি অন্ধকারেও কেউ তোকে ছুঁতে পারবে না। তোকে আমি বাড়ী পৌঁছে তবে নিজের ঘরে যাব। আরও দু' একটা কথাবার্ত্তা হোল তারপর দীঘির ধারে উঠে থামলেন,—কি বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হবে···না-বলে আমি তখন দৌড়ে বাড়ী ফিরে দেখি মা তখনও জেগে আছেন খাওয়া দাওয়াতো দূরের কথা শুধু আমার কথা ভাবছিলেন। এবার থামলেন ভূপেনবাবু আর আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

আপনার দাদামশাই ঐখানে এলেন কোথা থেকে? আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, আপনিতো আগেই বললেন ঐ পথে আসবার অন্য কোন রাস্তা নেই আপনাকে অতিক্রম করা ছাড়া।

সেইটেইতো আপনাকে বলছি। অন্য কোন পথেও সেই পোলের ওপর কারুর আসা সম্ভব নয়, যদিও বা কেউ আসে তাকে আমায় পেরিয়ে আসতে হবে। ভূপেনবাবু বলে চললেন, পরের দিন সকালে উঠেই দাদামশাইয়ের বাড়ী গেলুম · কিন্তু আশ্চর্য্য হলুম যখন শুনলুম দাদামশাই কাল রাতে বাড়ী আসেননি···আমি যখন জোর দিয়ে বললুম, আমি দাদামশাইয়ের সঙ্গে পোলের ওপর থেকে রাত প্রায় দুটোর সময় একসঙ্গে ফিরেছি···এমনকি তিনি আমায় দীঘির পাড় পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, তবুও আমার ওদের বাড়ীর কেউ বিশ্বাস করল না। অথচ যে লোকটার সঙ্গে আমি বাড়ী ফিরেছিলুম তিনি দাদামশাই ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। অবশ্য অন্ধকারে আমি মুখটা দেখতে পাইনি একথা সত্যি, তবু

তিনি যে আমার দাদামশাই একথা ধ্রুব সত্য। আর তা ছাড়া ছেলেবেলায় আমার বাবা মারা যাবার পর দাদামশাই আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

আমি উঠে দাঁড়ালুম। এরপর কি হবে আমি জানি।—পরে খবর পেলেন আপনার দাদামশাই সে রাতে মারা গেছেন···ভূপেনবাবু এ ধরণের অনেক ঘটনা আমি শুনেছি।

তা নয়। তাহলে আপনার মত লেখককে এ ঘটনা বলতুম না। দিনদুই পরে দাদামশাই গ্রামে এলেন। খবর পেয়েই আমি দৌড়ে গেলুম···কিন্তু সমস্ত ঘটনা শুনে তিনিও স্তম্ভিত···বললেন, ঐ দিনতো আমি সত্যিই আসিনি। তাহলে তুমিই ভুল করেছ অথবা আমার মত অন্য কেউ ··ফিরে এলুম দাদামশায়ের বাড়ী থেকে কিন্তু বিশ্বাস করুণ প্রফুল্লবাবু তিনি যদি অন্য কেউ হন, তবে দাদামশাইয়ের রূপ ধরে আসবেন কেন? কিন্তু আমার স্পষ্ট ধারণা তিনি দাদামশাই-ই। দাদামশাই সে ঘটনার পর আরও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন···তাহলে তিনি যে কে, আজও আমি এপ্রশ্নেরজবাব পাইনি কিন্তু তিনি যেই হোন তার সাহায্য ছাড়াতো আমি সেদিন নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারতুম না ··তবে কি ভূত···না অন্য কেউ!

উত্তর দিতে পারিনি। বাড়ী ফিরেও ভূপেনবাবুর কথা ভুলিনি কিন্তু সেই থেকে আজিও ভাবছি ···তিনি কে?

• • •

এমিল জোলার কাছে একদিন এক তরুণী এসে প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা আপনিই বলুন সত্যিকারের প্রেম কি?

জোলা বললেন,—যে প্রেম মিথ্যে নয়, সেটাই সত্যিকারের প্রেম।

—অর্থাৎ?—বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলেন তরুণী।

—যে প্রেম জীবনের কোন কাজে লাগে সেটার কথাই বলছি।

—কি কাজে লাগে? তরুণী বললেন।

—অর্থাৎ যে প্রেম হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় না, চারিদিক বজায় রেখে সংসারের ভিৎ পত্তন করে।

—সেটা আসবে কোথা থেকে তরুণী বললে।

—বিবাহের মধ্য দিয়ে,—গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন জোলা।

যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সঞ্জীব কুমার বসু

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। বৃটিশ শাসনে দেশ একদিকে যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা হারায়, অন্যদিকে তেমনি তার পুরোনো শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনও যায় আমূল বদলে। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে নূতন সামাজিক ও নৈতিক জীবনে দেশকে আত্মবিকাশের নেতৃত্ব দেন রামমোহন রায় আর সাহিত্য ক্ষেত্রে নেতারূপে দেখা দেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বাংলা সাহিত্যের যে প্রাচীন ধারা ১০ম শতাব্দী থেকে চলে এসেছে ভারতচন্দ্রই তার শেষ। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে সুরু হল নূতন ধারা। দেব মাহাত্ম্য অনুপ্রাণিত বাঙলা সাহিত্যে তিনি প্রথম আনলেন দেশ মাহাত্ম্য। আদিরস প্রধান সাহিত্যে রুচি সম্মত হাস্যরসের প্রবর্তনও তাঁর কৃতিত্ব। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তিনি একদিকে যেমন ছিলেন সাহিত্য স্রষ্টা অন্যদিকে তেমনি ছিলেন ভাবী সাহিত্যের সংগঠকও। তাঁর প্রভাকরে বাল্যে হাত মক্স করেছিলেন যাঁরা তাঁদের একজন হলেন দীনবন্ধু মিত্র, আর একজন হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঈশ্বর গুপ্ত যে প্রতিভা চিনতেন তাঁর এর চেয়ে বড় প্রমান আর কি হতে পারে! এছাড়া ঈশ্বর গুপ্ত আর একটি বড় কাজ করেছিলেন তাঁর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের রচনা ও জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে তিনি প্রভাকরে প্রকাশ করেছিলেন, যার ফলে তা বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু কালধর্ম্মে মানুষ ঈশ্বর গুপ্তকে ভুলতে বসেছে এবং তাঁর জীবন ও রচনা আজ গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাসাহিত্যের পুনর্বিচার শুরু হয়েছে, কারণ বিশ্ব জুড়ে চলেছে সাহিত্য সঙ্কট। সেই সঙ্কট বাংলা সাহিত্যের উপরও প্রভূত পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যকে তৎকালীন সমালোচকেরা যে দৃষ্টিকোন দিয়ে বিচার করেছেন, বর্ত্তমান যুগের সমালোচকেরা এতে অবশ্যই অন্য রূপ দেখবেন। আমাদের পূর্ব্ববর্তীরা কি সম্পদ আমাদের সাহিত্যে রেখে গেছেন, সেই প্রশ্নই আজ জাতির সামনে এসে পড়েছে। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ধর্ম সমাজ এবং সংস্কার রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনে বাঙালীর জাতীয় অন্তরকে বিপ্লব আবেগে মন্থন করেছিল, সেই মন্থন কার্য্যে মূলতঃ সহায়তা করেছে জাতির সাহিত্য চেতনা। আজকের সাহিত্য বলতে

যা বোঝার তা আমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা বোঝে নি, অর্থাৎ জীবনের জটিল চক্র আশা আকাঙ্ক্ষা সব কিছুকেই সব ভাবকেই সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করতে দেয় নি! এমন একটা বিচার পদ্ধতির আশ্রয় তাঁরা নিয়েছিলেন যার ফলে বস্তুর একটি মাত্রাস্থা আপনা হ'তে প্রকাশ হ'য়ে পড়ত এই বস্তু সামাজিক ও এর গুণগত বিকাশ আধ্যাত্মিক। আমাদের যে কোন চিন্তা যে কোন সমাজ কর্ম এই দু'টি মৌলিক বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আমরা কোন কোন সময় একে সাহিত্যের মধ্যে, সৌন্দর্য সাধনার মধ্যে সজ্ঞানে গ্রহণ করে থাকি, কোন সময়ে আমাদের অচেতন মনে এরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই প্রভাব যে সাহিত্যের রূপনার দ্বারা সুসজ্জিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রামমোহন হ'তে বঙ্কিম—এই সুদীর্ঘ মানস চিন্তার রাজ্য শুধু মাত্র সামাজিক বস্তুর দ্বারা গঠিত হয় নি। বরং রামমোহন নিছক সামাজিক চেতনা জাগ্রত করার আগে অধ্যাত্ম চিন্তার সূত্র খুঁজে বের করেন। এই অধ্যাত্ম এমন সুদূর প্রসারী এমন গভীর প্রেরণা এনে দেয় যে এর প্রভাব হ'তে মুক্ত হবার চেষ্টামাত্রই অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকর বলে প্রমাণিত হয় এই প্রমান একবার প্রকট হয়েছিল ইংরাজী শিক্ষার আদি যুগে।

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে সমাজ যখন বিপথগামী ঠিক এমনই একটা যুগে আবির্ভূত হলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন তৎকালীন আর দশটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মত ছিল। তবে বর্তমান মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষা ও সেকালের মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষা অনেকটা সংস্কার ঐতিহ্যের প্রতি কুর্নিশ করতে করতে বর্ধিত হয়েছিল। তাই সমাজের সব মানুষই ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে মুক্তির স্বাদ পায় নি। এর মাঝে যে সংরক্ষণশীলতার ভাব ছিল তা জাতিকে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে সন্দেহ নেই। চিন্তার জগৎ, ভাবের জগতে উনবিংশ শতাব্দী যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাব সাধনা হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি। সম্ভবতঃ কবি ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদ সেনের কাব্য পড়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়ই অতীন্দ্রিয় সাধনার স্বাদ পেয়ে ছিলেন। কিন্তু পাত্র ভেদে এই দুই সাধনার রূপ ভিন্ন প্রকৃতির হয়েছে।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত কিন্তু সাধনার ধারা হতে কাব্যের রস গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে যে বস্তুকে নিছক বস্তু বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা সমাজ প্রবাহ পুষ্ট বস্তু। জীবনানুভূতির রহস্যময় স্তরে এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা সাধারণতঃ কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য সমালোচনায় সমাজ চেতনা এই দিকটা বেশি করে দেখে থাকি। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যেখানে সমাজ চেতনার কবি সেইখানেই ব্যঙ্গের ছন্দে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং নিজে সামাজিক জীবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সমাজের বিশেষ মনোভাবের উপর তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। এই ব্যঙ্গ আদালত না হয়ে বরং ক্ষেত্র বিশেষে হাস্যরসের সঞ্চার করেছে। এই হাস্যরসের অন্তরালে যে উদাসীনতাপূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার রয়েছে তা কবিকে অনেক পরিমাণে রস পরিবেশনে সহায়তা করেছে অন্যথায় এমন ভাষায় রসাত্মক কবিতা সৃষ্টি হত যা রসবিহীন নিছক তার বিদ্রূপে প্রকাশ পেত। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় সে বিদ্রূপের শাণিত ছবি ঝলমল করে উঠে নি, এমন নয়। কিন্তু মধু হাস্যরসের পরিবেশনই বেশী। বস্তুতঃ এ জীবনের একটা অঙ্গ সমাজ জীবনে এর মূল্য আছে বটে কিন্তু ব্যক্তির অন্তর জগতে এই জাতীয় রসিকতার স্থান সঙ্কীর্ণ। জীবন সেখানে সামাজিক ভাব সমূহের বিচিত্র আলোচনা সম্ভব হতে পারে কিন্তু ব্যক্তি সব সময় নিছক উক্তি নয়। তার অন্তরজগৎ বহুকালের সংস্কার দ্বারা সুগঠিত।

এই সংসারের জগতে মানবের মন যতই প্রবেশ করে ততই মানব মন আত্মচিন্তায় অনুসারী হয়ে থাকে। জীবনের স্বরূপকে সমাজের মুকুরে প্রতিফলিত করে তার প্রতিবিম্ব আমরা প্রতিনিয়তই দেখে থাকি। তা কতটা বাস্তব তার বিচার করতে হলে জীবনের তথাকথিত ভাব অ-ভাব মনস্তত্ত্বের স্তর হতে মুক্ত হয়ে নৈর্ব্যক্তিক সাধনায় নিমগ্ন হতে হবে। সেখানে আক্ষেপ নেই, পর সত্তার মিলিত হবার আহুতি রয়েছে, সেখানে অভিমান নেই, আত্মসন্ধানের আনন্দ রয়েছে। এই যে পরম জগৎ সত্তা, এতে মিলিত হবার আবেদন আপনা হতেই কার্যে একদিন ফুটে ওঠে তখন কবির জীবন যেন রূপান্তরিত হয়ে সত্যানুভূতি রসে আপ্লুত হয়। এই সত্যানুভূতির জমিতে মন অন্তরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম বলতে নিষ্কাম ধর্মের কথা বুঝতেন। যখন জানকে মনের আঁধারে স্থাপন করার স্পৃহা অন্তরে আসে তখন বুঝতে হবে, ধর্ম তথাকথিত লৌকিক আচার হতে ভিন্ন সত্তা লাভ করেছে এবং মানব মুক্তি সাধনার অন্যতম প্রতিভাত হয়েছে। অবশ্য এটা সত্য যে, নিছক তত্ত্ব চিন্তা কাব্য নয়। কাব্যের আঁধারে তত্ত্বের স্থান হতে পারে, কিন্তু আঁধার হতে তত্ত্ব প্রধান হয়ে পড়লে তার মূল্য কাব্য হিসেবে কিছুই থাকেই না। কাজেই কাব্যরস ও তত্ত্বরসে সব সময়ে সমন্বয় করে চলতে হবে। একে অন্যকে অতিক্রম করে চলতে পারবে না। কবি ঈশ্বর গুপ্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই "কালকন্যার সহিত বর্ষবরের বিবাহ" দিয়েছেন বটে কিন্তু কাব্যের সুষমা ভোলেন নি। বরং মহাকালের খণ্ড রূপকে সমাজ সমন্বিত এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করে বর্ষকে বরের ভূমিকায় সাজিয়ে নবরসের সূচনা করেছেন। সমগ্র কবিতাটি বিবাহাদি কার্যে স্ত্রী আচারজনিত ভাবধারা আবিষ্ট। অথচ মহাকালের গতি অনুভূতি কবির নিমজ্জিত আত্মচেতনা এতে রয়েছে। কবির স্বভাব সুলভ রসিকতাও তার কাব্যে স্থান পেয়েছে ও অনুভব করার মত রস আছে, আর আছে তত্ত্বমূলক রসানুভূতি। কবি ঈশ্বর গুপ্তের সমগ্র রচনার পরিচয় এত স্বল্প পরিসরের মধ্যে দেওয়া সম্ভব নয় তবু একটা সুর নির্ণয় করা সম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাস্রোতের মধ্যে যে দ্বন্দ্বর্ত হয়ে উঠেছে তা ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেইদিন হতে বিচার করলে দেখা যাবে যে অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গে সমাজ চিন্তার এক অপূর্ব সমন্বয় কবি ঈশ্বর গুপ্তে পরিলক্ষিত। আমাদের মনে হয় তিনি সমন্বয়ের কবি।

• • • •

বার্ণার্ডশ' যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন, তখন সেই সৌভাগ্যের কথা শুনেই তা' প্রত্যাখ্যান করলেন।

তার টাকা এবং সম্মান দুই-ই। বহু কষ্টে তাঁকে পুরস্কার নিতে রাজী করা হোল। তিনি টাকাটা নিয়েই একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে দান করে দিলেন। অথচ তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম বহু বছরের মধ্যে তিনি লিখে মাত্র ৬ পাউণ্ড রোজগার করে ছিলেন। তার মধ্যে ১ পাউণ্ড হোল ভোট সোনার কাজের জন্য।

॥ আরশি ॥

সমরেশ দাসগুপ্ত

দিনের মধ্যে কতবার যে ছবিটা দেখছে বাসন্তী। আর কতরকম ভঙ্গীতেই যে দেখছে। এত দেখেও যেন ওর চোখের তৃষ্ণা মিটছেনা। সুপ্রকাশ জানে এইভাবে এ্যালবাম আঁকড়ে পড়ে থাকাটা বাসন্তীর আজকের স্বভাব নয়। বিয়ের বছর দুয়েক পর থেকেই ছোট ছেলে মেয়েদের ছবি জোগাড় করার সেই বাতিক ওর আজও গেলনা। কোলকাতায় থাকতে সুপ্রকাশ কতদিন বলেছে—'দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে?' তখন চোখে মুখে একটা বেদনার ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। আজ ইন্দ্রলে বন্দী হয়ে এসেও যেন সেই ছাপ তেমনি গাঢ়ই আছে।

সুপ্রকাশ বলল—'আবার ডুবে রইলে এ্যালবামের ভেতর!' বাসন্তী কোন জবাব দিল না। ম্লান একটু হেসে একটি শিশুর ছবির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সুপ্রকাশ ভাবল, বাসন্তীর মনটা হয়তো এখন ভেতরে ভেতরে কেঁদে উঠছে। কিন্তু উপায় নেই। বাসন্তী জীবনে কোনদিনই মা হতে পারবেনা। কোনদিন না।

—'ফটো' কর্ণার আনতে আজ আবার ভুলে যেওনা যেন।'

—'নতুন কোনো অতিথিকে এ্যালবামে বন্দী করবে বুঝি?'

সুপ্রকাশের কথাটা বাসন্তীর বুঝি ভাল লাগল না তাই ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল—'জানোইতো সব। আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?

—'তোমাকে কত করে বললাম আমার সঙ্গে কোলকাতায় চলো। গেলেনা। গেলে বিনয়ের ছেলেটাকে কত আদর করতে পারতে। ভালও লাগত।'

—'এখনও ভাল লাগছে। নিপুর ছবিটা দেখো। কী মিষ্টি ওর মুখখানা।'

—'কথাও বলে খুব মিষ্টি মিষ্টি। আমাকে ডাকতো দুগ্গাকাৎ কাকু বলে।'

শুনে যেন একটু জোরেই হেসে উঠল বাসন্তী। তারপর ছবিটার দিকে চোখ রেখে বলল—'খুব পাকা হয়েছে তো?' সুপ্রকাশ বাসন্তীর কথায় তেমন কান দিলনা। বিনয়ের শীর্ণ চেহারাটা তার মনে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—'বিনয়ের শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গেছে দেখলাম। বেচারার বার্ডেনতো কম নয়।'

বাসন্তী যেন এখন সুপ্রকাশের কথা শুনছে না। এক মনে দেখছে শুধু নিপুর ছবিখানা। এবং এক সময় কেমন অন্যমনস্কের মতো হঠাৎ বলে উঠল—'নিপুর চোখদুটো ওর মায়ের মতোই হয়েছে, না?'

—'অনেকটা। বিনয়ের বৌ বরিকার কিন্তু সেই চেহারা আর নেই। এখন মোটা মোটা গিন্নি গিন্নি দেখতে। অপারেশন করার পরই নাকি চেহারা ফিরেছে। মজা দেখো আমরা ছেলে-ছেলে করছি, চিকিৎসা, তাবিজ, মাদুলী কোনটাই বাদ যায়নি, আর ওরা কিনা সেই পথ বন্ধ করে দিল।

ছবিটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল বাসন্তীর। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে আঁচল দিয়ে মুছতে থাকে। যেন রক্ত-মাংসে গড়া নিপুর গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছে। বলল, 'ওরা এক পেয়েছে বলেই তো আর দুই চায় না। আমরা কত পেয়েছি বলতে পারো?'

—'অনেক।'

—'অনেক?'

—'হ্যাঁ! ঐ এ্যালবাম খুললেই পাবে।' বাসন্তী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। বললে—'যাঃ। দেখো ফটো কর্ণার আনতে ভুলবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি।' ঈষৎ হাসল সুপ্রকাশ।

—'যেমন ভাবে তাড়া দিচ্ছ বাজারের ফর্দের মধ্যে নোট না করলেই নয় দেখছি। বাজার বলতেই মনে পড়ল। কলকাতাতেও দেখলাম জিনিসপত্রের দাম সব আগুন। বিনয় সেদিন বলছিল—যে যুগ পড়েছে, তাতে আমরা সবাই চাল—ডাল—তেল—নুনের ভাবনাতেই শেষ হয়ে যাবো। আমি বললাম ট্রাগল কর একজিস্টেন্স? বিনয় বলে—নো মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, ট্রাগল্ কর ডেথ! কথার খৈ ওর মুখে সব সময়ই ফুটছে।'

—'তাই বুঝি?,' বাসন্তী একটু থামল। তারপর কতক্ষণ কি যেন ভাবল। ভাবতে ভাবতে একসময়ে বলে উঠল—'আচ্ছা, নিপুও খুব কথা বলতে শিখেছে, না?'

—'হ্যাঁ। হবে না কেন, মা-বাবা কেউতো আর কম কথা বলে না। তবে এবারে দেখলাম মল্লিকার হাসির মুক্তাদোষটা একটু কমেছে। আরে হ্যাঁ, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি বিনয়ের শালীর সঙ্গে দেখা হল। সেই যে মেডিক্যাল। তোমার এখনও কোনো ইস্যু হয়নি শুনে আমাকে বিরাট লেকচার দিয়ে শোনাল!'

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইল বাসন্তী ডান হাতের আঙুলগুলো ছবির মসৃণ বুকে ঘষতে লাগল। যেন সত্যিকারের নিপুকে আদর করছে। তারপর টেনে টেনে বলতে থাকে—'নিপুটা খুব চঞ্চল হয়েছে না?'

—'খুব! সব সময় চোখে চোখে রাখতে হয়। তার ওপর ওদের ছাদটা একদম খোলা কোনো রেলিং নেই।'

—'বলো কি' ঘুরি শিউরে উঠল বাসন্তী, 'বাড়িওলাকে বলতে পারে না রেলিং করে দিতে? ঘরে বাচ্চা আছে। যদি কোনদিন পড়ে যায়?' আতঙ্কভরা দৃষ্টি নিয়ে ছবিটাকে আঁকড়ে ধরল বাসন্তী।

—'বাড়িওলা কিছু করলেতো?' সুপ্রকাশ বলল, তার সঙ্গে আবার বিনয়ের মামলাও চলছে। গাছপালার দিকেতো বিনয়ের বরাবরই খুব ঝোঁক। বাড়ির পেছন দিকের খালি জায়গাটাতে ও ছোটখাটো একটা বাগান করেছে। বাড়িওলার সঙ্গে এই বাগান নিয়েও কত অশান্তি। একদিনতো রাগের চোটে নিপুও বলে ফেলল—বাড়িওলাকে আমি বন্দুক দিয়ে মেরে ফেলবো।'

এবারে হাসি ফুটল বাসন্তীর মুখে।

সুপ্রকাশ বলল—'ছেলেটা কি কম চালাক হয়েছে। তাহলে বলি শোন ওদের বাগানে একটা পেপে গাছ ছিল—সেটাতে কোনদিন ফল ধরেনি। শুধু ফুল ফুটেছে মাত্র। কিন্তু ফুটতে না ফুটতেই ঝরে পড়ত। একদিন বুঝি বিনয় বলেছিল—ঐ নিষ্ফলা গাছটাকে বাড়িতে রেখে কি হবে ওটাকে একদিন কেটে ফেলতে হবে।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল বাসন্তী। কপালে ফুটে উঠল কয়েকটা ভাঁজ।

সুপ্রকাশ তখন বলে চলেছে—'নিপুও কি কম চালাক? ওর বাবার কথাটা ঠিক মনে করে রেখেছে। একদিন দেখি কি দা নিয়ে বসে গেছে পেপে গাছটাকে কাটতে। দেখে আমরা সবাই

হাসাহাসি করছি। নিপু কিন্তু একটুও না হেসে পরম বিজ্ঞের মতো বললে—যে গাছে ফল ধরবে সে গাছ বাড়িতে রেখে কি হবে? কেটে শেষ করে দাও।'

বাসন্তীর হাত থেকে ছবিটা মাটিতে পড়ে গেল। সেদিকে সে তাকালনা। অ্যালবামটাকে দূরে সরিয়ে রাখতে রাখতে সে বললে—'কোলকাতায় সব জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছেতো? মাছ কেমন খেয়ে এলে?'

—'মাছের বাজারেও আবাদ। বুঝলে?' সুপ্রকাশ একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে থামল। তারপর বলল—'নিপুটা কিন্তু অদ্ভুত হয়েছে—মাছের ও ঘোর বিরোধী।'

অ্যালবামটার দিকে ভুরু দুটিতে তাকিয়ে বাসন্তী কিন্তু নিপুর হঠাৎ বিরোধিতার কারণ জানতে চাইল না। বরং বলল—'মল্লিকার সেই সেন্টিমেন্টাল বোনের না বিলেত যাবার কথা ছিল? কবে যাবে?'

—'ওসব নাতো কিছু,' মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সুপ্রকাশ বলল, 'আরে একটা মজার কথা শোন। নিপুকে আমি বলেছিলাম বড় হলে তুমি কি হবে? ও বললে—বড় হলে আমি আহাজে কাজ করবো। তখন বোম্বে আমি বিলেত যাবো।' কথার সঙ্গে সঙ্গে জোরে হেসে উঠল সুপ্রকাশ। বাসন্তী কিন্তু হাসল না। সে গম্ভীর। চিন্তামগ্ন।

—'নিপুর আর একটা কাণ্ড শোন……?'

বাধা দিয়ে বাসন্তী বললে—'মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে কি শান্তিতে থাকা যায়? বিনয়বাবুরা ঐ বাড়ীটা ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন?'

—'ছাড়লে বাড়ি পাচ্ছে কোথায় বলো? কোলকাতায় বাড়িভাড়া পাওয়াও একটা প্রবলেম। বিনয় বলছিল আমার অসুবিধা হচ্ছে শুধু খোলা ছাদটার জন্যে। কোনদিন নিপু—'

বাসন্তী আবার কথায় বাধাদিয়ে বলে উঠল—'বাগানটা বাড়িওলাকে ছেড়ে দিলেইতো পারে। ঝামেলা চুকে যায়।'

—'কি করে ছাড়বে বলো, মায়া জন্মে গেছে অমন সুন্দর বাগানের ওপর। বাগানটা করেছেও চমৎকার। তরিতরকারীর গাছ হয়েছে অনেক। আর সব গাছেই কী দারুণ ফলন। শুধু—সেই বিচ্ছিরি পেঁপে গাছটা এক্সেপ্‌শন!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘড়িটার দিকে তাকাল বাসন্তী তারপর আস্তে আস্তে খাট থেকে উঠে পড়ল। সুপ্রকাশ ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাতেই বাসন্তী একান্ত অসন্তুষ্টের মতো বলল—'কিছু বলবে?'

—'বলছিলাম কি, একটু আগে বাজার থেকে কি যেন আনতে বলছিলে?'

—'কৈ নাতো।' একটা চোক গিলল বাসন্তী; 'তুমি যাচ্ছো এখন বাজারে?'

—'হ্যাঁ। মনে পড়েছে। ফটো কর্ণার। ক'বাক্স আনতে হবে বলোতো?'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বাসন্তী শুধু জানাল—'ফটো কর্ণার আবার বললাম কখন? আমিতো বললাম আয়না আনতে। ভালো দেখে একটা এনো।'

কথাটা সুপ্রকাশের মনে গভীরভাবে নাড়া দিল। সে তখন মাটিতে পড়ে থাকা বন্ধুপুত্রের ফটোখানার দিকে অবাক দৃষ্টি তুলে ভাবতে লাগল বাসন্তী এত তাড়াতাড়ি ফটো কর্ণারের কথা ভুলে গেল? কেমন করে সে ভুলতে পারল?

মেয়ে মজলিশ

ত্বকের পরিচর্যা

সুরঞ্জনা সেন

সুন্দর ত্বক তাকেই বলে যে ত্বকে কোনো রকম দাগ, বা কলঙ্ক-চিহ্ন নেই, যা পেলব, এবং পরিচ্ছন্ন। সজীব ও সুন্দর ফুলের পাপড়ির মতো তাজা ও তকতকে। দিন-রাত্রির ভেতরে মাত্র ক'য়েক মিনিট ত্বক-পরিচর্যায় নিয়মিত ব্যয় করলে আপনিও সুন্দর ত্বকের অধিকারিণী হতে পারেন; এবং আপনি সৌন্দর্য্য লাভের জন্য কেনই বা তা করবেন না? রাতে ঘুমোবার আগে, মুখ থেকে সব রকম প্রসাধন তুলে ফেলবেন। কোনো কারণে শরীর ক্লান্ত থাকলেও এ বিষয়ে অবহেলা করবেন না। কারণ, দিনের প্রসাধন মুখ থেকে তুলে না ফেললে রোম কূপের ভেতর দিয়ে মুখে ব'সে যায়। তার ফলে কিছুদিন পরেই ত্বক কর্কশ, লাবণ্য ও শ্রীহীন ও শিথিল হয়ে পড়ে।

ত্বক সাধারণতঃ চার রকমের—শুষ্ক বা রুক্ষ ধরণের, তেল-তেলে, স্বাভাবিক, আর মিশ্র প্রকৃতির। যাদের ত্বক শুষ্ক, বেশি গরম বা ঠাণ্ডা পড়লে তাদের ত্বক আরো কর্কশ দেখায়। এই কর্কশতা দূর করার জন্য তেল জাতীয় পদার্থ বা প্রসাধনী ব্যবহার এবং মুখ আর্দ্র রাখা প্রয়োজন। যে ত্বকে আর্দ্রভাবের অভাব সে ত্বকেই বয়সের রেখা এবং কুঞ্চন তাড়াতাড়ি দেখা দেয়।

বারবার জল দিয়ে ধুলে মুখের ত্বক আরো শুকনো হ'য়ে পড়ে। দেহ-নিঃসৃত যে মূল্যবান তৈল মুখশ্রী কোমল রাখে তা অনেকখানি চ'লে যায়। সেই কারণে মুখ-বার বার-না ধোয়াই-ভালো। দিনে একবার ভালো চর্বি-যুক্ত সাবান ব্যবহার করবেন। তারপর নরম তোয়ালে দিয়ে আলতো ভাবে মুখ মুছে ফেলবেন। মুছে ফেলার পর মুখে ভালো ক্রিম মেখে ক'য়েক মিনিট রাখবেন। তারপর আরেক-খানা পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে মুখ থেকে ক্রিম তুলে ফেলবেন। এবার আপনি স্নিগ্ধ কোনো টনিক মুখে লাগাতে পারেন।

আপনার ত্বক সুন্দর রাখার জন্য ত্বকের খাদ্যের প্রয়োজন। প্রতি রাতেই। বিশেষ ক'রে যে-সব মেয়েদের ত্বক শুষ্ক তাঁরা যদি মুখের যৌবন-শ্রী বজায় রাখতে চান তবে এ কথাটি ভুললে চলবেনা। মুখের ত্বকের খাদ্য ব্যবহার করতে হবে মুখের নিচ দিক থেকে ওপরের দিকে। ওপর থেকে নিচের দিকে রগড়ালে মুখের পেশীর ওপর চাপ পড়ে, বয়স বেড়ে গেছে এমন দেখায়। খাদ্য বা ক্রিম মুখে ব'সে যেতে বড় জোর মিনিট কুড়ি লাগে। এই সময়টুকু রেখে তারপর ক্রিম তুলে ফেলবেন।

রাতে, ঘুমোবার আগে, যাঁদের স্নান করার অভ্যাস আছে তাঁরা স্নানের পর ত্বক পরিচর্যা করতে পারেন। গরম জলে স্নান করলে তার বাষ্প শরীরের রোমকূপগুলিকে উন্মুক্ত ক'রে দেয়। তখন ক্রিম ব্যবহার করলে তা সহজেই পরিচ্ছন্ন ত্বকের ভেতরে ব'সে যায়। এতে ত্বকের পুষ্টি আর আর্দ্রতা দুইই বাড়ে। ত্বকের যত্ন প্রতিরাতেই নিয়মিত ভাবে নেয়া দরকার। নিয়মিত না করে মাঝে মাঝে এ পরিচর্যায় ফল হয় না।

যাদের ত্বক এমনিতেই বেশি রকম তেল-তেলে তাদের মুখে প্রায়ই নানা রকম কালো দাগ, ব্রণ, মেছেতা, ইত্যাদি দেখা যায়। যে-সব মেয়েদের বয়স তেরো থেকে উনিশের ভেতরে, মুখের ওই সব

দাগ আয়নায় দেখে তাদের দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। ওই বয়সের মেয়েদের শরীরের তৈল গ্রন্থিগুলি তখন অতিমাত্রায় কাজ করে বলেই ও রকম হয়।

যে সব মেয়েদের ত্বকে চর্বি বেশি তাদের উচিত দিনের মধ্যে একাধিকবার মুখ ধুয়ে ফেলা, যাতে শরীরে বা মুখে দেহনিঃসৃত তৈল জমতে না পারে। যে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছবেন তা যেন পরিষ্কার থাকে। হাতের আঙুলও পরিচ্ছন্ন থাকা চাই। প্রথমে সামান্য উষ্ণজল দিয়ে মুখ এবং দেহের অন্যান্য অংশ ধুয়ে নেবেন। তারপর মুখে বার ক'য়েক ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেবেন। এতে যেমন রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়াকে সাহায্য করবে, তেমনি মুখের শিথিল ভাবও কেটে যাবে ও সজীবতা আসবে।

যাদের মুখ এমনিতেই তৈলাক্ত তারা ক্রিম না ব্যবহার করলেই ভালো। তবে বেশী ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে বেরুতে হ'লে মুখে একটু ক্রিম মেখে বেরুলে ঠাণ্ডার তীব্রতা ত্বকের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

তৈলাক্ত-ত্বকে মেয়েদের একটা সুবিধাও কিন্তু আছে। শুষ্ক-ত্বক মেয়েদের মতো তাদের মুখের ত্বক তাড়াতাড়ি কুঁচকে যায়না।

আপনার ত্বক যদি স্বাভাবিক হয় তা হলে তো চিন্তার কোনো কারণই নেই। তৈলাক্ত-ত্বক মেয়েদের মতো কোনোরকম বিশ্রী দাগ আপনার মুখে দেখা দেবেনা। আবার শুষ্ক-ত্বক মেয়েদের মতো আপনার মুখশ্রী তাড়াতাড়ি লাবণ্যহীন হবে না।

দিনের ভেতরে অন্তত দুবার আপনি ভালো সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলবেন। তারপর একটু ক্রিম ব্যবহার করবেন। শোবার আগেও আপনি ত্বকের পরিচর্যা করতে পারেন। ঠাণ্ডা পড়লে, বা জোর হাওয়া থাকলে ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একটু ক্রিম ব্যবহার করতেই হবে।

যাদের ত্বক মিশ্রণ প্রকৃতির তাদের শুধু কপালে, নাকে, আর আর চিবুকে তেল-তেলে ভাব থাকে। অনেক মেয়েদের শরীরে কুড়ি বছর পর্যন্ত চর্বির মাত্রা ক'মে যায়। বিশেষ ক'রে, যখন তিরিশের কোঠায় পা দেয়।

যাদের ত্বক মিশ্রিত প্রকৃতির তাদের ত্বক পরিচর্যার নিয়ম স্বাভাবিক ত্বক মেয়েদেরই মতো। কেবল শোবার আগে চোখের নিচে বেশ ক'রে ক্রিম মাখতে হবে।

দৈনন্দিন খাদ্যের গুণাগুণের উপরে ও নিয়মিত শরীর চর্চার উপর ত্বকের স্বাস্থ্য অনেকখানি নির্ভর করেও কারণ স্বাস্থ্যই সৌন্দর্যের আকর এবং স্বাস্থ্য অটুট থাকলে যৌবন-সুলভ রূপ লাবণ্যও সহজে লাভ করা যায়। যাঁদের ত্বকে চর্বির ভাগ বেশি তাঁরা অতিরিক্ত মশলা-দেওয়া খাবার ও বেশী ঘি বা তেল যুক্ত খাবার খাবেন না। কারণ তাতে চর্বি বৃদ্ধি পায়। বরং তাঁদের উচিত বেশি ক'রে শাক-সবজি আর টাটকা ফল ব্যবহার করা। অবশ্য ফল এবং শাক-সবজি প্রতিদিন কিছু-কিছু খেলে আমাদের সকলেরি উপকার হয়। তৈলাক্ত-ত্বক মেয়েরা ভাজা জিনিষ বেশি খাবেন না। শুষ্ক-ত্বক মেয়েরা কিন্তু তৈলাক্ত খাবার একটু বেশি ব্যবহার করলেই উপকার পাবেন।

সামান্য একটু মধু ১৫ কি ২০ মিনিট মুখে মেখে রাখবেন। তারপর গরম জলে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে মুখ থেকে সেই মধু তুলে ফেলবেন। এতে মুখ যেমন পরিষ্কার হয়, তেমনি মুখ থেকে বয়স-বৃদ্ধির রেখাও মিলিয়ে যায়। যাঁদের ত্বকে চর্বির মাত্রা একটু বেশি তাঁরা মধুর ভেতরে ক'য়েক ফোঁটা পাতিলেবুর রসও মিশিয়ে নিতে পারেন। নিয়মিত এই ভাবে পরিচর্যা করলে সত্যি আপনার মুখশ্রী বাড়বে।

মুখব্রণ, মেছেতা ও ছুলির প্রতিকার

(১) লোধ, ধনে ও যব জলের সঙ্গে ভালো ক'রে বেটে মুখে মাখবেন এবং দশ মিনিট পরে ধুয়ে ফেলবেন। এই জিনিসটি যৌবনজাত মুখব্রণে বিশেষ উপকারী।

(২) রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ এবং মহুয়ার ডাল একত্রে জলের সঙ্গে বেটে মুখে মাখলে মুখের ব্রণ ও মেছেতা দূর হ'য়ে মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হয়।

(৩) বটের কুঁড়ি আর মহুয়ডাল একত্র বেটে মুখে প্রলেপ দিলে মুখের মেছেতা চ'লে গিয়ে শ্রী বাড়ে।

(৪) শুকনো অর্জুন ছাল ঘোলের সঙ্গে বেটে মুখে প্রলেপ দিলে মেছেতা ভালো হয়।

(৫) পাতিলেবুর রসে শ্বেতচন্দন ঘষে লাগালে অল্পদিনের মধ্যে ছুলি সেরে যায়।

(৬) তালের রসের সঙ্গে লবণ মিশিয়ে মালিশ করলে ছুলি সহজে আরোগ্য হয়।

* * * *

"তোমার দ্বারা নাচ চলবে না,"—মোটা সিগারটা দাঁতে চেপে ধরে বললেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের ম্যানেজার লোমোনফ্ এক তরুণী নৃত্যশিল্পীকে।

—কারণটা কি জানতে পারি? বিনীতভাবে বললেন তরুণী।

—কারণটা হচ্ছে, তোমার পা আড়ষ্ট—ব্যালে নাচে ওটা একেবারেই অচল। অবশ্য তোমাকে হতাশ করতে চাই না,—তুমি একমাস পরে আমার কাছে এস।

একমাস পরে তরুণী এলেন ম্যানেজারের কাছে, নাচও দেখালেন।

এবার ম্যানেজারের মুখ গম্ভীর হোল। তিনি বললেন, আরও একমাস পরে এস।

আরও একমাস পরে তরুণীর নাচ দেখে ম্যানেজার বললেন: আরও একমাস পরে।

এবার কিন্তু নাচ দেখে তিনি হাসি মুখে বললেন, আর্ট-থিয়েটারের লোকজন তবল্ করতে হবে, নইলে সামলাবে কে?

মানে?—বিস্মিত হয়েই তরুণী প্রশ্ন করলেন।

ম্যানেজার হেসে বললেন: মানেটা খুবই পরিষ্কার—অ্যানা পাভলোভা, সারা ইউরোপ ছুটে আসবে কি না!

কোম্পানী আমলের কাহিনী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সেকালের সংবাদপত্র

কোম্পানীর ইংরেজ কেরানি আর কর্তাব্যক্তি যিনি এদেশে অনেকেই লেখক হয়েছিলেন। এবং সেই সময় তারা পরপর অনেকগুলি খবরের কাগজ বার করেছিলেন। সংক্ষেপে তাদের পরিচয় দেওয়া হল।

১৭৭০ সাল প্রথম ইংরেজী সাপ্তাহিক বেরোয়—ইণ্ডিয়া গেজেট। সরকারী মুখপত্র।

১৭৮০ সনের ২৯শে জানুয়ারী হিকি সাহেবের বেঙ্গল গেজেট আত্মপ্রকাশ করে।

গর্ডন এবং হে নামে দুই সাহেব বার করেন ক্যালকাটা অ্যাডভার্টাইজার—মাসিক পত্র। ঐ সনেই।

কসাইটোলা থেকে হোয়াইট সাহেব বার করেন আর একটি মাসিক পত্র, ক্যালকাটা ম্যাগাজিন, ১৭৯১ সনের ৩রা অক্টোবর।

১৭৯২ সনের ১৯শে এপ্রিল যে ইণ্ডিয়া গেজেট বেরোয় তার মধ্যে আমরা বিচিত্র সংবাদ সমাবেশ দেখতে পাই। প্যারিস বিদ্রোহ, রাজা লুইর শিরশ্ছেদ, ইংলণ্ডে বার্মিংহাম বিদ্রোহীদের বিচার, বাঙ্গালোর ও সেরিংগপটমের লড়াই, টিপু সুলতানের সঙ্গে সন্ধি ইত্যাদি।

সে সময় না ছিল টেলিগ্রাম, না বা অন্য কোন দ্রুত খবর প্রেরণের ব্যবস্থা। জাহাজে করে বিলাত থেকে খবরের কাগজে আসতো। দীর্ঘদিন বাদে বাদে। আর তারই জন্যে কী হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি।

কলকাতার বন্দরে যখন জাহাজ এসে ভিড়ত তখন কে আগে খবরের কাগজগুলো হাতাতে পারে তার প্রতিযোগিতা লেগে যেতো। পানসি নৌকোয় চেপে সাহেবরা জলপথে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতো—জাহাজ বন্দরে ঢোকবার আগেই তারা মাঝদরিয়া থেকে জাহাজে উঠে পড়ত।

সুতরাং যেখানে তারা স্থায়িভাবে বসবাস করছে সেখান থেকে তারা পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

১৭৯৪ সনের ১লা নভেম্বর, ২নং ওয়েলটন লেন থেকে জে. হোয়াইট প্রকাশ করেন ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল। এই পত্রিকাটিতে সারা মাসের ভারতীয় সংবাদের চুম্বক থাকতো এবং পত্রিকাটি বিলাতে পাঠানো হ'ত।

ওরিয়েন্টাল স্টার আপিস থেকে ১৭৯৫ সনের ২০শে জানুয়ারী সাপ্তাহিক পত্রিকা বেঙ্গল হরকরা প্রথম প্রকাশিত হয়।

ঐ বছর অক্টোবর মাসে ১৫৮ চিৎপুর রোড থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। নাম ইণ্ডিয়ান অ্যাপোলো।

১৮১৮ সনে ক্যালকাটা গেজেট এবং ক্যালকাটা একসচেঞ্জ্ প্রাইস কারেণ্ট প্রকাশিত হয়। তার আগের বছর শ্রীরামপুর থেকে বেরোয় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া। এই পত্রিকাটি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে এবং বহুদিন চলবার পর স্টেটসম্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৮১৯ সনের ১লা মে ক্যালকাটা জার্নালকে সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক পত্রিকায় পরিণত করা হয়। সোমবার ও বৃহস্পতিবার অবশ্য পত্রিকাটি বন্ধ থাকতো। চাঁদার হার ছিল মাসে আটটাকা। এই পত্রিকাটিই প্রথম সচিত্র পত্রিকা। অবশ্য চিত্রের সংখ্যা মাসে চার পাঁচখানির বেশি থাকত না এবং তাদের জন্যে পৃথক প্রতিখানির জন্যে আট আনা করে দাম ধার্য করা হত।

এশিয়াটিক ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৭নং পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের বেঙ্গল হরকরার আপিস থেকে। সেকালের পত্রিকায় কী ধরণের বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ করা হত তার নমুনা উদ্ধৃত হল :—১। ভারতীয়ের স্মরণ, ২। সুধাসাগরের কর্মকাণ্ড, ৩। অ্যাবটনি জোসেফ গ্রোসাস-এর স্মৃতিকথা, ৪। ছাপাখানার কথা, ৫। একটি হাস্যরসাত্মক গল্প, ৬। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ৭। পিটার মুর-এর বক্তৃতা, ৮। প্রান্তরের কুমারী কন্যা, ৯। রাজনৈতিক সংবাদ, মতামত, সাধারণ সংবাদ, নিয়োগ ও বদলী এবং স্থানীয় ঘটনা। এই পত্রিকাটির দাম ধার্য করা হয়েছিল, গ্রাহকদের জন্যে প্রতিসংখ্যা চারটাকা, সাধারণের জন্যে ছ'টাকা।

১৮১৫ সনের ২৫শে মে ক্যালকাটা গেজেট-এর পৃষ্ঠায় আমরা এই সরকারী বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পাই—"সরকারী ছাপার কাজ ক্যালকাটা গেজেট থেকে মিলিটারি অর্ফ্যান প্রেসে স্থানান্তরিত করা হবে এবং সেখান থেকে গভর্ণমেণ্ট-এর নিজস্ব পত্রিকা আগামী মাস থেকে প্রকাশিত হবে। পত্রিকার নাম হবে—গভর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৭৮৪ সন থেকে এই গেজেট নিয়মিত বেরুচ্ছে।

১৮২৪ সনের ৩১শে অক্টোবর সাপ্তাহিক মীনার নামে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মুখবন্ধে বলা হয়—দৈনিক সংবাদ পত্রের সবগুলি সকলের পক্ষে পড়া সম্ভব নয়। তাই এই সাপ্তাহিক পত্রে সেই সব পত্রিকা থেকে উল্লেখযোগ্য খবরগুলি সংগ্রহ করে পরিবেশন করা হবে। অবশ্য সেই সঙ্গে তাদের নিজস্ব সংবাদদাতার সংবাদও থাকবে।

জন বুল ইন দি ইস্ট প্রকাশিত হয় ১৮২১ সনের ২রা জুলাই। "হিন্দুস্থানী প্রেস" থেকে ছাপা হয়। সম্পাদক ছিলেন জেমস ম্যাকেনজি।

৩নং মেরা জান লেন থেকে নতুন সাপ্তাহিক ক্যালকাটা কোরিয়ার প্রকাশিত হয়. ১৮২৭ সনের ৬ই মে।

১৮২৭ সনের ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যায় তৎকালিক কলকাতা সংবাদপত্র সমূহের উপর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়।

বেঙ্গল হরকরা ছিল সবচেয়ে প্রাচীন পত্রিকা। এই পত্রিকাটির প্রতিপত্তিও ছিল প্রচুর। ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যাও ছিল যেমন বিপুল, তার মতামত ও সম্পাদকীয়গুলিও ছিল তেমনি যুক্তিপূর্ণ এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য। গভর্ণমেণ্ট গেজেট-এর মধ্যে মন্তব্য বা মতামত বিশেষ থাকত না, কিন্তু তার মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেসব তথ্য পরিবেশিত হত পাঠকদের কাছে তারা বিশেষভাবে গ্রহণীয় হত।

কলকাতা থেকে ১৮২৯ সনে একটি সাময়িক পত্রিকা বেরোয়। নাম ক্যালিডসকোপ। সেই বছরই বেঙ্গল অ্যাথেনাম-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

১৭৯০ সনে ২৭শে জুন বোম্বাই থেকে বেরোয় বম্বে গেজেট। প্রথম অবস্থায় বম্বে গেজেট প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হত। পরে তা মাসিকে পরিবর্তিত করা হয়।

১৮২৪ সনে ক্যাপটেন ডি. এল. রিচার্ডসনের পরিচালনাধীনে ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট প্রকাশিত হয়।

খ্যাতনামা লেখক ও সাংবাদিক ইঙ্গ-ভারতীয় ডেরোজিও-র নেতৃত্বে প্রকাশিত হয় নতুন দৈনিক—ইস্ট ইণ্ডিয়ান, ১৮২৭ সনে।

জন বুল-এর সম্পাদক জে. এইচ. স্টকুলার-এর একটি পরিসংখ্যান থেকে আমরা তখনকার দিনের সংবাদ পত্রগুলির একটি তালিকা পাই।

দৈনিক—বেঙ্গল হরকরা, ইণ্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা কোরিয়ার এবং জন বুল।

সপ্তাহে তিনদিন—ইণ্ডিয়া গেজেট, বেঙ্গল ক্রনিকল এবং ইণ্ডিয়ান রেজিস্টার।

সপ্তাহে দু'দিন—ক্যালকাটা কোরিয়ার এবং ক্যালকাটা গেজেট।

সপ্তাহিক—লিটারারি গেজেট, ওরিয়েন্টাল অবজার্ভার, বেঙ্গল হেরালড্, রিফর্মার, ফিলান-থ্রপিস্ট, এনকোয়ারার, জ্ঞানান্বেষণ, সমাচার দর্পণ।

মাসিক—ক্যালকাটা জার্নাল, বেঙ্গল স্পোর্টিং ম্যাগাজিন, ক্রিশ্চান ইনটেলিজেনসার এবং অবজার্ভার।

দ্বৈমাসিক—ইস্ট ইন্ডিয়ান জার্নাল।

ত্রৈমাসিক—ক্যালকাটা ম্যাগাজিন।

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বই ১৭৭৮ সনে হুগলি থেকে ছাপা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বইটির নাম হল—হ্যালহেড-এর ব্যাকরণ। বাংলা ভাষায় হ্যালহেড সাহেব এতদূর পারঙ্গম হয়েছিলেন যে তিনি যখন ছদ্মবেশে বাঙালীদের সঙ্গে মিশতেন তখন তাঁকে একেবারেই চেনা যেত না। সেই গ্রন্থের টাইপগুলির পরিকল্পনা করেছিলেন—সার সি. উইলকিনস। এই সূত্রে পঞ্চাননের নাম অবিস্মরণীয়। তিনিই এই গ্রন্থের যাবতীয় টাইপ তৈরী করেছিলেন। শ্রীরামপুর থেকে "রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনী" নামে বইখানি প্রকাশিত হয় ১৮০১ সনে। বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম বইএর মধ্যে এখানি অন্যতম।

বাংলার প্রথম সংবাদ-পত্র সমাচার দর্পণ ১৮১৮ সনের ২৩শে মে শ্রীরামপুর থেকে আত্মপ্রকাশ করে। তদানিন্তন গভর্ণরজেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই পত্রিকাটিকে সর্বপ্রকার সহায়তা দান করেছিলেন বলে কেরি সাহেব লিখে গেছেন। তখনকার দিনের ইংরাজ শাসকরা মনে করত, ভারতীয়দের পক্ষে জ্ঞান ও শিক্ষালাভ করা ইংরাজদের পক্ষে বিপদজনক, কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস তা মনে করেন নি। সমাচার দর্পণের প্রথম সংখ্যা বেরুবার পর তিনি নিজে হাতে চিঠি লিখে তার সম্পাদককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

সমাচার দর্পণের পর রাজা রামমোহনের "ব্রাহ্ম পত্রিকার" নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮২১ সনে এর প্রকাশ।

প্রথম বাংলা পত্রিকা ছেপে বেরোয় ১৮২৮ সনে শ্রীরামপুর থেকে। সেখানে কয়েকজন বাঙালীর চেষ্টায় একটি ছাপখানা স্থাপিত হয়েছিল।

চন্দ্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮২১ সনে, রাজা রামমোহনের কৌমুদী ১৮২৩ সনে, সমাচার ১৮২৯ সনে। শেষোক্ত পত্রিকার কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন, আর. মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রামমোহন রায়।

বলা বাহুল্য বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রাক্‌কালে এই সব পত্র পত্রিকাগুলি বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছিল।

ইংরাজী পত্র পত্রিকার মধ্যে এমন দু'একজন নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা সম্পাদক ছিলেন যাঁরা ইংরাজদের কুশাসন সম্বন্ধে অকুণ্ঠ মতামত জ্ঞাপন করতে পশ্চাৎপদ হননি এবং সেকারণে তাঁদের সরকারের হাতে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁদের সেই সব লেখাগুলিও ভারতীয়দের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। যথাস্থানে সেই কাহিনী বলব।

---

* * * *

একটি পত্রাংশ

মাসিক-পত্র বহুলোকের প্রিয় করে তোলবার জন্যে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন লেখার বিশ্বস্ততা এবং সংযম। উগ্রতার অতিভূত করে দেবার সংকল্প নিয়ে যে-লেখা রচিত হয়, একটু মন দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে, তার পোষাক ও বাইরের আতিশয্য স্বল্পকালের জন্যে পাঠকের চিত্ত চকল করে তুললেও সে স্থায়ী তো হয়ই না, পরন্তু প্রতিক্রিয়ায় অবসাদগ্রস্ত করে দেয়। সহজেই হক বা যাতেই হক যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন অনুভূতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসে নি, তখনি মনে জেনো তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হোকেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, সে অন্তঃসারশূন্য—সে টিকবে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৪শে ভাদ্র, ১৩৪০।

গল্পভারতী তার বিশবছরের পথপরিক্রমায় শরৎচন্দ্রের উক্ত আদর্শবাদকে অগ্রাহ্য করেনি।

চিত্র বিচিত্র

বিস্ফোরক আবিষ্কর্তার সাহিত্য-বিজ্ঞানপ্রীতি

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

নোবেল পুরস্কার। সারা পৃথিবী এই পুরস্কারের মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। এমনটি বড় দেখা যায় না। পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, কম্যুনিষ্ট অকম্যুনিষ্ট, শত্রু-মিত্র—অন্য সব বিষয়ে ভেদ থাকলেও এই পুরস্কারকে স্বীকৃতি দিতে তারা কেউ দ্বিধাগ্রস্ত নয়। এর শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদীসম্মত। প্রতি বছর যাঁরা এই পুরস্কার পান সেই সব কবি, লেখক, বৈজ্ঞানিক, শান্তি-সন্ধানী, এবং সমাজ-সেবীর বিচিত্র জীবন আর কাজের ইতিবৃত্ত আমরা সাগ্রহে পড়ি। তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হই।

কিন্তু এই পুরস্কার যিনি প্রবর্তন করে গেছেন তাঁর কথা পৃথিবীর খুব বেশী লোক জানে বলে মনে হয়না। তাঁর নিজের ঘটনা-বহুল জীবনও কম বিচিত্র নয়। প্রতি বৎসর শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসামী এবং শান্তি প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এই পুরস্কার বিতরণ করবার জন্যে তিনি বিশ লক্ষ পাউণ্ড দান করে গেছেন। টাকার অঙ্কটা ভেবে দেখবার মত। একটি মানুষের জীবনে এই বিপুল অর্থ উপার্জনের ইতিহাস উপন্যাসের মতোই কৌতূহলোদ্দীপক এবং রোমাঞ্চকর।

১৮৬৬ সালের একদিন দুপুর বেলা প্যারিসের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর সামনে দাঁড়িয়েছিল সুইডেনের এক যুবক। অ্যালফ্রেড নোবেল তাঁর নাম। লম্বা চওড়া চেহারা, কথায় আর আচরণে বিব্রত ভাব। তার এক বিরাট পরিকল্পনার কথা সে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের জানাতে এসেছিল, কিন্তু তার বক্তব্যকে কিছুতেই গুছিয়ে বলতে পারছিল না, কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠল—"মশায়রা শুনুন। আমার কাছে এমন এক তেল আছে, যা গোটা পৃথিবীকে উড়িয়ে দিতে পারে।"

ধনী মহাজনের দল সেকথা শুনে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়েন আর কি। ছেলেটা বলে কি। পাগল না মাথা খারাপ। তাও কি সম্ভব? আর তাছাড়া দুনিয়াটাকে উড়িয়ে দিতেই বা কে চায়? যুবককে তাঁরা পত্রপাঠ বিদায় দিলেন। অনর্থক তাঁদের খানিকটা মূল্যবান সময় নষ্ট হল।

তারপর সেই তরুণ বৈজ্ঞানিক আরও দু'এক জায়গায় তাঁর পরিকল্পনা পেশ করলে। কিন্তু কেউই তার কথায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলে না।

অবশেষে কথাটা তৃতীয় নেপোলিয়নের কানে পৌঁছলো। যুবকের কথায় আকৃষ্ট হ'য়ে তিনি তার প্রচেষ্টায় অর্থ সরবরাহের জন্যে এক ধনী ঠিক করে দিলেন। অনেক টাকা নিয়ে অ্যালফ্রেড

ষ্টকহলম্-এ ফিরে গেলেন। পিতা-পুত্রে দু'জনে মিলে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগলেন। পিতা ইমানুয়েল নোবেল বহুদিন আগে থেকেই এক ধরণের বিস্ফোরক উদ্ভাবনের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। ক্রিমীয়ার যুদ্ধে রাশিয়ানরা যে ভাসমান মাইন ব্যবহার করেছিল সেই বিস্ফোরক বোমা তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন।

ইমানুয়েল নোবেলের প্রতীতি জন্মেছিল যে, বিস্ফোরকরূপে নাইট্রো গ্লিসারিনের অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই সেই তরল পদার্থকে বশে আনতে পারছিলেন না। কয়েকটি অবস্থার সমন্বয় ঘটলে সেই তরল বস্তুটি প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ হোয়ে ফেটে পড়তে পারে, কিন্তু সেই অবস্থাগুলির বাঁধা ধরা সমন্বয় তিনি কিছুতেই ঘটাতে পারছিলেন না। ফলে অনেক সময় বিষম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছিল।

পুত্র অ্যালফ্রেড এবং পিতা ইমানুয়েল সেই বিস্ফোরক তৈলকে বোধ মানাবার কাজে লাগলেন। কর্মদক্ষতায় ছেলে বাপকে ছাড়িয়ে গেলেন শীঘ্রই। বহু গবেষণার পর অ্যালফ্রেড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে এই মারাত্মক পদার্থকে নিশ্চিতরূপে বিদীর্ণ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে কোন শক্ত আধারে আবদ্ধ করা এবং তারপর সেই আধারের গায়ে ঘা মেরে তাকে ফাটানো। সেই উদ্দেশ্যে অ্যালফ্রেড "ঘা-মারা টুপী" তৈরী করলেন। এই "টুপী" এখনো পর্যন্ত ডিনামাইট নির্মাণ শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়করূপে বিবেচিত।

দুই নোবেলিয়নের সাধনা লাভ করে পিতা পুত্রে মহা উৎসাহে কাজে তো লাগলেন, কিন্তু নাইট্রো-গ্লিসারিন অত্যন্ত বেঁকে দাঁড়ালো। উপর্যুপরি এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগলো যা যেমন ভয়ানক তেমনি মর্মান্তিক। ১৮৬৪ সালে এক পরীক্ষার সময় অতর্কিত বিস্ফোরণের ফলে ইমানুয়েলের ছোট ছেলে এমিল অ্যাব তার সঙ্গে চারজন শ্রমিক মারা পড়ল। পুত্রশোকে বৃদ্ধ ইমানুয়েল শয্যা নিলেন। উঠলেন না আর।

দমলেন না অ্যালফ্রেড। পিতার অসমাপ্ত কাজ তাঁকে করতেই হবে। তাঁর ফ্যাকটরি উঠিয়ে নিয়ে গেলেন গভীর জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে এক বছর ধরে তিনি তাঁর গবেষণায় মগ্ন রইলেন। স্বাস্থ্য গেল, কঠিন উদর পীড়ায় অস্থির হলেন, তবুও সঙ্কল্প রইল অটুট। জগতকে তিনি দেখাবেনই যে, তাঁর বিস্ফোরক মারাত্মক নয়, তাকে ইচ্ছামতো কাজে লাগিয়ে দেশের প্রভূত উন্নতি সাধন করা যেতে পারে। অবশেষে সুইডিশ সরকারের অনুমোদন ও আনুকূল্য লাভ করলেন। তাঁর বিস্ফোরক তৈলের সাহায্যে ষ্টকহলমে পাহাড় কাটিয়ে এক বিরাট রেলপথ তৈরী হল। নানাস্থানে বহু রাজপথ উন্মুক্ত হল সেই আবিষ্কারের সহায়তায়। চারিটি বিভিন্ন দেশে উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হল। অ্যালফ্রেড নোবেল সোজা হয়ে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়ালেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার বিপর্যয়। ১৮৬৭ সালের সকালে নরওয়েতে অবস্থিত নোবেলের উৎপাদনাগার বিদীর্ণ হয়ে আকাশে উড়ল। কয়েক সপ্তাহ পরেই খবর এলো, সাইলেসিয়ার কর্মশালায় একজন মিস্ত্রি সেই বিস্ফোরক ঠিক মতো ব্যবহার করতে না পারায় টুকরো টুকরো হয়ে ইতঃস্তত ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী এপ্রিল মাসে পানামা খালের মধ্যে ৭০ বাক্স নাইট্রো-গ্লিসারিন বাহী এক জাহাজ ফেটে চৌচির হল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তীরবর্তী মাল-গুদামগুলো পর্যন্ত ধ্বসে পড়ল। বাট জন মারা পড়ল। ক্ষতির অঙ্ক দাঁড়াল দু'লক্ষ পাউণ্ড। কিছুদিন পরেই আবার

সানফ্রান্সিসকোর রেলপথে এক মালগাড়ীর সঙ্গে অ্যালফ্রেডের বহু সাধনার নাইট্রোগ্লিসারিন বিদীর্ণ হয়ে পনেরো জনের প্রাণ হরণ করলে, আশেপাশের অনেকগুলো অট্টালিকাকে করলে ধরাশায়ী।

শেষোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরেই অ্যালফ্রেড ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিউইয়র্কে গেলেন। সঙ্গে ছিল কয়েক শেটি "মাল"।

খবর পেয়ে লোকজন তাঁর সান্নিধ্য পরিহার করে পালাতে লাগল। মড়ক বা মহামারীকে লোকে যেমন করে অভ্যর্থনা করে তেমনি অভ্যর্থনা পেলেন অ্যালফ্রেড। তিনি যখন ঘোষণা করলেন যে, খোলা মাঠে ইটখোলার পাশে তিনি জনসাধারণের সামনে তাঁর বিস্ফোরকের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন তখন কেউই তাঁর কথায় উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। যাই হোক ব্যবস্থা তিনি নিজেই করলেন। নির্ধারিত দিনে জনবিশেক লোক অকুস্থল থেকে বহু যোজন তফাতে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখতে লাগল! অ্যালফ্রেড নানাভাবে পরীক্ষা করে ছোট-বড় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেখালেন যে, নাইট্রো-গ্লিসারিন ভয়াবহ মারণ দ্রব্য নয়। সঠিক ব্যবহারে এর অনেক কার্যকারিতা। তাঁর আমেরিকা সফর সফল হল।

ক্রমে নানা দেশের গভর্ণমেণ্ট তাঁর পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বহু টাকার মাল সরবরাহের ফরমায়েস দিতে লাগল। নোবেল তাঁর আবিষ্কারের নাম দিলেন: 'ডিনামাইট'।

দশবছরে নোবেল পনেরোটি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সারা পৃথিবীতে ডিনামাইট সরবরাহ করে কোটী কোটী টাকা উপার্জন করলেন। "তবু ভরিল না চিত্ত"। চল্লিশ বছর বয়সে নিজের পানে তিনি ফিরে তাকালেন। দেখলেন, পরিশ্রান্ত, নিঃসঙ্গ এবং দুঃখভরাক্রান্ত চিত্ত এক বিষণ্ণ মানুষ হতাশভাবে চারিদিকে তাকাচ্ছে—আনন্দ নেই, সার্থকতা নেই, নেই জীবনের চরমতম প্রকাশ।

প্রথম যৌবনে তিনি প্যারিস ভ্রমণকালে একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলেন। মেয়েটি মারা যায়। সে বেদনা শেষদিন পর্যন্ত তিনি ভুলতে পারেন নি। অন্য কোন মেয়েকে জীবনে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

টাকা, টাকা আর টাকা। এত টাকা নিয়ে করবেন কি? প্যারিসে এক চমৎকার বাড়ী কিনলেন। জীবনে বৈচিত্র্য আনবার বাসনায় নানা খেয়ালে মাতলেন। যৌবনের আদর্শ দেবতা শেলীর বইগুলি আবার পড়তে লাগলেন। ছ'টি ভাষা জানতেন তিনি। বই পড়বার আগ্রহও ছিল অপরিমিত। চিঠি লিখতেও খুব ভালবাসতেন। দিনে গড়ে পঞ্চাশ খানারও বেশী চিঠি লিখতেন। বেশীর ভাগ চিঠিতেই থাকতো সাহিত্যের কথা, নব-প্রকাশিত পুস্তকের আলোচনা, নতুন নাটকের সমালোচনা। শেষ জীবনে তিনি একখানি নাটক রচনায় মগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু সে নাটকের কোন সংবাদ বিশ্বের সাহিত্য জগতে পৌছয় নি।

শান্তির জন্যে যারা নিরলস অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করবেন, নোবেল পুরস্কার তাঁরাই পাবেন —প্রবর্তনকালে নোবেল পুরস্কারের এই ছিল একমাত্র সর্ত। পরে নোবেল বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক-দেরও তাঁর তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেন। যাঁরা খ্যাতি এবং অর্থ প্রচুর পরিমাণে পেয়েছেন সেই সব প্রতিযশা মনীষীদের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কারের আয়োজন করেননি; যে সব প্রতিভা

বিজ্ঞানের গুণ এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভাগ্য দোষে অর্থ কৃচ্ছতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশের অভাবে যাঁরা তাঁদের গবেষণা বা সাহিত্য সাধনা সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না, তাঁরা যাতে এই পুরস্কার লাভ করে উপকৃত হন এবং সেই সঙ্গে জগতের স্বীকৃতি অর্জন করেন, সেই অভিপ্রায়েই নোবেল এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ তা হয় না। কারণ পুরস্কার বিজেতাদের আর্থিক অবস্থা অনুসন্ধান করে তাঁদের বিচার করে দেখবার অধিকার এই পুরস্কার-বিতরণ-সমিতির সদস্যদের ওপর অর্পিত হয়নি।

অ্যালফ্রেড নোবেল-এর শেষ জীবন ইতালিতে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিরিশ বছর পরে "শান্তি পুরস্কার" যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ, তাঁর ধারণা হয়েছিল তিরিশ বছরের মধ্যেও যদি জগৎময় সদ্ভাব স্থাপিত হয়ে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তা'হলে পৃথিবীতে আর কোনো দিনই শান্তি আসবে না, এবং সে ক্ষেত্রে "শান্তি পুরস্কার" হবে একটা উপহাসের মতো ব্যাপার। ১৮৯০ সালে তিনি এই কথা বলেছিলেন। আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে অচিরেই যে "শান্তি পুরস্কার" বন্ধ করে দিতেন তাতে আর সন্দেহ নেই। "শান্তির সলিত বাণী শুনাইছে ব্যর্থ পরিহাস।"—এ বাণী আজ নির্মম সত্য। ১৮৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর সজ্ঞানে এবং সমাহিত চিত্তে অ্যালফ্রেড নোবেল পরলোক যাত্রা করেন।

• • • •

দুর্ঘটনা

বিখ্যাত হাস্যরসাভিনেতা হ্যারল্ড্ লয়েড্-কে একটি হাসপাতাল পরিদর্শনের নিমন্ত্রণ করা হোলে তিনি বললেন—"হাসপাতালে একদা আমার মায়ের জীবনে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তারপর হাসপাতালের ওপর আমার একেবারেই আস্থা নেই।"

প্রশ্ন হল—"কি রকম দুর্ঘটনা, জানতে পারি কি?"

অভিনেতা বললেন—"নিশ্চয় পারেন। সে দুর্ঘটনা—আমি।"

বিচিত্রা

অক্ষম তরুণদের ক্লাব এ খবর জানতেন কী ?

অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-সঙ্গীত দলের জন ও জেরি নামের দু'জন ছাত্র গীটার বাজাতে বাজাতে যখন আইরিশ ব্যালাড পরিবেশন শুরু করল তখন শ্রোতাদের মনের উত্তেজনা বেশ স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেল। শ্রোতারা সবাই সোজা হয়ে বসে মাথা দোলাতে লাগল, এদিকে ওদিকে দুলতে লাগল, গুণগুণ করে গেয়ে উঠল, এবং শেষ পর্যন্ত উচ্চকণ্ঠে কোরাসে যোগ দিল।

এই সব হাসিখুশি, উৎসাহী তরুণ ছাত্র-জীবনের আনন্দ কোথায় তা ভাল করেই বুঝে নিয়েছে। শুধু সব ক্লাবের তরুণদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য এই যে তারা বসে বসেই যে উত্তেজনা প্রকাশ করছিল, এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ বসেছিল চাকা-অলা চেয়ারে, ক্রাচও কারও কারও হাতে ছিল, ঠিক হাতে নয়, চেয়ারের নিচে, আবার কারও বা পা ছিল লোহার তৈরি কৃত্রিম। ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ছিল অক্ষম। অকসফোর্ডের "Haven't a Name Club"-এর পাক্ষিক অধিবেশনে চলেছিল এই আনন্দোৎসব।

স্বাভাবিক ক্ষমতাহীন সদস্যদের কেউই ইউনিফর্ম পরে এখানে আসে নি, যদিও এরা সবাই ছিল—এদের সবার বয়সই বিশের নিচে বা বিশের সামান্য বেশি - রেডক্রসের অকসফোর্ড ১২ ভলান্টারি এইড ডিটাচমেন্টের (ভি-এ-ডি) সদস্য; এদের অনেকেরই আবার রেড ক্রসে কাডেট হিসাবে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে। এই বিশেষ দিনে ইউনিফর্ম না পরে আসাই উচিত হবে বলে তারা মনে করল। এদের একজন ত বলেই ফেলল, "আমাদের সঙ্গীরা সবাই হাসপাতালে ইউনিফর্ম দেখে দেখে ক্লান্ত, আমরাও চাই আমাদের ক্লাব হবে স্বাভাবিক ক্লাবের মত।"

এই বিশেষ অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় অকসফোর্ডের হ্যাকিন্ড অর্থোপেডিক সেন্টারের স্পোর্টস ও সোস্যাল ক্লাবে। আগের অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হয় অপেক্ষাকৃত ছোট জায়গায়—সাধারণতঃ পুরোনো স্কুল হল-এ—কিন্তু এবার তা সম্ভব হল না কারণ ক্লাবের সদস্য সংখ্যা এখন বেড়ে হয়েছে কম করেও ৫০, এবং বড় জায়গারই প্রয়োজন হল তার ফলে।

এই ক্লাব গঠনের প্রথম ধারণা আসে অকসফোর্ডের র‍্যাডক্লিফ ইনফারমারির প্রধান অ্যাল-মোনার মিস্ এলিজাবেথ টার্নার-এর কাছ থেকে। মিস্ টার্নার গিয়ে দেখা করেন ব্রিটিশ রেড ক্রসের ব্লাক ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস ফিলিস্ হেমোইটের সঙ্গে।

ভি-এ-ডি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার পর এই ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দিল; অবশ্য সবারই মত হয় এই নতুন ক্লাবটিকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক একটি যুব ক্লাবের মত করেই গড়ে তুলতে হবে। ক্লাবের সব কিছুই রাখা হল, যেমন টেবিল টেনিস, ডার্ট, ড্রাফটস্, টেবল টপ, ফুটবল, এবং এমন কি "পপ্" সঙ্গীতের রেকর্ড।

এলাকায় বাসকারী অক্ষম কিশোর ও তরুণদের কাছে যথারীতি চিঠি পাঠানো হল, তার পর আরও অনেক কিছু ব্যবস্থা করার পর ক্লাবের পক্ষ হয়ে প্রথম "খার্সডে নাইট" অনুষ্ঠিত হল। প্রথম

দিন কেবল তিনজন অক্ষম কিশোর উপস্থিত হয়েছিল, তাও প্রায় অনিচ্ছার সঙ্গে, কিন্তু পরে যখন সবাই বুঝল এতে আনন্দ কোথায় তখন দলে দলে এসে তারা ভিড় করতে লাগল।

সদস্যরা চাঁদা হিসাবে দিল সপ্তাহে মাত্র ৬ পেনি, প্রয়োজনীয় টাকা তারা সংগ্রহ করল অন্য ভাবে; সিটি অব অক্সফোর্ড ইয়ুথ কমিটি ও রেড ক্রস ডিসএবলড ক্লাবও তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করল।

এই সব অক্ষম কিশোর ও তরুণরা সেখানে যাতায়াত করে কি করে? কেউ কেউ সেখানে ইনভ্যালিড চেয়ারে করে নিজেরা চালিয়ে গেলেও বহু অক্ষম তরুণ সেখানে যায় অনেক ভি-এ-ডি সদস্য চালিত রেড ক্রস অ্যাম্বুলেন্সে চেপে, অথবা অন্য কারও গাড়িতে করে। এখানে বলা প্রয়োজন বাইরের বহু লোকই অক্ষমদের এই ভাবে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে থাকেন।

মিস হোয়াইট বলেন ক্লাব যে সমস্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে তা সবই যে অক্ষম সদস্যদের জন্য তা ঠিক নয়। নববর্ষে যে নাচের আয়োজন করা হয় তাতে সক্ষম ব্যক্তিরাই কেবল যোগ দেয় অবশ্য এমন সব অনুষ্ঠানেরই আয়োজন ক্লাব করতে চায় যাতে অক্ষম সদস্যরা যোগ দিতে পারে।

এই সব তরুণ ভি-এ-ডি সদস্যরা চায় ক্লাবটিকে অন্য সব যুব ক্লাবের মতই গড়ে তুলতে। অক্ষম সদস্যরা এই ভাবে নানা কাজকর্মের মধ্য দিয়ে অন্যের সঙ্গ লাভের আনন্দ পেতে পারে, তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধও এই ভাবে জাগ্রত হতে পারে, এবং তারা যে এক বিরাট সম্প্রদায়েরই অঙ্গ তাও এই ভাবে বুঝতে শেখে।

জীবনের উপর যে বাধা নিষেধের চাপ রেখা দেয় তা এই ভাবেই ক্রমে ক্রমে অপসারিত হয়, তারা নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে পারে ব্রিটেনের আরও দশজন কিশোর বা তরুণের মত নানা ধরণের কাজকর্মের মধ্যে।

যেখানে আপনার খেয়ালখুশী মত চলতে পারেন!

যদি এমন একটা জায়গা থাকতো যেখানে খুশীমত চলা যায়, নির্দিষ্ট কোন আইন কানুন নেই বলতেই হয় আর বাধা নিষেধমূলক কিছুই নেই, তাহলে এই রকম জায়গায় অনেকেই থাকতে চাইবে। বিশেষ করে স্কুল কলেজে যখন লম্বা ছুটি সুরু হয় তখন অনেক বাবা মাকে এ কথা বলতে শোনা যায় 'এই ছুটির দেড় মাস এখন এরা দস্তিপনায় অস্থির করে তুলবে।' লম্বা ছুটিতে ছেলেমেয়েদের সহরের বাইরে কোথাও পাঠানো খুব কম অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব। যাঁরা সহরে বাস করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা হয় বাড়ীতে থেকে হৈ চৈ করে নয়তো রাস্তায়, গলিতে বা পার্কে ভীড় করে নানা রকম দুষ্টুমি ভাঁজতে থাকে বা খেলাধুলা করে সময় কাটিয়ে দেয়। কিন্তু সহরে যদি এমন কতকগুলি জায়গা থাকে যেখানে ছেলেমেয়েরা গিয়ে তাদের খুশীমতো খেলাধুলা করতে পারে তাহলে অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

নেদারল্যাণ্ডের রটারডাম সহরে সত্যিই এই রকম একটা জায়গা আছে। আড়াই একর আয়তনের এই জায়গাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'যুবধাম'। বছরে একবার করে 'যুবধাম' গড়ে ওঠে আর সেই এক মাসে এই জায়গাটি প্রাণ চাঞ্চল্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। গত ১৮ই জুলাই তারিখে ষষ্ঠ যুবধামের উদ্বোধন উপলক্ষে নেদারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার হিসেবে দেখা যায় যে নেদারল্যাণ্ডের কিশোরদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ এখন পর্যন্ত গ্রীষ্মের ছুটিতে তাদের সহর বা গ্রামের বাড়ী থেকে বাইরে কোথাও যায় না। ছুটিটা যেখানে আকাঙ্ক্ষার বিষয় হওয়া উচিত, যাদের বাড়ীতে বসে ছুটি কাটাতে হবে তাদের পক্ষে এটা অনেক সময়েই একটা বিপুল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যে বাড়ীতে ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশী সে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ছুটির দিনগুলিতে অভিভাবকদের প্রায় উত্যক্ত করে তোলে এবং তাদের দুর্ভাবনাও বাড়ে। ছুটি কাটাবার যদি একটা ভালো উপায় থাকে তাহলে সহরের আবহাওয়া যেমন শান্ত থাকে তেমনি পার্ক বাগানগুলিও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচে।

বড় বড় শহরে ছুটির সমস্যা সমাধান সম্পর্কে রটারডামের 'যুবধামটিকে' একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত বলা যায়। শারীরিক শিক্ষা পরিষদের 'ছুটি কমিটি' এই 'যুবধাম' গঠনে উদ্যোগি হন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বেসরকারী ব্যক্তি ও সংস্থাগুলি এই কমিটির সঙ্গে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করেন। প্রাক্তন সাংবাদিক ডি হেসের রেসিডেন্সি অব হেল্থের প্রাক্তন পরিচালক, রাষ্ট্রীয় সংক্রোপ মেটাল এবং রেফিউজ সংস্থার প্রাক্তন জনসংযোগ রক্ষাকারী অফিসার এবং হল্যাণ্ডের 'ঘাঁ ঘাঁর রাজা' বলেই বিশেষ ভাবে পরিচিত ৭৪ বছর বয়স্ক মিঃ আর্টিনাস জেকব লিওনার্ড ভ্যান ছুইলেন হলেন এই 'যুবধামের' উদ্বোধক ও সংগঠক।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এক একরের বিপুল হলগুলি যুবধামে পরিণত হয়। সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই বাড়ীটিতে সাধারণতঃ প্রদর্শনী, মেলা, জনসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এ এক মাস এই সমগ্র সংস্থানটি খেলাধূলা ও নানা রকম কাজের ছলে পরিপূর্ণ বিপুল একটা মেলার রূপ ধারণ করে।

বিবাহিতা না অবিবাহিতা ?

বিবাহিতা নারীগণের কর্মসংস্থান সম্পর্কে নেদারল্যাণ্ডের কুশলতা নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠান একটি বিবরণী প্রকাশ করেছেন। এই সম্পর্কে প্রধান প্রধান ওলন্দাজ ও বৈদেশিক পুস্তকের একটি তালিকা এবং এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অনুসন্ধান, এই বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিবাহিতা নারীদের কাজে নিযুক্ত করে নিয়োগকারীগণ যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন সেই সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং এই শ্রেণীর কর্মীগণ সম্পর্কে কি নীতি অবলম্বন করা হয় তা জানার জন্যই এই অনুসন্ধান করা হয়। কাজের পরিবেশ, কি কি সর্তে বিবাহিতা নারীগণ কর্মে নিযুক্ত হন, এদের কর্মে অনুপস্থিতি এবং অবিবাহিতা নারীদের তুলনায় এঁরা কতখানি বেশী বা কম কাজ করেন ইত্যাদি বিষয়গুলিও এই অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নেদারল্যাণ্ডের কুশলতা নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত দাত শ কার্যের প্রত্যেকটিকে একটি করে প্রশ্নাবলী পাঠানো হয়। এই কার্যগুলির

শতকরা ৩৪ ভাগ প্রশ্নাবলীর উত্তর পাঠায় এবং সেগুলি, অনুসন্ধানের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। যে ২৩৮টি কার্য প্রশ্নাবলীর উত্তর পাঠিয়েছে, সেগুলিতে নিযুক্ত মোট কর্ম সংখ্যা হ'ল ২১৭,০০ এবং এঁদের মধ্যে নারী কর্মীর সংখ্যা হ'ল ৩৮,৩০৪ জন, তাঁদের মধ্যে আবার ৭,৮২০ জন নারী হলেন বিবাহিতা। প্রধানতঃ শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলিতেই এই অনুসন্ধান চালানো হয়। নেদারল্যাণ্ডে শতকরা ২০ জন বিবাহিতা নারী কর্মী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বাইরে কাজ করেন কাজেই এই অনুসন্ধানে তাঁরা অন্তর্ভুক্ত হন নি।

নেদারল্যাণ্ডের কুশলতা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অভিমত হ'ল এই যে, বিবাহিতা নারীগণ যদি বেশ কিছু দিন ধরে পূর্ণ সময়ের জন্য কাজ থাকেন তাহলেই তাঁদের কর্মী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি তাঁদের অনুসন্ধানের ফল বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন যে—যতজন বিবাহিতা নারী কর্মীকে প্রশ্ন করা হয় তাঁদের মধ্যে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ আংশিক সময়ের জন্য কাজ করেন। যে বিবাহিতা নারীগণের ছেলে মেয়েরা স্কুলে পড়াশুনা করে তাঁরা সাধারণতঃ আংশিক সময়ের জন্য কাজ করেন এবং এঁদের সংখ্যা, পূর্ণ সময়ের কর্মী তুলনায় দ্বিগুণ। বিবাহিতা নারীগণকে কর্মে নিযুক্ত করলে তাঁদের মধ্যে অনুপস্থিতির পরিমাণ বেশী হলেও তাঁদের কর্মকুশলতা অবিবাহিতা নারীদের তুলনায় কোন ক্রমেই কম নয়। নিয়োগকারীগণের মধ্যে শতকরা ২ জন বলেছেন যে বিবাহিতা নারী কর্মীগণের কাজ তাঁরা সন্তোষজনক বলেই মনে করেন। এঁদের দায়িত্ব জ্ঞান অধিকতর, এঁরা অনেক বেশী শৃঙ্খলা পরায়ণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কর্তব্য পরায়ণ এবং এঁরা অনেক বেশী নিয়মিতভাবে কাজ করেন। বিবাহিতা নারীগণ ঠিক কি ধরণের কাজের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত অথবা এঁদের কর্মে নিযুক্ত করা সম্পর্কে কি ধরণের দীর্ঘ মেয়াদী নীতি গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধেও এই বিবরণীতে কোন পরামর্শ দেওয়া হয় নি। কাজের সময়ের বিভিন্নতা সম্পর্কে প্রশ্নাবলীর উত্তরে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিবাহিতা নারীগণ আংশিক সময়ের জন্য কাজ করেন সেখানে কাজের সময় অর্ধেক করে, দুপুরবেলার ছুটি বাড়িয়ে, আগে ছুটি দিয়ে, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কাজের সময় স্থির করে, অর্ধেক ছুটির দিন ঠিক করে, ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া আসার অনুযায়ী বা বাড়ীর কাজের সময় অনুযায়ী ডিউটির সময় স্থির করে এবং সম্ভব হলে সকাল, দুপুর বা সন্ধ্যে বেলার কাজের সময় স্থির করে সমস্যার সমাধান করা হয়। তবে একেই হল্যাণ্ডের বিবাহিতা নারীগণের দ্বারা বলে এখনও দাবী করা যায় না।

এমন সব ছবির প্রদর্শনী কখনও দেখেছেন কি ?

পশ্চিম জার্মানীর একজন উঠতি শিল্পী আজকাল অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য সব বিষয়ে ছবি আঁকছে ও তুলছে ও সেসবে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। এই দলের একজন নামকরা শিল্পীর নাম গ্লোরিয়া মাইকেল নিউম্যানেস। তার আলোকচিত্রের তীব্র রসিকতা দর্শকমনে কশাঘাত করে। বর্তমানে একাধারে নিউইয়র্ক হামবুর্গ ও ইন্সব্রুকে তার আলোকচিত্রের প্রদর্শনী চলছে। তার ছবিগুলির নামকরণও অদ্ভুত যেমন 'তলোয়ারধারী মানবের হাতুড়ির মুখে একটি মেয়ে, নিজের মৃতদেহের ওপর হেঁটে-চলা মানুষ, ক্রন্দনরতা গাছের মধ্যে একটি নারীর মুখ, ইত্যাদি।

আপনার ঘর সাজাবেন ?

আজ য়ুরোপ থেকে শুরু ক'রে অ্যামেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া সর্বত্রই বেলিনের আলোকের ঘুড়ী সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ বাদামী কেশ ও সোনালী ডোরাকাটা গাউনে শোভিত এই ছোট্ট, সুন্দর, স্বাতন্ত্র পুতুলগুলি বেলিনের মহিলা শিল্পী মার্গা বের্নবুর্গ মার্ংজের একক সৃষ্টি। সারাবছর ধরে মোম দিয়ে তিনি এগুলি তৈরী করেন, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, কতকগুলি চতুরা, হাসিখুশী, কতকগুলি গম্ভীর ধ্যানমগ্না।

বড়দিনের সময় এইসব আলোকের ঘুড়ী দিয়ে ঘরসাজানো একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পীর গৃহে তখন আগমন হয় কত ক্রেতার। আলমারি ভর্তি এই পুতুলগুলিকে শিল্পী নিজে ক্রেতাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান।

ষোলবছর আগে শিল্পী তৈরী করেন তার প্রথম আলোকের ঘুড়ী। বড়দিনের সময় বেলিনে অবস্থিত ইংরেজ সৈন্যদের ঘর সাজাবার জন্যে তিনি পুটিং দিয়ে পুতুল গ'ড়ে রাংতা দিয়ে তাদের পোশাক পরিয়েছিলেন তখন।

ভাল করে ভেবে দেখুন তো
আমাদের সীমান্তেও এ ব্যবস্থা চলে কিনা !

পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিষ্ট কর্তৃপক্ষ গুপ্তচরবৃত্তিতে দিন দিন বেশ সেয়ানা হয়ে উঠছে। তাদের কৌশল হ'ল সীমান্তের যেখান যেখান দিয়ে লোকজন যাতায়াত করে, সেখানে সেখানে মাইক্রোফোন লুকিয়ে রাখা হয়েছে যাতে ঐসব জায়গায় বিদেশী পর্যটকদের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর লোকরা কি সব কথাবার্তা বলে তা রেকর্ড হয়ে যায়। পশ্চিম জার্মানীর শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা হঠাৎ এরকম গোটা-চারেক মাইক্রোফোন আবিষ্কার করেছে। জার্মানীর একটি বিশেষ পর্ব উপলক্ষ্যে ছুটিতে সীমান্তের এক জায়গায় বহু লোক জমা হয়েছিল। যাতে চোরাইমাল চালান না হয়, তা' দেখার জন্যে শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরাও সেখানে হাজির ছিল। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ে সন্দেহজনক বিজলীর তার; খুঁজতে খুঁজতে তারা পেয়ে যায় চারটে মাইক্রোফোন। এতে মনে হয় সীমান্তের অন্যান্য যাতায়াতের পথে এবং বেলিনের প্রাচীরের আশেপাশেও এরকম মাইক্রোফোন লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এভাবে শুধু যে পশ্চিম জার্মানদের সঙ্গে বিদেশী পর্যটকদের কথাবার্তা শুনে পরে প্রচারের কাজে লাগানো হবে তা' নয়, কম্যুনিষ্টদের নিজেদের যেসব সীমান্তরক্ষী আছে, তারাও যদি কড়া মানা সত্ত্বেও পশ্চিম জার্মানদের সঙ্গে আলাপ করে, তাহলে তাদেরও সেই অপরাধে ধ'রে সাজা দেওয়া যাবে।

দেখুন! কে বাঁচে কে মরে!
চলচ্চিত্র আর টেলিভিশন

একদিন এমন পরিস্থিতি হয়েছিল য়ুরোপে যে টেলিভিশনের চাপে চলচ্চিত্রশিল্পের নাভিশ্বাস উঠেছিল। কিন্তু বছর চারেক আগে এই দুই শত্রুর মধ্যে আপোষ হয় এবং এখন এরা য়ুরোপের অতি আধুনিক স্টুডিওতে একত্রে মিলেমিশে থাকে।

১৯৫৮-৫৯ সনে চলচ্চিত্রের মহা দুর্দিনের কথা আজ আর কারুর মনে নেই। বছরে তখন কুল্লে চারটে কি পাঁচটা ছবি তৈরী হচ্ছে। টেলিভিশন চিত্র প্রয়োজনার চাপে স্টুডিওতে তখন চলচ্চিত্র তোলার জায়গা নেই। সেই সময় ইুডিও মালিক সিউনা ট্রেবিটৎশ এগিয়ে এসে তাঁর ইুডিওকে এমনভাবে বাড়ালেন যাতে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র দুয়ের প্রয়োজন একই ইুডিওতে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে।

টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র যেভাবে ইুডিও তৈরী করলে একসঙ্গে কাজ করতে পারে, সেই ব্যবস্থাকে এখন বলা হয় "ট্রেবিটৎস্ সিষ্টেম"। এই পদ্ধতি আজ সর্বত্র স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়।

হামবুর্গ ইুডিওর সাজসরঞ্জাম আজ কোন অংশেই হলিউড ফিল্ম ইুডিওগুলির চেয়ে কম নয়। শুটিংয়ের জন্যে এখানে দশটি আলাদা ইুডিও আছে। এছাড়া গান, শব্দের সঙ্গে ছবির যোজনা, মহড়া দেবার জায়গা, কারখানা, আপিসবাড়ি সবই এই ইুডিওর মধ্যে বর্তমান। ইুডিও পরিচালনা, যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং সবকিছুর সুষম ব্যবহারের ওপর কড়া নজর রাখা হয়।

যেসব ছবি তোলার কাজ চলে অনেক আগে থাকতে সে সব ছবির সেটিং তৈরী হয় ও কখন কোথায় কি রকম আলো লাগবে তারও ছক তৈরী ক'রে রাখা হয়। আসল ছবি তোলার সময় আলো ফেলার জন্যে মাত্র চারজন লোক লাগে। ইুডিওর কোন ঘরে বসে হেড লাইটম্যান মাইক্রোফোনে নির্দেশ দেন ও সেইমত অপর একজন কয়েকটি চাবি টিপলেই ইুডিওর আলো প্রয়োজন মত বাড়ে কমে কিংবা নিভে যায়।

আগে থাকতে এসব ব্যবস্থা করে রাখায় একটি পুরো ছবি তুলতে শতকরা পঁচিশ ভাগ সময় বেঁচে যায়। "ইলেকট্রোনিক-সিম-সিষ্টেম" অনুসারে তিনটি সাধারণ ফিল্ম ক্যামেরায় একসঙ্গে দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। এইসব ক্যামেরার অতিরিক্ত ইলেকট্রোনিক ক্যামেরা লাগানো থাকে যেগুলি ইুডিওর টেলিভিশন পর্দায় ছবি পাঠায়। ঐখানেই ছবির পরিচালক বসে থাকেন এবং লাউডস্পীকার মারফৎ নির্দেশ দেন ও ক্যামেরাগুলি পরিচালনা করেন।

এই ইুডিওতে চারলক্ষ লিটার জল ধরে এরকম একটি আলাদা সুইমিং পুল আছে যেটি দরকার মত ফ্লোরের মধ্যে বসিয়ে জলের নিচের দৃশ্য তোলা হয়। কয়েকটি ছোট ছোট ফ্লোর একসঙ্গে ক'রে নিয়ে একটি বিরাট ফ্লোর সৃষ্টি করা যায়। একটি কেন্দ্রীয় শব্দ সরবরাহ কক্ষ থেকে যুগপৎ প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ইুডিওতে প্রয়োজনীয় নানারকম শব্দ যোগান হয়।

এছাড়া এই ইুডিওতে তরুণ শিক্ষার্থীদের অভিনয় শেখানো হয়। তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা প্রকৃত গুণী একমাত্র তারাই হামবুর্গ ইুডিওতে টেলিভিশন কিম্বা চলচ্চিত্র অভিনয়ের সুযোগ পায়।

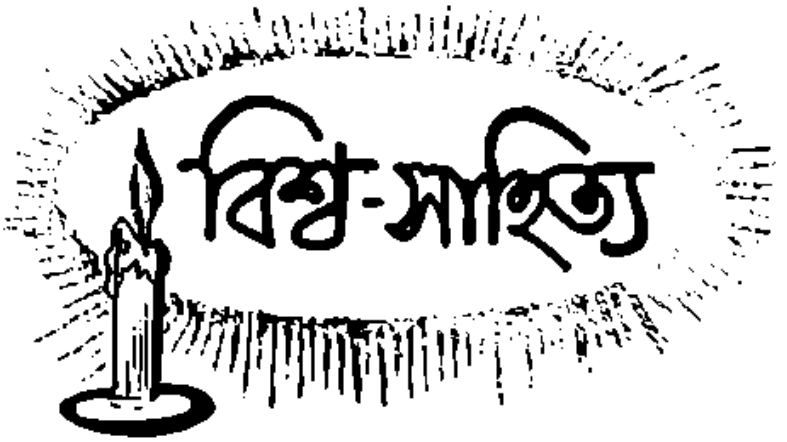

ঠাণ্ডা শরৎ

ইভান বুনিন

অনুবাদ : নীলিমা দে

সে বছর জুন মাসটা তিনি আমাদের সঙ্গে গ্রামে কাটিয়েছিলেন। তাকে আমরা পরিবারের একজন ব'লেই মনে করতুম। তার বাবা ছিলেন আমার বাবার প্রতিবেশী এবং বন্ধু। এখন অবশ্য আর তিনি বেঁচে নেই। পনেরোই জুন তারিখে যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড সেরাজেভোতে আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। ডাকঘর থেকে আমাদের বাড়িতে খবরের কাগজ এল ষোল তারিখে। মস্কোর সান্ধ্য বার্তাখানা হাতে নিয়ে বাবা পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি, মা এবং আমি তখনো চায়ের টেবিলটি ঘিরে বসেছিলুম।

"তা হলে যুদ্ধ! সেরাজেভোতে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ নিহত হ'য়েছেন। তার মানেই তো যুদ্ধ!"

সেই দিন আমাদের বাড়িতে অনেক অতিথি এসেছিল। বাবার জন্মদিনে। ভোজন-পর্ব সাঙ্গ হওয়ার পরে আমাদের বাগ্‌দানের কথা ঘোষণা করা হল। কিন্তু উনিশে জুলাই জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।...

সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এলেন। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা ছিলেন আমাদের বাড়ীতে। সীমান্তে যাবার আগে এসেছেন বিদায় নিতে (তখন সবাই ভেবেছিল যুদ্ধ বুঝি দিন ক'য়েকের ভেতরেই শেষ হ'য়ে যাবে, সেই জন্যই আমাদের বিয়েটা মুলতবী রাখা হ'য়েছিল বসন্তকাল পর্যন্ত)। এল বিদায়ের সন্ধ্যা। বাবা বাষ্প-স্নান জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন :

"এবার আগে থেকেই দারুণ শীত প'ড়ে গেল দেখছি।"

সন্ধ্যাটা আমরা কাটালুম প্রায় নীরবে। কেবল মাঝে মাঝে দু একটা মামুলী কথা হচ্ছিল। আমাদের মনের কথা, আবেগ যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় তার জন্য সেদিন আমরা সাধ্য মতো চেষ্টা করছিলুম। শীত সম্পর্কে বাবা দু একটা মন্তব্য করলেন। তোলানো বারান্দায় ছুটে গিয়ে দরজার কাচ আমি রুমাল দিয়ে মুছে দিলুম। বাগিচার ওপরকার রিক্ত আকাশে ঝিলমিল করছে যেন তুষারেরই ক'টি তারা। চোখে চশমা দিয়ে বাবা তামাক খাচ্ছেন। টেবিলের ওপর

খোলানো তার লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে আছেন অন্যমনস্ক চোখে। সেই আলোর নীচে ব'সে মা মনোযোগ দিয়ে একটা সিল্কের ছোট থলে সেলাই করছেন। কী জন্য তা আমরা জানি। সব কিছুর ভেতরেই যেন বিদায়ের সুর, বেদনার আভাস।

বাবা শুধালেন: "তা হলে তুমি সকালেই চ'লে যাবে, দুপুরে খেয়ে যেতে পারবেনা?"

তিনি বললেন: "যদি অনুমতি দেন। এখনো সব কিছু অগোছালো অবস্থায় প'ড়ে আছে।"

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: "তাই হবে, বাবা। আমাদের এবার তাহ'লে শুয়ে পড়া উচিত। সকালে যখন যাবে তখন তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হোক এই আমরা চাই।"...

মা দাঁড়িয়ে ভাবী জামাইয়ের গায়ে ক্রশ চিহ্ন এঁকে দিলেন। তিনি মা-বাবা দুজনকেই প্রণাম করলেন। এবার আমরা একা। খাবার ঘরে বেশ কিছু সময় কাটালুম। আমি প্যাসেন্স খেলার এক প্যাকেট তাস বের করলুম। তিনি নিঃশব্দে পায়চারী করতে লাগলেন ঘরের এক কোণ থেকে আরেক কোণে। তারপর বললেন:

"যদি তোমার আপত্তি না থাকে, চলো একটু বেড়িয়ে আসি।"

আমার বুক তখন কান্নায় আরো ভিজে উঠেছে। উদাস গলায় বললুম:

"বেশ..."

হল ঘর থেকে গায়ে একটা কোট চাপিয়ে নিলেন। কী যেন ভাবছেন। স্নিগ্ধ হাসি হেসে দু'ছত্র কবিতা আওড়ালেন:

"কী ভীষণ শীত, গায়ে জড়িয়ে নাও শাল, তোমার ফ্রোক..."

বললুম: "আমাদের তো ফ্রোক নেই। তারপর?"

"ভুলে গেছি। পরের পংক্তিগুলি এ রকম হবে:

"দেখো—অন্ধকার হ'য়ে আসা সাইন অরণ্যে ধীরে ধীরে বুঝি জেগে ওঠে অগ্নি-শিখা..."

"কী সেই আগুন?"

"চাঁদ উঠছে, তারই আভা, আর কি! পংক্তি ক'টির ভেতরে কেমন গ্রামের শরতের আমেজ রয়েছে: "গায়ে জড়িয়ে নাও শাল, তোমার ফ্রোক..." আমাদের ঠাকুরদা, ঠাকুরমায়েদের দিন... হায় ভগবান!"

"কী ব্যাপার?"

"কিছুই না। কেন যেন মন খারাপ লাগছে—তবে ভালোও লাগছে। তোমাকে যে আমি ভালোবাসি, বড্ড..."

খাবার ঘরের ভিতর দিয়ে খোলানো বারান্দায়, পরে বাগানে হাজির হলুম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার আমার হাত ধ'রে রইলুম। কালো ডাল-পালার ভেতর দিয়ে ক্রমশ আকাশের ফাঁসা আলো দেখা গেল। সেই আকাশে ছড়ানো, যেন ধাতুর তৈরী ঝিলমিল তারা। তিনি দাঁড়িয়ে প'ড়ে বাড়িটার দিকে তাকালেন:

"দেখেছ, জানালাগুলোতে কেমন আলো জ্বলছে। ঠিক যেন শরৎ। যতদিন পৃথিবীতে থাকবো, এই সন্ধ্যাটির কথা কখনো ভুলতে পারবো না..."

আমিও ফিরে তাকালুম। আমার গায়ে সুইস ওভারকোট, তা সত্ত্বেও আমাকে আলিঙ্গন

করলেন। আমার মুখ থেকে রুমালটা সরিয়ে নিলুম, এক পাশে সুইয়ে রাখলুম মুখ। চুমো খেতে তার অসুবিধা যাতে না হয়। চুমো দিয়ে তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন :

"তোমার চোখগুলো কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ঠাণ্ডা লাগছে না তো? হাওয়াটা বড্ড কনকনে। যদি শত্রুরা আমাকে মেরেই ফেলে, তখন কি তুমি আমাকে একেবারে ভুলে যাবে?"

ভাবলুম : "সত্যি যদি শত্রুরা তাকে মেরে ফেলে? তাকে কেমন ক'রে ভুলে যাবো? সে কি সম্ভব?" ও কথা ভেবে নিজেরই ভয় হল। তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম :

"ও রকম কথা বোলো না! তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না!"

তিনি একটু সময় চুপ ক'রে থেকে বললেন : "যদি, ওরা আমাকে মেরেই ফেলে, আমি ওপারে গিয়েও তোমার জন্ত অপেক্ষা করবো। তুমি বেঁচে থেকো, পৃথিবীর সব আনন্দ উপভোগ কোরো, তারপর এসো আমার কাছে।"

আমি অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লুম···পরদিন ভোরেই তিনি চ'লে গেলেন। মা তার গলায় বেঁধে দিলেন রেশমের সেই ছোট থলেটা। কাল সন্ধ্যায় ওটাই তিনি সেলাই করছিলেন। থলেটার ভেতর পুরে দিলেন সোনালি রঙের ছোট একটা মূর্তি। আমার মাতামহ এবং প্রপিতামহও যুদ্ধে যাবার সময় ওই মূর্তিটা গলায় ধারণ করেছিলেন। তার জন্ত কেমন এক আশংকা বোধ করছিলুম সবাই। তার গায়ে আমরা এঁকে দিলুম ক্রশ চিহ্ন। বহুদিনের জন্ত কাউকে বিদায় দেবার সময় যে রকম হয় তেমনি অসাড় মনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখছিলুম তার চ'লে-যাওয়া। রোদে ঝলমল করছে সকাল, চারিদিকের ঘাসে ঝিকিমিকি শিশির। তবু মনের সঙ্গে সব কিছুর কেমন গরমিল। কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফিরে এলুম বাড়িতে। যে বাড়ি থেকে তিনি এই মাত্র চলে গেছেন। হাত দু'খানা পেছনে রেখে হেঁটে বেড়ালুম ঘরগুলির ভেতর দিয়ে। বুঝতে পারছিলুম না কী করবো। কাঁদবো, না গলা ছেড়ে গান গাইবো···

তিনি নিহত হলেন—কী আশ্চর্য লাগছে কথাটা! এক মাসের ভেতরে। তারপর তিরিশ বছর কেটে গেছে। সব মানুষ, সব খুঁটিনাটি, যার কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যায় না, যাকে আমরা এক কথায় বলি অতীত, তা মনে করলে, একটু মন দিয়ে ভাবলেই বোঝা যায় কত না সময় কেটে গেছে। ১৯১৮ সালে মা আর বাবা দু'জনেই মারা গেলেন। আমি তখন থাকি মস্কোর একটা একতলা বাড়িতে। বাড়ির মালিক এক ব্যবসায়ী মহিলা প্রায়ই আমাকে ঠাট্টা ক'রে বলত :

"কী গো ঠাকরুন, তোমার ব্যবসা-পত্তর কেমন চলছে?"

আমিও তখন ব্যবসা করতুম। তখনকার অনেক মেয়েদের মতো আমিও সৈন্তদের কাছে বিক্রি করতুম পশমের টুপি আর বোতাম-ছাড়া ওভারকোট। আমার যা ছিল তা থেকে কিছু কিছু জিনিস—অদ্ভুত আংটি, ছোট্ট ক্রশ, পোকায় কাটা পশমের কলার। অ্যারবাট বাজারের এক কোণে ব'সে একদিন ওই সব জিনিস বিক্রি করছিলুম, সেই সময়ে একজন অসাধারণ মানুষের দেখা পেলুম। উদারচেতা। মধ্য বয়সী। প্রাক্তন অফিসার। ক'য়েকদিন প'রে তাকে বিয়ে করলুম। এপ্রিল মাসে আমরা চ'লে গেলুম একাটেরিনোডার-এ। যেতে লাগল দু' হপ্তা। স্বামীর ভাগনেও ছিল আমাদের সঙ্গে। ওর বয়েস বছর সতেরো হবে। ও চাচ্ছিল স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগ দিতে। আমার পোশাকটা ছিল কৃষক মেয়েদের মতো। তার ওপরেও কসাক কৃষকদের কোট। স্বামীর কালো

হাড়ি একটু একটু দেখে উঠেছে। আমার দু' বছর কাটালুম কুবান আর ডন দেখে। শীতের সময় প্রচণ্ড বাতাসের ভেতর আমরা জাহাজে ক'রে গেলুম নভোরোসিয়স্ক থেকে তুরস্কের দিকে। একদল উদ্বাস্তুর সঙ্গে। সমুদ্রে বেড়াবার সময় আমার স্বামী টাইফাস রোগে মারা গেলেন। এর পরে সারা দুনিয়ায় আমার আত্মীয় বলতে রইল মাত্র তিন জন। আমার স্বামীর ভাগনে, ভাগনের নতুন বৌ, আর তাদের সাত বছরের মেয়েটি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভাগনেটি সস্ত্রীক চ'লে গেল সাগর পাড়ি দিয়ে ক্রিমিয়ার দিকে। সেনাবাহিনীর কাজে যোগ দিতে। মেয়েটিকে আমার হেফাজতে রেখে। সেই যে তারা গেল, আর ফিরল না। আর কোনো খবরও পাওয়া গেল না। আমি বেশ কিছু দিন কাটালুম কনস্টান্টিনোপলে। হাড়ভাঙা খাটুনির পর যা পেতুম তাতে আমার আর বাচ্চা মেয়েটার কায়ক্লেশে দিন চ'লে যেত। পরে, অনেকের মতো, আমিও ঘুরে বেড়ালুম নানা জায়গায়। বুলগারিয়া, সার্বিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বেলজিয়ম, প্যারিস, নিস···মেয়েটি বড় হল, প্যারিসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল। সে হ'য়ে উঠল খাঁটি ফরাসী মেয়ে। সুন্দরী। তবে আমার সম্পর্কে পুরোপুরি নির্লিপ্ত। কাজ নিল চকোলেটের দোকানে। চকচকে পালিশ করা নখ। মসৃণ হাত। সেই হাতে সে ছোট ছোট বাক্সে সাটিন কাগজ লাগাত, তার ওপর আবার জড়াত সোনালী সুতো। আমি ঈশ্বরের ওপর ভরসা রেখে র'য়ে গেলুম নিস-এ। এখনো আছি সেখানেই। প্রথম ওখানে গিয়েছিলুম ১৯১২ সালে। আমার জীবনে তখন পৃথিবী!

তার মৃত্যুর পরেও তাহলে আমি বেঁচে আছি! অথচ এক সময়ে বলেছিলুম তাকে ছাড়া আমি বাঁচবোনা। কিন্তু যে ঘটনা-প্রবাহের মাঝখান দিয়ে আমি এসেছি তার কথা যখন মনে করি, তখন নিজেকে শুধাই, সত্যি জীবনে কী এল? নিজের মন থেকেই উত্তর আসে, শুধু শরতের এক সন্ধ্যা। সেই সন্ধ্যা পৃথিবীতে কি একদিন এসেছিল? সত্যি এসেছিল। আমার জীবনে ওই একটি মাত্র ঘটনাই ঘটেছে। বাকি সবই অবাস্তব স্বপ্ন।

তবু আমি বিশ্বাস করি, আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি, কোথাও তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন—সেই সন্ধ্যার মতোই ভালোবাসা আর নতুন দৃষ্টি নিয়ে। "তুমি বেঁচে থেকো, পৃথিবীর সব আনন্দ ভোগ কোরো, তারপর এসো আমার কাছে···" আমি বেঁচেছিলুম, আনন্দও উপভোগ করেছি, এবার একদিন চ'লে যাবো তার কাছে।

সাহিত্য সংবাদ

ইংরেজী সাহিত্য সম্পর্কে যাদের সামান্য পরিচয়ও আছে, তাদের প্রায় সবার কাছেই নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক হেনরী ফিল্ডিং সুপরিচিত। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট হেনরী ফিল্ডিং—এর কীর্তি-কাহিনী বোধ হয় অনেকেরই জানা নেই। ১৭৪৮ সালে তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টার-এর ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তখন তাঁর কর্ম-কেন্দ্র ছিল বো ষ্ট্রীট। তখনকার দিনে ইংল্যাণ্ডের ম্যাজিস্ট্রেটরা কোনো রকম ষ্টাইপেণ্ডই পেতেন না। কেবল তারা ক'রেক রকম ফি পেতেন। কর্তৃপক্ষ আশা করতেন এর অতিরিক্ত টাকার দরকার হ'লে ম্যাজিস্ট্রেটরা ঘুষ নেবেন। ফিল্ডিং যখন ওই কাজ নিলেন তখন একজন ম্যাজিস্ট্রেটের আইন মাফিক বছরের আয় ছিল মাত্র ২০০ পাউণ্ড। বলা বাহুল্য, ফিল্ডিং এক পয়সাও ঘুষ নেননি। ফলে তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। পরে অবশ্য সরকার একটা নির্দিষ্ট বেতন দেবার ব্যবস্থা করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার পরের মুহূর্ত থেকেই অপরাধ, দুর্নীতি, আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে হেনরী ফিল্ডিং শুরু করলেন এক আপসহীন সংগ্রাম। সেই সময়ে লণ্ডনের মতো দুর্নীতির কেন্দ্র সমস্ত পৃথিবীতেই খুব কম ছিল। রক্ষকই ছিল ভক্ষক। মানে চোর ধরার দায়িত্ব যাদের হাতে ছিল তারা নিজেরাই নানা রকম অপকর্মে লিপ্ত থাকত।

ফিল্ডিং এক অভিনব উপায় অবলম্বন করলেন। তিনি সর্বসাধারণকে জানালেন যে, এখন থেকে বাড়িতে চুরি হলে তারা যেন চোরের (যদি চোর চূড়ামণির দেখা মেলে) চেহারা, যে সব জিনিস হারিয়েছে বা চুরি গেছে তার খুঁটি-নাটি বিবরণ, কোন জায়গা থেকে এবং কখন খোয়া গেছে—সব বিষয় লিখিত ভাবে তাঁর অফিসে এসে জানিয়ে যায়। খবরের কাগজে যখন ফিল্ডিং-এর এই বিজ্ঞপ্তি বেরুল, তখন সত্যি-সত্যি বহু লোক 'এজাহার' দিয়ে যেতে লাগল। ইংল্যাণ্ডে তখন থেকে এই প্রথা চালু হল।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার-এর শান্তি রক্ষার জন্য যে আটজন কনষ্টেবল ছিল তারা তখনকার দিনের অন্যান্য কনষ্টেবলদের মতোই নীতি বা বিবেকের ধার ধারত না। ফিল্ডিং-এর সহকারী ওয়েলব ছিলেন তাঁর মতোই সৎ। তিনি ছ'জন কনষ্টেবলকে মনের মতো ক'রে শিক্ষিত ক'রে তুললেন। তখনো অবশ্য এদের নিয়মিত বেতন দেবার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। তবে আইন ঘটিত জটিল পরিস্থিতিতে তাদের সাহায্য করতেন আইনজ্ঞ ফিল্ডিং। ছ'জন কনষ্টেবলের এই দলটিকে বলা যায় লণ্ডন পুলিশ বাহিনীর সূচনা।

———

পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়

নীলাদ্রি সোম

ব্রিটিশ-রাজের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠেছে দিকে দিকে। ভারতের অগণন শহরে। অসংখ্য গ্রামে।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন এসেছে ভারতে। ভারতবাসীর উত্তেজনা যদি প্রশমিত করা যায়। কিন্তু সে আশা বৃথা। যেখানেই যাচ্ছে ওই কমিশন, সেখানেই তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে কালো পতাকা। অপমানে আর ক্রোধে আরো অস্থির হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

সাইমন কমিশন এল পঞ্জাবেও। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের রক্ত বুঝি তখনো শুকিয়ে যায়নি সে দেশের মাটি থেকে।

পঞ্জাবের বিদ্রোহী আত্মা কী ক'রে মেনে নেবে সাইমন কমিশনের রাজাবাজী।

কমিশন যতই কাছে আসছে, পঞ্জাববাসী ততই তীব্র ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে, এ কমিশন তারা চায়না।

লাহোরের একদল কংগ্রেস-কর্মী বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। এদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এক তেজস্বী নেতা। যেন মূর্তিমান দুঃসাহস।

এই বিক্ষোভ বিদেশী সরকারের কাছে অসহ্য। শুরু হ'য়ে গেল কর্মীদের ওপর হামলা। একজন তরুণ ইংরেজ অফিসার বেয়োনেটের আঘাত হানল বীর নেতার বুকে। রক্তাক্ত দেহে তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

এই আঘাতের ফলে কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হল। কিন্তু মৃত্যুর আগে দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা ক'রে গেলেন: "Every blow hurled at me is a nail driven in the coffin of the British empire."

এই দুঃসাহসী নেতা পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়। তিনি প্রস্তুত হয়েছেন শুনে সেদিন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ। এক চোখে অশ্রু, আরেক চোখে আগুন নিয়ে বিদেশী সরকারের সঙ্গে নতুন ক'রে মোকাবিলার জন্য তৈরী হয়েছিল সেদিন ভারতবাসী।

লালা লাজপৎ রায় নিজেই একটি নাম। দেশকে অনেকেই ভালোবাসেন, কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা ক'জন? লালা লাজপৎ সেই বিরল মানুষদের একজন।

জন্ম ১৮৬৫ সালের ২৮শে জানুয়ারী। বাবা ছিলেন একজন সাধারণ শিক্ষক, কিন্তু লালা লাজপৎ তাঁর কাছ থেকে পেলেন অসাধারণ উত্তরাধিকার। দেশপ্রেমের উত্তরাধিকার। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ধর্মীয় আর সামাজিক ধ্যান-ধারণা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আর্য সমাজ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সমাজ সংস্কার, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি জনহিতৈষী কাজে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিলেন।

জীবিকার প্রয়োজনে আইন ব্যবসায়ে ব্যস্ত। মন তবু দেশসেবার কাজে। অন্তর দেশ-প্রেমের প্রথম আত্মপ্রকাশ সাহিত্যের ক্ষেত্র দিয়ে। উর্দু ভাষায় রচনা করলেন তিনি ম্যাৎসিনি ও

গ্যারিবল্ডীর জীবনী। দু' খানি বইই বিশেষ সমাদর পেল। ইতালীর এই দুই জননায়ক ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছেও ছিলেন আদর্শ মানুষ। লালা লাজপৎ, শিবাজী এবং শ্রীকৃষ্ণের জীবনীও রচনা করেছিলেন। সাংবাদিক হওয়ার বাসনা জেগেছিল তরুণ বয়স থেকেই।

পঞ্জাবের দুর্ভিক্ষ তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল। এ-দেশে তখন প্রায় প্রতি দশ বছর পর পরই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। পঞ্জাবের দুর্ভিক্ষ স্বচক্ষে দেখে লালা লাজপৎ ভারতবাসীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হলেন। এই সব দুর্ভিক্ষের সময় খ্রীষ্টানমিশনারীরা অবশ্য দুর্গতদের সাহায্য করার কিছু কিছু চেষ্টা করতেন। কিন্তু সে সাহায্য তাঁরা দিতেন নিজেদের আশ্রমে অনাথদের সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়াতে। ১৮৯৭ সালে লালা লাজপৎ আর্যসমাজের পক্ষ থেকে একটা আশ্রম খুললেন। ভারতবাসীর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিদেশী মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের চেষ্টা আংশিকভাবে রোধ করার ব্যবস্থা হল। ১৮৯৯—১৯০০ সালে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবায় লেগে গেলেন অকাতর দেহ-মন নিয়ে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সেবা-কেন্দ্র স্থাপিত হল। বিভিন্ন প্রদেশের কর্মীরা পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লেগে গেলেন কাজে। সমস্ত বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যে মূলত এক এবং অভিন্ন, সংকটের মধ্য দিয়ে তা যেন সেদিন উপলব্ধি করা গিয়েছিল। ১৯০৫ সালে কাংগ্রাতে ভূমিকম্প-পীড়িতদের সেবায় একই অপ্রান্ত উদ্যমের পরিচয় দিলেন লালা লাজপৎ। সমাজ সেবায় তাঁর বিপুল আগ্রহ চোখের সামনে স্পষ্ট হল।

ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নিষ্ঠুর ঔদাসিন্য লালা লাজপতের মনে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার করল। 'দি পঞ্জাবী' নামে একটি সংবাদপত্রে সরকারের কড়া সমালোচনা লিখলেন। সংবাদ পত্রের মালিক আর সম্পাদককে সরকার অভিযুক্ত করল। লালা লাজপতের অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে সেনা-বাহিনীতে নতুন সৈন্য নিয়োগ কঠিন হ'য়ে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি রূপে লালা লাজপৎ এবং গোখেলকে ইংল্যাণ্ডে পাঠান হল। ভারতের রাজনৈতিক অসন্তোষ কেন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তা ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষদের বুঝিয়ে বলার জন্যই তাঁদের পাঠানো হয়েছিল। তাদের গরম-গরম বক্তৃতা সরকারের মোটেই ভালো লাগেনি। লাজপৎ প্রথম থেকেই ছিলেন চরমপন্থী। কিন্তু তাঁর তুলনায় যে গোখেল নরমপন্থী তিনিও সরকারের বিরাগভাজন হলেন। তখন সেক্রেটারী অব ষ্টেট লর্ড মর্লি আর ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর মধ্যে যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয় তাতে, এমনকি গোখেলের বিরুদ্ধেও অনেক ক্ষুব্ধ মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৫ সালে লাজপৎ রায় যখন ভারতবর্ষে ফিরে এলেন তখন লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগের ফলে বাংলাদেশে তীব্র আন্দোলন চলেছে।

ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে বঙ্গ-বিভাগ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ' বইয়ে নিজেই লিখে গেছেন: "যাকে আমরা সত্যিকারের আন্দোলন বলি তার সূত্রপাত ১৯০৫ সালে, বঙ্গ-বিভাগের পরে। এইজন্য আমাদের লর্ড কার্জনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।..... ওই বিভাগের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শক্তি যে আঘাত পেয়েছিল আর কোনো কিছুর মধ্য দিয়েই তা সে পায়নি। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলনের সঙ্গে একমাত্র স্বরাজ আন্দোলনের তুলনা হতে পারে।" আগেকার কংগ্রেসী নেতাদের নীতি ছিল আবেদন-নিবেদনের। কিন্তু ১৯০৫ সাল থেকে শুরু হল বৈপ্লবিক আন্দোলন। বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলার নেতারা শুরু করলেন বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন।

১৯০৫ সালে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে লালা লাজপৎ বাংলার দাবী সমর্থন ক'রে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের স্বপক্ষে মত জ্ঞাপন করলেন। তিনি বললেন: "আমরা—বারা প্রজা—আমাদের সামনে সংগ্রাম ছাড়া আর কোনো পথ নেই।" লালা লাজপতের চোখে স্বদেশী আন্দোলন আর সংগ্রাম ছিল এক এবং অভিন্ন। বাংলায় যে আন্দোলন শুরু হল কিছুদিনের মধ্যেই তার তরঙ্গ বিস্তৃত হল ভারতের অন্যান্য প্রদেশে।

তখনকার দিনের দু'জন লোকমান্য নেতা তিলক এবং লালা লাজপৎ সর্বান্তকরণে বাংলার আন্দোলন এবং দাবীকে সমর্থন জানালেন। ক্রমে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলও চঞ্চল, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল। ১৯০৭ সালে ক্যানাল কলোনাইজেসন বিলটিকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র পঞ্জাব অশান্ত হ'য়ে উঠল। এই বিলের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গ'ড়ে ওঠে তার অন্যতম নেতা ছিলেন লালা লাজপৎ। সরকারের প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্য নষ্ট ক'রে দিচ্ছেন—লালা লাজপতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠল। তাঁকে এবং অজিত সিংহকে গ্রেপ্তার করা হল। ১৯১৮ সালে তাঁকে নির্বাসিত করা হল মান্দালয়ে। অবশ্য ছ'মাস পরেই তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। সেক্রেটারী অব স্টেট লর্ড মর্লির সঙ্গে কোনো রকম পরামর্শ না করেই বড়লাট মিণ্টো তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। এতে লর্ড মর্লি অসন্তুষ্ট হন। পরে মিণ্টো, লালা লাজপৎ রায় এবং অশ্বিনী কুমার দত্ত সম্পর্কে মত পরিবর্তন করেন। তিনি চিঠিতে মর্লিকে লিখেছিলেন: "ভাবধারার দিক থেকে বোধহয় এঁরা দুজনেই বিপ্লবী, তবে নিজেদের আদর্শের কাছে এঁরা সৎ, দুজনেই যুক্তি মেনে নিতে রাজী।"

লালা লাজপৎ যখন মুক্তি পেলেন তখন সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল, যে ত্রয়ী বাল-লাল-পাল নামে বিখ্যাত, তাঁদের অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটল সুরাট কংগ্রেসে, এই কংগ্রেসেই নরমপন্থী আর চরমপন্থীদের মধ্যে মতের ব্যবধান সর্বপ্রথম স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। কংগ্রেসের নেতৃত্ব নরমপন্থীদের হাতে চ'লে যায়। সরকার কঠোর দমননীতি চালাতে শুরু করে। নরমপন্থীদের তুষ্ট করার জন্য মর্লি কিছু সংস্কারের প্রস্তাব করেন। কিন্তু মিণ্টো বলেন যে, তার আগে কিছু দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। তিনি বললেন: "ওষুধ আগে আমাদের দিতেই হবে, তারপর আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো সেই ওষুধের তেতো স্বাদ ভোলাবার জন্য।" এই সময়েই সরকার-বিরোধী-সভা-নিবারণী আইন, সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ আইন ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল আইনগুলি পাশ করা হয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এই পর্বে যেন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে আসে। সমস্ত চরমপন্থী নেতারাই এই সময়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে স'রে যান। অরবিন্দ সন্ন্যাস-জীবনে, বিপিনচন্দ্র পাল য়ুরোপে, তিলক মান্দালয়ের জেলে ছ' বছরের জন্য কারারুদ্ধ। অশ্বিনীকুমার দত্ত, ভামসুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধ মল্লিক প্রমুখ বাংলার চরমপন্থী নেতারা সরকারের নজরবন্দী। কংগ্রেসে নরমপন্থীদের একচেটিয়া আধিপত্য। ১৯১৪ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। এই সময়ে লালা লাজপতও চলে গেলেন আমেরিকায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এসে তাঁর পরিচয় হল লালা হরদয়ালের পরিচালিত গদর দল আর তারকনাথ দাস, সুরেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে। এঁরা সবাই ছিলেন 'যুগান্তর' দলের নেতা। ঘনিষ্ঠতা থাকলেও এঁদের সঙ্গে অনেক ব্যাপারেই তিনি একমত হতে

পারেননি। ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মানী থেকে অস্ত্র আমদানী ক'রে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করছিলেন। জাপান আর গ্রেট ব্রিটেনেও কিছুদিন ছিলেন পঞ্জাবের অশান্ত নেতা।

লালা লাজপৎ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মোট ছ' বছর ছিলেন। আপ্রাণ চেষ্টা করেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভারতবাসীদের স্বপক্ষে দৃঢ় জনমত গ'ড়ে তুলতে। এই প্রচেষ্টা ব্রিটিশ সরকারের চোখে স্বাভাবিক ভাবেই আপত্তিকর মনে হয়। একটি সাপ্তাহিকীতে লালাজী লিখেছিলেন: "ভারতে এক সামগ্রিক জাগরণ দেখা দিয়েছে, জন্ম হয়েছে একটি জাতীয় দলের—নিজেদের সরকার নিজেরাই চালাবার ক্ষমতা তারা রাখে—ভারতবাসী এই প্রমাণ দিয়েছে।"

লালা লাজপৎ আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে এলেন ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের দশ মাস পর। স্বাধীনতা সংগ্রাম আবার তখন তীব্র হয়ে উঠেছে। ফুঁসে উঠেছে জন-সমুদ্র। আবির্ভূত হয়েছেন নতুন নতুন নেতা। জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং অন্যান্য নেতারা ক্রমশ খ্যাতি অর্জন করছেন। পুরোনো নেতারা ক্রমশ লোকচক্ষু থেকে স'রে যাচ্ছেন। এমন কি লোকমান্য তিলকেরও আর আগেকার মতো প্রভাব নেই। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত অসহযোগ গ্রহণ করা হবে কি না তাই নিয়ে দেশে তুমুল বাক্-বিতণ্ডা চলেছে।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। সভাপতি হলেন লালাজী। এই সময়ে তাঁর জীবনে ঘনিয়ে আসে এক সংকট-পর্ব। কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হবে এমন সময় মারা গেলেন লোকমান্য তিলক। মদনমোহন মালব্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার নেতা অ্যানি বেশান্ত, যাঁকে লালা লাজপৎ খুব ভালো ক'রেই জানতেন সেই বিপিনচন্দ্র পাল—এঁরা মহাত্মা-গান্ধীর কর্ম-সূচীর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। যখন কংগ্রেস গান্ধীজীকে প্রধান নেতা ব'লে বরণ করে নিল তখন অবশ্য প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরোধিতা তিনি করেননি। তবে সম্মতি বোধ করছিলেন না। তথাপি কংগ্রেসের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অকম্পিত। জীবনের এই পর্বে তাঁর অন্যতম কীর্তি 'দি সার্ভেন্টস অব দি পিপল সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন স্থাপন। জাতীয় শিক্ষার প্রসার এবং সাংবাদিকতার দিকেও ঝুঁকে পড়লেন। উর্দু ভাষায় 'বন্দে মাতরম' নামে একখানা খবরের কাগজ আর ইংরেজী ভাষায় 'পিপল' নামে একখানা জার্নাল প্রকাশনা শুরু করলেন। উর্দু, ইংরেজী, আর হিন্দী এই তিনটি ভাষাতেই তাঁর কলম সমানে চলত। সাধারণ মানুষের সামাজিক কল্যাণের কথা ভেবে স্থাপন করেছিলেন 'দি সার্ভেন্টস অব দি পিপল সোসাইটি'। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য জাতি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। অন্যান্য সংগ্রামীর চোখে নিয়ত ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। স্বরাজ অর্জনের পর কী ভাবে দেশকে গড়তে হবে সে বিষয়েও তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। কোটি কোটি ভারতবাসীর দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করার কথা তিনি ভেবেছিলেন। অবশ্য এই অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরী দাদাভাই নৌরজী। লালা লাজপৎকে বলা হ'য়েছে ভারতের প্রথম সোসালিস্ট। পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত না হ'লে কী ক্ষতি হতে পারে এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন।

তরুণের শক্তিতে গভীর আস্থা ছিল লালাজীর। বিশ্বাস করতেন ভারতবাসীরা নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারবে। ম্যাৎসিনিও তো এ কথাই ভেবেছিলেন। লাজপৎ বললেন: "হে ভারতের তরুণ সমাজ, তোমাদের মাতৃভূমি আজ পদদলিত; তোমাদের

আত্মবিশ্বাস নেই ব'লে, দেশবাসী আর দেশের ওপর শ্রদ্ধা নেই ব'লে,···মনকে উন্নত কর, আত্মবিশ্বাস আর আত্ম-নির্ভরতার বৈদ্যুতিক শক্তিতে উদ্দীপিত হও···আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে, যারা জমি চাষ করে এবং আমাদের খাবার জোগায়, যারা দু'বেলা পেট ভরেও খেতে পায় না, তাদের মধ্যে এমন ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবে যা পৃথিবীর আর কোনো দেশের মানুষের মধ্যে নেই।"

হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে লালা লাজপতের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত না হলে ভারতের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হতে পারেনা। তবে কংগ্রেসের মুসলিম তোষণ-নীতির বিরোধী ছিলেন তিনি।

নিজে রাজনীতিক হয়েও রাজনীতিকে তিনি শেষ কথা ব'লে মনে করতেন না।

মানুষ হিসেবে তাঁর চরিত্র ছিল নিষ্কলঙ্ক। আত্মত্যাগ আর দুঃখ বরণে তাঁর সমকক্ষ নেতা সেকালে ছিল না। উনিশ শতকের শেষ ভাগে আর বিশ শতকের গোড়ার দিকে যে সব মহাপুরুষ ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস নিজেদের ত্যাগ ও তপস্যায় আলোকিত ক'রে গেছেন লালা লাজপৎ রায় তাঁদের একজন।

সেই মহান নেতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করি।

* * * *

জার্মানী থেকে চলে যাবার সময়ে জাহাজে আইনষ্টাইনকে সহযাত্রীরা পাগল বলেই ভেবেছিল।

মাথার ঝাঁকড়া চুল, পোষাক-পরিচ্ছদ আলু-থালু, আর প্রায় সব সময়ই বেহালা নিয়ে জাহাজের ডেকের পাশে বসে আছেন।

কথাটা ক্যাপ্টেনের কানে গেল। তিনি আইনষ্টাইনের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

—জাহাজের ডেকে পাগলামি করেন কেন? জানেন, এখনি আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারি। আপনার নামটি কি?

—আইনষ্টাইন!

—বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন?—তাহলে—আপনাকে এবার ডেক থেকে সরতে হবে।

—কোথায়?

—জাহাজের সবচেয়ে ভাল ঘরে।

ব্যাপার যা চলছে

সর্বের মধ্যেই ভূত! অতএব কোন রোজার সাধ্য নেই সেই ভূত ছাড়ায়। আপনি আয়কর ফাঁকি দিচ্ছেন কিনা তার ঠিক নেই, কিন্তু ভাগ্য যদি আপনার অপ্রসন্ন হয় তাহলে আয়কর অফিসারের হাতে আপনার নিগ্রহের অন্ত থাকবে না। বহু দৃষ্টান্ত এমনতর পাওয়া গেছে। এদিকে সাম্প্রতিকতম সংবাদে প্রকাশ, সেই আয়কর অফিসারই শুধু আয়কর ফাঁকি দিচ্ছেন না, রীতিমতো কালো টাকার পাহাড় বানাচ্ছেন নিজের বাড়ীর গুপ্ত গহ্বরে। কেন্দ্রীয় তদন্ত বুরো সম্প্রতি এমনি এক অফিসারের বাড়ী থেকে নগদে এবং অলঙ্কারে প্রায় দশ লক্ষ টাকা পেয়েছে। মাইনে তো ৩৭৫ টাকা, ভাতা ইত্যাদি নিয়ে সর্বসাকুল্যে আয় ৫০০ টাকার বেশি নয়, পৈতৃক সম্পত্তি গাঁয়ের ভিতরে আধখানা পোড়োবাড়ি আর দু'টা আমবাগান, তিনটে পুকুর, বিঘে খানেক জমি! এই তো রাজ্যপাট! এদিকে নয়াদিল্লীর বইস হিসেবে তাঁর খরচ তো মাসে ৫০০-র বেশি! অতএব এত টাকা তাঁর ঘরে আসে কোথা থেকে! সরকারী কর্মচারীর হোয়ে সরকার এর জবাব দিন!

• • • •

দেখে শুনে প্রজাতন্ত্রী ভারতের গণতান্ত্রিক (?) শাসন কাঠামোর ওপর ঘেন্না ধরে গেল!

কেরলের নির্বাচনে দেশের মানুষের সেই আক্রোশ বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে। ভোটের বাক্সে নানারকম মন্তব্য সম্বলিত কাগজ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি কাগজে লেখা আছে—

"সব কটি রাজনৈতিক দলই ভেঙে দেওয়া উচিত। সমস্ত রাজনৈতিক নেতার ফাঁসি হওয়া উচিত জেলে। রাজতন্ত্রই ফিরে আসুক। তবেই ভারতের জনগণ সমৃদ্ধির আশা করতে পারে।"

• • • •

বেশী বয়সে বিয়ে করাটা এখন কিছু আশ্চর্য বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়! প্রায়শই সে রকম দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে আশী বছর পার হবার পর বিয়ে! মানুষের পূর্ণ পরমায়ু হল আশী। সেই পরমায়ুর কোঠা পার হয়ে উধাও! একজন খ্যাতনামা মানুষের সম্বন্ধে যখন এই কথাটা শোনা গেল তখন তা একটি "খবরে" পরিণত হল এক মুহূর্তে। কম্পটন ম্যাকেনজি জনপ্রিয় ও বিখ্যাত লেখক। তাঁর বহু বই আমরা পড়েছি। তিনি নাইট খেতাব পেয়েছেন। বয়স তাঁর বিরাশী। সাম্প্রতিক খবর, সার কম্পটন ম্যাকেনজি বিবাহ করেছেন মিস সিলিয়াস ব্যাকহুইন-কে। বরের বয়স বিরাশী। কনের বয়স ছেচল্লিশ। বর তৃতীয় পক্ষ! কনের এই প্রথম!

ভাবতে আশ্চর্য লাগছে। দু'জনেই শুধু বিগতযৌবন নয়, বিগত যৌনজীবন। জৈব আকাঙ্ক্ষার পরিমণ্ডল পার হয়ে এসে তাঁদের এই যে সায়াহ্নকালের মিলন, এই মিলনের মধ্যে তাঁরা হয়ত একটি অপার্থিব সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন।

• • • •

ভাষা আন্দোলন নিয়ে সংকট সহজে মোচন হবে বলে মনে হয় না। মাদ্রাজে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর কিছুদিন অবস্থা থমথম করছে। কিন্তু হিন্দীবিরোধী আন্দোলন মুলে বন্ধ হয়নি।

সম্প্রতি সেখানকার এক ছাত্রনেতা ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা সংক্রান্ত সংবিধানের ১৭নং অধ্যায় রদ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলতে থাকবে।

চলতে থাকুক। আর এদিকে হিন্দীবাজদের চাপে পড়ে নরসী আর শাস্ত্রীজী আধোল তাধোল বলতে থাকুন। সব দিকেই বেসামাল অবস্থা। আর সব দিকেই বুদ্ধির ডেটলেশন। নইলে, কোথাও কিছু নেই, শেখ আবদুল্লাকে ছেড়ে দেওয়া হল এবং শুধু তাই নয়, তাঁকে অবাধে ভারতবিরোধী বক্তৃতা দেবার সুযোগ দেওয়া হল এবং বিদেশে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল!! আমাদের মত অভাজনদের মুখ থেকে যদি একটু এদিক ওদিক কোন কথা বেরোয় ব্যস, তাহলেই আমরা দেশদ্রোহী, বন্দুক উঁচিয়ে পুলিশ এসে একেবারে আমাদের অন্দরমহলে ঢুকে, আমাকে তো বটেই, যার, আমার পরিবারবর্গকে পর্যন্ত বেইজ্জত করে চলে যাবে, আর ওদিকে দেখুন, ভারতীয় নাগরিক, ভারতের অধিবাসী, শেখ আবদুল্লা যত্র তত্র বলে বেড়াচ্ছেন যে, কাশ্মীর ভারতের অংশ নয়, ভারতবর্ষ কাশ্মিরীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। সম্প্রতি শেখ আবদুল্লা লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছেছেন। তার আগে তিনি নাসেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মনে ভারতের বিরুদ্ধে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছেন। লণ্ডনে পৌঁছতেই সাংবাদিক সম্মেলন এবং তাঁর বাছা বাছা উক্তি: (১) তিনি যে সব দেশ সফর করবেন (অনেক দেশ) সেই সমস্ত দেশের অধিবাসীদের কাছে কাশ্মীরীদের মনোভাব বুঝিয়ে বলবেন। অর্থাৎ ভারতরাষ্ট্রের আদ্যশ্রাদ্ধ করবেন। (কাশ্মীরীদের তরফে ভারতের বিরুদ্ধে তাকে উকিল নিযুক্ত করে পাঠালে কে? না, ভারতরাষ্ট্রেরই কর্ণধারবৃন্দ! ধাঃ!!) (২) কাশ্মীর ভারতের অংশ নয়। (৩) কাশ্মীরে খুব ধরপাকড় হচ্ছে, অর্থাৎ ভারতরাষ্ট্র কাশ্মীরীদের ওপর খুব জুলুম চালাচ্ছে। (৪) তিনি ব্রিটেনের জননেতাদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং ভারতের হাত থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করার জন্যে তাঁদের সক্রিয় সাহায্য চাইবেন। এবার শেখ সাহেব যখন দেশে ফিরবেন তখন বোধহয় বিমান বন্দরে গিয়ে শাস্ত্রীজী নরসী প্রমুখ কর্তারা তাঁকে স্বাগত জানাবেন।

* * * *

অপরের কাছ থেকে টাকা ধার করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা শুধতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত মনের মধ্যে একটা লজ্জা আর হীনমন্যতা নিরন্তর পীড়া দেয়। ঋণের মতো বিড়ম্বনা বাস্তবিক আর কিছু নেই। চিরকাল অপরের কাছে অধমর্ণ হয়ে থাকা মানে, হীন হয়ে থাকা, শিরদাঁড়া চিরকালের জন্যে বেঁকে যাওয়া আর মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে করুণাপ্রার্থীর মতো অবস্থায় পড়া। ভারতের অবস্থা তাই দাঁড়িয়েছে! বিদেশের কাছে ঋণ দাঁড়িয়েছে পর্বত প্রমাণ! কোনদিন তা শোধ দিতে পারা যাবে বলে মনে হয় না। এবং তা যদি না যায় তাহলে চিরকাল অধমর্ণরূপে বিদেশের কাছে নীচু হয়ে থাকতে হবে—তাদের মনস্তুষ্টি করে চলতে হবে। তাদের কথা না শুনলেই হাঁক শোনা যাবে—দেআও জুপেয়া, নইলে তোমার জমির ওপর গিয়ে চড়াও হব। টাকা ধার করে লপচপানি করছ, চার শালা, পাঁচ শালা করে কোটি কোটি টাকা ওড়াচ্ছো, নষ্ট করছ, আর আত্মীয়-বন্ধুদের পকেট ভরাচ্ছো, আর এদিকে দেশের লোকের অন্নবস্ত্র নেই, তাদের দুবেলা দু-মুঠো অন্নের জোগানও দিতে পারছোনা; লজ্জার মাথা খেয়ে পাকিস্তানের কাছে চাল ভিক্ষে করছ—লজ্জাসরমের বালাই কি একেবারেই নেই! চারদিকে কি ঘটছে, তা কি একেবারেই দেখতে পাচ্ছো না, চোখের মাথা

কি একেবারেই খেয়ে বসে আছো ?—আমাদের উত্তমর্ণরা যদি এই সব বলে, তা'হলে আমরা কি উত্তর দেব ? না। উত্তর দেবার কিছু নেই। ঋণে ডুবে গেছি আমরা, তলিয়ে গেছি। আর বিদেশের কাছে সে ঋণ ক্রমেই বাড়ছে। সম্প্রতি কলকাতায় ভারতের কাউন্সিল অফ ইকনমিক অ্যাফেয়ার্সের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট এস. সি. রায় এক আলোচনা চক্রে প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৬৯ সালে ভারতের জাতীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৭৮৪১'৪৮ কোটি টাকা। তারমধ্যে ২৭৩৩৮০ কোটি টাকা বিদেশী ঋণ। ভাবুন অঙ্কটা একবার! দুহাজার সাতশ তেত্রিশ কোটি আশী লক্ষ টাকা ধার আমাদের বিদেশের কাছে। স্বাধীনতা পাবার পর ক'বছরে হু হু করে ধার বেড়ে গেছে। ১৯৫১ সালে বিদেশের কাছে ভারতের ধার ছিল মাত্র ৩২ কোটি টাকা।

আমাদের এই পল্লীতে এক ভদ্রলোক ছিলেন। সামান্য ছিল তাঁর আয়। হঠাৎ দেখি তাঁর অবস্থা ফিরে গেছে। খুব দামী দামী পোষাক পরিচ্ছদ পরে তিনি বেড়াচ্ছেন। আত্মীয়স্বজনদের খুব খাওয়াচ্ছেন, ভারী ঘটাপটা তাঁর বাড়িতে প্রতিদিন। তারপর দেখলাম, তিনি মোটরে চড়ে বেড়াচ্ছেন। শুনলাম, মোটর গাড়ী কিনেছেন। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি, আদালতের বেলিফ এসে তাঁর বাড়িতে ক্রোক বসিয়েছে, বাসনকোসন টানছে, আর ওদিকে মোড়ের মাথায় তিনটে কাবলিওলা দাঁড়িয়ে আছে, ভদ্রলোককে ধরবে বলে। কী ব্যাপার? না, তিনি চতুর্দিকে ধার করে এইসব বাবুয়ানি করেছেন এতদিন। যার, তিন তিনটে কাবুলীর কাছেও অনেক টাকা নিয়েছেন। তা, কাবুলীরা তো আর আদালত জানে না, তারা তাঁকেই জানে, অর্থাৎ একেবারে হাতে হাতে ধোকাপড়ার ব্যাপার! তারপর? তারপর ভদ্রলোক সেই যে নিজের স্ত্রীপুত্রদের ফেলে উধাও হয়ে গেলেন, আর তাঁর দেখা পাইনি! তাঁর পরিবারবর্গকে এক জ্ঞাতিবান আত্মীয় আশ্রয় দিয়েছেন। চোখের ওপর দেখা ঘটনা!

• • • •

কাব্যসাহিত্য, কথাসাহিত্য, নাটাসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্য, প্রভৃতি সাহিত্যের নানা শাখার কথা আপনারা জানেন! ওসব পুরনো হয়ে গেছে। আজকাল আরও অনেক নতুন নতুন সাহিত্য বেরুচ্ছে, যথা, কলাসাহিত্য, বোমসাহিত্য, ভেজালসাহিত্য! সর্বশেষ সাহিত্য কী জানেন? নানা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেন নি?—ক্রিকেটসাহিত্য! কি বলছেন? হরিধ্বনি করছেন! তা যাই করুন! ক্রিকেটের সঙ্গে সাহিত্য জুটেছে। যেমন সেই সুকুমার রায়ের হাঁস আর সজারুর মিলনে—হাঁসজারু; তেমনি আর কি? এই হাঁসজারুর আণ্ডতায় এক অধ্যাপকের বই বেরিয়েছে। তাকে বলা হয়েছে—ক্রিকেটসাহিত্য। এইবার আর রক্ষে নেই। খুব শিগগিরই আরও হাঁসজারু বেরুবে—ফুটবলসাহিত্য হকিসাহিত্য, টেনিসসাহিত্য, ঘোড়দৌড়সাহিত্য, সাঁতারসাহিত্য, চুকিৎকিৎসাহিত্য, কুস্তিসাহিত্য, লম্ফসাহিত্য, ম্যাজিকসাহিত্য, চিড়িয়াখানা-সাহিত্য; কি নয়? ইউনিভার্সিটিতে এই সব বই পড়ানো হবে! এবিষয়ে নতুন নতুন অধ্যাপকের পদ শীঘ্রই সৃষ্টি হবে বলে শুনছি।

• • • •

এই মন্দার বাজারে একটা ব্যবসা ভাল চলছে। রবীন্দ্র-ব্যবসা। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত অনুষ্ঠান বা অর্থের বিনিময়ে ঐ ধরনের কোন আয়োজন। ভাল পয়সা পাওয়া যায়।

প্রথম বিশ্বভারতী এই ব্যবসা শুরু করে। তারপর কত "ভারতী" কত "রবীন্দ্র"। রবীন্দ্র

র‍্যালা, রবীন্দ্র সম্মেলন, রবীন্দ্র নৃত্য, রবীন্দ্র নাট্য ইত্যাদি। বেশ পয়সা ওঠে। এক একটি সংস্থা তো ওই করেই চালায়। অনেকের সারা বছরের খরচ চলে যায়। হালফিল ব্যবসা শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি নিয়ে। একেবারে আন্তর্জাতিক ব্যবসা। চাপলা সাহেব বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের সব পাণ্ডুলিপি সরকার কিনে নেবে, বিদেশে চালান করতে দেওয়া হবে না। ব্যস, অনেকের বরাত খুলল। অর্থাৎ যাদের কাছে ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের কিছু পাণ্ডুলিপি আছে তারা এই সুযোগে অনেক টাকা লুটবে। তারপর আসছে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মোৎসব। এবার বোধ হয় রেকর্ড সংখ্যক রবীন্দ্র-উৎসব হবে কলকাতায়। খুব তোড়জোড় চলছে। নতুন নতুন ঢং। নতুন নতুন নাচের ঘরানা চলছে। আমি এবার একটি নতুন পরিকল্পনা করেছি। যদি কাজে লাগাতে পারি, বহু পয়সা পাওয়া যাবে। পরিকল্পনাটি হল এই: হোল্ নাইট প্রোগ্রাম। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হবে 'রবীন্দ্র কৌতুক'। অর্থাৎ কেবল হাসির ব্যাপার হবে। গান এমনভাবে গাওয়া হবে যে লোক হাসবে, নাচ এমন ভাবে নাচা হবে যে লোক হাসবে, রবীন্দ্র রচনা পাঠ ও আবৃত্তি প্রভৃতিও সেই ভাবে হবে। বড় বড় শিল্পী অংশ নেবে—যথা অহর, ভানু, হরিধন, নৃপতী, রবি, শীতল, মিন্টু। হে মোর দুর্ভাগা দেশ, হে মোর চিত্ত, ভগবান তুমি যুগে, যদিও সন্ধ্যা, প্রভৃতি আবৃত্তি ও গান এরা নতুন ঢংএ যখন করবে তখন দর্শক হেসে হেসে নিজেদের মধ্যেই গুনোগুনি সুরু করে দেবে। তা করুকগে। আমি তো তখন মুল হাউসের টাকা গুছিয়ে নিয়ে বাড়ী পিটটান দিয়েছি। আপনারা হাসবেন না। শীগগিরই রবীন্দ্রসম্মেলন এই পর্যায়ে নামবে।

• • • •

প্যারিসের নির্জন পথে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রিতে পদব্রজে চলেছেন অ্যানাটোল ফ্রান্স। দূরত্ব বেশী নয়, তাই পায়ে হাঁটছেন তিনি।

একটা পার্কের পাশে আসতেই চাপা ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেলেন তিনি। ব্যাপার কি জানবার জন্যে তিনি এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল এক দরিদ্র রমণী কোলে ছোট্ট এক শিশু নিয়ে শীতে কাঁপছে। অ্যানাটোল ফ্রান্স তখনি নিজের ওভার কোটটি খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। আর পকেটে যা কিছু ছিল সব তার হাতে গুঁজে দিলেন।

রমণী আতঙ্কে বলে উঠল—আপনার যে এ শীতে কষ্ট হবে মঁসিয়ে।

অ্যানাটোল ফ্রান্স বললেন,—তোমার এই কথাগুলি আমার সকল কষ্ট দূর করবে বাছা।

চিঠি শুধু চিঠি নয়

(শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত)

বাঁকুড়া জেল
২.৫.২৪.

প্রিয় দিলীপ,

তোমার ২৪।৩।২৪ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশঙ্কা করেছিলে যে, মাঝে মাঝে যেমন ঘটে এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে "double distillation"-এর ভিতর দিয়ে আসতে হবে কিন্তু এবার তা হয়নি সেজন্য খুবই খুশী হয়েছি।

তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমলভাবে স্পর্শ ক'রে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন, এ চিঠিখানিকে যে আবার "Censor"-এর হাত অতিক্রম ক'রে যেতে হবে সেও আর এক অসুবিধা, কেন না, এটা কেউ চায়না যে, তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহগুলি দিনের উন্মুক্ত আলোতে প্রকাশ হয়ে পড়ুক। তাই এই পাথরের প্রাচীর ও লৌহদ্বারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাবছি ও যা অনুভব করছি, তার অনেক খানিই কোন এক ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত অকথিতই রাখতে হবে।

আমাদের মধ্যে এতগুলি যে অকারণে বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি, সেই চিন্তা তোমার প্রবৃত্তি ও মার্জিত রুচিতে আঘাত করবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাগুলি যখন ঘেনে চলতেই হচ্ছে তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে। একথা আমি বলতে পারিনা যে, জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ করি—কেননা, সেটা নিছক ভণ্ডামী হয়ে পড়ে। আমি বরং আরও বলি যে, কোন ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারেনা। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস এ কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়, অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাস কালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরো হীন হয়ে পড়ে। এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে এতদিন জেলে বাস করার পর কারাশাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কার আমার একটা কর্তব্য হবে। ভারতীয় কারা-শাসন প্রণালী একটা খারাপ (অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রণালীর)। আদর্শের অনুসরণ মাত্র, ঠিক যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা খারাপ, অর্থাৎ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের অনুকরণ। কারা-সংস্কার বিষয়ে আমাদের বরং আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্-এর মত উন্নত দেশগুলির ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার যেটি সবচেয়ে প্রয়োজন সে হচ্ছে একটা নূতন প্রাণ বা যদি বল, একটা নূতন মনোভাব এবং অপরাধীদের প্রতি একটা সহানুভূতি। অপরাধীদের প্রবৃত্তিগুলিকে মানসিক ব্যাধি বলেই ধরতে হবে এবং সেই ভাবেই তাদের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতিষেধমূলক দণ্ডবিধি—যেটা কারা-শাসন বিধির ভিতরের কথা বলে ধরা যেতে পারে—তাকে এখন সংস্কারমূলক নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে। আমার মনে হয় না, আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তা হলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখতে পারতাম। এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে আমাদের

দেশের আর্টিষ্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাকত তাহলে আমাদের শিল্প সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হতো। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে তার জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হয়না।

আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে, আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মুহূর্ত ব্যাপে এই ধারণাটা প্রসারিত হয়ে থাকত তাহলে দুঃখে কষ্টে আর কোন যন্ত্রণা থাকত না এবং তাইতেই ত আত্মা ও দেহের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলেছে।

সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মানুষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে। আমিও সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই করে নিয়েছি এবং দর্শন বিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে লেগেছে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার মত যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হলেও তার কষ্ট নেই, অবশ্য যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে, কিন্তু আমাদের কষ্ট ত শুধু আধ্যাত্মিক নয়—সে যে শরীরেও কষ্ট এবং প্রস্তুত থাকলেও, দেহ যে সময় সময় দুর্বল হয়ে পড়ে।

৺লোকমান্য তিলক কারাবাস কালে গীতার সমালোচনা লেখেন। এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এবিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে, মান্দালয় জেলে ছ'বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ।

একথা আমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নির্জ্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জ্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে বুঝবার সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে একথা বলতে পারি যে, আমার ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নই বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের দিকে পৌঁছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে উঠছে। অন্য কারণে না হলেও শুধু এইজন্যই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে, অনেকখানি লাভবান হতে পারব।

আমার কারাবাস ব্যাপারটিকে তুমি একটা 'Martyrdom' ব'লে অভিহিত করেছ। অবশ্য ও-কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু আমার সামান্য কিছু 'humour' ও 'proportion'-এর জ্ঞান আছে, (অন্ততঃ আশা করি যে আছে) তাই নিজেকে 'Martyr' বলে মনে করবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। স্পর্দ্ধা বা আত্মম্ভরিতা জিনিষটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই, অবশ্য সে বিষয়ে কতখানি সফল হয়েছি, শুধু আমার বন্ধুরাই বলতে পারেন। তাই 'Martyrdom' জিনিষটা আমার কাছে বড় জোর একটা আদর্শই হ'তে পারে।

আমার বিশ্বাস বেশী দিনের মেয়াদীর পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ এই যে, আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকাল বার্দ্ধক্য এসে চেপে ধরে সুতরাং এদিকে তার বিশেষ সতর্ক থাকাই উচিত। তুমি ধারণাই করতে পারবে না, কেমন করে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে অকালবৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে, অবশ্য অনেকগুলি কারণই এর জন্যে দায়ী—যথা, খারাপ খাদ্য, ব্যায়াম বা স্ফূর্তির অভাব, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা একটা অধীনতার শৃঙ্খল-ভার, বন্ধুজনের অভাব, এবং

সঙ্গীতের অভাব যাহা সর্ব্বশেষে উল্লিখিত হ'লেও একটা মস্ত অভাব। কতকগুলি অভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যেগুলি বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এইসব বাইরের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অকাল বার্দ্ধক্যের জন্য কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্য সঙ্গীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আমাদের নেই। পিকনিক, বিশ্রম্ভালাপ, সঙ্গীতচর্চ্চা, সাধারণ বক্তৃতা, খোলা জায়গায় খেলাধূলা করা, মনোমত কাব্য সাহিত্যের চর্চ্চা—এ সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে এতখানি সরস ও সতেজ করে তোলে যে, আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না এবং যখন আমাদিগকে জোর ক'রে বন্দী ক'রে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। যতদিন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুলি আজকালকার মত নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতির ক্ষেত্র হয়েই থাকবে।

একথা আমার লিখতে ভোলা উচিত নয় যে, আপনার নিজের লোকের, বন্ধুবান্ধবের এবং সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা মানুষকে জেলের মধ্যেও অনেকখানি সুখ দিতে পারে। এই দিকের প্রভাবটা নিতান্ত অজ্ঞাতসারে ও সূক্ষ্মভাবে কাজ করলেও নিজের মনটাকে আমি বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই যে, এইভাব কিছুতেই কম বাস্তব নয়। সাধারণ ও রাজনৈতিক অপরাধীদের অদৃষ্টের পার্থক্যের এটা একটা নিশ্চিত কারণ। যে রাজনৈতিক অপরাধী, সে জানে মুক্তি পেলেই সমাজ তাকে বরণ ক'রে নেবে, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের তেমন কোন সান্ত্বনা নেই। সে বোধহয় তার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও কোন সহানুভূতিই আশা করতে পারে না এবং সেইজন্যই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়। আমাদের yard-এ যে সমস্ত কয়েদীর কাজ করতে হয় তাদের কেউ কেউ আমাকে বলে যে, তাদের নিজের লোকেরা জানেই না যে সে জেলে বন্দী। লজ্জায় তারা বাড়ীতে কোন সংবাদও দেয়নি। এ ব্যাপারটা আমার কাছে নিতান্ত অসন্তোষজনক বলে মনে হয়। সভ্যসমাজ অপরাধীদের প্রতি আরও সহানুভূতি কেন দেখাবে না?

আমার জেলের অভিজ্ঞতা বা তার থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে সে সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারি কিন্তু একটা চিঠির ত শেষ আছে। আমার বেশী উদ্যম ও শক্তি থাকলে একখানা বই লিখে ফেলার চেষ্টা করতাম কিন্তু সে চেষ্টার উপযুক্ত সামর্থ্যও আমার নেই।

আমার জেলের কষ্ট দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বলে মনে করায় আমি পক্ষপাতী। যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কম আসে, সেখানে বন্দী জীবনটা তত যন্ত্রণাদায়ক হয় না, এই সমস্ত সূক্ষ্মবরণের আঘাত উপর থেকেই আসে, জেলের কর্ত্তাদের এবিষয়ে কিছু হাত থাকে না। আমার অন্ততঃ এই রকমই অভিজ্ঞতা। এই যে সব আঘাত বা উৎপীড়ন—এগুলো আঘাতকারীর প্রতি মানুষের মনকে আরও বিরূপ করে দেয় এবং সেই দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় এগুলোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ। কিন্তু পাছে আমরা আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে একটা আনন্দধাম গড়ে তুলি, তাই এই সব আঘাত আমাদের উপর বর্ষণ করে আমাদের বহির্বিষ্ট আত্মাকে জাগিয়ে বলে দেয় যে, মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি কঠোর ও নিরানন্দময়। তুমি বলেছ যে, মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন করে সমস্ত পৃথিবীর মাটীকে একেবারে তলা পর্য্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে—এ দৃশ্য তোমাকে প্রতিদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণ করে তুলেছে। কিন্তু এই অশ্রু সবটুকুই দুঃখের অশ্রু নয়। তার মধ্যে করুণা

ও প্রেমবিন্দুও আছে। সমুন্নততর ও প্রশস্ততর আনন্দস্রোতে পৌঁছাবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি দুঃখকষ্টের ছোটখাট অগভীর চেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজী হতে? আমি নিজে ত দুঃখবাদ বা নিষ্কৎসাহের কোন কারণ দেখিনা বরং আমার মনে হয় দুঃখ-যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম ও উচ্চতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেয়। তুমি কি মনে কর, বিনা দুঃখ-কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোন মূল্য আছে?

তুমি কিছুদিন পূর্বে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলিই পেয়েছি। সেগুলি এখন ফিরে পাঠাতে পারব না, কারণ তাদের অনেক পাঠক জুটেছে। তোমার পছন্দ যে রকম সুন্দর তাতে একথা বলা অনাবশ্যক যে, আরও বই সাদরে গৃহীত হবে। ইতি—

সুভাষচন্দ্র বসু

• • • •

ঝড়ের রাত। বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী কার্ল অক্ আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন যে বাড়িতে, সেটি হচ্ছে দুই ছেলেদের সংশোধনী বিদ্যালয়।

ছেলেদের মধ্যে মহা হৈ চৈ। কেউ কাউকে মানে না, অধ্যক্ষের কথাও শুনতে চায় না। সকলে ভদ্রলোকটিকে ঘিরে নানা রকমের হৈ-হল্লা শুরু করে দিলে। কত রকমের দুষ্টুমি।

লোকটি প্রথমটা খুব বিব্রত বোধ করলেন, তারপর ধীরে ধীরে একখানা করিক গান গাইতে লাগলো। যেমন তার মাতুনে সুর, তেমনি তার মজার কথা। ছেলের দল একেবারে চুপচাপ। যেন কতোই শান্ত শিষ্ট সব।

অধ্যক্ষ এগিয়ে এলেন,—আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন—কে আপনি?

—আমার নাম কার্ল অক্। অধ্যক্ষ চমকে উঠলেন।

পুরাতন পাতা

সুবিখ্যাত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় গিরিশচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট সুহৃদ ছিলেন। শিশিরবাবুকে সকলেই পরম বৈষ্ণব, স্বদেশ ভক্ত এবং তেজস্বী সম্পাদক বলিয়াই জানেন, কিন্তু বঙ্গীয় নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত তিনি যে প্রথম হইতেই একজন প্রধান উৎসাহ-দাতা ও উদ্যোগী ছিলেন, এবং অভিনয়ার্থে স্বয়ং নাটক পর্যন্ত রচনা করিয়া দিয়াছেন, ইহা বোধহয় অল্প সংখ্যক পাঠকই জানেন। বঙ্গ রঙ্গভূমি তাঁহার অক্ষয়-স্মৃতি চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিতা হইবেন। তাঁহারই উৎসাহে শিশিরবাবু অমৃতবাজার পত্রিকার মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদিও লিখিতেন। ক্রাইবার্জার কোম্পানীর অফিসের কর্ম পরিত্যাগ করিবার পর শিশিরবাবুর অনুরোধে তিনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান লীগে'র হেড ক্লার্ক ও কেশিয়ারের পদ গ্রহণ করেন। ছোটলাট টেম্পেল সাহেবের স্বায়ত্তশাসন-প্রথা প্রবর্তনের সময়, 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে একটি সাধারণ সভা গঠিত হয়। এখানে প্রায় এক বৎসর কার্য্য করিয়া গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানীর অফিসে বুক কিপার হইয়া প্রবেশ করেন।

'ইণ্ডিয়ান লীগে' কার্য্য করিবার সময় ইনি দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম ছিল সুরতকুমারী। ইনি কলিকাতা, সিমলার বিখ্যাত লালচাঁদ মিত্রের প্র-পৌত্রী এবং বিহারীলাল মিত্রের প্রথমা কন্যা।

পার্কার সাহেব এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাক্য ব্যয় সঙ্কোচের নিমিত্ত তিনি অফিসে নিয়ম করেন, যাহাকে ডাকিবার প্রয়োজন হইবে, তিনি ঘণ্টা বাজাইয়া ডাকিবেন। একদিন গিরিশচন্দ্রের নিমিত্ত এইরূপ ঘণ্টা বাজিল। গিরিশচন্দ্র তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। সাহেবের চাপরাসী আসিয়া বলিল,—"বাবু, সাহেব আপনাকে ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছেন না?" গিরিশচন্দ্র মুখ না তুলিয়া কার্য্য করিতে করিতেই বলিলেন,—'না।' চাপরাশী বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ গরম মেজাজে পার্কার সাহেব আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি শুনিতেছনা কেন?" গিরিশচন্দ্র গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন,—"আমি শুনিনাই।" এইরূপ দুই তিনবার কথা কাটাকাটি হইবার পর তেজস্বী গিরিশচন্দ্র সাহেবকে বলিলেন,—"সাহেব, আমি এতক্ষণ ভদ্রতার সহিত তোমার কথার উত্তর দিতেছিলাম। এখন প্রকৃত কথা বলি শোন,—তুমি মনে ক'রোনা যে আমি তোমার খানসামা কি বেয়ারা,—তোমার ঘণ্টায় উঠবো-বসবো।" গিরিশচন্দ্রের নির্ভিক উত্তরে সাহেবের শ্বেতমূর্ত্তি সহসা রক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি তখনই আত্ম-সংবরণ করিয়া লইয়া বলিলেন,—"বাবু, দুঃখিত হইওনা, আমি আমার এইরূপ অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত দুঃখিত হইয়াছি।" সেই অবধি গিরিশচন্দ্রকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন,—মধ্যে মধ্যে আপনার কক্ষে তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেন। এক সময় অফিসের কার্য্যে বিস্তর লোকসান হওয়ায় অফিস ফেল হইবার সম্ভাবনা হয়। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে অফিস নিরাপদ হইতে

পারে, পার্কার সাহেবকে সেইরূপ যুক্তি প্রদান করেন। তাঁহার পরামর্শ মত কার্য্য করিয়া সাহেব উক্ত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পান এবং আনন্দের সহিত তাঁহার আশাতিরিক্ত বেতন বাড়াইয়া দেন।

দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া এবং অফিসে সাহেবের সদ্ব্যবহারে গিরিশচন্দ্র অনেকটা মানসিক শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মাঝে মাঝে আবার তিনি থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করেন।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারের অবস্থা এ সময়ে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভুবনমোহনবাবু দিন দিন ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছিলেন। কোনও কালেই থিয়েটার সংক্রান্ত হিসাবপত্রের তাঁহার সুব্যবস্থা ছিলনা। যে দিন অধিক বিক্রয় হইত, সেদিন রাত্রে থিয়েটারে পান ভোজনের ধুম পড়িয়া যাইত। নৈতৃক বিষয় ভুবনমোহনবাবুর মাতার নামে ছিল, এ নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রায়ই তাঁহাকে হাওনোট কাটিতে হইত। ছদ্মবেশী হিতৈষী বন্ধুরও অভাব ছিল না, হাজার টাকা পাইয়া দুই হাজার টাকা লিখিয়া দেওয়ার মহাজনেরও অসদ্ভাব ঘটিত না।

* * * *

বিখ্যাত অভিনেতা লুসি ম্যালিসিয়ো অনেক রাত্রে অভিনয়ান্তে বাড়ি ফিরছিলেন হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল কে একজন তাঁর বাড়ির পাঁচিলের পাশে চুপ করে বসে আছে, যেন কার অপেক্ষা করছে।

চোর নয়তো? —ভাবলেন লুসি। তারপর তার কাছে গিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললেন,—দেখছ না সব চুপচাপ, চুরি করবার এ সুযোগ হারিও না বন্ধু,—আমি ত এসে পড়েছি। আগে কোন্ ঘরে ঢুকবে? —এক তলার বড় ঘর, —উত্তর দিল চোর। এইবার তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—চোর, চোর।

পাঠক পাঠিকার কলম

মাননীয় গল্প-ভারতী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

দেশের শত অভাব ও সংকটের মধ্যেও ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া শেখাটা একদিন অব্যাহত ছিল। কিন্তু বর্তমানে লেখাপড়ার দফা গয়া হইয়াছে। তাহা বোধ করি লক্ষ্য করিয়াছেন। স্কুলগুলি সাম্প্রতিক কালে সপ্তাহের বেশীদিন বন্ধই থাকে বা বন্ধ হইয়া যায়। প্রায়শই ধর্মঘট। ধর্মঘটের হিড়িক লাগিয়াই আছে—তাহার আর শেষ নাই। ছেলেদের অভিভাবকগণ উদরান্নের সন্ধানে সকাল হইতে রাত পর্যন্ত বাহিরে বাহিরে ঘোরেন, মনে করেন, ছেলে দুপুরে স্কুলে শিক্ষালাভ করিতেছে, কিন্তু তিনি জানিলেন না, ছেলে দ্বি-প্রহরে চার পয়সায় টিকিট কিনিয়া সিনেমায় ঢুকিয়া হিন্দি ছবি দেখিয়াছে, অথবা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া হিন্দি-আতীয় সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইয়াছে—বোম্ রাধা বোম্, সমস্ম হোগা কি নেহি। একেই তো চতুর্দিকে এই বোম্ রাধা বোম্, তার উপর কুসংসর্গের অভাব নাই, সোনায় সোহাগা। দুপুরে প্রায়ই স্কুল বন্ধ—অতএব পুত্রের বারোটা বাজিতে যে আর বিলম্ব নাই—এখবর তাহার পিতা আজ হয়ত পাইতেছেন না—কিন্তু শীঘ্রই পাইবেন, তবে বড় দেরীতে পাইবেন। তখন আর ঘড়ির কাঁটা ঠিক করিবার কোন উপায় থাকিবে না। ইহার উপর সম্প্রতি আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। এবার লোকসভার নির্বাচনে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বালক বাহিনীর কর্ম-তৎপরতা। খাতা বই শিকায় তুলিয়া রাখিয়া স্কুল কামাই করিয়া তাহারা তাহাদের পল্লীর অমুক'দার জন্য ভোট যুদ্ধে নামিয়াছিল। তাহাদের চীৎকারে স্লোগানে হল্লায় ত্যাহি ত্যাহি ব্যাপার—'ভোট দেবেন কাকে? রামহরি বা কে।' অথবা 'ভোট দেবেন কাকে? আমরা চাই যাকে।' পাড়ার বড়রা বোধ করি কোন ভোট প্রার্থীর সম্বন্ধেই প্রচারকার্য চালাইবার মতো যথেষ্ট উপকরণ পাইতেছে না, কারণ ভোটারদের আর কাহাকেও চিনিতে বাকি নাই। তাই এবার বড়রা কৌশলী করিয়া বালক-বাহিনীকে উৎসাহিত করিয়াছে এবং তাহাদের দিয়া স্লোগান ছাড়িয়াছে। বালকরাও চা-বিস্কুট খাইয়া পরমোৎসাহে লেখাপড়া তুলিয়া 'ভোট কর' করিয়া বেড়াইয়াছে। ফলে তাহাদের বছরের পাঠাক্রম যে কতদূর পিছাইয়া গেল তাহা তাহারা আজ উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। বার্ষিক পরীক্ষার সময় তাহা হাড়ে হাড়ে টের পাইবে। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! ক্লাশ প্রমোশন দিতে হেড মাষ্টার মশায় বাধ্য। মাষ্টার মশায়দের তো পাড়ায় বাস করিতে হইবে? ইস্কুলে আসিতে হইবে? অতএব হাত পা মাথা তাঁহার হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য ফেলকরা ছেলেদের প্রমোশন দেওয়া ভিন্ন তাঁহাদের অন্য গতি নাই। আমাদের পাড়ার এক ইস্কুলের প্রধান

শিক্ষক বোধ করি ছেলেদের বেপরোয়া কানাই করা, যখন তখন স্কুল হইতে চালান যাওয়ার বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন, ছেলেরা দিন গুনিলাম ছেলেরা তাঁহার নামে বদ রটনা দিতেছে! এবারকার লোকসভা নির্বাচনে বালকদের উস্কানিই তাঁদের কাছে লাগলো যে তাঁদের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক হইয়াছে তাহা বুঝিবার মতো বুদ্ধি স্বার্থান্বেষী, স্বার্থান্বিতাকারী লোকদিগের নাই। কিন্তু শুধু তাঁহারাই নন, দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল অভিভাবকরাও যেন হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাই এই পত্রের সূচনাতে যাহা বলিয়াছি, তাহারই পুনরুক্তি করি, শেষ পর্যন্ত ছেলেদের লেখাপড়া শেখাটাও উঠিয়া যাইবার পথ ধরিয়াছে। একটি জাতির ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিবার পক্ষে এ যে কতবড় আতঙ্কের কথা তাহা বোধ করি কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। ইহার প্রতীকার হইবে কিসে? আপনাদের নিকট হইতে এবং চিন্তাশীল পাঠকদের নিকট হইতে সেই উত্তরের প্রত্যাশায় রহিলাম। ইতি—

বাগবাজার
১লা এপ্রিল, ৬৪

ভবদীয়
শ্যামাকান্ত রায়

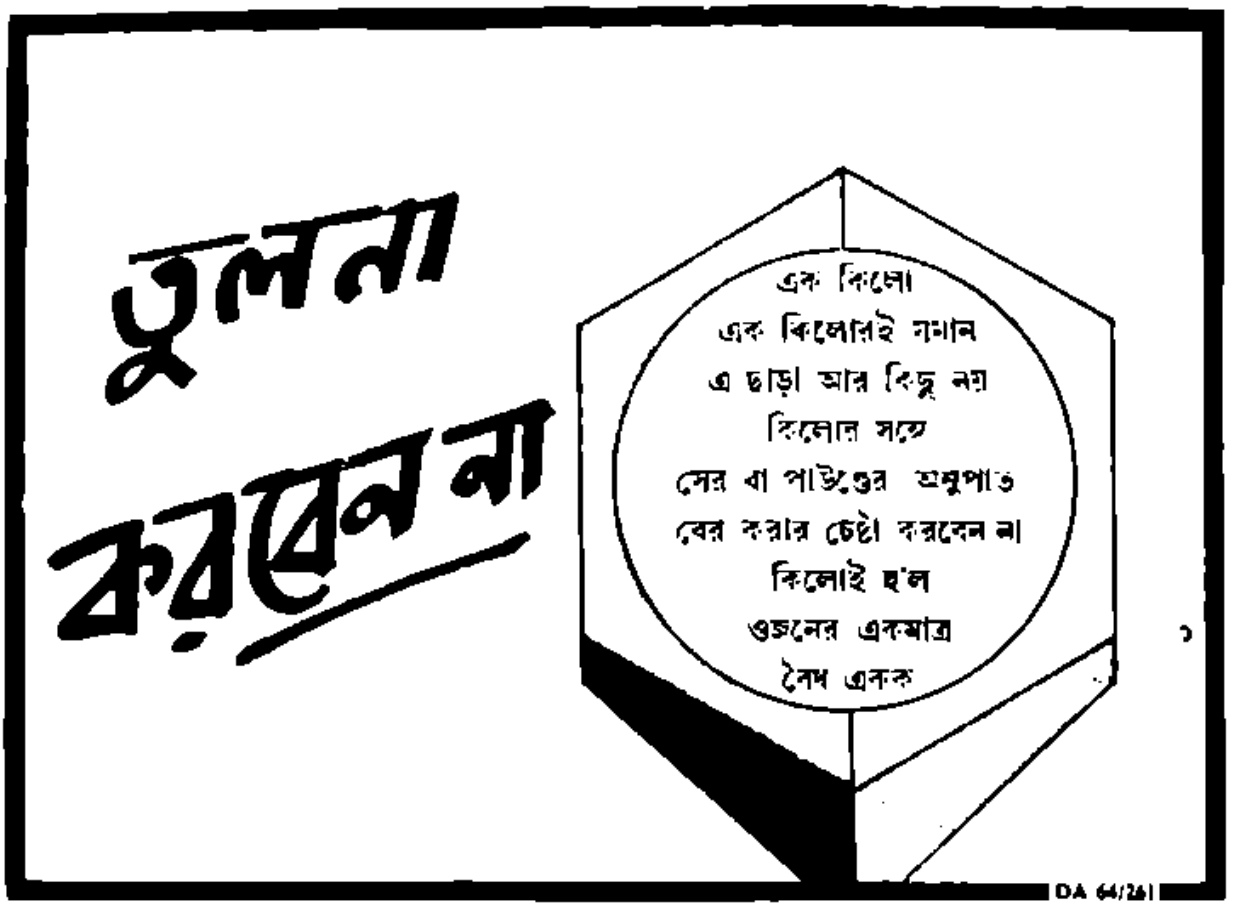

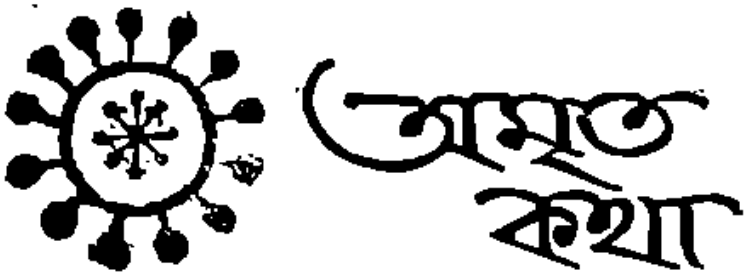

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা

জনক ভারী ধীপুরুষ। দুখানা তলোয়ার ঘুরতেন। একখানা জ্ঞানের ও একখানা কর্মের। একদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, আর একদিকে সংসারের কর্ম করছে। জনক রাজার সভায় একটি ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনক রাজা হেঁটমুখ হয়ে চোখ নীচু করে রইলেন। ভৈরবী তাই দেখে বলেছিলেন, "হে জনক! তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়।" পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বৎসরের ছেলের ন্যায় স্বভাব হয়, তখন স্ত্রী পুরুষ বলে ভেদবুদ্ধি থাকে না।

• • • •

সরল বিশ্বাস ও অকপটতা থাকলে ভগবান লাভ হয়। একটি লোকের একটি সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, লোকটি বিনীতভাবে সাধুর নিকট উপদেশ প্রার্থনা করলেন। সাধু বললেন, "ভগবানকে প্রাণধন দিয়ে ভালবাস।" লোকটি বললে, "ভগবানকে কখনও দেখিনি, তাঁর বিষয় কিছু জানি না, কি করে তাঁকে ভালবাসব?" সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কাকে ভালবাস?" লোকটি বললে, "আমার কেউ নেই, শুধু একটা মেড়া আছে, ঐটিকেই ভালবাসি।" সাধু বললেন, "ঐ মেড়ার ভিতর নারায়ণ আছে জেনো, ঐটিকেই প্রাণ-মন দিয়ে সেবা করবে ও ভালবাসবে।" এই বলে সাধুটি চলে গেলেন। লোকটিও ঐ মেড়ার ভিতর নারায়ণ আছেন বিশ্বাস করে প্রাণপণে তার সেবা করতে লাগল। সাধুটি বহুদিন পরে সে রাস্তায় ফিরে যাবার সময় লোকটির সন্ধান করে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কেমন আছ?" লোকটি প্রণাম করে বললে, "ওরো! আপনার কৃপায় বেশ আছি, আপনি যেমন বলেছিলেন, সেইরূপ করে মেড়ার ভিতর মধ্যে মধ্যে এক অপরূপ মূর্তি দেখতে পাই—তাঁর চারি হাত; দর্শন করে আমি পরম সুখে আছি।"

• • • •

নৌকারোহিত ব্যক্তি সম্মুখে ভয়ঙ্কর স্রোতকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া, কাতরে ভগবানের নিকট 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করে, কিন্তু যখন স্রোত তাহার পদতল দিয়া চলিয়া যায়, তখন সেও 'যা শালা' বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়। বদ্ধজীবেরও ঐ দশা। যখন বিপদে পড়ে, তখন কাতরে কতই প্রার্থনা করে, কিন্তু বিপদ চলিয়া গেলে সব ভুলিয়া যায়।

সকলেই আপনার জমি প্রাচীর দিয়া ভাগ করিয়া লয়; কিন্তু আকাশকে কেহ খণ্ড করিতে পারে না। এক অখণ্ড আকাশ সকলের উপর বিরাজ করিতেছে। মানুষ অজ্ঞানে আপনার ধর্মকে সত্য ও শ্রেষ্ঠ বলে, জ্ঞান হইলে সকল ধর্মের উপর এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে বিরাজিত দেখে।

॥ নূতন শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
দহন ও দীপ্তি ৬৲

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
বায়স্কোপের বাক্স ৬৲

মনোজ বসুর
সাজবদল ৫৷৷০

পরিতোষ মজুমদারের
সান্-পাঁউলির মেয়ে ৩৷৷০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
দোলগোবিন্দের কড়চা ৬৲

তারেশ শর্মাচার্যের
ছায়ামিছিল ৬৲

সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
পরমাত্মীয়া ৫৷৷০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

জরাসন্ধের
লৌহকপাট ৪র্থ ও শেষ পর্ব ৭৲

প্রশান্ত চৌধুরীর
কান পেতে শুনি ৫৲

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঢেউ ওঠে পড়ে ৬৲

অরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আলোর অরণ্য ৬৷৷০

মিত্র ও ঘোষ ঃ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

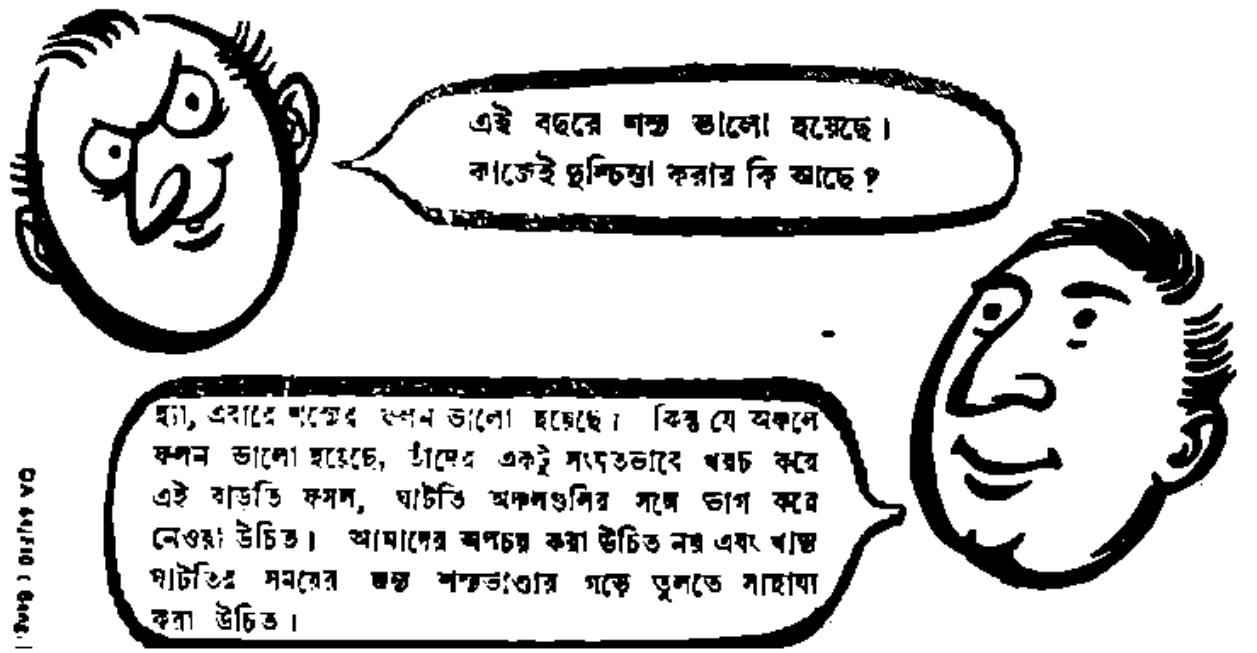

অন্তরীক্ষে

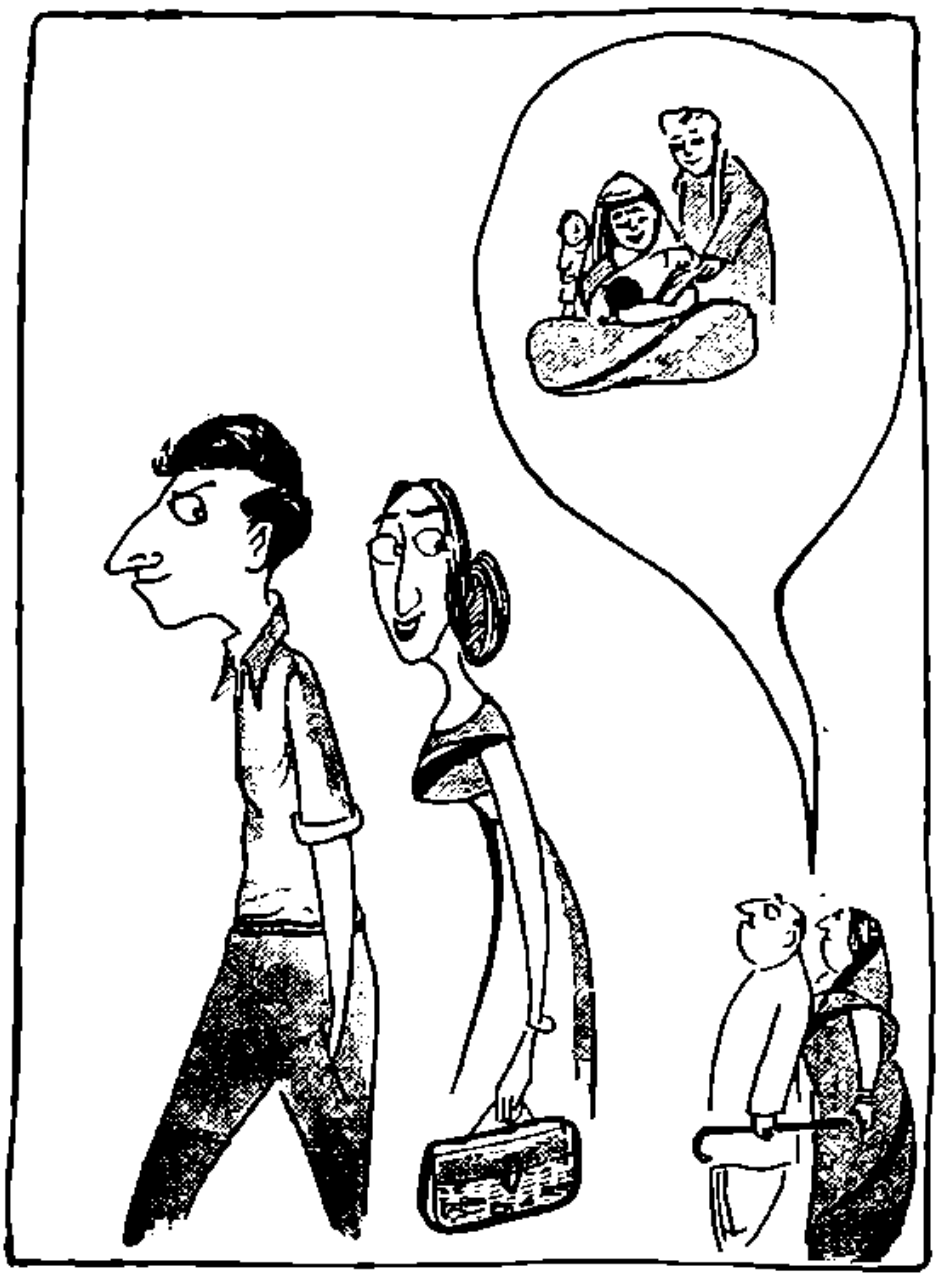

সেদিন ও আজ

অন্তরীক্ষে

আরে, স্যার কি আর আমাদের দেখতে পাচ্ছেন।

বিশ্ব-উৎসব

॥ সচিত্র সংযোজন ॥

হলা পিয় সহি–

হলা পিয় সহি

তালতমালের তপোবনে নয়,

মৃগশাবকের আদরে আহ্লাদে নয়

–গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে

এ কালের বরবর্ণিনী শকুন্তলা আজও

'হলা পিয় সহি।' 'হলা পিয় সহি।' ব'লে

সঙ্গিনীদের কুঞ্জবনে সৌন্দর্যেরি বরণডালায়

আজ তারা না হলেই নয়

বোরোলীন ক্রীম

সকল কাজে সবারে সাজে

বোরোলীন

বোরোলীন হাউস্– কলিকাতা-৩

কার্নিভ্যাল

শ্রীগৌরীশংকর দে

এখনকার দিনে বড়-বড় শহরগুলিতে আমোদ প্রমোদের অসংখ্য আয়োজন : সিনেমা, থিয়েটার, শীতের সময় ক্রিকেট, নাচ-গানের জলসা, সার্কাস, আরো কত কী। কিন্তু যখন এ সব প্রায় কিছুই ছিলনা তখন ? তখনও আনন্দের আয়োজন ছিল। আর সেই-আয়োজন কার্নিভ্যাল। বড়োদিনের ঠিক পরে, এই আমাদের দেশেই বিদেশ থেকে আসত কার্নিভ্যালের দল। মুখে রং মেখে, বিচিত্র সাজ-পোশাক প'রে তারা জাদু খেলা দেখাত। তাই দেখে আনন্দ পেত ছেলে বুড়ো সকলেই। সেই কার্নিভ্যাল এখন প্রায় উঠেই গেছে। একমাত্র গোয়াতেই এখনো তা আছে।

কার্নিভ্যাল আসার সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া প'ড়ে যায় য়ুরোপ আর আমেরিকার শহরগুলিতে। যা ছিল আগাছায় ভরা নেহাৎই ময়দান, রাতারাতি তা-ই হ'য়ে ওঠে প্রমোদ বাগিচা কিংবা জাদুকরের আজব দেশ। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা অবাক হ'য়ে দেখে ভ্রাম্যমান দলের লোকেরা ট্রেনের কামরা আর ট্রাক থেকে নানা রকম জিনিস-পত্র নামাচ্ছে তো নামাচ্ছেই। গোটা ময়দান হয়ে ওঠে অগণন তাঁবুর মনোহারী শহর। চারদিকে চোখে পড়ে কাঠের তৈরি অসংখ্য অস্থায়ী ঘর। শিশুদের যেন ডাকতে থাকে নাগর-দোলা আর কাঠের ঘোড়া। নানা আশ্চর্য দৃশ্য, শব্দ, গন্ধের সমাবেশ বলেই কার্নিভ্যাল বিশেষ ক'রে শিশুদের কাছে এত প্রিয়। ওরা বড়-বড় চোখ মেলে অবাক হ'য়ে দেখে ঝলমলে আলো, রঙিন পোশাক, বিচিত্র মানুষ। সামনেই যেন এক সব-পেয়েছির দেশ। সেখানে অন্ত নেই লোকের ভিড় আর ঠেলাঠেলির।

আধুনিক কার্নিভ্যালের পেছনে রয়েছে ক'য়েক শতাব্দীর ইতিহাস। প্রাচীন মিশর, গ্রীস আর রোমে একদল ভ্রাম্যমান অভিনেতা রাস্তায়-রাস্তায় অভিনয় ক'রে লোকদের আনন্দ দিত। মধ্যযুগে ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে বহুলোক য়ুরোপের শহরে এসে জমায়েৎ হত। এই জনসমাগম উপলক্ষ্য ক'রে আনন্দ-মেলার সৃষ্টি। ভ্রাম্যমান দোকানী আর মিষ্টান্ন-বিক্রেতার দল মিশে যেত সাধারণ লোকদের মধ্যে। যে যার মতো ক'রে লোককে আনন্দ দে'য়ার চেষ্টা করত বাজীকর, বিদূষক, গায়ক আর নর্তকের দল।

কার্নিভ্যাল বা আনন্দ-মেলা মূলত রোমান ক্যাথলিকদের উৎসব। লেন্ট-এর উপবাসের ঠিক আগে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হত। এখনো নিউ অরলিয়েন্স, বেলজিয়ম ইত্যাদি ক্যাথলিক শহরে কার্নিভ্যালের ঘটা দেখবার মতো। বিশেষ ক'রে বিচিত্র পোশাক-পরা নর-নারীদের শোভাযাত্রা।

প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য এই দু' দেশেই ভ্রাম্যমান আনন্দ-মেলা লোকপ্রিয়। সিনেমা, অটো-মোবাইল্‌স, পার্ক ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয়ের আগে আমেরিকাবাসীরা কার্নিভ্যাল উপলক্ষ্যে যে কী আনন্দ করত আজ তা কল্পনা করাও কঠিন। তবু, নানা রকম আমোদ-প্রমোদের আয়োজন সত্ত্বেও, এখনো নতুন মহাদেশের লোকেরা কার্নিভ্যালের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। ওই উপলক্ষ্যে খুলে দেয় মনের আগল, খুশির ফোয়ারা।

বহুকাল আগে থেকেই কার্নিভ্যালের প্রধান কেন্দ্র রোম। প্রাচীন রোমের অন্যতম আনন্দ উৎসব কার্নিভ্যাল। সংযমের সব বাঁধ যেন ভেঙে যেত তখন ক'য়েকদিনের জন্য। যা খুশি বলার, যা

খুশি করার স্বাধীনতা পেয়ে মেতে উঠত রোমের নর-নারী। বিচিত্র ছদ্মবেশে তারা বেরিয়ে পড়ত রাজপথে। কমোডাস-এর রাজত্বকালে তাঁর ক'জেকজন শত্রু স্থির করে দেহ-রক্ষীর ছদ্মবেশ প'রে সুযোগ মতো সম্রাটের বুকে ছুরি মারবে। কিন্তু মতলব হাসিল করার আগেই তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হ'য়ে যায়।

ওই উৎসব উপলক্ষ্যে নর-নারীরা, মাঝে-মাঝে একটু অসংযত হ'য়ে পড়ে ব'লে কতিপয় পোপ কার্নিভ্যালকে মোটেই সুনজরে দেখতেন না। আবার ক'জেকজন পোপ ছিলেন এর উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক।

ইতালীর অন্যান্য শহরগুলির মধ্যে ভেনিসেই কার্নিভ্যাল সমস্ত সবচেয়ে বেশি। পরে, কে কত ভালো ক'রে আনন্দ-মেলা বসাতে পারে, তার একটা প্রতিযোগিতা যেন শুরু হয়েছিল মিলান, ফ্লোরেন্স, নেপলস্ ইত্যাদি শহরগুলিতে। একটু উচ্ছৃঙ্খল ব'লে ফ্লোরেন্সের কার্নিভ্যালের দুর্নাম ছিল।

এখন য়ুরোপ আর আমেরিকার প্রায় সব শহরেই কার্নিভ্যাল বসে। স্পেনে চলে চারদিন ধরে। তবু বুধবার পড়ে এই চারদিনের ভেতরে। ফ্রান্সে আমোদ-প্রমোদ জমে ওঠে লেন্ট-এর তৃতীয় সপ্তাহে, স্রোভে-এর মঙ্গল আর বৃহস্পতিবার।

জার্মানীতে কার্নিভ্যাল বছরের একটা ঘটনা। ছেলে-বুড়ো সবারই মনে ক'দিন ধরে বেজে চলে উৎসবের সানাই। রাইণভূমি আর দক্ষিণ জার্মাণীতে কার্নিভ্যাল খুবই জনপ্রিয়। মনের ভার লঘু ক'রে দিতে উৎসবে মেতে ওঠে সাধারণ মানুষ। লঘু কৌতুকে সরস থাকে মন।

কার্নিভ্যাল উপলক্ষ্যে আনন্দ ক'রে ক'রে শেষে বুঝি ক্লান্তই হয়ে পড়ে নগরবাসী। উৎসবের তোরণ থেকে ঝ'রে যায় দেবদারু পাতা, শুকিয়ে আসে ফুল। আবার শুরু হয় ছকে বাঁধা প্রাত্যহিক জীবন। সাজ-পোশাক আর মুখোশ অনাদৃত ভাবে প'ড়ে থাকে আলমারীর ভেতরে। আর আনন্দ নয়। এবার এসে গেছে উপবাস আর অনুতাপে চিত্তশুদ্ধির দিন।

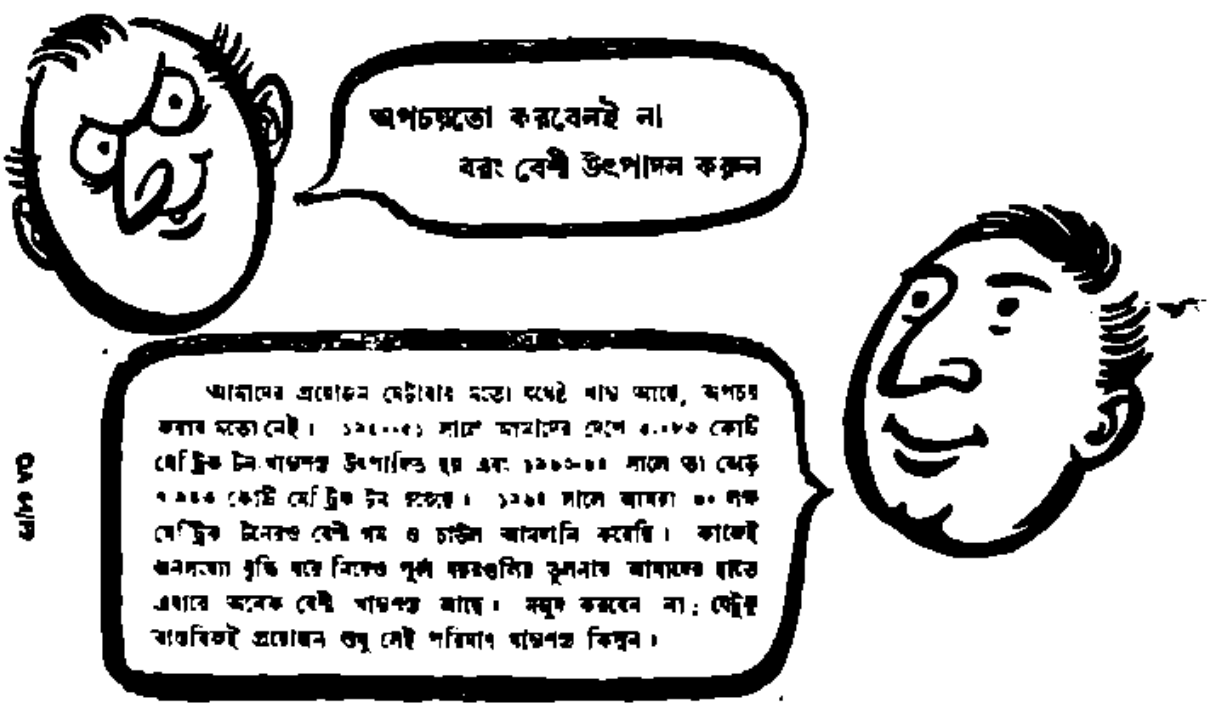

গল্প-ভারতী
চৈত্র, ১৩৭১

"কথা প্রসঙ্গে"

॥ আয়করের দায়ে বিজ্ঞাপনের অপমৃত্যু ॥

যে-কোন বিষয়ে সরকারী নীতি গ্রহণকালে বিষয়টির গুরুত্ব, ভূত, ভবিষ্যত ও ভালমন্দ সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত। সেই বিষয়ে যাঁরা ওয়াকীবহাল তাঁদের পরামর্শ নেওয়াও একান্ত দরকার। আমাদের জাতীয় সরকারের কিন্তু সে বালাই নেই। তাঁরা এসব বিষয়ে চিন্তা না করেই এমন এক একটি পরিকল্পনা এবং নীতি গ্রহণ করেন যাতে দেশের মঙ্গল সাধিত হওয়াতো দূরের কথা বরং বিপরীত ফলই ফলে থাকে।

সম্প্রতি সরকারের অর্থ দপ্তর ঠিক করেছেন যে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আর ইচ্ছামত বিজ্ঞাপন করা চলবে না, বিজ্ঞাপনের ব্যয়সঙ্কোচ করতে হবে, তা না হলে, আয়কর দিতে হবে।

শিল্প বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন সঙ্কুচিত করার এই প্রস্তাবটি দেশের অগ্রগতির পক্ষে যে কতখানি ক্ষতিকর তা বিজ্ঞাপন সম্পর্কে যাঁদের এতটুকুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝবেন। অথচ কতবড় দুঃখের কথা যে, এত বড় একটা প্রয়োজনীয় বিষয় আমাদের জাতীয় সরকার অনুধাবন করতে পারেন না। এ থেকেই বুঝতে পারা যায় তাঁদের চিন্তাশীলতা ও দূরদর্শিতার অভাব।

শিল্প বাণিজ্যই দেশের সম্পদ গড়ে তোলে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে; আর এই সম্পদ গড়ে তোলা এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধনের মূল ভিত্তিই হচ্ছে বিজ্ঞাপন। প্রচার শিল্প শুধুমাত্র দেশের বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনেই সীমিত নয়,—দেশের সম্মান, সংহতি, সংস্কৃতি ও সুনাম প্রসারে এবং শিল্প বাণিজ্যের প্রচারে দেশের বাইরেও তার অগ্রগতি। একেতো আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক শিল্পপতির ধারণা একান্ত সীমাবদ্ধ। তাই অনেকক্ষেত্রে

বিজ্ঞাপনের ব্যয়কে তাঁরা অনাবশ্যক মনে করেন। নিতান্তই বিজ্ঞাপন করতে হয়, তাই কিছু করেন। আর সরকারও এ-বিষয়ে একেবারেই সচেতন নন,—এ-সম্পর্কে তাঁদের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা আজ অবধি আমরা দেখলাম না। তাঁদের ধারণায় বিজ্ঞাপন, নিতান্তই বিজ্ঞপ্তি বিবরণী,—বিহুক প্রচার। বিজ্ঞাপনের সুদূরপ্রসারী দিককে আজ অবধি তাঁরা প্রাধান্য দিলেন না। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশের প্রচার শিল্পের প্রাণ-প্রাচুর্যের অভাব। দেশও তাই স্বাধীনতা পাওয়ার সতের বছর পরেও যে তিমিরে সেই তিমিরেই নিমজ্জমান। বিজ্ঞাপন বোধহীনতা যে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার একটা মস্তবড় কারণ, তা একটু চিন্তা করলেই বা পৃথিবীর অপরাপর উন্নত দেশগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এইজন্যেই পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে বিজ্ঞাপনের চাহিদা যে কত বেশী তা আমরা ভাবতেও পারি না! সেখানে সরকারের উৎসাহ এবং পরিপুষ্টতায় শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি কত বেশী পরিমাণে এবং কতভাবে বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ করেন তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। প্রতি সুসভ্য দেশই ভাবেন যে প্রচার-শিল্পই হচ্ছে জাতির জীবনের প্রকৃত আয়ুরেখা এবং দেশের শিল্প-বাণিজ্যের জীবনস্পন্দন। জাতির আয়ু এবং জীবনী-শক্তিকে বর্ধিত করতে তাই সে-সব দেশের সরকার প্রচার শিল্পকেই সর্বপ্রথম প্রাধান্য দিয়ে থাকেন,—আর পরিতাপের বিষয়, আমাদের জাতীয় সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও উদাসীন।

বিজ্ঞাপনে ব্যয় সঙ্কোচ—সরকারের এই সিদ্ধান্ত যদি কার্যকরী হয়, তবে দেশের বাণিজ্যের অপমৃত্যু ঘটবে। দেশের শিল্প-সমৃদ্ধি গড়ে উঠতে পারবে না, অথচ বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহের জন্য সরকার চান দেশজাত দ্রব্যের প্রচুর উৎপাদন ও বিদেশে রপ্তানি করা। বিজ্ঞাপন সঙ্কুচিত করলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং প্রচার-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি। তা ছাড়া ছাপাখানা, ব্লক নির্মাতা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিও বিশেষভাবে আহত হবে। এইসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেকার হয়ে পড়বেন। দেশের বেকার সমস্যা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠবে।

আজ বিজ্ঞাপন শিল্প প্রত্যেক সুসভ্য এবং প্রগতিশীল দেশে সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে; আর দুর্ভাগ্যের কথা হল; আমাদের দেশ এ ব্যাপারে একেবারেই তিমিরে। শুধু শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে নয়, জাতিগঠনে, জাতির সংহতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং সকলপ্রকার গঠনমূলক কাজে বিজ্ঞাপনের অবদান যে কত অধিক তা সকল সুসভ্য ও প্রগতিশীল দেশের সরকার মাত্রই মর্মে মর্মে অনুভব করেন অথচ আমাদের সরকার আজও তা বোঝেন নি বা বোঝবার কোন চেষ্টাও করেননি। এরচেয়ে দুঃখের ও লজ্জার কথা আর কি হতে পারে?

পৃথিবীর অন্য উন্নতশীল দেশে যেখানে বিজ্ঞাপনের ব্যয় জাতীয় আয়ের ২·৮ শতাংশ,—সেখানেও দেখি সে দেশের সরকার বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যবসায়ী সমাজকে আরও কতভাবে সচেতন ও উৎসাহিত করার প্রয়াসী। অথচ আমাদের দেশে যেখানে জাতীয় আয়ের মাত্র ০·০৬ শতাংশ বিজ্ঞাপনে ব্যয়িত হয়, সেখানে আমাদের জাতীয় সরকার আজ তাকে আরও সঙ্কুচিত করার নীতি গ্রহণে উদ্যোগী।

সরকারের বরঞ্চ অনেক আগেই কর্তব্য ছিল স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিল্পপতিদের নানাভাবে উৎসাহিত করা এবং জনসাধারণকে এ সম্পর্কে অবহিত করা এবং দেশব্যাপী একটি সুষ্ঠু বিজ্ঞাপন আদর্শের আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

শুধু শিল্পের জন্যে নয়, দেশের সংস্কৃতি ও আদর্শকেও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাতির কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনাও সরকারের ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা উচিত ছিল বহু পূর্বেই। তা না করে সরকার একে হ্রাস করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছেন তা দেশের পক্ষে কতখানি অকল্যাণকর তা বুঝিয়ে বলবার মতন লোকও কি সরকারের দপ্তরখানায় নেই?

য়ুরোপের সংবাদপত্রগুলি তাদের আয়ের ৮০ থেকে ৮৫ ভাগের অধিকও উপার্জন করে বিজ্ঞাপন থেকে। আমাদের দেশের বড় বড় দৈনিক সংবাদপত্রগুলির ক্ষেত্রে আয় ৫০ ভাগ মাত্র। আর সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপন থেকে আয় কত কম তা আমরা উল্লেখ করতেও লজ্জা বোধ করি।

অথচ, এই সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিই দেশের মেরুদণ্ড। এরাই দেশের প্রাণবহ্নিকে বাঁচিয়ে রাখে। শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামে নয়, স্বাধীনতা অর্জনে, স্বাধীনতা রক্ষণে, দেশের সংহতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা বিস্তারে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা কে না জানে? আমাদের নিতান্তই দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতা লাভ করার পরও এ সব বিষয় চিন্তা করে এদের উন্নতি বিধানে কোন সক্রিয় চেষ্টাই করা হচ্ছে না; যদিও এদের ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব জাতীয় সরকারের। বিজ্ঞাপন হ্রাস হলে এদের অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

এইসব নানাদিক চিন্তা করে সরকারের উচিত, এই মহা অকল্যাণকর পরিকল্পনাকে অচিরাৎ পরিত্যাগ করা। তা না হলে ভারতের শুধু অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক নয়,—সাংস্কৃতিক জীবনেরও যে সর্বনাশ সাধিত হবে, তা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়।

পাঠক পাঠিকার কলম

[পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক গ্রাহিকাদের কাছ থেকে আমরা প্রায়শই নানা ধরণের পত্র পাই। অনেক পত্রে চিন্তাশীলতা এবং নানা সমস্যা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও সুচিন্তিত মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন থেকে আমরা এই ধরণের প্রকাশ-যোগ্য এক বা একাধিক পত্র প্রতি সংখ্যায় দেব। এই বিভাগে শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে সমসাময়িক জীবন ও তার সমস্যা সম্পর্কে মতামত আহ্বান করা হচ্ছে।

গল্প-ভারতী-সম্পাদক]

শ্রীযুক্ত গল্প-ভারতী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

বিনীত নিবেদন,

আজকাল দেখিতেছি আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ভুল। কথায় ভুল, কাজে ভুল, ভুলে ভুলময়। সরকারী-বেসরকারী সকল পরিকল্পনায় এবং তাহাদের রূপায়ণে প্রায়শই বড় বড় ভুল ধরা পড়িতেছে। ইহাদের মধ্যে আবার বিশেষ মারাত্মক এক প্রকার ভুল ঘটিতেছে যাহার ফলে দেশের ছাত্র সম্প্রদায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। সেদিন একটি ছাত্রকে তাহার সাম্প্রতিক পরীক্ষার ফল মন্দ হইল কেন জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, আরে রাখুন মশাই, রেজাল্ট খারাপ হবে না তো কি? আপনাদের প্রশ্নে যদি গণ্ডা গণ্ডা ভুল থাকতে পারে তাহলে আমাদের উত্তরে দু'চারটে ভুল থাকবে, তা আর এমন বিচিত্র কি!...কথাটা ছাত্রটি মিথ্যা বলে নাই। প্রায়শই খবর পাওয়া যাইতেছে যে, নানা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুল!! আমাদের ছাত্রাবস্থায় আমরা এরূপ কল্পনাই করিতে পারিতাম না।...এই সেদিন ফুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ভূগোলের প্রশ্নপত্রে ভুল ধরা পড়িয়াছিল। তারপর প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় গণিতের প্রশ্নেও ভুল ধরা পড়িয়াছে। এইরূপ ভুলের ফলে ছাত্রছাত্রীরা স্বভাবতই অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়, যাহার ফলে তাহাদের সেদিনকার সমগ্র পরীক্ষাটাই অত্যন্ত খারাপ হইয়া যাওয়াও আশ্চর্য নয়।... এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোযোগ নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ফল কিছু হইবে কি? ইতি—

সুরজিৎ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা

বন্দে মাতরম্

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

গল্প-ভারতীতে চক্রপাণির লেখা 'ব্যাপার যা চলছে' আমি প্রথমেই পড়ি। কেননা তিনি যে ব্যাপার নিয়ে লেখেন, তা জাতির কল্যাণার্থ। তাঁর মত আর অমতের সঙ্গে যে আমি সব ক্ষেত্রে একমত, তা নয়। তবু সরস মন্তব্য বলেই পড়তে তো ভালো লাগেই, তার ওপর চিন্তা করার মতো খোরাকও প্রচুর থাকে।

মাঘ মাসের সংখ্যায় তিনি এক প্রকাশকের একখানা বই-এর বিজ্ঞাপন হুবহু তুলে দিয়েছেন। আমি ইচ্ছা করেই তা উদ্ধৃত করলাম না। যেহেতু তাতে ওই বিজ্ঞাপন প্রচারে প্রকারান্তরে সাহায্য করা হবে। চক্রপাণি কঠোর ভাষায় বইখানির লেখকের ও প্রকাশকের নিন্দা করেছেন এই ব'লে :

"বিজ্ঞাপনটি একটু তলিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে যে, এক লাম্পট্য-লালসা পঙ্কিল চরিত্র ব্যক্তি (তাকে লেখক বা সাহিত্যিক বলতে বাধছে) তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছে—দেশ-বিদেশের কামনা রাজ্যের দেহসঞ্চারিণী নায়িকাদের নিয়ে লালসায় পঙ্কিল আবর্তে পাপের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে যে সব কাণ্ড লেখক প্রত্যক্ষ করেছে বা যে সব কাণ্ডে অংশ নিয়েছে তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী। দু'টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে! খুব সম্ভবত প্রচুর বিক্রি হচ্ছে।

এর পরেও আরো উদ্ধার-যোগ্য মন্তব্য রয়েছে। কিন্তু চক্রপাণি তাঁরা সম্ভবতঃ আমার চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ, তবে তিনি যে 'জ্ঞানবৃদ্ধ' তাতে আমি নিঃসন্দেহ। আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারকে একটা 'সাজেশ্‌শন্' দিচ্ছি যে, এই রকমের লেখক ও প্রকাশককে প্রকাশ্য স্থানে বেত্রদণ্ডের আইনতঃ ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য। সেই ভাবে আইন প্রণয়ন করতে গেলে গোটা দেশ ও জাতির সমর্থন নিশ্চিত ভাবে সরকার পাবেন।

চক্রপাণি তাঁরাকে এই বৃদ্ধ 'বেত্রপাণি' সস্নেহ অভিনন্দন জানাচ্ছেন গল্প-ভারতীর মাধ্যমে। তিনি গল্প-ভারতীর উচ্চ আদর্শই রূপায়িত ক'রে চলেছেন চক্র হাতে নিয়ে। ইতি—চৈত্র ১৩৭১—জয় হিন্দ

শ্রীবেত্রপাণি।

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ!

সম্রাটের নির্বাসন

চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য

আত্মজীবনীর মাধ্যমে নতুন তথ্য

বিস্ময়কর উপাদান

মার্কিণ কূটচক্রের কদর্য কাণ্ড

অন্তরীক্ষে

"THE GOVT IS STILL CONSIDERING THE QUESTION OF AMENDING THE OFFICIAL LANGUAGES ACT – WE DO NOT WANT TO TAKE ANY HASTY ACTION."
— Lalyamangam Sastri

Courtesy : THE MAIL

"U. S. Ambassador Taylor in Distress in South Vietnam"

Courtesy : "SWARAJYA"

উদাত্ত আহ্বান

"আর কিছুরই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম, সরলতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ বিস্তার; বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন — উহাই জীবনের একমাত্র গতি-নিয়ামক; স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ। দেহাবসানে কিছুই থাকে না একথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু। পরোপকারই জীবন, পরহিত-চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বইজন নরপশুই মৃত প্রেততুল্য; কারণ হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত ছাড়া আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘুরিতে থাকুক, তোমাদের পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল— এগিয়ে যাও; এখনও বলিতেছি—এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পাই নাই, তখনও বলিয়াছি— এগিয়ে যাও। এখন একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি—এগিয়ে যাও। বৎস, ভয় পাইও না। উপরে তারকা-খচিত সমস্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিওনা, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে—অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সবই তোমার পদতলে।"

স্বামী বিবেকানন্দ

তাকে নিয়ে তারা একবছর আনন্দ করে। এক বছর পরে যার যেমন কর্ম তেমনি অবস্থা লাভ করে। ঐ এক বছর শ্রাদ্ধের ফলভোগ করে। পাপীদের কিন্তু ঐ এক বছরও পাপ যন্ত্রণার থেকে নিস্তার নেই।'

'পরলোকে গিয়েও কি জীবাত্মার ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে?'

'আছে বৈ কি। জীবের তুল সূক্ষ্ম কারণ—তিন দেহেই ক্ষুধা তৃষ্ণা বর্তমান। তুল দেহ খাদ্যদ্রব্য প্রত্যক্ষ ভাবেই গ্রহণ করে, প্রতি গ্রাসেই তার পুষ্টি তুষ্টি ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ে থাকে। সূক্ষ্ম দেহে কেবল আহার্য বস্তু দর্শনমাত্রই তৃপ্তি হয়। কারণ-শরীর নিজে কিছু করতে পারে না, তাই কোনো ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ যদি আহার্য বস্তু নিয়ে নিজের জঠরাগ্নিতে হোম করে তবেই তার ক্ষুন্নিবৃত্তি।'

এদিকে বাড়িতে এত বেশি ভক্ত অতিথির সমাগম হয়েছে যে তাদের জঠরাগ্নির হোম বুঝি হয় না।

বাড়ির মেয়েরা বলাবলি করছে, 'কী হবে? আজকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। এদিকে ভাঁড়ারে চাল বাড়ন্ত।'

কথাটা গোঁসাইয়ের কানে গেছে। তিনি মেয়েদের ডেকে বললেন, 'দেখ গে আলায় চাল আছে।'

'আমরা দেখে এসেছি, চাল নেই।' মেয়েরা বললে অপ্রতিভ হয়ে।

'আরেকবার গিয়ে দেখ।'

ঠাকুর বলেছেন তাই মেয়েরা দেখতে গেল। কিন্তু ও হরি, এ যে বেধি আলাই ভর্তি। এত চাল এরই মধ্যে এল কী করে? কোন পথ দিয়ে? কে নিয়ে এল? গেল কোথায়? কোন বাজারে?

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক নগেনবাবুর স্ত্রী বললে, 'সেবার আমাদের গোয়াবাগানের বাসায় গোঁসাই তাঁর ভক্তদের নিয়ে উপস্থিত। দিন-রাত মহোৎসব চলল। এক খোয়া দই, তাই দিয়ে তিন দিন মহোৎসব, কিন্তু দই ফুরোল না। গোঁসাইকে জিগগেস করলাম, এ কেমনতরো? তিন দিনেও যে দই ফুরোয় না। গোঁসাই বললেন, এ স্বয়ং মধুসূদন জোগাচ্ছেন, এ ফুরোবে কেন?'

কিন্তু বালিকা সত্যবাসীর এ কী কাণ্ড?

সত্যবাসী অভয়বাবুর ভাগ্নী, শুদ্ধবর্ণ পড়তে পারে না, অথচ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে স্তব পড়ে, আবৃত্তি করে। পূর্বজন্মে কোন এক পাহাড়বাসী মহাপুরুষের কৃপা পেয়েছিল, সেই কৃপায় এ জন্মে মাঝে মাঝে তার ভাবসমাধি ঘটে। তখন গুরুর আসন সামনে রেখে সে পুজো করে। পুজো করতে করতে কখনো তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। যখন স্তবস্তুতি করে তখন আসনে কখনো কখনো গুরুর পায়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সেই সত্যবাসী গোঁসাইজিকে বললে, 'আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।'

'সে কী, তোমার তো গুরু আছেন।'

'হ্যাঁ, তিনিই বললেন আপনার কাছ থেকে দীক্ষা নিতে। আমি ওঁকে বললাম, আপনি থাকতে অন্যের দ্বারস্থ হব কেন? তিনি বললেন, হতে হবে, তাই ভগবানের বিধান।'

গোঁসাইজি হাসলেন, বললেন, 'তোমার গুরুর আদেশ আমার শিরোধার্য। দেব তোমাকে দীক্ষা।'

দীক্ষা দেওয়ার সময় দেখা গেল সত্যদাসী আসন থেকে কিছুটা উপরে উঠে শূন্যে বসে আছে।

আরো অনেক সব অলৌকিক অবস্থা হয় সত্যদাসীর। তার বাপ-মা অভিভাবকেরা মনে করে ও সমস্ত ব্যাধি, চিকিৎসার জন্যে তারা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়।

'ব্যাধি কে বলে? এসব দিব্য লক্ষণ।' বললেন গোঁসাই, 'একে যদি ব্যাধি বলা হয় তবে তাতে মহাপুরুষদেরই অবজ্ঞা করা হয়।'

নগেনবাবুর স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবী আবার বললেন, 'বাঁশবেড়ে ব্রহ্মমন্দিরের উৎসব উপলক্ষে যে কীর্তন হয়েছিল তাতে গোঁসাই যে নেচেছিল শূন্যে উঠে নেচেছিল।

কিন্তু, ওসব থাক, আসল কথা হচ্ছে মনের স্থৈর্য। মনের একাগ্রতা।

'কিন্তু কী করে মন স্থির হবে? কী করে একাগ্র হব?' ভক্তের দল আবার গোঁসাইকে ঘিরে ধরল।

'ভগবান আছেন এটি একটি অনন্ত বিশ্বাসে আগ্রহ রাখো।' বললেন গোঁসাইজি, 'তারপর স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন—এই তিন উপায় অবলম্বন করো। প্রথমে স্মরণ—সর্বস্থানে সর্বঘটনায় স্মরণ; দ্বিতীয় মনন, মনকে সর্বসময়েই সংযুক্ত করে রাখা, চোখ ফিরিয়ে না নেওয়া, আলো দেখলে সাপ যেমন আর চোখ ফেরাতে পারে না; তৃতীয় নিদিধ্যাসন, গরুর মতন জাবর কাটা, স্মরণে-মননে যা স্বাদ পেয়েছ বারে বারে তা সম্ভোগ করা। এই তিন একত্র হলেই একাগ্রতা।'

'কিন্তু মনের উপর কর্তৃত্ব আসেনা কেন?'

'কী করে আসবে? সব সময়ে মনে যে সঙ্কল্প বিকল্প হচ্ছে। এতেই তো মনের চঞ্চলতা, তাতেই আসেনা কর্তৃত্ব। এই সঙ্কল্প বিকল্পের কারণ দুটি ইন্দ্রিয়—জিহ্বা আর উপস্থ। উপস্থ লোকে অনায়াসে দমন করতে পারে কিন্তু জিহ্বাকে বশে আনাই কঠিন। কেউ নিন্দে করল কটু কথা বলল, জিহ্বা তক্ষুনি প্রতিবাদ করে বসল। নিন্দা প্রশংসায় চঞ্চল হবে না—জিহ্বাকে বশীভূত রাখা কি সামান্য কথা?

'বশীভূত কী করে করি?'

'সাধু সঙ্গ করো, সর্বদা বিদ্যানিত্যবিচার করো অর্থাৎ সংসারের অসারতা চিন্তা করো, আর', গোঁসাইজির কণ্ঠ গাঢ় হয়ে উঠল, 'আর সর্বক্ষণ ভগবানের নাম জপ করো।'

শ্রাদ্ধ সেরে গোঁসাই আবার ফিরলেন ঢাকায়। বেশি দিনের জন্যে নয়, আবার চলে এলেন কলকাতায়, উঠলেন সুকিয়া স্ট্রীটে রাখাল রায় চৌধুরীর বাড়ি।

পোস্ট অফিসের ডেপুটি কনট্রোলার জেনারেল, উমাচরণ দাস এসে হাজির। বললে, 'সেবার আপনি বলেছিলেন আমার বাড়িতে একদিন পায়ের ধুলো দেবেন। অনুমতি করুন, একদিন আপনাকে নিয়ে যাই। কবে যাবেন বলুন?'

'যেদিন বলবেন সে দিনই যাব।' এক বাক্যে রাজি হলেন গোঁসাই।

হ্যাঁ, সেবার কথা দিয়েছিলেন, কথার খেলাপ করবেন না। সত্য কথাই তো কলির ধর্ম।

সেবার সেই আশ্বিনের ঝড়ের কথা মনে নেই? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কথা দিয়েছিলেন সপ্তাহে দু'দিন, বুধবার আর রবিবার, সমাজের উপাসনায় যোগ দেব। শুধু বিজয় নয়, কেশবসহ আরো কজন ব্রাহ্ম স্বীকার করে এসেছিল।

সেই প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে কে পথে বেরুবে? গাছ পড়েছে পোস্ট উপড়েছে, নদী ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছে নৌকো। রাস্তায় এক গলা জল, যানবাহন নিশ্চিহ্ন।

বিজয় একবার ছাদে উঠেছিল আকাশ দেখতে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ বুধবার। আর কথা নয়, কোমর বেঁধে বাড়ির বার হয়ে গেল। রাস্তায় নদী বইছে, তাতে কী, সাঁতরে পার হয়ে যাব। মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে তাতে কী, যতক্ষণ আমি না মৃত হই জল ঠেলে এগিয়ে চলি।

ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছুল বিজয়। বাড়ি ঘর সব ভেঙে চুরে গিয়েছে তবু বিজয়ের ব্রতভঙ্গ হয়নি।

আর কেউ গিয়েছিল?

'না, আর কেউ যায়নি। যখন তাড়া দিয়ে উপাসনা সেরে ফিরে আসছি দেখি কেশববাবু পাখিতে করে যাচ্ছেন।'

তখন একসঙ্গে গিয়ে আবার উপসনা করল দু'জনে। সর্বতোভাবেই সঙ্কল্প রক্ষা করল বিজয়।

উমাচরণ দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিল। আর সেই নির্দিষ্ট দিনক্ষণে নিতে এল গোসাইকে।

উমাচরণের বাড়ি পৌঁছুতে না পৌঁছুতে প্রবল জ্বর হল গোসাইয়ের। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলেন। তিন দিন তিন রাত রইলেন প্রায় বেহুঁসের মত, প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি। পরে আবার আপনা আপনিই জ্বর ছেড়ে গেল।

'এ জ্বর ভোগের হেতু কী?' জিজ্ঞেস করল ভক্ত।

'গুরুবাক্য লঙ্ঘন।' গোসাইজি বুঝিয়ে বললেন, 'ঐ সময় পরমহংসজী একটা নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত আসন ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু উমাচরণবাবু এসে অনুরোধ করায় ভিবার পড়লাম, এখন কী করি? নিজের বাক্য রক্ষা করে সত্যপালন করি, না, পরমহংসজীর আদেশ পালন করে ঐ বাক্য অগ্রাহ্য করি। ভাবলাম সত্যপালন করাই বুঝি ঠিক হবে। না, গুরুদেব বুঝিয়ে দিলেন গুরুবাক্য লঙ্ঘন করে সত্যপালনও অপরাধ।'

মহরমের মিছিল যাচ্ছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছেন গোসাই। হাসেন হোসেন বলে বুক চাপড়ে কাঁদছে লোকেরা আর তাদের পিপাসা শান্তির জন্যে রাস্তায় জল ঢালছে। বেদনায় দ্রবীভূত হলেন গোসাই। বললেন, চলো আমরাও গিয়ে জল দিই।

কিন্তু যার বাড়িতে আছে সে রাখালবাবুকেই মেরে বসল মহেন্দ্র।

গোসাই ভিতর বাড়িতে গেছেন, এই ফাঁকে মহেন্দ্র তাঁর ঘর পরিষ্কার করতে লেগেছে। আসনের ধারের ফুল-পাতা ফেলে দিয়ে আসনের কিছুটা তুলে তার নীচেটা ঝাঁট দিতে যাচ্ছে, রাখাল বাবু রুখে এলেন: 'এ কী করছেন? ঝাঁটা যে ঠাকুরের আসনে লাগবে।'

মহেন্দ্র রাখালের কথা গ্রাহ্যই করলনা।

'সে কী মশাই, শুনছেন না নাকি? আসনে যে ঝাঁটা লাগছে।' মহেন্দ্রের হাত থেকে রাখাল ঝাঁটাটা কেড়ে নিতে চাইল।

এতবড় স্পর্ধা! ক্রোধান্ধ মহেন্দ্র ঝাঁটা দিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল রাখালকে।

রাখাল একেবারে স্তব্ধ। লাখুটিয়ার জমিদার, কত তার প্রবল প্রতাপ, একটা কড়ে আঙুলও তুলল না। মহেন্দ্র তো ঠাকুরেরই ভক্ত, তার অমর্যাদা ঘটাল না। কে জানে কেন এই প্রহার, কে জানে এই প্রহারে কোন অপরাধের ক্ষালন হল।

গোসাই শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। বললেন, 'মহেন্দ্রবাবুর আচরণ অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

রাখালবাবু ইচ্ছে করলে অনায়াসে দারোয়ান দিয়ে অপমান করতে পারতেন, কিন্তু তা করেন নি। এতে বোঝা যাচ্ছে রাখালবাবু কত মহৎ, কী অমায়িক তাঁর সহিষ্ণুতা!'

গোঁসাইকে মেনে রাখালবাবু আগে ব্রাহ্মমত ধরেছিলেন, এখন আবার সেই গোঁসাইকে মেনেই আরেক রকম হয়েছেন। এখন ভোর সকালে গায়ত্রী জপ করেন, পিতৃ পুরুষের তর্পণও তাঁর নিত্যক্রিয়া।

একদিন গোঁসাইকে বললেন, 'কী দেখলাম বলুন তো।'

'কী দেখলে?'

'দেখলাম অন্তরীক্ষে একটি জ্যোতির্ময় গোলাকার চক্র।'

'হ্যাঁ, ওটা দেবতার ছাঁচ।' বললেন গোঁসাই, 'বিশেষ ভাবে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালে ওর মধ্যে দেবতার মূর্তি দেখা যায়।'

'আর দেখুন তো, সাধনকালে মাঝেমাঝে ধূপধুনা গুগগুলের গন্ধ পাই। এর অর্থ কী?'

'এর অর্থ আপনার কাছে কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে।' বললেন গোঁসাই, 'কোনো মহাপুরুষ এলে ওরকম সুগন্ধ পাওয়া যায়। ওটা তাঁদের গাত্রগন্ধ। কিন্তু শুনুন, এ কথা কাউকে প্রকাশ করবেন না। প্রকাশ করলে আর আসবেন না তাঁরা। ওঁদের আসতে দিন, ঐ গন্ধই ক্রমে ক্রমে আনন্দলোকে নিয়ে যাবে আপনাকে।'

'আচ্ছা, আপনার প্রতি আমার সঙ্কোচ ভাব যায় না কেন?' শিষ্য শ্যামাকান্ত একদিন জিগগেস করলেন গোঁসাইকে।

'নিজেকে যেমন পাপী মনে করেন আমাকেও তেমনি পাপী মনে করবেন, তাহলেই আর সঙ্কোচ ভাব থাকবে না।' গোস্বামী প্রভু বলতে লাগলেন তত্ত্বের মত: 'যেমন নন্দ-যশোদা গোপালকে দেখতেন তেমনি চোখে দেখবেন। শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ অনুগ্রহ দেখালে শ্রীমতী গর্বিতা হলেন, ফলে আন্তর্হিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তখন সখীদের নিয়ে শ্রীমতী কাঁদতে বসলেন, শ্রীকৃষ্ণকে তখন প্রকাশিত হতে হল। প্রকাশিত হয়ে করলেন রাসলীলা। তখন শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীমতীকে দেখে সখীরা আত্মহারা, আবার সখীদের পাশে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে শ্রীমতী আত্মহারা। গুরু-শিষ্য সমান, গুরু-শিষ্য একত্র হয়ে কাঁদলেই ভগবান প্রকাশিত হন। তখন গুরু শিষ্যকে ভগবানের পাশে দেখে কৃতার্থ, আর শিষ্যও গুরুকে ভগবানের পাশে দেখে আপ্তকাম।'

আরেকজন সমবেত ভক্তদের দেখিয়ে বললে, 'এরা কি সবাই আপনার শিষ্য?'

'আমরা সবাই এক—সকলেই ধর্মার্থী হয়ে একত্র বাস করছি।' বললেন গোঁসাই, 'ভগবানই একমাত্র গুরু। তিনিই একজনের মধ্য দিয়ে অন্যকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এই মন্ত্রে গুরু যদি মনে করে আমি গুরু আর এ আমার শিষ্য তা হলেই গুরুর পতন।'

প্রতাপ মজুমদারের ছোট ভাই এসে হাত পেতেছে গোঁসাইয়ের কাছে। মানে কিছু পয়সা চায়।

গোঁসাই তাকে দিলেন কিছু পয়সা। প্রণাম করে লোকটা চলে গেল তুষ্ট মনে।

রাখালবাবু বললেন, এ পয়সা দিয়ে তো ও মদ খাবে।'

'জানি।'

'জানেন? কী আশ্চর্য, জেনে শুনে একটা মাতালকে প্রশ্রয় দিলেন?'

সহানুভূতি-মাখানো সুরে প্রভু বললেন, 'ওর মদ যে এখন দারুণ প্রয়োজন। মদ না পেলে যে ওর এখন জীবনধারণ কষ্টকর হবে। একটা অভ্যাস করে ফেলেছে, এখন আর তার কী করা!'

রাধাদেবীর বুঝে উঠতে পারলেন না এ রহস্যের ব্যাখ্যা কী!

গোসাই তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি যদি ওকে পয়সা না দিতাম, ও চুরি করত। চুরির পাপ থেকে ওকে রক্ষা করলাম।'

ভবানীপুরে মনোরঞ্জন গুহের ছেলের অন্নপ্রাশনে গোসাই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। আর এসেছে এক রামাচারী সাধু।

সাধুকে খেতে দেওয়া হয়েছে, সে বললে, 'ক্রিয়া না করে ভোজন করা যাবে না।'

'বেশ তো ক্রিয়া করে নিন।' সবাই বললে সাধুকে।

'ক্রিয়া করতে হলে কারণ লাগবে।'

সকলে বিরক্ত হল। এখানে কারণ মিলবে কোথায়? মদের আমদানি হলে কেপে যাবে অতিথিরা।

গোসাইজি শুনলেন। মনোরঞ্জনকে বললেন, 'এ সাধু অভ্যাগত। দেবতার মত এঁকে সেবা করবে। যা উনি চান তাই এনে দেবে।'

'উনি যে মদ চান।'

'হ্যাঁ, মদ নিয়ে এলেই এঁর চিত্ত বিনোদন করবে।'

গুরু-আজ্ঞা মানল মনোরঞ্জন। তন্ত্রমতে সাধু ক্রিয়া করলেন। ক্রিয়ার শেষে তুষ্ট মনে বসলেন ভোজনে।

হঠাৎ মাঝরাতে উঠে গোসাই কুলদাকান্তকে বললেন, 'দারুণ খিদে পেয়েছে, শিগগির কিছু খেতে দাও।'

কুলদা সামনে খাবার নিয়ে এল। তাই খেয়ে আবার শুয়ে পড়লেন গোসাই।

কী রহস্য তা কে জানে!

জানে শুধু সেই মাদারিপুরের শিষ্যটি যে প্রভুকে দর্শন করবার জন্যে গৃহ থেকে যাত্রা করেছে। প্রতিজ্ঞা করেছে গুরুদেবের দর্শনের আগে জল গ্রহণও করবেনা। সারা দিন টিমারে অভুক্ত কাটিয়ে সন্ধ্যায় গোয়ালন্দে পৌঁছেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় সমস্ত দেহ ভেঙে পড়ছে তবু প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে না। রাত দশটায় গোয়ালন্দ থেকে কলকাতার ট্রেন ছাড়ল, ট্রেনের কামরায় একটা বেঞ্চির উপর শুয়ে শিষ্য ক্ষুধার যন্ত্রণায় ককাতে লাগল, তবু, না, কিছু খাব না। প্রাণ যদি যায় তো যাবে, প্রভুকে দর্শনের আগে দেহের আবার খাদ্য কী!

মধ্যরাত্রে শিষ্যের হঠাৎ মনে হল, ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু নেই, সমস্ত দেহে অগাধতৃপ্তি, দু চোখ ভরে সুখ শান্ত সুনিদ্রা।

কে ক্ষুধা মোচন করল? কে এনে দিল উপশম?

পরদিন মধ্যাহ্নে শিষ্য এসে হাজির। প্রভুকে দর্শন করে প্রণাম করে দাঁড়াতেই প্রভু তাকে তাঁর প্রসাদের থালা এগিয়ে দিলেন।

কী আশ্চর্য, প্রভুর কৃপায়, এখন, হ্যাঁ, এখুনিই শিষ্যের প্রথম ক্ষুধাবোধ হচ্ছে।

যার ক্ষুধা তাঁরই তৃপ্তি। (ক্রমশঃ)

চিঠি শুধু চিঠি নয়

(শ্রীহেমন্তকুমার সরকারকে লিখিত)

বৃহস্পতিবার
বৈকাল
১৯।৬।১৪

ট্রাম হইতে নামিয়া বুকটান করিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম। সত্যেনমামা ও একটি পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা হয়। তাঁরা একটু আশ্চর্য্য হইল। ভিতরে পিসামহাশয় মামা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হল। মার কাছে খবর গেল। অর্দ্ধেক পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। প্রণাম করিলাম—তিনি দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে এইমাত্র বলিলেন—"আমার মৃত্যুর জন্য তোমার জন্ম। আমি এতক্ষণ থাকিতাম না গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিতাম, কেবল পারি নাই মেয়েদের জন্য।" আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। তারপর বাবার সঙ্গে দেখা। তিনিও প্রণামান্তে আলিঙ্গন করিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন। অর্দ্ধেক পথে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং ঘরে অনেকক্ষণ আমাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া যখন কাঁদিতেছিলেন তখন আমার মনে হইতেছিল শুভ্র জ্যোৎস্না মধ্যবর্ত্তী সেই কচি মুখখানি যাহার জন্য মন ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু পরীর মন পায়ে নাই। তারপর তিনি শুইয়া পড়িলেন, আমি ধীরে ধীরে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। তখন তিনি বোধহয় ব্রহ্মসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় গিয়াছিলাম। সমস্ত frankly বলিলাম—টাকার কথা বলিলাম। হরিপদের কথা তাহারা টের পাইয়াছে তোমার কথা তাঁদের কাছে বলিবার আবশ্যক হয় নাই তাই বলি নাই—মামা জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছি। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কেবল বলিলেন একখানা চিঠি দাও নাই কেন।

নানাস্থানে টেলিগ্রাম ও খোঁজ করা হইয়াছিল। মা active ছিলেন বাবা passive কতকটা যা হয় হবে। পুলিশে খোঁজ করান হয়না একজন পুলিশ কর্ম্মচারী relative বারণ করিয়াছিলেন। মা পাগল প্রায়, আমি বাড়ী ছাড়িয়া যাইব তাই অগত্যা এক মামা (আমেরিকা প্রত্যাগত চলিলেন আমার অনুসন্ধানে, বৈদ্যনাথ ও দেওঘরে পাহাড়ে সব খোঁজ করিয়া একখানি পত্র দিয়াছেন—আজ পৌঁছিয়াছে তাহার মর্ম্ম শুনিয়াছি। বালানন্দের কাছে গিয়াছেন। আর একজন ব্রহ্মচারী বলিলেন। "যদি উপযুক্ত না হইয়া গিয়া থাকে তবে ধাক্কা খাইয়া ফিরিবে। না হয় ফেরাইবার চেষ্টা বৃথা।"

বেলুড়ে খোঁজ করা হইয়াছিল, হরিদ্বার Ramkrishna Mission-এ wire করা হইয়াছিল —negative reply। Howrah-র একজন গণৎকারের কাছে যাওয়া হইয়াছিল, তিনি বলেন, ফিরিয়া আসিবে ১৯।২০ দিনের ভিতর—ভাল আছে, একলা নাই, সঙ্গে দুজন আছে, উত্তর পশ্চিমে 'ব' দিয়া

কোন স্থান আছে—তখন বোধহয় বারাণসীতে। তিনি আরও বলেন, centray influence-এর জন্য সে সন্ন্যাসী হইতে পারিবেনা, সংসারী হইবে। তাঁর মাথায় আছি। তিনি কচুপোড়া জানেন।

সকলের মধ্যে রবেন দাদুর খুব favourable. সতোন বলেন, most obdt হও, তার জীবনের ideal যেন তাই। আর বিশেষ কেউ বলে নাই।

এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তিনি বেশ reasonable. তিনি বলেন, boldly বলে করে—talk the matter over and then be a Sannyasin-কে তোমার পথে বাধা দিতে পারে?

দুপুরে ফের বাবার সঙ্গে অনেক কথা হয়। নানা মত লইয়া, সন্ন্যাসী ধর্ম সম্বন্ধে এবং ব্রহ্মণের সম্বন্ধে। বলিলাম কাহাকেও পছন্দ হইল না। তার সঙ্গে আমার ideal-টা বলিলাম। সমস্ত discussion-এ what he wanted to drive at was - (১) সংসারে থেকে ধর্ম হয় কিনা, (২) ত্যাগের জন্য Preparation দরকার, (৩) কর্তব্য ত্যাগটা কি ঠিক—আমি বলিলাম, (১) সকলের পক্ষে এক ঔষধ নয়, কারণ সকলের এক রোগ, এক সামর্থ্য নয়, (২) সংস্কারের উপর ত্যাগটা অনেক নির্ভর করে - সকলের জন্য বেশী বলা মানা প্রয়োজন না হইতে পারে (৩) কর্তব্যটা relative, higher call চলে lower calls ভেসে যায়, জ্ঞান এলে কর্মনাশ হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন—অদ্বৈতজ্ঞান "ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা" একটি theory, কিনা বলিলাম যতক্ষণ মুখে বলছি ততক্ষণ theory কিন্তু realise করিলে সত্য এবং realise করা যায়। যাহারা একথা বলে গেছেন তাহারা realise করেছিলেন এবং বলে গেছেন আমরা realise করিতে পারি। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কারা করেছিলেন এবং প্রমাণ কি?" বলিলাম—"ঋষিরা" প্রমাণ "বেদাহমিতি" এই বলিয়া শ্লোকটা quote করিলাম। তারপর বলিলেন—"এক সময়ে কলিকাতা মহর্ষি দেবেন্দ্র, কেশবচন্দ্র, ও পরমহংসদেব ছিলেন, যে যে রকম পেরেছিলেন সেই রকম হয়েছিলেন। আমি বলিলাম, বিবেকানন্দের ideal হচ্ছে আমার ideal।

শেষে বলিলেন, আচ্ছা যখন তোমার higher call আসিবে তখন আমরা দেখিব। আমি এতদিন বাবাকে actively oppose করি নাই—passively I have won the victory. এখন তিনি জোর করিয়া আমাকে কিছু বলিতে পারেন না। এবং next time চলিয়া গেলে বোধহয় আর ফিরাইবার চেষ্টা ও সংকল্প ত্যাগ করিবেন।

যাহা হউক আসাতে ভাল হইয়াছে এখন দেখিতেছি।

মা fanatic, বলেন—আর যদি ও যায় আমি আর থাকিব না—সঙ্গে সঙ্গে যাইব আর বাড়ীতে ফিরিব না। ওঁকে বুঝিবার চেষ্টা সফল হইবে না বলিয়া বোধহয়। বাবাকে দেখিলাম খুব reasonable.

বেশ ভাল আছি। তুমি কেমন আছ লিখিবে। তোমার

সুভাষ

শেষ সন্ধ্যায়

সন্তোষকুমার দত্ত

সুপ্রকাশ সেদিন চলে গিয়েছিল। মনের মধ্যে কোন আর হতাশা নিয়ে গিয়েছিল কিনা, তা উমা জানে না। তবে সেই শেষ। তারপর থেকে আর কোনদিন এ-বাড়ীতে সে আসেনি।

সন্ধ্যার অন্ধকার উমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। কিংবা নিজেকে অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে উমা।

আজথেকে চার বছর আগের এক সন্ধ্যার কথা তার মনে পড়ল। সেদিনও এমনি ছাদের ওপর দাঁড়িয়েছিল সে। পাশে ছিল সুপ্রকাশ। সন্ধ্যার অন্ধকার আজকের মত তাদের দু'জনের অস্তিত্বকে সেদিন মুছে ফেলেছিল।

তার হাত দুটো সুপ্রকাশের হাতের মধ্যে ধরা ছিল। বিপুল উচ্ছ্বাসে সুপ্রকাশের মুখ থেকে অনর্গল ভালবাসার কথা বেরিয়ে আসছিল। সেই সঙ্গে স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাষ।

উমার যে ভাললাগেনি, তা নয়। বেশ লেগেছিল সুপ্রকাশের কথাগুলো। সে যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল সেই উচ্ছ্বাসের সামনে।

সুপ্রকাশ এক সময় কথা থামিয়েছিল। অপলক চোখে (অন্ধকার থাকলেও উমা অনুমান করেছে) তার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর প্রশ্ন করেছিল, 'তাহলে তুমি রাজী—?'

'—জানিনা।'—কথাটা উমা লজ্জায় বলেনি। সম্মতির একধরণের নেতিবাচক উত্তরও তা নয়। সত্যিই সে তখনও পর্যন্ত নিজের মনকে ঠিকমত বুঝতে পারেনি।

অথচ সুপ্রকাশ এই কথাটার অন্য মানে করেছিল। তার দু'চোখে যেন আলো জ্বলে উঠেছিল—যা সেই অন্ধকারের মধ্যেও উমার দৃষ্টি এড়ায়নি।

সুপ্রকাশ তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল।

এক অনাবাদিত সুখাবেগে উমাও বিহ্বল হয়েছিল প্রথমে। কিন্তু ওই প্রথম কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই সচেতন হয়েছিল সে। সুপ্রকাশকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিল '—না—ছিঃ—!'

'কেন—!' সুপ্রকাশের বিহ্বলতা তখনও কাটেনি। উমার স্খলিত আঁচল তখনও তার হাতের মুঠোয়। '—এখন আর আপত্তি কিসের!'

উমা শুধু আগের কথাটার পুনরাবৃত্তি করেছিল; '—না,—ছিঃ—!'

আর একবার কাছে টানার চেষ্টা করে সুপ্রকাশ বলেছিল; 'উমা—লক্ষ্মীটি—!'

'না—না—না—!' প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল উমা। জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল সে।

কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুপ্রকাশ। তারপর নীচে নামবার জন্যে পেছন ফিরেছিল; গলার স্বরে অদ্ভুত একটা আওয়াজ তুলে বলেছিল; '—আচ্ছা—!'

উমা—, ক্রতলয়ে ওঠা-নামা বুকের ওপর হাত রেখে, নীচের দিকে তাকিয়েছিল শুধু। তার দু'চোখে আতঙ্ক! ছাদের সিঁড়িগুলো কি এক ভয়ংকর আকর্ষণে তাকে যেন টানছে।

তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গিয়েছিল সে।

ছবিটা এত স্পষ্ট আর উজ্জ্বল যে, এখনও—এই চারবছর পরেও তার বুকের মধ্যে আলোড়ন আসে।

শুধু তাই নয়, তার সংগে তীব্র ঘৃণা আর একধরণের স্বস্তি।

এই স্বস্তিটা এমনই যে, মনের পাখী যেন এক অনিবার্য খাঁচার বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। আজ,—চারবছর পরেও উমা এই মুক্তির জন্যে বারবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়।.....

তার নির্জন চিন্তায় বাধা পড়ল। পাশে এসে দাঁড়াল রুমা।

উমার থেকে বছর পাঁচেকের ছোট, কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে তারা যেন সমবয়সী। '—দিদি।' রুমা তার গায়ের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল।

উমা ঘাড় ফেরাল; '—কিছু বলবি?'

রুমা মাথা নীচু করল। অন্ধকারে তার মুখখানা অস্পষ্ট হল। উমা অনুমান করল, সে কাঁদছে। এক অব্যক্ত মর্মবেদনা কান্না হয়ে গলে পড়ছে।

কোন কথা বলল না উমা। তাকে কাঁদবার সুযোগ দিল। নিষ্পলকের মত অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সে। সেখানে তখন দু'একটি নক্ষত্রের আবির্ভাব।

সেদিকে চেয়ে উমা ভাবল:—কাঁদুক। কান্নাটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। মনের ভার নামিয়ে রাখার এমন উপায় আর আছে!

ভাবতে ভাবতে উমা একসময় তদ্‌গতচিত্ত হল।

চারবছর আগে সেও ঠিক এমনি করেই কেঁদেছিল। না,—সুপ্রকাশের সংগে বিচ্ছেদের শোকে নয়। নিজের ভুলের জন্যে।

ভুল—? উমার চিন্তা তার মনকে প্রশ্ন করল। মন উত্তর দিল;—নিশ্চয়ই। যার হাতে হাত রেখে তুমি সুন্দরের স্বপ্ন দেখেছিলে, সে যে তোমায় কোন নরকে নিক্ষেপ করছিল তা বুঝি ভুলে গেছ!

না—ভুলিনি।—উমা মাথা নাড়ল। ভুলতে পারিনি বলেই কোথাও বাঁধা পড়িনি। সেদিনের চোখের জলে আমার মিথ্যা মোহের কাজল ধুয়ে গেছে।

মোহছাড়া আর কি। আর কোন বিশেষণে সুপ্রকাশের ভালবাসাকে অভিহিত করা যায়!

উমার হাসি পেল। হ্যাঁ—, এই বিষণ্ণ সন্ধ্যার অন্ধকারে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকা ছোট বোনের পাশে দাঁড়িয়ে তিক্ত হাসি হাসল আপন মনে। কত ভালবাসার কথাই বলেছিল সুপ্রকাশ:—আচ্ছা—উমা; মনে কর এমন দিন যদি আসে—যখন পুরো একটা দিন তোমাকে দেখতে পাবো না! তুমি তাহলে কি করবে বলতো—।'

উমা মুখ টিপে হেসেছিল: '—কি আর করবো! মনের কথা মনেই চেপে রাখতে হবে।'

'শুধু তাই—।' বিস্ময়ে সুপ্রকাশের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল সে। তারপর বলেছিল: 'আমি কিন্তু পারবো না। সেখানে—যেভাবেই থাকিনা কেন, অন্তত একবার তোমাকে দেখতে আসতে হবেই।'

উমা -, চারবছর আগের উমা এখনকার তুলনায় ছেলেমানুষ বলতে হবে। তাই তার কথায় ছেলেমানুষীর সুর শোনা গিয়েছিল: '—এমন ত' হতে পারে, তোমাকে হয়ত তোমাদের বিলাশপুরের অফিসে বদলী করে দিল!'

'—দরকার হলে;—' সুপ্রকাশ তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। দৃঢ় স্বরে বলেছিল; '—তোমার জন্যে আমি চাকরীও ছাড়তে পারি।'

—সেই সুপ্রকাশ।

আজকের প্রাপ্তযৌবনা শান্ত উমা চার বছর আগের অনভিজ্ঞ উমাকে চোখ রাঙাল: 'মুখের মিষ্টিকথা আর সুন্দর চেহারা দেখে ভুলেছিলে তুমি। মানুষটার মনটাকে যাচাই করে দেখনি। সেই জন্যেই তুমি ঠকেছ—।'

'—অবশ্য—;' সেই সঙ্গে একটু সহানুভূতি দেখাল: '—যাচাই করার মত বিচারবুদ্ধি তখনও হয়নি।'

না হলে সুপ্রকাশের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে সে অমন আকুল হয়ে কেঁদেছিল কেন! চোখের জলে চারপাশের দৃশ্যমান জগৎকে অন্ধকার বলে মনে হয়েছিল কেন!

...তারপর একটি একটি করে দিন কেটেছে আর আস্তে আস্তে সুপ্রকাশ সম্বন্ধে নিস্পৃহ হয়ে উঠেছে সে।

সেই অবসরে সুপ্রকাশের প্রকৃত পরিচয় তার কাছে একটু একটু করে ফুটে উঠেছিল। উপমাটা চোখ বুজিয়ে কল্পনা করল উমা: ভোরের আলোর স্পর্শে ব্রাহ্মমুহূর্তের পৃথিবীর মত।

এই ক'বছরে সেই অস্পষ্টতার কুয়াশা কেটে গিয়েছে। সুপ্রকাশকে ভাল করেই চিনেছে উমা। তার লম্পট-মনের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উমা ভাবে, হ্যাঁ—সে আজও মনে করে, নরক শুধু কুৎসিত নয়। সুন্দরের ছদ্মবেশেও মানুষকে সে প্রতারণা করে। বিদ্রূপ অসুন্দর আর নোংরা নরকের চেয়েও সুন্দরের আবরণে যে নরক—তা আরও ভয়ংকর, উমা তাই আজও শিউরে ওঠে মনে মনে।

সেই শিহরণে তন্ময়তা ভাঙল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, রুমা তখনও পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কান্না খেয়েছে কখন।

কোন রকম ভূমিকা করল না উমা! '—আমার মনে হয়, তুই ভুল করেছিস—!'

'না—দিদি!' রুমার গলার স্বরে আকুতি; '—ও কক্ষনো এমন হতে পারে না। আজ ছ'মাস ধরে ওকে দেখছিস তো—'

উমা নীরব। কিন্তু তার মন মুখর হয়ে উঠল: তা—ঠিক! সুপ্রকাশকে সেও পুরো একটি বছরে চিনতে পারেনি।

এই নীরবতার একটা অন্য অর্থ করল রুমা। সেটা তার স্ব-পক্ষেই। তাই উমার হাতখানা সে গভীর আবেগে টেনে নিল; '—দিদি।'

উমা বুঝল—ও কি বলতে চায়।

একটু অপেক্ষা করল সে। একটু কঠিন শুষ্কতা। তারপর বলল, '—না।'

উমার হাতখানা রুমা যে হাত দিয়ে ধরেছিল, সেই হাতটা কেঁপে উঠল একবার। তারপর আস্তে আস্তে আলগা হয়ে গেল।

এবার উমার পালা। ছোটবোনের হাতখানা মুঠোর মধ্যে টেনে নিতে গেল সে। কিন্তু তার আগেই রুমা নিজেকে দূরে সরিয়ে নিল। একটু যা অপেক্ষা করল। তারপর দ্রুতপদে নীচে নামবার সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াল।

ছাদের ওপর তখনও রইল উমা। একা।

পরদিন সকালে রান্নাঘরে বসে কুটনো কুটছিল উমা। তার ঘুম সাড়ে-ছ'টায়। কিন্তু বাবা অফিসে বেরিয়ে যান ন'টায়। একটু সাহায্য না করলে মা পেরে ওঠেন না।

ওঘরে রুমা বই খুলে (খুব সম্ভব) পড়ছিল। আজ তার ছুটি। কলেজ যাবার তাড়া নেই। অন্যদিন এতক্ষণে সে রান্নাঘরে এসে দাঁড়াত। মা'র হাত থেকে খুন্তিটা নিয়ে বলত : 'তুমি সরো দেখি —আমি রাঁধছি।'

উমার ভ্রূ'দুটো কুঞ্চিত হল একটা বিশেষ কারণেই : মা'কে একবার বাজিয়ে দেখবে নাকি—! মন্দ কি—!

বঁটিখানা পাশে সরিয়ে রেখে উমা উঠে দাঁড়াল। মার মুখের দিকে (মা'র অলক্ষ্যেই) একবার তাকাল। তারপর সুরু করল : '—রুমাটা গেল কোথায়! অন্যদিন এতক্ষণে রান্নায় বসে যেত—!'

ডালের কড়াটা নামিয়ে রাখতে রাখতে মা উত্তর দিলেন : —'ঘরেই ত' আছে। বোধহয় শরীর-টরীর খারাপ হয়েছে, তাই—।'

উমা ভেবেছিল, মা'র কথা বুঝি শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই পরবর্তী বক্তব্যের জন্যে সেও তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই মা বললেন : 'অরবিন্দ আজ ক'দিনই আসছে না। ফাল্গুন মাসের শেষ। এই সময়েই আবার চারদিকে অসুখ-বিসুখ করে। কী জানি, ছেলেটার তেমন কিছু না হলেই বাঁচি।'

উমা চুপ করে রইল। অল্পক্ষণ। তারপর মা'র মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে সেখানে বলল। বলল ; '—রুমাকে তুমি একটু বুঝিয়ে বলো—।'

'তার—মানে—।' মা তার চোখে চোখ রাখলেন।

'—অরবিন্দবাবু আর এবাড়ীতে আসবেন না বোধহয়!'

'কেন—! কি হয়েছে তার—?'

উত্তর দিতে গিয়ে উমা হাসল একটু। বিচিত্র সেই হাসি। ক্ষোভ আর ঘৃণা প্রকাশের সেই ভংগীটি যেমন তির্যক তেমনি অর্থপূর্ণ।

মা'র বিস্মিত, ধোঁয়া চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে উমার হাসিটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। মা'র দিকে আর একটু সরে গেল সে। গলার স্বর নামিয়ে বলে যেতে লাগল—অরবিন্দের অন্তর্ধানের কারণ। রুমাকে সে বিয়ে করতে চায়না। জীবনে উন্নতি করতে চায়। তার জন্যে তাকে বাইরে যেতে হবে। সবকিছুই একরকম ঠিক হয়ে গিয়েছে। মাস তিনেক পরেই সে টেক্সটাইলের কাজ ভাল করে শেখার জন্যে পশ্চিম জার্মানী চলে যাচ্ছে। সেখানে আড়াই বছর থাকবে।

সুতরাং রুমা যেন তাকে ভুল না বোঝে……

মোটামুটি আভাস দিয়ে উমা চুপ করল।

কিন্তু মা বড় বোকা। উমা অন্তত তাই মনে করল। না হলে একথা শোনার পরেও কি কেউ জিগ্যেস করে; '—তা সেখান থেকে ফিরে এসেও কি রুমাকে বিয়ে করতে পারে না! মেয়েতো আর দেখতে শুনতে খারাপ নয় বাপু।'

মনের কথাটা উমা মুখেই বলল: 'দেখ মা—; তুমি বড় বোকা। সব মানুষ ত' আর তোমার মত নয়। তোমাদের কাল আর নেই। আমরা যে কী যুগে বাস করছি—তা আমরাই জানি—।'

কথার মধ্যে বক্তৃতার ভাব এসে যাচ্ছে বলে উমা থামল। এবং এক সময় রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বিছানায় ওপর পা ঝুলিয়ে বসে, আজকের সাতাশ বছরের উমা—তেইশ বছরের উমার মুখোমুখি হল।

তেইশ বছরের উমা তন্বী—সুন্দরী। দুটি চোখে স্বপ্নমাখা দৃষ্টি। কলেজের মধ্যে ভাল রেজাল্ট করা মেয়ে।

আর আজকের উমা—, সাতাশ বছরের এক বাস্তববাদিনী। অবয়বে মুলতার আভাস। দুটি চোখে শানিত ইস্পাতের দীপ্তি।

আজকের উমা—, সেদিনের উমার দিকে ভ্রূকুটি করল: —কেমন! সেদিন যে বড় কেঁদেছিলে তুমি! সুপ্রকাশকে ফিরিয়ে দিয়ে তারপর তারই জন্যে অস্থির হয়েছিলে! আজ রুমাকে দেখে বুঝতে পারছ ত'—কী যুগে আমরা বাস করছি! পুরুষের কাছে আজ মেয়েদের প্রয়োজন কিসের জন্যে দেখছ ত'—!

সেদিনের উমা, আজকের উমাকে সমর্থন না করে পারল না। সে যেন তার পাতলা ঠোঁটের সুন্দর হাসি দিয়ে বলল: 'শেষ পর্যন্ত নিজেকে ত' আমি সামলে নিয়েছিলাম—!'

'নিশ্চয়ই—।' আজকের উমা মাথা নাড়ল আপন মনে। 'কথাটা সত্যি। সেদিন তুমি শক্ত না হলে আজ আমার কোন অস্তিত্ব থাকত না। পুরুষের লালসার খোরাক হয়ে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ অবমানিতা নারীর মধ্যে আমি হারিয়ে যেতাম। তলিয়ে যেতাম।'

উমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল;—রুমার জন্যে দুঃখ হয়। অরবিন্দকে সত্যিই ভালবেসেছে। ছেলেটার মধ্যে একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল। আর এই জন্যেই রুমা কোনদিক ভেবে দেখল না। তার অবস্থা হল আলো দেখা পতঙ্গের মত। সত্যিই ওর জন্যে কষ্ট হয়—।

উমা উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করল। টেবিলের গায়ে লাগানো বড় আয়নার সামনে দাঁড়াল একবার। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রুমার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল উমা। কয়েকটি মুহূর্ত·····। কিন্তু—না, সে ঢুকল না। ফিরে এল।

রুমা সব কথাই উমার সংগে গল্প করেছিল। বয়েসে কয়েক বছরের বড় হলেও মানসিক সাম্য ছিল তাদের মধ্যে। তাই অরবিন্দের সংগে আলাপের সুরু থেকে মধ্যপর্বের ইতিহাস উৎসাহের সংগে বলে গিয়েছিল রুমা।

উমা শুধু চুপ করে শুনেছিল। কোন প্রশ্ন করেনি। মন্তব্য করেনি।

তার সেই নীরবতায় অস্বস্তিবোধ করেছিল রুমা : '—তুই রাগ করলি দিদি—?'

'না—রে, না।'

'তবে কিছু বলছিস না যে!' উমার চোখে চোখ রেখে হেসেছিল সে। তারপর নিজেই আরম্ভ করেছিল ; 'না—রে, সত্যিই ভাল। একেবারে পারফেক্ট, জেন্টলম্যান। কথা দিয়ে কথা রাখার মত সাহস আছে।'

উমা খুশীর ভাব দেখিয়ে বলেছিল : 'ভালই ত।'

কিন্তু এ সব দু'মাস আগের কথা।

তারপর কেমন করে রুমার ভালবাসার ইতিহাস মধ্যপর্ব থেকে শেষপর্বে এসে দাঁড়িয়েছে—তা উমা জানে না। খোঁজও রাখেনি।

জানতে পারল তখন, যখন (বা যেদিন) বিকেলে বাড়ী ফিরে এসে রুমাকে তার বিছানার ওপর থাকতে দেখল।

কোন রকম বিস্ময় বা সন্দেহ জাগবার আগেই উমা বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। রুমা বালিশে মুখ গুঁজে ছিল। উমা তার পিঠের ওপর হাত রাখল ! '—কিরে ? এই অসময়ে শুয়ে কেন! শরীর খারাপ নাকি—!'

রুমা নীরব। তার শুয়ে থাকার ভংগীটা ঠিক সুস্থ মানুষের মত নয়। তাই উমা আবার ডাকল তাকে ; '—এই,—এই রুমা!' কিন্তু পরক্ষণেই দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল তার : 'এ—কিরে!'

কাঁদছিস্!' রুমা আর পারল না ; ফুঁপিয়ে উঠল। অরবিন্দের চিঠিখানা বিছানার ওপর থেকে তুলে নিয়ে, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল উমা।

চিঠির সারমর্মটুকু মা'কে বলেছিল উমা। না হলে, অরবিন্দ অনেক কিছুই লিখেছিল। সে সব কথা মা'কে বলা যায় না। মা বুঝতেও পারবে না।

'কিন্তু—' ; উমা ভাবল : 'অরবিন্দ—কি—। কোন্ বিশেষণে ওকে চিহ্নিত করা যায়!'

রুমার মত মেয়েকে ও নাকি ঠিক ভালবাসেনি। নিছক চোখের নেশা। একটু বিশদ, একটু বা সংগেদান করল···। ক্ষণিকের হাসি,—একটু হাতধরা···, এর মানে যদি ভালবাসা হয়—তাহলে অরবিন্দ নাচার। জীবনে উন্নতিকামী পুরুষের কাছে ও-সবের গুরুত্ব নেই। একটি নারী—, এক ফোঁটা চোখের জল বা এক টুকরো হাসি—, এর চেয়ে পৃথিবী অনেক বড়।

চিঠিখানা মুড়ে রেখে উমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। অরবিন্দ আর সুপ্রকাশ—দুটি মানুষকে পাশাপাশি রেখে বিচার করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল : —এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সে নরক দর্শন করল। এও সেই সুন্দরের আবরণে-ঢাকা নরক।

উপায় নেই। রুমাকে এই নরকের আকর্ষণ থেকে সরিয়ে আনতে হবে। মোহমুক্ত করতে হবে তার মনকে।

মোহ ছাড়া আর কি ! অরবিন্দের এই চিঠির পরেও রুমা তার সংগে দেখা করতে চায়। আশ্চর্য—!

তার মানে—, উমা ভাবল : রুমা মনে করছে ; অরবিন্দের সামনে গিয়ে একবার দাঁড়ালে, ছলছল চোখে কয়েকটা ভাবাবেগের কথা বললে সে তার মত পরিবর্তন করবে !

একেই বলে বোকা মেয়ে।

উমার অভিজ্ঞতা তাকে সমর্থন করল।

রুমাকে সে বুঝিয়ে বলবে : আজকের যুগ ভাব বিলাসের যুগ নয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে প্রেম যতখানি না আছে, তার চেয়ে বেশী আছে পরস্পরকে মানেজ করার মত চাতুর্য। এই অবস্থায় অরবিন্দকে যদি সে অন্ধের মত ভালবেসে থাকে,—তাহলে নিজেই ঠকবে রুমা।

উমা স্থির করল ; আজ রাত্রিরেই রুমাকে কথাগুলো বলবে সে। আর দেরী নয়। আজ রাত্রিরেই।

সেদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে রুমাকে দেখতে পেলনা উমা। মা বললেন : 'এইত' একটু আগেই বেরুল। ক'দিন ঘরে থেকে থেকে চেহারাটা কালি হয়ে গেছে।'

উমা বিরক্ত হল মনে মনে। মা'র সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। দু' একদিনের মধ্যে খারাপ হওয়ার মত স্বাস্থ্য নয় রুমার। আজ সে কথাগুলো বলার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছিল। কখন ফিরবে—কে জানে !

সেই কথাটাই মা'কে জিগ্যেস করল উমা। শুনল : —তার ঠিক নেই। বলে গেছে ফিরতে একটু দেরী হতে পারে।

যাক্ ! উমা মনে মনে একটু স্বস্তিবোধ করল।

কিন্তু ঘুম ভাঙল রাত এগারটার পর।

ছাদের ওপর মা'র পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল উমা। শেষ ট্রামখানা ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ষ্টপেজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আশেপাশের বাড়ীর আলোগুলো একটার পর একটা নিভে গেল। নিঃসঙ্গ হয়ে গেল রাস্তাটা,—তবু রুমা ফিরল না।

মা'র ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর উমাকে সচেতন করল : '—কি হবে এখন—।'

শুকনো গলায় উমা উত্তর দিল : '—কিছু বুঝতে পারছি না। চলো বাবাকে বলি—।' মা'কে সংগে নিয়ে ছাদের সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল সে।

তারপর আরও কয়েকটা দিন। অসহ্য উদ্বেগ। আকুল প্রতীক্ষা। 'টেলিগ্রাম' এল সাতদিনের দিন সকালে।

দার্জিলিং-এ রয়েছে রুমা। সংগে অরবিন্দ। এখানে এসে তাকে বিয়ে করেছে। বাড়ীতে যা ভাবে ভাবুক, রুমার মা, বাবা আর দিদি যেন তাদের ভুল না বোঝেন।

টেলিগ্রাম করেছে অরবিন্দ নিজে।

সেদিন সন্ধ্যেয় ছাদের ওপর দাঁড়িয়েছিল উমা। একা। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গীমায় ছিল একটা নিদারুণ একাকীত্ব। নিষ্করুণ একটা অসহায় ভাব।

সে ভাবছিল রুমার কথা আর সেই সংগে তুলনা করছিল নিজের। অরবিন্দের সংগে দেখা

করে কি এমন মন্ত্র দিয়েছে রুমা,—যার জন্যে অরবিন্দ তার নিজস্ব জগতের পরিধিকে আরও ছোট করল! নিজের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হল! কী সে মন্ত্র—হাসি, চোখের জল! —অভিমান! —না—অন্তর্দৃষ্টি!

উমা তার দৃষ্টিকে অন্ধকার আকাশের দিকে প্রসারিত করল :—এখান থেকে ওই গ্রহ নক্ষত্রগুলোর দূরত্ব অনেকখানি। —সীমাহীন। সুপ্রকাশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি আজও ওই নক্ষত্রগুলোর মতই! সেও কি আজ উমার সকল ইচ্ছা আর চেষ্টার বাইরে! উমা ভাবতে লাগল এবং একসময় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। সংগোপনে। এর শব্দ যেন অন্য কাউকে সচকিত করে না দেয়। —অন্য কেউ মানে—বাবা-মা, অনেক দূরের রুমা। রুমার কাছে উমার আজ মস্ত বড় হার হয়ে গিয়েছে।

উমার প্রসারিত দৃষ্টিটুকু ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল। এবং একসময় সেটুকুও অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

উমা অনুভব করল, পৃথিবীটা ঘুরছে। এই বাড়ী, ছাদ,—শহরের লক্ষ লক্ষ সুখী অসুখী মানুষকে নিয়ে বিপুল বেগে ঘুরছে। কেবল একমাত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে উমা। একা। অসহায়। জীবনের অভিজ্ঞতা বলে কাল্পনিক অস্তিত্বটা কোথাও নেই। জীবন দর্শন নামে গালভরা বুলিটাও নিশ্চিহ্ন। —কেবল উমা একা।

সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তার পা টলতে লাগল। মাথা ঘুরতে আরম্ভ করল। শরীর কাঁপতে লাগল থরথর করে।

তবু শেষবারের মত একবার চেষ্টা করল উমা। সামনের আলসেটাকে জড়িয়ে ধরবার ইচ্ছের হাত দু'টোকে বাড়িয়ে দিল শেষবারের মত।

* * * *

চার্লস্ ডিকেন্স তাঁর উপন্যাসের প্লট খুঁজতে একবার এসেক্স প্রদেশে গিয়েছিলেন। হঠাৎ সেখানে তাঁর চোখে পড়ল রাস্তার ধারে একজন মোটা টেকো লোক এমনভাবে যাচ্ছে যে তাকে দেখে সকলে হেসেই অস্থির।

ডিকেন্স লক্ষ্য করলেন। লোকটি কিন্তু হাসছেনা। এমন কি বুঝতেও পারছে না যে লোকে তাকে দেখে হাসছে।

ব্যাপার মন্দ নয় ত?

ডিকেন্স খুব ভাল করেই লোকটিকে লক্ষ্য করলেন, তারপর ফিরে এসে সৃষ্টি করলেন মিঃ পিক্‌উইক্‌কে।

দীপশিখা

শ্রীরমণীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

পুকুর থেকে এক যুবকের মৃতদেহ টেনে তোলা হল। সবার চোখে বিস্ময়—। এ-যে মস্তক হীন দেহ! তদন্তকারি দারোগা, বিশ্বজিৎ বাবু আবার অনুরোধ ক'রলেন। ছেলের দল হৈ হৈ করে পুকুরের জল তোল-পাড় করে তোলে। সব বৃথা। মুণ্ডহীন দেহ নিয়েই পুলিসকে সন্তুষ্ট হতে হল। মৃতদেহের বুকের দিকটায় গভীর ক্ষত। চারিদিক থেকে সবাই এসে জড় হতে থাকে। অপরিচিত যুবকের মৃতদেহ কেউ সনাক্ত করতে পারলনা। বিশ্বজিৎ বাবু মৃতদেহ পেয়ে বিশেষ বিচলিত হলেন না। কারণ তো জানাই ছিল। গ্রামরক্ষী দলের কথায় সবই প্রকাশ পায়। ওদের কথায় ধীরে ধীরে এক-লোমহর্ষক-কাহিনী আত্মপ্রকাশ করে।

গতকাল রাত্রিতে সবাই যখন গভীর সুপ্তির কোলে, সহসা পৈশাচিক চিৎকারে এবং পাড়া-পড়শিদের আর্তনাদে গ্রামরক্ষীরা অসীম সাহসে ডাকাত দলের সামনা সামনি রুখে দাঁড়ায়।

মুহুর্মুহু পটকার যথেচ্ছ ব্যবহারে সেদিন সবাই ভয় পেলেও, গ্রামরক্ষী দলের সর্দার যুবক স্বপন দীর্ঘ বর্শা হাতে দলবল নিয়ে ক্ষিপ্রের মত ডাকাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

স্বপনের পিছু পিছু রক্ষী দলও এগিয়ে এলো। ডাকাতেরাও কম যায় না। শেষটায় কিন্তু ডাকাতেরা নিপুণ ভাবে পালিয়ে যেতে থাকে। মুহূর্তে স্বপন অনেকটা এগিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ওর সামনাসামনি একটা কিরিচ ঝক্‌মকিয়ে উঠে।

স্বপনের উত্তপ্ত রক্তধারা ওকে আরও উৎসাহ দিল। স্বপন মুহূর্তে প্রাণপণ শক্তিতে বর্শা চালিয়ে দেয়। ক্যাঁচ করে একটু শব্দ। তারপরই আর্তনাদ করে ডাকাতটা পড়ে যায়। হাতের অস্ত্র হারিয়ে স্বপন নিঃসহায়। চারিদিকে উত্তেজিত জনতার চিৎকার। পটকার আওয়াজ এবং রক্ষিদলের ছ্যাঁকের শব্দ। যেন যুদ্ধক্ষেত্র। ঝাঁপিয়ে উঠে স্বপন। জন কয়েক ডাকাত হুংকার ছেড়ে ওর দিকে তেড়ে আসছে। অন্ধকারে স্বপন দ্রুত মিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দলবল নিয়ে স্বপন আবার ছুটে এল। কোথাও কেউ নেই। নিঝুম রাতের অন্ধকারে শুধু ঝিঁঝি পোকার শব্দ। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আহত ডাকাতের সন্ধান পাওয়া গেলনা।

প্রভাত এল। সাথে সাথে এল পুলিশ। বিশ্বজিৎ বাবু স্বপনের উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। স্বপনের উৎসাহে খুশি হন। স্বপন এগিয়ে চলে। গ্রাম্য রাস্তা পেরিয়ে গভীর জংগলের ভেতর সরু রাস্তা ওদের আরও খানিকটা এগিয়ে নেয়।

"এই যে স্যার পেয়েছি।"

স্বপনের কথায় বিশ্বজিৎ বাবু দ্রুত এগিয়ে যান। সত্যিইতো মানুষের রক্ত। জমাট রক্ত মাটি কামড়ে পড়েছিল। বিশ্বজিৎ বাবু বুঝতে পারলেন স্বপন মিথ্যা কথা বলেনি। স্বপনের বিক্ষিপ্ত

বর্ণা আমূল বিদ্ধ হয়েছিল। তা না হলে এত রক্ত কোথা হতে এল? রক্তের পরিমাণ থেকেই বোঝা যায় লোকটা ভীষণ ভাবে আহত হয়েছিল। তবে মৃতকলেবর কেন?

"স্যার—!"

—চিন্তিত বিশ্বজিৎ বাবু চমকে উঠে সামনের দিকে চান। একটু দূরে স্বপন উবুড় হয়ে কি যেন দেখছিল। এগিয়ে আসতেই স্বপন হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে গেছে।

সূক্ষ্ম হলেও চমকপ্রদ সূত্রের আবিষ্কারে বিশ্বজিৎ বাবুর পুলিশিমন বৃহৎ কিছুর সম্ভাবনায় সক্রিয় হয়ে উঠে।

ফোঁটা ফোঁটা রক্ত হলেও আকার ছিল আকাশের গায়ে তারার মতোই। বুঝতে পারলেন আহত লোকটাকে কেউ বয়ে নিয়ে গেছে। তা না হলে রক্তের ফোঁটা অমন হবে কেন? প্রশ্ন আসে মনে। বিশ্বজিৎ বাবু আরও আবিষ্কার করলেন একাধিক লোকের পা'য়ের দাগ। রক্তের ফোঁটা অনুসরণ করে ওরা একটি পুকুরের ধারে এসে থেমে পড়ে। সামনেই পুকুর। চারিদিকে বন এবং বাঁশ ঝাড়। সূর্যের আলো দিনের বেলায় পড়ে কিনা সন্দেহ। পলাশে কতগুলি ব্যাং ঝপাঝপ্ পুকুরে লাফিয়ে পড়ে। ওদের ডাগর ডাগর চোখেও বিস্ময়।

রক্তের ফোঁটাগুলি এখানে এসেই থেমে গেছে। পায়ের দাগগুলি আরও স্পষ্ট। কচুরিপানায় ভর্ত্তি পুকুরের দিকে চেয়ে ভাবছিলেন বিশ্বজিৎ বাবু।

তদন্তের ধারা শুরু। সূত্র ছিন্নভিন্ন। বিশ্বজিৎ বাবু যতই এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেন, অসাফল্য ততই ওকে রূঢ় আঘাত করে। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে দেয়া সত্ত্বেও কেউ মৃতদেহ দাবী করলেনা। বিশ্বজিৎ বাবুর মনের অস্বস্তির মধ্যে দীর্ঘ দুটি মাস কেটে গেল। কোন দিক থেকেই কিছু হল না।

পুলিশের কাগজ পত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল, বছরদ্দিকে সে রাত্রিতে পুলিশ ধরে পারনি। বছরদ্দি ডাকাতের সরদার বলেই শুধু পরিচিত নয়। কয়েকবার জেলও খেটেছে। তাই পুলিশ প্রতি রাত্রিতে বছরদ্দিকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, সে ঘরে আছে কিনা। সন্দেহক্রমে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাথে সাথে বছরদ্দির সাকরেদ বলে আরও কয়েকজন। সবাই কামীনে খালাস।

বিশ্বজিৎ বাবুর মন অস্বস্তিতে ভরে গেছে। উপরিওয়ালা'দের কঠোর সমালোচনায় বিশ্বজিৎ বাবুর মনে শান্তি ছিলনা। প্রত্যেক কাজের মাঝখানে বীভৎস কবন্ধের ছবি ফুটে বেরোয়। সে কবন্ধও যেন বিদ্রূপের হাসি হাসে। অনুযোগ দেয়, কই তুমি তো বের করতে পারলেনা আমি কে? অসাফল্য ওর মন দুর্বল করে। স্বপনের কথায় স্পষ্টই মনে হয়, মৃতের পরিচয় গোপন করতে গিয়েই, ডাকাতেরা মাথা কেটে নিয়ে গেছে। ডাকাত দলের বিপদ-মুক্তির আশ্বাসেই এই হতভাগা যুবককে প্রাণ দিতে হয়েছে। স্পষ্টই বুঝা যায় কবন্ধের অধিকারী এক শক্তিশালী যুবক। বয়সও বেশী নয়। বড় জোর পঁচিশ কি ছাব্বিশ।

ইদিলপুর। অজ পাড়াগাঁ। সেই থানার দারোগা বিশ্বজিৎ বাবু। ছোট থানা। আয়তন বৃহৎ। এক দারোগা, দুই ছোট দারোগা, দশ জন সিপাহী। একবার মফঃস্বলে বেরুলে কয়েকদিন বাইরেই থাকতে হয়। অন্যান্য কাজের ঝামেলাও তো কম নয়। ছোট দারোগা ঘরে বাইরে সব দিকেই ভাল সামলায়। সিপাহীদের প্রায়ই বাইরে থাকতে হয়। কাজের ঝামেলায় এখানে ওখানে ছুটাছুটি

করে। কোর্ট তো সেগেই আছে। কোথাও যেতে হলে খুবই অসুবিধে। কিছুটা রাস্তায় সাইকেল চলে। আবার সময় সময় সাইকেলও দারোগা বাবুর কাঁধে চড়ে বেড়ায়। এই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পুলিশ সাহেবের কাছ থেকে অনেক বারই তাড়া খেতে হয়েছে। সি-আই-ডি বিভাগও নিশ্চেষ্ট ছিলনা। তবুও কবন্ধের পরিচয় অজ্ঞাতই রয়ে গেল। যতই দিন যায়, সবাই ভুলে যেতে থাকে সেই কবন্ধের কথা। শত কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও বিশ্বজিৎ বাবু মাঝে মাঝে চমকে উঠতেন। এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন থানার এক ঝুলন্ত কাঠ ফলকের ওপর। বিবর্ণ কবন্ধের ফটো। মনে হয় বীভৎস কবন্ধ ওকে দেখে অট্টহাস্য করে। সি-আই-ডি বিভাগ কেস হাতে নেবার পর থেকে বিশ্বজিৎ বাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। উপরিওয়ালার কাছে আর কৈফিয়ৎও দিতে হবে না। যা করবার ওরাই করবে। কিন্তু ঐ ছবি—? ঝুলন্ত ছবি অষ্টপ্রহর ওকেই যেন পেয়ে বসেছে।

আকাশ ভেঙে এল বরষা। বিশ্বজিৎ বাবু ধানক্ষেতের কিনারা ধরে চলছিলেন। বর্ষার ধারা ছাতির ভেতর দিয়েও তেড়ে আসছে। একটু আশ্রয় চাইলেও পাওয়ার উপায় ছিলনা। ধারে কাছে বাড়ি ঘরও নেই। শুধু ধু-ধু করছে ধানক্ষেত। শ্রাবণের পাগলা হাওয়া ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। উপায় নেই। শক্ত করে ছাতি ধরে বিশ্বজিৎ বাবু এগিয়ে চলেন। গাছের তলায় কোনও রকমে আত্ম-রক্ষা করছিলেন। কাঁধে ছিল ব্যাগ। ব্যাগ থেকে গামছা বের করে ভিজা শরীর মুছতে থাকেন। ব্যাগের মধ্যে ক্ষুদ্র সংসার। মফঃস্বলে বেরুলে সব কিছুরই দরকার। বড় নিরুপায় হয়েই বিশ্বজিৎ বাবু একদিন এক ভদ্রলোকের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছিলেন। আদর যত্ন করে ভদ্রলোক খাওয়ালেন। ভোরের দিকে এক কাপ চায়ের সাথে বিস্কুটও এল। পরম আপ্যায়িত বিশ্বজিৎ বাবু আতিথেয়তার প্রশংসা অনেকের কাছেই বয়ে নিয়ে গেলেন। একদিন কিন্তু বিশ্বজিৎ বাবুকে শুধু বিস্মিতই হতে হয়নি, তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কোনওদিন কারোও আতিথ্য গ্রহণ করবেন না। কারণ ঐ ভদ্রলোকের চায়টাকা তেরআনার বিলতো শোধ করতেই হয়, তা ছাড়া পুলিশ সাহেবের কাছে বিরাট কৈফিয়ৎও দিতে হয়েছিল।

ঘুপ করে শব্দ হতেই বিশ্বজিৎ বাবু সহসা চমকে উঠলেন। একটা লোক একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভিজা গামছা নিংড়ে জল ছাড়িয়ে নিচ্ছে। সামনে এক বোঝা কাঠ। দিনের বেলাতেও অন্ধকার নেবে এসেছে। বৃষ্টি যে সহসা থামবে তাও মনে হয় না। মুখ বুজে কতক্ষণই বা থাকা যায়।

বিশ্বজিৎ বাবু লোকটার সাথে আলাপ জমিয়ে তুললেন।

"কোথায় যাবে?"

"আজ্ঞে বাজারে।"

"অঃ, কাঠ বিক্রী করতে?"

"আজ্ঞে হাঁ। আপনি?"

"আমি? ঐ গাঁয়ে। মাধব ঘোষের বাড়ি।"

লোকটা চুপকরে থাকে। সে বড় ক্লান্ত।

"তুমি কি কাঠ কেটেই খাও?"

"তা-ছাড়া আর কি করব? আপনি কি করেন?"

রগচটা লোক। একটু বিরক্তির সাথেই জিজ্ঞেস করে।

বিশ্বজিৎ বাবুর গায়েছিল বর্ষাতি। একবার নিজের দিকে চেয়ে বলেন বিশ্বজিৎ বাবু, আমার কথা বলছ? দারগাগিরি করি।

লোকটা সহসা চুপ করে গেল।

"কি, চুপ করে রইলে যে?"

—ভয়ে ভয়ে বিশ্বজিৎ বাবুর দিকে লোকটা চাইছিল।

"আপনিতো দারোগা বাবু, একটু উপকার করবেন?"

হেসে বলেন বিশ্বজিৎ বাবু "বল, যদি পারি করব।"

"সাকিনার বরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। মেয়েটা সব সময় কাঁদে। বড় ভাল মেয়ে। একটু খুঁজে দেখুন না যদি পাওয়া যায়।"

"ক'দিন হল পাওয়া যাচ্ছেনা?"

"তা মাস দু'এক হবে বৈকি?"

"ওকে থানায় পাঠিয়ে দিও দেখব।"

[২]

দুপুর গড়িয়ে গেছে। বিশ্বজিৎ বাবু থানার বাইরে একজন লোকের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন।

"বাবু—!"

বিশ্বজিৎ বাবু থানার দিকে পা-বাড়াতেই থেমে পড়লেন। মুখফিরে চাইলেন।

কিছুটা দূরে একটি মেয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সর্বাংগে মোটা কাপড়।

দু'এক পা এগিয়ে এসে সহানুভূতি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বিশ্বজিৎ বাবু, "আমায় কিছু বলবে?"

একটু দূরে একজন লোকও দাঁড়িয়ে ছিল। সে লোকটি এগিয়ে এসে বললে, "হুজুর, সাকিনা।"

"সাকিনা! আরে, তুমিই তো সেদিন……।"

"আজ্ঞে। তাইতো সাকিনাকে নিয়ে এলাম।"

বিশ বাইশ বছরের সাকিনা দু'টি তীক্ষ্ণ চোখ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বজিৎ বাবুর কথায় আশ্বাস পেয়ে সাকিনা ধীর পায়ে আরও একটু এগিয়ে আসে। তারপরই বলে, "বাবু, আমার স্বামী? আমার স্বামী কোথায়? ওরা বললে, আমার স্বামীর খবর নাকি আপনারা জানেন?"

মেয়েটির ঠোঁট দুটি ঘন ঘন কাঁপছিল। ওর অন্তস্থল হতে কান্নার রোল উথলে আসছিল। বড় বড় চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

সাকিনার প্রশ্ন বড় কঠিন। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বিশ্বজিৎ বাবুর পক্ষে আরও কঠিন। সাকিনার প্রশ্নে বিশ্বজিৎ বাবু বিচলিত হন। বুঝতে পারেন নিরাশার বাণী সাকিনাকে বড় আঘাত করবে। সে আঘাতে সাকিনা হয়তে ভেঙে পড়বে।

বিশ্বজিৎ বাবু সাকিনাকে নিয়ে থানাঘরে এসে বসলেন। সাকিনা বিশ্বজিৎ বাবুর দিকে আবার চায়। ওর চোখে সেই একই প্রশ্ন।

সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিশ্বজিৎ বাবু চুপ করে গেলেন। পারলেন না। ["তোমার স্বামীর খবর আমাদের কাছে নেই।"] একথাটুকু বলার মত শক্তি বিশ্বজিৎ বাবু হারিয়ে ফেলেছেন। সাকিনা বড় আশা করে এসেছে। এখানে এলে সে তার হারানো স্বামীকে খুঁজে পাবে। পুলিশের কর্তব্যও তো তাই। কিন্তু আজ যে বিশ্বজিৎ বাবু নিঃসহায়। এমন খবরও তো তিনি পাননি কখনও। তবুও তিনি পূর্ণ সহানুভূতি নিয়েই প্রশ্ন করতে থাকেন। এতবড় অপ্রিয় কথা তিনি সহসা সাকিনাকে বলতে পারলেননা।

"সাকিনা, তোমার স্বামীর নাম?"

"আরসেদ আলি।" মুখনত করে বলে সাকিনা।

"তুমি কোথায় থাক?"

"আমার বাবার কাছে।"

"তোমার বাবার নাম?"

"বাবু, কতেপুরের ঐ যে বছরদ্দি ওস্তাদ,—তার মেয়ে।" পাশে দাঁড়িয়ে বলছিল লোকটি।

বছরদ্দি ওস্তাদ!!! একপ্রকার চিৎকার করেই উঠলেন বিশ্বজিৎ বাবু। চোখমুখ মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠে।

ভয়ে সাকিনা এতটুকু হয়ে গেল।

পরক্ষণেই সেই বীভৎস কবন্ধের কথা, পুকুর থেকে টেনে তোলা মুণ্ডহীন দেহ, থানাঘরের গায়ে ঝুলান কবন্ধের কটো ওর বিস্মিত চোখের সামনে অট্টহাস্য করে উঠল। পুলিশ সাহেবের রক্ত চক্ষুর ধিক্কার, পুলিশি তদন্তে ওর অসাফল্য, সব কিছুই ওকে সজোরে আঘাত করে। মুহূর্তে বিশ্বজিৎ বাবুর চোখে মুখে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে ভয়ে সাকিনার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। পাশে দাঁড়ান সাকিনার সাথী, ভীত, সন্ত্রস্ত। পারে তো দৌড়ে পালিয়ে যায়।

"সাকিনা—!"

রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করে সাকিনা, "—বাবু।"

"তোমার স্বামীর বয়স? পরনে কি ছিল? গায়ের রং? দেখতে কেমন?" বিশ্বজিৎ বাবু ঝড়ের বেগে সাকিনাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকেন।

অতগুলো প্রশ্নে সাকিনা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তারপরেই সে বলে, "ওর বয়স হবে পঁচিশ-ছাব্বিশ।"

"গায়ের রং?"

"কালো।"

"কালো! পরনে কি ছিল?"

"খুতি। আর গায়ে ছিল গেঞ্জি……।"

"ডুরি সার্ট। তাই না?"

"হাঁ হাঁ। ডুরি সার্ট।"

সাকিনার হাতোজ্জ্বল চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠে। হারানো স্বামীকে ফিরে পাবার আশায় সাকিনা অমঙ্গলের অশ্রু দু'হাতে মুছে ফেলে।

"স্বাস্থ্য কেমন ?"

"খুব জোয়ান বাবু। জানেন, কুস্তি করত। এক ফকির ওকে মাদুলি দিয়ে বলেছিল, তোমাকে কেউ হারাতে পারবেনা।" স্বামীগর্বে সাকিনার চোখে মুখে দীপ্তি এসে যায়।

"মাদুলি! কিসের মাদুলি? রুপোর?"

সহাস্যে উত্তর করে সাকিনা। "—হাঁ বাবু, রুপোর। চৌকোনি রুপোর মাদুলি।" নিঃসন্দেহে স্বামীর সবটুকু পরিচয় দারোগা বাবুর কাছে পৌঁছে দিয়ে সাকিনা আনন্দে আত্মহারা। বারে বারে সে পুলিশ সাহেবের দিকে চায়। বদরাগী স্বামী হয়তো মারপিট করে, পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে।

"অবিনাশ—।" বিশ্বজিৎ বাবুর অস্বাভাবিক উত্তেজনায় সাকিনা স্তব্ধ।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়েই বিশ্বজিৎ বাবুর দিকে স্থির হয়ে থাকে। ছোট দারোগা অবিনাশ বাবু এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে ওদের কথা শুনছিলেন। বিশ্বজিৎ বাবুর ইংগিত তিনি বুঝতে পারলেন।

সহসা সাকিনার বুকফাটা আর্তনাদে থানার সবাই ছুটে এল। আশে পাশের দোকানীরা ছাড়াও অনেক লোক থানায় এসে ভিড় জমাতে থাকে। সবাই দেখল সাকিনা আরসেদের রক্তাক্ত কাপড় চোপড় বুকে চেপে চিৎকার করে কাঁদছে। রুপোর মাদুলি মুখের উপর বার বার বুলিয়ে দিতে থাকে।

বিশ্বজিৎ বাবু কিছুক্ষণ আগেও কবজের পরিচয় আবিষ্কারের আশু সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে উঠে ছিলেন। পুলিশ সাহেবের কাছে নিজের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হবে বলে, নবযৌবনে বলিয়ান বিশ্বজিৎ বাবু কত রঙিন স্বপ্নই না কল্পনার তুলে ধরে ছিলেন। স্বামীর অকালমৃত্যুতে সাকিনার চোখের জল, বিশ্বজিৎ বাবুর সে উৎসাহ, আবিষ্কারের অপূর্ব সাফল্য, মুহূর্তে বিষাদে পরিণত হল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে থানাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিশ্বজিৎ বাবুর চোখও ঝাপসা হয়ে আসে। সাকিনার কান্নার রোল তখনও বাতাসে ভর করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

[৩]

"কয়েক দিন হয় বাপের বাড়ি এসেছি। কথা ছিল একমাস থাকব। স্বামী একদিন আমায় নিতে এল। বললে, না তোমাকে যেতেই হবে। একা একা বাড়িতে ভাল লাগেনা। আমিও যেতে চাইছিলাম। ঠিক হল রাত পোহালেই চলে যাব। সন্ধ্যার সময় ও এসে বললে, ওগো শোনছ, এই রাত্তিরেই নাকি তোমার বাবার সাথে কোথায় যেতে হবে। ও কথা শুনে কেন জানি মন কেমন করে উঠল। এক অজানা আশংকায়—বুক কেঁপে উঠে।"

বলতে বলতে সাকিনা চুপ করে গেল। মাথা নীচু করে থাকে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যেই জিজ্ঞেস করলেন বিশ্বজিৎ বাবু, "চুপ করে রইলে কেন সাকিনা? বল, তারপর কি হল, বল?"

সাকিনা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

"সাকিনা, বুঝি, ও সব কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি না বললে কি করে বুঝব কি হয়েছিল?" বিশ্বজিৎ বাবুর কণ্ঠে সহানুভূতির সুর বেজে উঠে।

"জানেন, আমার বাবা ডাকাতের সরদার।"

নতুন কিছু নয়। একথা তো বিশ্বজিৎ বাবুর জানাই ছিল।

সাকিনার কথায় বিশ্বজিৎ বাবু শুধু মাথা নাড়লেন। বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও, বিশ্বজিৎ বাবু সাকিনার কথায় রীতিমত গম্ভীর হয়ে ওঠেন। আজ পর্যন্ত ও বহরমদ্দির বিরুদ্ধে তিনি কোন প্রমাণই সংগ্রহ করতে পারেননি। অধীর আগ্রহে আবার বিশ্বজিৎ বাবু সাকিনাকে অনুরোধ করলেন,—"সাকিনা—, তারপর ?"

"বাবু, বলেছিলেম—না তুমি যেতে পারবেনা। আঘাত পেলেও সব কথাই ওকে বলেছিলাম। ভয় ছিল বাবা হয়তো ডাকাতি করতেই ওকে কোথাও নিয়ে যাবে। শরীর ভাল নেই, মাথা ঘুরেছে, কত কথাই ও বলেছিল। বাবা কোন কথাই শুনলেনা। এক রকম জোর করেই নিয়ে গেল। বাধা দিতে আমিও মার সাহায্য চাইলাম। বাবা বললে, 'আমার সাথেই তো যাচ্ছে। বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে সকাল সকাল চলে আসব। ভয় কি' ?"

"বুঝতেই পারেন সারারাত কি দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম। রাত্রি শেষে ঘুম এল। বেলা করেই ঘুম থেকে উঠলাম। ওকে দেখতে না পেয়ে বাড়ির মধ্যে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলাম। কোথাও নেই। বাবা ঘুমুচ্ছিল। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, আরসেদ আসেনি ?'

"মার প্রশ্নে কেন জানি বুক থেকে কান্না বেরিয়ে আসে। অস্ফুট আর্তনাদে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। পরক্ষণেই মা চিৎকার করে বাবাকে ডাকলেন। লাল চোখ দুটো মেলে বাবা বললেন, 'কেন, আরসেদ তো নেমন্তন্ন খেয়ে আমার আগেই চলে এসেছে।' ও আসেনি ? বাবার চোখ দু'টো লাল ছিল বটে, তবে ওর কথার মধ্যে সৌকর্য ছিলনা। বাবার স্বাভাবিক কণ্ঠের সাড়া ছিলনা। অতি কষ্টেই যেন বাবা কথাগুলি বলে আবার বিছানার মধ্যে মুখ লুকালো।

বাবার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। বার বার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও বাবা ঐ এক কথাই বলেছিল। কেন জানি বাবা আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারেনি। আজ এখানে এসে আমি বুঝতে পেরেছি, কেন বাবা সেদিন আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। আর কেনই বা আমার দিকে থেকে বারবার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কত খুঁজেছি, কত লোককে জিজ্ঞেস করেছি, কেউ আমায় স্বামীর কথা বলতে পারেনি। কত কেঁদেছি, তবুও সে ফিরে আসেনি। খোদার কাছে কত মানত করেছি। সবই শেষ হয়ে গেল। সাকিনা আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে।

এতদিন পর আশাতিরিক্ত সংবাদে পুলিশ সাহেব বিশ্বজিৎ বাবুকে ডেকে পাঠালেন। পুলিশ সাহেব অন্যান্য অফিসারদের সামনে ওর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করলেন। অফিসারদের উৎসাহে বিশ্বজিৎ বাবুর মন সাড়া দিতে পারলনা। অতটুকু মেয়ে সাকিনার কথাই ওর বার বার মনে পড়ে।

বহরমদ্দি মাস্তানের কার্য কলাপের কথা বিশ্বজিৎ বাবুর কাছে সবই স্পষ্ট। সাকিনার কথা ধরে তিনি ইয়াসীনকে গ্রেপ্তার করেন। সাকিনা যখন ইয়াসীনের দু'টি হাত ধরে চোখের জলে ভাসতে থাকে, ইয়াসীন সাকিনাকে উদ্দেশ করে সব কথাই সেদিন প্রকাশ করেছিল। ইয়াসীনের কথা শুনে সাকিনা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। বিশ্বজিৎ বাবু বিমূঢ়।

গ্রামরক্ষীদলের ভয়ে বহরমদ্দির দল যখন পালাতে সুরু করে, অনভিজ্ঞ এরসাদ মৃত্যুরূপী যমের সামনে পড়ে যায়। এরসাদের আর্তনাদে বহরমদ্দি জামাইএর বিপদ মুক্তিতে ছোটে আসে। পিছু পিছু

ইতাসীনের সাথে আরও জনাকয়েক। বছরদ্দি মহা সমস্যার সম্মুখীন। এরসাদের কত স্থান থেকে গল্ গল্ করে রক্ত বেরুচ্ছিল। গ্রামরক্ষী দলের উল্লাসধ্বনি দ্রুত এগিয়ে আসছে। এরূপ ক্ষেত্রে বছরদ্দির সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে কোন দিনই বেশী বিলম্ব হয়না।

সহসা একজন গর্জে উঠল, "সর্দার!"

সরদার এরূপ প্রশ্নের জবাব জীবনে অনেক বারই দিয়ে এসেছে। কিন্তু সে মুহূর্তে অমন ভয়াবহ হুকুম দিতে গিয়ে সাকিনার কথা কোন দিনই বড় হয়ে দাঁড়ায়নি। শত ভয়াবহ হলেও দলের সংহতি এবং পরিচয় গোপন রাখতে বছরদ্দিকে হুকুম দিতে হল। নিমেষে এরসাদের মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

জেলা জজের সামনে একদিন সাকিনাকে দাঁড়াতে হল। কিছুটা দূরে মাথা নত করে আসামীর কাঠগড়ায় বছরদ্দি দাঁড়িয়েছিল। জন্মদাতা পিতা। এতটুকু থেকে যাকে এতদিন কোলে পিঠে করে, পিতা তার স্নেহের সন্তানকে বড় করেছিল, সেই সন্তান, তারই পিতার বিরুদ্ধে জজ সাহেবের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে, বুকের ভিতর অব্যক্ত যন্ত্রনা, তবুও সাকিনা স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেনি। দু'চোখে অশ্রুর বন্যা। তবুও সাকিনা প্রতিটি কথা খুলে বলে। জন্মদাতা পিতা বলে সাকিনা বছরদ্দিকে রেহাই দেয়নি। মার বৈধব্যের আর্তনাদও তাকে রোধ করতে পারেনি, বলেছিল, "মা, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ। বৈধব্য আমার জীবনের সব কিছুই কেড়ে নিয়েছে। আমার জীবনের এত আশা, আকাঙ্খা, সব হারিয়ে গেছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো মা।"

উপযুক্ত সাক্ষী সাবুদ নেই বলেই, বছরদ্দির দশ বছর জেল হয়ে গেল।

মাস কয়েক পরের কথা। বিশ্বজিৎ বাবু চলতিপথে সাইকেলের ব্রেক কষে থেমে পড়লেন।

সামনেই বছরদ্দি মাতব্বরের বাড়ি। বিশ্বজিৎ বাবুর মনের কোণে একখানি করুণ মুখ ভেসে আসে। এক পা দু'পা করে তিনি আরও খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে চলেন।

সামনেই মেটে দেউরি—। খুঁটিতে বাঁধা হালের গরু। ডাকলেন,—বছরদ্দি মাতব্বর বাড়ি আছ?

চারিদিকে দুপুরের রৌদ্র। দেউরি থেকে বেরিয়ে এল এক লম্বা চৌরা জোয়ান। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে। হাঁটু পর্যন্ত ধুলা—।

"কে? বাবু—!!!"

বিশ্বজিৎ বাবু বিস্মিত। ওর সামনে সাকিনাকে বুকে চেপে বয়স্ক বছরদ্দি ডুকরে কেঁদেছিল। পিতৃস্নেহ অন্ধ হয়ে অভাগিনী কন্যার সর্বাঙ্গে ঝরে পড়তে থাকে। পিতৃস্নেহে সিক্ত সাকিনা বছরদ্দির বুকে মুখ গুঁজে কাঁদে।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল বছরদ্দি, "বাবু, দয়া করে এলেন যখন, সাকিনাকে একবার আশীর্বাদ করে যান। আইনের ঘর থেকে মুক্তি পেলেও, খোদার কাছে আমি কোন দিনই মুক্তি পাবনা।"

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রশস্ত রাস্তায় চলতে চলতে বিশ্বজিৎ বাবু সাইকেল থেকে নেমে পড়লেন। এই মুহূর্তে তিনি সাইকেলে চড়ে যাবার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। ঝাপসা চোখের সামনে পৃথিবী আর আকাশ একাকার হয়ে গেছে।

আধুনিক কালে চলিত ভাষার প্রবর্ত্তক বিবেকানন্দ

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

চলিত বা কথ্য ভাষায় বাংলা রচনার প্রসঙ্গে আমাদের প্রথমেই স্মরণে আসবে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩ খৃঃ) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম। প্যারীচাঁদ লিখতেন 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্ম-নামে। তিনি 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খৃঃ) নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। এই গ্রন্থে তিনি সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত বা কথ্য ভাষার মিশাল দিয়েছেন। কিছুটা নমুনা দিচ্ছি :

"সরকার কষ্ট হইয়া বলিল—মহাশয়! মুখের কথা, অমনি বলিলেই হইল? কোথায় কলিকাতা—কোথায় বৈদ্যবাটী—আর ঠকচাচিই বা কোথায়? আমাকে অন্ধকারে ঢেলা মারিয়া বেড়াইতে হইবে, এক মুঠা খাওয়া দূরে থাকুক এখনও এক ঘটি জল মাগায় দিই নাই—আজ কিরে কেমন করিয়া আসতে পারি? বাহারাম অমনি রেগেমেগে ঘুমকে উঠিয়া বললেন,—ছোট লোক এক জাতই স্বতন্তর, এরা ভাল কথার কেউ নয়, নাতি খেঁটা না হলে ঘুম হয় না। লোকে তল্লাস করিয়া দিল্লী যাইতেছে, তুমি বৈদ্যবাটী গিয়া একটা কর্ম নির্দেশ করিয়া আস্তে পার না? সাহুব হইলে ইসারায় কর্ম বুঝে, তোমার চোখে আঙ্গুল দিয়া বলতুম তাতেও হোস হৈস না?"

সহজ-সরল গদ্য-রচনা-রীতি যাঁরা প্রবর্তনে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে পুরোগামী ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০ খৃঃ) মহাভারতের অনুবাদ-কার্য করেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি চলিত বা কথ্য ভাষায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। ওই গ্রন্থে চলিত বা কথ্য ভাষার সঙ্গে সাধু ভাষার মিশাল দেওয়া হয় নাই। নমুনা দিচ্ছি :

"ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংকেপ হয়ে পড়ল। কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরী-তলা জুড়ে বসে গ্যালো। আয়গায় আয়গায় রংকরা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টিন ও পেতলের অসুরের চাল, তলওয়ার, নানা রঙের ছোবান প্রতিমার কাপড় ঝুলতে লাগল। দর্জিরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরোজায় দরোজায় বেড়াচ্ছে; 'মধু চাই।' 'শাঁখা নেবে গো' বোলে ফিরিওয়ালারা ডেকে ডেকে যুচ্ছে। চাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও বাজার দালালেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছে। কোন কোন কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটি, চুমকি ঘটি ও পেতলের থালা ওজন হচ্ছে!"

লেখার নমুনা দুইটি উদ্ধার করেছি অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ থেকে। এরপর বেশ কয়েক বৎসর পেরিয়ে গেল। চলিত ভাষা ব্যবহারের দিকে সাহিত্য-সাধকদের দৃষ্টি বা মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল না। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা যে,—আধুনিককালে বাংলা-সাহিত্যে চলিত বা কথ্য ভাষা প্রচলনের পথিকৃৎ প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ খৃঃ)—যিনি 'বীরবল' লেখনী-নামে (Pen name-এ) সুপরিচিত। ওই শক্তিমান লেখক তাঁর সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' নামক

মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে চলিত ভাষা প্রচলনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টা নিষ্ফল হয়নি। বর্তমান লেখকের লেখা প্রবন্ধও সেই অভিজাত পত্রে প্রকাশিত হবার মর্যাদা পেয়েছিল।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে চলিত ভাষা প্রচলনের পথপ্রদর্শক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন না—ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খৃঃ)—যাঁর গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ছিলেন একাধারে বাগ্মী, লেখক, গায়ক, কবি-মনীষী ও ঋষি। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী ইত্যাদি ভাষায় সুপণ্ডিত। ওই প্রতিভাবান ভারত-সন্তানের লোকাতীত প্রতিভার প্রভা শুধু ভারতবর্ষকেই আলোকিত করে নি, আমেরিকায় ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দীপ্তি লোক-লোচনে তুলে ধরেছিল। ওই সকল দেশের জন-মনে ভারত সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা যুগ-যুগ ধ'রে বাসা বেঁধেছিল, তা' তিনি ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছিলেন মনীষা, জ্ঞান ও যুক্তির প্রচণ্ড আঘাতে।

স্বামীজীর চেয়ে বীরবল ছিলেন বৎসর পাঁচেকের ছোট। বাংলা সাহিত্য-জগতে বীরবল প্রথম দেখা দিলেন পরিণত বয়সে। 'সবুজ পত্র' যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর বয়স ৪৮ বৎসর। ওই মাসিক পত্রিকাখানি বের হবার আগের বছর বের হ'ল তাঁর কাব্য গ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশৎ'। কাব্য, কথা-সাহিত্য ও প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে চৌধুরী মশায়ের সারস্বত সাধনা সার্থক হয়ে উঠেছে। তিনি সাধু ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। কিন্তু স্বামীজী সাধু ও চলিত উভয় ভাষায়ই লিখেছেন। সে দিক দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক অবদান অবিস্মরণীয়। স্বামীজীর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বীরবলের বঙ্গভারতীর পূজা-মন্দিরে অর্ঘ্য নিয়ে প্রবেশের বছর বারো আগে। সেই প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতর সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট ; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা ভয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষায় যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে যেন, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল বকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়,—লক্ষণ।

"যদি বল ও-কথা বেশ, তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ ক'রব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ

কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হ'য়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।"

পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে আরও চিন্তাশীলতা-পূর্ণ মন্তব্য আছে। শেষাংশের মন্তব্য—"দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই।"

স্বামী বিবেকানন্দের 'ভাববার কথা' পুস্তকখানাও চলিত ভাষায় রচিত। যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিতেছি :

"গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাস ভট্টাচার্য—মহাপণ্ডিত, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার; বন্ধুরা বলে ভগন্তার ধাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে বেড়বুড়ি ছেলে হ'লে ঐরকম চেহারাই হ'য়ে থাকে। যাই হোক্, কৃষ্ণব্যাস মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই, বিশেষ টিকি হ'তে আরম্ভ ক'রে নখাগ্র পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকশক্তির গতাগতি বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ বহুতজ্ঞান থাকার দরুন দুর্গাপূজার বেদাধার মৃত্তিকা হ'তে মায় কান্না, পুনর্বিবাহ, দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ প্রয়োগ—সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি এমনি সোজা ক'রে দিয়েছেন। যথা, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যাসগুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যাসদের মধ্যে গুড়গুড়ে!!! অতএব কৃষ্ণব্যাস যা বলেন তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেসা লেগাপড়ার চর্চা হচ্ছে, লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে উঠছে, সকল জিনিস বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাস মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাক। নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বলছে—বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ!! 'বেঁচে থাক্ কৃষ্ণব্যাস' ব'লে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যাসদলের আদর! 'ভল্ বাবা "অভ্যাস" অস্ মাবো' ইত্যাদি।"

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর যেসব কথাবার্তা ও আলোচনা হ'ত, ওই সমুদয় তিনি লিখে রাখতেন। 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থে ওই সকল বাণী গ্রথিত আছে। তাঁর শ্রীমুখ থেকে যে সকল বাণী নিঃসৃত হ'ত, সেগুলো চলিত ভাষায় বলতেন। পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিতেছি :

"...আবার বৃন্দাবনলীলার কথা ছেড়ে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কেমন হৃদয়গ্রাহী তাও দেখ্! অমন যুদ্ধ কোলাহলেও কৃষ্ণ কেমন স্থির, গম্ভীর, শান্ত! যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জুনকে গীতার দেছেন, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—যুদ্ধ

করতে লাগিয়ে দিচ্ছেন! এই ভয়ানক যুদ্ধের প্রবর্তক হয়েও নিজে শ্রীকৃষ্ণ কেমন কর্মহীন—অস্ত্র ধরলেন না! যে দিকে চাইবি, দেখবি শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র perfect (সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ)। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ—তিনি যেন সকলেরই মূর্তিমান বিগ্রহ! শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই। এখন বৃন্দাবনের বাঁশী বাজানো কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা; ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা-কালী এঁদের পূজা। তবে তো লোকে মহা উদ্যমে কর্মে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে। আমি বেশ ক'রে বুঝে দেখেছি, এদেশে এখন যারা ধর্ম ধর্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity—cracked brains অথবা fanatic (মজ্জাগত দুর্বলতা সম্পন্ন, বিকৃত মস্তিষ্ক অথবা বিচারশূন্য ধর্মোন্মাদ)। মহারজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। বেশ ঘোর তমো-তে ছেয়ে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে—ইহজীবনে দাসত্ব, পরলোকে নরক।"

স্বামীজী ভারতের নারীদের দুর্গতি ও দুর্দশার বিষয় নিজের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে বললেন :

"কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হবে না? ভারতের অধঃপতন হ'ল ভটচায্যি বামুনরা ব্রাহ্মণেতর জাতকে যখন বেদপাঠের অনধিকারী ব'লে নির্দেশ করলে, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখতে পাবি—মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। রাজার বেশও ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন। এসব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন মেয়েদের সে অধিকার এখনই বা থাকবে না কেন? একবার যা ঘটেছে, তা আবার অবশ্য ঘটতে পারে। History repeats itself (ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়)। মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ—সে জাত কখনও বড় হ'তে পারেনি, কস্মিন কালে পারবেও না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।' যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কখন উন্নতির আশা নেই। এজন্য এদের আগে তুলতে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।"

স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানাও রচিত হয়েছে চলিত ভাষায়। ওই গ্রন্থে দুটি দেশের খাওয়া-পরা, বেশ-ভূষা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, ইত্যাদি সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ আছে। ওই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"...আমরা স্নান করি কেন?—অধর্মের ভয়ে; পাশ্চাত্যেরা হাত-মুখ ধোয় পরিষ্কার হবে ব'লে। আমাদের জল চাললেই হ'ল, তা তেমনই ঝেড়-ঝেড় করুক আর ময়লাই লেগে থাকুক। আবার মক্কিনী তায়া স্নান ক'রে এমন লম্বা চওড়া তেলক কাটলেন যে, কামারও সাধ্য নয় তাকে ঘষে তোলে। আবার আমাদের স্নান সোজা কথা, যেখানে হোক ডুব লাগালেই হ'ল। ওদের—সে এক বস্তা কাপড় খুলতে হবে, তার বন্ধনই বা কি! আমাদের মা বেখাতে লজ্জা নেই, ওদের বেলায়। তবে পুরুষে পুরুষে কিছুমাত্র নেই, বাপ বেটার সামনে উলঙ্গ হবে—দোষ নেই। মেয়েছেলের সামনে আপাদমস্তক ঢাকতে হবে।

'বহিরাচার' অর্থাৎ পরিষ্কার থাকাটা, অন্যান্য আচারের ন্যায়, কখন কখন অত্যাচার বা অনাচার হয়ে পড়ে। ইউরোপী বলে যে, শরীর সম্বন্ধী সমস্ত কার্য অতি গোপনে করা উচিত। উত্তম কথা। এই শৌচাদি তো দূরের কথা; লোকমধ্যে থুথু ফেলা একটা মহা অসভ্যতা। খেয়ে আঁচানো সকলের সামনে অতি লজ্জার কথা, কেননা কুলকুচো করা তায় আছে। লোকলজ্জার ভয়ে খেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে,—ক্রমে দাঁতের সর্বনাশ হয়। সভ্যতার ভয়ে অনাচার। আমাদের আবার দুনিয়ার লোকের সামনে রাস্তায় ব'সে ঘষির নকল করতে করতে মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা, আঁচানো—এটা অত্যাচার। ও সমস্ত কার্য গোপনে করা উচিত নিশ্চিত, তবে না করাও অনুচিত।

"আবার দেশভেদে যে সকল কার্য অনিবার্য, সেগুলো সমাজ সয়ে নেয়। আমাদের গরম দেশে খেতে ব'সে আধ ঘড়াই জল খেয়ে ফেলি—এখন ঢেঁকুর না তুলে যাই কোথা; কিন্তু ঢেঁকুর তোলা পাশ্চাত্য দেশে অতি অভদ্রের কাজ। কিন্তু খেতে খেতে রুমাল বার ক'রে দিব্যি নাক ঝাড়ো—তত দোষের নয়; আমাদের দেশে ঘৃণার কথা। এ ঠাণ্ডা দেশে মধ্যে মধ্যে নাক না ঝেড়ে থাকা যায় না।"

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে আরও কিঞ্চিৎ উদ্ধার ক'রে দিতেছি:

"তুমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ? অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে দুর্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎপাদন করেছ, তাদের জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি? তোমাদের অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলণ্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ—তোমাদের আফ্রিকা?

"কোথা সে সকল নুনো জাত আজ? একেবারে নিপাত, বড় পক্ষে তোমরা তাদের মেরে ফেলেছ; যেখানে তোমাদের শক্তি নাই, সেথা মাত্র অল্প জাত জীবিত।

"আর ভারতবর্ষ তা কস্মিন কালেও করেন নি। আর্যেরা অতি দয়াল ছিলেন। তাঁদের অখণ্ড সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদয়ে, অমানব-প্রতিভাসম্পন্ন মাথায় ওসব আপাতরমণীয় পাশব প্রণালী কোন কালেও স্থান পায়নি। স্বদেশী আহাম্মক! যদি আর্যেরা নুনোদের মেরে ধ'রে বাস করত, তাহ'লে এ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি কি হ'ত?

"ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ ক'রে আমরা বেঁচে থাকবো। আমাদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান ক'রব, আমাদের চেয়ে বড় ক'রব। ইউরোপী সভ্যতার উপায়—তলোয়ার; আর্যদের উপায়—বর্ণ-বিভাগ। শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতার শেষবারে সোপান—বর্ণবিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।"

'পরিব্রাজক' স্বামী বিবেকানন্দের চলিত ভাষায় লিখিত আর একখানি উপাদেয় তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। তা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করছি।

"আর্য ব্রাহ্মণের নাকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ভম্ভম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' ব'লে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্ছ তোমরা। তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার মিউজিয়ম, তোমাদের আচার ব্যবহার, চাল-চলন দেখলে বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ

মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্গেরা। তোমরা ভূত কাল—নুড্ লড্ লিট্ সব এক সঙ্গে। বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি ব'লে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ-লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরি করছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্যে—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি-ভীমনিনাদী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-বাণী—'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে'।

* * * *

গিয়োভানি সান্তির তখন চিত্রকর হিসাবে খুবই নাম। কিন্তু মনে তাঁর সুখ নেই, ছেলেটার ছবি আঁকার দিকে তেমন মন নেই। রং তুলি হাতে নিয়ে সে শুধু বসে বসে ভাবে।

বাপ চটে উঠে একদিন বল্‌লেন তাকে,—"কি ভাবিস্ বল ত?"

ছেলে উত্তর দিলে,—"আমি যা আঁকতে চাই, সেটা পুরোপুরি ধরতে পারছি না।"

—"বেশ, চেষ্টা কর।"

ছেলে ত চেষ্টা ক'রতে বসল, কিন্তু তবুও সেই একই ভাব।

বাপ হতাশ হ'য়ে পড়লেন, কিন্তু ছেলের প্রতিভা তাঁর অজ্ঞাত নয়। রং তুলি হাতে নিয়ে ছেলের নিশ্চেষ্ট ভাব দেখে তিনি এক রকম হাল ছেড়ে দিলেন।

মাস তিনেক পরে তিনি তাঁর অঙ্কন কক্ষের একপাশে একখানি ছবি টাঙানো দেখে চম্‌কে উঠলেন,—এ ছবি কে এঁকেছে? এ যে অপূর্ব সৃষ্টি! এ প্রতিভা যে স্বর্গের দান! এবার র‍্যাফেল এসে তাঁর বাপের পায়ের কাছে বসলেন, বললেন, এরই কল্পনার জন্যে ত অপেক্ষা করছিলাম বাবা।

কোম্পানী আমলের কাহিনী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চুরী, ডাকাতি, রাহাজানি।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতের নানা প্রদেশে শহর-রক্ষা বা পুলিশ-আইনের যে বিশেষ আটঘাট ছিল না তা বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। ঠগীদের অত্যাচারের কথা ইতিপূর্বে এক নিবন্ধে বলেছি। এবারে বাংলা দেশের ডাকাত ও তাদের ডাকাতির একটি কাহিনী পাঠকদের জানানো হল।

ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাতে বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান নগরগুলিতে পুলিশী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর এই কাজে যাঁরা বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন, তালতলার রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সেই সময় তিরিশ বছরের অধিককাল ভারতীয় পুলিশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবার পর অবসর গ্রহণ করেন এবং তারপরে তাঁর দেখা বা জানা কয়েকটি ডাকাতির বর্ণনা ১৮৯২ সালে প্রকাশ করেন। তাঁর সেই দুষ্প্রাপ্য দলিল থেকে প্রথম ঘটনাটি হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম। প্রায় একশো বছর আগে এক বাঙালী পুলিশ কর্মচারীর বাংলায় লেখা প্রামাণ্য বিবরণীটি যে নানা তথ্য বহন করে এনেছে তাতে সন্দেহ নেই। তখনকার দিনে বাংলা ভাষার রূপ ও গঠন কেমন ছিল তারও প্রমাণ আছে এই রচনায়। কাহিনীটি যথাযথ নীচে সাজিয়ে দিলাম :—

দুর্বৃত্তের বৃত্তান্তে মানব-প্রকৃতির মলিনাংশের বিচিত্র চিত্র দেখা যায়। এখানে নিষ্ঠুর-প্রকৃতি ক্রোধান্ধ, লোভাসক্ত ও কামোন্মত্তদিগের ভীষণ, মলিন মূর্তি দেখিয়া যেমন বিস্মিত ও ভীত হইতে হয় তেমন রাজত্ব ও রাজদণ্ডের মাহাত্ম্য দেখিয়া আশ্বাসিত ও হৃষ্টচিত্ত হইতে হয়। রাজদণ্ড না থাকিলে এই সকল রিপুপরায়ণ পাপাচারীদিগের অত্যাচারে লোক পর্য্যাকুল হইত; বলবান দুর্বলকে গ্রাস করিত এবং পৃথিবীতে শান্তি সুখের একান্ত অভাব হইত। এক সময়ে এদেশের এইরূপ অবস্থাই ছিল। ডাকাইতগণ নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে প্রার্থিত ধন অর্থ না দিলে লুটতরাজ করিবে বলিয়া প্রকাশ্য রূপে পত্র লিখিয়া গৃহস্থের নিকটে পাঠাইত এবং লেখনানুসারে কার্য্যও করিত। প্রতিবিধানের উপায় ছিল না। দুষ্টের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া রাজাকে অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত যথোচিত অনুষ্ঠান করিতে হয়। মায়াবী দুর্বৃত্ত আবার বিবিধ চাতুর্য্য অবলম্বন করে এবং তদনুসারে রাজাকেও কৌশল অবলম্বনে নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। কালক্রমে বর্ত্তমান রাজনিয়মেরও পরিবর্ত্তন এবং সংশোধন করিতে হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে দুর্বৃত্তের দমনে এবং সাধুবৃত্তের কল্যাণ-সাধনে সকলের অন্তরে উৎসাহের সঞ্চার ও সুখের বিস্তার হয়। রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে কামপরায়ণ রাবণ এবং দুষ্ট দুর্যোধনের অবৈধাচরণ এবং ন্যায়পথাবলম্বী রাম যুধিষ্ঠিরাদির সত্যধর্ম্ম পালনের বৃত্তান্ত শুনিয়া অন্তঃকরণে বিষাদ ও হর্ষের উদয় হয়। একমনে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে করিতে তাদাত্ম্যজ্ঞান জন্মিলে শ্রোতাই যেন রাম যুধিষ্ঠিরাদির স্বপক্ষাভিমুক্ত হইয়া বিপক্ষ রাবণ আদির বধে সমুদ্যত হইয়াছেন। এবং আন্তরিক ক্রোধা-

বেগের বশবর্ত্তী হইয়া অস্ত্র-পরিচালন আদি করিতেছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এদিকে লোক সমাজে নিয়ত অনিষ্টকারী দুর্বৃত্তদলের দৈনন্দিন অত্যাচার দেখিয়া শুনিয়াও সকলেরই চিত্তের এইরূপ ভাব উদয় হইয়া থাকে এবং সকলেই যেন বিচারকের অধিকার পাইয়া উহাদের দণ্ডবিধানে সমুদ্যত হইয়াছেন বোধ করেন। সকলের মনে এইভাব স্থায়ী হইলে দুষ্টের দমন তাদৃশ কঠিন কার্য্য হয় না। বস্তুতঃ এই বিষয়ে সুবুদ্ধির দ্বারা কৌশল পরিচালনা করিলে কি পুলিশ অফিসর, কি গৃহস্থ, সকলেরই চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং অন্তরে উৎসাহ জন্মিয়া থাকে। এই উদ্দেশে এই অধ্যায়ে দুষ্টের কতকগুলি কাহিনী সন্নিবেশিত করা গেল। রহস্য বুঝিলে ফল লাভের সম্ভাবনা।

জিলা হুগলীর অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামের বসুদের বাটিতে ১২৪৯ সালের ভাদ্রমাসের এক রাত্রিতে ডাকাইতি হয়। বসুরা তখন এই প্রদেশের বড়লোক বলিয়া খ্যাত। পূর্ব্বে মোসলমান দিগের রাজত্বকালে এই বংশের কয়েকজন সরকারী চাকরি করিত। পরে ব্রিটিশ অধিকারের প্রথম অবধি ৫।৬ জন পুরুষ সিমকি ও অন্যান্য এলেকায় কাজ করিয়া আসিতেছিল। ইহাদের অনেক পরিবার। কাঁচাপাকা বাড়ী। বাড়ীটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্ব। দক্ষিণে একটি কানা নদী। পশ্চিমে একটি বড় পুষ্করিণী। উত্তরে সদর। সদরের সম্মুখে প্রশস্ত ময়দান। তাহার উত্তরে গ্রামের অপরাপর লোকের বাস। রাত্রি গভীর ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। "ডাকাইত পড়িয়াছে সকলে আইস" বলিয়া একজন লোক কয়েকবার চিৎকার করিয়া নীরব হইল। সমাগত দর্শক মধ্যে নিধি সর্দ্দার নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে ঐ দিবস এক বান্দির বাটীতে কুটুম্বরূপে আসিয়াছিল। সে সঙ্গী লোকদিগকে আর বেশী আগে যাইতে নিষেধ করিল এবং বলিল, "দেখচ না? আঁধারে মারের বন্দোবস্ত আছে। ইহাতে পুরাণ ডাকাইত আছে সন্দেহ নাই।" ডাকাইতরা সদর দ্বার হইতে আন্দাজ ১০।১২ হাত তফাতে ময়দানের স্থানে স্থানে কয়েকটা জলন্ত মসাল পাড়িয়া দিয়াছিল। সম্মুখে এক ডাকাইত ঢাল তলওয়ার লইয়া লম্ফ ঝম্ফ করিতেছিল। মসালের আলোক উত্তরের ময়দানের যতদূর পর্য্যন্ত বেশী পরিমাণে যাইতেছিল, তাহার বাহিরে একজন অস্ত্রধারী জোয়ান মুখে মাথায় কাপড় জড়াইয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে বেড়াইতেছিল। মসালের আলোতে খাটীর পাইকের নজর বেশী দূর যায় না। অপর লোক দলবদ্ধ হইয়া অকস্মাৎ উহার উপরে আক্রমণ করিতে পারে, এই নিমিত্ত ঐ অস্ত্রধারী লোকটি অন্ধকারে পাহারা দিতেছে এবং ইহাকেই "আঁধারে মার" বলে, এই কথা নিধি সকলকে বুঝাইয়া দিল। আর বলিল, যদি তোমরা বেশী আগে যাইবার চেষ্টা কর তবে ঐ জোয়ানটা বগে আসিয়া তোমাদের কাহাকে না কাহাকেও আঘাত করিয়া যাইতে পারে এবং বেশী আড়ম্বর দেখিলে সঙ্কেত করিয়া খাটীর পাইককে সাবধান করিতে পারে। যাহা হউক এই বন্দোবস্ত পাকা বলিয়া বোধ হইতেছে না—বসুদের বাড়ী যেরূপ লম্বা, সম্মুখে যেরূপ বড় ময়দান দেখিতে তাহাতে অন্ততঃ দুইজন খাটীর পাইক এবং আঁধারে মারের পাইক দেওয়া উচিত ছিল। এক একজন পশ্চিম মুখে এবং এক একজন পূর্ব্বমুখে যাতায়াত করিলে ভাল ছিল। এই সকল কথা নিধিসর্দ্দার বলিতে বলিতে সঙ্গীদিগকে আস্তে আস্তে কহিল, যদি তোমরা আমায় একটা কোন অস্ত্র বা লাঠি দাও এবং ৮।১০ জন লোক আমার সঙ্গে যাও তবে ডাকাইতদিগকে একবার দেখিতে পারি। দর্শক মধ্যে একজন শক্ত একটি বাঁশের দীর্ঘ লাঠি নিধির হাতে দিল। নিধি অপরের নিকটে একখানা কাপড় লইয়া মুখে ও মাথায় বাঁধিল। সঙ্গীদের নিকট বসুদের বাটীর অবস্থা ও যাতায়াতের অপর দুয়ার আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় জানিয়া লইল এবং সঙ্গীদিগকে বলিল—তোমাদের কোন ভয় নাই, কিন্তু

করিতেও হইবে না, লাঠি হাতে আমার পিছে হামরাও থাকিবে। "বসুদেব" "বসুদেব" এই শব্দ মুখে বলিবে এবং চীৎকার করিবে। যাহার মুখে ঐ শব্দ না হইবে হয়ত ডাকাইত বোধে আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিব। যদি আমি প্রথমে আঁধারে মারের পাইককে মারিতে পারি তবে কেহ কেহ তাহার হেফাজাৎ করিও আর যদি আমি একবারে ঘাঁটীর পাইকের সঙ্গে লড়াই করি দেখ, তখন তোমরা আঁধারে পাইকের পাছু দিয়া দৌড়িয়া সদরে যাইও।" তাড়াতাড়ি কয়েকটা কথা বলিয়া ও শুনিয়া নিধিসর্দার অন্ধকার মধ্যে একবারে উধাও হইয়া চলিয়া গেল।

ময়দানের পশ্চিম অংশে কতক জমিতে পূর্বে মাটি তুলিয়া ইট প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কাজেই ঐখান ময়দান অপেক্ষা ২।৩ ফিট নিম্ন ছিল। নিধি তথায় কিছুকাল বসিয়াই আক্রমণের সুযোগ বুঝিয়া লইল। পরে শৃগালের মত ধীর ও স্থির পদে নিঃশব্দে আঁধারে মারের পাইকের অনুসরণ করিতে করিতে সিংহবিক্রমে তাহার উপর আক্রমণ করিল। ঐ পাইক তখন পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব মুখে চলিতেছিল এবং রাত্রভাগে গ্রামের লোক আসিয়া জমা হওয়ার ঐদিকেই তাহার লক্ষ্য ছিল। নিধি তাহার দক্ষিণে গিয়া অকস্মাৎ আক্রমণ করিল এবং তাহার লাঠির প্রচণ্ড প্রহারে সে "আঁ" শব্দে একেবারে ধরাশায়ী হইল। নিধি বিদ্যুৎ বেগে মৌমাছি মৌমাছি এই শব্দ বলিতে বলিতে ঘাঁটীর পাইকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এই সঙ্কেত বাক্যে ঘাঁটীর পাইক উহাকে আপন দলের আঁধারে পাইক মনে করিতেছিল। এই সময়ে নিধির বজ্রতুল্য বংশ লাঠি উহার সন্দেহ ভঞ্জন করিল। সে উড়োপাক দিয়া সদরের দুয়ার দিকে যাইতে লাগিল। নিধির সঙ্গে যুদ্ধ করিলনা। নিধি বেগে দৌড়িয়া উহার কোমরে আর এক প্রহার মারিল। ঐ ব্যক্তি চালসহ হুড়মুড় শব্দে সদর দুয়ারের নিকটে পড়িয়া গেল এবং ভিতরে প্রবেশ করিল। নিধি আপন সঙ্গী কয়েকজনকে সদরের বাহিরে লাঠির ঠকাঠক শব্দ ও গোল করিতে বলিয়া নিজে পূর্ব্বদিকে দৌড়িল। সে ভাবিয়াছিল, ঘাঁটীর পাইক যেরূপ লাঠির চোট পাইয়াছিল, তাহাতে সে কিম্বা অপর কোন ডাকাইত সদর দুয়ার দিয়া বাহির হইবেনা। নিধি গিয়া দেখিল বাটীর পূর্ব দক্ষিণের দুয়ার দিয়া ডাকাইতগণ হুড়হুড় ভাবে পলাইতেছে। তথায় এক বৃক্ষের তলায় খানিক খাড়া হইয়া নিধি এক ব্যক্তির উপরে দুইলাঠি মারিল এবং তাহাকে কাবু করিয়া মাটিতে ফেলিল। এই সময়ে এক অস্ত্রধারী ডাকাইত ঈশান কোণে দৌড়িতেছিল। নিধি তাহাকে সেই ঘাঁটীর পাইক মনে করিয়া আবার আক্রমণ করিল। কয়েক ঘা লাঠি খাইয়া ঐ ব্যক্তি পড়িতে, উঠিতে, পলাইতে পলাইতে—পরিশেষে পড়িয়া নিশ্চল হইল। নিধি দৌড়িয়া পূর্ব দিকের দুয়ারের নিকটে আবার আসিল। তখন আর কোন ডাকাইতকে দেখিতে পাইল না। পরে আপন দলের লোকদিগকে ময়দান হইতে মসাল লইয়া আসিতে বলিল। বৃক্ষতলে যে ব্যক্তি পড়িয়াছিল তখন তাহার চৈতন্য হইয়াছিল এবং সে "ভাওয়ে" "ভাওয়ে" বলিয়া ডাকিতেছিল। কয়েকজন তাহাকে ধরিয়া সদরে আনিয়া ফেলিল। ক্রমে বসুদের বাটীর ও গ্রামের অনেক লোক আসিয়া জমা হইল। ঈশান কোনের দিকে কিয়দ্দূরে যে ব্যক্তি পড়িয়াছিল তাহার নিকটে মসাল সহ কয়েকজন গিয়া দেখিল, তাহার গলা কাটা, মাথা নাই; অস্ত্র মধ্যে ডাইন হাতের মুষ্টিতে একটি বাঁশের হলকা ধরা আছে, তাহার অগ্রভাগের কতক অংশ সম্মুখের উচ্চ আইলের মাটিতে প্রবেশ করিয়াছে। বাম হাতে এক বালিসের ওয়াড়ে কতক রূপা সোনার কুচা গহনা ও টাকা আছে; কতক টাকা ও গহনা পশ্চাতেস্থানে স্থানে ছড়ান আছে। এই সকল দেখিয়া উহাকে ঘাঁটীর পাইক বলিয়া নিধির যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা দূর হইল। নিধি বলিল, ঐ ব্যক্তিকে তুলিয়া লইতে না পারিয়া ও মুমূর্ষু দেখিয়া

ডাকাইতেরা তাহার মাথা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। আঁধারে মায়ের পাইকের কি হইল বলিয়া নিধি জিজ্ঞাসিলে কয়েকজন বলিল তাহাকে গ্রামের এক গৃহস্থের বাহিরের ঘরে বাধিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া আসিয়াছে। তখায় মশালসহ কয়েকজনে গিয়া দেখিল দুয়ার খোলা, বন্ধ ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে। তদারকে জানা গেল—বাহিরের শিকলটি অধিক লম্বা। ভেতর হইতে কপাট ঠেলিলে যে ফাঁক হয় তাহার ভিতর দিয়া খানিক হাত সলাইয়া কপাটের বেনি বাতার উপরিভাগের কিয়দংশ মোচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং শিকল ও কপাট খুলিয়া বন্ধ ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে।

নিধি বলিল, বোধ হয় তাহার সকল ঘর বিফল হইল। যে লোক যে কাজের উপযুক্ত নহে, তাহাদিগকে লইয়া কোন উদ্যোগ করিলে এই রূপ ফল হইয়া থাকে। আর একজন উপযুক্ত সঙ্গী পাইলে অথবা বন্ধুদের বাড়ীর জায়গা জমি তাহার ভালরূপে জানা থাকিলে এবং ধাঁচীর পাইককে লাঠি মারিবার পরেই ঐ দুয়ারের নিকটে পৌঁছিতে পারিলে সে সকলকে না হউক আর কতকগুলি ডাকাইতকে মারিতে ও ধরিতে পারিত। বড় সুযোগ গেল। ঢাল তলওয়ার থাকিলে এবং বন্ধুদের বাড়ীর ভিতরের অবস্থা জানা থাকিলে, সে ধাঁচীর পাইকের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিয়া সকলকে খোড় কাটা করিতে পারিত। এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে নিধি বলিল, যাহারা আঁধারে পাইককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের কয়েকজনের ঐ ঘরে কি দুয়ারে থাকা উচিত ছিল। ঐ লোকটা লাঠির চোটে প্রথমে বেহুঁস হইয়াছিল পরে চেতনা পাইয়া কপাট ভাঙ্গিয়া পলাইয়াছে।

ভিতর সেউড়ির মধ্যে বন্ধুদের একজন পাইককে রসি দ্বারা বাঁধা দেখা গিয়াছিল। সে ব্যক্তি বলিল, ঘুমাইবার সময় কয়েকজনে অকস্মাৎ গলায় লাঠি দিয়া তাহার হাত বাঁধিয়াছিল এবং ঐ সময়ে ভিতর হইতে কে যেন সদর দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বাঁধিবার সময়ে সে একজন ডাকাইতের হাতে ও পায়ের গোছে কামড়াইয়া মাংস ছিঁড়িয়া লইয়াছিল। ঐ পাইকের কথায় ডাকাইতেরা কেহ কেহ "নিতে" ও "ভাগু" নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিয়াছিল।

এক্ষণে এই ঘটনা সম্পর্কে আসল রহস্য ভেদের কথা বলিতে হইবে। ঘটনার পরদিন অপরাহ্নে দারোগা রহিমবক্স তদারকে আসিল। বড় লোকের বাটীতে ডাকাইতি। তদারকের আড়ম্বর বড়। দিনের বেলায় আবশ্যকীয় স্থানসকল দারোগা করা হইল। সন্ধ্যার সময়ে আহত ডাকাইতটির মৃত্যু হইল। সে যতক্ষণ জীবিত ছিল, তখন "ভাগু" এই শব্দ ব্যতীত আর কোন কথা বলিতে পারে নাই। রাত্রি ৩।৪ দণ্ডের সময়ে দারোগা কাছারিতে বসিলেন। বন্ধুদের বাটীর ও গ্রামের অনেক লোক সঙ্গে নিধি সর্দারকে ডাকা হইল। বন্ধুদের বাটীর যে চৌকীদারকে ডাকাইতেরা বাঁধিয়াছিল তাহার সঙ্গে কয়েক কথার পরে দারোগা নিধি সর্দারকে লইয়া পড়িলেন। বলিলেন—নিধি। তোমার কেরামতের কথা শুনা হইয়াছে—আসল কথা কি? বল দেখি।

নিধি যে সময় হইতে আসিয়া ঘটনায় যাহা দেখিয়াছিল তাহাই বলিতেছিল।

দারোগা ধমকাইয়া উঠিলেন ও বলিলেন—সওয়ালের জবাব চাহেন, বাজে কথা শুনিতে চাহেন না।

সওয়াল কি? বুঝিতেছি না। নিধি বলিল।

দারোগা। এখন ডাকা সাজসে চলবেনা; ডাকাইতদের নাম ধাম ও তোমার সঙ্গে কেন কাজিয়া হইয়াছিল, সব খুলিয়া বল; বেশী চালাকি করোনা।

নিধি। হুজুর! আমাকে কি ডাকাইত মধ্যে একজন বুঝিতেছেন? তবে ত আমি বেশ বাহাদুরি দেখাতে এসেছিলাম! কোথা খোসনাম পাব, না জেলখানা খাব!

দারোগা। মুখ সামলে কথা কও। যেদিন তুমি কুটুম্ববাড়ী আসলে, সেই রাত্রিতেই ডাকাইতি। তোমার ত্যাগ করে নূতন খাটীর পাইক করায় তাহার উপর তোমার বড় রাগ ও তাহাকেই মারবার চেষ্টাও করেছিলে—এই সকল কথা কি আর বুঝতে বাকি আছে? এই কাজ করে আমার গোপ দাঁড়ি পেকে গেল, আজ কিনা তুমি আমায় ফাকা ভুলাতে এলে।

নিধি। হুজুর। আপনার বুদ্ধি বড়। তা না হলে কি এমন পারা? আমি গরীব ছোটলোক। মুখ ত সামলানই আছে, তবে হাত সামলাইতে পারি নাই বলে এই ত নাকাল দেখছি।

দারোগা। জমাদার! নিধে বেটা সোজা লোক নহে। সোজা আঙ্গুলে ঘি বাহির হয় না। এর কাছেই আসল কথা জানবে। ইহাকে ভাল করে দেখ, তফায়তে লয়ে যাও।

নিধি। হুজুর। ভাল বিচার দেখছি। দুটো লাশ পড়ে, একটার যেন মাথা নাই। আর একটা ত গোটালাশ। নিতে ও তাও নামে আর দুইজনের নাম প্রকাশ হয়েছে। বাবুদের চৌকীদার এক কি দুই ডাকাতের হাতে পায়ে লাঠালাঠি দিঁড়ে দিয়েছে। যার মাথা কাটা হয়েছে, তাহার কোন ওয়ারিস থাকলে তার মুখ বন্ধ করতে ডাকাইতদিগকে রাজ হতে হবে। এতেও যদি ডাকাইতির কিনারা না হয়, তবে আর কিসে হবে? আমি, মহাশয়, নির্দ্দোষী। পরে টের পাবেন।

এই সকল কথার সময়ে গ্রামের কয়েকজন লোক উঠিয়া বলিল, মহাশয়! আমরা নিধের পক্ষে সাক্ষ্য দিব। তার কোন দোষ নাই। সে ভাল মানুষ।

দারোগা বলিলেন, এসব যোগসাজসের কথা দেখছি। গ্রামশত্রু না হইলে ডাকাইতি হয় না, জানা আছে।

যাহা হউক পরদিন হইতে লাশ দেখাইবার নিমিত্ত পড়শী গ্রামের লোকজনকে আনা হইতে লাগিল। তৃতীয় দিবসে আর-একজন হিন্দু দারোগা আসিলেন। তিনি লাশ দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তখনি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে রহিমবক্স দারোগার ঘোড়াটি চাহিয়া লইয়া গেলেন। দুই তিন ঘণ্টা বাদে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। এইবারে সঙ্গে একটি দীর্ঘাকার পুরুষ, ১২।১৩ বৎসরের এক বালক, ১৪।১৫ বৎসরের একটি স্ত্রীলোক এবং একটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক ছিল। প্রথমবারে এই হিন্দু দারোগা যখন আসিতেছিলেন, তখন ঘটনাস্থলের আন্দাজ দুই ক্রোশ দূরে একটি বড় পুকুরের পাড়ে বৃক্ষতলায় বসিয়া তিনি খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পূর্ব্বকথিত দুইটি স্ত্রীলোক ও বালকটি ঐ পুকুরে জল খাইয়া স্নানবদনে পথে চলিতে লাগিল। দারোগাকে উহাদের পাছে পাছে কতকদূর আসিতে হইয়াছিল। ঐ সময়ে প্রাচীনা স্ত্রীলোকটি আপনা আপনি আক্ষেপ করিতে করিতে বলিয়াছিল—"আজ এমন করে কি তোকে আনতে হয়? তা যেমন তোর কপাল, যখন সে গেল তখন ছাই টাকাকড়িতে আর কি কাজ; হা পরমেশ্বর! মুকরবার যো নাই, পেট ভরে কাঁদবারও যো নাই।" এই কথাগুলি দারোগার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তখন তিনি ইহাতে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। ঘটনাস্থলে গিয়া যাহা কিছু দেখিলেন তাহাতে ঐ সকল কথার অর্থ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল এবং তিনি ঐ লোকগুলির সন্ধানে দৌড়িলেন। কতকদূর

যাইবার পরে অপর একজন জোয়ানসহ কথিত তিনটি লোক সঙ্গে উহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি উহাদের সকলকে ফিরাইয়া আনেন। উহারা অন্যান্য লোক সঙ্গে আসিয়া লাশ দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল প্রকাশ পাইল। পরিশেষে এই সামান্য সূত্র হইতে হিন্দু দারোগার প্রয়াসে প্রকৃত রহস্য প্রকাশ পাইল। মাথাকাটা লাসটার নাম নিতাই; যুবতী স্ত্রীলোকটি নিতাইর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; বালকটি ঐ স্ত্রীলোকের ভাই, প্রাচীনা স্ত্রীলোকটি নিতাইর দূর-সম্পর্কে পিসি; সে নিতাইয়ের স্ত্রীকে পিত্রালয় হইতে আনিতে গিয়াছিল। বড় জোয়ানটির নাম ভাগবৎ বা ভাগু এবং সে অপর মৃত ডাকাইতের জামাতা। এই সকল কথা প্রকাশ হইলে অপর ডাকাইতদিগের সন্ধান হইল। যুবতী স্ত্রীলোক এবং ভাগুর মৃত শ্বশুরের পরিবারকে যাহা দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিধির পক্ষে বিধি সদয় হইলেন। রহিমবক্স দারোগা আপন অনুমান-শক্তির মাহাত্ম্য বুঝিলেন কিনা জানা গেল না।

• • • •

ভন্ হিণ্ডেনবার্গ একবার এক সামান্য জার্মান সৈনিককে দল ছেড়ে পালাবার জন্য কোর্ট মার্শাল করবার আদেশ দিলেন।

সৈনিকের বৃদ্ধা মাতা ত কেঁদেই আকুল। বললে, আমার জন্যে যাহার আমার প্রাণ যায়। কেন না আমার কঠিন অসুখের খবর পেয়েই সে লুকিয়ে আমাকে দেখতে এসেছে।

—তোমার অন্য ছেলেরা ছিল না? প্রশ্ন করলেন হিণ্ডেনবার্গ।

—তারা সব ফ্রান্সো প্রাশিয়ান যুদ্ধে মারা গেছে। একটি মাত্র ছেলেই এখন জার্মান সৈন্য বিভাগে কাজ করে।

হিণ্ডেনবার্গ গম্ভীর হ'য়ে বললেন,—তুমি বীর প্রসবিনী, —তোমার আবেদন গ্রাহ্য হোক,— তোমার ছেলে মুক্তি পাবে।

ব্যাপার যা চলছে

(মতামতের জন্য গল্প ভারতী সম্পাদক দায়ী নন)

রাজারাজড়ার ব্যাপার। কিছুদিন আগে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের স্বামী এডিনবরার ডিউক ফিলিপ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। দোলের দিন তিনি ছিলেন জয়পুরে এবং জয়পুরের মহারাণীর সঙ্গে সারাদিন হোলি খেলেছিলেন। তাঁর দুই গালে মুখে মাথায় আবিরে ভরে গিয়েছিল। পরণের দামী সুট লালে লাল হয়েছিল। মহারাণীর সোনার পিচকারি থেকে ঝরা রঙীন গোলাপ জলের সঙ্গে ফোল লীলার কুঞ্জতল আমোদিত হয়েছিল। তা তো হয়েছিল। কিন্তু ভাবছি এই রঙীন সংবাদ পড়ে রাণী এলিজাবেথের মেজাজ সপ্তমে চড়েনি তো? একেই তিনি একটু কোপনস্বভাব বলে শুনেছি! কতকটা তাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহীর মেজাজ পেয়েছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া পারিবারিক জীবনেও পুরোদস্তুর আত্মম্ভরী ছিলেন। শুনেছি তাঁর দাপটে প্রিন্স অ্যালবার্ট মাঝে মাঝে বাড়ী ছেড়ে পালাতেন। অবিশ্যি আমাদের প্রিন্স ফিলিপ ছেলে ভাল। এদিক ওদিক দোষ নেই। খেলাধুলো আর দেশ বেড়ানো—তাতেই খুসী। তাহলেও রাণীর মেজাজ তো। সে এক আলাদা জিনিষ!

• • • •

রাজারাণীর কথা থেকে চলে আসা যাক বিড়ির কথায়। বিড়ি। কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে যেন একটা বেয়াড়া ভাব আসল। বিড়ি যেন নিতান্তই এক অতি অপাংক্তেয় এবং অ-সভ্য বস্তু! তাই বোধকরি আজকাল গৃহভৃত্যরা, এমনকি বাড়ুদাররাও বিড়ি ছেড়ে সিগারেট ধরেছে। আজকাল তারা আর বিড়ি ফোঁকে না। ছেলে ছোকরাদের তো কথাই নেই। কিন্তু তাই বলে আমাদের এই নিজস্ব নির্ভেজাল স্বদেশী বস্তুটির চাহিদা কমছে এমন মনে করবার কারণ নেই। বরং এক সাম্প্রতিক খতিয়ানে জানা গেছে বিড়ির বিক্রি সর্বত্রই বাড়তির মুখে। এমন কি, এই তুচ্ছ বিড়ি বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছে। অর্থাৎ বিদেশীরাও বিড়ি ফুঁকছে। প্রচুর পরিমাণে বিড়ি বিদেশে চালান যাচ্ছে, বিশ্ব-বাজারে বিড়ির প্রচলন খুব। আমেরিকা থেকে মালয়েশীয়া সর্বত্র বিড়ি চালান যাচ্ছে। মালয়েশীয়ার সর্বাধিনায়ক টুংকু আবদুল রহমান একজন অবিচ্ছিন্ন বিড়িপায়ী, এ একটি বিশেষ খবর। তিনি এই ভারতীয় পথাকে নিজের দেশে দস্তুরমত আতে তুলেছেন। যে সব দেশ ভারত থেকে বিড়ি আমদানি করে তাদের মধ্যে আফগানিস্তান, বাহেরিন, কাওয়াট, মালয়েশীয়া, নেপাল, সিংগাপুর, বর্মা, পাকিস্তান এবং সিংহল উল্লেখযোগ্য। অবশ্য পাকিস্তান ও সিংহল নিজেদের দেশের বিড়ি শিল্পকে বাঁচাবার জন্যে ভারতের বিড়ি আমদানি বন্ধ করেছে। তাহলেও সেই দুই দেশেও ভারতের বিড়ি নানা পথ দিয়ে পৌঁছোচ্ছে। মার্কিন দেশেও বিড়ির প্রচলন বাড়ছে। সিগারেট-কাগজ থেকে ক্যানসার হয়, এই যে কথাটা চালু হয়েছে তারই সুবিধা নিয়ে বিড়ির পক্ষে বলা হচ্ছে যে বিড়ি নির্ভেজাল, তামাক পাতা দিয়েই মোড়া হয়। কাজেই তা থেকে কোন রোগ জন্মাবার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য বিড়িশিল্পের কর্তাব্যক্তিরা মনে করছেন মার্কিন দেশে যদি আকর্ষণীয় প্যাকিং মোড়ায় সুন্দরভাবে বিড়িকে পাঠানো যায় তাহলে তার চাহিদা আরও অনেক বাড়বে।

• • • •

ভাষাবিতর্কে নানা গুণীজন নানা মতামত প্রচার করেছেন। সেই মতামতের মধ্যে যদি কোন বিচারপতির মন্তব্য পাওয়া যায় তাহলে তার যে সমধিক গুরুত্ব আছে তাতে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি এলাহাবাদের এক কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এস ধাবন তাঁর মতামত সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। বলেছেন হিন্দিতেই। কিন্তু তাঁর কথা শুনে হিন্দিবাজদের মাথা ঘুরে গেছে। তিনি বলেছেন, ভাষার চেয়ে জাতীয় সংহতির কথা আগে ভাবা দরকার। তাঁর উক্তি—"যদি আমি হিন্দির দ্বারা প্রজাতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে পারি তাহলে আমি হিন্দি গ্রহণ করব। কিন্তু যদি দেখি কেবলমাত্র হিন্দিকে বাদ দিলেই প্রজাতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব তাহলে মনে ব্যথা পেলেও আমি হিন্দিকে ত্যাগ করব। ভাষা ভাব প্রকাশের মাধ্যম। পূজার্চনার বস্তু নয়।...কোন জটিল সমস্যাকে ভাষাবেগের দৃষ্টিতে দেখলে সমূহ বিপদ। এই সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদের দৃষ্টিতে দেখা উচিৎ। হিন্দির সমর্থকরা বুঝতে পারছেন না যে যদি কেবলমাত্র মর্যাদা রক্ষার জন্যে অহিন্দিভাষীদের ওপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগবে এবং জাতীয় ঐক্য বিপন্ন হবে।"

আজকের এই ভাষাদ্বন্দ্বজনিত জটিল ও সংকীর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে একজন হিন্দিভাষী বিচারপতির এমন একটি নির্ভীক ও সুচিন্তিত ভাষণের প্রয়োজন ছিল।

• • • •

কোন গণ্যমান্য নেতা যখন ভিন প্রদেশের কোন শহরে যান তখন তাঁকে ঘটা করে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এবং সেই উপলক্ষে রাস্তাঘাটে যাতে প্রচুর লোক জমে তার ব্যবস্থাও করতে হয়। কংগ্রেস এসব কাজে খুব দড়। সম্প্রতি কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ আগরতলায় পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে যাতে তাঁর অভ্যর্থনা উপলক্ষে পথে পথে খুব ভীড় জমে, স্থানীয় কংগ্রেস সে জন্যে এক বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল। ফলে ভীড়ও হয়েছিল প্রচুর। কংগ্রেস কী ব্যবস্থা করেছিল জানেন? সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের আদিবাসীসুলভ বুক খোলা, পেট খোলা, পা খোলা পোষাক পরিয়ে ঘাটিতে ঘাটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। মেয়েদের মুখে আবার সে কি আকর্ষণীয় হাসি। আর ভঙ্গীই বা কি কম? পত্রিকায় ছবি বেরিয়েছে। তাই দেখেই এই মন্তব্য লিখলাম। অতএব কামরাজ-অভ্যর্থনায় সেখানে যে ভীড় জমবে তাতে আর সন্দেহ কী!

• • • •

ভাড়াটেদের প্রতি বাড়িওয়ালার জুলুম জবরদস্তি আর অত্যাচার—শুধু আমাদের এই শহরেই নয়, অন্য দেশের অন্য শহরেও আছে। বস্তুতঃ মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তার গলায় পা দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধির করার মত নীচ প্রবৃত্তি শুধু কোন একটি স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর সব জায়গার সব মানুষের মধ্যেই এই নীচতার প্রকাশ দেখা যায়। সম্প্রতি সভ্যতার পীঠস্থান খাস লণ্ডন মহানগরে ভাড়াটে বনাম বাড়িওয়ালা ও সেখানকার গৃহসমস্যা সম্বন্ধে যে "রিপোর্ট" বেরিয়েছে তা শুধু বিস্ময়কর নয় অপরাধকাহিনীর মত চমকপ্রদ। বাড়িওয়ালার অত্যাচারে সেখানকার ভাড়াটের অবস্থা যেমন করুন তেমনি শোকাবহ। সেখানকার মিলনার হল্যাণ্ড কমিটি নামে একটি সংস্থা শহরের গৃহসমস্যা ও ভাড়াটে বাড়িওয়ালার সম্পর্ক অনুধাবন করে সরকারের কাছে একটি আড়াই লক্ষ শব্দ সম্বলিত রিপোর্ট পেশ করেছেন। এই রিপোর্ট টিকে সমাজসমস্যা সম্পর্কে এই শতাব্দীর একটি স্মরণীয় ও মহৎ প্রচেষ্টা বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে। সেই দীর্ঘ রিপোর্টের সারমর্ম হচ্ছে

এই :—১। লণ্ডনে অন্ততঃ সেড়হাজার গৃহহীন পরিবার ছড়িয়ে আছে। ২। চল্লিশ থেকে আশীহাজার নরনারী বাড়ি না পেয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে দিনপাত করছে। ৩। বাড়িওয়ালারা অতিলোভের তাগিদে ভাড়াটেদের কাছ থেকে বেশী ভাড়া আদায় করবার জন্যে বা তাদের উৎখাত করে বেশী ভাড়ায় নতুন ভাড়াটে বসাবার জন্যে নানা অমানুষিক এবং হিংস্র পন্থা অবলম্বন করছে, যথা, তাদের মারধোর করছে, খুন করবার ভয় দেখাচ্ছে, তাদের ঘরে আবর্জনা ফেলে দিচ্ছে, তাদের বন্ধ দরজায় লাথি মারছে, তাহাদের স্নানের ঘরে জ্যান্ত সাপ ছেড়ে দিচ্ছে এবং সময়ে সময়ে তাদের পিছন থেকে ন্যাংটো মেরে ফেলে দিচ্ছে! রিপোর্টে অবশ্য বলা হয়েছে যে এরকম বাড়িওয়ালার সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু তারা আছে এবং তাদের দাপটে বহু শত ভাড়াটে ত্রাহি ত্রাহি করছে এবং ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়ে বাড়িওলার বেশী ভাড়ার চাহিদা মেটাচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশের তথাকথিত উচ্চ সভ্যতার গুণগানে যারা অহরহ পঞ্চমুখ, খবরটি পড়ে তারা কিছু ম্রিয়মান হবে সন্দেহ নেই।

• • • •

পাশ্চাত্যদেশে ভারতের "বন্ধুর" (?) অভাব নেই। যে-কোন সুযোগে ভারতের কুৎসা করা ওদেশের বহু লোকের একটা বিশেষ আনন্দের কাজ! বহু বহু বার এই প্রমাণ পাওয়া গেছে। মার্কিন বা ব্রিটেন এদুই দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই দুই দেশের নেতারা প্রায়শই ভারতের সম্বন্ধে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। কিন্তু অপরদিকে দেখা যায়, এই দুই দেশের বহু প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সংস্থা বা ব্যক্তি অবাধে ভারতের বিরুদ্ধে বাজ বিদ্রূপ শ্লেষ ও কুৎসা প্রচার করছে। ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারলেই যেন তাদের জীবন সার্থক। সম্প্রতি লণ্ডনের নিউ আর্টস থিয়েটার ক্লাব নামক নামকরা প্রতিষ্ঠানে একটি নাটক অভিনীত হচ্ছে। নাম "কাইণ্ড্ লি মাংকিস"। এই নাটকে ভারতীয় সভ্যতা ও দর্শনের আদ্যশ্রাদ্ধ করা হয়েছে। এই নাটকের প্রধান চারটি চরিত্র চারজন মার্কিন ডাক্তার ভারতে এসে হিমালয়ের নানা স্থানে ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে তারা কৈলাশে উপস্থিত হয়েছে। সেইখানে বসে তারা এখন সব কথা বলছে বা এমন সব কাণ্ড করছে যাদের দ্বারা প্রচারিত হচ্ছে যে, হিন্দুধর্ম কুসংস্কারের আগাগোড়া মাত্র, হিন্দু ধর্মধ্বজীরা ভাকিনীবিদ্যা ছাড়া আর কিছু জানে না, তারা সব ভিক্ষা করে দিনপাত করে, হিন্দুর মহাদেব আর কালী এরা অতি জঘন্য আদর্শের প্রতীক এবং পুনরায় এদেশে যীশুর সন্তানদের ভারতে এসে এই সব ভারতীয়দের অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে নিয়ে যাওয়া কর্তব্য। এই মতবাদ প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ চারজন ডাক্তার যাচ্ছেতাই সব কাণ্ড করেছে নাটকের মধ্যে, তারা অবাধে জুতো পায়ে মন্দিরে ঢুকছে, বিষ্ণুমূর্তির মাথায় চড়ে বসেছে, মদের বোতল দিয়ে সেই মূর্তির গায়ে আঘাত করেছে। তাদের কারবানি আর মজাদার ব্যাপার দেখে দর্শকরা হেসে লুটোপুটি খেয়েছে। নাটকটি অনেকদিন থেকেই চলছে। লণ্ডনে অনেক ভারতীয় আছেন। তাঁরা এই ব্যাপারটা সইছেন কেমন করে তাই ভাবতে আশ্চর্য লাগছে।

• • • •

নানা ঘটনা! নানা ব্যাপার! সরকারী কোন কাজটা কি ঠিক নির্ঝঞ্ঝাটভাবে সম্পাদিত হবার নয়! টেলিফোন বিলের কেচ্ছা তো কারুর অজানা নেই। সম্প্রতি যে টেলিফোন ডাইরেকটরি বেরিয়েছে তা নাকি ভুলে ভরা। এই ডাইরেকটরির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে টেলিফোন-কর্মীরা

জেনারেল ম্যানেজারের কাছে আবেদন করেছিলেন। জানা গেছে, জেঃ ম্যানেজার এনকোয়ারী (১৯৭) কমীদের নতুন ডাইরেকটরি না খুলতে নির্দেশ দিয়েছেন।.....

• • • •

মঙ্গলগ্রহে মানুষ আছে। এবার আর. এইচ. জি. ওয়েলস-এর কল্পনা নয়। এবার রুশ বিজ্ঞানীর গবেষণা। সোভিয়েট বিজ্ঞানী জেলিকস মিগেল বলেন যে মঙ্গলগ্রহের আকৃতিতে যেসব সাময়িক পরিবর্তন দেখা যায় তা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের সৃষ্টি। অতএব তাদের সঙ্গে কবে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে, তারই দিন গোনা যাক!...

• • • •

কয়েকজন কংগ্রেসী মন্ত্রী পিপে পিপে মদ টানছেন, অর্থাৎ ওঁরা পাঁড় মাতালের পর্যায়ে পৌঁছেছেন, বলেছেন যে সে লোক নয়, স্বয়ং মোরারজি ভাই দেশাই, খাস রাজধানীতে মাদক বর্জন সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে। সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেছেন, এ অবস্থা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে শুধু কংগ্রেসই নয়, দেশও উচ্ছন্নে যাবে। মোরারজিভাই শুনতে পেলেন না, কিন্তু আমরা যেন শুনতে পেলাম: আরে ওটা আবার কোত্থেকে এসে জুটল. যাও না যাওয়া, এখানে কেন, নিজের ডেরায় গিয়ে চেল্লাও গে! নেশাটা বেশ জমে উঠেছিল, দিলে সব মাটি করে!.....

• • • •

মেক্সিকোর এক জ্যোতিষী শুণে গেঁথে রেখে বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন এবং সেই যুদ্ধে মেকসিকো শহর নিশ্চিহ্ন হবে। শুধু তাই নয়, সেই যুদ্ধে অর্ধেকেরও বেশি পৃথিবী ও তার লোকজন ধ্বংস হবে। এই জ্যোতিষী নাকি এর আগে পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহ, হিটলারের পতন, প্রভৃতি ব্যাপারে যেসব ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। অতএব, আর চিন্তা নেই, মোক্ষলাভের দিন আসছে!...

• • • •

দিল্লী থেকে একটা ইংরাজী সাপ্তাহিক বেরোয়, নাম ইণ্ডিয়ান অবজার্ভার। যত রাজ্যের নোংরা খবর তৈরী করে পরিবেশন করাই এই পত্রিকার কাজ। কলকাতা নিয়ে নানা কুৎসা এই পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। দিল্লীর কর্তাদের নাকের ডগায় বসে কী করে যে এর সম্পাদক এই পত্রিকা চালাচ্ছেন তা আশ্চর্যের ব্যাপার। সম্প্রতি কলকাতা পুলিস এবিষয়ে সজাগ হয়েছে এবং কলকাতার ব্যাপার নিয়ে এই পত্রিকায় যে লেখা বেরিয়েছে তা নিতান্ত অশ্লীল বিবেচনায় এই পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশককে গ্রেপ্তার করেছে। সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছে এই পত্রিকার পরিবেশক মুলচাঁদ কাপুর।...

• • • •

হায় বাংলা দেশের মন্ত্রী, তোমার কপালে এও ছিল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারীলাল তোমায় একেবারে তুচ্ছ তুচ্ছ করে তোমার অভ্যর্থনাকে অগ্রাহ্য করে ক্রোড়পতি ব্যবসায়ির কোলে চড়ে দমদম থেকে রাজভবন চলে গেল। ব্যাপারটা যেমনি মজার তেমনি দুঃখের। ব্যাপারটা হল এই: গত ১০ই এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ এসেছিলেন কলকাতায়। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে রাজ্যের প্রথমমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্য কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যথাসময়ে দমদম বিমান ঘাঁটিতে হাজির হয়েছিলেন। প্রথা এই যে মাননীয় অতিথি

রাজ্যসরকারের প্রতিনিধির সঙ্গেই তাঁর গাড়িতে রাজভবনে আসবেন! কিন্তু হা হতোস্মি: বিজয় সিং নাহার দাঁড়িয়ে রইলেন। নন্দজী তাঁর দিকে ফিরেও তাকালেন না। নন্দজীর সঙ্গে ছিলেন এক ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী। ঘনশ্যাম বিড়লা তাঁর সঙ্গে কথা বলতেই তিনি মশগুল। ব্যবসায়ী বললেন, সরকারী খোলা গাড়ীতে গিয়ে কাজ নেই ও গাড়ীতে বড্ড ভীড়। আমার গাড়ীতে চলুন, এয়ারকনডিশানকরা গাড়ী আমার। তথাস্তু তথাস্তু বলে নন্দজী তাঁর গাড়ীতেই উঠলেন। বিজয় সিং নাহার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। এই ব্যাপারে নাকি পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ও কংগ্রেস মহলে বেদনা ও বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছিল এবং অতুল্য ঘোষ নাকি নন্দজীকে এবিষয়ে "কড়া" চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তাঁবেদারদের আবার বেদনা, তাঁদের আবার বিস্ময়! একখানা মোলায়েম চিঠি পেয়েই তাঁরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তাহাড়ি ঐ শিল্পপতিটির কী অস্পর্ধা। তিনি নাকি ঐ দিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাইটার্স বিল্ডিংএ গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাতেও অসম্মতি জানান।...

• • • •

ভারতবর্ষ আমাদের মাথার চুল পর্যন্ত বিক্রয় করছে এবং আমাদের মাথার চুল বিদেশে রপ্তানি করে বেশ কিছু বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেছে। গত বছর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ন' মাসে ভারত ১৯৭২৬৬৮ টাকা দামে ২৫১০২ কিলো মানুষের চুল পশ্চিমী দেশগুলিতে রপ্তানি করেছে। মন্দ কি! এবার থেকে সবাই চুল রাখুন আর সেই চুল বিক্রি করুন।.....

• • • •

আর ভাবনা নেই, কাকদ্বীপে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র খুব সাংঘাতিক কথা বলেছেন: "পশ্চিমবঙ্গ সরকার অসাধু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কখনই পরাঙ্মুখ হবে না।" দেনাপাওনা নাটকে জীবানন্দের প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি মনে পড়ছে: "এবার নিয়ে ক'বার হল দাদা!" এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ভাগবতগীতা থেকে একটি শ্লোক ভিক্ষা করেছেন, তিনি বলেছেন "আমি একথা কখনো বিশ্বাস করিনা যে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সাহায্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে।" তিনি না বিশ্বাস করলে কী হবে, দিল্লীর দাদারা করেন, স্বয়ং জওহরলাল করতেন (বা করতে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল) লালবাহাদুর করেন, নন্দ প্রমুখ আর সবাই তো তোবা বলে করেন।

• • • •

ক্যান্সার রোগের প্রতিষেধক কোন ওষুধ আজ পর্যন্ত কেউ বের করতে পারেনি।

ক্যান্সার ভ্যাক্সিন তৈরী করতে হ'লে চাই সুস্থ মানুষের দল যারা সাহস করে মৃত্যু বরণ করতে পারবে। তাদের দেহে ক্যান্সার সেল প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা চালাবেন বিজ্ঞানী, ধীরে ধীরে অত্যন্ত কঠোর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আসবে তাদের ওপর।

আমেরিকার ওহিও জেল হাসপাতালে আবেদন প্রচারিত হ'ল—কয়েকজন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণকারী চাই।

কয়েকজন বন্দী এগিয়ে এলেন, যাঁদের নামে চুরি খুন, অপরাধের রেকর্ড ছাড়া আর কিছুই নেই।

সাহিত্য সংবাদ

অষ্টাদশ শতকের য়ুরোপের অন্যতম মনীষি দিদেরো। দার্শনিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি জীবিতাবস্থাতেই বহুদূর ব্যাপ্ত হয়েছিল। সেকালের য়ুরোপের অনেক শাসক, যাঁরা প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচারী রূপে ইতিহাসে পরিচিত, তাঁরা দিদেরো প্রমুখ দার্শনিকদের ভাবধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন। তিনি মাঝেমাঝে দিদেরোকে নিজের প্রাসাদে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে তাঁর সঙ্গে নানা দার্শনিক আলাপ আলোচনা করতেন। দিদেরো আলাপ করতে করতে যখনই একটু উত্তেজিত হ'য়ে পড়তেন, সামনে হাত চালিয়ে যেতেন, যা সামনে পেতেন তা-ই চাপড়াতেন। সম্রাজ্ঞী হ'য়েও ক্যাথারিনের দু-একবার ওরকম চাপড় খেতে হয়। বাধ্য হ'য়ে ক্যাথারিন একটা উপায় বাৎলালেন। এর পর থেকে যখনি তিনি দিদেরোর সঙ্গে দর্শন তত্ত্ব নিয়ে আলাপ করতেন, দার্শনিক ভদ্রলোক এবং নিজের মাঝখানে একটা টেবিল রেখে দিতে ভুলতেন না।

• • • •

খ্যাতনামা ইংরেজ সাহিত্যিক। জন্মেছিলেন কিন্তু এ দেশে। বোম্বাই শহরে। ছেলেবেলার অনেকগুলি দিন কেটে গেল সেখানেই। মা-বাবা পাঠালেন ইংল্যাণ্ডের এক স্কুলে। সেখানে যে মহিলাটি তার অভিভাবক হলেন তিনি দারুণ নিষ্ঠুর। কারণে অকারণে বালকটিকে মারধোর করতেন। বইয়ের মধ্যে যখন ডুবে যেত, একমাত্র তখনি ছেলেটির মনে আসত শান্তি। কিন্তু সে শান্তিও বেশিদিন ভোগ করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হ'য়ে পড়ল। মা ইংল্যাণ্ডে এসে দেখলেন ছেলে প্রায় অন্ধ, তার মন প্রায় পঙ্গু। অন্য একটি স্কুলে পাঠান হল। সহৃদয় শিক্ষকের সাহচর্য, চেষ্টা আর যত্নে আবার সজীব হ'য়ে উঠল বালকের মন। তার মন পথ পেল আত্মপ্রকাশের। বড় হয়ে ছেলেটি ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠল। তবু তার মনে চিরকালের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষের প্রকৃতি, এর গাছপালা, জীবজন্তু। ইনি রাডিয়ার্ড কিপলিং।

• • • •

উত্তর য়ুরোপের বাসিন্দা। কবি আর নাট্যকার হিসেবে পৃথিবীজোড়া নাম। দিন-রাত সাহিত্য সৃষ্টিতেই ব্যস্ত থাকতেন। জীবনের অন্য সমস্ত বিষয়েই ছিলেন উদাসীন। কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করতেন না। নিজের পরিবারের লোকদের সঙ্গেও নয়। সমাজে থেকেও তিনি যেন ছিলেন সমাজের বাইরে।

১৮৫০ সালে গৃহত্যাগ ক'রে গিয়েছিলেন। যোল আর জন কয়েক বন্ধু ছাড়া আর কেউ তাঁর দেখা পেত না। মিস্টিক ব'লে তাই তাঁর খ্যাতি রটে গিয়েছিল। সমাজ সম্পর্কে উদাসীন থেকেও যে কটি সামাজিক নাটক তিনি রচনা করেছেন চরিত্র-বিশ্লেষণ, মানবিকতা, মমতা আর আধুনিক সমস্যার রূপায়নে সেই নাটকগুলি তাঁকে এনে দিয়েছে মৃত্যুত্তীর্ণ খ্যাতি। এই আশ্চর্য নাট্যকার ইবসেন। তাঁর নাম আজ আর কোনো পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেনা।

গোখরো সাপের বিচার

সাদেক হেদায়াৎ

অনুবাদ :—গৌরীশংকর দে

[লেখক পরিচয়: আধুনিক পারস্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক সাদেক হেদায়াৎ। জন্ম ১৯০৩ সালে তেহেরাণে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'অন্ধ পাঁচা।' ১৯৫১ সালে প্যারিস শহরে এই শক্তিমান সাহিত্যিক আত্মহত্যা করেন। বর্তমান আখ্যায়িকাটি তাঁর প্রখ্যাত উপন্যাসের একটি অংশ। তবে, ছোটগল্পের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এর আছে।]

আমার মা-বাবা সম্পর্কে নানা রকম কথা কানে এসেছে। তবে নানীর কাছে যা শুনেছি তা-ই সত্য ব'লে মনে হয়। নানী বলেছিল :

আমার বাবা আর কাকা ছিলেন যমজ ভাই। দেখতে অবিকল একরকম। নাক-মুখ, চেহারা ভাব-ভঙ্গি—সবদিক থেকে। এমনকি তাদের গলার স্বরও ছিল একই রকম। ফলে দু'জনকে আলাদা ক'রে চেনা অনেক সময়ই কঠিন হ'য়ে দাঁড়াত। তাছাড়া, তাদের দুজনের মধ্যে ছিল সহানুভূতির অদৃশ্য বন্ধন-ডোর। একজনের অসুখ করলে, আরেকজনও অসুস্থ হয়ে পড়তেন। প্রবাদ বাক্য দিয়ে বলতে গেলে, তারা ছিলেন যেন একই আপেলের দুই আধখানা অংশ।

সময় বুঝে, দু'জনে মিলে স্থির করলেন ব্যবসা করবেন। বিশ বছর বয়স যখন হল পা বাড়ালেন ভারতবর্ষের দিকে। সেখানেই ব্যবসায় শুরু করলেন। রেশমী কাপড়, ফুল-কাটা কাপড়, সুতী বস্ত্র, জোব্বা, শাল, সুঁচ, মাটির বাসন, সিরিমাটি, কলমের বাক্সের চাকনা ইত্যাদি হরেক রকম জিনিসের ব্যবসায়। বাবা আস্তানা গাড়লেন বারানসীতে। ব্যবসায় উপলক্ষ্যে কাকাকে পাঠাতেন ভারতের অন্যান্য বড় বড় শহরে। ডেরা বাঁধবার কিছুদিনের মধ্যেই বাবা শিবম মন্দিরের এক নর্তকী, বুলম দাসীর প্রেমে পড়লেন। বিশাল শিবম বিগ্রহের সামনে ওই দেবদাসী নৃত্য করতেন। মন্দিরের পরিচারিকার কাজও করতেন। তার সর্বাঙ্গে তখন যৌবনের উষ্ণ শোনিতধারা প্রবাহিত। গায়ের রং জলপাইয়ের মতো। উন্নত বক্ষ। আয়ত চোখ দু'টি উপরের দিকে ঈষৎ বাঁকানো। সরু ভ্রু-লতা দু'টি এসে মিলেছে ঠিক মাঝখানে। ললাটে কুমকুমের রক্ততিলক।

কল্পনা ক'রে নিতে পারি, আমার মা বুলম দাসীর পরনে তখন সোনালি কাজকরা রঙিন রেশমী শাড়ি। মাথায় বুটিদার জরীর কাপড়। বক্ষদেশ অনাবৃত। কেশদাম অনন্ত অন্ধকার রাত্রির

মতো কালো খোঁপা ক'রে বাঁধা। মণিবন্ধে এবং পায়ে কঙ্কন। নাসারন্ধে সোনার নথ। চোখ দুটি কালো মদালস! উপরের দিকে ঈষৎ বাঁকা। ঝকঝকে সাদা দাঁত। সেতার, সারঙ্গী, বীণা, করতাল, আর পিতার ধ্বনির সঙ্গে তাল রেখে ধীর লয়ে, মেপে মেপে পা ফেলে, নেচে চলেছেন। মাথায় পাগড়ি বাঁধা ক'য়েকজন লোক খালি গায়ে বিচু গলায় গান ধরেছে। একঘেয়ে সেই সুর। কী যেন রহস্য আছে সেই গানে। কী এক জাদুমন্ত্র! তার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠছে চিরকালের ভারতবর্ষের মানুষের নানা আখ্যান, প্রেম, বেদনা। পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রদীপ জালিয়ে মন্দির—নৃত্য ক'রে চলেছেন। ফুলের মতোই যেন ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলছেন যুগল দাসী। যেন একটা হিল্লোল ব'য়ে যাচ্ছে তার গ্রীবা আর বাহুতে। মাথাটা একবার এসে ঝুঁয়ে পড়ছে সামনের দিকে, আবার চ'লে যাচ্ছে পিছন দিকে। দেহের প্রতিটি আন্দোলনের কত অর্থ, শব্দে যা প্রকাশ করা যায়না সেই ভাষা। এই দেহ-তরঙ্গ আমার বাবার মনে নিশ্চয়ই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। চন্দনের সৌরভ আর চন্দন-তৈলের সুসঙ্গের সঙ্গে তার অঙ্গের মেদ-গন্ধ মিশে যাওয়াতে ইন্দ্রিয়ের কাছে আরো প্রখর হ'য়ে উঠেছিল ওই দৃশ্যের আবেদন। চেতনার তলদেশে যেসব বোধ লুকিয়ে থাকে, তারা যেন ধীরে-ধীরে জেগে উঠেছিল অপরিচিত উদ্ভিদের গন্ধসারের সাড়া পেয়ে। নার্সারীতে যে ওষুধের বাক্স থাকে তার গন্ধের সঙ্গে বোধ হয় মিল আছে ওই সব আণের। আমরা জানেছিলুম, ওই বাক্সগুলি আসে ভারতবর্ষ থেকে। আসে অপরিচিত তৈল। এক প্রাচীন সভ্যতার, রহস্যের দেশ থেকে। আমি যে ওষুধ ব্যবহার করতুম তার গন্ধ নিশ্চয়ই ওই সব আণের মতো।

সব কিছু মিলে বাবার মনে জাগিয়ে তুলেছিল এক সুদূর, লুপ্ত জগতের স্মৃতি। বাবা যুগল দাসীর প্রেমে পড়লেন। সেই প্রেম এমনই গভীর হল যে তিনি দেবদাসীটির ধর্ম গ্রহণ করলেন। হলেন নিজস্ব পূজারী।

কিছুদিন পরেই নর্তকীর সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিল। মন্দিরে কাজ করার অধিকার তিনি হারালেন। কাকা বাইরে গিয়েছিলেন। আমার জন্মের দিন ক'য়েক পরেই ফিরে এলেন বারানসীতে। অন্যান্য ব্যাপারে যেমন তার মানসিক প্রতিক্রিয়া অবিকল বাবার মতো ছিল, প্রেমের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। আমার মা'কে পাগলের মতো ভালোবেসে ফেললেন। শেষে বাসনা চরিতার্থ পর্যন্ত ক'রে ফেললেন। শরীর আর মন দু'দিক থেকেই কাকা অবিকল বাবার মতো ছিলেন ব'লে খুব সহজেই কামনা মেটাতে পারলেন। যে মুহূর্তে মা আবিষ্কার করলেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, তাদের দু'জনের কারো সঙ্গেই তিনি সম্পর্ক রাখবেন না। তবে তারা যদি গোখরো সাপের বিচার মেনে নিতে রাজী হন, তবে দুজনের মধ্যে যিনি জীবিতাবস্থায় ফিরে আসবেন তিনি হবেন তারই।

বিচারটা হবে এইভাবে। আমার বাবা এবং কাকা দু'জনকেই বন্ধ ক'রে রাখা হবে ক'য়েখানার মতো একটা অন্ধকার ঘরে। আগে থেকেই সেখানে একটা গোখরো সাপ ছাড়া অবস্থায় থাকবে। সাপটা যাকে প্রথম ছোবল মারবে, তিনি চিৎকার ক'রে উঠবেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন সাপুড়ে এসে দরজা খুলে দেবে। তখনো যিনি বেঁচে আছেন, তাকে নিয়ে যাবে বাইরে।

অন্ধকার ঘরে দু'জনকে বন্দী করার আগে বাবা যুগল দাসীকে অনুরোধ জানালেন শুধু একবার মন্দিরের সেই পবিত্র নৃত্য দেখাতে। মা রাজী হলেন। মশালের আলোতে, সাপুড়ের

বাঁশির তালে তালে, মেপে মেপে পা ফেলে, সামনে পেছনে বাহুতে তালে হেলে, বাঁকাবাঁকা গতিতে নেচে চললেন ঠিক যেন গোখরো সাপেরই মতো। এর পরেই, যেখানে সাপ, সেই ঘরে আটকে রাখা হল আমার বাবা আর কাকাকে। কিন্তু বাইরের শ্রোতাদের কানে যা ভেসে এল তা ভয়ের চিৎকার নয়। একটা চাপা আর্তনাদ, আর তার সঙ্গে এক লোমহর্ষক অট্টহাসি। দরজা খোলা হল। বেরিয়ে এলেন কাকা। মুখ তার বিধ্বস্ত, জরাক্রান্ত চুল—।

মেঝের ওপর দিয়ে যখন গোখরো সাপটা এঁকেবেঁকে আসছিল সেই শব্দ, হিস হিস আওয়াজ শুনে, ঝিকঝিকে চোখ দেখে, ওটার গরল ভরা বিষদাঁত, কুৎসিৎ লম্বা শরীরের মাথায় চামচের মতো আকারের ছোট মাথাটার কথা ভেবে আতংকে কাকার চেহারা একেবারে পাল্টে গেছে। অন্ধকার ঘর থেকে যখন বাইরে এলেন তখন তিনি রীতিমতো বৃদ্ধ। তার মাথার সমস্ত চুল পেকে ধবধবে সাদা হ'য়ে গেছে।

আগেকার চুক্তি অনুযায়ী বুলস দাসী আমার কাকাকেই হ'লেন। কিন্তু জীবিত অবস্থায় যিনি বাইরে এসেছেন তিনি যে আমার কাকা তারও কোনো স্থিরতা ছিল না। "বিচারে" হাজির হওয়ার ফলে তার মানসিক ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে স্মৃতি-শক্তি। নবজাত শিশুটিকেও তিনি চিনতে পারছিলেন না। এই জন্যই সবাই ধ'রে নিয়েছিল তিনিই আমার কাকা। আমার ব্যক্তিগত ইতিহাসে এই অদ্ভুত ঘটনা, সেই লোমহর্ষক অট্টহাসি, আর গোখরো সাপের ভয়াবহ বিচারের যে স্থায়ী প্রভাব থাকবে, আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করবে, এতে আর বিচিত্র কি!

• • • •

ক্লাশের সবচেয়ে হাঁদা মেয়েটি শিক্ষক মহাশয়ের কাছে একেবারেই hopeless.

সে শুধু চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবে। দূরে সুইডেনের যে পর্বতশ্রেণী ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম দিকে, তারই দিকে চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে।

শিক্ষক মশায় বললেন—তোমার দ্বারা কিছু হবে না; —জগতের উন্নতিও করতে পারবে না তুমি।

কুড়ি বছর পরের কথা। শিক্ষক মশায় তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। মেয়ে হৈ হৈ পড়ে গেছে। আমেরিকা থেকে অনেক দিন পরে পৃথিবী বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী জন্ম ভূমি সুইডেনে ফিরে আসছেন।

শিক্ষক মশায় দেখতে গেলেন তাকে। অভিনেত্রী খবর পেয়ে শিক্ষকের কাছে বিনীত নমস্কার জানালেন। ও পরিচয় দিলেন। শিক্ষক মহাশয় এবার চিনতে পারলেন তাকে। সে এখন গ্রেটা গার্বো, —বিশ্ব বিজয়িনী।

বিশ্বের সেরা গল্প

আংটি

গুই ছামপুস

অনুবাদ : অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সেদিন একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন ক'রে ওর পরিচয় পেলাম।

এক ধনী প্রতিবেশীর গৃহে একটি সান্ধ্য-মজলিশের আসরে ওর সত্যিকার রূপটি আমার চোখের সামনে ধরা দিল।

ওর চোখে নতুন কাজলের রেখা। পেলব তনুলতায় নতুন পোষাকের বাহার। সেই পোষাক পরিধানের অভিনব ভঙ্গীটি ওকে যেন আজ আরও সুন্দর করে তুলেছে। ওর আনীল দুটি চোখে উজ্জ্বল অনুরাগ যেন আজ নিবিড়তর হয়ে ঘনিয়েছে। ওর শরীরের প্রতিটি ভঙ্গীতে উজ্জ্বল অন্তরের নবজাগ্রত প্রেম যেন উপচে পড়তে চাইছে।

আমার সতর্ক চক্ষুকে ও ফাঁকি দিতে পারল না। ও প্রেমে পড়েছে। নতুন করে নতুন মানুষের সঙ্গে।

কিন্তু কে সে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সন্দেহ দূর হল।

গৃহস্বামীর রূপবান পুত্র। তার জন্যেই ওর সারা অঙ্গ ঘিরে আজকের এই বিচিত্র চঞ্চলতা।

মনে মনে হাসলাম। আমার বিত্তহীন প্রেমের চেয়ে গৃহস্বামীর বিলাসী পুত্র আজ ওর কাছে বেশি কাম্য।

ভাল।

• • • •

বাড়ি ফেরবার পথে নিরালায় পেয়ে ওকে জিগেস করলাম :

"আজকের সন্ধ্যাটা কেমন লাগল, রানি?"

"চমৎকার। ভারী সুন্দর।"

তারপর অনেক কথা বললে।

ওর অসংলগ্ন কথায় নিবিড় আবেশ, কপোলে রক্তিম আভা, দুই চোখ স্বপ্নাতুর।

ওর উচ্ছ্বাসকে বাধা দিয়ে ডানহাতের আঙুল থেকে আমাদের বাগদানের আংটিটা খুলতে খুলতে বললাম :

"দেখ, যে আংটিটা তুমি আমায় দিয়েছিলে, সেটা আঙুলে বড্ড ছোট হয়ে গিয়েছে, আর পরা চলছে না, আঙুলে লাগছে। তুমি এটা নাও, যদি একটু বড় করে দিতে পারো· ···"

বাম হাতখানি বাড়িয়ে উৎসুক কণ্ঠে ও বললে :

"দাওতো, দাওতো, দেখবো'খন যদি·····"

আংটি ফিরিয়ে দিয়ে একটু হেসে ওকরানি জানিয়ে ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

• • • •

তারপর দেখা মাসখানেক পরে।

রাস্তায়। একেবারে মুখোমুখী।

আংটির কথাটা মনে এলো। কিন্তু চেপে গেলাম। থাক না এখন। সবে মাস খানেক হয়েছে বৈত নয়। ওকে নাহয় আরও কিছু সময় দিলাম।

কথাটা ও নিজে থেকেই পাড়লে :

"তোমার সেই আংটিটা···জান ··সেটা বড় অলক্ষুণে···হারিয়ে ফেলেছি ··"

ওর অসংলগ্ন বিস্তৃত কথার উত্তরে শুধু একটু হাসলাম। সংবাদটি অপ্রত্যাশিত নয়। তাই সহজভাবেই হাসতে পারলাম।

আমার পরিপূর্ণ স্থির দৃষ্টির সামনে মাথা নীচু করে ও বললে :

"তুমি বোধহয় আমার ওপর খুব রাগ করেছো···"

হেসে বললাম :

"না। রাগ কিসের। ও আংটিটা গেছে ভালই হয়েছে। তুমি সুখী হও, এই তো আমি চাই।"

"তুমি কি ভাল।"

মিষ্টি হাসল। তারপর এগিয়ে চলল।

মাথার উপর মেঘ ঘনাচ্ছিল। এইবার বৃষ্টি নামল।

• • • •

তারপর আবার দেখা হল।

অনেকদিন পরে।

সহসা একদিন এক মাঠের ধারে দেখা হল।

একমাস দুমাস নয়—পুরো এক বছর পরে।

দূর থেকে আমায় দেখতে পেয়ে হাত তুলে আমায় থামতে ইঙ্গিত করলে।

তারপর ওর ক্ষিপ্র চঞ্চল গতি একেবারে আমার বুকের কাছে এসে থামল।

"ওগো, শোন! খুব ভাল খবর। তোমার সেই আংটিটা খুঁজে পেয়েছি। হারিয়ে পাওয়া খুব ভাল শকুন! না? এই···এই দেখ সেই আংটি! এবার পর দেখি! আর আঙুলে ছোট হবে না।"

আশাহতা নারীর উন্মুখ মুখের দিকে তাকালাম। তার হাতের আংটিটার দিকেও। দুজনেই নির্বাক।

ক্ষণেক নীরব থেকে বললাম :

"না। ও আংটিটা এখনো অমঙ্গল লেগে রয়েছে। ও তো আমি নিতে পারি না। তাছাড়া ওটা এখন আমি আর পরতেই পারবো না। আমার আঙুলের পক্ষে ওটা এখন বড্ড বড় হয়ে গেছে। ও আংটি তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

মেয়ে মজলিশ

গৃহ-সজ্জা

সুরঞ্জনা সেন

"বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এককোণে
বাঁধিব আপন মনে
ধন নয়, মান নয়,
এতটুকু বাসা।"

এই বাসনা শুধু কবির নয়, অনেকেরই। কিন্তু, বাসা এতটুকু হোক তাতে ক্ষতি নেই, তা যেন হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। তার জন্য আবার গৃহ-সজ্জা সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

ঘর সাজাবার জন্য যে সব উপকরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে সব চেয়ে সস্তা, সুলভ, আর তাড়াতাড়ি ব্যবহারের উপযোগী জিনিস হল দেয়াল-কাগজ। রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগের বিশিষ্ট কবি ও চিত্র-শিল্পী উইলিয়াম মরিস দেয়াল-সজ্জার নানা মূল্যবান ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ঘরের ভেতরে কী ক'রে সরল সহজ সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়, এ বিষয়ে জাপানীদের কাছেও অনেক কিছু শেখবার আছে।

ঘরের দেয়ালে লাগাবার জন্য আধুনিক নানা ডিজাইনের কাগজ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। কাগজের নক্সা বা লতাপাতা ফুল ইত্যাদির রং যেন খুব বেশি উগ্র না হয়। চোখের পক্ষে রং যেন প্রীতিকর হয়। ঘরের সবগুলি দেয়ালে, সিলিংএ একই ডিজাইনের কাগজ ব্যবহার করা উচিত। অবশ্য, এই সব বিষয়ে ব্যক্তিগত রুচির দাম অনেকখানি ব'লে বাঁধা ধরা কোনো নির্দেশ দেয়া সঙ্গত নয়। দেয়াল-কাগজ ব্যবহারের একটা সুবিধা, প্রত্যেক বছর নতুন ডিজাইনের কাগজ ব্যবহার করা যায়। বাইরের পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন গাছপালা নতুন রঙে সেজে ওঠে ঘরের ভেতরেও তেমনি যেন আবহাওয়ার পরিবর্তন আনা চলে। যাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, এবং যারা একটু সৌখিন তারা ইচ্ছে করলে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ইত্যাদি ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘরের ভেতরটা পালটে দিতে পারেন। যাদের ছবি আঁকার হাত রয়েছে তাদের তো আরো সুবিধে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেয়াল-কাগজের ব্যাপক চাহিদা এবং ব্যবহার রয়েছে। ছাপা হচ্ছে নানা রকম সুন্দর সুন্দর আর আধুনিক ডিজাইনের কাগজ। আমাদের দেশে এর ব্যবহার যে একেবারে নেই তা নয়। নানা পূজা-পার্বণে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং উৎসবে দেয়াল-কাগজ দিয়ে

পুজা-মণ্ডপ, বাঁশের বা কাঠের খুটি, তোরণ ইত্যাদি সাজান হয়। কিন্তু শয্যা কক্ষ বা বাসগৃহ সাজাবার কাজে-দেয়াল কাগজের ব্যবহার এখনো নিতান্তই সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশের মেয়েদের এদিকে একটু নজর দেয়া দরকার। তাহলে তাদের ঘর যে কেবল স্নিগ্ধ, মনোরম হ'য়ে উঠবে তা নয়, দেয়াল-কাগজ তৈরির ছোট-ছোট অনেক কর্ম-ক্ষেত্র গ'ড়ে উঠবে। অনেকের আর্থিক সংস্থান হবে'

দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অনেকখানি নির্ভর করে ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের ওপর। পয়সা থাকলেই ঘর সুন্দর রাখা যায় না। এর জন্য দরকার রুচির।

ঘরের দেয়াল কাগজে মুড়ে দিলে যেমন সৌন্দর্য বেড়ে যায়, তেমনি সুন্দর পর্দা দরজা, জানালায় লাগালে বাড়ির চেহারাই যেন পালটে যায়। বাড়ির রং, গঠন ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্দার কাপড় কিনবেন। অনেক বাড়ির মেয়েরা নিজেরাই বেশ সুন্দর পর্দা তৈরি করতে পারেন। এতে কেবল যে খরচ কম পড়ে তা নয়, মনের তৃপ্তিও পাওয়া যায়।

গৃহ-সজ্জার আরেকটি উপকরণ ছবি। অনেকে বাজারের রুচিপূর্ণ ক্যালেণ্ডার বা ওই ধরণের ছবি যত্র তত্র দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখেন। মনে রাখবেন আপনাদের অনেকের বাড়িতেই ছোট ছেলে-মেয়ে আছে। ওই সব ছবির প্রতিক্রিয়া তাদের মন বিষময় হ'য়ে উঠতে পারে। ভালো ক্যালেণ্ডার দেয়ালে টাঙ্গানে দোষ নেই। তবে, একঘরে একটি বা দুটির বেশি ক্যালেণ্ডার না থাকাই ভালো। দেয়ালে ভালো ছবি টাঙ্গিয়ে রাখার মূল্য নিশ্চয়ই আছে। তবে ঘর বিশেষে ছবির রকম ফের থাকা দরকার। যেমন ঠাকুর ঘরে রাখবেন দেব-দেবীর কিংবা সাধু-সন্তদের ছবি। শোবার ঘরে নানা রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য, বা বড় বড় শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রতিলিপি। শহরে প্রাকৃতিক পরিবেশের অভাব। তাই দেয়ালে প্রাকৃতিক দৃশ্য থাকলে ইট-কাঠ পাথর দেখে দেখে ক্লান্ত চোখ একটু বিশ্রাম পায়। এ ছাড়া দেয়ালে রাখতে পারেন মনীষিদের বাণী। শিশু, বয়স্ক, নারী, পুরুষ সকলেরই চরিত্র গঠনে, হতাশ মুহূর্তে মনকে চাঙ্গা ক'রে তুলতে, আশার আলো দেখাতে এদের জুড়ি নেই। মাঝে মাঝে বাণীগুলি পাল্টে দিতে পারেন।

যদি সম্ভব হয় ঘরে একগুচ্ছ ফুল রাখবেন। যাঁদের বাড়িতে স্থান-সমস্যা, তাঁরাও টবে ফুলের চর্চা করতে পারেন। ফুলের জীবন্ত সাহচর্য গৃহের সৌন্দর্যের অনেকখানি সহায়ক। প্রকৃতির সঙ্গে মনের সমাবেশের সুযোগ দেয়।

গৃহ-সজ্জার আরেকটি প্রয়োজনীয় দিক আসবাবপত্রের বিন্যাস। আলমারী, খাট, টেবিল, চেয়ার, আলনা ইত্যাদি সাজিয়ে গুছিয়ে যার যার জায়গায় রাখবেন। ঘরে যেখানে সেখানে জিনিস-পত্র ফেলে না রেখে ঠিক ঠিক জায়গায় রাখা উচিত। সাজানো ঘর ছন্দোবদ্ধ কবিতার মতো। প্রসাধনের টেবিল একটু আড়ালে থাকাই ভালো। ঘরে বই রাখার জন্য যেমন বুকসেল্ফ থাকবে, তেমনি চায়ের সাজ-সরঞ্জাম রাখার জন্য একটা ছোট শেলফের ব্যবস্থা থাকবে। অতিথিদের জন্য মোটা ক'য়েক সুন্দর কাপ ডিস রেখে দিলে ভালো হয়। আর, ঘরের সামনে থাকবে একখানা পাপোষ।

মনে রাখবেন ঘর আপনার মনের, রুচির প্রতিফলন। ঘর আপনার নিজস্ব পৃথিবী। তাই নিজে সুন্দর হতে গেলে, তাকেও সুন্দর ক'রে তুলতে হবে।

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় তরবাল

চীন সম্পর্কে একটি স্মরণীয় বই

চীনা জঙ্গীনেতারা আজ কুটিল পথের যাত্রী। তারা ভারতের প্রতি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী। যে ভারতবর্ষ চিরকাল চীনদেশের অধিবাসীদের আশা আকাঙ্ক্ষা দুঃখ দৈন্যের সঙ্গে একাত্মভাবে অংশভাগী হয়েছে, বহু শতাব্দী ধরে যে ভারতের সঙ্গে চীন মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল, বিনা কারণে সেই ভারতের প্রতি হিংস্র ভাবাপন্ন হয়ে চীনের জঙ্গীনায়কবৃন্দ সেই যুগযুগান্তের পবিত্র মৈত্রীবন্ধনকে ছিন্ন করেছে। আজ মনে পড়ছে, এক শতাব্দী আগের কথা। যখন চীন ছিল নিতান্তই দুর্বল, আত্মরক্ষায় একান্ত অক্ষম। সেই সময় নবজাগরণের অরুণালোক ভারতের পূর্বাচলে। সেই সময় চীন মহাদেশের নাগরিকদের প্রতি ভারতবর্ষের নাগরিক তার শুভেচ্ছা জানিয়েছে, তার বেদনার কথা বিশ্ববাসীর কাছে প্রচার করেছে। শুধু ভারতে নয়, খাস ইংলণ্ডেই এমন এক মহৎপ্রাণ ইংরাজ ছিলেন যিনি চীনাদের প্রতি ইংরাজদের বর্বরোচিত আক্রমণ, শোষণ ও অত্যাচার তাঁর লেখনীমুখে প্রকাশ করেছিলেন। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। এক ইংরাজ লিখছে ইংরাজী সভ্যতার বিরুদ্ধে। সেই লেখার কথাই আজ স্মরণ করছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিলাত থেকে একটি ইংরাজী বই বেরোয়—নাম, 'লেটার্স অফ জন চায়নাম্যান'।

চীনদেশে হামলাদার অর্থলোভী এবং রাজ্যলিপ্সু ইংরাজ বণিক এবং রাজপুরুষদের সম্বন্ধে যে সব কথা সেই গ্রন্থে বলা হয়েছিল তা সেই সময় চারিদিকে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। বই খানিতে লেখকের নাম ছিল না।

আমাদের দেশেও বইখানি কম উত্তেজনা এবং আলোড়নের সৃষ্টি করেনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই বই নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করে মজুমদার লাইব্রেরীর আলোচনা সভায় সেই প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

কিন্তু তার লেখক যে কে তা তখনো জানা যায়নি। তা না জানা যাক গ্রন্থের বক্তব্য এবং বিশেষ করে তার মধ্যে যে ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারিত হোয়েছিল, তা সেই সময়কার পাঠকদের মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। লেখকের সেই ভবিষ্যৎবাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে দেখে তাঁর গভীর চিন্তাশক্তি এবং অভ্রান্ত দূরদৃষ্টির প্রমাণ পেয়ে বিস্মিত হোতে হয়।

১৩১৯ সালের কার্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজ'

নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, তার মধ্যে আমরা 'জন চায়নাম্যানের চিঠির' লেখকের পরিচয় জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"কেমব্রিজের কলেজ ভবনে একজন অধ্যাপকের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আমি দিন দুয়েক বাস করিয়াছিলাম। ইঁহার নাম লোয়েস ডিকিন্সন। ইনিই জন চায়নাম্যানের পত্র বইখানির লেখক। সেই বইখানি যখন প্রথম বাহির হয় তখন আমাদের দেশে প্রাচ্য দেশাভিমানের একটা প্রবল হাওয়া দিয়াছিল। সমস্ত ইউরোপের চিত্ত যেমন একই সভ্যতাসূত্রের চারিদিকে দানা বাঁধিয়াছে, তেমনি করিয়া একদিন সমস্ত এশিয়া এক সভ্যতার বৃন্তের উপর একটি শতদল-পদ্ম হইয়া বিশ্ববিধাতার চরণতলে নৈবেদ্যরূপে ফুটিয়া উঠিবে, এই কল্পনা ও কামনা আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেছিল।

সেই সময় এই বইখানি অবলম্বন করিয়া আমি এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পাঠ করিয়াছিলাম। তখন জানিতাম, সে বইখানি সত্যই চীনাম্যানের লেখা। যিনি লেখক, তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি চীনাম্যান নহেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ভাবুক, অতএব তিনি সকল দেশের মানুষ।"

সাম্রাজ্যবাদী পররাজ্যলোলুপ ইংরেজদের আচার আচরণের বিরুদ্ধে একজন ইংরেজেরই লেখা এই বিস্ময়কর বইখানির কিয়দংশের মর্মানুবাদ উদ্ধৃত করেদিলাম। তার ভিতর থেকে আজকের পাঠক এক মহামতি ইংরাজের ভাবুকতা এবং দূর-দৃষ্টির পরিচয় পাবেন।

পাশ্চাত্য জাতিদের সম্বোধন করে এই পত্রগুলি লেখা। চীনদেশ আক্রমণ ক'রে পাশ্চাত্য-দেশের সৈন্যরা যখন নানাভাবে তাকে শোষণ এবং অর্থদণ্ডিত করেছিল এবং জগতের কাছে চীনাদের অসভ্য এবং বর্বর ঘোষণা করেছিল সেইসময় এক ভদ্রলোক তাঁর প্রথম পত্রে লিখলেন—"তোমরা আমাদের (চীনাদের) অসভ্য এবং বর্বর বলে রটনা করছ। কিন্তু আমাদের বর্বর মনে করবার অধিকার তোমাদের আছে কিনা তা দেখতে হলে প্রথমে তোমরাই বা কেমন, আর আমরাই বা কেমন তা বিচার করা দরকার। আমাদের কথাই আগে বলি। অতিসুদূর প্রাচ্যদেশে সূর্যালোক প্লাবিত প্রশস্ত নদীকূলে আমার জন্মভবন। এমন সূর্যের আলো তোমরা কখনো দেখনি। তোমাদের যাও বা আছে তা তোমরা ছাই আর ধোঁয়ায় কলুষিত করে ফেল। আমাদের ঘরগুলি এক একটি বাগানের মধ্যে সাজানো, সাদাসিধে, আড়ম্বর বর্জিত, প্রিয়দর্শন এবং পরিচ্ছন্ন। নদীর উভয় পারে সেই ঘরগুলির লাল বা নীল খোলার চাল বৃক্ষশ্রেণীর শ্যামল সমুদ্রের মধ্যে থেকে যেন মাথা তুলে রয়েছে। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। এখানে ওখানে বড় বড় গাছের ফোপর মাথার উপর কোন উঁচু দেবমন্দিরের সুবর্ণখচিত কারুকার্য ঝিকমিক করছে। চারিদিকে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং স্বাধীন প্রকৃতির অপরূপ লীলা। পাহাড়ের মাথায় নানা নাম না জানা রঙীন ফুলের বাহার। সেই পাহাড়ের উপরকার নিস্তব্ধতা এমনি প্রগাঢ় যে, যেন মনে হয় নীচেকার গাছগুলির মর্মরধ্বনি কান ভ'রে শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নিম্নভূমি থেকে চাষীদের এপার ওপার ডাকাডাকির শব্দ অথবা সকাল সন্ধ্যায় উপত্যকার দেবমন্দিরের পূজায় আহ্বানের ঘণ্টাধ্বনি সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। সে কি অপার্থিব নিস্তব্ধতা! কি ধ্বনি! কি গন্ধ! কি বর্ণচ্ছটা। এখানে সমস্ত ইন্দ্রিয় এই সকল রসে সিক্ত হয়, এবং ক্রমে কত যে সরস হয়ে ওঠে তা তোমাদের হিমপ্রধান দেশে তোমরা কল্পনাই করতে পারনা। সৌন্দর্যের এই অবারিত প্রকাশ আমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে আমাদের যুগে যুগে উদ্বুদ্ধ করেছে। সুতরাং আমাদের চীনদেশে যদি ধর্ম থাকে, শ্রী থাকে, ললিত কলাকৌশল থাকে, তবে তার দেখবার

চোখ আছে সে তার কারণ সহজেই বুঝতে পারবে। আমাদের সমাজে অশোভন পাশবন্ধনের কোন স্থান নেই। এখানে পরস্পরের সঙ্গে প্রভু ভৃত্য সম্পর্ক নয়। সত্যিকার সাম্য আমাদের আচার ব্যবহারে নিহিত থেকে আমাদের নিয়ন্ত্রিত করছে। হে সভ্যতাদাবেদ্ধুবৃন্দ! এদের পরিবর্তে তোমরা আমাদের কি দিতে পার? তোমাদের ধর্ম? হায়! সেইধর্মের নামে কি না অকথ্য দুষ্কার্য তোমরা করছ। তোমাদের নীতি? তা তো আমরা খুঁজে পাইনা। তোমাদের বুদ্ধি? সে বুদ্ধি তোমাদের কী দশা করেছে। তোমরা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু সংস্কৃত নও। তোমরা শিক্ষাপ্রাপ্ত, কিন্তু শিক্ষিত নও। তোমরা গ্রহণ করতে পার কিন্তু চিন্তা করতে অক্ষম। যে ধর্মের বুলি তোমরা শিখেছো, সে ধর্মে তোমাদের বিশ্বাস নেই।"

পরবর্তী পত্রে জন চায়নাম্যান চীনদেশে ইংরাজ ও ফরাসী বণিক এবং লুঠেরাদের চোরা-কারবার এবং অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করে তাঁর অঘোষ ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করেছেন—"তোমাদের বণিকরা যখন আমাদের দেশে প্রথম আসে তখন তারা কিন্তু আমাদের আমন্ত্রণে আসেনি। তথাপি আমরা তাদের অভ্যর্থনা করেছিলাম, খুব উৎসাহ করে না হোক, অন্ততঃ প্রসন্নভাবে। যতক্ষণ তারা আমাদের নিয়মরক্ষা করেছিল আমরাও ততক্ষণ তাদের কারবার মঞ্জুর করেছিলাম, কিন্তু এই কারবারে যে তারা আমাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা গলাবে না। প্রথম প্রথম তোমরা এই সর্তে রাজী হলে এবং অনেক বছর মাঝে মাঝে খিটিমিটি বাধলেও, কোন বড় রকমের গোলযোগ ঘটেনি। যে বিষয়ে গোলমালটা আরম্ভ হল সে বিষয়ে তোমরা নিজেদের আচরণ সম্বন্ধে আজও পর্যন্ত কোন কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওনি। তোমাদের কারবারের প্রধান জিনিষ ছিল আফিম। আমরা দেখলাম, এই নেশায় আমাদের দেশের লোকের শরীর উচ্ছন্নে যাচ্ছে। সুতরাং এ-ব্যবসা নিষেধ করলাম। কিন্তু তোমাদের বণিকরা আইন লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করল, লুকিয়ে চোরাই আফিম আমদানী করতে লাগল। অবশেষে বাধ্য হয়ে আমরা আইন জারি করে নিষিদ্ধ মাল আটক ও নষ্ট করলাম। আর যায় কোথায়! ছুতো করে তোমরা যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, আমাদের রাজ্য আক্রমণ করলে, খেসারত আদায় করলে এবং হংকং দ্বীপ দখল করে নিলে। এ কি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের পক্ষে শুভ সূচনা? এতে কি ইংরাজদের ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে আমাদের উচু ধারণা হবার কথা? আরও কয়েক বছর পরে হল ছুতো করে আবার তোমরা গণ্ডগোল আরম্ভ করলে এবং নতুন নতুন দাবী করতে থাকলে। ফরাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তোমরা আমাদের রাজধানী অধিকার করলে এবং আমাদের নিকট এমন সব অপমানজনক প্রস্তাব করলে যা নিশ্চয়ই তোমরা কোন য়ুরোপীয় জাতির কাছে করতে সাহস পেতেনা। আমরা অগত্যা সম্মত হলাম। তখন আমরা দুর্বল ছিলাম, যুদ্ধপ্রধান জাতির মধ্যে গণ্য হবার যোগ্যতা আমাদের ছিলনা। কিন্তু তাই বলে কি আমাদের ন্যায়-অন্যায়বোধে আঘাত লাগেনি? পরে যখন য়ুরোপের প্রত্যেক জাতি কোন না কোন ছুতো ধরে আমাদের রাজ্যের এক এক অংশ দখল ও অধিকার করে রাখলে তখন তোমরা কি মনে করলে যে, আমরা সহ্য করলাম বলে অপমানটা আমাদের মর্মে আঘাত করলনা? তোমরা বল যে, আমাদের মত প্রজারা নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল। হায়! উৎপীড়নে অধীর হোয়ে তা হয়ত তারা করেছিল, কিন্তু তোমাদের সৈন্যরা?—তোমাদের যে সৈন্যরা খৃষ্টধর্মাভিমানী জাতির অন্তর্গত, তারা? তারা যা করেছিল, ইতিহাসে তার তুলনা মিলবেনা। পিকিং থেকে সমুদ্র পর্যন্ত যে জমি একদিন উর্বর ছিল তাকে জিজ্ঞাসা কর। যে নিরীহ

নির্দোষীরা কয়েকজনের অপরাধের জন্য হাজারে হাজারে তোমাদের হাতে মরেছে তাদের জিজ্ঞাসা কর। যে পুরুষরা তোমাদের হাতে খুন হয়েছে, যে সব নারী ও শিশু অকথ্য অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়েছে তাদের জিজ্ঞাসা কর। সর্বোপরি জিজ্ঞাসা কর সেই খৃষ্টকে যিনি মানুষকে ভালবাসতেন, যাঁকে তোমরা মান্য করবার ভান করে থাকো—তাঁকে বিচার করতে বল, অপরাধ কার—আমাদের?—যারা অবিরত অত্যাচারে অসহিষ্ণু হোয়ে স্বদেশ রক্ষায় নিযুক্ত হয়েছিল, তাদের? না, তোমাদের? যারা প্রতিরোধের উত্তরে নিষ্ঠুর অত্যাচার করবার সময় একবারও ভেবে দেখল না যে সমস্ত কাণ্ডটা তোমাদেরই পাপের ফল! হায় রে হায়! এই খৃষ্টধর্মাবলম্বী জাতিরা আমাদের শেখাতে এসেছেন যে, ধর্মের কোন অর্থ নেই যদি তার পিছনে বল না থাকে। ভয় নেই, সে শিক্ষা আমরা অবহেলা করব না। যেদিন সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে, সে দিন য়ুরোপের পক্ষে দুর্দিন! তোমরা চীন জাতির চল্লিশ কোটি মানুষকে অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত হবার জন্যে খুঁচিয়ে তুলছো। তোমরা চীনদেশে আসবার আগে যে নির্বিবাদী শান্তিপ্রিয় চীনারা পরস্পরের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে এবং সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে শান্তিতে থাকা ছাড়া অন্য কোন আকাঙ্খা করতনা, তোমাদের অত্যাচারে তারা আজ জেগে উঠেছে। খৃষ্টের নামে তোমরা রণভেরী বাজিয়েছো—কনফুসিয়াসের নামে আমরা তা প্রতিধ্বনিত করব!!"

সুদূর অতীতে এক মনস্বী ইংরাজ যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন আজ তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়ে সারা বিশ্বকে সন্ত্রস্ত করেছে!

• • • •

তখন সপ্তদশ শতাব্দীর বামকরা চিত্রকরদের ছবি দেখতে লোকে ছুটে আসত ফ্লোরেন্সে। ওখানকার ছবি আঁকার নৈপুণ্য "ফ্লোরেন্টাইন্ আর্ট" হিসাবে এখনও জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে।

কিশোর বালক মিশেলএঞ্জেলো ছবি আঁকা শিখতে এলেন ফ্লোরেন্সে।

এই বিদেশী ছেলেটিকে প্রথমে আমল দিতে চাইলেন না শিল্পীর দল।

গুরু বললেন—"আমার আঁকা ছবি প্রথমে অনুকরণ করে রং তুলি চালাও, অবশ্য, অনেক দিন লাগবে এতে, কিন্তু বারংবার ব্যর্থ হলেও, চেষ্টা করে এগিয়ে চল।

গুরুর আঁকা ছবি দেখে দেখে মিশেলএঞ্জেলো সেই ছবি নকল করতে লেগে গেলেন।

কয়েকদিন পরে চিত্রাগারে এলে গুরুর ও চক্ষুস্থির। শিষ্যের নকল করা ছবির কাছে গুরুর ছবি যেন ম্লান হয়ে গেল।

গুরু এবার শিষ্যকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন,—"বৎস, তোমার কাছেই আমাকে ছবি আঁকা শিখতে হবে এবার।"

বিচিত্রা

বলতে পারেন কেন আজ সংসারে দিদিমাদের অত কদর ?

শুধু বেশবাস প্রসাধনে নয়, পশ্চিম জার্মানীর মহিলারা কর্মজগতেও অধিক অংশ গ্রহণ করছেন কিন্তু তার ফলে সংসারে অসুবিধাও দেখা দিয়েছে। মহিলারা যারা অফিসে বা কলকারখানায় কাজ করেন, তাদের শতকরা ৩৮ ভাগ পুরো সময়ের চাকুরেরা বিবাহিত ও সন্তানসম্ভবীর জননী এবং সেকারণে চোদ্দবছরের বিপলক্ষ জার্মান ছেলেমেয়েদের তাদের মায়েদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় সাধারণত সন্ধ্যায় নয়তো সপ্তাহান্তিক ছুটির দিন দুটিতে। অন্য দিনে তারা হয় থাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ নয় আত্মীয় স্বজনের দেখাশুনোতে।

এই কাজের জন্যে দিদিমাদের আজকাল সংসারে খুব কদর। প্রায় ছয়লক্ষ ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ দেখাশোনা করেন দিদিমারা। বাড়িনাতনীদের ভার দায়িত্ব দিদিমাদের হাতে সঁপে দিয়ে মায়েরা বেশ নিশ্চিন্তে কাজে বেরিয়ে যান।

অনেক বৃদ্ধা আছেন, তাঁরা এই কাজে বেশ আনন্দ ও তৃপ্তি পান, কেননা বৃদ্ধ বয়সে একলা দিন কাটানো কিম্বা কোন বার্ধক্যাশ্রমে গিয়ে থাকা তাঁদের কাছে অত্যন্ত ভয়াবহ। দেখা গেছে, অবসর গ্রহণের পর বৃদ্ধদের যদি সংসারে কোন কাজকর্ম না থাকে ও তারা একলা পড়ে যায়, তা হলে তারা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে করে ও তাদের দেহ মন তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়।

বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীর মোট জনসংখ্যার দশভাগের বেশি অর্থাৎ পঁয়ষট্টি লক্ষ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের বয়স পঁয়ষট্টি বছরের ওপরে। পশ্চিম জার্মানীর কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাবে ১৯৭০ সনের মধ্যে এই সংখ্যা পৌঁছাবে আশি লক্ষের কাছে কিন্তু পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এদের অনেকেই অকর্মণ্য হয়না। এরা সমাজের সমস্যা। সমাজে এদের স্থান কোথায়, কিভাবে এদের সমাজের উপকারে লাগানো যায়, এই প্রশ্ন নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী স্তরে বহু আলাপ আলোচনা হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

এই হার্টের ব্যাধির যুগে অচল হার্টকে সচল করার উপায়

গত কয়েক বছরে হার্টফেলজনিত মৃত্যুর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি হয় হঠাৎ ও আকস্মিক এবং যুবা, বৃদ্ধ সকলের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। যেহেতু হার্টফেল করলে এক মিনিটের মধ্যেই মানুষের জীবনাবসান ঘটে, সেহেতু এই জরুরী অবস্থায় কি করা উচিত, তা প্রত্যেকের জানা দরকার। এই অবস্থায় শুধু যে অস্ত্রোপচার করলেই জীবন বাঁচে তা নয়, বাইরে থেকে হার্টের উপর মালিশ করলেও বহুক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়।

হার্টের স্পন্দন থেমে যাওয়া ও চোখের তারা হঠাৎ বিস্ফারিত হওয়া হার্টফেলের নির্ঘাৎ লক্ষণ। এই অবস্থায় একমুহূর্ত সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া ও হার্টের ম্যাসেজ বা মালিশ-জানা দুজন লোক সঙ্গে সঙ্গে দরকার। অত্যন্ত জরুরী ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অক্সিজেন দেবার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত, আক্রান্ত ব্যক্তির মুখে মুখ ঠেকিয়ে বাতাস সরবরাহ করা চাই। সঙ্গে সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট ছন্দে রুগীর বুকে চাপ দিতে হয়। বক্ষাস্থির নিম্নাংশে দু'হাত রেখে হার্টের দিকে মিনিটে ৬০ থেকে ৮০ বার চেপে চেপে হাত চালাতে হয়। দেখা গেছে এই সহজ পদ্ধতিতে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের চাপ যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য রক্ত-চলাচল ঠিক থাকে।

বক্ষাস্থিতে চাপ দিলে হার্ট খালি হয়ে যায় অর্থাৎ হার্টে রক্ত থাকে না। এরপর আবার হার্টে রক্ত প্রবেশ করে। এই পদ্ধতি বার পাঁচেক করার পর রুগীকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিতে হয়। দুটির পরিবর্তে একজন লোকও যদি এই দুটি প্রক্রিয়া একত্রে করতে পারে, তাহলে হার্ট পুনরায় চলতে পারে। এভাবে হার্টের স্পন্দন ফিরে এলে ম্যাসাজ বা মালিশ চালিয়ে যেতে হয়।

বুকে অস্ত্রোপচার ক'রে সরাসরি হার্টে মালিশ করলেও সুফল পাওয়া যায় তবে এর তিনটি কুফল আছে, যথা—অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করতে বেশ কিছুক্ষণ মূল্যবান সময় কেটে যায়, সংক্রমণের বিপদ দেখা দেয় ও যথেষ্ট সতর্কতাবে হার্টে যদি মালিশ না করা হয় তবে হার্টের সূক্ষ্ম তন্তুগুলির সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

গত চারবছরে বাইরে থেকে হার্ট মালিশ করার পদ্ধতিতে চিকিৎসকরা যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন ও তাদের নির্দেশ হচ্ছে যে সাধারণ মানুষেরও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার কৌশল শিখে রাখা উচিত।

আপনার কি মনের ব্যাধি ?

ভয় নেই সেরে যাবে !

চিকিৎসকদের মতে আজকের রুগীদের মধ্যে শতকরা অন্তত দশ থেকে পঞ্চাশজন মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত যা ঔষধে বা ইঞ্জেকশনে সারেনা। মানসিক ব্যাধির নানা কারণ থাকতে পারে, যথা—বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা, ভয়, অনিদ্রা, হাঁপানি, হার্ট ও রক্ত-চলাচলে গোলমাল, স্নায়ুরোগ ও অন্যান্য মনোগত বিকার জনিত ব্যাধি।

মনোব্যাধির চিকিৎসার জন্য পশ্চিম জার্মানীর ষ্টুটগার্টে যে হাসপাতালটি তৈরী হচ্ছে, সেরকম হাসপাতাল শুধু পশ্চিম জার্মানীতে কেন সারা য়ুরোপেও নেই। সম্পূর্ণ হাসপাতালটি তৈরী করতে খরচ পড়বে সাড়ে চার মিলিয়ন মার্ক ও সময় লাগবে দু'বছর! ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এগারোজন বিশেষজ্ঞ এই হাসপাতালে কাজ করতে রাজি হয়েছেন। আজ পর্যন্ত মনোব্যাধি চিকিৎসার যতরকম পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা সবই এখানে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হবে। ব্যক্তিগত চিকিৎসা ব্যতীরেকও এখানে দেশগত চিকিৎসা করা হবে। কিন্তু চিকিৎসাপদ্ধতির মধ্যে থাকবে কাজ ও খাদ-

প্রশ্বাস চিকিৎসা, সম্মোহন, আত্মসচেতনতা, সঙ্গীত-চিকিৎসা ও ছন্দ-চিকিৎসা। এই হাসপাতালে সর্বতন্ধ একশত রুগীকে ছয় থেকে আট সপ্তাহ চিকিৎসা করা যাবে। হাসপাতালের ব্যবস্থামত প্রত্যেক রুগীকে স্বতন্ত্র কক্ষে রাখা হবে যাতে রুগী সহজে নিজেকে পুনরায় ফিরে পেতে পারে।

এই হাসপাতালে সংযুক্ত একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ থাকবে। পশ্চিম য়ুরোপ ও উত্তর আমেরিকার মানসিক ব্যাধির প্রচণ্ড বৃদ্ধি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সামনে বর্তমানে যে নতুন সমস্যা উপস্থিত করেছে, তার সন্তোষজনক সমাধান আজও হয়নি। এখন দেশে দেশে মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের মনোব্যাধির হাসপাতালে সাধারণত যে চিকিৎসা হয়, তাতে মনের রোগ ও দেহ ও স্নায়ুসত্ত চিকিৎসার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়ে থাকে। এই হাসপাতালটি তৈরী হলে, এটি হবে মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের বিশ্রাম ও শান্তির স্বর্গ। এখানে তারা পাবে পুনর্বাসন ও সমাজে পুনঃগৃহীত হবার আশ্বাস। আত্মহত্যার চেষ্টা না থাকলে মানসিক ব্যাধি মারাত্মক নয়, কিন্তু দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা অবশ্যই গুরুতর রোগের সৃষ্টি করে। ষ্টুটগার্টের হাসপাতালে চিকিৎসকরা শুধুই মানসিক ব্যাধি সারিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন তা নয়, ব্যাধির কারণ অনুসন্ধান করবেন ও সম্ভব হলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার ক্ষেত্রে ষ্টুটগার্ট এক নতুন সন্ধান দেবে।

যাদুঘরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডিম

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ ডুইসেলডর্ফ শহরের সোয়েবেকে যাদুঘরে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ডিম সংরক্ষিত আছে। অবশ্য আসল দশইঞ্চি উঁচু বিরাটাকার ডিমটির পরিবর্তে জনসাধারণের দৃষ্টি গোচরে রাখা হয়েছে ঐ ডিমের একটি অবিকল নকল যাতে এই বিরাটাকার বিরল ডিমের কোনরূপ ক্ষতি না হয়। এতাবৎ লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক পাখীদের প্রসবিত ডিম একমাত্র মাদাগাস্কার দ্বীপে পাওয়া যেত। স্বভাবতই এই বস্তুগুলি অত্যন্ত দুর্লভ ও সেহেতু খুবই মূল্যবান। দৈবাৎ বেলিনের এক সংগ্রহকারী এই ডিমটি কেনেন। প্রথমে মনে হয়েছিল ডিমটি জাল এবং ফেলে দেবার উপক্রম হয়েছিল। পরে যখন দেখা গেল ডিমটি আসলে একটি প্রাগৈতিহাসিক ডিম, তখন ঐ ভদ্রলোক ডিমটিকে বিজ্ঞানীদের হস্তে অর্পন করেন। এই ডিমের মধ্যে যে পদার্থ আছে তার ওজন ১৪ পাইট অর্থাৎ সাতটি উটপাখী অথবা ১৮৩টি মুরগীর ডিমের সমান। যাদুঘরে ঐ বিরাট ডিমের পাশেই "হামিং বার্ডের" একটি ডিম রাখার প্রাগৈতিহাসিক পাখীটির ডিমের বিরাটত্ব দেখলে অবাক হতে হয়।

আজ সিনেমায় ক্যাসানের হিড়িক

পোশাক পরিচ্ছদের বিজ্ঞাপনে আজকাল নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। মহিলাদের সান্ধ্য পরিচ্ছদের নবতম সংস্করণ দেখাবার উদ্দেশ্যে বেলিনের পোষাক ব্যবসায়ীরা শহরের গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী ব্যক্তিদের এক শৌখীন সিনেমায় একটি নাতিদীর্ঘ ছবি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ছবিটির শেষ দৃশ্যের সময় হঠাৎ দর্শকরা দেখলেন প্রেক্ষাগৃহের উজ্জ্বল ঝাড়বাতির নিচে অপরূপ সুন্দর বিচিত্র অলাবরণগুলি যেন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ, বিস্মিত দর্শকদের করতালি যেন আর শেষ হয়না। এভাবে দর্শকদের হৃদয় মন জয় করার একদিকে যেমন ব্যবসায়ীদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়, তেমনি অন্যদিকে বেলিনের তৈরী শৌখীন পোশাকের জয় সূচিত করে।

এই প্রগতির যুগে রন্ধনেও বিপ্লব

হিমায়িত খাদ্য সম্বন্ধে একজন জার্মান বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, আজ থেকে পাঁচবছর পরে পশ্চিম জার্মানীতে মাত্র দুরকম রেষ্টুরাণ্ট থাকবে, এক খুব দামী রেষ্টুরাণ্ট ও আরেক সূক্ষ্ম-রশ্মিতে রাঁধা খাবারদাবারের সস্তা রেষ্টুরাণ্ট। সূক্ষ্ম-রশ্মি বা "মাইক্রো-রে" এখনো রহস্যে আবৃত থাকলেও খুব শীঘ্রই এটি গৃহস্থের রন্ধনশালায় প্রবেশ ক'রে বিপ্লবের সৃষ্টি করবে। এই সূক্ষ্ম-রশ্মি হিমাঙ্কের নিচে জমা খাদ্য থেকে যাবতীয় খাদ্য কয়েক মিনিটের মধ্যে উত্তপ্ত করতে সমর্থ।

"মাইক্রো"-রে বা সূক্ষ্ম-রশ্মির সুবিধা এই যে, বড় ছোট রেষ্টুরাণ্ট বা গৃহে এটির ব্যবহার শুরু হলে সময় বাঁচবে ও বেশি কর্মচারী রাখতে হবেনা। তাছাড়া মাইক্রো-রে দিয়ে রাঁধলে খাদ্যের কোন ভিটামিন নষ্ট হবেনা।

মাইক্রো-রে ও ইনফ্রা-রেড-রে এই দুটির মধ্যে তফাৎ এই যে, মাইক্রো-রে যে খাদ্য গরম করা হবে তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রয়োজনীয় উত্তাপ সৃষ্টি করে কিন্তু ইনফ্রা-রে খাদ্যের উপরিভাগ উত্তপ্ত করে। মাইক্রো-রে গবেষণার ক্ষেত্রে জার্মান মাইক্রো-রে সোসাইটির কারিগর ও বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি ম্যাগনেট্রন উদ্ভাবন করেছেন। এরই মডেল অনুসারে ক্যান্টিন ও রেষ্টুরাণ্টগুলির জন্যে এই সোসাইটি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একটি বিশেষ কিসটার দেওয়া উনুন বাজারে ছাড়বেন। এই মাইক্রো-রে উনুনে মোট বারোটি ম্যাগনেট্রন থাকবে ও তাদিয়ে একঘণ্টায় ২৫০ থালা হিমায়িত খাদ্য তপ্ত করা যাবে।

এই মাইক্রো-রে উনুন সাধারণত বেশ বড় ধরণের। তাই এই উনুন বাড়ি বাড়ি ব্যবহার করার যোগ্য নয়। তবে বাড়ির রান্নাঘরের জন্যেও খুব শীঘ্র মাইক্রো-রে ষ্টোভ তৈরী করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

মেট্রিক পদ্ধতিই একমাত্র আইনসঙ্গত পদ্ধতি

সব সময়েই

কিলোগ্রামে মিটারে লিটারে

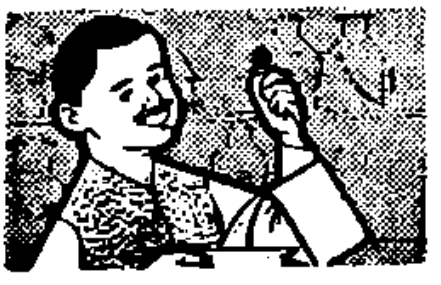

কিনুন

Om/64/676 (Bengali)

সেকালের পেরুদেশের উৎসব

নীলিমা দে

একদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, অন্যদিকে পাহাড়ের সারি। মাঝখানে ছোট একটি দেশ পেরু। ঐশ্বর্যের জন্য খ্যাত। আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মণি-মুক্তার লোভী স্পেনীয়দের চোখে। তারা এসে লুট ক'রে নিল যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত ওই দেশের স্বর্ণ-ভাণ্ডার,—আঘাত হানল একটি প্রাচীন সুসভ্য জাতির জীবন-যাত্রায়।

কিন্তু য়ুরোপীয় দস্যুদের বর্বর অভিযানের আগে পর্যন্ত ইনকাদের জীবনে ছিল সমৃদ্ধি আর শান্তি। তখন প্রতিমাসেই লেগে থাকত কোনো না কোনো উৎসব। ইনকাদের প্রধান দেবতা ছিল সূর্য। তাই অয়নান্ত আর বিষুবকাল উৎসব রূপে উদযাপিত হত। ইনকাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব ছিল রেমী। উত্তর—অয়নান্ত বা কর্কটক্রান্তির সময় মহা সমারোহে ইনকারা উৎসব পালন করত। দেশের নানা অঞ্চল থেকে সামন্তগণ হাজির হতেন রাজধানীতে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

উৎসবের আগেকার তিনদিন সকলে উপবাসী থাকত। ওই ক'দিন গৃহস্থের বাড়িতে আগুন জ্বলত না। উৎসবের দিন ভোরে রাজা পাত্রমিত্র এবং রাজধানীর সমস্ত অধিবাসীদের নিয়ে মস্ত এক ময়দানে হাজির হয়ে উদীয়মান সূর্যকে অভিনন্দন জানাতেন। ওই দিন সবাই সাধ্যমতো ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরত। দামী অলংকার আর মণি-মুক্তা কে কত বেশি পরতে পারে তার একটা প্রতিযোগিতা যেন হত সামন্তদের মধ্যে। তাদের মাথায় শোভা পেত রং-বেরঙের পাখির পালক। অসংখ্য সেই রঙিন উষ্ণীষের দিকে তাকিয়ে মনে হত যেন মাথার ওপর একখানা সামিয়ানা টাঙানো রয়েছে। নাগরিকগণ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করত দেবতার আবির্ভাবের। রাজধানীর গম্বুজ আর প্রাসাদ-শীর্ষে যে মুহূর্তে সূর্যের প্রথম রশ্মি এসে পড়ত, উল্লাস-ধ্বনিতে মুখর হ'য়ে উঠত সমবেত জনতা। ধরত বন্দনা গান। তার সঙ্গে বাজত ইনকাদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র। সূর্যদেব যতই আকাশে আরোহণ করে ভক্তদের ওপর কিরণ বর্ষণ করতেন ততই শোনা যেত তাদের আনন্দ-ধ্বনি। এর পরে রাজা মস্ত সোনার পাত্র থেকে শস্যের সুরা নিয়ে তর্পণ করতেন সূর্যের উদ্দেশে। তর্পণ শেষ হলে পর

তিনি এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সেই পবিত্র সুরা পান করতেন। এর পরে সমবেত জনতা মিছিল ক'রে যেত মন্দিরের দিকে।

মন্দিরের পবিত্র পথে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজা এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা ছাড়া বাকি সবাই পাদুকা খুলে ফেলত। মন্দিরে ঢুকবার অধিকার ছিল একমাত্র রাজ এবং রাজপরিবারের লোকের। মন্দিরে ঢুকবার আগে তারাও জুতো খুলে ফেলতেন। বেশ কিছু সময় ধ'রে প্রার্থনা ক'রে রাজা আবার বেরিয়ে আসতেন জনসাধারণের সামনে। এবার শুরু হত উৎসর্গের প্রস্তুতি। সাধারণত জীবজন্তু, শস্য, ফুল এবং সুগন্ধি বৃক্ষ-নির্যাস দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হত। নরবলি হত কদাচিৎ। সুদর্শন বালক বা সুন্দরী তরুণীকে বলি দে'য়া হত বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যে। রাজার অভিষেক, রাজপুত্রের জন্ম, কিংবা স্মরণীয় কোনো যুদ্ধজয়ের কালে। মেক্সিকোর অধিবাসী আজটেকদের মতো ইনকারা নরবক্তের উল্লাসে মোটেই আগ্রহী ছিল না।

এর পরে, ধাতব দর্পণে প্রতিফলিত রোদের সাহায্যে আগুন ধরান হত শুকনো স্তূপে। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে আগুন জ্বালা হত চকমকি ঠুকে। পবিত্র অগ্নিশিখা অনির্বাণ রাখার ভার থাকত মন্দিরের দেবদাসী বা সূর্য-কুমারীদের ওপর। উৎসবের দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে সারা বছর খারাপ যাবে এ রকম মনে করা হত। পূত অগ্নি জ্বালাবার পর ভোজের পালা। সারারাত ধ'রে চলত নাচ-গান।

রেমী ছাড়া আরো অনেক ছোটখাট উৎসব প্রচলিত ছিল সেকালের ইনকাদের মধ্যে। স্পেনীয় সৈন্যদের আক্রমণে ইনকারা হারাল স্বাধীনতা। লুপ্ত হল তাদের গৌরবের দিন। ফলে দীপ্তিহীন হ'য়ে পড়ল ইনকাদের জাতীয় উৎসব।

বিশেষ আকর্ষণ !

দুর্গেশনন্দিনী শতবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী সংখ্যা থেকে

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে

বিচিত্র আলোচনা।

থিনজান

সরোজমোহন মিত্র

মানুষের সমাজ কেবল মানুষকে নিয়ে নয়। এই প্রকৃতিকে নিয়েও। প্রকৃতির রাজ্যে নানা রূপ রঙের খেলা। নিয়ত পরিবর্তন তার ধর্ম। এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষকেও খাপ খাইয়ে চলতে হয়। সেজন্য সে পালন করে ঋতুউৎসব। বৈচিত্র্যময় মানুষ প্রকৃতির বিচিত্রতাকে নানাভাবে, নানা সুরে, আনন্দগানে মূর্ত করে তোলে। দেশে দেশে এই ঋতু উৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়।

থিনজান বা water festival বর্মাদেশের প্রধান জাতীয় উৎসব। বর্ষাশেষে শরতের শুভ্রাকাশে অমলিন আলোর বর্ণায় হয় বাঙালীর দুর্গোৎসব। বাঙালী মাত্রেরই এ জাতীয় উৎসব। বর্মীদের জল উৎসবও তেমনি তাদের জাতীয় উৎসব।

বর্মাদেশে সাধারণতঃ না শীত না গরম। তবু চৈত্রের দাবদহ দিনগুলির মধ্যেই মনে হয় প্রকৃতির চরম বিরূপতা। চৈত্রের তখন শেষ। অসহ্য গরম। ঘরে থাকা যায়। চাতকের মত সকলে তাকিয়ে থাকে একটুকু কালো মেঘের প্রত্যাশায়। ধোঁয়াটে আকাশের কোন পর্দায় যদি একটু কালো হয়ে আসে তাহলে আনন্দের আর সীমা থাকেনা। জল হবে। ধরণী শীতল হবে। মানুষের প্রাণ জুড়াবে। বহির্রাঙ্গনে মানুষের মেলা বসবে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ। জল আবাহনী উৎসব। জল-উৎসব। মৌসুমীর পদধ্বনি ঐ শোনা যায়।

বৎসরের তখন শেষ। নতুন বৎসরের আরম্ভ। পুরাতন জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি শেষ হয় অন্ধকার সিকনের মধ্যে। পুরানো যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু ক্লেদ, যা কিছু গ্লানি সব ঝরা পাতার মতো শেষ করে নতুন বৎসরের আহ্বান করে। বৎসরের শেষ পাঁচদিন ধরে জলোৎসব। তারপরদিন নববর্ষ। তাই থিনজান নববর্ষের আবাহনীও বটে।

পাড়ায় পাড়ায় প্যাণ্ডেল তৈরী হচ্ছে। ছেলে বুড়ো সকলেরই মহা আনন্দ। পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা উঠছে। মেয়েরাও বাদ নাই। সবচেয়ে সুন্দর প্যাণ্ডেল করতে হবে। যে প্যাণ্ডেল সবচেয়ে সুন্দর হবে তাকে সরকার পুরস্কার দেবেন। তিনটি পুরস্কার দেওয়া হয়। বর্মীরা স্বভাব সুন্দর। ফুল তাদের সবচেয়ে প্রিয়। ফুল দিয়ে তাদের দেবতার পূজো আর ফুল দিয়েই হয় তাদের প্রসাধন শেষ। তাদের জীবনযাত্রা অনাড়ম্বর কিন্তু অসুন্দর নয়। জল-উৎসবের মধ্যেও রয়েছে এই সুন্দরের ছটা। জলের দেবতা বরুণ। তার আবির্ভাবে অঙ্গ জুড়ায়, দেহ শীতল হয়। রুক্ষ মাটি নতুন শ্যামলে যৌবনশ্রী ধারণ করে। ফুলে-ফলে তাদের সমৃদ্ধি আসবে।

প্যাণ্ডেল তৈরী হোল। ঘড়ায় ঘড়ায় জল এল। কেবলই জল। তার সঙ্গে রং নেই, গোবর নেই; কাদা বা কালিও নেই। যেমন থাকে আমাদের হোলিখেলায়। আছে সুগন্ধি। সেন্ট-মেশানো। মথুরা বৃন্দাবনের হোলিখেলার মধ্যেও যে কুৎসিতের পরিচয় পেয়েছি তাতে যে-কোন রুচিপ্রাণ মানুষের চিত্ত ব্যথিত হবে। কিন্তু আনন্দ হোল এ জল উৎসব দেখে। এখানে জল শুধু জল। প্রচণ্ড রোদে যখন সমস্ত শরীর জ্বলে যায় তখন পথে সুগন্ধি ঠাণ্ডা জলের ধারা খারাপ লাগে না। স্কুল-কলেজ অফিস-

কাছারির তখন ছুটি। অফিস যাবার তাড়া নেই। ভিজে কাপড়ে অন্তত যাওয়ার লজ্জা নেই। জলোৎসব পাঁচদিন চলে। ঐ কয়দিন সর্বত্র একটা ছুটির মেজাজ। প্রথমদিন বাচ্চাদের জন্য। পরের চারদিন সরকারী ছুটি।

সকাল থেকেই ছেলে মেয়েরা দলে দলে গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে। কেউ হেঁটে, কেউ বা ট্রাকে। সেই ট্রাক আবার সাজানো। অতি সুন্দর করে সাজানো। পুরস্কার দেওয়ার সময় এই সাজানো ট্রাকগুলোকেও ধরা হয়। ট্রাকের সামনে পিছনে পোষ্টার থাকে। তার থেকে বোঝা যায় এরা কোন পাড়ার দল। তারা গান করে ছড়া বলে। তর্জার মত গানের লড়াই হয়। বিষয়বস্তু সাধারণতঃই বর্মী সংস্কৃতি সম্বন্ধে। অন্য দেশের তুলনায় তাদের সংস্কৃতি যে উত্তম তা প্রতিপাদন করার দিকেই ঝোঁক বেশী। তা ছাড়া গানের বিষয়বস্তু সাধারণতঃই প্রেম। তা যদি ইঙ্গিতময়ও হয় তাহলেও কেউ কিছু মনে করেনা। এমনকি মেয়েদের উদ্দেশ্যে 'অশ্লীল' কিছু বললেও না। যেমন বাড়ীর বারান্দায় একটি সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে ছোটবড় আত্মীয় স্বজন। ট্রাকে যাচ্ছে জল নিয়ে একদল। তাদের মধ্যে একজন বলল, এস সুন্দরী, তোমায় আমি বিয়ে করব। তোমার মত সুন্দরী আর দেখিনি। অমনি সকলে লোহো করে হেসে উঠল। এমনকি গুরুজনেরাও। কারণ এতো আনন্দের সময়। উক্তি-অত্যুক্তির ছল জীবনের মূলে গিয়ে বিঁধেনা। জীবনকে তারা সহজভাবে নিতে পেরেছে। তার মধ্যে কোন কদর্য খোঁজার সময় নেই। জল-উৎসবের মধ্যেও রয়েছে তাই সহজ আনন্দের প্লাবন।

সারা বছর ধরে বর্মীরা অপেক্ষা করে এই উৎসবের। যেমন আমরা করি শারদীয়ার। তিনদিন ধরে ঝরে চলে পথে পথে জলের ধারা। রাত্রে রাস্তায় মোড়ে মোড়ে পার্কে পার্কে পোরে নাচের ভীড়। এ নাচও তাদের অতি প্রিয়। আর সারাদিন ট্রাকে ট্রাকে এবং প্যাণ্ডেলে গানের লড়াই। যেন চলে আমাদের তর্জা বা কবিগান। বর্মীরা মনে করে, এ উৎসবের ফলে নামবে নব-বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারা। সঙ্গে আনবে ঐশ্বর্যের সম্ভার নতুন বছরে আসবে আনন্দের ফোয়ারা।

এই জল-উৎসবের অপেক্ষা করে বহুঘরে আবদ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকারা। এই উৎসব তাদের মিলনের পথ খুলে দেয়। জলধারার অবকাশের মধ্যে চলে তাদের মন দেওয়া নেওয়া। বিবাহের সূত্র তাদের দৃঢ় হয়। দু'জনে পালিয়ে যায় বাড়ী থেকে। দিন সাত অজ্ঞাতবাস করে তারা ফিরে। আত্মীয় স্বজন তাদের বরণ করে স্বামী-স্ত্রী রূপে। ইপ্সিত বাসনার তৃপ্তিলাভ ঘটে।

বিসর্জন শেষ হয়। হৈ চৈ আনন্দের অবসান ঘটে। চতুর্থদিন শেষদিন। নতুন বৎসরের প্রথম দিন। জলের ধারা বন্ধ হয়েছে। পুরানো বছর বিদায় নিয়েছে। নতুন বছরের প্রথম দিন অজানা রহস্য নিয়ে তাদের কাছে এসেছে। এসেছে নতুন প্রাণের, নতুন ঐশ্বর্যের, সুখী জীবনের বার্তা নিয়ে। সেই শুভ-কামনাই তারা করে। দলে দলে যায় মন্দিরে কলায়। ফুল আর বাতি দিয়ে ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করে শ্রী ও সমৃদ্ধির। এ কয়দিন ধরে যাকে আবাহন করে নিয়ে এল তাকে বরণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

— ——

সিংহলের উৎসব

তপতী বসু

ভারতের সঙ্গে সিংহলের যোগাযোগ অনেককালের। এ-দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি 'সিন্ধুর টিপ' ওই দ্বীপটির অধিবাসীরা বরণ ক'রে নিয়েছে সাগ্রহে। তাই ও-দেশের বহু উৎসবের সঙ্গে বেশ মিল আছে আমাদের দেশের প্রধান ক'য়েকটি উৎসবের।

সিংহলবাসীরা উৎসবকে বলে মাঙ্গল্য। মোট চারটি মাঙ্গল্য অনুষ্ঠিত হয় বছরে: আলুৎ অসুরুদ, পেরহেরা, কাত্তি আর আলুৎসন। বৈশাখে আলুৎ অসুরুদ বা নববর্ষ, আষাঢ়ে পেরহেরা, কার্তিকে কাত্তি বা দীপাবলী আর পৌষে আলুৎসন বা নব-ধান্য উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবগুলির সময় আর চেহারার দিকে তাকালেই বোঝা যায় এদের ওপর হিন্দু প্রভাব কতখানি।

সিংহলের সব থেকে বড় উৎসব পেরহেরা। উৎসবের প্রধান কেন্দ্র কাণ্ডি। প্রাচীনকাল থেকে এই উৎসব চ'লে এসেছে। এর দেবতা চারজন: নাথ, বিষ্ণু, কাতরগাম, পট্টিনিদেবী। পূর্ণিমা তিথিতে একটা কাঁঠালগাছ চারখণ্ড ক'রে কেটে বাদ্যভাণ্ড সহকারে মন্দিরের উঠোনে আনা হয়। তারপর এই চারটি খণ্ডকেই সাজানো হয় লতাপাতা ফুলে। এই সাজানো গাছগুলিকে সিংহলীরা বলে আবাচ্ গাছ। আগে যাদের নাম করা হয়েছে সেই চারজন দেবতার মন্দির থেকে এর পরে বেরোয় মস্ত শোভাযাত্রা। হাতীর পিঠে রত্ন চিহ্ন চলে মিছিলের পুরোভাগে। এ ছাড়াও মিছিলে থাকে অনেক অলংকৃত হাতী। পতাকা হাতে নিয়ে গান-বাজনা করতে করতে এগিয়ে যায় শোভাযাত্রীর দল। এই মিছিল দেখে কাণ্ডির আঞ্চলিক শিল্প-কলার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। রাত্রিবেলা শোভাযাত্রীদের হাতে থাকে জলন্ত মশাল। অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে আলোর সেই যাত্রার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন বুঝি কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যায় সেই যুগে যা চিরকালের মতোই হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। কাণ্ডিয়ান নৃত্য মূলতঃ যুদ্ধনৃত্য ব'লেই মনে হয়। সিংহলের সম্রাট গজবাহু দক্ষিণ ভারত আক্রমণ ক'রে বিশেষ সফল হ'য়েছিলেন। যুদ্ধ জয়ের স্মারক হিসেবে পেরহেরা উৎসবের প্রচলন তিনিই নাকি করেন।

পেরহেরা আগে ছিল বিষ্ণু উৎসব। একে বৌদ্ধ উৎসবে রূপান্তরিত করেন রাজা কীর্তিশ্রী। সামন্তদের সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজে শোভাযাত্রায় যোগ দিতেন দামী পোষাক-পরিচ্ছদ প'রে। রাজা অবশ্য সোনার রথে থাকতেন। আট ঘোড়ায় টানা রথে।

পূর্ণসজ্জা এবং তোরণ সিংহলের প্রায় সব ক'টি উৎসবেই দেখা যায়। পথের ওপর কাপড় দিয়ে তৈরী করা হয় সুন্দর তোরণ। তৈরী করার ভার থাকে রজকদের ওপর। পথের দুধারে মাটি টাঙিয়ে তাতে ঝুলিয়ে দেয়া হয় সারি বাঁধা নারকেল পাতা।

সিংহলের আরেকটি উৎসব বলি-উৎসব। সিংহলীরা বিশ্বাস করে যে মানুষের ভাগ্য গ্রহ-নক্ষত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই জন্য তারা নক্ষত্র-মণ্ডলীর পূজা করে।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস

৮৪. আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গল্প-ভারতী
বৈশাখ, ১৩৭২

"কথা প্রসঙ্গে"

দু'টি মূল্যবান কথা ॥

স্বাধীন ভারতবর্ষের চরম সঙ্কটের পুঞ্জীভূত কালো মেঘের মধ্যে সহসা বিদ্যুৎ চমকের মত দুটি মূল্যবান কথা আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলো। এই প্রত্যয়ের কথা আমাদের শুনিয়েছেন নেহেরু পরিবারের দুই সন্ত্রান্ত মহিলা। সরকারি দপ্তরখানার প্রচলিত ভাষণ থেকে পৃথক সত্তায় বিঘোষিত এই সতর্কীকরণ আজ আমাদের পাথেয় হোক।

যে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, যার আত্মপ্রত্যয় বা আত্মচেতনা নেই, সে কখনও কৃতী হতে পারে না। তার জীবনে সাফল্যলাভ কোন দিনই সম্ভব নয়। পরমুখাপেক্ষী বাকি আত্ম-প্রত্যয়হীন হয়ে পরগাছারই মতন দুর্বহ জীবন বহন করে।

যেমন ব্যক্তির জীবনে একথা সত্য তেমনি জাতির জীবনেও একথা তাত্ত্বিক সত্য। প্রতিটি বিষয়ে আজ আমরা আত্ম-শক্তিকে হারিয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে উঠছি। এই দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ জাতির সর্বাঙ্গে। আজ আমাদের আত্ম-প্রত্যয় নেই, মনের দৃঢ়তা নেই, কোন দায়িত্ব গ্রহণ করার শক্তি পর্যন্ত নেই। আমাদের সকল শক্তি ও উৎসাহের উৎস আজ শুকিয়ে গেছে। খাওয়া পরা থেকে আরম্ভ করে, দেশ উন্নয়ন, দেশরক্ষা প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই আমরা পরের দ্বারস্থ হচ্ছি এবং ব্যাকুল নয়নে পরের মুখের দিকে চেয়ে আছি। অথচ জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করার দুর্জয় আত্মচেতনা এবং আত্ম-প্রত্যয় একদিন আমরাই পরাধীন ভারতে ঘোষণা করেছিলাম। সেদিন ভারত পরাধীন হলেও বিশ্বের দরবারে তার শ্রেষ্ঠত্বের বহ নিদর্শন প্রকটিত হয়েছিল। আমাদের বিবেকানন্দ আমাদেরই বিবেককে পৃথিবীর নৈতিক মানসে উন্মোচিত করেছিলেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-প্রেমে পৃথিবীকে জয় করেছিলেন। আমাদের মহাত্মা শুধু আমাদেরই রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না—সারা পৃথিবীর বিস্ময় ছিলেন তিনি।

ভারতবর্ষে এই রকম মহান ব্যক্তিত্ব শুধু ব্যক্তির মস্তক নয়—জাতির মস্তকে গরীয়ান হয়ে উঠেছিলো।

কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষ বর্তমানে পূর্ব ঐতিহ্য হারিয়ে দুর্বল ও অসহায়। এই লজ্জা এবং দীনতা থেকে মুক্ত হতে না পারলে বর্তমান ভারতবর্ষের কল্যাণ নেই।

সেই কথাই স্মরণ করে এই দুর্যোগ মুহূর্তে ভারতবর্ষের মহিলাময়ী আমাদের আত্মরক্ষা শুনিয়েছেন। সম্প্রতি সীমান্ত নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মে দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন, আমাদের এই দুর্দিনে কে শত্রু আর কে মিত্র তা আমরা চিনতে পারলাম। এই চেনার প্রয়োজন আমাদের জাতির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরের সাহায্য আমাদের সঙ্কটকালে যে কতো বিপদ তার বোধ আমাদের মধ্যে আজ জাগরিত হয়েছে। আমাদের প্রয়োজন নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে ওঠা। আত্ম-প্রত্যয়ের বোধে জাগ্রত হওয়া —নিজের পায়ে দাঁড়ানো। যত বড় কঠিন কাজই হোক না কেন, আজ আমাদের আবার নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে।

জাতির এই আত্ম-সম্বিৎকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে দেশের পরম কল্যাণ সাধন করেছেন। অতীতচারণাকে আজ জাতির জীবনে কার্যকরী করে গড়ে তুলতে হবে। অতীতের জাতীয় আত্ম-প্রত্যয়কে বর্তমানে জাতির শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করার দিন এসেছে আজ।

ভারতের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ভারতের ভগিনী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও সময়োচিত সতর্ক বাণী দেশবাসীকে শুনিয়েছেন সম্প্রতি কংগ্রেসী এম্.পিদের সভায়।

তিনি বলেছেন বর্তমানে আমরা শুধুই ধার করার মনোবৃত্তি গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। আমরা আমাদের সকল প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে অপর দেশের কাছে ভিক্ষা করতে শিখেছি। আমাদের এই গ্লানিময় হীন মনোবৃত্তি থেকে ফিরে দাঁড়ানোর দিন এসেছে। আমাদের ভাবতে হবে কতোকাল ভিক্ষা বৃত্তির দ্বারা আর অপরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে দেশ বাঁচতে পারে? আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে শুধু ধার আর সাহায্য চিরদিন বিদেশ থেকে পাওয়া যায় না। আর তারদ্বারা কোন মহৎজাতির আত্মত্রাণ রচিত হয় না। পৃথিবীর অপরাপর স্বাধীন দেশের মানুষ যেমন নিজেদের আত্ম-প্রত্যয়ে বিশ্বাসী হয়ে আপন শক্তিতে বেঁচে থাকে, তাদের অতীত গৌরবকে বর্তমানে সঞ্চারিত করে, তেমনি আমাদেরও কর্তব্য ঠিক সেই ভাবেই বেঁচে থাকা—নিজের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠা।

তিনি আরো বলেছেন যে পরের কাছে হাত পেতে পেতে আর পরের মুখাপেক্ষী হয়ে পৃথিবীতে আমরা নিন্দনীয় হয়ে উঠছি।

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষের পদচারণায় এই দুটি মহা মূল্যবান কথা মন্ত্রশক্তির মত কাজ করুক!

দেশবাসীকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিই যে দেশের মানুষ একদিন নিজেদের মানসিক শক্তি, আত্ম-চেতনা এবং আত্ম-প্রত্যয়ের দ্বারা পৃথিবীর কাছে শুধু বরণীয় হয়নি, পৃথিবীকে বিস্মিত করেছিল. সেই দেশেরই আমরা উত্তর সাধক।

পাঠক পাঠিকার কলম

[পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক গ্রাহিকাদের কাছ থেকে আমরা প্রায়শই নানা ধরণের পত্র পাই। অনেক পত্রে চিন্তাশীলতা এবং নানা সমস্যা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও স্টিংপূর্ণ মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন থেকে আমরা এই ধরণের প্রকাশ-যোগ্য এক বা একাধিক পত্র প্রতি সংখ্যায় দেব। এই বিভাগে শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে সমসাময়িক জীবন ও তার সমস্যা সম্পর্কে মতামত আহ্বান করা হচ্ছে।

—গল্প-ভারতী-সম্পাদক]

(মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী নন্)

শ্রীযুক্ত গল্প-ভারতী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

অবশেষে বিদেশে অনেক জল ঘোলা করিয়া, সেখানকার দেশে দেশে ভারতের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াইয়া, পিছন হইতে নিজের মাতৃভূমির পিঠে ছুরি মারিয়া ইতিহাসের অন্যতম দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক শেখ আবদুল্লা অন্য কোন উপায় না পাইয়া দেশে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ভারত সরকার তাহার প্রতিবিধি আটক করিয়াছেন। কিন্তু এই আটক পর্বটি যেন একটি প্রতি-নাটকীয় ব্যাপার হইয়াছিল। অন্তত স্টেটসম্যানের রিপোর্ট পড়িয়া তাহাই বোধ হইয়াছে। কী যেন এক ভীষণ ব্যাপার। বিমান বন্দরের চারিদিকে হাজার পুলিশ! দর্শক তো দূরের কথা পত্রিকার সাংবাদিকরাও কাছে যাইবার পথ পান নাই। ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা পুলিশ ছিনাইয়া লইয়াছে। কে আসিতেছে? বোধ করি অন্য কোন দেশের রাজা মহারাজা যিনি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া ভারতের কাছে আত্ম সমর্পণ করিতে আসিতেছেন। সুতরাং তাহার প্রতি "রাজার প্রতি রাজার আচরণ" দেখাইতে হইবে বৈকি! পুলিশ শেখ আবদুল্লাকে সেইরূপই খাতির দেখাইয়াছে। সর্বোচ্চ শ্রেণীর ভি. আই. পি-দের যেরূপ আপ্যায়ন করা হয়, সেইরূপ আপ্যায়ন। ভি. আই. পি বিশ্রামাগারে বিশ্রাম, উৎকৃষ্টতম খাদ্যপানীয় সরবরাহ ইত্যাদি। তারপর কোথায় তাহাকে রাখা হইবে? কোন্ জায়গা এখন সবচেয়ে আরামপ্রদ? খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির হইল—উটাকামণ্ড। দারুণ গ্রীষ্মে পরম আরাম দায়ক স্থান। সেই স্থানে সর্বরকম বিলাস এবং সুখ সুবিধার মধ্যে এই দেশদ্রোহী খলনায়ক পরম আরামে তাহার দিন যাপন করিবে। সেখানে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইবে, বৈশ আড্ডায় যাইবে নিলগিরির কমিশনরকে ট্যাকে গুঁজিয়া সেইখানে বসিয়াই সে বাহির হইতে লোক আনাইবে ও ষড়যন্ত্র আঁটিবে। স্মরণ করুন, ইংরাজ আমলে নিজের স্বাধীনতা অর্জন আকাংখায় ইংরাজের হাতে পড়িয়া দেশপ্রেমিক বীর সন্তানরা কী নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন!

আমরা জানি, একাধিক ষোড়শ অন্ধকার কারাগারে নির্যাতনের চেয়ে রক্তবমন করিয়াছেন, শারীরিক আঘাত পাইয়া চিরদিনের মতো স্বাস্থ্যহীন হইয়াছেন, কয়েকজন ইহ-পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছেন। এই নৃশংস লোকটার রাজত্বকালে তাহারই কারাগারে বাংলার বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদের জীবনান্তের মর্মন্তুদ ঘটনা আমরা কেহই ভুলিয়া যাই নাই। আজো এই স্বাধীন যুগেও পুলিশের বৈধমাবূলক আচরণের কথা আমরা প্রায়শই পত্রিকায় পড়ি। সামান্য অপরাধে অপরাধী বিচারাধীন কয়েদী পুলিশের হাতে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, কেহ কেহ বা মারা পড়িয়াছে—এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। মুসলমান আমল হইলে যে ব্যক্তিকে কাজীর বিচারের সমতুল্য দণ্ড পাইতে হইত এই ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তি, বন্দীরাজার সম্মান পাইতেছে। এবং তাহার জন্য ইতিমধ্যে উকিল জুটিয়াছে। জয় প্রকাশ নারায়ন আর নবকেষ্ট চৌধুরী—এই দুই সুবিধাবাদী সর্বোদয় পাণ্ডা মার্কি শেখ আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার না করিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ পাঠাইয়াছেন। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য একদিকে তাহার অগণিত বীর সন্তান বুকের রক্ত দিয়া তাহার শৃংখল মোচন করিয়াছে আর অন্যদিকে কতিপয় বিকৃতবুদ্ধি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পরোক্ষে তাহার বুকে ছুরি বসাইতেছে। ইতি—

অরবিন্দ পালিত
হাওড়া

গল্প-ভারতী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
শ্রদ্ধাভাজনেষু,

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালনকে উপলক্ষ্য করে গত ফাল্গুন সংখ্যা গল্প-ভারতীতে 'ব্যাপার যা চলছে' নামক লেখার মধ্যে লেখক চক্রপাণি যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়ে সত্যিই চিন্তা করবার আছে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা শত শত নাচ-গান-অভিনয়ের আয়োজন করি। অনুষ্ঠানগুলিতে সমারোহ আর কলরবের অন্ত থাকে না। কিন্তু সেই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা সেই বিরাট মহান ব্যক্তিটিকে কতটুকু অনুভব করতে পারি, কতটুকু উপলব্ধি করতে পারি? রবীন্দ্রনাথ কি শুধুই গান বেঁধেছেন আর নাটক রচনা করেছেন? জাতিকে জাগাবার জন্যে, তাকে উন্নত করবার জন্যে তাঁর কি সর্বাঙ্গীণ সর্বব্যাপি চেষ্টা আর কর্মোদ্যম ছিল না? জাতির কল্যাণ কামনায় তাঁর যে মন অনিমিষ জাগ্রত ছিল সেই মনের কতটুকু পরিচয় আমরা এই সব নাচগানের আসরে বহন করে আনতে পেরেছি? লক্ষ লক্ষ নরনারী অনুষ্ঠানে আসে। কিন্তু তারা আসে নাচ দেখতে, থিয়েটার শুনতে, গান শুনতে আর বড় বড় শিল্পীদের দেখতে। তারা কেউ রবীন্দ্রনাথকে জানতে আসে না, বুঝতে আসে না। অনুষ্ঠানগুলিও আজ দলীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যেও রাজনীতি প্রবেশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে একটা দল আর একটা দলের ওপর টেক্কা দিচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের গভীরে যাঁরা প্রবেশ করতে পেরেছেন তাঁরা বলবেন, তাঁকে নিয়ে এই বিপুল অর্থব্যয়, এই প্রবল আড়ম্বর, এই বাহ্যিক অনুষ্ঠান—এর প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল অপরিসীম।

তাঁর নামে নিয়ে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের কদর্য ও কুৎসা অনুষ্ঠান অতিশয় ঘৃণা করতেন তিনি। তাই তিনি বলেছিলেন—

বাঁশী যখন থামবে ঘরে নিভবে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার পরে পড়বে যবনিকা।
তখন যেন কবির তরে ভীড় না জমে সভার ঘরে
হয় না যেন উচ্চস্বরে শোকের সমারোহ।
সভাপতি থাকুন বাসায়, কাটান বেলা তাসে পাশায়
নাই বা হল নানা ভাষায় আহা উহু ওহো।
নাই বসালো দল বেঁধেদের কোলাহলের মোহ।"

আমরা তাঁর আদর্শকে ভুলেছি। যে "দীক্ষা" তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন, তা ভুলেছি। তাঁর নাম দিয়ে আমরা মেতেছি নাচগান করায়। এই সব ঢং করার যারা উদ্যোক্তা, (যাদের সাংবৎসরিক "ব্যবসায়ের" ফাঁকে শত সহস্র নরনারী আকর্ষিত হয়ে অবোধের মত রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাবার পরিবর্তে অশ্রদ্ধাই জানাচ্ছে বেশি করে) তাদের দায়দায়িত্ব বোধ নেই, তারা নিজেরাই রবীন্দ্রনাথকে জানে না, তাই দেশের লোককে তারা জানাবেই বা কি? মানুষকে মানুষের মতো মানুষ হবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের যে আদর্শ, যে বাণী—তাকে আজ স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে, আজ এই মহা সংকটের দিনে তাঁর সেই "দীক্ষা" মানুষকে শোনাবার :

"আঘাত-সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অন্তরে কুণ্ডলকৃতী অলংকার রাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শংখগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। এ-ক্ষত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নব বীর বেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
তাদের দলিত ক্রোড়ে না রাখি বিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন॥

বেলগাছিয়া　　শ্রীরমেন্দ্র চৌধুরী
বৈশাখ ১৩৭২

উদাত্ত আহ্বান

আমাদের দেশ তো একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত, একদিন দারিদ্র্যকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল—আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন সধর্মকে অপমানিত করিব। আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিতসংযত, সেই স্বল্পোকরণ জীবন-যাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর, সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না। আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোনো আরাম কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না। একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কখনোই নহে। নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব ধীরভাবে নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের দুই চারিদিনের এই ইস্কুলের মুখস্থ বিদ্যা সেই চিরন্তন প্রভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতি মুহূর্তে আমাদের বক্ষঃ কুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। এবং আমরা নিজের অলক্ষে শনৈঃ শনৈ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গল দীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে সেইখানে আমাদের গৃহযাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!"

একবার স্বীকার করো যে, দেশের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা করো, জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পদাহত অকালকুষ্মাণ্ডের ন্যায় অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।

আজ আমাদের দেশে যা ঘটছে
সব কাজেই মস্তিষ্কের অভাব।

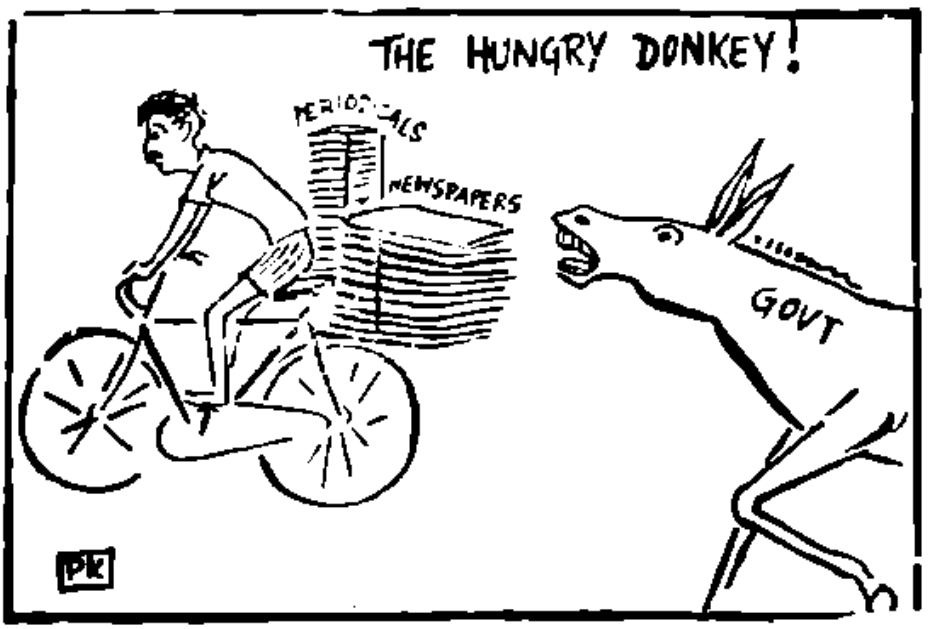

কিসের এত ক্ষুধা?
পত্র-পত্রিকাকে গ্রাস করার?

স্বরাজ্য'র সৌজন্যে

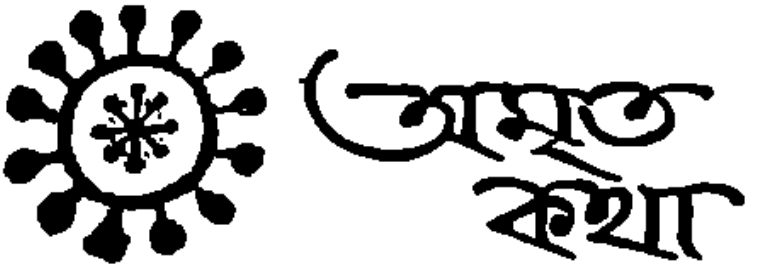

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা।

যারা কেবল বই পড়া পণ্ডিত কিন্তু ভগবানের তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাদের কথাবার্ত্তা ও গোলমেলে। সাময়াচারী নামে কোন পণ্ডিত বলেছিলেন, "ঈশ্বর নীরস তোমরা নিজ নিজ প্রেমভক্তির দ্বারা সরস কর।" কি আশ্চর্য্য! যেহেতু যাঁহাকে রসস্বরূপ বলিয়াছে, তাঁহাকে কিনা নীরস বলেন; ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে, তিনি ঈশ্বর কি তাহা জানেন নাই। তাই এইরূপ গোলমেলে কথা।

• • • •

যতক্ষণ অহঙ্কার—ততক্ষণ অজ্ঞান; অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নাই। নীচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়; চাতক পাখীর বাসা নীচে; কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। উঁচু জমিতে চাষ হয় না; খালা জমি চাই, তবে জল জমে, তবে চাষ হয়।

• • • •

বিষয়ীরা যখন সাধুর কাছে আসে তখন বিষয়ের কথা, বিষয় চিন্তা সব একেবারে লুকিয়ে ফ্যালে। সাধুর কাছ থেকে চলে গিয়ে সেগুলি আবার বার করে; যেমন পায়রা মটর খেলে মনে হ'লো সব হজম করে ফেল্লে কিন্তু তারপর গলায় হাত দিয়ে দেখ মটর সব গিজ গিজ করছে।

• • • •

তীব্র বৈরাগ্য হ'লে আত্মীয়-স্বজন কালসাপ, সংসার গাছকুরা ব'লে বোধহয়। তখন বিষয় ঠিকঠাক করবো, টাকা জমাবো এসব বোধ থাকে না। ঈশ্বর একমাত্র বস্তু— আর সব অনিত্য, অবস্তু বলে মনে হয়।

• • • •

জাহাজের কাপ্তানের কাঁটা উত্তর দিকে থাকে। তাই জাহাজের দিক ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তাহলে কোনও ভয় থাকে না।

চিঠি শুধু চিঠি নয়

(আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত)

আলমোড়া
কার্তিক, ১৩০৮
এপ্রিল, ১৯০২

বন্ধু,

তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই কিন্তু কতদিন যে তোমাকে লইয়া কাটাইয়াছি, হৃদয়ের অন্তরঙ্গ প্রদেশে তোমাকে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আজ তোমার জয় সংবাদ পাইয়া নবমেঘগর্জনপুলকিত ময়ূরের মত আমার হৃদয় নৃত্য করিতেছে। মাতাল মদের বোতলের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত যেমন পান করে তোমার চিঠির ভিতর হইতে আমি সমস্ত মত্ততাটুকু একেবারে উপুড় করিয়া ধরিয়া চাখিবার চেষ্টা করিতেছি। বহু বিলম্বে তোমার জয় হইলেও আমি হতাশ হইতাম না—তবু সমস্ত পাওনার প্রবল আনন্দ।

গতকাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল—নিশ্চয় সেখানে তোমার জয় হইয়াছে—তোমার সেই বক্তৃতা সভায় আমাদের হৃদয় উপস্থিত ছিল।

য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিবে—তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না। প্যারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্রভেদী জয়-তোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নির্জনতার মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে—তখন তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে তুমি কাহাকেও খুঁজিবে না—তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা নত করিবে বিদেশী ছাত্রকে ডাকিবার জন্য বিদেশের স্থানে প্রাসাদ রচনা করিলে চলিবে না—মাঠের কুটীরের মধ্যে মৃগচর্মে যে বসিবে সেই তোমাকে পাইবে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারোও হাতে দেন নাই—তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে—সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়মন্ত্র উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে এবং নির্মল সূর্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শূন্য প্রান্তর এবং উদার আকাশ তৃষিত বক্ষের ন্যায় ব্যাকুল প্রসারিত বাহুর ন্যায় সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরাও সেই দিনের জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের রাজা যে কেহ হউক, আমাদের আকাশ,

আমাদের দিগন্ত বিস্তীর্ণ মাঠ কে কাড়িয়া লইবে? আমাদের জ্ঞানের অবকাশ, আমাদের ধ্যানের অবকাশ, আমাদের দারিদ্র্যের অবকাশ হইতে আমাদিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারিবে? আমাদের দেশে যে পরমমুক্তির অচল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—তাহা শুভ্র, তাহা নির্বাক, তাহা দীন তাহা দিগম্বর, তাহা শাশ্বত—তাহাকে বলির রাহু ও ক্ষমতাশালীর স্পর্ধা স্পর্শ করিতে পারে না—ইহাই চিত্তের মধ্যে স্থির নিশ্চয়রূপে জানিয়া শান্ত মনে সন্তোষের সহিত প্রসন্নমুখে ইহারই বিরল ভূষণ বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিদেশীর কটাক্ষে আর ভ্রূক্ষেপ করিব না—তাহার বিজ্ঞাপে আর কর্ণপাত করিব না—তাহার কাছ হইতে যে বর্বর রং চং বসন ভূষণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম তাহা তপোবনের দ্বারে আবর্জনার মত ফেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিব।

পত্রের মধ্যে আমাদের আম্রমুকুল হইতে কালিদাসের শিরীষ পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।

তোমার—রবি

* * * *

যুদ্ধের সময় লণ্ডনের নৌ-অফিসে একদিন এক যুবক চাকুরীপ্রার্থী এসে অনেক কষ্টে কর্তার সঙ্গে দেখা করল।

—কি চাও তুমি?

—আজ্ঞে, আমি রাজকীয় নৌ বিভাগে জাহাজের নাবিক হতে চাই।

—তুমি কি নৌ বিভাগের কোন শিক্ষা লাভ করেছ? আমাদের এখনি উপযুক্ত লোকের দরকার। শিখিয়ে নেবার সময় বড় কম। তোমার কোন সার্টিফিকেট আছে?

যুবকের মুখ ম্লান হয়ে গেল।

বড় কর্তা এবার তাকে বললেন—"সার্টিফিকেট না থাকলে তোমাকে নিতে পারব না।"

যুবক চলে যাচ্ছিল, বড় বড় কর্তা আবার তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বাবা কি করেন?"

—নাবিক ছিলেন, নৌযুদ্ধে মারা যান।

—তোমার ঠাকুর্দা?

তিনিও নাবিক ছিলেন, নৌযুদ্ধে মারা যান।

—তোমার ঠাকুর্দার বাবা?

—তিনিও নাবিক ছিলেন, নৌ যুদ্ধে মারা যান।

—তাঁরও বাবা?

—স্পানীশ আরমাডার সময়ে যুদ্ধ জাহাজের নাবিক ছিলেন।

এবার বড়কর্তা তখনি যুবককে নৌবিভাগে ভাল চাকরী দিলেন।

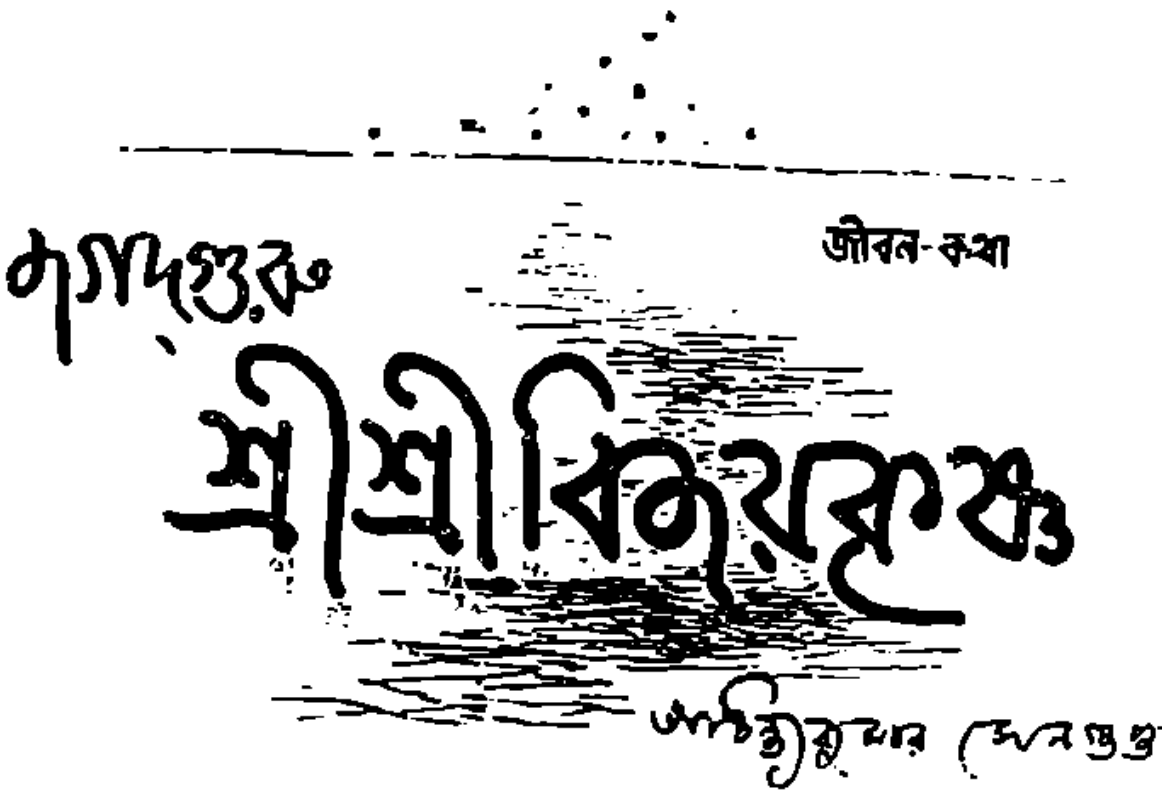

৩০

গৌসাই প্রভু বললেন, আমি এবার কুম্ভমেলায় যাব।

'সেখানে কেন?' ভক্ত জিগগেস করল।

'অতি প্রাচীন কজন মহাপুরুষ এবার কুম্ভমেলায় আসবেন, তাদের দেখতে যাব।'

গ্যাণ্ডেরিয়ার আশ্রমে এসে কুলদানন্দ দেখল সমস্ত নিঝুম। যে আশ্রম সর্বদা ভজনে-কীর্তনে মুখরিত ছিল তা এখন প্রায় জনমানবশূন্য। সমস্ত আকাশ বাতাস দীন মলিন।

গৌসাই কোথায়?

গৌসাই প্রয়াগে গিয়েছেন, ত্রিবেণী সঙ্গমে।

'আপনি এলেন, আমাদের গৌসাই কই?' পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ ছুটে এল কুলদাকে দেখে: 'গৌসাই কবে আসবেন?'

'গৌসাই ছাড়া আমাদের দিন যে কাটে না।'

'গৌসাই ভালো আছেন তো?'

'বৃন্দাবনে কি আর ফিরবেন না শ্রীকৃষ্ণ?'

কুলদানন্দ বললে, 'আমি যাইনি প্রয়াগে। এবার যাব। তোমাদের কাছে প্রভুর সংবাদ এনে দেব।'

নিষ্প্রাণ আশ্রম, নিস্তেজ জীবনযাত্রা। সকালবেলা দেবী যোগমায়ার একবার পুজো হয়, ঠাকুরের ভজনকুটিরে একটু ধুনো জ্বলে, সন্ধ্যায় নিয়ম রক্ষার আরতি। আরতির সময় কেউ বিশেষ আসে না। যদি বা কেউ আসে আমতলার মন্দিরের রোয়াকে বা পুকুরের ধারে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যায়। সকলের মুখ বিষণ্ণ, দৃষ্টি উদাস, মন প্রাণ স্ফূর্তিহীন।

যে গাছের নিচে গোঁসাই রোজ দাঁড়াতেন, পত্রমর্মরে তার অন্তরের কথা শুনতেন, সেই গাছ পাতা ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। যেখানে পাখিদের জন্যে চাল ছড়িয়ে দিতেন সেখানে ঘাস গজাচ্ছে। এখন চাল ছড়িয়ে দিলেও পাখিদের আর দেখা নেই। গাছেও আর পাখি বসে না। যেখানে নাম গান নেই সেখানে পাখিরা কার কাকলী করবে? গাছ নেই পাতা নেই চাল নেই পাখি নেই।

কুলদানন্দ প্রয়াগ চলল। কুঞ্জ আর অশ্বিনী সঙ্গী হল।

এলাহাবাদ স্টেশনে নেমে তিনজনে একটা গাড়ি নিল।

গাড়োয়ান জিগগেস করল, 'কোথায় যাব?'

অশ্বিনী কুঞ্জকে ঠেলা মারল: 'বল না কোথায় যাবে?'

'তুই বল না—' কুঞ্জ পালটা গুঁতো মারল।

'আহা, গোঁসাই কোথায় আছেন তা বলবি তো?'

'তোকেও তো তাই বলতে বলছি গোঁসাই কোথায় আছেন—'

এ নিয়ে তুমুল ঝগড়া। এ বলে তুই বল, ও বলে তুই বল। এ বলে তোর বলতে বাধা কী, ও বলে তোরই বা কোন বাধা?

ঝগড়ার কিনারা হয় না দেখে কুলদা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

'এ কি তুই নেমে যাচ্ছিস কেন?' অশ্বিনী চেঁচিয়ে উঠল: 'গোঁসাই কোথায়!'

'গোঁসাই সর্বত্র।' বলে কুলদা রাস্তার পাশে একটা গাছের নিচে আসন করে বসল।

'শালারা সব হস্তিমূর্খ।' ভড়কে উঠলো অশ্বিনী: 'গোঁসাইয়ের কাছে যাবে বলে বেরিয়েছে অথচ তাঁর ঠিকানা জেনে আসেনি।'

'তুইও তো তো বেরিয়েছিস তুই কেন আনিস নি?' পালটা হুঙ্কার ছাড়ল কুঞ্জ।

'বা, আমি তোর সঙ্গে এসেছি, আমি কী জানি। তুই যেখানে যাবি আমিও সেইখানে যাব।'

'চমৎকার। এদিকে আমিও তো তোর উপরে ভার দিয়ে বসে আছি। তুই যেখানে নিয়ে যাবি নিশ্চিন্ত মনে সেইখানে গিয়ে উঠব।'

'এখন কী করা! ও-ওতো ঠিকানা জানে না, দিব্যি গাছতলায় গিয়ে বসেছে।'

'না, না, বসতে দেওয়া হবে না, চল রাস্তা ধরে বেরিয়ে পড়ি। পথই আমাদের পথ দেখাবে।'

গাছতলা থেকে তুলে নিল কুলদাকে। চলো রাস্তায় জিগগেস করতে-করতে পেয়ে যাব ঠিকানা।

'চলো আমরাই তাঁকে খুঁজছি না, তিনিও আমাদের খুঁজছেন।' কুলদা উঠে পড়ল।

কিন্তু রাস্তায় কাকে জিগগেস করবে? শীতের রাত, দশটা প্রায় বাজে, রাস্তায় লোকজনই বা তেমন কোথায়? যে কজন বা প্রশ্ন শুনে দাঁড়ায় কোনো হদিস দিতে পারে না।

অজানা পথ, শীত, ঘাড়ে বোঝা, নিরুদ্দেশের মত চলতে লাগল সবাই।

'আর কত হাঁটব? আর কত?'

হঠাৎ রাস্তার দক্ষিণ দিকের একটা বাড়ি থেকে কে বলে উঠল: 'ব্রহ্মচারী, আমি এইখানে।'

এ কী, গোঁসাইপ্রভুর কণ্ঠস্বর!

দরজা খুলে গেল। মিলে গেল ঠিকানা। মিলে গেল ঠাকুর। আর কী, প্রণাম করো, পেটপুরে ভোজন করো, তারপর সুখে নিদ্রা যাও।

পরদিন বিকেলে গৌসাইপ্রভু সবাইকে নিয়ে চললেন গঙ্গাতীর। আর এই তো ত্রিবেণী—গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতীর মিলনক্ষেত্র। গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী যমুনা পূর্ববাহিনী আর সরস্বতী অন্তঃসলিলা। দুই নদীর মাঝখানে বিস্তীর্ণ চড়া, সেখানে যত রাজ্যের সাধু সন্ন্যাসী এসে ভিড় করেছে। বৈষ্ণবরাও এসেছে দলে-দলে। নানকপন্থী উদাসীরাও কম যায় না। শুধু তাই? এসেছে কবীরপন্থী, গোরোখনাথী, নির্বাণী, নিরঞ্জনী। কেউ কুঁড়েঘর বানিয়েছে, কেউ আছে তাঁবুতে, কেউ বা শুধু ছাতার নিচে আবার কেউ বা সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়ে, ধুনি জ্বালিয়ে। কেউ গৈরিকধারী, কারু বা শুধু কৌপীন আর বহির্বাস, কেউ বা শুধু ভস্মের আচ্ছাদনে। যেন বসে গেছে নৈমিষারণ্যের ঋষিসভা।

গৌসাইপ্রভু শিষ্যদের নিয়ে নাম গান করতে এগোতে লাগলেন।

'নাম-ব্রহ্ম নাম-ব্রহ্ম নাম-ব্রহ্ম বল ভাই।
হরিনাম বিনা জীবের আর গতি নাই॥'

কে এই পুরুষোত্তম? সাধুদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে গেল। হরিনামের এমন সিংহনাদ তারা কেউ শোনেনি। সবাই তাঁর পদধূলি নেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। এমনটি বুঝি আর কেউ আসেনি এবার।

হঠাৎ একজন খর্বাকৃতি জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষ ছুটে এল গৌসাইয়ের কাছে, 'আও মেরে প্রাণ' বলে গৌসাইকে জড়িয়ে ধরল। মহাপুরুষের সর্বাঙ্গে মহাভাববিকার দেখা দিল, সুরু হল অশ্রুবর্ষণ।

ক্ষণকাল পরে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হলেন মহাপুরুষ আর নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

'উনি কে?' জিগগেস করল মহেন্দ্র।

গৌসাইজির দুচোখ ছলছল করে উঠল। বললেন, 'উনি আমার গুরুদেব, পরমহংসজী।'

'পরমহংসজী তো গৌরবর্ণ কিন্তু তাঁকে তো শ্যামবর্ণ দেখলাম।'

'তিনি অন্যদেহ আশ্রয় করে প্রচ্ছন্নভাবে এসেছিলেন।'

পরদিন গৌসাইজি বেণীমাধব দর্শন করলেন। এক টাকার বাতাসা কিনে ভোগ দেওয়ালেন। বললেন, 'এইখানে শিক্ষাষ্টক দিয়েছিলেন মহাপ্রভু। আর ঐ যে দশাশ্বমেধ ঘাট দেখছ ঐখানে তিনি রূপ গোস্বামীকে দশদিন ধরে শিক্ষা দিয়েছিলেন।'

গৌসাইজি ঠিক করেছেন বাড়িতে আর থাকবেন না, চড়ায় গিয়ে থাকবেন আর সাধুসন্তদের ভাণ্ডারা দেবেন।

গোয়ালিয়রের প্রাক্তন মন্ত্রী দীনকর রাও তাঁবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। চড়ায় খাটানো হয়েছে। তিরিশ-চল্লিশজন ভক্ত শিষ্য থাকতে পারবে। শুধু মেয়েরাই বাড়িতে থাকবে। আসা-যাওয়া করবে।

কিন্তু এতগুলো ভক্ত শিষ্যের চলবে কী করে? তারা খাবে কী?

'আমি ভিক্ষে করে খাওয়াব।' বললেন গৌসাই প্রভু, 'খাওয়াবার ভার আমার উপর।'

প্রথম দিনেই প্রায় পৌনে দুশো টাকা মিলে গেল। সবাই ভাবল এ নিয়ে দিনকতক বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যাবে, কিন্তু গৌসাইজি বললেন, 'মনে রাখবে আমার আকাশবৃত্তি। দিনের জিনিস দিনেই ব্যয় করে ফেলব, পরের দিনের জন্যে সঞ্চয় করে রাখব না।'

সাধুদের মধ্যেই আবার কত ভিক্ষুক। মহারাজ, দুরোজ কিছু খাইনি। মহারাজ, ধুনির কাঠ নেই। কেউ বললে, জল খাবার লোটা নেই। কেউ বললে গাঁজা কিনতে পাচ্ছি না, ভজন বন্ধ হবার উপক্রম। কেউ বললে, প্রচণ্ড শীতে মারা যাচ্ছি, একটা করে কম্বল কিনে দিন।

সব টাকা সন্ধ্যের আগেই নিঃশেষ করে দিলেন গোঁসাই।

কিন্তু দেখি কাল তিনি কেমন করে খাওয়ান!

ভোরবেলা এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক এসে হাজির। 'স্বামীজি, যদি কৃপা করে আদেশ করেন সেবার জন্যে কিছু পাঠিয়ে দিই।'

গোঁসাইজি সম্মতি দিলেন। দুটো মুটের মাথায় প্রচুর জিনিস এসে উপস্থিত হল। চাল ডাল আটা ঘি থেকে সুরু করে দুধ দই মিষ্টি মায় তামাক টিকে পান সুপুরি।

গোঁসাইজি বলে দিলেন, 'আজকের মত রেখে বাকি সমস্ত কাঙালীদের বিলিয়ে দাও। আকাশ বৃত্তির কথা ভুলো না। একটা জিনিসও যেন কালকের জন্যে না থাকে।'

দেখি কাল কে পাঠায়! কাল কী করে খাওয়ান সবাইকে।

কালকের কথা কালকে।

চলো মাধোদাস বাবাজীকে দেখে আসি।

মাধোদাসের আশ্রমে মহাপ্রভুর মন্দির। গোঁসাই গিয়ে দাঁড়াতেই মাধোদাস সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়লেন। গোঁসাই মহাপ্রভুর সামনে সাষ্টাঙ্গ হলেন ও সাধুর পদধূলি নিলেন। দুজনে বসলেন বারান্দায়। মাধোদাস বললেন, 'আপনি যে আজ এখানে আসবেন তা আমি জানতাম।'

'কী করে জানতেন?'

'পুজোর সময় মহাপ্রভু আমাকে বলে দিলেন, বিজয় আজ আমাকে দেখতে আসবে। ওর জন্যে আমার প্রসাদ রেখে দিস।'

'কই দিন।' গোঁসাই হাত পাতলেন।

মালপো আর লাড্ডু প্রসাদ এনে দিলেন মাধোদাস। গোঁসাই নিজে কিছু নিয়ে বাকিটা ভক্তদের বিলিয়ে দিলেন।

'আমরা চড়ায় যাচ্ছি, আপনি আশীর্বাদ করুন।'

সাধু হাসলেন, বললেন, 'বীজ তুমিই বুনেছ, এখন গাছ হোক ফুল-ফুলুরুক, সব তোমার।'

'এই মাধোদাস কে?' জিগগেস করল মহেন্দ্র।

'আমার গুরুভাই। তিরিশ বছর ঐ নির্জনে বসে ভজন করছেন।' বললেন গোঁসাইজি, 'কোথাও যান না। কেউ ওঁর খবর রাখে না।'

গোঁসাইয়ের তাঁবুর বাইরে প্রশস্ত দরজায় লেখা হল: হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' শুধু তাই নয়, ভিতরে বেদী স্থাপন করে তার উপর বসানো হল গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ।

কীর্তন লাগাও।

কিন্তু কীর্তন কি আজ জমছে না? কারু মন কি আজ উদাসী হয়ে রয়েছে?

'ভগবানের দিকে চোখ রেখে গান করো।' বললেন গোঁসাইজি, 'আর তাঁর দৃষ্টির এক কণা করুণা যদি পাও দিক-রেখা ভেসে যাবে।

অন্যান্য সাধুরাও এসে জড় হতে লাগল।

গোঁসাইজি হঠাৎ হুঙ্কার করে উঠলেন : অবধূত! অবধূত!

অমনি কোত্থেকে এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী এসে হাজির, মুণ্ডিত মাথা, গায়ে ভস্মপ্রলেপ। এসে দু'হাত তুলে গোঁসাইয়ের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। যে যে অবস্থায় ছিল সে ঠিক সেই অবস্থায় নিস্তব্ধ হয়ে রইল। সকলের হাত পা অনড় কিন্তু খোল করতাল আপনা আপনি বাজতে লাগল। সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ বিগ্রহের মালা এনে গোঁসাইয়ের গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে মিশে গেলেন কেউ দেখল না।

গোঁসাইজি বললেন, নিত্যানন্দ প্রভু অন্তর্ধানে প্রকট হয়ে এসেছিলেন। সঙ্কীর্তনের সময় গৌর-নিতাই কী ভাবে দাঁড়াতেন সেই সচ্চিদানন্দ রূপ আমার দর্শন হ'ল।'

ক্যাপা চাঁদ অর্জুন দাস বললে, 'আমি কী জানি কেন তাঁর পা টিপে দিলাম।'

প্রথম দিনই দেখা গেল থালির উপর পড়ে আছে। কে এ? 'অসাধারণ মহাপুরুষ।' বললেন গোঁসাই, 'সারা গা থেকে শুভ্র রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে। 'দেহমুক্ত যোগচারী।'

বাইরে চেয়ারা দেখে তেমন কিছু মনে হবার উপায় নেই। কালো কদাকার কুলি মজুরের মত দেখতে। ছেঁড়া মাকলাবের টুকরো দিয়ে কৌপীন করা। জটা নেই তিলক নেই মালা নেই বিভূতি নেই—কোনো সংস্কারেরই ধার ধারে না। সম্পত্তি বলতে একটা মাত্র লোহার কড়া, তাতেই পান, আহার ও শৌচ-ক্রিয়া চলে। গোঁসাই বলেন, 'অতোম্মত পিশাচবৎ। আসলে ত্রিকালজ্ঞ। শুধু জ্ঞানমার্গে নয় রাগমার্গেও এঁর অবস্থা অসাধারণ। পরভাবের যে কোন ভাব ইচ্ছামাত্র সম্ভোগ করতে পারেন।'

গোঁসাইজির দেখা পাবার পর থেকে ক্যাপা গোঁসাইজির সঙ্গলিপ্সু। দিনমানে যেখানে থাকুক সন্ধ্যা হলেই গোঁসাইজির ডাঁবুতে বসে সে আড্ডা জমায় আর ছুটি নেয় ভোর রাতে। গোঁসাইকে দোঁহা পড়িয়ে শোনায়। রোজ প্রায় কুড়িটি দোঁহা পড়ায়, নিত্য নতুন দোঁহা, আর দোঁহার শেষ পাদে বলে, কহে অর্জুনা, শোন ভাই সাধু।

শুধু দোঁহা? যে কোনো শাস্ত্র পুরাণের একটি চরণ পাঠ করো, অর্জুন দাস আগে পিছে দশ বারোটি চরণ অনর্গল বলে যাবে।

বাঙলা না পড়েও মহাপ্রভুর সমস্ত তত্ত্ব তার জানা। 'বৈষ্ণবসাধনের কথা আপনি কী করে জানলেন?'

'ধ্যানমে মিলা।'

আর তার কী প্রেম! মানবপ্রেম—ঈশ্বরপ্রেম!

কেউ কাউকে মারলে সে আঘাত নিজ প্রাণে অনুভব করে অর্জুন দাস আর বালকের মত কাঁদে। আর সকল মানুষের মধ্যেই তার ইষ্টদেবের প্রকাশ এই উপলব্ধিতে যে, কাউকে সে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরতি করে।

একদিন ক্যাপা দেখল পোল-বরাবর বড় রাস্তা দিয়ে পুলিশ সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। কী মনে হল ক্যাপার, বড় বড় পা ফেলে ফেলে ঘোড়ার সঙ্গে ছুটতে লাগল। কী আশ্চর্য, কোত্থেকে ছুটে এসে ঘোড়ার সঙ্গ ধরেছে লোকটা, সমান বেগে চলেছে, সাহেব তীব্রতর গতিতে ঘোড়া ছোটাল। কী

অভাবনীয় ব্যাপার, লোকটাও সেই সময়ে ফিরছে। শুধু ফিরছে নয়, যেন শূন্যের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। সাহেব বিমূঢ় হয়ে ঘোড়া থামালেন। ক্যাপাটাও থামল। কী চাও তুমি? মর্মে উত্তাল সাহেব। ক্যাপা কিছু বলল না, ঘোড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আর হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাহেবের আরতি করতে লাগল।

'এ কী করছে?' পথচারী একটি ভদ্রলোককে সাহেব জিগগেস করল।

ভদ্রলোক বললে, 'এ এক পাগল।'

আরেকজন বললে, 'মোটেই পাগল নয়। এ একজন সাধু। তোমার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তির বিকাশ দেখে তোমাকে এ পূজা করছে।'

ক্যাপাটাও বালকের মত হাসতে লাগল।

সাহেবেরও মনে হল এ কখনোই পাগল নয়। পাগল কখনো ঘোড়ার সঙ্গে ছুটতে পারে! সাহেব ক্যাপাকে সেলাম করল; বললে, 'এ সাচ্চা সাধু হ্যায়—'

কিন্তু ক্যাপা গোঁসাইজির কাছে বসে কেবল কাঁদে কেন? চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়ে কাঁদে। গোঁসাইজি প্রশ্নও করেন না, চুপ করে বসে তার কান্না দেখেন। গোঁসাই যখন ইঙ্গিত করেন তখন একটু থামে আবার কতক্ষণ পরে সংস্কৃতে হিন্দিতে নানা অজানা ভাষায় স্তবস্তুতি সুরু করে। কখনো বা আরতি করতে করতে নাচতে সুরু করে। লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে: 'তাতা থাইয়া তাতা থাইয়া তাতা থাইয়া থাইয়া। বৃন্দাবনের বংশী বাজে নাচে কিষণ কানহাইয়া।'

আবার কাঁদতে বসে। বলে, তুমি আমার রামজী। তোমার সঙ্গে আমার তিন-যুগ কেটে গেল—ত্রেতা দ্বাপর আর কলি—তুমি শুধু দর্শনই দিলে, চরম কৃপা তো করলে না। আমাকে তোমার করে নাও, আর যেন পুনর্জন্ম না হয়।'

চলো বৈষ্ণবশিরোমণি রামদাস কাঠিয়া বাবাকে দেখে আসি!

কাচের কৌপীন পরেন বলে নাম কাঠিয়া বাবা। একটা বড় ছাতার নিচে সামান্য কম্বলাসনে বসে আছেন, উজ্জ্বল দেহ তপ্তাবৃত। মাথায় সরু লম্বা পিঙ্গল জটা পিঠের দিকে ঝুলে রয়েছে। শরীরে এত তেজ অথচ কত স্নিগ্ধ আভা। দুটি চোখে মমতার মাধুরী। মনে হয় যেন কত কালের কত আপনার লোক, দেখলেই মন প্রাণ যেন শীতল হয়ে যায়। প্রেমে ম্লান করে উঠে।

কাঠিয়া বাবার আর এক নাম ব্রজবিদেহী। দেহে থেকেও তিনি দেহমুক্ত।

গোঁসাই বাবাজীকে প্রণাম করলেন। বাবাজী প্রতি নমস্কার করলেন গোঁসাইকে। বসতে আসন দিলেন।

চড়ার উপরে তাঁবুর ভিতরে শুয়ে ভক্ত বলছে গোঁসাইকে, কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম!

'কোথায় ছিলে?'

'ব্রাহ্মসমাজে টানা পাখার নিচে ছিলাম এখন এই উন্মুক্ত গঙ্গার চড়ার উপরে কম্বল সম্বল করে শুয়ে আছি।'

'দেখ না আরো কতদূর যেতে হয়! কোন সর্বস্বান্তের কিনারে।' গোঁসাইজি অভয় দিলেন: 'ভগবান যার কাছে ধরা দেন তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েই ধরা দেন।'

[ক্রমশঃ]

মেয়েটি না বাঘটি

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

জনৈক বিখ্যাত গল্পলেখক একবার এক পত্রিকায় বিচিত্র একটা গল্প লিখলেন। আর সেই গল্প পড়ে পাঠক মহলে তুমুল আলোচনা শুরু হয়ে গেল। আলোচনাটা লেখকমশাই গল্পের শেষে পাঠক মহলের কাছে যে প্রশ্নটিকে রেখেছিলেন সেইটাকে নিয়ে। শেষপর্যন্ত অনেক মাথা ঘামিয়েও লোকে যখন কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারলে না তখন বাধ্য হয়েই—

না, তার আগে গল্পটা বলে নিই। নাহলে লোকগুলির কাণ্ডকারখানার মানে খুঁজে পাবেন না আপনারা। গল্পটা সত্যিই অদ্ভুত ধ'রে ফলে পরবর্তী ঘটনাগুলো গল্পের উপসংহারের মত ঘটে যেতে লাগল।

যুগটা অর্ধ সভ্যতার যুগ, যখন মানুষ পুরোপুরি সভ্য হয়ে ওঠেনি, আবার আদিম বর্বরতাও লোপ পায়নি একেবারে। গল্পটা সেই যুগের এক রাজকন্যাকে নিয়ে।

রাজকন্যা পরমা সুন্দরী, দেশে দেশান্তরে তার রূপের খ্যাতি। রাজ্যের মন্ত্রীরও এক রূপবতী কন্যা ছিল। সেই রাজ্যের যিনি সেনাপতি তিনি পূর্বে সেনাপতি অবসর গ্রহণের পর সবে কিছুদিন হল সেনাপতির পদ পেয়েছেন। তাঁর বেশ বীরত্বের এবং শৌর্যের খ্যাতি দেশব্যাপী। রাজার মনে মনে ইচ্ছা সেনাপতির সঙ্গে তাঁর একমাত্র কন্যার বিয়ে দিয়ে দেন, অর্ধেক নয়, একেবারে পুরোপুরি রাজত্বটাই যৌতুক দেবেন তাকে। মন্ত্রীরও মনে আশা যে নবীন সেনাপতির সঙ্গে নিজের মেয়েটির বিয়ে দেন। কিন্তু সে ইচ্ছার একমাত্র অন্তরায় রাজকন্যা। রাজা মুখফুটে যদিও কিছু বলেন নি কোনদিন তাহলেও তাঁর মনোগত ইচ্ছাটুকু অজানা নয় মন্ত্রীর। আরও একটা বাধা আছে। রাজকন্যা আর সেনাপতি গোপনে ভালবাসেন পরস্পরকে এবং সেনাপতির আন্তরিক ইচ্ছা যে বিয়েটা যেন রাজকন্যার সঙ্গেই হয়। এযুগে হলে নারীর কথা ছিল, কিন্তু সেযুগে রাজা হওয়ার সুযোগ থাকলে কেউ কি আর মন্ত্রী হতে চায় কখনও? মন্ত্রীমশাই জানতেন ব্যাপারটা এবং সেই কারণে আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। যদি কাণ্ডটা রাজকন্যাকে নিয়ে না হত তা'হলে একটুও ভাবনা করতেন না তিনি, কারণ রূপে রাজকন্যার থেকে তাঁর মেয়েও কম যায় না কিছু; এবং মেয়ের বিয়েতে খরচপত্র যা করবেন তিনি তার পরিমানও একটা ছোটখাট রাজত্ব কেনারই সামিল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যে গাছের ওপর খোদ রাজামশায়ের নজর রয়েছে সেখানে প্রকাশ্যে হাত বাড়ান চলবে না। খুব কৌশলে না চালালে শেষ পর্যন্ত গর্দান নিয়েই টান পড়ে যাবে হয়ত।

অথচ রাজ্যের যিনি মন্ত্রী, যিনি বাইরের বড় বড় সমস্যাগুলো জলের মত সমাধান করে দেন, সেই তিনিই সামান্য একটা ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না সেটাই বা কেমন কথা! তাই ভেবেচিন্তে মোক্ষম একটা উপায় বার করলেন মাথা থেকে। যদি সফল হন তবে তো কথাই নেই, আর যদি বিফল হন তবে কেউই দায়ে না সেনাপতিকে।

সে রাজ্যের বিচার পদ্ধতিটা একটু অদ্ভুত রকমের ছিল। রাজ দরবারে যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ হত তাদের বন্দী করে রাখা হত, এবং বছরে একবার বিচার সভা বসিয়ে সারা বছরের বিচারাধীন বন্দীদের বিচার করা হত। বিচারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দৈবের নির্দেশ মেনে নেওয়া হত।

যেমন, কোন অভিযোগিত যুবকের বিচার হলে বন্দীকে রাজামশায়ের কাছে দাঁড়িয়ে অনেক দূরে রাখা দুটি চারিদিক ঢাকা খাঁচার একটিকে বেছে নিতে হত। এই দুটি খাঁচার একটির মধ্যে থাকত যুবকটির সঙ্গে বিয়ে দিলে মানায় এমন একটি কুমারী মেয়ে এবং আরেকটিতে থাকত তিনদিনের অভুক্ত একটি বাঘ। দৈবাধীন বিচার পদ্ধতির জন্ত সকলের বিশ্বাস ছিল যে কয়েদী নির্দোষ হলে নিশ্চয়ই তার বেছে নেওয়া খাঁচাটি থেকে মেয়েটি বেরিয়ে আসবে; আর তা না হলে বাঘ।

মন্ত্রীমশাই ভেবে ভেবে এই অদ্ভুত বিচার পদ্ধতিটাকেই কাজে লাগালেন। রাজামশায়ের কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ বলতে ভয় হয় কিন্তু, না বললেও চলে না; কারণ প্রজাসাধারণের কাছে রাজকন্যার নামে বিশ্রী একটা কুৎসা রটছে। মন্ত্রী নাকি আমাদের নতুন সেনাপতির সঙ্গে গোপনে প্রেম করছেন, আর আপনি নাকি জেনেশুনেই এই অপরাধের প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

একটু একটু সত্যতার আলোক পাওয়ার ফলে রাজ্যে যেসব নতুন নতুন আইন কানুন তৈরী হয়েছিল তাতে কাজটা অপরাধের তালিকায় পড়ে, এবং নতুন আইনে রাজার নিজেরও হাত পা বাঁধা, অভিযোগ যদি হয় কারুর নামে তবে তার আইন মাফিক বিচার করতেই হবে রাজামশাইকে। অতএব অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিরুপায় হয়ে সেনাপতিকে বন্দী করার আদেশপত্র লিখে দিলেন তিনি। মন্ত্রী সেখানা হাতে নিয়ে এক টুকরো সাকলোর গাদি গোঁফদাড়ীর জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে রাজার কাছ থেকে বাইরে গিয়ে জারি করে দিলেন সেই আদেশটা।

বিচারের আগে খাঁচার মধ্যে মেয়ে রাখার সময় মন্ত্রী পরিষদবর্গ পরিবেষ্টিত রাজামশাইকে যুক্তি দিলেন, মহারাজ, রাজকন্যা মানী; তাকে তো আর খাঁচার মধ্যে রাখা যায় না। আবার দৈবের কথা বলা যায় না, যদি সেনাপতি নির্দোষ হয় তবে যে-সে মেয়ের সঙ্গেও বিয়ে দেওয়া যায় না তার, তাহলে সুবিচার হয়নি বলে কলঙ্ক হবে মহারাজের নামে। আমি মহারাজের দাস মাত্র, আমার কন্যার মান রাজকন্যার তুলনায় কিছুই নয়; অথচ রূপে গুণে মর্যাদায় সে কন্যা সেনাপতির কিছুমাত্র অনুপযুক্ত হবে না। যদি আদেশ করেন তবে তাকে এনে খাঁচার মধ্যে রাখতে পারি।

রাজামশায়ের ইচ্ছা ছিল রাজকন্যাকেই রাখবেন খাঁচার মধ্যে; কিন্তু মন্ত্রী পারিষদবর্গের সামনে এমন কৌশলে প্রস্তাবটা উত্থাপন করলেন যে তিনি আপত্তি করতে পারলেন না তাতে।

পূর্ব ব্যবস্থা মত বিরাট এক প্রান্তরে বিচার সভা বসলো। সভা লোকে লোকারণ্য। কেননা এমন বন্দীর বিচার কেউ কখনও দেখেনি এর আগে। যথা সময়ে বন্দীকে আনা হল। বন্দীর চোখে মুখে কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। সে স্থির জানে যে রাজকন্যা তাকে ভালবাসে, যেমন করে হোক কোন খাঁচায় বাঘ আর কোন খাঁচায় মেয়ে থাকবে সেটা জেনে নিয়ে সেনাপতির প্রাণরক্ষার জন্ত নিশ্চয়ই মেয়ের খাঁচাটা সে ইসারা করে বলে দেবে সেনাপতিকে। সুতরাং খাঁচা গ্রহণ করার আগে সবাই যখন সেনাপতির দিকে চেয়ে রয়েছে সেনাপতি তখন অভিবাদন করার ছলে রাজকন্যার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। কোন খাঁচায় কি থাকবে সেটা সত্যিই জেনে নিয়েছিল রাজকন্যা। সেনাপতি রাজকন্যার দিকে চাওয়া মাত্র সে প্রত্যাভিবাদনের ছলে ইসারায় ডানদিকটা দেখিয়ে দিলে। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেই সেনাপতি আর দ্বিধা না করে অনেকদূরে পাশাপাশি রাখা খাঁচা দুটির মধ্যে ডানদিকের খাঁচাটি মনোনীত করলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই খাঁচা থেকে কি বেরিয়েছিল—মেয়েটি না বাঘটি?

প্রশ্নটা নিয়ে পাঠকমহলে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল। একদল বলে—মনে রাখবেন, ঘুসটা অর্থ সভ্যতার ঘুস। এখনও দেশের লোক বর্বর যুগের নৃশংস কাণ্ডকারখানা দেখতে একেবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েনি। আরও মনে রাখবেন যে নিজের প্রেমাস্পদকে মেয়েরা যমেরও হাতে তুলে দিতে পারে, তবু অন্য মেয়ের হাতে কখনই নয়। সুতরাং রাজকন্যা যখন আগে থেকেই জানতেন যে কোন খাঁচায় কি আছে তখন খাঁচা থেকে বাঘই বেরিয়েছিল। আরেকদল লোক বললে ঘুসটা যে অর্থ সভ্যতার ঘুস সেইটাই বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। ঘুসগ্রহির সময়ে আদিম বর্বরতার আমলের মানুষের মনে দয়া মায়া প্রভৃতি মানবিক ধর্মগুলি ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিল। তা ছাড়াও স্বাভাবিক ভাবেই যাদের মন কোমলতায় ভরা থাকে রাজকন্যা সেই স্ত্রীজাতেরই মানুষ। যদি প্রেমাস্পদকে না পায় জীবনে, তাহলেও কোন প্রাণে সে তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে? বেঁচে থাকলে মাঝে মাঝে চোখে দেখাটাও তো দেখতে পাবে। আরও একটা কথা, সেনাপতিকে যদি বাঘে খায় তবে রাজকন্যার গুপ্ত প্রণয়ের কথাটা প্রমাণ হয়ে গেল। সুতরাং রাজকন্যা যখন কোন খাঁচায় কি আছে সেটা জেনেশুনেই ইসারা করেছিল তখন খাঁচা থেকে মেয়েটিই বেরিয়েছিল।

কিছুতেই যখন তর্কের মীমাংসা হয় না, তখন বাধ্য হয়েই লেখকের শরণাপন্ন হতে হল। একদল লোক গেল লেখক মশায়ের কাছে প্রশ্নটার উত্তর জানতে। লেখক মশাই কিন্তু কৌশলে এড়িয়ে গেলেন এদের। সাধারণ লোক যখন হার মেনে গেল তখন আসরে নামল সাংবাদিকরা। তাঁরা লেখককে একটা ডিনার পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেন। লেখক যখন খেতে বসলেন তখন তাঁর সামনে দু'ডিস পুডিং রাখা হল, একটা ডিসের পুডিং একটা মেয়ে পুতুলের মত দেখতে; আরেকটা ডিসের পুডিং এর আকার একটা বাঘের মত। লেখকমশাই বুঝে ফেললেন এদের উত্তর জানবার কৌশলটা, এবং বুঝেই নির্বিবাদে দু'হাতে দুখানা চামচ চালিয়ে একসঙ্গে শেষ করে ফেললেন দুখানা ডিসের পুডিং। অতএব এ কৌশলও ব্যর্থ হল। এরপর সহরের অনেক গণ্যমান্য লোক এলেন লেখকের কাছে। এবারে আর এড়াতে না পেরে লেখক একটা সর্ত রাখলেন তাঁদের সামনে। সর্ত হল এই যে, তিনি তাঁদের আরেকটা গল্প বলবেন এবং তারপর একটা প্রশ্ন করবেন, যদি তাঁরা সেই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর দিতে পারেন তবেই লেখক মশাই বলে দেবেন খাঁচা থেকে মেয়ে বেরিয়েছিল না বাঘ বেরিয়েছিল। নতুন একটা গল্প শোনার লোভে লেখকের সর্তে সহজেই রাজী হয়ে গেলেন সকলে। লেখক তখন শুরু করলেন নতুন গল্পটা।

এক রাজপুত্র ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। নানান রাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে এক রাজ্যে গিয়ে সেখানকার রাজবাড়ীর অলিন্দে দাঁড়ান একটি মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। মেয়েটিও মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাঁকে। রাজপুত্র এরপর সেই রাজ্যের রাজার কাছে গিয়ে অলিন্দে দাঁড়ান সেই মেয়েটির পাণি প্রার্থনা করলেন। রাজামশাই ছদ্মবেশী রাজপুত্রের প্রার্থনা শুনে চটে গিয়ে বললেন, কে হে বাপু তুমি যে প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তঃপুরের একটি মেয়েকে তুলে দেবো তোমার হাতে? রাজপুত্র তখন নিজের পরিচয় দিলেন। পরিচয় শুনে রাজা মশাই ক্রোধ সম্বরণ করে গম্ভীর হয়ে বললেন, একমাস পরে রাজকীয় পরিচয় পত্র নিয়ে এখানে এস। সেইদিন বাইরের লোকের পক্ষে রাজবাড়ীর যেসব মেয়েদের দেখতে পাওয়া সম্ভব তাদের সবাইকে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে তোমার সামনে। প্রথমে একবার সকলের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হবে তোমাকে

যাতে সকলকেই দেখবার সুযোগ পাও। তারপরে বিনা দ্বিধায় তুমি যাকে দেখেছ সেই মেয়েটিকে দলের মধ্যে থেকে বেছে নিতে হবে। যদি তা পার তবেই তোমার সঙ্গে সেই মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হবে, আর না পারলে প্রাণদণ্ড। এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে ভেবে দেখ কি করবে।

ভেবে আর কি দেখবেন রাজকুমার, যে মুখ দেখেছেন তিনি সে মুখখানি চক্ষু মুদলেই মনের আকাশে শুকতারার মত জলজল করে উঠছে, সাজার মেয়ের মধ্যে মিশিয়ে দিলেও ঠিক চিনে নেবেন তাকে। অতএব এক মাস কোনমতে বাড়ীতে কাটিয়ে আবার গিয়ে হাজির হলেন সেই রাজার কাছে। রাজা মশাই কথামত রাজপুত্রের দেখা সুন্দরীকে সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করলেন। সনাক্ত-করণে এসে দাঁড়াল দুই সারিতে হুবহু একই রকমের সাজপোষাকপরা কুড়িজন করে চল্লিশজন সুন্দরী মেয়ে। রাজকুমার ধীরে ধীরে সুন্দরীদের সামনে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন, পিছনে চলল খোলা তরোয়াল হাতে ঘাতক যাতে রাজকুমার মুহূর্তমাত্র না ভুলতে পারেন যে একবার সবাইকে দেখার পর বিনা দ্বিধায় সেদিনকার দেখা মেয়েটিকে বেছে নিতে না পারলেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। কয়েকটি মেয়েকে অতিক্রম করার পরেই রাজকুমারের কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল, কি আশ্চর্য সব কটিকেই যে একই রকম দেখতে! তাহলে উপায়? হঠাৎ মনে হল ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন বোধহয়! প্রথম সারির ভাবলেশহীন মেয়েগুলির মধ্যে একটি মেয়ের চোখেমুখে যেন একটু হাসিহাসি ভাব দেখলেন রাজকুমার। মনে হল মেয়েটি যেন চোখের ভাষায় আহ্বান জানাচ্ছে, এই, চলে যাচ্ছ কেন, আমাকে কি চিনতে পারছ না? কিন্তু সব মেয়েগুলিকে না দেখে কিছু করবেন না বলে ঠিক করলেন রাজকুমার। দেখতে দেখতে দ্বিতীয় সারির সুন্দরীদের সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছেন তখন একজনের চোখে মুখে যে স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠল বলে মনে হল, মনে হল সে যেন বলতে চায়, করছ কি সরে যাচ্ছ কেন, আমাকে কি চিনতে পাচ্ছ না, প্রাণটা যাবে যে এখনি! সবাইকে দেখা শেষ করে মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে লাগল রাজকুমারের, এইবার আর মুহূর্তমাত্র দেরী না করে বিনা দ্বিধায় দেখিয়ে দিতে হবে এদের মধ্যে কোন মেয়েটিকে দেখেছিলেন সেদিন, নতুবা মৃত্যু অনিবার্য। এটুকু রাজকুমার ধরেই নিলেন যে সেদিন তিনি হয় ওই হাস্যমুখী মেয়েটিকে দেখেছিলেন না হয় ওই বিরক্ত মেয়েটিকে; কিন্তু কোনটিকে? হঠাৎ হাসি আর বিরক্তির আর একটা করে অর্থও ঝিলিক দিয়ে গেল রাজকুমারের মনের মধ্যে,—রাজকুমারের জীবনসঙ্কট, বিপদে হাস্যমুখী মেয়েটা হয়ত বেশ একটা মজার গন্ধ খুঁজে পেয়েছে যার সকৌতুক প্রকাশ ওই হাসির মধ্যে দিয়ে হয়েছে; আর যে মেয়েটা বিরক্তি দেখিয়েছে সে হয়ত এইভেবে বিরক্ত হয়েছে যে, যে লোক সামান্য একটা মেয়ের জন্য নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সে রকম একটা অপদার্থ লোকের গলায় শেষ পর্যন্ত বরমালা পরাতে হবে হয়ত। হাসি আর বিরক্তির সমর্থনে যুক্তিগুলো রাজকুমারের মাথার মধ্যে সবকিছু গোলমাল করে দিলে যেন। অথচ ভেবে চিন্তে কাজ করার মত সময়ও নেই হাতে। হঠাৎ কি একটা কথা ভেবে মনের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রাজকুমার দেখিয়ে দিলেন ওই দুটির মধ্যে একটি মেয়েকে।

কে সেই মেয়েটি? লেখক প্রশ্ন করলেন গল্পের শেষে। প্রশ্ন শুনে শ্রোতারা যখন চিন্তায় বিভোর লেখক মশায় তখন চুপিচুপি উঠে গেলেন সেখান থেকে। কেননা, একথা তিনি স্থির জানতেন যে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ কোনদিনই দিতে পারবে না।

কোম্পানী আমলের কাহিনী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রামবাংলায় ডাকাতি

[গত সংখ্যায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় নামে যে পুরানোকালের পুলিশ কর্মচারীর কথা লিখেছিলাম, তাঁর সম্বন্ধে খবর নিয়ে জানা গেল, রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষরা সুতানটি গোবিন্দপুরের লোক ছিলেন, অর্থাৎ কলকাতার পত্তন হবার আগে থাকতেই তাঁরা এই নগরের বাসিন্দা। তালতলায় ছিল তাঁদের বাস।

শতাধিক বছর আগেও তাঁরা সব ইংরেজিনবিশ ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরেই রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় পুলিশের কাজে যোগদান করেন এবং তিরিশ বছর যোগ্যতার সঙ্গে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করেন। তারপর সেই সময়কার প্রচলিত বাংলায় তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী রচনা করে পাঠকদের উপহার দেন। এই সংখ্যায় তাঁর লেখা আরও দুটি কাহিনী পরিবেশন করা হল।]

॥ এক ॥

কাটোয়া সব-ডিভিশনের মধ্যে রায়েশ্বরবাটী গ্রামের নবীন মামার বাটীতে পৌষমাসের শেষে একরাত্রিতে ডাকাইতি হয়। ডাকাইতেরা লোহার সিন্দুকের চাবির নিমিত্ত নবীন ও তাহার পরিজনের উপরে বড় অত্যাচার করে। অস্ত্র ও জলন্ত মশাল দিয়া যাতনা দেয় এবং অনেক বন্ধকী সহনাপাতি নগদ টাকা পয়সা লুটতরাজ করে। নবীনমামার সোনাদারী দোকান ও লবণের ব্যবসায় আছে। তাহার ঘরের পশ্চিম-উত্তরে আন্দাজ ৭।৮ রসি তফাতে গঞ্জের মধ্যে দোকান। মূল্যবান সামগ্রী দোকানে রাখিত না। নিজ বাটীতেই রাখিত। কাঁচা ঘর, কিন্তু বিলক্ষণ শক্ত ও ঘেরাঘোরা বটে। বাটীর দক্ষিণেই একটি নূতন পুষ্করিণী। তাহার পাড়ে নূতন বাবলা গাছের বন। গরু চরিতে যাইবার যো নাই। পশ্চিমে অনেকের বাস। চালে চালে বসতি। পূর্বে এবং উত্তরে খানিক দূর পর্যন্ত কতকগুলা শিমুলের ছোট বড় গাছের জঙ্গল। লতা সকল শিমুল গাছের ডালে উঠিয়া ঐস্থান একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। নবীনের সদরের সম্মুখে উত্তর দিকে দশ বার কাঠা খালি জায়গায় উত্তরে ও পূর্বমুখে একটি রাস্তা গিয়াছে এবং ঐ রাস্তার কিয়দংশে উত্তর পূর্বে এক বৃহৎ বাওড়। বর্ষাকালে নদীর জল উঠিয়া বাওড়ে প্রবেশ করে। উত্তরে রাস্তার কোণে দক্ষিণদ্বারী একটি নূতন মুদিখানার দোকান হইয়াছে। দোকান ভালরূপে সাজান হয় নাই। ঘরের মধ্যে বাঁশের মাচা বাঁধা হইয়াছে। নবীনের সদর ও নূতন দোকানের দুয়ার প্রায় মুখ মুখ। ডাকাইতের তদারক নিমিত্ত প্রথমে সব-ইন্সপেক্টর, হেড কনষ্টেবল প্রভৃতি গিয়াছিল পরে ইনসপেক্টরও জুটিয়াছিল, বোল

দিবস অতীত হইয়া গেল কোন সন্ধান পাওয়ার কথা জানা গেল না। সতের দিনের দিন সাব-ডিবিশনের ডেপুটীবাবু ঘটনাস্থান এবং পুলিশের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিতে আসিলেন, অপরাহ্নে তিনি গ্রামে পৌঁছিলেন। কথিত নূতন দোকানের পূর্বদিকে পাল্কি রাখিয়া নবীন মাষ্টার বাড়ী ঘর এবং যেখানে লোহার সিন্দুক মাটিতে গাড়া ছিল তাহা দেখিতে লাগিলেন এবং পুলিশ অফিসরদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহারা তখন গ্রামের মধ্যে ও পড়শীগ্রামে সন্ধান নিষিত্ত গিয়াছিল। ডেপুটীবাবু নবীনের বাড়ী এবং তাহার দক্ষিণের খিড়কী পুষ্করিণী পশ্চিমে পড়শীদের সদর বাড়ী সকল দেখিয়া এবং নূতন দোকানদারের সঙ্গে দুই চারি কথা কহিয়া পাল্কির নিকটে আসিলেন। রাস্তার উত্তরাংশে বাঁশঝাড়ের ধারের কতক মাটি কাটিয়া নূতন দোকানদার আপন ঘর তয়ার করাইয়াছিল এবং যে স্থান হইতে মাটি কাটান হইয়াছিল তাহা বেশ পরিষ্কার দেখাইতেছিল। সূর্য নামিয়া পড়ায় শিমুলগাছ সকলের বিস্তীর্ণ ছায়া ঐ মাটিকাটার জায়গায় পড়িয়াছিল। তথায় পাল্কি নামাইয়া ডেপুটীবাবু দক্ষিণমুখে বসিলেন। দেখিলেন অদূরে একটি ভগ্ন দেবালয়। দেবালয়ের সম্মুখে এক ভগ্ন নাট-মন্দির। তাহাতে অনেক অশ্বত্থ গাছ বাহির হইয়াছে এবং জঙ্গলের সাঁতাসকল দেবমন্দির আচ্ছন্ন করিয়াছে। ডেপুটীবাবু পুলিশ অফিসরদিগের প্রতীক্ষায় পাল্কিতে বসিয়া পড়িলেন। বেহারা প্রভৃতি সকলের নূতন দোকানদারের নিকটে গিয়া গুড়ুক টানিতে লাগিল। ডেপুটীবাবুর নিকটে জনপ্রাণী ছিল না। তিনি দেখিলেন একটি পয়সা ভগ্ন নাটমন্দিরের দিক হইতে গড়াইয়া আসিয়া রাস্তার নীচে ঘাসবনে পড়িল। কিয়ৎক্ষণ বাদে আবার একটি পয়সা গড়াইয়া নিকটে আসিল। তিনি পাল্কি হইতে বাহির হইয়া ভগ্ন দেবালয়ের নিকটবর্তী স্থানে বেড়াইতে বেড়াইতে অনেকগুলি পয়সা এখানে সেখানে ছড়াইয়া আছে দেখিতে পাইলেন। ইতিপূর্বে ২।৪ পসলা বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার ধারে ধারে ঘাস জন্মিয়াছিল। পাল্কিতে আসিয়া এই ডাকাইতির প্রথম এত্তেলার সঙ্গে যে মাল তালিকা ছিল, তাহাতে ৩৯ টাকার পয়সা লুঠ হওয়ার কথা জানিলেন। বেলা শেষে ইনস্‌পেক্টর প্রভৃতি আসিলেন। ইনস্‌পেক্টর ইংরাজীওয়ালা। তাঁহার সঙ্গে ইংরাজীতে দুই চারি কথার পরে ডাকাইতির কোন সন্ধান হয় নাই শুনিয়া ডেপুটীবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। অনেক টাকার পয়সা চুরি যাওয়ার সম্পর্কে কথা কহিতে কহিতে ডেপুটীবাবু দুই একটা বাঁশের সিঁড়ির যোগাড় করিতে পুলিশকে আদেশ করিলেন এবং ইনস্‌পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া ভগ্ন নাটমন্দিরের নিকটে বেড়াইতে বেড়াইতে ঘাসবনে পয়সা ছড়ান থাকা দেখাইলেন। কোন সুরাগ পাইয়াছেন কি? সিঁড়ি লইয়া কি হইবে? ইনস্‌পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন। কোন মর্ত্যলোক তাঁহার সুরাগ পাওয়া নহে, এই ভগ্ন-দেবালয় সন্ধান দিতেছে বলিতে বলিতে ডেপুটীবাবু আসিয়া অবধি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা কহিলেন। এই সময় মধ্যে দুইটা সিঁড়ি আসিল। ভগ্ন নাটমন্দিরে সিঁড়ি লাগাইয়া দেখা গেল, ছাদ ফুটিফাটা হইলেও তাহার স্থানে পয়সা চালা আছে এবং মন্দিরে যে অশ্বত্থ গাছ সকল জন্মিয়াছে, তাহার শাখা প্রশাখা বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইলে কাটা দিয়া পয়সা ঠেলিয়া ফেলিতেছে। সিঁড়ির একটা নূতন দোকানদারের দোকান হইতে আনা হইয়াছে, জানিয়া ডেপুটীবাবু বলিলেন—এই সিঁড়িটি দিয়াই ডাকাইতেরা ঘটনার রাত্রিতে যে নাটমন্দিরের ছাদে পয়সা ঢালিয়াছিল তদ্বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। পরে পুলিশ অফিসরদিগকে নূতন দোকানঘরে লইয়া ডেপুটীবাবু বলিলেন, ঘটনার রাত্রিতে এই দোকানঘরের মধ্যে মাচার

শয়ন করিয়াছিল এবং ডাকাইতি হওয়ার সময়ে সে জাগিয়াছিল বলিয়া দোকানদার কিয়ৎক্ষণ পূর্বে তাহার নিকটে স্বীকার করিয়াছে; মাচায় বসিলেও নবীন মামার সদর পর্যন্ত বেশ দেখা যায়। পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিয়া ডাকাইতদিগের যাতায়াত হয় নাই; নূতন দোকানের সম্মুখ দিয়াই উহাদের সমুদায় কার্য্য হইয়াছে স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে; এই সকল অবস্থায় নূতন দোকানদার যে কোন সন্ধান দিতে অপারক এরূপ বোধ হয় না। এই সকল কথা বলিয়া ডেপুটিবাবু তাঁহার পাল্কির নিকটে যাইলে নূতন দোকানদার বেগে গিয়া তাঁহার নিকটে পড়িয়া গেল এবং ভৈরব ডোম প্রভৃতি কয়েকজন ডাকাইতের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাতে বড় শাসন করিয়াছে, দোকানে আগুন লাগাইয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে, ডাকাইতির সময়ে ভৈরব তাহার সিঁড়ি লইয়া গিয়াছিল ইত্যাদি সত্য কথা বলিতে লাগিল। যাহাদের নাম প্রকাশ হইল পুলিশ তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইল। ডেপুটীবাবুকে ঐ রাত্রিতে তথায় থাকিতে হইল। যে বাটীতে তাঁহার বাসা হইল তাহার উত্তর পূর্বে একটি বৃহৎ বাঁশবন। রাত্রি দুই তিনদণ্ড সময়ে ডেপুটীবাবুর একজন বেহারা আবশ্যকীয় কার্য্য নির্বাহ নিমিত্ত বাঁশবনে গিয়াছিল, দেখিল—উত্তর দিক হইতে একটা লম্বা জোয়ান আসিয়া বন-মধ্যস্থিত এক ডোবায় নামিল এবং জলে কি যেন রাখিয়া দিল। বেহারা উঠিয়া লোকটাকে ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অপর বেহারারা অস্ত্রশস্ত্রসহ দৌড়িল। দুইজন চৌকীদার এবং একজন কনেষ্টেবল অপর এক আসামীকে লইয়া নিকট দিয়া আসিতেছিল, তাহারাও গোল শুনিয়া বনে গিয়া দেখিল ভৈরব ডোমকে ধরা হইয়াছে। উহার কাপড় ভিজা, হাতে পাঁকের গন্ধ। জলের মধ্যে একখানা মাতা-ঘুরানী জাল পাওয়া গেল। মাল তালিকায় এই জাল লেখা ছিল। ভৈরব ডোম বয়েস খানাসী পুরান পাপী। সে নিকটে অপর চোরাই জিনিস রাখে নাই। মাছ ধরার বাই থাকায় জালখানির মায়া ছাড়িতে পারে নাই, নাম প্রকাশ হওয়ার কথা শুনিতে পাইয়া জালখানি তফায়ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

দুইটি পয়সা পড়ার সূত্র অবলম্বনে অল্পক্ষণ মধ্যে একটি বৃহৎ ব্যাপার আবিষ্কৃত হইল।

॥ দুই ॥

জিলা নদীয়ার মধ্যবর্ত্তী ধনপুর গ্রামের তিলক দত্তের বাটীর অনতিদূরে বাঁধা বকুল গাছের তলায় একটি বৃদ্ধ বসিয়া জাল বুনিতেছিল। বয়স প্রায় ৭০ সত্তর। শরীর শক্ত ও সবল। বর্ণ কোকিলের মত কাল। চক্ষু দুইটি কুঁচের মত লাল। মাথার সম্মুখের কেশ পাকা ও সাদা। বেলা ২।৩ দণ্ড হইয়াছিল। পরাণ কোলে নামক এক ব্যক্তি আসিয়া "খাঁয়ের পো! কতক্ষণ?" বলিয়া বৃদ্ধকে সম্ভাষণ করিল। বৃদ্ধের নাম রামতনু খাঁ। সকলে "খাঁয়ের পো" বলিয়া ডাকে। উহাদের কথাবার্ত্তা সময়ে কাসীম সেখ, কিনু বোষা, সদয় সর্দ্দার, ষষ্ঠো গোয়ালা এবং সাগর বাগদি ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিল। সাগর ও ষষ্ঠোর বগলে এক একটা শুণ ধলে ছিল। ষষ্ঠো গোয়ালা বলিল, "খাঁয়ের পো! রকম সকম কি বল দেখি? হেঁটে হেঁটে ত পায়ের তলা উড়ে গেল! আষাঢ়ের শেষ; ঘরে ভাত নাই, আজ না কাল করে কেবল দম দেয়, বাবুও দেখেও দেখেন না।" সাগর বাগ্দি বলিল, "তাহারও ঐ দশা; ঘরে কিছুমাত্র নাই; আজ ধান দিবার কথা আছে, কিন্তু বাবু ত এখনও কাছারীতে বসেন নাই।

সরকার মহাশয় বসে কেবল কাগজ ঘাটছেন, আমি এই দেখে এলাম।" ঝড়ো বলিল, "খাঁয়ের পো! তোমাকে বারবার বলেছি, এবারেও বলছি আমরা ইহার পর মোটঘাট এ তিলকে বেটার বাড়ীতে আর কখন আসবো না; আজ যদি আমায় ফেরায়, তবে দেখবে অল্প দিনের মধ্যে এ বেটার ভুঁড়ি তরমুজ হাসানো করবো।" সদর সর্দার বলিল, "সত্য বটে; তিলকবাবুর ভুঁড়িটি দেখতে দেখতে বেড়ে উঠলো।" কিন্তু ঘোষা বলিল, "দশ মাসে মেয়েদের পেট কত বড় হয় খবর রাখ? এ যে দশ বৎসরের অধিক হবে, তোমরা ও অঞ্চলের লোকেরা কত ঘর মেয়ে এনে এই তিলকবাবুর পেটেই চালচো তার হিসাব রাখ? লোকে বলে কুড়ি আর ভুঁড়ি কিছু অমিলেই বাড়ে।" ঝড়ো বলিল, "যা করেচি তা করেচি, পাঁচ পুকুরের জল এক জায়গায় করেচি, এখন একদিন এক চুমুক মেরে সব শুষে নেব।" পরান কোলে একটু মুচকি হাসিয়া এবং তিলকবাবুর বাড়ীর দিকে আঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখছিস! দু'তালা, তিনতালা উঠেছে; চুমুক মারবার ঘাট কই?" ঝড়ো বলিল, "কি বাড়ী দেখাচ্ছিস? গুরপুরের ময়রাদের অন্দর বাড়ী দেখেছিলি? সেখানে ত এই ঝড়ো না হলে কাজ চলে নাই। সদর দেউড়ি ও পাকা ছাদ মারবে ঝড়ো; দামি মাল আনবে ঝড়ো; ভাগের বেলায় কিছুই না, চাষী চাষী ধান দিতেও কত গোল!" কাসীম সেখ বলিল, "তুই দামি মাল চাস না কি? খলর ধান চাষ করে; খেতে পায় কি না, খড় আর কুঁড়ো।" সদর সর্দার বলিল, "ঝড়ো হাসাকে লয়ে তামাসার কথা নয়ে, সত্যই বলচি আমাদের পরামর্শ হয়েচে, বাবু যদি আমাদের আবশ্যক মত ধান চাল আগে যেমন দিতেন, এখন আর না যেন, তবে এক রাত্রিতে সকলে মিলে বেটাকে দেখতে হবে। খাঁয়ের পো! তুমি একটু মনোযোগ কর, সকলে মিলে বাবুকে বলবে চল; মহাজনের কাছেও পাই না, এখানেও পাই না; চলে কেমন করে বল দেখি?" কিন্তু ঘোষা বলিল, "তোমাকে মহাজনের নিকটেও যেতে হয় না কি?"

"তোর কিরে? তুই ঘোষার ছেলে! তোর ত একটা লোক দেখান ব্যবসা আছে। আমার ও ঝড়োর যে পুলিসের কাছে জোসনাম বড়, দুইজনের তদারক হয়; দুই জনেরই এক মহাজন; প্রথমে পুলিসকে ঠকাবার নিমিত্ত নামে একটা মহাজন করেছিলাম, যেমন নিতাম, তেমন শোধ দিতাম, এখন ত আর মহাজনের কড়াগণ্ডা দেওয়া হচ্ছে না, এখান হইতে রসের যোগান ছিল তাও ত প্রায় বন্ধ হয়ে এল দেখচি।" কাসীম সেখ খানিক নীরব থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "খাঁয়ের পোর সঙ্গে পরামর্শ করে তোদের যেটা সব কাজই হবে দেখচি। ইনি ত কথা কচ্চেন না। বেটা, বুড়ো হয়েছে, সেকেলে লোকও গেছে; তোদের মত এ বেটার ভাবনা চিন্তাও নাই; ভাগের সময়ে আপনি, আপনার ছেলে, জামাই, সম্বন্ধী প্রভৃতির ভাগ মারেন। এর সঙ্গে পরামর্শ করলে কাজ হবে না।"

রামচন্দ্র খাঁ বলিল, "সেখের পো! কি কথা বলবো? কাজের কথা হলে উত্তর দিতে পারি। ছেলে-ছোকরার মত, কত এলোমেলো কথা বলচে, বলুক। আসল কথা কি জান? তোমাদের মত অনেক লোককে তিলকবাবুর দিতে খুতে হচ্ছে। হাতী পোষা আর খোরাক যোগান সোজা নয়। বাবুর মেজাজও এখন গরম দেখা যায়। আমরা পাঁচজনেই গরম করে তুলেছি, তবে আজ সবাই মিলে বলবে চল, পরে যা হয় পরামর্শ করা যাবে। সকল দিকে এখন সাবধান হওয়া চাই। হাওয়ার দাজার জিহ্বা জেনো। আগে পেটের দায়ে ১০।১২ কোশ পথ চলে রাতারাতি লোকের ঘর মেরে আনতে হতো। পথে চলবার সময়ে লাঠির উপরে ভর দিয়ে লাফ মেরে মেরে যেতে হতো। কাঁধা ঘোকড়ার

মাল বেঁধে আনতে হতো। এখন বিলাতী দেশলাই ও রেশমের চলন হয়েছে। ডাকাইতি ত এখন সখের কাজ হয়েছে। কলিকাতা এখন কনেষ্টবলময় হয়েছে। জেলখানাও ত এখন শ্বশুর বাড়ী হয়েছে। রেলে চড়; বিলাতি ব্যাগে মাল ভর; যেখানে ইচ্ছা পাড়ি মার; হাট বাজারে মাল ছাড়; এখন আর এ রকম বাবুদের খোলামুড়ি করতে ইচ্ছা যায় না। এ সকল বুঝি; কিন্তু এ কাজও বড় ঝোঁকের কাজ। এখন পুলিসের বল বেশী। সকলে মিলে গেলে চলে না। তুমি আমি গেলেও কাজ হয়না। সকলের বিশ্বাস কোথায়? ডাকাইতি বে খারাপ জিনিষ। কাজ খারাপ! সকলের মনও খারাপ। খারাপ হবার কথা। যারা লোকের ঘর মারতে পারে, তারা কি আপনার দলের লোককে ঠকাতে পারে না? বাজারে বেচে বেড়ালে জিনিসের দর হয় না। কম দামে দিলেও লোকে সন্দেহ করে। আর বুড়ো হয়েচি, রোক কমেচে বলে যা বলচো, তা নহে। যেমন জোর কমেচে, হিসাব বেড়েচে। ওয়াকফ্ সাহেব যখন আসিষ্টাণ্ট, যখন পাকা ম্যাজিষ্ট্রেট, পরে যখন ডাকাইতি কমিশনার তখন তাঁকে দেখেচি। যেমন যাত্রার সঙ্, তেমন কখন চোর, কখন ডাকাইত, কখন গোয়েন্দা, সেজে দিনে রেতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেচি, তিনি কি আমার আসল রূপ বুঝতে পেরেছিলেন? যেমন লাল নীল পাগড়ীওয়ালা পাহারাওয়ালা নহে। এখন সাদা কাপড়ে বাবু সেজে কত পুলিস লোক বেড়াচ্চে তার কেউ ঠিকানা রাখ? এখন অনেকে দুই একটা কাজের পরে সর্দ্দার সেজে দাঁড়াচ্চে, তেমন মারাও পড়েচে, কাজেই দেখে শুনে রোক কমাতে হচ্চে।"

সদর সর্দ্দার বলিল, "বুড়োর রোক তেমনই আছে, কমে নাই। এক সময়ে বুড়ো নাকি একলাই এক ডাকাইতি করেছিল শুনেচি।"

কালীম জিজ্ঞাসিল "খাঁয়ের পো! রকমটা কি হয়েছিল শুনতে পাই না? বলিতে বলিতে বাবুর বাড়ীতে চল।"

রামতনু বলিল, "তোমরা তাকে ডাকাইতি বল, আর যা বল, একলাই তা করেছিল সত্য। বলাগড়ের সেই বড় ডাকাইতির কথা কি তোমাদের মনে আছে? তাতে আমার নাম প্রকাশ হয়। তাতেও কিছু হতো না, তবে দুষ্ট মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে এই একবার আমায় ফেরে পড়তে হয়েছিল। তখন আমি তরি জোয়ান। সর্দার স্ত্রী ছাড়া তাহার মুন্সকীকে রেখেছিলাম। পুলিস এই দুই জনীকে হাত করে আমার ঘরে। নষ্ট মেয়ের সন্ধান আসল সন্ধান বুঝবে। এ জেল সে জেল করে শেষে পাঁচ বৎসরের পরে মুরশিদাবাদের জেল হতে খালাস পাই। তখন খালাসের পরে কয়েদিদিগকে পথ খরচ দেওয়া কিংবা পুলিসের হেফাজতে পাঠাইবার নিয়ম ছিলনা। খালাসের সময়ে হাতে সাতটি মাত্র পয়সা ছিল। জেলে একজন হিন্দুস্থানী কয়েদির গাঁজার যোগাড় করে দিয়েছিলাম, তাতে ক্রমে সাতটি পয়সা পেয়েছিলাম। পথে আসতে আসতে নদীর ধারে একটা নূতন গঞ্জ হতেছিল দেখলাম। জায়গার নামটা মনে হয়না। মুসকলাই ও চিনির কারবার বেশী। রোজ নগদ খরিদ বিক্রী দেখেছিলাম। টাকার ঝনঝনানি রাতদিন। দেখে মন খারাপ হল। ভাবলাম পাঁচ বছর পরে শুধু হাতেই বা ঘরে যাব কেমন করে? সেদিন সেখানে থাকলাম এবং খুরে খুরে রকম সকম দেখলাম। পরদিন নদীর ধারে মড়া শ্মশান হতে নেকড়া কাথি নূতন গাছের ঝেরা হতে বাঁশ তুলে ও খানিক তেল কিনে কয়েকটা মশাল বাঁধলাম।

আমার কপাল গুণে ঐ দিন সন্ধ্যার সময়ে সামান্য মেঘ ও খানিক টিপ টিপ বৃষ্টি হয়ে গেল। মহাজনেরা আপন আপন দোকানে বসে খোকড় মিলাতে লাগলো। এখানে সেখানে গাছের বেরার উপরে কয়েকটা অলক্ত মসাল গেড়ে, গাদাগাদি ঝেড়ে, কয়েকবার দৌড়াদৌড়ি করলাম, একটা বাঁশের বাঁশ টানিয়া কাহার দোকানে লাঠি, কাহার দোকানে ইট ছুঁড়িয়া মারলাম এবং এক দোকানে টাকার শব্দ শুনিয়া বেগে ঢুকিলাম, দেখলাম একজন তক্তপোষে টাকা ঢেলে গনতেছে। একটা বাটখেরা তুলে তার মাথায় এক আঘাত মারলাম। সে কাবু হয়ে পড়লো। আমি কতকগুলো টাকা আঁচলে ভরে এবং সম্মুখের মসালটা তুলে নিয়াতে নিয়াতে দৌড়ালাম। নিকটে এক আকের ক্ষেতে ঢুকে টাকাগুলী বাঁধতে ছিলাম, এমন সময়ে কয়েক জনা লোক এইদিগে, আকক্ষেতে এক বেটা ঢুকছে বলে গোল করে আসতে লাগলো। আমি চীৎকার শব্দ করে বেরুলাম, বললাম ওরে! তোরা পশ্চিমে যা আমি এই শালাদিগকে নিকাস করে যাচ্ছি, এই বলে বাঁশের তাড়াটা ধরে মসাল ফুঁকে বন্দুকে লাগাবার মত ধরলাম। আক গাছের জলে তাড়াটা ভিজেছিল, আলোতে বন্দুকের মত চকচক করায় সকলে ধড়াধড় শব্দে পড়তে লাগলো। আমি পালালাম। এতে প্রায় দুশোটাকা মেরে এনেছিলাম।"

শ্রাবণ মাসের এক রাত্রি প্রায় দুই প্রহর সময় সোনাবাড়ির দাওয়ায় তিলকবাবু একটি চামড়া মোড়া মোড়ায় বসিয়া আছেন। নিকটে মুক্ত সর্দার ফুসফাস শব্দে কি বলিতেছে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টিপাত নাই। দাওয়ার এক পার্শ্বে একটা হাঁড়িতে ঘসী ও তুষের আগুন আছে। তাহার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। সোনাবাড়ীর সদর দুয়ার বন্ধ। খানিক পরে খিড়কি দুয়ারে "খট" শব্দ হইল। এবং দুইটি জোয়ান ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। মুক্ত সর্দারের সঙ্কেত অনুসারে ঐ দুয়ার বন্ধ করা হইল। ভীমা ও নয়না সর্দার আসিয়া বাবুকে প্রণাম করিল। বাবু উহাদিগকে নিকটে বসিতে বলিলেন। নয়না বলিল "হুজুর। মুক্ত সর্দারের নিকটে সকল কথা শুনেছি। তা, যা ঠাউরেছেন তা ঠিক। বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছে। তা কোন চিন্তা নাই, আমরা আপনার সব কাজ আজাম করবো।" ভীমা বলিল, "কাঁটা বাঁশের ঝাঁড় কতক ছাঁটা গেলেই ভাল, বাকিগুলো বাড়িতে পারে।" নয়না বলিল, "আমাদের মোটা রকম বকসিসটার কথা যেন মনে থাকে।" মুক্ত সর্দার বলিল, "শুধু তা নয়, এই কর্ম্মের পরে আমার ও নয়নার নামে থানায় রিপোর্ট করে বেউড়িতে দরওয়ান রাখিতে হবে; এক এক জোড়া রূপার মোটামোটা বালা হাতে আমরা যদি বেউড়িতে বসিয়া থাকি তবে ইন্দ্র চন্দ্রেরও গতিবিধি থাকবে না দেখবেন। বিশেষ এই কাজের পরে আপনার উপরে অনেকের রাগ হবার কথা।"

তিলকবাবু।—রাগের কথা কি বলতেছ! সেদিন ঝড়ো ঘোষ, কালীয়, খাঁয়ের পো প্রভৃতি আমাকে বড় শক্ত শক্ত বলেছে; এক রকম তয়ও দেখাইয়াছে।

নয়না।—ভাল কথা হুজুর। এই খাঁয়ের পোকে রেহাই দিতে হবে। সে আপনার মঙ্গলকারী নয়।

তিলকবাবু।— না না! সেটি হবে না। খাঁয়ের পো আসল বদমাস। ওর মুখচোখ দেখে ভয় হয়। কথা কম কয় সত্য কিন্তু যা বলে তা ওজাদি ধরণের কথা। সেই বেটা ত সকলের গুরু।

মুক্ত।—খাঁয়েরপো গেলে আমরা উপায়বুদ্ধি হারা হব। তার মত একটা লোক এতরাটে

নাই। বিশেষ তার ছেলে, জামাই প্রভৃতি নিজের অনেক লোক বাবা দলে আছে। সকলকে নিকাস করা সোজা হবেনা।

তিলক।—যা হউক, যত শীঘ্র হয় এই কাজ চাই। এই শ্রাবণের মধ্যেই নিকাস করতে হবে।

নয়না।—তবে গাঁয়ের তপাশে আপনার সেই দশা ঘরখানি সাফা সুতরা করাবেন। ঐ গোলা বাড়িতে হবে না।

তিলক।—সে যে গাঁয়ের প্রায় বাহিরে হলো। রাণী যামনীর ঘর হতে যে অনেক তফায়ত হবে?

নয়না।—তাই ত চাই। নিকটে আপনার চারা আদমীজান আছে। পরে আপনাকে সব বুঝিয়ে দেব। এখন আমরা তবে বিদায় হচ্ছি। রাণী যামনীর তখাটা ঠিক লাগবে কিনা দেখ'বন।

শ্রাবণ মাসের শেষে একদিন অপরাহ্ণ সময়ে রামনগর গ্রামের বাগানে অনেক লোকজন জমিয়াছে। পুলিস কয়েকজন ডাকাইত ধরিয়া সবডিবিজনে লইতেছে। দর্শক মধ্যে সাগর বাগদি ছিল। সে দেখিল তাহার পরিচিত শ্যামা ডোম, পরাণ কোলে, নকড়া হাড়ি, নবীন সর্দার প্রভৃতি ১৮।১৯ জন প্রধান প্রধান ডাকাইতকে ঘেরিয়া অনেক পুলিস লোক বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। উহাদের অনেকেরই গায়ে দাগ জখম, কাহার হাতে কড়া, কাহার দড়ি দিয়া হাত বাঁধা। সাগর দেখিতে লাগিল কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। খানিক তফায়তে এক গাছের তলায় কালীম সেখ এবং কালী সর্দার দুইটি খুঁটিতে গুড়ের পারার মত বসান রহিয়াছে দেখিল। উহাদের উভয়ের পা, হাঁটু, বাহু আদিতে অনেক চোটের দাগ— দুইজনকে যেন তামাক কাটা করিয়াছে। যাহারা উহাদিগকে রহিতেছিল, তাহারা কিছু তফায়াতে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, কেহ জল, কেহ তামাক খাইতেছিল। খুঁটির নিকটে কোন পুলিস লোক ছিলনা। সাগর বাগ্দি আস্তে আস্তে নিকটে গিয়া কালীমকে চাচা সম্বোধনে সেলামকরিল। কালীম বলিল "কি সাগর! বেঁচে এসেছিস? যদি বেঁচে থাকিস তিলকে বেটাকে একবার দেখিস বাবা। আমাদের ত এই দশা দেখছিস— বাঁচবার আশা নাই। তোকে ত সে রাতে সেখানে একবার দেখেছিলাম—পালালি কখন?"

সাগর।—ঘরে অনেক মদের কলসি ও জামাই আদর দেখেই আমার মনে সন্দেহ হয়। আগে কখন এত মদের আমদানি দেখি নাই। পথ চলে গেছি, একটু একটু খাবার পরেই নেশা হলো—ঘুম এলো। যেমন চটকা ভাঙ্গলো, দেখলাম সব আলো নিবান, দক্ষিণে একটা দীপ মিটমিট কচ্ছে। সকলেই বেহুঁস। আমাদের হেতের ঘড়ি একটি নাই। এতে আরও সন্দেহ। তাড়াতাড়ি বাহিরে—একেবারে রাস্তায়। তখন রাত সাঁ সাঁ কচ্ছে। ভীমে, নয়না প্রভৃতি কাকেও দেখলাম না। এতরাতে আর কোথা যা কর হবে? মন বড় খারাপ হলো। দক্ষিণে মাঠের দিকে একবারে চম্পট। খানিক পরেই টপাটপ কয়টা মসাল জ্বালা হোলো—চারদের শব্দ-গোল চীৎকার উঠলো। দৌড়—একেবারে কোশ দুই এসে মসিদপুরের বাঁধের নীচে খেজুর তলায় খানিক বসলাম। খানিক পরেই ডাইনে একজনের কাতরানি শব্দ শুনলাম। আস্তে আস্তে গিয়ে দেখলাম—ষাড়ো গোছান— রাস্তার ধারে পড়েচে। তার এক উরুতে বল্লমের চোট—রক্ত ঝুলিয়ে পড়চে। তার মুখে একটুকু জল দিলাম। সে আমায় পলাতে বললো। তা, ব্যাপার খানা কি চাচা!"

কাশীর লেখ।—ব্যাপারটা আর কি? সকলকে নিমন্ত্রণ করে ডাকলে, পরে আমরা এক রাঁড়ীর ঘরে ডাকাইতি করেচি, আর বাবু আপনার চাকর বাকর লয়ে লড়াই করে আমাদিগে ধরেছেন, এই কথা আর কি? পুলিস তাই বিশ্বাসও করলে।"

কাশী সর্দ্দার বলিল—"আর তিলক বাবুকে সাহেব দারোগাগিরি দেবেন বলেছেন। আরও কাকে কাকে এখন টানে—ঠিক নাই। যদি তুই বাঁচিস তবে আমার সঙ্গী বিশের সঙ্গে সলা করিস্ তিলকে বেটাকে একবার দেখিস—আর নয়না ও মুক্ত দাগাবাজী করেচে—সাবধান ভুলিস না।'

এ সময়ে, "চল উঠ সব, রওনা হও" বলিয়া জমাদার হুকুম দিল। সাগর সরিয়া দাঁড়াইল। এই মোকোদ্দমা অনেকের দণ্ড হইল। তিলকবাবুর রাজসরকারের বড় খোসনাম হইল। তিনি দারোগাগিরি পাইলেন।

* * * *

রুশ মনীষী লেখক টলষ্টয়ের স্ত্রী বড়ই উগ্র স্বভাবের স্ত্রীলোক ছিলেন।

স্বামীর সকল কথাতেই তিনি বিরক্তি আর ক্রোধ প্রকাশ করতেন। এমন কি সময়ে সময়ে টলষ্টয়কে বাড়ী থেকে বের করেও দিতেন।

টলষ্টয় বড়ই বিব্রত। কবি তিনি, দার্শনিক তিনি, একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তিনি। স্ত্রীর সঙ্গে কোন মতে না পেরে উঠে এক বন্ধুর কাছে গিয়ে বললেন: কি করা যায় বলত?

বন্ধুটি বেশে বাক্তি নন, তিনিও একজন কাউণ্ট। পরামর্শ দিলেন,—আচ্ছা তোমার স্ত্রীকে গান শেখালে পারো?

টলষ্টয় ভাবলেন,—কথাটা মন্দ নয়, গানের মহিমায় যদি স্ত্রীর উগ্র স্বভাব বদ্‌লে যায়!

বেশ ধীরে ধীরে মৃদু হেসে শান্তভাবে তিনি জানালেন তাঁর স্ত্রীকে—একটু গান শেখনা কেন?

স্ত্রী বললেন: না গান শিখে আর কি হবে? তার চেয়ে বাজনা শেখাই ভাল। আগেই ছাম্ বাজানো অভ্যাস করি তাহ'লে।

এই বলে একটা রুটি বেলবার বেলুন নিয়ে তেড়ে এলেন। বল্লেন: পিঠ পাত,—আমি ছাম বাজাব।

টলষ্টয় ততক্ষণে দিয়েছেন পিঠান।

অপমৃত্যু

অশোক সেনগুপ্ত

একদিন নয়, বহুদিন ওরা এই ভাবে এই পথে পাশাপাশি হেঁটেছে। কিন্তু সেই দিনগুলোর সঙ্গে আজকের এই দিনটার কোনো তুলনা হয় না। আলো ঝলমল্ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রজতের মনে হলো পৃথিবীতে আজ আর কোথাও অন্ধকার নেই, অতৃপ্তি নেই। শুধুই আনন্দে ভরা। ওর মনের এই ভাবনার ছায়া ওর চোখে-মুখেও প্রতিফলিত হয়েছিলো। তাই দেখে খুশী হয়েছিলো সীমা। বলেছিলো,—'খুব খুশী হয়েছো তুমি, না?'

এমনি নির্বোধ প্রশ্ন সীমার অন্তত: করা উচিত হয়নি। জীবনের ছাব্বিশটা বছর যে মানুষ যে কোনো একটা চাকরীর জন্ত হন্তে হয়ে ঘুরেছে সমস্ত কলকাতা সহরে, কখনো কখনো কলকাতার বাইরেও, টিউশানী করে যে মানুষ এ যাবৎ সংসারের দায়িত্ব আর সকলের মত সমান ভাবে কাঁধে নিয়েছে, সেই মানুষ যদি 'নিউ ইণ্ডিয়া ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশানের' এই দু'শো পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরীটা পায়, খুশী না হয়ে থাকতে পারে! সীমার তো কোনো কিছুই অজানা নেই। তবে? সীমা কি নিজেই খুশী হয়নি? ওর আশা কি আরো বেশী ছিলো? কে জানে।

সীমা আবার প্রশ্ন করলো—'কী হলো, কথা বলছ না যে!'

—'কি বলবো বল! সব কথাতো তুমিই বলে ফেলেছো। বাকী রেখেছো কিছু?'

কথার শেষে হাসলো রজত। সীমাও হাসলো।

—'এসো, একটু কফি খেয়ে নেওয়া যাক্।'

সামনের রেস্তোরাঁতে ঢুকলো ওরা। শুধু কফি নয়, আরো কিছু খেলো। সকালে ইন্টারভিউ দিয়ে টিউশানীর টাকাই পেয়েছে রজত। দু'জায়গায় জবাব দিয়ে এসেছে। এক জায়গায় আরো কিছুদিন করবে। এরা ভালো টাকা দেয়। মানুষও ভালো, রজতের চাকরীর খবরে খুব খুশী হয়েছেন ছাত্রের বাবা। টাকার সব অংশটাই পকেটে রয়েছে। আজ আর খরচের কৃপণতা করবে না। খেতে খেতে সীমা প্রশ্ন করলো—'জয়েনিং ডেট কবে?'

—'অফিসিয়ালি ঠিক জানায় নি, তবে আন-অফিসিয়ালি জানতে পেরেছি সামনের সোমবার নাগাদ। ওদের লাষ্ট চিঠিতে ওরা জানিয়েছে, আমাকে ওরা সিলেক্ট করেছে। ওদের সর্তাধীনে কাজ করতে আমি রাজী আছি কি না!'

—'উত্তর দিয়েছো?'

—'নিশ্চয়ই। সেই দিনেই।'

আরো কিছুক্ষণ পর ওরা বেরিয়ে এলো। ট্রাম-বাসের আওয়াজ, জনতার কলরব, কোনো কিছুই আজ আর রজতের মনে বিরক্তি ভাব আনতে পারলো না। সামনে দাঁড়িয়ে যে ভিখারী বুড়ীটা অজস্র আশীর্বাদ করে পয়সা চাচ্ছিলো, আজ তাকেও দশটা নয়া পয়সা দিতে দ্বিধা করলো না রজত।

সীমা বললো—'তুমি আজ কুবেরের ধন পেয়েছো মনে হচ্ছে। খুব হাত খুলেছে দেখছি।'

রজত হাসলো। বললো,—'খরচের এই তো সুরু। অনেক কিছু কিনতে হবে। রাত হয়ে যাবে কিন্তু। তোমার মা আবার না ভাবতে বসেন। ছোট্ট আদুরে মেয়েতো।'

—'তা' একটু ভাববেন বৈকি। জানেন তো বহুৎ কয়েক ঘরেই একটা ছেলে বরা—খুড়ি, মেয়েরা তার আদুরে মেয়েটার পিছনে পিছনে ঘুর ঘুর করছে।'

সীমার কথায় খুব জোরে হেসে উঠলো রজত। সীমা কপট ক্রোধে ঝমকে উঠলো,—'এই, কি হচ্ছে। অসভ্য।'

প্রথমেই ওরা কাপড়ের দোকানে ঢুকলো। দোকান নয় যেন ইন্দ্রপুরী। রং রং আর রং। লাল-নীল-সবুজ-বেগনী। এখন এই পৌষের শীতে গরম জামার হাট। মনে মনে ঠিক করেছিলো মায়ের জন্ত একটা তাঁতের শাড়ী আর বাবার জন্ত একটা সিল্কের ধুতি কিনবে। কিন্তু দোকানে ঢুকেই সেই ইচ্ছাটা অন্ত একটা ইচ্ছায় রূপান্তরিত হলো। দোকানে বসেই রজত যেন নিজের ঘরের কর্মরত মাকে দেখতে পেলো। একটা পুরোনো অল্প ছেঁড়া বিছানার চাদরকে মা দুভাঁজ করে গায়ে জড়িয়ে শীতকে ঠেকিয়ে রেখে খুশীমনে কাজ করে চলেছেন। মাঝে মধ্যে শীতের কাঁপুনী অসহ্য মনে হচ্ছে। তখন আঁচ কেলে দেওয়া উনুনের উষ্ণ দেহটাতে হাত সেঁকে নিচ্ছেন। নিজের দিকে কখনই তাকিয়ে দেখবার সময় পাননি মা। সর্বদা ছেলে-মেয়ে আর স্বামীর দিকেই সতর্ক নজর। কিন্তু ছেলে-মেয়ে আর স্বামী কি কখনও তাকিয়ে দেখেছে তার দিকে ভালো করে! এতসব কথা ভাবতে গিয়ে লজ্জা পেলো রজত। ঠিক কথা! অনেক আগেই ওর উচিত ছিলো মাকে একখানা গরম চাদর কিনে দেওয়া। এতদিনে মনে হয়নি। আজ মনে পড়েছে, এবং আজই কিনতে হবে। কেনাও হলো। গরম নয়, সীমার ইচ্ছানুসারে খদ্দরের একটা গায়ের কাপড়। সেই সঙ্গে বাবার ধুতি, বড়দার গেঞ্জী, ছোড়দার পাঞ্জাবীর কাপড়, আর বৌদির জন্তও একটা শাড়ী কিনলো রজত। ক্যাশ কাউন্টারে গুণে গুণে সাতচল্লিশ টাকা তেইশ নয়া পয়সা দিয়ে দিলো। ক্যাশমেমোটা পকেটে রাখতে গিয়েই হাসলো রজত। ভাগ্যলিপি লেখা রয়েছে ক্যাশমেমোর পিছনে। 'আজ থেকে আপনার আগামী দিনগুলো সুখ-শান্তিতে ভরা থাকবে।' এসব সত্যে আগে বিশ্বাস ছিলো না। আজও নেই। তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো। ভালো লাগলো। খুশীমনে সীমাকে নিয়ে পথে নামলো। বাইরে এসে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো। ন'টা বে'জে গিয়েছে। ঠাট্টার কথা নয়, সত্যিই সীমার মা চিন্তা করবেন সময়মত মেয়েকে বাড়ীতে না পৌঁছাতে দেখলে। ইচ্ছে ছিলো আগামী কালকের জন্ত সিনেমার অ্যাডভান্স টিকেট কিনে রাখবে। কিন্তু দেরী হয়ে যাবার ভয়ে সিদ্ধান্ত বদলাতে হলো। বাস ষ্টাণ্ডের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো—'চলো, কেরা যাক।'

কয়েকটা মুহূর্ত নিস্তব্ধভাবে কাটলো। শীতের রাতটা রাতেই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে সহরটা। বাস ষ্টাণ্ডে আর কেউ নেই। শুধু ওরা দু'জন। খুব কাছাকাছি একটা কুকুর হঠাৎ সুর করে কেঁদে উঠলো। চমকে উঠলো। চমকে উঠলো সীমা। রজতের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। কি ভীষণ বিশ্রী অলুক্ষণে কান্না। ভয় ধরিয়ে দেয়। শুধু ভয় নয়, বিরক্তিও। ঘুরের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললো,—'বাস ষ্ট্রাইকগুলো কি আজ ষ্টাইক করেছে নাকি?'

রজত হাসলো।

—'হাসছো যে?'

—'তোমার রকম সকম দেখে। আজ না হয় একটু বেশীক্ষণই অপেক্ষা করলে।'

ঠাট্টা করবার সোভটুকু সীমাও ছাড়লো না। বললো—'তা ঠিক। আমার তো শুধু পস্তাই করতে হবে সারাজীবন।'

—'সীমা।'

সীমা নীরব।

—'সীমা!'

—'বলো।'

—'লক্ষ্মিটি রাগ কোরোনা। ভুল বুঝোনা আমাকে। চাকরীতে কনফার্মড্ হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সাড়া দিলো না সীমা। রজত হয়তো আরো কিছু বলতো আবেগে। কিন্তু তার আগেই দোতলা বাসটা দ্রুতবেগে ছুটে এসে ওদের সামনে দাঁড়ালো। একজন যাত্রী নামলো। উঠলো ওরা দুজন। পাশাপাশি বসলো। যাত্রীরা সকলেই নীরব, নিস্পন্দ। এক নজরে সকলকে দেখে নিলো সীমা। না, চেনা জানা কেউ'ত নেই। দু'টো কথা বলে নীরবতার অস্বস্তি থেকে সে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিলো সীমা, তা হলো না। ভাবনার জাল বুনতে সুরু করলো মনটা। রজতের দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার। কি ভাবছে রজত? নিশ্চই কোনো সুখের স্বপ্ন দেখছে। খুব স্বাভাবিক! ওর এই সুখ স্বপ্নের ভাগ আর কদিন পর সীমাও পাবে। রজতের মা সত্যিই খুব স্নেহ করেন ওকে। মা একাই নন, ওদের বাড়ীর সকলেই। সীমাকে রজতের বৌ হিসাবে পেতে কারুরই আপত্তি নেই। বরং খুশীই সকলে। অথচ আশ্চর্য, রজতের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো যে মানুষটিকে কেন্দ্র করে সেই মানুষটাই আজ আর নেই। সেই মুহূর্তে চলমান বাসের দোতলায় বসে অনেকদিন পর হাসিকে মনে পড়লো সীমার। রজতের ছোটো বোন হাসি। সীমার শৈশব আর কৈশোরের বন্ধু। বছর পাঁচেক আগে মারা গিয়েছে। বেঁচে থাকলে খুব খুশী হতো হাসি সীমাকে ওদের বাড়ীর মানুষ হিসাবে পেয়ে।

—'কি ভাবছো?' রজতের প্রশ্ন।

—'অনেক কিছু।'

—'পরে ভেবো। এখন নামবার জন্ত তৈরী হও।' রজত হাসলো। পরের ষ্টপেজেই নেমে পড়লো ওরা। বড় রাস্তার ওপরেই সীমাদের বাড়ী। সদর দরজা খুলে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়েছিলেন সীমার মা। সীমাকে পৌঁছে দিয়ে এগিয়ে চললো রজত। এই রাস্তার শেষে বাঁ দিকের গলিতে শেষ বাড়ীটা ওদের। বাড়ীতে ঢুকতেই মায়ের সঙ্গে দেখা। রজত কাপড়ের প্যাকেটা মায়ের হাতে তুলে দিলো। মা একটু অবাক হলেন। উল্টে পাল্টে দেখলেন। বললেন—'এগুলি কিরে খোকা?'

—'খুলেই দেখো না। রজত মুখ টিপে হাসলো। মা প্যাকেটটা খুললেন। এক এক করে সব কাপড় বের করে দেখলেন। এই চাদরটা তোমার জন্ত এনেছি মা। তুমি গায়ে দেবে।

মায়ের মুখে আনন্দের আভা। খুশীতে আর তৃপ্তিতে দু'চোখ যেন ভরে গেছে। মুখে বললেন,—'কেন তুই আবার এতসব মিছিমিছি কিনতে গেলি খোকা?'

—'মিছিমিছি নয় মা।'

—'খুব সুন্দর হয়েছে রে খোকা। হ্যাঁরে, দাম কত নিলো?'

—'সে অনেক টাকা মা। এক হাজার। বলো কি বলবে এবারে?' রজতের কণ্ঠস্বরে কৌতুক। মা হাসলেন ওর কথা শুনে। তারপর ফিরে গেলেন নিজের কাজে। কিছুক্ষণ পর খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লো রজত। অনেক ভাবনা এই মুহূর্তে ঝড়ে চড়ে উঠলো মাথার মধ্যে। পরপর পেরিয়ে যাওয়া কয়েকটা বছরের কথা মনে পড়লো। একটার পর একটা জায়গায়

গিয়েছে চাকরীর জন্ত। গিয়ে নিরাশ হয়েছে শুধু। 'আমার দ্বারা কিছু হবে না', এই রকম একটা ধারণাকে যখন মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে সুরু করেছে, ঠিক সেই সময়েই এই চাকরীটার খবর পেয়েছিলো কমলাক্ষদার কাছে। কমলাক্ষদা ওর আত্মীয় নয়। রজত জানে, আত্মীয়েরা আত্মীয়ের জন্ত কিছু করে না। প'ড়ার বেপাড়ার একজন ভালো অভিনেতা হিসাবে খ্যাতি আছে কমলাক্ষদার। আর সেই সুবাদেই 'নিউ ইণ্ডিয়া ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশনের' সেবার অফিসারের সঙ্গে আলাপ। এবং সেই আলাপের সূত্র ধরে কমলাক্ষদা রজতকে ঠেলে দিয়েছিলেন। প্রথম মাসের মাইনে পেলেই কমলাক্ষদাকে একটা ভালো কিছু প্রেসেণ্ট করতে হবে।

—'খোকা।'

মা ঘরে ঢুকলেন। আলো জেলে দিলেন। উঠে বসলো রজত।

—'ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

—'না মা। কেন, কিছু বলবে?'

—'তোর একটা এক্সপ্রেস চিঠি এসেছে আজ দুপুরে তুই বেরিয়ে যাবার পর। ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে।' মা খামটা তুলে দিলেন রজতের হাতে। উল্টোপাল্টে দেখলো রজত। খামের গায়ে 'নিউ ইণ্ডিয়া ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশনের' নাম ছাপানো। একটা অনির্বচনীয় আনন্দে দুলতে লাগলো মনটা। হাত কাঁপতে লাগলো। সুখের দুঃখ। নিশ্চয়ই পত্রপাঠ কাজে যোগ দেবার নির্দেশ।

—'কার চিঠিরে খোকা?'

—'আমার নতুন অফিসের।'

মায়ের মুখে আশার আলো। রজত জানে মা এই মুহূর্তে সবকিছু ভুলে ঠাকুরকে ডাকছেন। মৃদু হেসে খুলে ফেললো রজত চিঠিখানা। একবার—দু'বার—বারবার পড়লো। একটা যন্ত্রণা দারুণ ভাবে কামড়ে ধরলো সমস্ত অনুভূতিটাকে। তারপর এক সময়ে অবশ হাতে চিঠিখানা ছুড়ে ফেলে দিলো কোণের টেবিলটার উদ্দেশ্তে। চিঠিটা মাটীতে পড়ে গেলো। মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো রজত। মা কি কিছু আঁচ করেছেন! মায়ের মুখে আতঙ্কের ছায়া। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো রজত। মা খুব নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন,—'কি লিখেছে ওরা?'—'লিখেছে, ওদের হেড্ অফিস দিল্লী থেকে টাইপকলে সমস্ত রকম রিক্রুটমেণ্ট বন্ধ করতে আদেশ দিয়েছে দেশের এই জরুরী পরিস্থিতির জন্ত' অতএব তোমার ছেলের চাকরী আর হলো না। কথার শেষে হাসলো রজত। হাসিটা কান্নার মত দেখালো। মা আর একটিও কথা বললেন না। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমনি নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। শুয়ে পড়লো রজত আবার। এপাশ ওপাশ করলো কিছুক্ষণ। না, চাকরী নয়, এই মুহূর্তে একটু ঘুমের প্রয়োজন তার। ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্। যে ঈশ্বরকে শৈশবের পর থেকে অবিশ্বাস করে এসেছে রজত, আজ সেই ঈশ্বরের কাছেই মিনতি জানালো ঘুমের জন্ত। কিন্তু ঈশ্বরও যদি এই মুহূর্তে 'নিউ ইণ্ডিয়া ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশনের' চেয়ারম্যানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। দেশের জরুরী পরিস্থিতির জন্ত যদি তাকে ঘুমাতে না দেওয়া হয়। অসম্ভব নয়। অথচ বিরতি নেই কোনো কিছুরই। নাচ্ গান হল্লা আগের মতই চলছে। আজও চোরাকারবারী আর কালোবাজারীরা বুক ফুলিয়ে চলছে। শুধু চাকরী হলো না তারই দেশের জরুরী পরিস্থিতির জন্ত। না, এতসব ভাবনা ভেবে লাভ নেই। ঘুম চাই তার। একটা কঠিন শীতল ঘুম। এ ঘুম কাল সকালেও নয়ই, পরশুও নয়, কোনো দিনই যেন না ভাঙে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

স্মৃতি দোলায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নিখিলের কথায় অপ্রস্তুতির মনের সমস্ত লক্ষণই টের পাচ্ছিলাম। আঘাত দিয়ে নয় অন্য উপায়ে এ সব বিভ্রমের মূল খুঁজতে হবে জেনে শান্ত স্নিগ্ধ সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম,—কেন এ অভিমান, কি সে অভিযোগ তুমি জিজ্ঞাসা করেছ কখনো ?

করেছি ! করেছি !—নিখিল বেশ বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল,—তাকে ব্যাকুল ভাবে মিনতি করেছি বারবার। তবু কিছুই সে বলেনি। যেমন নিঃশব্দে এসেছে তেমনি নিঃশব্দে চলে গেছে কিছুক্ষণ বাদে।

তুমি পিছু নেবার চেষ্টা করেছ কখনো ?

একবার করেছিলাম। আর করি না। সেই একটিবার তার মুখের কথা শুনেছিলাম। তীব্র চাপা স্বরে বলেছিল, আমায় ধরতে চেয়ো না। তাহলে এই শেষ দেখা।

এবার আমাকেও খানিক নীরব থাকতে হ'ল। দূরের রেলপোলের ওপর দিয়ে ওপার থেকে একটা মালগাড়ি আসছে। ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে শব্দটা যেন রাত্রির কাতর হৃদস্পন্দনের মত।

কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করলাম,—চম্পা এসব কথা কিছু জানে ?

—জানত না। আমিই একদিন মনের অস্থির যন্ত্রণায় তাকে জানিয়েছি।

—সে শুনে কিছু বলেছে ?

—সে বিশ্বাস করে নি। আমার ওপর রাগ করেছে। বলেছে এ সব আমার মনের ভুল। পারতপক্ষে আমায় তাই সে একা থাকতে দিতে চায় না। আমায় নিয়ে কলকাতার নার্সিং হোমে সে-ই নিয়ে গেছল।

পোল পেরিয়ে এসে মালগাড়িটা এখন এদিকের এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। কাছে আসার আওয়াজটায় আর সে রহস্য-স্পন্দন নেই। একটু স্পষ্ট ও কর্কশ।

একটু দ্বিধা করে কথাটা বলেই ফেলাম,—কিন্তু সে-ই আবার নার্সিং হোম থেকে হঠাৎ এই অজ্ঞাতবাসে তোমায় টেনে এনেছে। কেন ?

—নার্সিং হোমের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট না হয়েই বোধ হয়।

এবার একটু হেসে বললাম,—সেখানে চিকিৎসা তোমার হ'ল কই ! ঘুমিয়ে না যেতে-ই ত পালিয়ে এসে। তোমার সেখানকার ডাক্তার তাই বেশ অবাক ও ক্ষুণ্ণ।

তোমার সঙ্গে ডাক্তারের দেখা হয়েছে ?—নিখিল একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—হাঁ হয়েছে। তোমার খোঁজ করতেই সেখানে গেছলাম। তুমি নিরুদ্দেশ জেনে ডাক্তারের সঙ্গেও চেষ্টা করে দেখা করেছিলাম। একমাসের কেবিন-ভাড়া অগ্রিম দিয়ে কেন তুমি চিকিৎসা আরম্ভ না হতেই চলে এলে তিনি বুঝতে পারেন নি।

বুঝতে তিনি পারবেন না!—নিখিল ক্লান্ত স্বরে বললে,—কী চিকিৎসা তিনি আমার করতেন? তাঁর চিকিৎসা করবার মত কোন রোগ ত আমার হয়নি।

নিখিলের ধারণাটাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে বললাম,—হঠাৎ চম্পার কথায় নার্সিং হোমে তুমি ত' গিয়েছিলে।

গিয়েছিলাম শরীর মনের যে অসহ্য যন্ত্রণায় এক এক সময়ে দিনের পর দিন আমি ঘুমোতে পারি না তাই সারাবার আশায়।—নিখিল এবার একটু তিক্ত হয়ে উঠল—তাঁর অদ্ভুত সব অবান্তর প্রশ্নের জবাব দিতে নয়।

এ প্রসঙ্গ আর ধরে রাখা উচিত মনে হল না। নিখিলকে একটু শান্ত হবার অবসর দিয়ে মিনতির সুরে বললাম,—তোমার সব কথা জানবার জন্যেই একদিন আমার চিঠি লিখেছিল। তোমার সেই সম্পূর্ণ জীবনের ইতিহাস আমি শুনতে চাই।

শুনবে! শুনবে!—নিখিল বেশ একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললে,—কিন্তু আজকে নয়। আজ আমি একটু একা থাকতে চাই ভাই। তুমি কিছু মনে কোরো না।

না, না মনে করব কি? সত্যি একটু লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম,—আমারই অন্যায় হয়েছে। তুমি আপত্তি কোরো না। আমি নদীর ধারের মন্দিরেই আবার যাচ্ছি। সেখি পুজো এখন কি রকম চলেছে।

বারান্দা থেকে নামতে নামতে নিখিলের কুণ্ঠিত আপত্তি শুনতে পেলাম।

—তোমায় মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছি বোধহয়।

না না কষ্ট কিসের।—বলে বাইরে গেট খুলে বেরিয়ে গেলাম।

মন্দিরে সে রাত্রে ফিরে যাই নি। নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না জেনেও অধমা কৌতূহলে বন্ধুর সরল বিশ্বাসের চরম অপমানই করেছিলাম। কিছুদূর পর্যন্ত নদীর দিকে গিয়ে আবার গোপনে মাঠের ভেতর দিয়ে বাড়িটার পিছন দিকেই ফিরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

নিখিলের এই বিভ্রমের সত্যি কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা আমার না জানলেই নয়।

জানবার সুযোগ সত্যিই হবে কি না সে বিষয় আমার অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

সমস্ত ব্যাপারটাই নিখিলের অপ্রকৃতিস্থ মনের ভ্রান্তি, এ ধারণাটা মনের মধ্যে তখনও এক রকম বদ্ধমূল।

তার স্ত্রীর আবির্ভাবটা নিখিলের অসুস্থ মনের কল্পনা ছাড়া আর কিছু হতে পারে এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করব! নিখিলের মনের মধ্যেই কোথায় অস্বাভাবিক কোন ওলট পালট হয়ে গেছে বলে মনে হয়। তার চেতনাই হয়ত অর্ধজাগ্রত। ঘুমের মধ্যে আমরা যে স্বপ্ন দেখি জাগ্রত অবস্থায় তার অবাস্তবতা উপলব্ধি করতে আমাদের দেরী হয় না। নিখিলের মনে নিদ্রা ও জাগরণের সেই সীমারেখাই বোধহয় অজ্ঞাত বিপর্যয়ে বোধহয় বিলীন হয়ে গেছে। স্বপ্নের সঙ্গে

সত্যের পার্থক্য সেখানে ধরা যায় না। মনের কোনো গভীর রহস্যমূল থেকে তার জীবনের একাগ্র ব্যাকুলতার লক্ষ্যই তাই স্বপ্নমূর্তি নিয়ে বারবার তাকে বিভ্রান্ত করে।

বাস্তব ভিত্তি কিছু না-ই থাক এই স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় নিখিলকে লক্ষ্য করবার আগ্রহেই অতি সন্তর্পণে বাড়ির পিছন দিকের তারের বেড়ার ভেতর দিয়ে ঢুকে নিঃশব্দে বারান্দাটার যত কাছে সম্ভব এসে দাঁড়ালাম।

যেখানে অমাবস্যার রাত এমনিতেই অন্ধকার। যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলাম একটা ঝাঁকড়া বহুল গাছের ডালপালা ও পত্রপুঞ্জ সেখানে যেন আরো গাঢ় মসীকৃষ্ণ যবনিকা ফেলেছে।

নিখিলের পক্ষে সেখানে আমার উপস্থিতি টের পাওয়া সুতরাং সম্ভব নয় কিন্তু নিখিলের প্রতি দৃষ্টি রাখাও আমার পক্ষে তেমন সহজ হচ্ছিল না।

বারান্দার ওপর একটি অস্পষ্ট ছায়ার মতই তাকে দেখা যাচ্ছে। আগে থাকতেই জানা না থাকলে সেখানে যে কেউ বসে আছে তাও অনুমান করা কঠিন হত।

এভাবে নিখিলের ওপর দৃষ্টি রেখে কোন লাভ হবে কিনা এ বিষয়েও এবার সন্দেহ জাগছিল।

সমস্ত ব্যাপারটা হয়ত সম্পূর্ণ ভাবেই নিখিলের মানসিক ভ্রান্তি। তাই যদি হয় তাহলে তার স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় বাইরে থেকে লক্ষ করবার কিছু থাকবে কি। আমি চলে আসবার পরই সম্ভবতঃ নিখিল তার স্বপ্নময় আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় তার অর্ধচেতন মন যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে বাইরে তার কোন প্রকাশ না হওয়ারই কথা। যেমন নিস্পন্দ ভাবে সে বসে আছে তেমনিই হয়ত থাকবে বহুক্ষণ। তারই মধ্যে তার স্বপ্নলোকের অসম্ভব ছায়ানাট্য সুরু ও শেষ হয়ে যাবে। এখান থেকে আমি তার কিছুই টের পাব না।

গুপ্তচরের মত বন্ধুর ওপর এভাবে নজর রাখতে আসার দরুণ মনের মধ্যে একটা গ্লানি গোড়া থেকেই অনুভব করেছি। তার ওপর এ প্রতীক্ষা বৃথা বুঝে নিঃশব্দে মন্দিরের দিকেই চলে যাবার সঙ্কল্পই করেছি এমন সময় হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলাম।

নিখিল আর নিস্পন্দ ভাবে বসে নেই। সে উঠে দাঁড়িয়ে কেমন একটু অস্থির ভাবে বারান্দায় পায়চারী করছে। অন্ধকারে তার মুখের চেহারা অবশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার কাছে সে অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি মাত্র। তবু তার পদ চারণার ভঙ্গিতেই যেন তার তীব্র ব্যগ্রতা ফুটে উঠেছে।

আকস্মাৎ এই উত্তেজনা কি তার মনের অস্বাভাবিক স্বপ্নাবেশেরই একটা লক্ষণ? এই অবস্থাতেই কি তার মনে অলীক ছায়ানাট্যের প্রক্ষেপ চলে?

বিচার করবার চেষ্টার মধ্যেই সমস্ত শরীরে একটা শীতল শিহরণ বয়ে গেল।

অদ্ভুত একটা মৃদু ধ্বনি হঠাৎ কোথা থেকে উঠছে। আর একটু স্পষ্ট হলে তা ঝিল্লীরব বলে মনে করতে পারতাম, কিংবা আর একটু স্পষ্ট হলে নূপুর নিক্কণ মনে করা যেত।

কিন্তু দুই-এর কিছুই তা নয়। মনের অমন সন্ত্রস্ত অবস্থা না হলে কল্পনা করতে পারতাম ও ধ্বনি যেন নক্ষত্র ভূষিতা রাত্রির অলঙ্কার-শিঞ্জিনী।

শব্দটা অবিরামও নয়। থেকে থেকে ক্ষণিক কম্পন তুলেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে।

নিখিল এই ধ্বনিরই প্রতীক্ষা করছিল? তার মৃতা স্ত্রীর অলৌকিক আবির্ভাবের এই কি পূর্বাভাস?

সমস্ত ব্যাপারটা নিখিলের অসুস্থ মনের ভ্রান্তি তাহলে নয়? অনাহূত অবাঞ্ছিত দর্শক হলেও আমিও কি এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার শরীক হতে চলেছি!

সত্যিই সমস্ত শরীর মনে এক অদ্ভুত আশঙ্কা-আগ্রহ মেশানো বিহ্বলতা অনুভব করছিলাম।

নিখিল পদচারণা থামিয়ে আমার কাছের দিকের বারান্দায় এসে তখন দাঁড়িয়েছে।

তার মুখটা এখান থেকেও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু তার দাঁড়াবার ভঙ্গিতেই যেন তার শঙ্কিত ব্যাকুল প্রতীক্ষার তীব্রতা টের পাচ্ছিলাম।

একটা কিছু এইবার ঘটবে নিশ্চয়।

কিন্তু কোথায়? কি ভাবে?

প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করে তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের অন্ধকার ভেদ করবার চেষ্টা করলাম।

শিঞ্জিনী ধরণের ধ্বনিটা কিছুক্ষণের জন্যে থেমে ছিল।

আবার সেটা বেজে উঠতেই কিন্তু সচকিত বিস্ময়ে আবেশ-বিহ্বলতার ঘোর এক নিমেষে কেটে গেল।

এ শিঞ্জিনী ধ্বনির উৎস ত আমার অত্যন্ত নিকটে! যে বকুল গাছটার নিচে আমি দাঁড়িয়েছি তার শুঁড়িটার ঠিক বিপরীত দিক থেকে শব্দটা উঠছে মনে হচ্ছে।

এ কি আমারই মনের ভুল। এ ধ্বনির রহস্যই কি এমন যে শ্রোতার অত্যন্ত নিকটেই তার উৎস বলে মনে হয়? নিখিলের অনুভূতিও কি এখন ঠিক আমারই মত!

তাই যদি হয় তাহলেও এ বিষয়ে নিঃসংশয় হবার জন্যে একটু সন্ধান করা দরকার।

নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এবার গাছের শুঁড়িটার ওধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

না, সেখানে কিছুই নেই। ধ্বনিটা কিন্তু তখনও শোনা যাচ্ছে। শুদ্ধ বিস্ময়ে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনুভব করলাম ধীরে ধীরে দূরে সরে গিয়ে সেটা যেন মিলিয়ে গেল।

নিখিলের অবস্থা এখন কি দেখবার জন্যে গাছের শুঁড়িটা ঘুরে আবার নিঃশব্দে সামনে গিয়ে দাঁড়তেই হিম হয়ে গেল বুকের ভেতরটা।

সত্যই কি আমি সম্পূর্ণ সচেতন, না আচ্ছন্ন বিহ্বলতায় আমিও নিখিলের মতই বিভ্রান্ত?

যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি সে দিকে নয়, বাইরের রাস্তার দিকে বারান্দার রেলিং-এর ওপর থেকে একাগ্রভাবে ঝুঁকে পড়ে নিখিল যা দেখছে অন্ধকারের মধ্যেই অস্পষ্টভাবে আমিও তখন তা দেখতে পেয়েছি।

অন্ধকারেই যেন ঈষৎ তরল হয়ে অস্পষ্ট এক ছায়াময় নারীমূর্তি সেখানে সৃষ্টি করেছে।

—যমুনা।

করুণ দীর্ঘশ্বাসের মত নিখিলের রুদ্ধকণ্ঠের কাতর সম্ভাষণ রাত্রির স্তব্ধতাকে শিহরিত করে দিলে।

ছায়ামূর্তি নির্বাক নিস্পন্দ।

—কাছে এসো যমুনা। বলো কি অপরাধে এ শাস্তি আমায় দিচ্ছ? এ যন্ত্রণা আর যে সইতে পারি না।

এ কি অপ্রকৃতিস্থের আর্ত প্রলাপ মাত্র! কেমন করে তা ভাবব?

শরীরী হোক অশরীরী হোক সেই নারীমূর্তিকে আমিও দেখতে পাচ্ছি।

—আজ আমার তোমার কাছে শেষ মিনতি যমুনা—নাতিস্ফুট চাপা কান্নার স্বরে নিখিল তখন বলে চলেছে,— বলো কেন তুমি আমায় ছেড়ে গেছ? কেন দূরে আছ এমন করে? ওরা যা বলে তাই যদি সত্য হয়, যদি সত্যিই তুমি এখন অন্য জগতের হও, তাহলে তাও আজ বলো। তোমার কাছে যাবার জন্যে আমিও প্রস্তুত। যমুনা!

শেষ আহ্বানটা চাপা কান্নার স্বর ছাড়িয়ে, উচ্চকণ্ঠের যন্ত্রণা কাতর আর্তনাদ হয়ে উঠল।

এ আর্তনাদের কারণও তখন আমি বুঝেছি। ছায়াময় নারীমূর্তি যেন মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

না, মিলিয়ে ত ঠিক যাচ্ছে না! তীব্র উত্তেজনা বিস্ময়ে কম্পমান হয়ে টের পেলাম সে মূর্তি আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই দিকেই যেন সরে আসছে।

কি রহস্য আছে এই ছায়াময়ীর আবির্ভাবের পেছনে? সত্যিই এ মূর্তি ছায়াময়ী না শরীরিনী? এ মীমাংসার সুযোগ আজ আর আমি কোন মতেই ছাড়তে প্রস্তুত নই।

—যমুনা! বলে কাতর চিৎকার করে নিখিল তখন বারান্দার অপর প্রান্তে ছুটে যাবার চেষ্টা করছে সেখানকার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার জন্যে। দুর্বল শরীরে ছুটতে গিয়ে অন্ধকারে সে যেন একবার পড়ে গেল মনে হল।

আমার কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেবার তখন অবসর নেই। নারী মূর্তিটি আমার কিছুদূর দিয়েই বাংলো বাড়িটার পেছন দিকে প্রায় নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে! অনেকটা নিকট হওয়ার দরুণ সে মূর্তি বেশ কিছুটা স্পষ্টভাবেই আমি তখন দেখতে পাচ্ছি।

মিশকালো শাড়ীর ওপর সেই রঙেরই ওড়নায় সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকার দরুণই সে মূর্তি অন্ধকারে অমন অস্পষ্ট। প্রসাধনের কোনো কৌশলে মুখটুকু শুধু অন্ধকারেও কেমন আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল।

পরিণাম যা হয় হোক সামনে গিয়ে পথ রুদ্ধ করার সঙ্গেই ছুটে গিয়ে অতর্কিতে এ মূর্তির হাতটা অন্ততঃ ধরে ফেলব বলেই তখন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছি।

কিন্তু এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে বাধা পাব ভাবতে পারিনি। মূর্তিটি কাছে আসতেই ছুটে যেতে গিয়ে পায়ের তলায় কি একটায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম।

যথা সম্ভব দ্রুতই উঠে দাঁড়ালাম তারপর। কিন্তু চারিদিকের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে সে ছায়া মূর্তির কোন চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলাম না।

কিন্তু যাবে সে কোথায়? শূন্যে যে সে মিলিয়ে যেতে পারেনা সে বিষয়ে তখন আমি নিঃসন্দেহ। কাছে থেকে শুধু যে তাকে দেখেছি তা নয়। যে কণ্ঠস্বর শোনবার জন্যে নিখিল ব্যাকুল, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার সময় সেই কণ্ঠের সচকিত ভীত ধ্বনিও আমি শুনতে পেয়েছি।

বাংলো বাড়ির বিস্তীর্ণ বাগানের মধ্যে এই অন্ধকারে সে মূর্তির সন্ধান পাওয়া অবশ্য বেশ কঠিন। কিন্তু এ মূর্তির রহস্য ভেদের আরো ভালো উপায় তখন আমি ভেবে পেয়েছি।

বারান্দা থেকে নামতে যাবার পথে পড়ে যাওয়ার পর নিখিলের অবস্থা সম্বন্ধে মনে একটা উদ্বেগ থাকলেও তা অগ্রাহ্য করে সোজা বাইরের গেট খুলে মাঠের ওপর দিয়ে মন্দিরের দিকে আমি ছুটলাম। এ রহস্যের মীমাংসা মন্দিরে পৌঁছেই যে পাওয়া যাবে এ বিষয়ে তখন আর আমার সন্দেহ নেই।

নিখিলের কাছে তার স্ত্রীর আবির্ভাব সম্বন্ধে যেটুকু শুনেছি, তার সঙ্গে চম্পার এই রাত্রের পূজা অনুষ্ঠান ও নদীর তীরে তার চাচাজির রহস্য জনক আকস্মিক উদয় মিলিয়ে সমস্ত ব্যাপারটার গূঢ় অর্থ তখন আমার কাছে আর অস্পষ্ট নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মন্দিরে গিয়ে পৌঁছানটাই এখন একান্ত প্রয়োজন।

মন্দিরের কাছাকাছি এসেই ভেতরের মন্ত্রধ্বনি থেকে বুঝলাম যে পূজা অনুষ্ঠান তখনো অবিরাম ভাবে চলছে।

অনভ্যাসের দরুন এতখানি পথ যথা সম্ভব বেগে দৌড়ে এসে তখন আমি বেশ হাঁফাচ্ছি। দম নেবার জন্যে কিছুক্ষণ মন্দিরের বাইরেই একটু দাঁড়ালাম। বাইরেটা একেবারে নির্জন। মনে মনে ক্ষীণ একটা সন্দেহ বুঝি ছিল যে লণ্ঠন সমেত চম্পার চাচাজিকে হয়ত সেখানে দেখতে পাব। চাচাজি কাছাকাছি কোথাও থাকুন বা না থাকুন তাঁর লণ্ঠনের আলো কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না।

একটু জিরিয়ে নিয়ে মন্দিরের দিকেই এবার যাচ্ছিলাম। মন্দিরের দরজায় পৌঁছাবার আগেই প্রধান পূজারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মন্দিরের ভেতর থেকে কি কাজে তিনি বেরিয়ে আসছেন।

অন্ধকারে আমার প্রথমটা তিনি চিনতে পারেন নি। বিস্মিত ও ঈষৎ রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কৌন ?

পরিচয় আর দিতে হ'ল না। আর একটু কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি নিজেই যেন লজ্জিত ভাবে বললেন,—ও আপনি! কিছু মনে করবেন না। অন্ধকারে আপনাকে চিনতে পারিনি। কিন্তু এতক্ষণ আপনি ছিলেন কোথায় ?

যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললাম,—পূজো ত সারারাত চলবে, তাই বাসা থেকে একবার ঘুরে এলাম। চম্পাদেবী কি ফিরেছেন ?

ফিরেছেন মানে ?—পূজারী আমার প্রশ্নটা যেন বুঝতে পারলেন না।

ভেতরের উত্তেজনাটা গোপন করে সহজ ভাবেই বলবার চেষ্টা করলাম,—ও তিনিও তাহলে এখনো ফেরেন নি ?

ফিরবেন কেন ? পূজারী এবার একটু কৌতুক মিশ্রিত স্বরেই বললেন,—তিনি কি কোথাও গেছেন যে ফিরবেন। তিনি ত সেই তখন থেকেই মন্দিরের মধ্যে পূজা দেখছেন!

মন্দিরের মধ্যে পূজা দেখছেন! আমার বিদ্যুৎ বিস্ময় এবার আর গোপন রাখতে পারলাম না, —মানে, তিনি খানিক আগে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যান নি ?

না বাবুজি! পূজারীর গলায় কৌতুক বিস্ময়ের সঙ্গে আমার এরকম অদ্ভুত অনুমানে একটু যেন সন্দেহের আভাসও পেলাম,—তিনি বাইরে গেলে আমি জানতে পারতাম না। আমি ত সারাক্ষণই ওঁর সঙ্গে আছি। কিন্তু এ রকম ধারণা আপনার হ'ল কেন?

—না, ধারণা ঠিক নয়।—বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম,—মানে, এখানে আসবার পথে ওঁর মত কাকে যেন সামনে যেতে দেখলাম। অন্ধকারে ভুলই হয়েছে নিশ্চয়।

হাঁ তা ত হতেই পারে।—পূজারীর গলায় স্বরে কিন্তু আমার কৈফিয়তটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পেরেছেন বলে মনে হ'ল না,—তবে আপনি ছাড়া এখানে কেউ এ পর্যন্ত আসেও নি। তা বাইরে কেন! চলুন না ভেতরে গিয়ে পুজো দেখবেন!

পূজারী আমায় মন্দিরের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে নিজের কাজে গেলেন।

উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্র ধ্বনিতে নাতি বৃহৎ মন্দিরের ভেতরটা গমগম করছে। ধূপ ধুনোর গাঢ় ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন। চম্পাকে তার ভেতর দিয়ে খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগল। চোখটা একটু সয়ে যাবার পর দেখতে পেলাম দূরে এক কোণের একটা থামে হেলান দিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত ভঙ্গিতে সে বসে আছে। চোখের দৃষ্টি মন্দিরের ছাদের দিকে নিবদ্ধ। কিন্তু সে যেন অন্ধ অচেতন দৃষ্টি। উদাস শূন্যতা ছাড়া সেখানে কিছু নেই।

প্রয়োজন আর ছিল না। তবু চম্পার বেশভূষাটা ভালো করে একবার লক্ষ করলাম। লাল পাড় যে গরদের শাড়িটি সে পরে আছে চাচাজির লণ্ঠনের আলোয় সেইটেই তার গায়ে সন্ধ্যার পর দেখেছিলাম মনে পড়ল। গায়ে তখন একটি কমলা রঙের ছোট ব্লাউজও ছিল। সেটা এখন তার পাশে মেঝের পড়ে আছে।

না, সমস্ত অনুমান আমার ভুল। পূজারী কোন কারণে আমায় যদি মিথ্যেও বলে থাকে তবু যেভাবে এখানে আমি ছুটে এসেছি তাতে কারুর পক্ষে আমার আগে এসে বেশ বদল করে মন্দিরের মধ্যে বসে থাকা সম্ভব নয়।

খানিক আগে যা আমি দেখে এসেছি সে রহস্যের ব্যাখ্যা তাহলে কি?

সত্যিই অশরীরী অলৌকিক কিছু যে নয় তার প্রমাণ ত আমি পেয়েছি বলেই মনে হয়। ছায়ামূর্তিকে কায়ারূপে স্বচক্ষে শুধু দেখেনি, তার অস্ফুট কণ্ঠধ্বনিও শুনেছি।

কে এই নারী? কি উদ্দেশ্যে নিখিলকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে মাঝে মাঝে সে ছায়ারূপিনী হয়ে দেখা দেয়।

নিখিলের জন্যে চম্পা যে উদ্বেগ আশঙ্কা ব্যাকুলতা আজ আমার কাছে অকস্মাৎ প্রকাশ করে ফেলেছে এ রহস্যের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? চম্পার চাচাজির সঙ্গেও এ সব ব্যাপারের সম্পর্ক কি? কি তাঁর আসল ভূমিকা এই রহস্য জটীলতায়?

মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এই সব নিরুত্তর প্রশ্ন তীক্ষ্ণ সূচি মুখে যেন আমায় জর্জর করে তুলল।

এ রহস্য কি চিরকাল আমার কাছে অভেদ্য হয়েই থাকবে? না, অপ্রকৃতিস্থ বলে যাকে মনে করছি সেই নিখিলের বিশ্বাসের মধ্যেই এ রহস্যের উত্তর প্রচ্ছন্ন আছে?

সত্যিই নিখিলের স্ত্রী কি এখনও জীবিত ? তিনিই কি এমন ভাবে মাঝে মাঝে নিখিলকে দেখা দিতে আসেন ?

কিন্তু দেখা দিয়েও নিখিলকে সমস্ত কাতর মিনতি উপেক্ষা করে নীরবে তিনি বারবার চলে যান কেন ? কেনই বা নিখিলকে তিনি ছেড়ে গেছেন ? গেছেনই বা কোথায় ?

না, যত গভীরই হোক এ রহস্য ভেদের শেষ চেষ্টা আমায় করতেই হবে এবং তার জন্যে চম্পাই আমার একমাত্র অবলম্বন। হয়ত অসতর্ক মুহূর্তের দুর্বলতায় সে আমার কাছে কিছুটা আত্ম-প্রকাশ আজ করে ফেলেছে। নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে যাতে সে মেলে ধরে তারই জন্যে ধৈর্য ধরে এবার অপেক্ষা করতে হবে।

তখনই চম্পার কাছে গিয়ে বসতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু নিখিলকে যে অবস্থায় ফেলে এসেছি তাতে তার খোঁজ নেওয়াটা আগে দরকার।

বাসার দিকেই আবার ফিরলাম। [ক্রমশঃ]

• • • •

নেপলস্ সহরের বুক চিরে যে এভিনিউ রাস্তাটা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেছে তার আর একপাশে একটা ভাঙ্গা বাড়ীর রোয়াকে একজন বুড়ো বেদে এসে আশ্রয় নিলে। সামনে টুপিটা রেখে সে বসে আছে।

গান গাওয়া তার অভ্যাস। গলাটাও বেশ মিঠে। কিন্তু লোকে তাকে বিশেষ আমল দেয় না। তার সামনের টুপিতে কেউ একটা সামান্য মুদ্রাও দিচ্ছেনা।

পথ চলতে চলতে এক ভদ্রলোক তা' লক্ষ্য করলেন! ধীরে ধীরে তিনি এসে বুড়ো বেদের পাশে দাঁড়ালেন ও বল্লেন আমি কি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি ?

—টাকাপয়সা দিতে চান আপনি ?

—না, গান গেয়ে আপনার টুপি ভর্ত্তি করতে।

বুড়ো বেদে একটু হাসলে। তাহলে গুণীই বটে !

ভদ্রলোক এবার গান আরম্ভ করলেন। বেদে ত স্তম্ভিত, চমকিত। এ যে বিশ্বজয়ী গলা।

দেখতে দেখতে টুপি ভরে উঠল মুদ্রায়। এইবার ভদ্রলোকটি চলে যাবেন। বেদে শুধু বল্লে—আপনার নামটি কি জানতে পারি ?—নিশ্চয়ই, আমার নাম ক্যারুসো।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ৫ ॥

রবি আর ছবি ইস্কুলে যায়।

ছবি বড়—উঁচু ক্লাসে পড়ে। হাতে পরীক্ষা। রাত্রি জেগে তাকে পড়াশোনা করতে হয়। একদিন খুট্ করে জোরের কাছে আওয়াজ হতেই পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে তার বৌ লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

'এ সময় বিরক্ত কোরো না। আমি পড়ছি।'

মুখে এই কথা বললে বটে, কিন্তু লক্ষ্মীকে তার খারাপ লাগলো না। আসে তো আসুক্।

লক্ষ্মী তার রাঙা-রাঙা ঠোঁট দুটি উল্টে সে এক অদ্ভুত ভঙ্গী করে বললে, 'আসবার জন্যে আমি যেন মরে যাচ্ছি!'

ছবি তাকে না দেখবার ভাণ করে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে পড়তে লাগলো।

'এই!'

লক্ষ্মী চাপা গলায় আবার ডাকলে, 'এই।'

ছবি তবু সেদিকে তাকালো না। লক্ষ্মী তখন পা টিপে টিপে এগিয়ে এলো তার কাছে।

'বিদ্যের সাগর হবেন উনি!'

মুখ না ফিরিয়েই ছবি বললে, 'হবই তো।'

'দেখাই যাবে।'

লক্ষ্মী তার চেয়ারের পেছনে হাত রাখলে।

'এই!'

'কী।'

'তোমার ছবি নামটা কে রাখলে বল দেখি!'

ছবি বললে, 'মা রেখেছে। বাবা রেখেছে।'

লক্ষ্মী বললে, 'ওটা মেয়েদের নাম। নামটা বদলে নিও।'

'নেবো।'

'নেবো নয়, সত্যি বলছি। আমার লজ্জা করে।'

'ছবি বড়লে কি নাম রাখবো ? কবি ?'

লক্ষ্মী বললে, 'ছবির চেয়ে ভালো।'

ছবি এবার হেসে তার মুখের দিকে তাকালে। বললে, 'বরের নাম মুখে আনলে ! তোমার পাপ হবে।'

'হোক্‌গে। আবার বলবো। ছবি-ছবি-ছবি—হলো ?'

ছবি তার পিঠের ওপর একটি চড় বসিয়ে দিলে।

'উঃ!' বলে লক্ষ্মী তার গায়ের ওপর ঢলে পড়লো। —'তুমি আমাকে মারলে ? আমি বলে দেবো।'

'আমিও বলে দেবো—আমার পড়ার সময় তুমি 'ডিস্‌টার্ব' করছো।'

'বেশ করবো, আবার করবো, আমার খুশী।'

লক্ষ্মী দু'হাত বাড়িয়ে ছবির গলাটা জড়িয়ে ধরলে।

ওদিকে ঠিক এই সময়েই বরদাসুন্দরী ডাকলেন, লক্ষ্মী !'

'এই যে !'

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। —'আমি পালাই বাবা।'

'হ্যাঁ যাও, বিদ্যে হও।'

দোরের দিকে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে লক্ষ্মী ভেংচি কেটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বরদাসুন্দরী লক্ষ্মীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন খাওয়াবার জন্যে। লক্ষ্মীকে নিজের কাছে বসিয়ে বসিয়ে রোজ তিনি খাওয়ান। এ তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস।

আজ কিন্তু খুঁজতে গিয়ে তাঁর নজরে পড়লো লক্ষ্মী চুপিচুপি বেরোচ্ছে ছবির পড়বার ঘর থেকে। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন বরদাসুন্দরী। হরেনবাবু বলেছেন—'দেখো যেন বৌমা এখন ছবির কাছে না যায়। ওর পড়ার ক্ষতি হবে।'

কথাটা বলতে গিয়ে বরদাসুন্দরীর কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকেছিল। তবু তিনি চোখ-কান বুজে কথাটা বলে ফেলেছিলেন। ছেলেকে বলতে পারেননি, বলে ছিলেন লক্ষ্মীকে।

'এ সময় তুমি ওদিকে যেয়ো না বৌমা, ছবিকে ভাল করে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।'

লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী, তার ওপর আজকালকার মেয়ে। এই ইঙ্গিতই তার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু চুরি করে খাওয়াটা মন্দ লাগে না লক্ষ্মীর। লুকোচুরি খেলার মত মজা লাগে। কেমন যেন একটা মিষ্টি আস্বাদ অনুভব করে। তাই ফাঁক পেলেই সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুট্ করে ছবির ঘরে গিয়ে ঢোকে। কখনও বা এক-আধটা কথা বলেই পালিয়ে আসে। কখনও বা তার গায়ের ওপরে ঢলে পড়ে। চিমটি কাটে, মার খায়, আবার কখনও বা নিজেও দু' এক ঘা বসিয়ে দেয় ছবির পিঠের ওপর।

বরদাসুন্দরীর চোখ এড়ায়নি। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছেন বই-কি !

দেখতেও তো মন্দ লাগে না।

কিছু বলতেও ইচ্ছে করে না, অথচ না বললেও নয় !

হরেনবাবু সেদিন আবার বললেন বরদাসুন্দরীকে।

'তোমাকে একটু দেখতে বললুম, তুমি তো খুব দেখছো!'

'কী দেখবো?'

'না দেখলে ছেলেটা যে পরীক্ষায় ফেল্ মারবে। সেদিন রাত্তির তখন প্রায় দশটা, দেখলুম—বৌমা বেরিয়ে আসছে ছবির ঘর থেকে।'

বরদাসুন্দরী বোধকরি রাগ করলেন। বললেন, আমি পারবো না খবরদারী করতে। আমারও তো একটা সাধ-আহ্লাদ আছে।'

'ছেলেটা থাক্ তাহ'লে গো-মুখ্খু হয়ে।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'থাক্ না। লেখাপড়া শিখে চাকুরি-বাকুরি না করলে সংসার চলবে না'—এমন তো নয়।'

এই বলে মুখ টিপে হেসে তিনি চুপিচুপি বললেন, 'রোসো, এবার একদিন ছবির বিছানায় বৌমাকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেবো।'

মুখে বললেন—এই পর্যন্ত। কাজে তা করলেন না।

অনেক ভেবেচিন্তে রবিকে একদিন কাছে ডেকে বললেন, 'আখ্ রবি, লক্ষ্মীর এখন খেলা করবার বয়েস্। তুই যেমন লক্ষ্মীর সঙ্গে খেলা করতিস্ এখনও তো তেমনি খেলা করতে পারিস।'

ইচ্ছে তো করে,—কিন্তু রবি বললে, 'বা-রে, ওর যে এখন বিয়ে হয়ে গেছে।'

'বিয়ে হয়েছে তো কী হয়েছে!'

বরদাসুন্দরী ভেবেছিলেন, লক্ষ্মী ছেলেমানুষ, ছোট দেওরের সঙ্গে খেলা করতে পেলে হয়ত বা তাই নিয়েই মেতে থাকবে, ছবির পড়ার ঘরে বারবার গিয়ে ঢুকবে না।

'আর আখ্, ছবির ঘরে ওকে যেতে দিবি না। ছবির পড়ার ক্ষতি হবে।'

নতুন একটা কাজের ভার পেয়ে গেল রবি। সেদিন থেকে যথা উৎসাহে লেগে পড়লো তার নতুন কাজে।

'বৌদি, শোনো!'

রবি এখন লক্ষ্মীকে বৌদি বলে ডাকে। 'তুই' না বলে 'তুমি' বলে। প্রথম দু'চারদিন খুব হাসাহাসি করেছিল দু'জনে। এখন সেটা গা-সওয়া হয়ে গেছে।

লক্ষ্মী রবির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'কী বলছো?'

রবি বললে, 'চোর-চোর খেলবে?'

লক্ষ্মী বললে, 'না ভাই, শাড়ী পরে আমি ছুটতে পারবো না। আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যদি যাই তো মা বকবে।'

'তাহ'লে চল—ছাতের টিন্-কুঠ্রীতে বসে বসে আমরা খেলা করিগে।'

লক্ষ্মী বললে, 'না। এখন আমাকে খেলা করতে নেই।'

বরদাসুন্দরী বসে বসে পান সাজছিলেন।

রবি বললে, 'মা শুনছো? বৌদি বলছে এখন তাকে খেলা করতে নেই।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'কে বললে খেলা করতে নেই? খুব আছে। যাও ভাইবোনের মত দুটিতে খেলা করগে যাও।'

হুকুম পেয়ে দু'জনেই খেলা করতে গেল ছোতলার ছাতে।

সিঁড়ির পাশেই দু'খানা ছোট ছোট ঘর। একখানা পুজোর ঘর। আর একখানা খালি।

সুমুখে প্রকাণ্ড খোলা ছাত।

প্রয়োজন না হলে কেউ এখানে আসে না। খেলা করবার জায়গাটি ভাল।

ঠাকুর-ঘরে ঢুকলো না তারা।

—'ও-ঘরে ঢুকতে নেই। ঠাকুর আছে।'

ঠাকুর বলতে কিছুই ছিল না সে-ঘরে। থাকবার মধ্যে আছে শুধু খানকতক ঠাকুর-দেবতার ছবি, আর কিছু পুজোর বাসন। বাড়ীতে কোনও ক্রিয়া কর্ম হলে সেগুলো কাজে লাগে। ঠাকুর পুজোর বালাই হরেনবাবুরও নেই, বরদাসুন্দরীরও নেই। ঠাকুরবাড়ী একটা করতে হয়, তাই করা। করেছিলেন বোধ করি হরেনবাবুর বাবা। সেই থেকে ঘরখানা অমনি পড়েই আছে।

পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো রবি। পিছু পিছু গেল লক্ষ্মী। ঘরের এককোণে গাদা করা ছিল কয়েকটা সতরঞ্চি আর একটা বড় কারপেট। যখন দরকার হয় তখন সেগুলো নামিয়ে নিয়ে যায় এখান থেকে।

রবি কারপেটটা মেঝেতে ফেলে লক্ষ্মীকে বললে, 'ধরো এইটে পাতবো।'

দুজনে ধরাধরি করে কারপেটটা তারা পাতলে মেঝের ওপর।

লক্ষ্মী বললে, 'এবার কি করতে হবে?'

রবি বললে, 'এবার খেলা করবো আমরা।'

'কি খেলা?'

রবি খানিক্ ভেবে বললে, 'বৌ-বৌ খেলা খেলি এসো।'

'সে আবার কিরকম খেলা?'

'এ-মা, তাও জানো না?'

'না ভাই, সত্যি বলছি জানি না।'

রবি বললে, 'একজন হবে বৌ, একজন হবে বর।'

'বৌ কে হবে?'

'তুমি।'

'আর বর?'

'আমি।'

লক্ষ্মী বললে, 'যেৎ! আমার বর তো হয়ে গেছে। তোমার দাদা তো আমার বর।'

'সে তো সত্যিকারের বর। এ হচ্ছে মিছেমিছি—খেলার বর আর বৌ।'

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলে, 'কি করতে হবে আমাকে?'

রবি বললে, 'বর—এইটে আমাদের বাড়ী। তুমি বাড়ীতে একা আছো, আমি গেছি মধুপুরে। আমি মধুপুর থেকে ফিরে এসে দেখবো তুমি শুয়ে শুয়ে কাঁদছো। আমি বলবো—'কাঁদছো

কেন?' তুমি বলবে –'তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না। তুমি আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে আর আমাকে ছেড়ে যাবে না!' আমি তাই করবো। তোমাকে আদর করে ভালবেসে তোমার কান্না থামাবো। তারপর—'

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু লক্ষ্মী তাকে আর বেশি কিছু বলতে দিলে না।

'না তাই ও-খেলা থাক্। অন্য খেলা খেলি।'

'তাহ'লে তুমি খেলবে না বল। আমি মাকে গিয়ে বলিগে যাই।'

লক্ষ্মী বললে, 'তার চেয়ে তুমি একটা গল্প বল। আমি শুনি।'

রবির তখন খেলার দিকে মন। বললে, 'গল্প আমি জানি না।'

লক্ষ্মী বললে, 'আমার খুব পিপাসা পেয়েছে। এক গ্লাস জল খেয়ে আসি।'

এই বলে লক্ষ্মী নীচে নেমে যাচ্ছিল, রবি বললে, 'মায়ের কাছে যেয়ো না যেন। মা বকবে।'

লক্ষ্মী হেসে বললে, 'যাব না।'

রবি তার আসবার অপেক্ষায় বসে রইলো।

ছবি পড়ছিল বসে বসে। সুমুখে টেবিলের ওপর তার খাতাপত্র বই ছড়ানো রয়েছে। হঠাৎ তার একটা বইএর ওপর একখিলি পান এসে পড়লো।

পানের খিলি কে ছুঁড়েছে বুঝতে তার দেরি হলো না। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলে, জানলার বাইরে লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছে। শিক ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

পানের খিলিটি মুখে পুরে দিয়ে ছবি চোখের ইসারায় ডাকলে লক্ষ্মীকে।—'এসো।'

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলে, 'আচার খাবে?'

ছবি মাথাটি কাৎ করে বললে, 'খাব।'

লক্ষ্মী ছুটে সেখান থেকে চলে গেল। ছাতে সে রেখে এসেছে আচারের বড় বড় বোয়েম্ রোদে দেওয়া হয়েছে। সেই বোয়েম থেকে এক খামচা আচার তুলে এনে নিজেও খাবে ছবিকেও খাওয়াবে—এই ছিল তার ইচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে যেই সে ছাতে উঠতে যাবে, দেখলে সিঁড়ির ওপর যেখানে ঠেস্ দিয়ে রবি দাঁড়িয়ে আছে।

লক্ষ্মী বললে, 'নেমে এসেছো তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো?'

রবি বললে, 'মাকে বলে দেবো।'

'কী বলে দেবে?'

'ভেবেছো বুঝি আমি কিছু দেখিনি।'

'কী দেখেছ?'

রবি বললে, 'দাদাকে তুমি পান দিয়ে এলে, আবার তার জন্যে আচার আনতে যাচ্ছ।'

লক্ষ্মী বললে, 'বেশ করেছি।'

রবি বললে, 'বেশ তাহ'লে মাকে সেই কথা বলিগে যাই।'

এই বলে সত্যিই সে চলে যাচ্ছিল, লক্ষ্মী ডাকলে, 'ঠাকুরপো, শোনো।'

রবি ফিরে দাঁড়ালো।—'কি শুনবো ?'

'এগিয়ে এসো, বলছি।'

রবি এগিয়ে এলো। বললে, 'বল।'

লক্ষ্মীর চোখেমুখে মিনতির চিহ্ন।

'বোলো না লক্ষ্মীটি।'

'বেশ বলবো না। তুমি আমাকে খানিকটা তুলের আচার এনে দাও।'

'তুলের আচারে হাত দিলে মা বকবে কিন্তু। আমি তোমাকে আমের আচার এনে দিচ্ছি।'

'না, আমের আচার আমি খাব না।'

লক্ষ্মী বললে, 'তাহ'লে তুমি নিজে নেবে এসো!'

রবি বললে, 'মা যদি জিজ্ঞাসা করে—তুলের আচারে কে হাত দিয়েছে? তখন তুমি বলবে না বল।'

'না, বলবো না।'

দু'জনে যড়যন্ত্র করে আচার চুরি করবার জন্ত ছাতে উঠে যাচ্ছিল: সিঁড়ির একটা ধাপ সবে তখন উঠেছে, এমন সময় পেছনে ডাক শোনা গেল—

'বৌমা! বলি ও বৌমা!'

বরদাসুন্দরীর কণ্ঠস্বর!

'এই যে মা—যাচ্ছি।'

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালো বরদাসুন্দরীর কাছে। 'কী বলছো মা?'

'এই যে শুনলুম তোমরা ছাতে খেলা করতে গেলে, ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছো?'

'কিছু না। আমরা যাচ্ছি ছাতে।'

'রবি কোথায়?'

'সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে।'

'শোনো বৌমা, চুপিচুপি বলি।'

এই বলে লক্ষ্মীকে তিনি তাঁর কোলের কাছে টেনে এনে বললেন, 'ছাতে আমি আচারের জায়গাগুলো রেখে এসেছি। আচার দেখলে রবির লোভায় জল সরে। তোমাকে যদি বলে তো কিছুতেই দেবে না। বলবে আকাচা কাপড়ে আচারে হাত দিলে মা বকবে।—যাও খেলা করগে যাও।'

ছাতে যাবার আগ্রহ লক্ষ্মীর যেন কমে গেছে। বললে, 'না মা আমি ছাতে যাব না। তুমি বরং ঠাকুরপোকে ডাকো।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'ঝগড়াঝাঁটি কিছু হলো নাকি রবির সঙ্গে?'

লক্ষ্মী হেসে বললে, 'না মা, সে-সব কিছু হয়নি। তুমি ডাকো না মা ঠাকুরপোকে।'

রবিকে ডেকেই বিপদ বাধালেন বরদাসুন্দরী।

রবি ভাবলে বুঝি তার আচার চাওয়ার কথা মাকে সে বলে দিয়েছে।

'কিন্তু বৌদি যে দাদার জন্তে আচার আনতে যাচ্ছিল তার বেলা কিছু হলো না!'

বরদাসুন্দরী হাসলেন একটুখানি। ব্যাপারটা বুঝলেন সবই। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না কাউকে।

হাতে পুজো।

তখন মাত্র দশ-বারোদিন বেতি। কলকাতা শহরেও পুজোর রং ধরেছে। লোকজনের ভিড়ে পথে আজকাল চলা যায়। নতুন জামাকাপড় কিনেছে সবাই। ফুটপাথে পর্যন্ত দোকান বসে গেছে।

পাড়ায় পাড়ায় সর্বজনীন পুজো। ছেলেরা বেরিয়েছে খাতা আর ছাপা রসিদ বই হাতে নিয়ে। বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করছে।

একদল ছেলেকে বিদেয় করতেই আর একদল এসে আক্রমণ করলে হরেনবাবুকে।

হরেনবাবু কাউকে বঞ্চিত করেন না। প্রত্যেকের দুটি করে টাকা বরাদ্দ।

টাকা দুটি হাতে নিয়ে একটি ছেলে এগিয়ে এলো।

'না স্যার, আপনার কাছে দু'টাকা নেবো না।'

নাছোড়বান্দা ছেলে।

'আপনি অত বড়লোক স্যার, আপনি পাঁচটা টাকা না দিলে আমাদের চলবে কেমন করে?'

হাসলেন হরেনবাবু।

'তোমাদের চলা মানে তো বাবা ফুর্তি করা। আর আমার হবে মুস্কিল। তোমাদের পাঁচ টাকা যদি দিই, আর সবাইকে পাঁচ টাকা করে দিতে হবে।'

ছেলেটি বললে, 'আমরা কাউকে কিছু বলবো না স্যার। আপনি দিন পাঁচ টাকা, কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবো দু'টাকা দিয়েছেন।'

'মিথ্যা কথা বলবে?'

'তাতে কি হয়েছে? এরকম কত বলতে হয়।'

আর-একটি ছেলে এগিয়ে এলো। বললে,

—'এই দেখুন না স্যার রসিকবাবু অত বড়লোক তো! মেরেকেটে আট আনা পয়সা আদায় করলাম। বাদুবাবু জিজ্ঞাসা করলে, ও-ব্যাটা কত দিলে? বললুম—আট টাকা। তখন বাদুবাবু ঝপ্ করে পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়ে দিলে। বললে, রসকে-ব্যাটা অত বড়লোক হয়ে যখন আট টাকা দিয়েছে, আমি পাঁচ টাকার বেশি দেবো না। এখানে যদি সত্যকথা বলতুম স্যার, যদি বলতুম—রসিকবাবু আট আনা পয়সা দিয়েছেন তাহ'লে বাদুবাবু ঠিক দেখতেন চার আনা বের করে দিতো।'

হরেনবাবু মনে মনেই হাসলেন। বললেন, 'না বাবা, আমি দু' টাকার বেশি কিছুতেই দেবো না। তোমাদের টাকা দেওয়ার চেয়ে পুজোর সময় গরীব মানুষকে কিছু দান করা উচিত। যাও তোমরা আর আমাকে বিরক্ত কোরো না। আমার বাড়ীতে পুজো হয় জানো তো? ওই ভাখো সে, ওখানে প্রতিমা তৈরী হয়েছে।'

ছেলেরা তবু ছাড়বে না।

'আর একটা টাকা দিন স্যার। আপনার নামে এই দেখুন তিন টাকার রসিদ কাটছি।'

ছেলেটা রসিদ লিখতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে মাথার ওপর এক ছাতির বাড়ি খেয়ে চমকে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলে এক ভদ্রলোক তাঁর হাতের ছাতিটি তুলে বলছেন, 'না। দু'টাকার এক পয়সা বেশি দিয়েছ কি আমি পুলিশ ডাকবো।'

হরেনবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

'আসুন বেইমশাই, আসুন!'

লক্ষ্মীর বাহন বরেন বাঁড়ুজ্যে এসে বসলেন হরেনবাবুর পাশে। ছেলের দুটি টাকা নিয়েই বিদায় হলো।

'এদের হাত থেকে নিস্তার নেই। আমি গরীব মানুষ। আমাকেও একটি করে টাকা প্রত্যেককে দিতে হয়েছে। পুজো না ছাই! পুজোর নাম করে ফুর্তি! আমার ছেলে গুণধর এক কাণ্ড করে বসেছে।'

'সে আবার কি কাণ্ড করলে?' হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

বলতে বোধকরি লজ্জা করছিল বরেনবাবুর। কিন্তু কথাটা বলে যখন ফেলেছেন তখন না বলেও উপায় নেই। কথা তিনি খুব কমই বলেন, তবু তাঁকে বলতে হলো।

'গুণধরটি আমার সত্যিই গুণধর। ছেলেদের একটা ক্লাব আছে পাড়ায়। উনি তার পাণ্ডা। দু'পয়সা চারপয়সা করে চাঁদা। মাসে তিন চার টাকা আদায় হয়। সন্ধ্যেবেলা প্রায়ই দেখি—এক-ব্যাটা ঘুগ্‌নিওলা এসে দাঁড়ায়। লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুগ্‌নি খায় আর হরদম পেটের অসুখে ভোগে। বুঝলুম—ক্লাবের পয়সাকড়ি ওরই হাতে থাকে। সেদিন একটা ছেলের সঙ্গে খুব বচসা হচ্ছে শুনে চুপিচুপি ঘোরের কাছে গিয়ে শুনি—ঠিক যা ভেবেছিলুম তাই। ছেলেটা আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলো—'বলে দেবো তোর বাবাকে?' গুণধর মেরে দিলে তার মাথায় এক চাটি।

'বলছি তো খাতাটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'বের কর্ খাতা।' ভয়ে ভয়ে গুণধর খাতা বের করলে। দেখা গেল আড়াই টাকার গোলমাল। বুঝলুম আড়াই টাকার ঘুগ্‌নি তখন হয়েছে গুণধরের। আড়াইটি টাকা গচ্ছা দিয়ে খুব করে মারলাম ছেলেটাকে। পরশু দেখি না—আবার সেই ঘুগ্‌নিওলা এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুণধর পাতা চাটছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'পয়সা কোথায় পেলি?' ঘুগ্‌নিওলা বললে, 'ধারে দিলাম বাবু।' বললাম, 'ফের যদি তোমাকে দেখি আমার দরজায় তো আমি পুলিশ ডাকবো।' ঘুগ্‌নিওলা চলে গেল, কিন্তু যাবার সময় আমাকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল।—আমি নাহয় আসব না কাল থেকে, কিন্তু ঘুগ্‌নিওলার অভাব নেই কলকাতায়। পুলিশ ডেকে আমাকে না ধরিয়ে ওই খোকাবাবুকে ধরিয়ে দিন।' বলেই লোকটা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। আমি কিন্তু মরমে মরে গেলাম।'

'মরমে মরে যাবার মতন কি এমন হলো বেয়াইমশাই?'

বরদাসুন্দরী এসে দাঁড়ালেন।

বরেনবাবু বললেন, 'আপনার কাছে আমি একটি আর্জি নিয়ে এসেছি বেয়ানঠাকরুণ।'

'চা-টা খেয়ে আগে একটু ঠাণ্ডা হোন্, তারপর আপনার আর্জি শুনবো। আসুন—ভেতরে আসুন।

দুই বেয়াইকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গিয়ে 'বৌমা!' 'বৌমা' বলে ডাকতে লাগলেন বরদাসুন্দরী।

'দেখে যাও কে এসেছে আমাদের বাড়ীতে।' [ক্রমশঃ]

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

প্রত্যুৎপন্ন প্রত্যুত্তর

বিচিত্র কোন চিত্র বা চরিত্র নয়। এবার শুধু কথা। কথার পিঠে কথা। উত্তরের পিঠে উত্তর।

সঙ্গে সঙ্গে চকিতের মধ্যে মুখের মত জবাব।

এক কথায় প্রত্যুৎপন্ন প্রত্যুত্তর।

এবং সেই উত্তর বা প্রত্যুত্তর এমনই যে তার আর জবাব নেই। অর্থাৎ সেই উত্তর বা প্রত্যুত্তরের মোক্ষম আঘাতে প্রতিপক্ষ শুধু ধরাশায়ী নয়, উত্থানশক্তিরহিত।

ইংরাজীতে এই রকম বাকবিন্যাসকে বলা হয়—রিপার্টি। রিপার্টির ক্ষমতা, সহজ ক্ষমতা নয়। বুদ্ধির শাণিত দীপ্তিতে উজ্জ্বল রসাত্মক রিপার্টি শোনা যেতে পারে ওঁদেরই মুখে, ক্ষুরধার যাঁদের বুদ্ধি, সতীর্থ যাঁদের দেবা, আর অপরিমেয় যাঁদের রসবোধ। এমন মানুষ কোন সমাজে কোনদিনই সুলভ নয়। তাই উল্লেখযোগ্য রিপার্টির সংখ্যাও বেশী নয়। যেগুলি আছে সেগুলি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, কালের সীমা অতিক্রম করে তারা আজো স্মরণীয় হয়ে আছে।

দুই খ্যাতকীর্তি ইংরাজ দেশনায়ক গ্ল্যাডস্টোন ও ডিজরেলির দুর্ধান্ত বক্তৃতাগুলি হয়ত আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু তাঁদের মধ্যেকার সেই বাক্‌যুদ্ধটি আজো আমাদের মনে আছে।

একবার উত্তরের মধ্যে এক তুমুল বচসার মাঝখানে ডিজরেলির এক কঠিন মন্তব্যে গ্ল্যাডস্টোন সরোষে বলে উঠলেন—'হয় তুমি ফাঁসীকাঠে ঝুলে মরবে, নাহয় মরবে কোন অঘন্য রোগে।'

সঙ্গে সঙ্গে ডিজরেলি মুচকি হেসে জবাব দিলেন—'যদি আমি তোমার নীতিকে মেনে নিই অথবা তোমার রক্ষিতাকে গ্রহণ করি তাহলে সে রকম দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়।'

গ্ল্যাডস্টোনের কাছে এর আর জবাব ছিল না।

• • • •

মনে পড়ছে এক জজের মন্তব্যের উত্তরে দিগ্‌গজ আইরীশ কৌঁসুলী জর্জ কুরান-এর সেই মর্মঘাতী প্রত্যুত্তর। একটি ফৌজদারী মামলায় কুরান আসামীর পক্ষে আইনঘটিত এক কূট প্রশ্নের আলোচনা করছিলেন। বিচারকের মনে হল, কুরান-এর যুক্তি নিতান্তই অসারগর্ভ। বিরক্তভাবে তিনি মন্তব্য করলেন—'মিঃ কুরান, আপনি কি আমাকে ফৌজদারী আইন শেখাবার চেষ্টা করছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন কুরান—'না ধর্মাবতার, যা অসাধ্য তার জন্যে আমি চেষ্টা করি না।'

• • • •

প্রত্যুৎপন্ন প্রত্যুত্তরে সিদ্ধহাত ছিলেন উইনস্টন চার্চিল। তাঁর দুটি রিপার্টি স্মরণীয় হয়ে আছে।

রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অবস্থায় চার্চিল উদারনৈতিক দলে যোগ দিয়েছিলেন এবং নাম রাখতে শুরু করেছিলেন।

সেই সময় একদিন এক সান্ধ্য-মজলিশে একটি মহিলা তাঁর সামনে এসে কতকটা চড়া সুরে বললেন—'মিঃ চার্চিল, আপনার নতুন রাজনীতি আর আপনার এই নতুন গোঁফ, এ দুটোর কোনটাই আমার পছন্দ নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে হেসে জবাব দিলেন চার্চিল—'মাদাম, এ দুটোর কোনটারই সংস্পর্শে আসবার সুযোগ কোনদিন আপনার হবে বলে মনে হয় না।'

চার্চিলের সময়ে পার্লামেন্টে একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন লেডী অ্যাস্টর। জবরদস্ত মহিলা। যেমন বোলচাল, তেমনি সাহস। পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে চলতেন তিনি। চার্চিল তাঁকে বরদাস্ত করতে পারতেন না। সুযোগ পেলেই তাঁকে কড়া কথা শুনিয়ে দিতেন। একদিন চার্চিলের এমনি একটা কঠিন মন্তব্য শুনে লেডী অ্যাস্টর দারুন রেগে গিয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে উঠলেন—'আপনি যদি আমার স্বামী হতেন, তাহলে আপনার কফিতে আমি বিষ মিশিয়ে দিতাম।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চার্চিল উত্তর দিলেন—'আপনি যদি আমার স্ত্রী হতেন তাহলে সেই কফি আমি খেয়ে ফেলতাম।'

• • • •

মুখের মত জবাব দিতে, লেডী অ্যাস্টরও কম ছিলেন না।

পার্লামেন্টের সভ্য হবার পর তিনি নানাস্থানে স্ত্রীস্বাধীনতার স্বপক্ষে জোরালো বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন।

স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদীরা অনেক সময়ে তাঁর সেইসব সভায় গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করত। একটা সভায় তাদের নিয়োজিত একব্যক্তি সহসা তাঁর বক্তৃতার মাঝখানে চিৎকার করে উঠল—'বলি ও ঠাকরুণ, বলুন তো দেখি, ভাঁয়োরের পায়ে কটা আঙুল থাকে।'

লেডী অ্যাস্টরের বক্তৃতার স্রোতকে রুদ্ধ করে দিয়ে তাঁকে বিব্রান্ত করে দেবার উদ্দেশ্যেই লোকটা হঠাৎ এই রকম বেয়াড়া প্রশ্ন করেছিল। লেডী অ্যাস্টরের প্রত্যুৎপন্ন উত্তরটি চিরকালের জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রশ্নটা শুনে একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সমান দাপটে তিনি উত্তর দিলেন—'তোমার নিজের পায়ের জুতোটা খুলে ফেল, খুলে গুণে দেখ।'

এই জবর উত্তর শুনে লোকটা মিটিং থেকে পালাবার পথ পায়নি।

একবার লেডী অ্যাস্টর চার্চিলকে পর্যন্ত বাক্যসংগ্রামে ধরাশায়ী করেছিলেন। চার্চিলের সঙ্গে তাঁর ঠোকাঠুকি চলবার বেশ কিছুদিন পরে একদিন এক আসরে লেডী অ্যাস্টর চার্চিলকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি বরাবর লেডী অ্যাস্টরকে পার্লামেন্টের সভ্যারূপে পছন্দ করেন নি।

প্রশ্ন শুনে অকপটে চার্চিল বললেন—'আপনি যখন পার্লামেন্টে ঢুকলেন তখন আমার মনে হল যেন আমার বাথরুমের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ঢুকে পড়েছে এবং তখন সেখানে আমার হাতের সাবানটা ছাড়া নিজেকে রক্ষা করবার আর কিছু নেই।'

লেডী অ্যাস্টর সুযোগ পেয়ে প্রত্যুত্তরে বলে উঠলেন—'একথা কি একবারও আপনার মনে হয়নি যে আপনার চেহারাখানাই আপনার যথেষ্ট রক্ষাকবচ?'

এর আর জবাব খুঁজে পাননি চার্চিল।

• • • •

এক নামকরা রূপসী অভিনেত্রীর প্রগল্‌ভ উক্তির উত্তরে বার্নার্ড শ-র সেই বিখ্যাত মন্তব্যটি আমরা ভুলিনি।

একদা সেই অভিনেত্রীটি বার্নার্ড শ-র কাছে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করলেন। বললেন, —'বিবেচনা করুন মিঃ শ, আপনার সঙ্গে আমার মিলনে যে সন্তান জন্মাবে সবদিক দিয়ে সে কী সুন্দর আর গুণবান হবে! আমার দেহ-লাবণ্য আর আপনার মনীষা নিয়ে যে ছেলে জন্মগ্রহণ করবে, পৃথিবীতে তার তুলনা পাওয়া যাবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন শ'—'কিন্তু যদি সে আমার দেহ-লাবণ্য আর আপনার মনীষা নিয়ে জন্মায় তাহলে কি হবে?'

• • • •

উপসংহারে, আমাদের দেশের বিগত যুগের প্রিয় অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফির প্রত্যুৎপন্ন প্রত্যুত্তরের আশ্চর্য ক্ষমতার একটি উদাহরণ দিই।

একদা একটি অভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখর নাটকের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর চাকরকে ডাক দিলেন, 'হরে ও হরে।' সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি আবার ডাকলেন এবং প্রস্থানোদ্যত হলেন। এমন সময় দ্বিতীয়বার ডাকার সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগারের পিছনের সারি থেকে একজন দর্শক নড়া করবার জন্যে বলে উঠল, 'আজ্ঞে যাই।' অন্য কেউ হলে কি করতেন জানি না। কিন্তু অর্ধেন্দুশেখর ঘাবড়াবার পাত্র ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে থমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই দর্শকের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ও হতভাগা, তুমি ওইখানে বাবুদের সঙ্গে গিয়ে বসেছো, আর আমি এদিকে চিল্লিয়ে মরছি। এদিকে আয় শিগগির! আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন।'

সারা প্রেক্ষাগার বেদম হাসিতে ফেটে পড়ল!

• • • •

বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক গেটে সঙ্গীত সম্বন্ধে নিজেকে বিশেষজ্ঞ বলে মনে করতেন। সঙ্গীত নিয়ে অনেক আলোচনা ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

একবার একজন গায়ক এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

গেটে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বল্লেন আর জুড়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে গভীর গবেষণা সঙ্গীত সম্পর্কে।

বেচারা গায়ক ত অস্থির। অত বিদ্যে নেই তাঁর। শুধু মাথা নাড়া দিয়ে গেটের কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন।

শেষে গেটে পরিতৃপ্ত হাসি হেসে বল্লেন: বুঝলেন ত সঙ্গীতের মর্মকথা?

গায়ক শুধু বললেন: চমৎকার।

গেটে একটু রহস্যের হাসি হেসে বল্লেন: আমার সঙ্গীত-জ্ঞান চমৎকার এই কথাটাই বলতে চান ত আপনি?

গায়ক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্লেন: আজ্ঞে না,—গান জিনিষটা গাইবার জন্যে সৃষ্ট হয়েছে, তর্ক করবার জন্যে নয়। সুতরাং আমি বলতে চাইছিলাম আপনার মূর্খতা চমৎকার।

সাহিত্য সংবাদ

আজ থেকে দু'তিন শ' বছর আগেকার কথা। একখানা বজরা নৌকা চলেছে। ফরিদপুর থেকে আরাকান রাজ্যের দিকে। বজরায় অসংখ্য যাত্রী। ফরিদপুরের নবাবের মন্ত্রী আর তাঁর ছেলেও রয়েছেন এতে। অন্ধকার। হঠাৎ বজরায় সোরগোল প'ড়ে গেল। ডাকাত এসে পড়েছে। ডাকাতদের হাতে প্রাণ হারালেন মন্ত্রী। তাঁর ছেলে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে কোনো রকমে প্রাণ বাঁচালেন। শেষ পর্যন্ত হাজির হলেন আরাকান-রাজের সভায়। তাঁর কবি-প্রতিভা আরাকান রাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। পতন-উত্থানের এক বিচিত্র জীবন শুরু হল। এমনি বিচিত্র জীবন-যাপন ক'রে গেছেন প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি আলাউল।

* * *

চার্লস ল্যাম্ব ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। নিজের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তিনি সচেতনও ছিলেন। একদিন দেখা গেল তিনি একটা বাড়িতে ঢুকছেন। তাঁর চোখে-মুখে অহংকার। আধ ঘণ্টা পরে বেরিয়ে এলেন বাড়ির ভেতর থেকে। তাঁর মুখের অবস্থা তখন দেখবার মতো। দাম্ভিকতাব একেবারেই উবে গেছে। সমস্ত মুখে ফুটে উঠেছে লজ্জার গ্লানি। কী ব্যাপার। একজনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অকপটে জানালেন ইংল্যাণ্ডে এমন লোকও রয়েছেন যাঁর জ্ঞানের হাজার ভাগের এক ভাগও ল্যাম্বের নেই। সেই অসাধারণ মানুষটি কে? ল্যাম্ব যাঁর সঙ্গে স্বল্পকাল আলোচনা ক'রেই নিজের জ্ঞানের দীনতা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি বিখ্যাত কবি ও সমালোচক সামুয়েল্ টেলর্ কোলারীজ্।

* * *

বোখারা রাজ্যের মন্ত্রীদের দুশ্চিন্তার সীমা নেই। কারণ তাদের প্রিয় আমীর মার্ভ নগরে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার সৌন্দর্যে এমনি মজে গিয়েছেন যে আর নিজের দেশে ফিরে আসতেই চাচ্ছেন না। মন্ত্রীরা আর উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত আমীরের সভা কবির শরণ নিলেন। সভা কবি বোখারার রূপ বর্ণনা ক'রে এমন চমৎকার একটি কবিতা লিখলেন যে তা প'ড়ে আমীর স্বদেশে না ফিরে পারলেন না! এমনি শক্তিমান ছিলেন পারস্যের প্রথম গীতি-কবি রুদাকী। তিনি ছিলেন অন্ধ। সেকালের পারস্যে কবিতা লিখে তাঁর মতো এত অর্থ উপার্জন আর কেউ করতে পারেননি। শেষ বয়সে এই কবি সন্ন্যাসী হ'য়ে গিয়েছিলেন।

ব্যাপার যা চলছে

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য গল্প-ভারতী সম্পাদক দায়ী নন।)

ইংলণ্ডের কেনাকাটার বাজারে ধরহরিকম্প। দর চড়ানোর প্রতিবাদে সেখানকার বাড়ীর গিন্নিরা রীতিমত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এই বিদ্রোহ সরকারের বিরুদ্ধে বা কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয়। এই বিদ্রোহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে। প্রায় দু' হাজার গৃহকর্ত্রী এই বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। খবরটি জানাচ্ছেন লণ্ডনের সমাজসেবিকা-রানীরা এক মহিলা—শীলা মন্ট গোমারি। প্রথমে একজন মাত্র গিন্নী এই বিদ্রোহের সূচনা করেন। তিনি তাঁর পাড়ার ন'জন গৃহিণীকে নিয়ে এক ঘরোয়া সভায় স্থির করেন যে বিস্কুটের অন্যায় রকম মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে তাঁরা এক মাস বিস্কুট কিনবেন না।

তারপর 'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।' ...যে জিনিষের দর বাড়ছে, তাকেই গিন্নিরা অ-স্পৃশ্য ঘোষণা করে দিচ্ছেন। ...বর্তমানে দু' হাজারের ওপর গৃহকর্ত্রীরা এই ক্রয়বর্জন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। দোকানদারেরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। অদ্ভুত পরিস্থিতি!

শীলা মন্ট্‌গোমারি বলেছেন, "এই আন্দোলনে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। আমরা এই মোক্ষম অস্ত্রের দ্বারা উৎপাদক, পরিবেশক, মধ্যস্বত্বভোগী ও পাইকার, সকলকে এক সঙ্গে এমন টাইট দিয়ে দিয়েছি যে বাছাধনদের রাতারাতি আক্কেল দাঁত গজিয়ে গেছে। চড়া দর হেঁট মাথা হয়েছে।"

আমাদের দেশের গিন্নিরা দুপুরবেলা সিনেমা না গিয়ে এই রকম একটা পরিকল্পনা নিয়ে চেষ্টা করে দেখুন না কেন।

• • •

আমাদের জাতীয় জীবনে কৌতুকের আর শেষ নেই। সাম্প্রতিককালে একটি সেরা কৌতুক করেছেন দিল্লী সংসদের কয়েকজন সদস্য। এক ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী নাকি বলেছেন, ঐ ব্যবসায়ী আর তাঁর সমগোত্রীয় আরো অনেক শিল্পপতি অকাতরে কো'টি কোটি টাকা "চাঁদা" (?) দিয়েছেন, তবেই স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালানো সম্ভব হয়েছে। অতএব তাঁদের কাছে সমগ্র জাতি ঋণী। কয়েকজন সদস্য তাঁর এই সদম্ভ উক্তি হজম করতে পারেননি। তাঁরা অঙ্ক কষতে লাগলেন। হিসাব করে দেখলেন, ঐ ব্যবসায়ী যে টাকার অঙ্কটা বলেছেন তা শোধ করবার দায় যদি প্রত্যেক ভারতবাসীর হয়, তাহলে মাথাপিছু পঁচিশ পয়সা উশুল দিলেই দেনাটা শোধ হয়। অতএব তাঁরা ক'জন উক্ত ব্যবসায়ীর সদর দপ্তরে প্রত্যেকে পঁচিশ পয়সা পাঠিয়ে দিয়ে নিজের নিজের ঋণ পরিশোধ করেছেন। খুব হাসিঠাট্টা-মস্করা চলছিল ক'দিন এই নিয়ে। ঘরে বাইরে শত্রু। চারিদিকে হাহাকার। একদিকে পাকিস্তান অন্যদিকে চীন আমাদের দেশকে খাবলে খাবলে খাচ্ছে। কিন্তু আমরা দিব্যি নিশ্চেষ্ট। রং তামাসার সুযোগ পেলেই আমরা ভারী খুসী। নাচ গান হৈ হল্লা সংস্কৃতি-শ্রাদ্ধ যেন দিনদিন মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে। এই ক'বছরের মধ্যে সমগ্র জাতটা কি একেবারে নপুংসক হয়ে গেল।

• • •

'ভারত সেবক সমাজ'। নাম ভরা নাম। ভারত ভরা যশ। পাঁয়তাড়াবী প্রতিষ্ঠান। অবশ্যই এবং বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট বিরাট ব্যাপার। বহু বছর এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। কিন্তু তা নামকাবাস্তে। আসল খুঁটি হলেন চেয়ারম্যান। প্রতিষ্ঠানের জন্ম থেকে অদ্যাবধি ঐ পদে সমাসীন স্বয়ং মহারাজ নন্দর মতোই প্রতাপশালী ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ। সম্প্রতি এই মহাভারতসমাজ সম্বন্ধে যে সব গুরুতর অভিযোগ শোনা গেছে তা পড়ে আমরা তো হতভম্ব। এই অভিযোগ এনেছে নগণ্য কোন ব্যক্তি নয়—স্বয়ং পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি—যার কাজ হল, জনসাধারণের টাকা পয়সা কী ভাবে খরচ হচ্ছে তার অনুসন্ধান করা। কমিটির অভিযোগ: ভারত সেবক সমাজ নানাভাবে অনেক টাকা পেয়েছে—কোটি কোটি টাকা। কিন্তু তার খরচ-পত্রের কোন হিসেব নেই। শুধু তাই নয়। আরও নানা গুরুতর অভিযোগ। সেই সব অভিযোগ ৬৪০ পাতার এক প্রকাণ্ড খাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে! তা তো হয়েছে। ঝুলি থেকে বেড়াল তো বেরিয়ে পড়েছে। নন্দাজী উল্টো দৌড় মেরেছেন—অর্থাৎ সমাচার ও সেবকের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন। কিন্তু অতগুলো টাকা! টাকাগুলো কেবৎ পাওয়া যায় না? সে যুগে মহারাজ নন্দর শ্যালক ছিল বাচাল। সে মহারাজের টাকার ভাঁড়ার ঘর ফাঁক করেছিল। এই যুগেও দিল্লী মসনদের আশেপাশে বাচালদের অভাব নেই! হায় সমাচার-সেবক নন্দ! ওরা শুধু তোমাকে নয়—সারা দেশটাকে ডোবালে!!

• • • •

আমাদের দেশে তহবিলের বা টাকার জোর না থাকলে সুবিচার পাওয়া যায় না। যাদের মুরুব্বি আছে, টাকার জোর আছে, মামলায় বড় বড় কৌঁসুলি দেবার ক্ষমতা আছে তাদের বেলায় অনুকূল বিচার। কিন্তু গরীবকে কে দেখে? গরীবের বিচার কে করে? বিশেষ করে আমাদের ছাত্র সম্প্রদায় অনেক সময়েই শিক্ষা অধিকর্তাদের কাছ থেকে এমন অবিচার পেয়েছে যা মারাত্মক। কোন প্রতিকার হয় নি। পরীক্ষার খাতায় ভুল নম্বর দেওয়া, পাশের জায়গায় ফেল করিয়ে দেওয়া, বিচার না করেই পরীক্ষায় বসতে অনুমতি না দেওয়া—এমন অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু সে সব অভিযোগের কোন কিনারা হয়েছে বলে শুনিনি। সম্প্রতি এর একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখা গেল। মহৎ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাটনার খবর। তরুণ ছাত্র কে. এস. রামন বি, এ, পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দেবে। কিন্তু তার নাম পরীক্ষার্থী-তালিকাভুক্ত করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তার আবেদন ব্যর্থ হবার পর রামন এক দুঃসাহসিক কাজ করল। সে তার অভিযোগ ও আবেদন নিয়ে হাজির হল গিয়ে একেবারে পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীনরসিংহেমের কাছে, তাঁর বাড়িতে। তখন রাত্তির বেলা। রবিবার। বিচারক বাড়িতেই ছিলেন। ভৃত্যের মুখে আগন্তুকের খবর পেয়ে তাকে ডেকে শুনলেন তার অভিযোগ। তারপর তখনই সেই রাত্তির বেলাতেই আর দু'জন বিচারপতিকে আহ্বান করলেন তাঁর বাড়িতে। তাঁরা এলেন। আদালত বসল। এরকম আদালত বোধ করি পৃথিবীতে আর কোথাও বসেনি। একে রবিবার ছুটির দিন, তায় রাত্তিরবেলা। কিন্তু বিচারক যখন তার বিচার করতে উদ্যত, তখন ছুটি নেই, রাত্রিদিনের ভেদ নেই। বিচারের বাণী তখন আর নীরবে নিভৃতে কাঁদে না। অমোঘ সে দণ্ড। বিধান কঠিন। কারু সাধ্য নেই তাকে নাকচ করে। বিচারকরা বিচারে বসলেন। রামনের অভিযোগ শুনলেন। তার পর রায় দিলেন: বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি কিছু বলবার থাকে তার জন্য আলাদা শুনানী হবে। তারপর বিচারে সাব্যস্ত

হলে রামনের পরীক্ষার ফল নাকচ করে দেওয়া হবে, কিন্তু ইতিমধ্যে তাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হোক। বিচারের রায় চলে গেল সেই রাত্তির বেলাই। কারণ, পরের দিনই পরীক্ষা শুরু।... রামন পরীক্ষা দিয়েছে।...খবরটি প্রেরণাদায়ক। দেশে এমনধারা নরসিংহের প্রয়োজন আজ বড় বেশি।

• • • •

২৫শে এপ্রিলের সংবাদে জানা গেছে, পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেখানে সেনাবাহিনীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে। রাজাকার আর মুজাহিদরা সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। এক কথায় পাকিস্তান তৈয়ার।...এদিকে আমাদের করলা সংকট। অর্থাৎ করলা পাওয়া যাচ্ছে না। আমার বেহারী করলাওয়ালা জানাল, পাকিস্তান সব করলা টেনে নিয়েছে। অর্থাৎ পাকিস্তানের করলার চাহিদা মেটাতে আমরা কার্পণ্য করছি না। তারা যুদ্ধ করবে। করলার কত দরকার তাদের। তাদের না দিলে চলে! তাছাড়া এই সময় এই সব যুদ্ধের খবর বড়ই বেসুরো। কত নাচগান সংস্কৃতির আয়োজন করেছি আমরা। এ সময়ে আবার ওসব কেন?

• • • •

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসনের প্রেসিডেন্টগিরির দিন নাকি ফুরিয়ে এসেছে। উডরফ নামে এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এই বাণী প্রচার করেছেন। এই লোকটি নাকি ইতিপূর্বে যেসব বড় বড় ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তা ফলেছে। এবারে উডরফ বলছেন, জনসন শিগগিরই স্বাস্থ্যের অজুহাতে অবসর নেবেন, তাঁর জায়গায় আসবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিউবার্ট হামফ্রে। ১৯৬৯ সালেই এই রদবদল ঘটবে। মার্কিনী ওলধাজরা ছোটখাটো কথা বলে না। একেবারে মাথা ঘরে টান দেয়।

• • • •

বিশ্বভারতীর ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন ধরেই অনেক কথা শোনা যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের কুক্ষিগত হয়। সেই সময়েই রবীন্দ্র-অনুরাগীদের মনে নানা কথা ও সন্দেহের উদয় হয়। দেখা যাচ্ছে তাঁদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। বিশ্বভারতী যে ইতিমধ্যে তার ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট অনেকখানি হারিয়েছে এ সত্য আজ আর চাপা দেওয়া যাবে না। এখন সেখানে সেই আগেকার আশ্রমের পবিত্র ভাব ও পরিবেশ আর নেই। সেখানেও নর্দমা-নল প্যান্ট আর ছুঁচোমুখো জুতো ঢুকেছে। সেখানে এখন বড়লোকী চাল। বড়লোকী ব্যাপার। সেখাপড়া সেখানে হচ্ছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের অনেক ফারাক। এই সব চাপা অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে সংসদীয় হিসাব কমিটির রিপোর্টে। এই বিবরণীতে বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের আজীবনের সাধনার পীঠস্থান তার আদর্শ থেকে দিন দিন বিচ্যুত হচ্ছে। পরীক্ষার পাশের হার সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছে, অন্যান্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বিশ্বভারতীর পাশের হার সর্বনিম্ন, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় আর পাঁচটা মামুলী প্রতিষ্ঠানের মতো হয়ে উঠছে।

অনেকদিন ধরেই বিশ্বভারতীর মনেতে ঘুন ধরেছে। জানিনা, ভবিষ্যতে কী আছে। জগতের কাছে গর্ব করবার মতো আমাদের এই একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। তাও বুঝি যেতে বসেছে!

তা যাক গে! আমরা এ বছর বৃষোৎসর্গ-আড়ম্বরে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করছি! কত নাচ, গান, তামাসা!

এদিকে রোজ রাত্রে আমাদের ফৌজের কনভয় চলেছে যশোর রোড ধরে! ওদিকে সাজ সাজ রব। এদিকে নাচ গানের মোচ্ছব!

সত্যি সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দেশ!

বিশ্বের সেরা গল্প

শাদা হাতীর মত পাহাড়

(Ernest Hemingway : "HILLS LIKE WHITE ELEPHANTS")

অনুবাদক—মলয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এব্রো নদীর উপত্যকা জুড়ে যে পাহাড়গুলো সুবিস্তৃত হয়ে রয়েছে, সেগুলোর রং শাদা। পাহাড়গুলোর এপাশটায় ছায়ার একান্ত অভাব, কেননা ছায়া দেবার মত গাছপালা এই জায়গাটায় নেই। রেল স্টেশনটা নিরুপায়ের মত সেই খোলা রোদের মাঝেই পড়ে পড়ে ঝিমোচ্ছে। স্টেশনের দু'পাশে দুটি রেল লাইন—বিপরীতদিগ্‌গামী ট্রেণগুলো স্টেশনের দু'পাশে এসে হাঁক ছাড়ে।

স্টেশনটার মাঝ-বরাবর একটি পানশালা। পানশালার একদিকে, অর্থাৎ এক পাশের প্ল্যাটফর্মের উপর ছায়া পড়েছে—ছায়াটা ঐ পানশালার দ্বারাই রচিত হয়েছে। চারপাশেই খোলা-মেলা, আর তার মধ্যে এই খানিকটা ছায়া ঠাণ্ডায়-গরমে বড় মনোরম। পানশালার ভিতরের চাইতে এ-জায়গাটা বরং ভাল। পানশালার দরজাটা খোলাই, তবে তাতে একটা পর্দা ঝুলছে। আমেরিকান লোকটি এবং তার সঙ্গিনী মেয়েটি ঘরের বাইরে এই ছায়ায় এসে বসল—সেখানে পাতা ছিল একটা টেবিল আর তিন চারটে চেয়ার। বার্সিলোনা থেকে যে এক্সপ্রেস গাড়িটা আসবার কথা, সেটা আসতে এখনও চল্লিশ মিনিট দেরি। এই স্টেশনে এসে গাড়িটা দু-মিনিট দাঁড়াবে, তারপর ম্যাড্রিডের দিকে ফের গাড়ি দেবে।

"কী খাওয়া যায়?" মেয়েটি টুপি খুলতে খুলতে বললে। টুপিটা সে রাখলে টেবিলের উপরেই।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে লোকটি বললে, "ওঃ, কী গরম!"

"বিয়ারই খাওয়া যাক, না কি বল?" মেয়েটি বললে।

পানশালার পর্দাটা সরিয়ে লোকটি চেঁচিয়ে একটা পানীয়ের হুকুম দিলে।

একটি পরিচারিকা চৌকাঠের উপর থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "বড়টা?"

লোকটি জবাব দিলে, "হ্যাঁ, বড়টা—দুটো দিও।"

পরিচারিকাটি দু-গ্লাস বিয়ার আর দুটো কেন্টের প্যাড নিয়ে বেরিয়ে এল। প্যাড আর গ্লাস দুটো টেবিলে নামিয়ে দিয়ে ওদের দুজনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে। লোকটি ঘাড় নেড়ে জানাল, আর কিছু চাই না। পরিচারিকা ভিতরে গেল।

টেবিলের মেয়েটি এতক্ষণ ঐ পাহাড়ের শ্রেণীটার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে ভাবছিল, দেশটার মাটি যেরূপ ধরণের, অথচ পাহাড়গুলো রোদ্দুরে কী শাদা দেখাচ্ছে!

"ঐ পাহাড়গুলো দেখাচ্ছে শাদা হাতীর মত। তাই নয়?" মেয়েটি বললে।

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে লোকটি বললে, "শাদা হাতী আমি কখনো দেখিনি।"

"সেটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

"তার মানে?" লোকটি বলল—"তুমি বলছ, আমার পক্ষে শাদা হাতী না দেখাটা অস্বাভাবিক নয়। তার মানে, না দেখাটাই স্বাভাবিক। তাহলেই কি প্রমাণ হয়ে যায় যে আমি কখনও শাদা হাতী দেখিনি - দেখেও তো থাকতে পারতুম!"

মেয়েটি ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে এপাশে রাখলে। তার নজর পড়ল পর্দাটার উপর। তাতে ছবির ধরণে কি একটা লেখা রয়েছে। মেয়েটি বললে; "ওটা কী? লেখা না ছবি? ওর মানে কী?"

"ওটা একটা পানীয়ের নাম। 'এনিস্ ডেল্ টোরস্'।"

"কেমন খেতে?"

"তুমি খাওনি কোনদিন!" লোকটি পর্দা সরিয়ে ডাকল—"একবার শোন তো।" পরিচারিকাটি ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

"দুটো 'এনিস্-ডেল্-টোরস্' দিও।"

"জল মিশিয়ে? নাকি—"

মেয়েটির দিকে ফিরে লোকটি প্রশ্ন করলে, "জল মিশিয়ে খাবে?"

"তা জানি না। ওর সঙ্গে জল মিশোলে কি ভাল হয়?"

"মন্দ কি!"

"তাহলে জল মিশিয়ে নিয়ে আসি?" পরিচারিকাটি জিজ্ঞাসা করলে।

"তাই আন।"

হাতের গ্লাসটা নিঃশেষ ক'রে নামিয়ে রাখতে রাখতে মেয়েটি বললে, "এটা লাইকরিসের মতন খেতে লাগে। ঠিক যেন সেই রকম।"

"সবই তাই।"

"হ্যাঁ।" মেয়েটি সায় দিলে, "তাই বটে। বিশেষ ক'রে সেই সব জিনিসগুলো, যাদের জন্যে তুমি এতদিন ধরে অপেক্ষা করেছ—যেমন 'এ্যাব্‌সিন্থে'।"

"ও কথা থাক্।"

"তুমিই তো ও কথা আরম্ভ করলে।" মেয়েটি বললে, "আমি তো চাইছিলুম বেশ ফুর্তি ক'রে সময়টা কাটাতে।"

"বেশ তো, সেই চেষ্টাই করা যাক না।"

"বেশ। আমি তো সেই চেষ্টাই করছিলুম। তখন বললুম না—পাহাড়গুলো শাদা হাতীর মত দেখতে? খারাপ বলেছি কিছু?"

"মোটেই না।"

"তারপর আমি এই নতুন পানীয়টা চেখে দেখতে চাইলুম। এটা দেখা, ওটা শোনা, একটা নতুন জিনিস চাখা—সকলেই তো তাই করে।"

"তা করে। করে বৈকি। নিশ্চয়ই।"

মেয়েটি পুনরায় পাহাড়গুলোর দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে। "পাহাড়গুলো দেখতে চমৎকার। অবিশ্যি সত্যি সত্যি ঠিক শ্বেত-হস্তীর মত দেখায় না—তবে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ওদের শরীরগুলো খানিকটা যেন ঐ রকমই মনে হয়। আমি সেই কথা বলছিলুম।" মেয়েটি বললে।

"আর এক গ্লাস ক'রে খেলে কেমন হয়?"

"বেশ তো, আপত্তি কি?"

হু-হু গরম হাওয়ার ঝড়ে উড়ে পর্দাখানা ওদের টেবিলটার গায়ে এসেই কেবল ধাক্কা খাচ্ছিল। সেটাকে সরিয়ে দিতে দিতে লোকটি বললে, "বিয়ারটা বেশ সুন্দর, আর খুব ঠাণ্ডা। তাই না?"

"সত্যি, খাসা।"

"অপারেশনটা কিন্তু আসলে ভীষণ সহজ, জিপ্‌।" লোকটি বললে, "আসলে ওটা একটা অপারেশনই নয়, বলা চলে।"

মেয়েটি টেবিলের গ্লাসগুলো এবং তার নীচের মেঝেটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

"আমি জানি, ওতে তোমার কোন আপত্তি হবে না, জিপ্‌। ওটা, বলতে গেলে, কিছুই না। শুধু হাওয়াটা ঢুকতে একটু সাহায্য করা, এই মাত্র।"

মেয়েটি এবারেও কোন জবাব দিলে না।

"আমি তোমার সঙ্গে যাব এবং পুরো সময়টাই তোমার কাছে থাকব। হাওয়াটা যাতে ভিতরে যায়, ওরা সেইটুকু করবে। আর তার পরেই তো—ব্যস, সব স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।"

"তারপরে আমরা কী করব?"

"তারপরে? তারপরে তো আমরা হয়ে যাব—আগে যেমনটি ছিলুম, তেমনি।"

"এ কথা মনে করার কারণ কী?"

"আরে, ঐ একটা ব্যাপারেই তো আমাদের যা কিছু মাথাব্যথা! ঐ টুকুর জন্যেই তো আমরা অসুখী!"

মেয়েটি পর্দাটার দিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে একটা কোণা ধরে ফেলল। সেটাকে ধরে রেখেই, এবং সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললে, "তাহলে তুমি কি মনে কর যে, আমাদের আর কোন অসুবিধে থাকবে না? আমরা সুখী হতে পারব?"

"আমি জোর গলায় বলতে পারি, আমরা সুখী হব। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আমি এমন বহু লোকের কথা জানি যারা ঐ অপারেশন করিয়েছে।"

"আমিও শুনেছি," মেয়েটি বললে। "আর, পরে তারা সবাই সুখী হয়েছে, তাও শুনেছি।"

"দেখ," লোকটি বললে—"অপারেশনে যদি তোমার ইচ্ছে না থাকে তাহলে দরকার নেই, থাক। ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমায় আমি কোন কিছুই করতে বলব না। তবে, ব্যাপারটা যে খুব সহজসাধ্য, এইটুকু আমি বলতে পারি।"

"তুমি সত্যিই চাও, ওটা হোক?"

"আমার মনে হয়, ওটা ক'রে ফেলাই সবচেয়ে ভাল। তবে তোমার যদি ওতে আপত্তি থাকে তাহলে আমি জোর খাটাতে চাই না।"

"আচ্ছা, আমি যদি রাজি হই তাহলে তুমি খুশি হবে তো? আর, সব কিছু আগের মতনই চলবে তো? আর—তুমি—তুমি আমায় ভালবাসবে তো?"

"আমি কি তোমায় এখনই ভালবাসি না, জিপ্‌? আমি যে তোমায় ভালবাসি তা তো তোমার অজানা নয়?"

"আমি জানি।" মেয়েটি বললে, "আমি জানি তা। আচ্ছা, যদি অপারেশনটা করানোর পর কোনদিন আমি বলি—অমুক জিনিসটা খেতহস্তীর মতন দেখতে—তুমি রাগ করবে না?"

"আরে না না, রাগ করব কেন? বরং আমার ভালই লাগবে। ভাল যে এখনই আমার লাগছে না তা নয়, কিন্তু কি জান—এখন ওসব চিন্তা মাথায় ঠিক নিতে পারছি না। আর তুমি তো

জানই, কোন একটা বিশেষ চিন্তা মাথায় থাকলে আমি কেমন যেন হয়ে পড়ি।"

"আচ্ছা, আমি যদি স্যাটেলাটা চুকিয়েই ফেলি, তখন তো আর তোমার কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না?"

"উঁহু। কেন থাকবে দুশ্চিন্তা? ব্যাপারটা তো একদম সোজা।"

"তাহলে তাই হোক।...আমি আমার নিজের জন্যে ভাবি না।"

"তার মানে?" লোকটি জিজ্ঞাসু হল।

"বলছি কি, আমি আমার নিজের জন্যে একটুও চিন্তিত নই।"

"আমি কিন্তু তোমার ভাল মন্দর দিকে নজর না রেখে পারি না।"

"তা আমি জানি। আমি বাপু নিজের ওপর অত নজর রাখতে পারি না, হ্যাঁ। তবে তুমি বলছ, তাই ভাবছি, কাজটা মিটিয়ে ফেলে মুস্কিল আসান করাই ভাল।"

"আমি বলছি বলেই এ-জিনিসটা করতে হবে, এই যদি তোমার মনোভাব হয়, তাহলে আমি তোমায় এ-ব্যাপারে প্রতিনিবৃত্ত হতে বলব।"

মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে স্যাটেলাইটার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। নদীটার ওপারে, নদীর ধারে ধারেই শস্যক্ষেত। কিছু গাছপালাও আছে ক্ষেতগুলোর মাঝে মাঝে। এদেরকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে রয়েছে পাহাড়গুলো। মন্থরগতি একটা মেঘ নীচের শস্যক্ষেতের উপর চলমান ছায়া ফেলে ফেলে চলে গেল।

"প্রকৃতি আর জীবনকে আমরা সম্পূর্ণ ভাবেই উপভোগ করতে পারতাম",—মেয়েটি যেন নিজের মনেই বলল। "তার বদলে আমরা প্রতিদিনই প্রাপনীয়কে উত্তরোত্তর দুষ্প্রাপ্য ক'রে তুলছি।"

"এ্যাঁ, কি বললে?" লোকটি বলল। কথাগুলো সে ঠিক শুনতে পায় নি।

"বলছিলুম, জীবনে আমরা সবই পেতে পারতুম।"

"পারতুম বলছ কেন—আমরা তা পেতে পারিই তো!"

"না। পারি না।" স্থির কণ্ঠের জবাব এল।

লোকটি প্রত্যয়ের সুর আনতে চাইল কণ্ঠস্বরে—"সারা পৃথিবীটাকেই আমরা ইচ্ছে করলে হাতের মধ্যে পেতে পারি।"

"না, তা পারিনা।"

"যেখানে খুশি আমরা যেতে পারি—কে আটকাবে? করতে পারি যা খুশি।"

"যা খুশি করতে এখন আমরা পারিনা। পৃথিবী এখন আর আমাদের নয়।"

"নিশ্চয়ই আমাদের।"

"আগে হয়ত তাই ছিল, এখন আর নেই। পৃথিবীটা একবার এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেলে আর তাকে ফিরে পাওয়া যায় না।"

"কিন্তু পৃথিবীটা এক্তিয়ারের বাইরে গেল কখন?"

"এখন হয়ত টের পাচ্ছ না, অপেক্ষা কর, বুঝতে পারবে।"

"এই, শুনছ?" লোকটি বলল। "এদিকে এস, এই ছায়ায়। ঐসব চিন্তাকে মনের মধ্যে প্রশ্রয় দেওয়াটা তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না।"

"প্রশ্রয় দিচ্ছি না। যা সত্যি তাই বলছি।"

"দেখ ডিগ্, আমি আবার বলছি, যে কাজে প্রবৃত্ত হতে তোমার মন সায় দিচ্ছে না, সে কাজ তোমায় আমি করতে দিতে চাই না।"

"আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হবে না এমন কোন কাজ তুমি আমায় করতে দিতে চাও না, তা আমি জানি।" মেয়েটি প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চাইল—"আর এক গ্লাস ক'রে বিয়ার নেবে?"

"তা নিচ্ছি। কিন্তু তোমার এটা বোঝা উচিত যে—"

"আমি বুঝেছি। এ আলোচনাটা এখন বন্ধ করা যাক।" মেয়েটি চেয়ারে এসে বসল। বসে, তাকিয়ে রইল পাশা রঙের ঐ পাহাড়গুলোর দিকে। তার সঙ্গীটি তার দিকে চেয়ে আগের কথারই জের টেনে চলল।

"তোমার এটা বোঝা দরকার যে, তোমার অনিচ্ছাকে আমার ইচ্ছে দিয়ে চাপা দিতে আমি আদৌ চাইনা। যেমন চলছে সেইভাবেই চলতে দিতে আমি বিন্দুমাত্র নারাজ নই। মোদ্দা কথা, তোমার ছাড়া কাউকে আমার প্রয়োজন নেই—কাউকে আমি চাই না।"

"তুমি আমার একটা উপকার এখন করবে?"

"আলবৎ। তোমার জন্যে আমি যে কোন কাজ করতে পারি।" লোকটি তৎপরতা দেখাতে চাইলে।

"তাহলে, এখন একটু চুপ করবে দয়া ক'রে?"

লোকটি চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিলে। তার নজর পড়ল দেওয়ালের গায়ে ঠেসানো বড় ব্যাগদুটোর দিকে। একটা ব্যাগ তার নিজের, অন্যটা তার সঙ্গিনীর। ব্যাগদুটোর গায়ে অস্ত্র দেখেন মারা। তারপর সে আবার আরম্ভ করলে, "কিন্তু আমি সত্যিই চাই না যে—

কথার মাঝেই মেয়েটি বলে উঠল, "এবার আমি চেঁচাব কিন্তু।"

পানশালার পরিচারিকাটি দু-গ্লাস বিয়ার নিয়ে বেরিয়ে এল এই সময়। কাউন্টার প্যাডের উপর গ্লাস দুটোকে রেখে সে জানাল যে, ট্রেন আসতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে, "কী বললে? ট্রেন—কী?"

পরিচারিকাটির হয়ে লোকটিই উত্তর দিলে, "পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ট্রেন এসে পড়বে।"

মেয়েটি ধন্যবাদ জানানোর ভঙ্গীতে পরিচারিকার দিকে চেয়ে হাসলে।

"আমি এই ব্যাগদুটোকে বরং ও-প্ল্যাটফর্মে রেখে আসি, লোকটি বললে। মেয়েটি তার দিকেও সদাস্ত দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "বেশ, রেখে এস। ট্রেন আসবার আগে বিয়ারটা শেষ ক'রে ফেলতে হবে।"

লোকটি ব্যাগ দুটো তুলে নিয়ে পানশালার অপর দিকের প্ল্যাটফর্মে রাখলে। তারপর গলা বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করলে, ট্রেনটা এসে পড়ল কিনা। ট্রেন অবশ্য তখনও দৃষ্টিপথের বাইরে। তারপর সেখান থেকে সরে এসে এ পাশের দরজা দিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল পানশালায়। ঢুকে এক গ্লাস পানীয় খেলে। চারপাশে তাকিয়ে দেখল: অনেকেই ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে, কিছু-না কিছু একটা পান করতে করতে। তারপর উল্টোদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। তার সঙ্গিনী তখনও টেবিলেই বসে ছিল।—তাকে দেখে মেয়েটি একটু হাসলে।

"এখন বেশ ভাল বোধ করছ-তো?" লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

"ভালই বোধ করছি," মেয়েটি বললে। "আমার এখন কোন অসুবিধে বা কষ্ট নেই। বেশ ভালই লাগছে।"

———

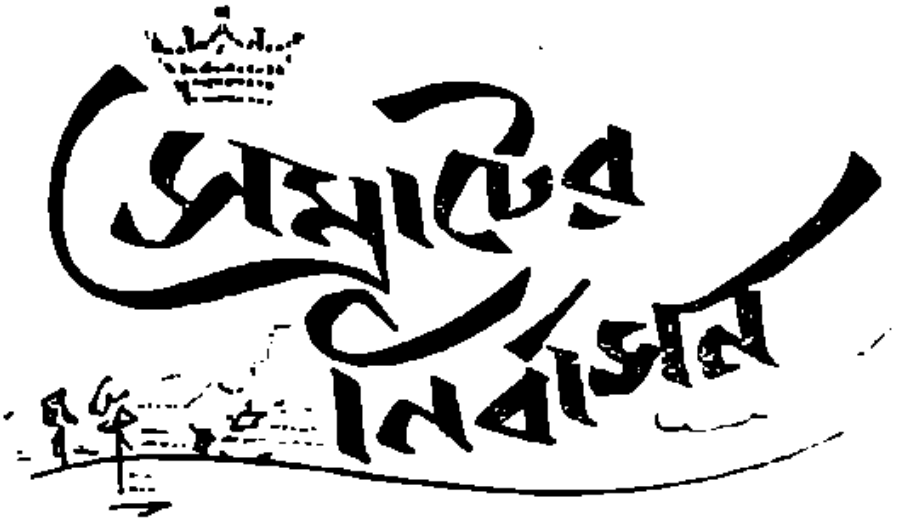

[চার্লি চ্যাপলিনের জীবনরহস্য]

বরকুচি

[এক]

সম্রাট। জনগণমন অধিনায়ক। কোন এক দেশের নয়। সারা দুনিয়ার। চলচ্চিত্রজগতের একচ্ছত্র অধীশ্বর চার্লি চ্যাপলিন।

এক আধ বছর নয়। সুদীর্ঘ চল্লিশবছর তাঁর রাজত্বকাল।

দেশে দেশে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণঢালা রাজকীয় সম্রমের সম্বর্ধনা তিনি পেয়েছেন, দেশভ্রমণকালে কোন রাজাবাদশা সে রকম সম্বর্ধনা পেয়েছেন কি না সন্দেহ।

সারা পৃথিবীর মানুষ চার্লিকে ভালবেসেছে, আপন করে নিয়েছে, তারা মনে করেছে, এই মানুষটি সত্যিই তাদের দরদী বন্ধু, তাদের প্রতিনিধি।

চার্লি চ্যাপলিনের জগৎ-বিস্তৃত জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তাঁর ধরণবৃত্তি, মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা, যা ফুটে উঠেছে তাঁর ছবিতে, তাঁর সদ্য-প্রকাশিত আত্মজীবনীতে।

এই আত্মজীবনীর মধ্যে আমরা পেলাম তাঁর জীবনের বহু বিস্ময়কর নতুন তথ্য, অনেক আশ্চর্য উদ্‌ঘাটন, তাঁর জীবনদর্শন, মনীষা এবং অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতা।

চার্লি চ্যাপলিন নন শুধু একজন চলচ্চিত্রাভিনেতা। তিনি জীবনরসিক, দার্শনিক এবং কবি।

তাঁর বিচিত্র আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর মনস্বীতা আর দার্শনিকতা।

এই আত্মজীবনী যেন এক বিরাট মহাকাব্য, দুঃখের করুণ মূর্ছনায় যার শুরু, সাফল্য-সূর্যের গগনাবস্থিতিতে যার মধ্যগগন উদ্ভাসিত, অবিচার আর লাঞ্ছনায় যার অপরাহ্ণ ম্লান এবং সায়াহ্নের স্বর্গীয় সুষমায় যার পরিণতি!

বিরাট তাঁর জীবনের ব্যাপ্তি। বারে বারে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁর সঙ্গ লাভ করে, তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাঁরা আনন্দ পেয়েছেন, কৃতার্থ বোধ করেছেন। সেই তালিকায় আছেন,

আইনস্টাইন, বীতারক্রক, বুলগানিন, ক্রুশ্চভ, শলিয়াপিন, চার্চিল, নোবেল কাওয়ার্ড, স্টাফোর্ড ক্রিপস, উইল দুরান্ট, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, হ্যারল্ড লাসকি, এমিল লাডুইগ, টমাস ম্যান, হু এম লাই, সমারসেট মম, পিকাসো, সারত্রে, বার্নাড শ, আপটন সিনক্লেয়ার, চিকেন স্পেণ্ডার, জন স্টাইনবেক, এচ. জি. ওয়েলস, অইম এণ্ডওয়ার্ড প্রমুখ বহু সুধী ও বিজ্ঞজন। তাঁর সঙ্গে রাজনীতি সমাজনীতি সাহিত্য কাব্য দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে তাঁরা তাঁর চিন্তাশীলতায় বাকবৈদগ্ধে চমৎকৃত হয়েছেন। তাইতো তিনি আজ শুধুমাত্র একজন চলচ্চিত্রকার নন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের পাশে তাঁর আসন।

মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যে তাঁর জন্ম। সেজন্য তাঁর সার্থক।

জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। অনেক আঘাত। কিন্তু কোন অবস্থাতেই জীবনের প্রতি মানুষের প্রতি তাঁর মন বিমিয়ে ওঠেনি। চিরকাল তিনি বিশ্বাস করেছেন দুঃখের তিমিরেই জ্বলে মঙ্গল আলোক এবং সে আলোয় জয় হবে।

তাই দুঃসহ দুঃখের মধ্যেও তিনি হেসেছেন, মানুষকে হাসিয়েছেন। হাসির মধ্যে দিয়ে কাঁদিয়েছেনও।

তারপর তাঁর জীবনে দুঃখের দিন শেষ হয়ে যখন অভাবনীয় সাফল্য এলো, এলো ছকুলপ্লাবী অর্থপ্রাচুর্য তখন তিনি বিহ্বল হলেন বটে, কিন্তু মনের মধ্যে কোন বিকার এলো না, জীবন সম্বন্ধে তাঁর মতবাদের পরিবর্তন ঘটল না।

সেই নির্ভীক দুঃসাহসী মন আর মতবাদের জন্যেই সাফল্যের তুঙ্গে বসেও তাঁর জীবনে এলো দুর্বিপাক, অবিচার আর কুটচক্রের আবর্তে পড়ে তিনি নিশ্চিহ্ন হবার মতো অবস্থায় পড়লেন। তাঁর পরবর্তী জীবনের সেই অধ্যায় যেন এক রোমাঞ্চকর উপন্যাস। সেই অধ্যায়ের মধ্যেই তাঁর জীবনের মহত্তম প্রকাশ। সেই অধ্যায় নিয়েই আমাদের এই কাহিনী।

॥ দুই ॥

১৯৩১ সালের মাঝামাঝি। সিটি লাইট্‌স্ ছবি মুক্তিলাভ করেছে এবং দিকে দিকে দেশে দেশে অভাবিত সাফল্য আর অর্থ অর্জন করেছে।

কিন্তু চার্লির মনে সুখ নেই।

নির্বাক ছবির যুগ শেষ হয়েছে। হলিউডের জীবনে এসেছে প্রচণ্ড পরিবর্তন।

নির্বাক পর্দার তারকারা প্রায় সকলেই চিত্রগগন থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

টকির দিন এসেছে। ছবি কথা বলছে।

হলিউডের সেই শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ আর নেই। চতুর্দিকে কোলাহল কর্মব্যস্ততা আর যন্ত্রের ঝনৎকার।

শব্দযন্ত্রীরা স্টুডিওগুলোকে ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরী করছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাউণ্ড ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে। তার সঙ্গে নানারকমের নানা আকারের যন্ত্রপাতি। বৈদ্যুতিক তারের জটলায় চারিদিক সমাকীর্ণ। টেকনিসিয়ান তার কানে যন্ত্র, হাতে যন্ত্র, মাথায় যন্ত্র নিয়ে বিচিত্র

সাজঘোষাকে শব্দক্ষেপণকে নিয়ন্ত্রিত করছে। অদ্ভুত দেখতে লাগছে সেই সব যন্ত্রীদের, তারা যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে নেমে এসেছে।

অভিনেতারা আর স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে না। মাইক্রোফোনের সঙ্গে তাদের সর্বদা সংলগ্ন থাকতে হচ্ছে।

সমস্ত ব্যাপারটা চার্লির কাছে যেমন জটিল তেমনি নিরানন্দকর মনে হচ্ছে। এতসব যান্ত্রিক কৌশলের মাঝখানে অভিনয়শিল্পীর ভিতরকার সৃজনীশক্তি কেমন করে ফুটবে? হতাশ হলেন তিনি, বিরক্ত হলেন, কিন্তু অতঃপর তিনি নিজে কি করবেন?

এই সময় তিনি তৃতীয়বার বিবাহ করলেন। তাঁর তৃতীয় স্ত্রী পলেট গডার্ড ফুটিবাজ বুদ্ধিমতী মেয়ে। সম্প্রতি তার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছিল। চার্লির ভাল লাগল তাকে।

তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, নিশিবাসরে, রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লাগলেন।

কিন্তু এই সমস্ত সুখসম্ভোগের অন্তরালে মনে মনে তিনি নিরন্তর অপরাধী বোধ করতে লাগলেন। এ তিনি কি করে চলেছেন? আর কি কোন কাজ নেই তাঁর?

সহসা তাঁর মনে আর-একটি নির্বাক ছবি করবার পরিকল্পনা জাগল। মনে মনে স্থির করলেন পলেট গডার্ড হবে সেই ছবির নায়িকা।

নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড্ নামে পত্রিকার এক সাংবাদিকের সঙ্গে কিছুকাল আগে তাঁর যে আলোচনা হয়েছিল তা মনে পড়ল। সেই সাংবাদিক তাঁকে জানিয়েছিল, ডেট্রয়েট শহরে বড় বড় কলকারখানার নিষ্পেষণে কত শত সুস্থ স্বাস্থ্যবান কর্মী ও শ্রমিক অল্পকালের মধ্যে কী রকম শক্তিহীন ও পঙ্গু হয়ে পড়ছে তার ভয়াবহ ও করুণ চিত্র যেন চার্লি একবার সেখানে গিয়ে দেখে আসেন।

সেই আলোচনাই মডার্ণ টাইম্স্ ছবির প্রেরণা।

পলেট গডার্ড হল সেই ছবির নায়িকা। দুঃস্থ দুঃখী ছিন্নবাসা এক তরুণী।

তাকে মলিন হতশ্রী দেখাবার জন্যে চার্লি যখন পলেটের গালে কপালে কালো পৌঁচ লাগিয়ে দিলেন তখন পলেট কেঁদে ফেললো।

চার্লি বললেন, ওগুলো কালি নয়, ওগুলো তোমার বিউটি স্পট।

মডার্ণ টাইম্স্ মুক্তি পাবার আগে কোন কোন চিত্রসমালোচক লিখল যে, শোনা যাচ্ছে, ছবিটা নাকি কমিউনিষ্ট-পন্থী।

কথাটা অনেকদিন পর্যন্ত মুখে মুখে চালু ছিল।

* * * *

মডার্ণ টাইম্স্ মুক্তি পাবার পর চার্লি তাঁর নতুন স্ত্রীকে নিয়ে হনলুলু বেড়িয়ে এলেন। বিভার্লি হিলস-এ নিজের বাসস্থানে ফিরে এসে শুনলেন, ছবিটা বিপুল সাফল্য লাভ করেছে।

চার্লির মনে নতুন করে আবার চিন্তা জাগল। আবার কি নির্বাক ছবি করবেন? একমাত্র তিনি ছাড়া তখন হলিউডে আর কেউই নির্বাক ছবি করছে না। কথা না বলে, শুধু চোখমুখ হাতপা নেড়ে যে অভিনয়পদ্ধতি এতদিন চলে এসেছিল এবং যে পদ্ধতির চরমোৎকর্ষ সাধন করেছিলেন চার্লি চ্যাপলিন, সবাকচিত্রের দাপটে সে-পদ্ধতি অচল হয়েছে।

চার্লির মনে হল, সবাকচিত্র করবার মত সঙ্গতি ও ব্যবস্থা তাঁর আছে, কিন্তু নির্বাক অভিনয়ে

তিনি যে শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করতে পারতেন, হয়ত সবাক অভিনয়ে তা পারবেন না, তাঁর এতকালের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা হয়ত নষ্ট হবে। চার্লির মন নৈষ্কর্ম্যের বিষাদে আচ্ছন্ন হল।

এদিকে পলেটের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না।

এক বছরও হয়নি, ইতিমধ্যেই নানান খিটিমিটি ও মতান্তর ঘটছে প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়।

পলেট প্যারামাউন্ট কোম্পানীতে অভিনয় করবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হল। ইচ্ছে না থাকলেও চার্লি বাধা দিলেন না। দাম্পত্য জীবনের ব্যবধান আরও দুস্তর হল।

। তিন ।

যুদ্ধ বাধল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

চার্লি একটি চিত্রনাট্য রচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু কাজ এগুলো না। প্রেমের গল্প হাসির গল্প তখন আর তাঁর ভাল লাগছে না। নাৎসী বর্বরতার বিবরণ শুনছেন আর তাঁর মনের মধ্যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে।

পৃথিবীতে একমাত্র লোক যাকে সর্বান্তকরণে চার্লি ঘৃণা করেছেন, সে হচ্ছে অ্যাডলফ্ হিটলার।

১৯৩৭ সালে আলেকজাণ্ডার কর্ডা চার্লিকে বলেছিলেন, আপনি হিটলারকে নিয়ে একটা ছবি করুন! হিটলার এবং আপনার ভবঘুরে-চরিত্রটির মধ্যে যে আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে তাই দিয়ে মানুষ-চেনার ভ্রান্তি সৃষ্টি করুন। আপনি দুটো চরিত্রই অভিনয় করতে পারবেন, একাধারে হিটলার এবং ভবঘুরে।

হঠাৎ চার্লির সেই কথা মনে পড়ল। তাঁর মনে হল, এই তো হাতের কাছেই একটা ঘুসোপযোগী ছবির উপাদান রয়েছে। ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে শ্লেষের মধ্যে দিয়ে হিটলার চরিত্রকে রূপায়িত করবার জন্যে তাঁর মনে প্রবল বাসনা জাগল।

দু'বছর ধরে তিনি গ্রেট ডিকটেটর ছবিটির চিত্রনাট্য তৈরী করলেন। তারপর তার কাজ শুরু হল। লোক জানল, চার্লি চ্যাপলিন হিটলারকে নিয়ে ছবি করছেন।

ছবির কাজ আধাআধি এগিয়েছে, এমন সময় তিনি নানা ভয়-দেখানো উড়ো চিঠি পেতে লাগলেন। তাঁর প্রযোজক ইউনাইটেড আর্টিস্ট জানালো যে হিটলার বিরোধী এই ছবি হয়ত সেন্সর পাস করবে না। ব্রিটিশ সেন্সর কর্তৃপক্ষের মতও প্রায় সেই রকম। হয়ত এ ছবি ইংলণ্ডে দেখানোই চলবে না। কারণ তখনো ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি।

কিন্তু চার্লি দমলেন না। কঠিন তাঁর পণ, অদম্য তাঁর অধ্যবসায়। ছবির কাজ এগিয়ে চলল। হিটলারকে লোকচক্ষে হেয় করতেই হবে। মানুষকে যে বিনা বিচারে হত্যা করে, নরনারী শিশুবৃদ্ধ কাউকে যার মেহ নেই, সেই জল্লাদকে চার্লি কোনদিন বরদাস্ত করতে পারবেন না। তাঁর হাতে যে ক্ষমতা আছে হিটলারের বিরুদ্ধে তা তিনি প্রয়োগ করবেন।

তাঁর নিউইয়র্ক আপিস থেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ এলো, দয়া করে এ ছবির কাজ বন্ধ করুন। আমেরিকায় বা ইংলণ্ডে এ ছবি কোনদিন মুক্তি পাবে না।

কিন্তু চার্লি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দরকার হয় নিজে হল ভাড়া নিয়ে ছবি চালাবেন।

শেষ হল ছবির কাজ। আর সেই সঙ্গে ইংলণ্ড নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

তারপর খবর এলো, হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছে। সারা আমেরিকার চাপা উত্তেজনা। চার্লির কাছে তখনো উড়ো চিঠি আসছে। কেউ লিখছে, যে সিনেমায় এই ছবি দেখানো হবে সেই সিনেমায় সেই সময় বোমা পড়বে, নাহয় হাঙ্গামা লেগে যাবে, চার্লিকে খুন করে ফেলা হবে। ইত্যাদি। কিন্তু চার্লি কোন বিপদকেই ভয় করেন না। দুর্জয় তাঁর সাহস আর অপরাজেয় তাঁর জীবনীশক্তি।

নিউ ইয়র্কের দুটি সিনেমা গৃহে গ্রেট ডিকটেটর খোলবার ব্যবস্থা হয়েছে। তার আগে সাংবাদিকদের ছবিখানা দেখানো হল। অভিমত শোনা গেল, হ্যাঁ, একখানা ছবি বটে। কিন্তু খরচ উঠবে না।

সাংবাদিকদের কথা ফলেনি। দুটি ছবিঘরে গ্রেট ডিকটেটর পনেরো সপ্তাহ ধরে চলেছিল এবং টিকিট বিক্রয়ের দিক থেকে চার্লির আগেকার সমস্ত ছবির রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল।

পত্রিকায় পত্রিকায় সমালোচনা বেরুলো। ভালোর মন্দর মেশানো সমালোচনা। অনেক সমালোচকই ছবির শেষ বক্তৃতাটা পছন্দ করল না। তাদের মতে বক্তৃতাটা কমিউনিস্টধর্মী। কিন্তু জনসাধারণ সেই বক্তৃতাকে বিপুল অভিনন্দন জানালো।

চার্লির মনের প্রতিক্রিয়া এবং তাঁর ভাবনাকে বোঝবার জন্যে বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করে দেওয়া হল। ছবির উপসংহারে সেই একনায়ক-ভস্মুরে জনতাকে উদ্দেশ করে বলছে—"আমি সম্রাট হতে চাই না। সম্রাট হওয়া আমার কাজ নয়। আমি শাসন করতে চাই না। আমি কারুকে জয় করতে চাই না। আমি সকলকে সাহায্য করতে চাই, তা সে শাদা চামড়ার মানুষই হোক, বা কালো চামড়ারই হোক। আমরা পরস্পরের সুখ-শান্তি চাই, দুঃখ-দুর্দশা চাই না। আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করতে চাই না, ভালবাসতে চাই। এ পৃথিবীতে সকলকারই স্থান আছে। এই উর্বরা বসুন্ধরায় কারুরই অন্নের অভাব হবার কথা নয়। জীবনের পথ সুন্দর এবং স্বাধীন হতে পারে। কিন্তু সে পথ আজ আমরা হারিয়েছি। লোভের বিষে মানুষের আত্মা কলুষিত হয়েছে। ঘৃণায় আচ্ছন্ন হয়েছে মানুষের মন। আমাদের জ্ঞান বেড়েছে,-কিন্তু আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি। আমাদের চিন্তাশক্তি বেড়েছে কিন্তু অনুভূতি মরে গেছে। যন্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়। চতুরতার চেয়ে দয়া ও ক্ষমা বড়। পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাই ভাই সম্পর্ক চাই। যন্ত্র দুর দেশে এমন মানুষ রয়েছে যারা নানা ভয়ঙ্কর মতবাদের এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার নাগপাশে বন্দী। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, হতাশ হয়ো না, এই দুর্দিন কেটে যাবে, মানুষে মানুষে ঘৃণ্যতা দূর হবে, ডিকটেটররা নিপাত যাবে, মানুষের ক্ষমতা মানুষের হাতে ফিরে আসবে। মানুষের স্বাধীনতা কেউ কোনদিন কেড়ে নিতে পারবে না। সৈন্যগণ! যারা তোমাদের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, যারা তোমাদের কামানের খোরাকে পরিণত করেছে, যারা তোমাদের সুকুমার হৃদয় বৃত্তিকে নষ্ট করেছে, তারা সব অস্বাভাবিক মানুষ। তাদের যন্ত্র-মন, যন্ত্র-হৃদয়। তাদের কাছে তোমরা আত্মসমর্পণ করো না। তোমরা তো যন্ত্র নও, তোমরা মানুষ। মানুষের প্রতি তোমাদের বুকে ভালবাসা আছে, সেই ভালবাসার বদলে বিদ্বেষ-পোষণ করো না। সৈন্যগণ! মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধবার জন্যে যে যুদ্ধ তাতে তোমরা যোগ দিও না, স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ কর। সেন্ট লিউক ধর্মগ্রন্থের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে লেখা আছে, মানুষের মধ্যেই ভগবানের রাজত্ব, কোন একজন বা কোন একটা দলের

মানুষের মধ্যে নয়, সকল মানুষের মধ্যে। তোমরা সেই মানুষ। তোমরা এই পৃথিবীতে সুখ-শান্তি আনতে পার, জীবনকে সুন্দর করতে পার। গণতন্ত্রের নামে এসো, আমরা সকলে সেই কাজে ঐক্যবদ্ধ হই। গণতন্ত্র আজ ক্ষমতাশালী হয়েছে। সে আমাদের অনেক মিথ্যা স্তোক বাক্য শুনিয়েছে। কিন্তু কোন একনায়কের কথা আমরা শুনবো না। আমরা সমগ্র বিশ্বের মুক্তির জন্য লড়াই করব। জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হব আমরা, লোভ এবং অবিশ্বাস থেকে মুক্ত হব। আমরা সেই পৃথিবীর জন্যে যুদ্ধ করব, যে পৃথিবীতে বিজ্ঞান মানুষকে মারবার অস্ত্র শুধু তৈরী করে না, মানুষের জন্যে সুখ ও সমৃদ্ধি আনে। সৈনিকগণ! গণতন্ত্রের নাম নিয়ে তোমরা একতাবদ্ধ হও। ..... হানা! তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? চেয়ে দেখ, আকাশ থেকে মেঘ সরে যাচ্ছে, সূর্য উঠছে। অন্ধকার থেকে আমরা আলোর দিকে চলেছি। আমরা এক নতুন জগতের সামনে দাঁড়িয়েছি। সে জগতে দয়া আছে, মমতা আছে, ক্ষমা আছে, নেই ঘৃণা, নেই লোভ, নেই পাশবিকতা।..... চেয়ে দেখ হানা! মানুষের আত্মা পাখা মেলে চলেছে রামধনুর দিকে, আশার রামধনু, নতুন জীবনের রামধনু।..... মুখ তোল, হানা, চেয়ে দেখ।"

পরবর্তী অধ্যায়ে: গ্রেট ডিকটেটর ছবি নিয়ে চারিদিকে তুমুল হৈচৈ: চার্লির প্রতি সাংবাদিকদের এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের বিরোধিতা: রুশ যুদ্ধত্রাণ সমিতির উদ্যোগে আহূত সভায় চার্লির বক্তৃতা: পলেট গডার্ডের সঙ্গে বিচ্ছেদ: জোন বেরি নাম্নী এক চরিত্রহীনা রমণীর শঠতায় চার্লির বিরুদ্ধে মামলা: সাংবাদিকদের বিদ্রোপাত্মক: উনা ওনীলের সঙ্গে পরিচয় ও পরিণয়: মার্কিন রাষ্ট্র ধুরন্ধরদের কূটচক্র।

মাছি

অমিলকুমার ভট্টাচার্য

ক'দিন ধরেই একটা মাছি ক্রমাগত উৎপাত করছিলো।

একটা ছোট্ট মাছি; কিন্তু বন্ধুর দেওয়ার কী অপরিসীম ক্ষমতা এই ইতর প্রাণীটার। ক্রমশই উত্যক্ত হয়ে উঠছিলেন মিস্টার মুখার্জি। মিস্টার মুখার্জি মানে, বিত্তবান পুরুষ সত্তীব মুখোপাধ্যায়। যদিও বাঙালী ঘরে জন্ম; কিন্তু আচার-আচরণে একেবারে সাহেবী মানুষ।

শহরের অনতিদূরে পরিচ্ছন্ন সুদৃশ্য বাংলো। বাংলোর নাম, 'দি গ্রিন ভ্যালি!'

ছোট্ট সংসার তাঁর। তিনি নিজে, তাঁর স্ত্রী 'মেমসাব,' আর একটি মাত্র অনূঢ়া কন্যা 'মিসিবাবা।'

আর যারা, তারা ইতরজন। বয়, বাবুর্চি, খানসামা, আয়া,—অর্থাৎ চাকর লোক।

মুখার্জিসাব বাইরে রসিকতারি লোক। অফিসে কড়া মেজাজী। ঘরে ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করবার উপায় নেই; কেননা, ঘরে 'মেমসাব' বৈষম্যটাই সব।

মিসিবাবা উজ্জ্বল কিশোরী,—তারুণ্যের দরজায় পা দিয়েছে। মুখার্জি পরিবারে এখনো কচি খুকি, বেবি বললেও চলে। আধ আধ ইংরেজির সঙ্গে বাংলা মিশানো কথা, কণ্ঠস্বরে ক্ষিপ্রতা; আর এখনো ব্যবহারে আহ্লাদীভাবে আটখানা।

সাধারণ বাঙালী পরিবারের মেয়ে হলে এমনভাবে স্কার্ট আর ইংলিশ ফ্রক পরে ঘুরে বেড়ানো চলতো না। দেহের যৌবনকে পুরুষ মানুষের চোখের সামনে এমনভাবে প্রকট করে মেলে ধরতে লজ্জা হতো নিশ্চয়ই। অন্তত: মা শাসন করে বসন ধরাতেন।

মিসিবাবার খুব ফুলের সখ।

আর তার জন্যে বাংলো-সংলগ্ন বাগানের ফুলচর্চায় মুখার্জিসাবকেও মাঠে নামতে হয় সিল্কের পায়জামা আর আদ্দির পাঞ্জাবী পরে। আদুরে মিসিবাবার সখকে সমর্থনা জানাতে কাঁচি হাতে নিয়ে ফুলের আগাছাকে পরিষ্কার করতে মালির সঙ্গে মুখার্জিসাবও বাগানের কাজে লেগে যান।

মেমসাব বকাবকি করেন, 'যত রাজ্যের বাগানের ধুলো পায়ে-হাতে মেখে বাপ-মেয়েতে অখলিসনা করা!'

মুখার্জিসাব একথা গায়েই মাখেন না।

'পাপা প্রিমরোজটার কলারিং দেখো!'—মেয়ের কণ্ঠে খুশির বন্যা।

'অতসি ডালি!'

'আর কী সুইট স্মেল!'

মুখার্জিসাব হেঁট হয়ে গোলাপ গাছের প্রিমরোজের মিষ্টি আঘ্রাণ নেন। কিন্তু এ কী উৎপাত!

ঠিক সেই সময়েই নাকে বসলো একটি মাছি।

মুখার্জিসাব অনেকবার চেষ্টা করলেন মাছিটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু না, ঘুরে ফিরে বার বার মাছিটি এসে নাকে বসে। অনভ্যাসি আওয়াজ:

বিশ্রি বিরক্তিকর।

বাগানের মাছি ঘরেও সংক্রামিত।

চায়ের টেবিলে বসেছেন মুখার্জিসাব। স্যাক-সাজানো প্লেটে মাছি। খানসামা কিংবা বাবুর্চি হলে এক্ষুনি তার উপযুক্ত শাস্তি পেতো। এক্ষুনি তাকে তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিতেন।

এমন অসাবধানতা কেন? এ বেয়াদবির উপযুক্ত শাস্তি তিনি দিতেনই। একবার সরোষ গর্জনে হুঙ্কারও ছাড়লেন তিনি। কিন্তু-প্রতিবাদ তাঁর বাধা খেয়ে ফিরে এলো। মেমসাব ধৈর্যবতীই প্রেয়তরে স্যাণ্ডুইচ আর কেক সাজিয়েছেন। আর সেই খাদ্যদ্রব্যের ওপর একটি কালো মাছি।

খাবারটা পালটে দেওয়া হলো। এবার সযত্নে খাবার ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসে টি টেবিলে রাখা হলো। মুখার্জিসাহেব নিজে সতর্কতার সঙ্গে খাবারের ঢাকনি খুললেন।

কী আশ্চর্য! কোত্থেকে সেই কালো মাছিটির আবার আবির্ভাব।

হাতের সোড়ায় যা দেবেন,—রাগে তাই ছুড়লেন মুখার্জিসাব মাছি কিন্তু অক্ষত। সেই রকমই ভন্ ভন্ করে ওড়ে আর খাবারের প্লেটের কাছে এগিয়ে আসে।

বিলিতি মেটের মশারি ফেলে রাত্তিরে শুয়েছেন।

সুখ এবং নিরুদ্বেগ জীবন। মেমসাব এখন ধৈর্য,—ঘরোয়া এবং স্বামীর কণ্ঠলগ্না।

আশ্চর্য, সেখানেও মাছি।

নাকের ডগায়, কপালের রেখায়, কানের আশেপাশে। ভন্, ভন্, ভন্!

'কে মশারি ফেলেছে?' মুখার্জিসাব সরোষে গর্জন করে উঠলেন।

প্রিয়তমা পত্নী বললেন, 'আমি।'

'তোলো মশারি, ফ্লিট আনো।'

মশারির বাইরে মাছি উড়ে গেলো বটে। তবে ঘরের বাইরে নয়। আর মুখার্জিসাবের তন্দ্রাকে জাগিয়ে রাখলে সারারাত্তির ওই মাছির ভন্‌ভনানি।

জীবাণু-নাশক কেমিক্যালস্ এলো। এমন কি আঠা মাখানো কাগজও। কিন্তু মাছি ঘরে কই?

ঘরে বাইরে মাছির উৎপাত।

শহরের রাজপথ বেয়ে দ্রুতগতিতে মোটরে চলেছেন মুখার্জিসাহেব। ঘাড়ে একটা শিহরণ অনুভূত হলো। বিশ্রী অস্বস্তিকর। ঘাড় ফেরাতে না ফেরাতেই কানে এলো ভন্, ভন্, ভন্!

'এই ড্রাইভার রোখো!'

ড্রাইভার ব্রেক কষলে।

'হুজুর!'

'নিকালো শালা লোকো!'

'কৌন হায়!'

শোফারের প্রশ্নে মুখার্জিসাব আত্মস্থ হয়ে ওঠেন।

'কুছ নেহি, চলো!'

মাছি তৎক্ষণে উড়ে গেছে।

আবার অফিসের চেম্বারেও সেই মাছি।

ঘর, বেয়ারা, কমলোর, বড়বাবু পর্যন্ত সবে তটস্থ। বড় সাহেবের চেয়ার এবং টেবিলের চারপাশে মাছির উপদ্রব

সেই মাছিকে সবংশে নির্মূল করা যায় না? আশ্চর্য!

বড় সাহেবের চেম্বারের ফ্লাওয়ার ভাস সরিয়ে নেওয়া হলো। ফুলের জন্যেই মাছির উৎপাত।

মুখার্জিসাব কড়া হুকুম দিয়েছেন, অফিসে আর ফুল ঢুকবে না।

চিঠির পর চিঠি সই করে চলেছেন মুখার্জিসাহেব।

হঠাৎ দেখলেন কালির দোয়াতে কোথা থেকে একটা মাছি এসে পড়েছে। কালিতে আটকে তার পাখা, যতই ছটফট করে কালির আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে ততই সে কালিতে আরো জড়িয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে মাছিটা নিস্তেজ হয়ে এলো।

কলম হাতে নিয়ে মুখার্জিসাহেব দেখলেন বিপন্ন মাছিটির মৃত্যু যন্ত্রণা। অবচেতন মনে একটা হয়তো প্রতিহিংসার আনন্দ!

অফিস থেকে তাড়াতাড়িই ফিরলেন মুখার্জিসাহেব সেদিন।

শরীরটা ভালো লাগছে না। মনটাতেও কেমন যেন স্ফূর্তির অভাব।

'দি প্রিমরোজে'র গেটের দরজায় ঝকঝকে ক্যাডিলকখানা ঢুকতেই বেয়ারাদের এসে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলেন। সমস্ত আভিজাত্য আজ তাঁর ধূলায় লুণ্ঠিত।

'হোয়াটস্ হেপেনড? হয়েছে কী?' মুখার্জিসাব বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

হৈমবতী খাঁটি বাঙালিঘরের মেয়ের মতনই কান্নাভাঙা গলায় উত্তর দিলেন, 'সর্বনাশ হয়েছে আমাদের।'

'মানে?'

'ডল নেই।'

মা ডাকেন মেয়েকে আদর করে ডল বলে। আর বাপ ডাকেন, ডালিয়া। ফুলের সখ মেয়ের। নাম তাই ডালিয়া।

মুখার্জিসাব রাগ টানলেন।

'চলো ঘরে যাই।' চাকর-বাকরদের সামনে সীন ক্রিয়েট করা চলে না।

মুখার্জি জায়া-তবু সামলাতে পারেন না।

'ঘর কী আমাদের আছে? পোড়াকপালী ঘর আমাদের ভেঙে দিয়ে গেছে।'

'হোয়াট ইউ মিন?'

'মাছি। মাছির মতন কদাকার একটা ছেলের প্রেমে পড়ে ডল আমাদের ঘর ছেড়েছে।'

মুখার্জিসাহেব স্ত্রীকে নিয়ে বাংলোর ঘরে ঢুকলেন।

আর কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেলো তিনি নিজেই লন সংলগ্ন ফুলের গাছগুলি নির্মূল করতে ধারালো কাঁচি হাতে বাগানে নেমেছেন।

চমক

সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে আড়াই মাইল উপরকার হ্রদ

দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম হ্রদ 'টিটিকাকা'র অবস্থান সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে আড়াই মাইল উপরে। এটি দৈর্ঘে ১৩০ আর প্রস্থে ৩০ মাইল। কোনো কোনো জায়গায় এর গভীরতা ৯০০ ফুট। আবার অনেক জায়গায় জল এত কম যে নৌকো অনেক সময় তলার মাটিতে ঠেকে যায়।

হ্রদের তীরে আছে অনেকগুলি স্টীমার-ঘাট। হ্রদের জলে নিয়মিত স্টীমবোট চলাচল করে।

টিটিকাকার জল কিন্তু বেজায় ঠাণ্ডা। বছরের বেশির ভাগ সময়েই জলের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি। তা ব'লে, কোনো সময়েই জল জমে যায় না। শীতের সময়েও নয়। মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে হ্রদে। তার ধাক্কা দিয়ে লাগে ঘনিষ্ঠিয়া আর পেরুতে।

টিটিকার জলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। হ্রদের উপকূলবাসীদের তাই বেশ মজা!

তীক্ষ্ণদন্ত মাছ

খাদ্য সংগ্রহের রীতি প্রাণী বিশেষে বিভিন্ন। উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকটি নদীর মোহনা আর পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি নদীর বাসিন্দা ছোট-ছোট এক রকম মাছের খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতিটি কিন্তু সত্যি বিচিত্র।

মাছগুলি শিকারের অপেক্ষায় থাকে। প্রধান শিকার মাছি বা ওই জাতীয় পতঙ্গ। জলজ ঘাসে যখন কোনো পতঙ্গ এসে বসে, মাছটি ধীরে ধীরে কাছে এসে একেবারে হঠাৎ এক ঝলক জল ছুঁড়ে দেয়। দেখে মনে হয় যেন তীর ছুঁড়েছে। অব্যর্থ এদের লক্ষ্য। জলের তীর লাগার সঙ্গে সঙ্গে পতঙ্গটি জলে প'ড়ে যায়। মাছটা তখন ছুটে গিয়ে পতঙ্গটিকে খেয়ে ফেলে।

অনেকে ওই মাছকে বলে রাইফেল মাছ। লম্বায় এক ফুটের বেশি হয় না। ওজন দু' পাউণ্ডেরও কম। খেতে বেশ সুস্বাদু।

পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাণী

পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাণী কি? বেশির ভাগ লোকই উত্তরে বলবেন তিমি কিংবা হাতী। উত্তর কিন্তু হল না। ক্যালিফোর্ণিয়ার সিকোয়িয়া ন্যাশনাল পার্কের সিকোয়িয়া গাছটিই পৃথিবীর প্রবীণতম প্রাণী। গাছটি উচ্চতায় ৩০০ ফুট। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য ১৬টি দেশলাই কাঠির একটি ক'রে বাক্স ও গাছের কাঠ দিয়ে বানানো যেতে পারে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার ওই অতিকায় বৃক্ষদের মাঝখানে এমন কয়েকটি গাছ আছে যাদের বয়েস অন্ততঃ চার হাজার বছর। কবে থেকে তারা বাড়তে শুরু ক'রেছিল। আজো বেঁচে আছে। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে।

বিচিত্রা

মদের পিপায় সরাইখানা কখনও শুনেছেন কি?

এক সরাইখানার মালিকের কেরামতিতে দক্ষিণ জার্মানীর হাইলব্রন শহরের কাছাকাছি অখ্যাত পল্লী স্টাইন হঠাৎ প্রচুর নাম ক'রে ফেলেছে। হাইলব্রনের কোন এক সেলের গুদামে ঐ সরাইখানার মালিক শতবছর পুরাণো একটা মদের পিপে দেখে সেটা কিনে নেয়। তখনও কিন্তু পিপের মধ্যে বিশহাজার লিটার মদ ছিল। যাই হোক মদ খালি ক'রে সরাইখানার মালিক সেটা নিজের বাগানের খাতায় পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করলে কিন্তু তার আগে এক কাঠের তৈরী পিপের গায়ে সত্তরবছর ধরে যে ছাওলা পড়েছিল তা ওঠাতে হল। শুনলে অবাক হবেন যে পিপেটা এত বড় যে ছাওলার ওজন হ'ল ৩০০ পাউণ্ড! এদিকে সরাইখানার মালিক প্রচার করে দিল যে যারা পিপের তলা আসল পুরোনো মদ খেতে চায় তারা যেন তার দোকানে আসে। খবর পেয়ে দলে দলে লোক আসতে শুরু করেছে। সরাইখানাটা ছোট, অত লোক ধরেনা। সরাইখানার মালিক মাথা খাটিয়ে খালি পিপেটার মধ্যেই বসার জায়গা ক'রে দিয়েছে। পিপের মধ্যে এখন অনাকুড়ি লোক বসে পুরানো মদের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। ব্যবসা ফলাও চলছে দেখে সরাইখানার মালিক এরকম আরেকটা বড়সড় পিপের সন্ধানে আছে যদিও সহজে পাবেনা কারণ এবছর এতো মদ হয়েছে যে কেবল খালি পিপের ভুলোবেনা, চৌবাচ্চার তরে রাখতে হবে!

এবারে পাগলদের আঁকা।

প্রতিভা ও পাগলামির মধ্যে তফাতটা কতটুকু? একশো বছর আগে ইতালির ডাক্তার সিজারে লমব্রোসো তাঁর লেখা বইয়ে বলে গেছেন যে প্রতিভা ও পাগলামির মধ্যে তফাতটা এতো সামান্য যে সেটা একটা সূক্ষ্ম পর্দা বই আর কিছুই নয়। একালে মনোবিজ্ঞানী ইয়ুঙ্‌কে তো বলেইছেন যে "মানসিক বিকৃতদের মধ্যে এমন কিছুই নূতন বা অজানা নেই, যেটা আমাদের মনের সুড়ঙ্গে সুপ্ত নেই।'

পাগলদের আঁকা ছবিতে আধুনিক মনোবিজ্ঞান যথেষ্ট আগ্রহান্বিত। বহু পাগল আছে যারা প্রচুর ধৈর্য ও আবেগ দিয়ে ছবি আঁকে ও রঙ করে তবে এদের মধ্যে বেশিরভাগ শিল্পীরা বড় দোমনা।

সাধারণ মানুষরা যাতে বিকৃতমস্তিষ্ক শিল্পীদের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সেজন্য মনো-ব্যাধিগ্রস্তদের আঁকা ১৮০ খানি ছবি নিয়ে সম্প্রতি মিউনিখে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল বিস্তর ভীড় হয়েছিল এই প্রদর্শনীতে।

প্রথম দৃষ্টিতে আধুনিক চিত্রশিল্পের যে কোন প্রদর্শনী থেকে এর বিশেষ কোন তফাৎ ছিলনা। মূর্ত, প্রতীকী, বিমূর্ত সবরকম ছবিরই নিদর্শন ছিল এখানে। সব ছবিতেই ছিল প্রচুর

রঙের প্রাচুর্য ও উল্টোপাল্টা রঙের বৈচিত্র্য। কতক ছবি দেখে মনে হবে যেন নেহাৎ বাচ্চারা এঁকেছে। তবে একটু গভীর ভাবে দেখলেই স্পষ্ট দেখা যাবে যে ছবিগুলো সব যেন খাপছাড়া ও সব মূর্তির মুখেই যেন একটা ক্লান্তবাসের ভাব রয়েছে। প্রত্যেকটা মূর্তির চোখের দৃষ্টি যেমন ভয়াবহ তেমনি অস্বাভাবিক।

মিউনিখের এক জন মনোবিজ্ঞানী এই প্রদর্শনীর একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র গ্রহণ করেছেন। এতে শিল্পীদের ক্রমিক প্রয়োগধারা দেখানো হয়েছে। কিভাবে এক জন মনোবিকারগ্রস্ত শিল্পী একটি মূর্ত বস্তুর ছবি আঁকতে শুরু ক'রে আস্তে আস্তে সবকিছু গুলিয়ে ফেলে একটা কিম্ভূত কিমাকার কিছু এঁকে বসে এই চলচ্চিত্রে তা সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অনেক সময় অনেক প্রকৃতিস্থ শিল্পীও ছবি আঁকতে গিয়ে এই ভাবে ক'রে বসে ও প্রমাণ করে যে মনোবিজ্ঞানী ইদুকের বর্ণনায় এতোটুকু অতিরঞ্জন নেই।

আপনার বাজনা শুনে কেউ রাগ করেন কি?

পিয়ানো সহযোগে সঙ্গীতচর্চা মহাযুদ্ধের আগে জার্মানীর ঘরে ঘরে রেওয়াজ ছিল। যুদ্ধের তাণ্ডবে ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে পিয়ানোরও কবর রচনা হল। যুদ্ধ শেষ হল, দুঃখ, দৈন্য, চরম বিপর্যয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে জার্মানী আবার সুখের মুখ দেখল। আজ পশ্চিম জার্মানীর সমৃদ্ধি আবার তাকে ললিতকলার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সঙ্গীতচর্চার আসরে তাই পিয়ানো আবার তার হারানো মর্যাদা ফিরে পেয়েছে।

তবে আরেক মুশকিল হয়েছে এখন। যুদ্ধোত্তর যুগে যেসব ঘরবাড়ি তৈরী হয়েছে তা সবই প্রায় পাতলা দেয়ালের। ফলে আপনি হয়তো দিনরাত সঙ্গীতচর্চায় বিভোর রইলেন কিন্তু ফ্ল্যাট-বাড়ির অন্যান্য ঘরের বাসিন্দারা উত্যক্ত হয়ে উঠে পুলিসে খবর দিলে। সুতরাং সঙ্গীতসাধকদের সাধনার নতুন পথে পা বাড়াতে হয়েছে।

এই অবস্থায় কিছুদিন গীটার বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই ফ্ল্যাটবাড়ির সুরসাধকদের জন্যে এমন কয়েকটি বাজনা বেরিয়েছে যাতে প্রতিবেশীদের বিরক্তি উৎপাদন না ক'রে নিবিঘ্নে সুরের সাধনা করা চলে। এগুলিকে বলা চলে যান্ত্রিক-বৈদ্যুতিক অথবা স্রেফ বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্র এবং দেখতে কোনটা অর্গানের মত, কোনটা পিয়ানোর মত, কোনটা বা সপিনেটের মত। এসব বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ এতো মৃদু যে পাশের ঘরে কেন, সামনে লোক বসে থাকলেও তার প্রতিগোচর হয় না। সাধক কানে "ইয়ারফোন" লাগিয়ে এসব বাদ্যযন্ত্রের "নীরব সুরের" মাধুর্য আস্বাদন করতে পারেন।

এই বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্রগুলি দামেও যেমন সস্তা, দেখতেও তেমনি সুন্দর আর উচ্চাঙ্গ ও হাল্কা সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত করার সমান কাজের।

খুব মোটা হওয়া পাপ—কেন মানুষ মোটা হয় জানেন কি ?

আমরা জানি বেশি খেলে মানুষ মোটা হয়। পশ্চিম জার্মানীর শহর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অয়েলনের মনে করেন যে দেহযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ও খাদ্যের প্রতি আসক্তি মেদবহুলতার মূল কারণ নয়। কোন কারণে পরিমিত আহারে বাধা মানুষ সুযোগ পেলেই পেটুকের মতো খেতে শুরু করে—ও তার ফলে শরীরে মেদ বৃদ্ধি হয়।

ঠিক এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে মোটা মানুষের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের সময় তাদের আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়েছিল। যুদ্ধের পর দেশের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পানভোজনের প্রতি আসক্তিও বেড়ে গেল। ঘরে বাইরে শুরু হল ভালো খাওয়া-দাওয়া। মা-বাপে ছেলেপুলেদেরও কষে খাওয়াতে শুরু করলেন। ফল হল সর্বজনীন মেদ বৃদ্ধি।

শরীরের ওজন বেড়ে গেলে নানা গোলমাল দেখা দেয় ও কখন কখন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। মেদবৃদ্ধির ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, ধমনীর কাঠিণ্য দেখা দেয়, হার্টের অসুখ ও পাথুরী রোগ হয়। সুতরাং দেহের ওজন যাতে অযথা না বাড়ে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তাঃ অয়েলনের তারও উপায় বাৎলেছেন।

তাঁর মতে দেহের পক্ষে যতটা ক্যালোরি দরকার তারচেয়ে কিছু কম ক্যালোরি খেলেই ওজন কমে যাবে। এতে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য (চিনি, মিষ্টি ইত্যাদি) কম থাকবে ও প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য যেমন চর্বিছাড়া মাংস, ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বেশি থাকবে।

এইধরণের খাদ্য খেলে প্রথম সপ্তাহে শরীরের বিশেষ কোন তারতম্য দেখা যায় না তার কারণ দেহের চর্বি জলে রূপান্তরিত হয়ে শরীরকে বেশ মোটা মোটা দেখায়। দুই পাউণ্ড চর্বিতে ৩০০০ ক্যালোরি থাকে। বিশেষ আহারের সাহায্যে ওজন কমাবার সময় ১০০ গ্রাম চর্বি ১০০ গ্রাম জলে রূপান্তরিত হয়।

শুধু জল খেয়ে ওজন কমাতে গেলে শরীরের অপকার হয়। বাজারে রোগা হবার জন্যে যেসব বড়ি পাওয়া যায়, অধ্যাপক অয়েলনের তারও পক্ষপাতী নন ; কারণ তাতে রোগী তার ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষা ঐসব বড়ির ওপর বেশি নির্ভর করে। মোটা থেকে রোগা হতে হলে সব দিক বিচার করে তিনি "ডায়েটিং" বা বিশেষ ধরণের খাদ্যগ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন।

সঙের যাত্রা দেখেছেন কি ?

শহর কোলকাতায় একদিনে জেলেপাড়ার সঙ বেরত ও তাই দেখার জন্যে শহরের লোক ভেঙে পড়ত। জেলেপাড়ার সঙের কথা এখন বোধহয় ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে ; কিন্তু সুদূর দেশ জার্মানী সেখানে আজও বছরে বছরে সঙ বের হয় আর ছেলেবুড়ো সবাই তাতে যোগ দেয়। পশ্চিম জার্মানীর কোথাও এই সঙপরবের নাম 'কার্নিভাল' কোথাও বা বলে 'কার্নিং'। আগেকার দিনে বড় বড় শহরে কার্নিভালের আলাদা আলাদা দল ছিল ; কিন্তু এখন কার্নিভাল প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছে।

সাধারণতঃ কার্নিভাল বা কার্নিং পরবের 'ঘট' বসে বছরের একাদশ মাসের একাদশ তারিখের একাদশ ঘণ্টা একাদশ মিনিটে। আসল পুজো শুরু হয় জানুয়ারীতে; আর (রোজ মানডে) বা দোলাপ সোমবার ঘিরে কার্নিংয়ের ঘুমঘাম একেবারে চরমে ওঠে। কার্নিভালের মিছিলের জন্যে নির্বাচিত হয় এক জন যুবরাজ ও একজন যুবরাণী, সঙ্গে চলে দলে দলে ছোট ছোট ঘাঘরাপরা নর্তকীর দল আর হাসির খোরাক জোগাবার জন্যে থাকে ভাড়াকরা ভাঁড়। হৈ-হল্লোড়, হাসি-তামাশা, ফূর্তি' বেলেল্লাপনার তুফান বইতে থাকে। কথায় বলে এমন সব কার্নিভাল—পাগল লোক আছে জার্মানীতে যারা কার্নিভালে যোগ দেবার পয়সা না থাকলে বিছানাপত্র বেচেও পয়সা যোগাড় করতে প্রস্তুত। কার্নিভালের মিছিল প্রায় সব শহরেই বার হয় তবে কোথাও ভাঁড়ামো একটু কম হয় কোথাও হয় একেবারে চূড়ান্ত। কার্নিংয়ের সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যেও আলাদা নাচের ব্যবস্থা হয়।

ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় শীতের ভূতপ্রেত অপদেবতা তাড়িয়ে বসন্তকে আবাহন করার জন্যেই বহুকাল আগে জার্মানীতে এই পরব শুরু হয়েছিল। এখনও দক্ষিণ জার্মানীর ছোট ছোট গ্রামে গেলে সেকালের কিছুটা রেশ দেখতে পাওয়া যায়। এই পরবের সময় সেখানে এখনও লোকে হৈতাদানব ডাইনীর মুখোশ এঁটে নানারকম বিকট শব্দ করতে করতে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তবে এখন এটা সেখানেও হাসি-তামাশায় দাঁড়িয়েছে। আর ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকের দু পয়সা আয়ও হয়; কারণ মুখোশপরা মিছিল দেখার জন্যে নানা জায়গা থেকে বহু লোক আসে।

* * * *

সেকস্‌পীয়ারের "ওথেলো" নাটকে ওথেলোর ভূমিকায় স্যর্ হেনরি আর্ভিং-এর নামবার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে শেষে দর্শকগণকে জানানো হোল—"যে নূতন অভিনেতাটি ওথেলোর পার্ট করবেন, তাঁর সম্বন্ধে দর্শকেরা যেন কোন তুলনা মূলক সমালোচনা করে অভিনয় পণ্ড না করেন।"

অভিনয়কালে দেখা গেল, নূতন অভিনেতাটি অতি অপূর্ব অভিনয় করেছেন। দর্শকেরা স্তম্ভিত, বিমোহিত। শেষে কয়েকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত দর্শক অভিনয়ান্তে প্রেক্ষাগৃহে বসেই চিৎকার করে উঠলেন—"স্যর্ হেনরি আর্ভিংও এঁর চেয়ে ভাল অভিনয় করতে পারতেন না।

নূতন অভিনেতা সন্তর্পণে পাদপ্রদীপের সামনে এসে বিনীতভাবে জানালেন,—আমার সর্বাপেক্ষা আনন্দ, আমার পুরাতন বন্ধুরাও আজ আমাকে চিনতে পারেন নি, —কারণ, আমি স্বয়ং হেনরি আর্ভিং—শুধু আজ নিজেকে একবার যাচাই করতে চেয়েছিলাম।"

খেলাধূলা

বিমল দেব

ভারতীয় ফুটবলের অবনতি।

সম্প্রতি জাপানের টোকিও শহরে এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম অনুষ্ঠান হোল। ফাইনাল খেলায় বার্মাকে ৪-০ গোলে হারিয়ে ইস্রায়েল যুবদল আলোচ্য প্রতিযোগিতার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। গতবারের প্রতিযোগিতায় ইস্রায়েল ও বার্মা যুগ্মভাবে বিজয়ী হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দশটি দেশের মধ্যে ভারতও ছিল। কিন্তু ভারতীয় তরুণদলের প্রথম প্রয়াস সার্থক হয়নি। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের দম ও ক্ষিপ্রতার অভাব এবং প্রতিপক্ষের গোলের সামনে সট্ করার ব্যর্থতা করুণভাবে দেখা দেয়। এবং এই ব্যর্থতার জন্যই তাঁরা প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। বল আয়ত্তে রাখার কৌশলে এবং পারস্পরিক বল আদান প্রদানে কিছুটা নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও সামগ্রিকভাবে ভারতীয় তরুণদলের কোন উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল না। তরুণ-দলের এই অবনতি বিশেষ চিন্তার বিষয়। এই তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়েই তো আগামী দিনের জাতীয় দল গঠন করা হবে! কিন্তু তাঁদের খেলায় যদি ফুটবলের ন্যূনতম মর্যাদাও না পালিত হয় তাহলে সে দলের অবস্থা যে কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। ১৯৬২ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। কিন্তু ১৯৬৪ সালের বিশ্ব অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতায় উন্নীত হতে ব্যর্থ হয়। প্রাক-অলিম্পিকের খেলায় ইরাণের কাছে হেরে গিয়ে ভারত বিদায় নিতে বাধ্য হয়। অথচ মেলবোর্ন অলিম্পিকে ক্রম পর্যায়ের তালিকায় ভারত চতুর্থস্থানের অধিকারী হয়েছিল। ভারতীয় ফুটবলের মান যে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী তার একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ বিষয়ে ভারতের ক্রীড়া পরিচালকদের অবিলম্বে দৃষ্টি দেয়া দরকার। আগামী বছরেই এশীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান অবস্থা বিদ্যমান থাকলে ফুটবলে ভারতের এশীয় বিজয়ীর সম্মানটুকুও হারিয়ে যাবে। সুতরাং এই অবনতির মোড় ফেরানো দরকার। সুষ্ঠু পরিকল্পনার অনুসরণে তরুণ খেলোড়দের যদি উপযুক্ত ভাবে গড়ে তোলা যায় তবে তাঁরা ভাষ্য দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সমর্থ হবেন এ আশা বোধ হয় সঙ্গত কারণেই করা যায়।

• • • •

ক্রীড়া কংগ্রেস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের উদ্যোগে কিছুদিন আগে কলকাতায় "ক্রীড়া কংগ্রেস এর" অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে খেলাধূলার সামগ্রিক উন্নতিকল্পে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং কয়েকটি সুপারিশ

উপস্থাপিত করেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই সম্মেলনকে ঐতিহাসিক, অভিনব, অভূতপূর্ব ইত্যাদি নানাভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আলোচ্য ক্রীড়া কংগ্রেসের উদ্যোগ আয়োজন ও সংগঠন বৃহৎ ও ব্যাপক ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু খেলাধুলা ও শরীর চর্চার উন্নতিকল্পে ইতিপূর্বে এধরণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি বলে যে প্রচার চালানো হয়েছে তা ঠিক নয়। কয়েকটি পত্র পত্রিকায় এই ভুল প্রচারের বিরুদ্ধে জানাই যে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের উদ্যোগে এ ধরণের সম্মেলন ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্যোগ আয়োজনের ব্যাপকতার তারতম্যে এই সম্মেলন ও আলোচ্য ক্রীড়া কংগ্রেসের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও মূলগত উদ্দেশ্য যে একই ছিল তা অনস্বীকার্য। এছাড়াও দু-একটা খেলা ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেও খেলাধুলা সম্বন্ধে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সে যাই হোক। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে খেলাধুলার অবস্থান মুক্ত প্রাঙ্গনে। সুতরাং খেলাধুলার উন্নতি মূলক পরিকল্পনাকেও মুক্ত প্রাঙ্গনে নিয়ে আসতে হবে। মোটকথা যে পরিকল্পনা রচনা করা হবে তা অবশ্যই দেশের সমস্ত এবং সহজ ভাবেই রূপায়ন যোগ্য হওয়া প্রয়োজন।

ক্রীড়া কংগ্রেসের সুপারিশের ভিত্তিতে রচিত পরিকল্পনা যদি রাজ্যের খেলাধুলার উন্নতির সহায়ক হয় তাহলে তাদের প্রয়াস সার্থক বলে পরিগণিত হবে।

• • • •

খেলাধুলার টুকরো খবর

১৯৬৮ সালে মেক্সিকো শহরে আগামী বিশ্ব-অলিম্পিকের আসর বসবে বলে স্থিরীকৃত হয়েছে। মেক্সিকো শহরে অনুষ্ঠান স্থান হিসেবে নির্বাচনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন ফরাসী অলিম্পিক কমিটির সভাপতি আভেরফ্ ব্রান্ডেজ ইনি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রাক্তন সহ সভাপতিও বটে। ব্রান্ডেজের মতে মেক্সিকোর প্রাকৃতিক আবহাওয়ার দরুণ প্রতিযোগিরা সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, সবচেয়ে অসুবিধায় সম্মুখীন হবে দূর পাল্লার প্রতিযোগিরা।

• • • •

পোল্যাণ্ডে উপযুক্ত মহিলা এ্যাথলীটের অভাব। টেলিভিসন মারফত নূতন প্রতিভার সন্ধান করা হচ্ছিল। এর উত্তরে সাড়া দিয়ে ৬০০ প্রার্থিণী আবেদন করেন। চূড়ান্ত ভাবে বাছাই করে শেষ পর্যন্ত ৩০ জনকে নির্বাচন করা হয়। এদের বয়স ১৬ থেকে ২০ এর মধ্যে নির্বাচিত ৩০ জনকে অলিম্পিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

• • • •

রোম অলিম্পিকের তুলনায় টোকিও অলিম্পিকে রাশিয়া এ্যাথলেটিকসে নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে না পারায় রাশিয়ার প্রধান কোচ গাভরিল কোরোবকভ্‌কে নিদারুণ সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। রাশিয়ার প্রতিযোগিদের ব্যর্থতার জন্য তাঁকেই মুখ্যতঃ দায়ী করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি তরুণ প্রতিযোগিদের বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক প্রতিযোগিদের টোকিও অলিম্পিকে নিয়ে গেছেন।

— —

বঙ্কিম-রবীন্দ্র সংগম

আদর্শ পথ্য,
পানীয় ও খাদ্য

লিলি বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

দুই মহাযুগ

বঙ্গদর্শন। ১২৮৯ বৈশাখ (বঙ্কিমচন্দ্র)

পত্রসূচনা।

সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজী বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিনকোটি বাঙ্গালী কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে এডুকেশন ফিল্‌টর ডউন করিবে। একথার তাৎপর্য এই যে কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই, তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেচ করিলেই নিম্নস্তর পর্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনই বিস্তারূপ জল বাঙ্গালীর জাতিরূপ শোষক মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতর লোক পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে।

আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করিনা। যদি দেশের ও দশের উন্নতির সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এইপত্র প্রকাশ বৃথা কার্য্য মনে করিতাম।

বঙ্গদর্শন নবপর্য্যায়। ১৩০৮ বৈশাখ (রবীন্দ্রনাথ)

পত্রসূচনা।

সম্পাদক একথা বলিতে পারিবেন না যে বঙ্গদর্শনের নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন—সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।

অধুনা বঙ্গদেশের যে কেহ সুলেখক আছেন বঙ্গদর্শন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া ঐতিহাসিক সূত্রে বঙ্কিমের কালের সহিত গ্রথিত করিয়া লইবে, ইহা বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালী লেখকদিগের পক্ষে প্রার্থনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। কালের সহিত কালান্তরের যোগসূত্র যতই দৃঢ় হইবে তাবের পথ ততই প্রশস্ত হইতে থাকিবে। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন যদি কেবল বঙ্কিমের কালের মধ্যে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে জীবিত কালের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তবে স্বভাবের নিয়মে তাহা কালক্রমে ধূলি সমাচ্ছন্ন ইতিহাসের বিবর মধ্যে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহারের অতীত হইয়া যাইবে। মহাপুরুষদিগের কীর্তি এককালকে অন্যকালের সহিত বাঁধিবার জন্য যোগ সূত্রের কাজ করে।

আগামী সংখ্যায়
এই দুই মহাযুগ সম্পর্কে
আরো আলোকপাত করা হইবে।

বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-মানস

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

মহৎ লেখক মাত্রেই জীবনের স্বরূপ-সন্ধানী। কেবল গল্প উপন্যাসে, কাব্য নাটকে, তাঁর তৃপ্তি নেই। তিনি জীবনের রহস্য, স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথও করেছিলেন।

এই দুই মহৎ লেখক আধুনিক বাঙালী তথা ভারতবর্ষ নির্মাণ যজ্ঞের দুই প্রধান ঋত্বিক ছিলেন, এ'কথা অযথার্থ নয়। কিন্তু দুইজনের চিন্তাধারা এক নয়, এক ধারার কথাও নয়। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়েই আমাদের ভাবনেতা, কিন্তু বঙ্কিম আমাদের যে পথে চালনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সে পথে চালনা করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র নৈহাটির গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। হিন্দু কলেজের ছাত্র ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। সরকারী চাকুরি না করে ওঁর উপায় ছিল না। তন্ত্র ও পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে ওঁর আস্থা ছিল। তবে পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবুদ্ধির আলোকে তিনি মনের মতো দেবতা অন্বেষণ করেছিলেন, তার ফল "কৃষ্ণচরিত্র"। সংশয় সন্দেহ অবিশ্বাসে বঙ্কিম চিত্ত বারবার বিক্ষিপ্ত হয়েছে, তিনি নানা শাস্ত্রচর্চা ও বুদ্ধিচর্চার মধ্য দিয়ে মানসমুক্তি পেতে চেয়েছেন। তিনি কোনোদিন ইয়োরোপ যান নি, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের পাশ্চাত্ত্য চিন্তাজগৎ ওঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকীয় পাশ্চাত্ত্য দর্শন চিন্তাকে আত্মসাৎ করেছিলেন। ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়েই ওঁর মৃত্যু হয়। স্বদেশপ্রেম ওঁর অদ্বিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের বেদান্তচর্চা ও দেবেন্দ্রনাথের শুকী ভক্তিচর্চার পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। ওঁর চোখের সামনেই ঠাকুরবাড়ি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে উপবীত বর্জন করে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান, জীবিকার্জনের জন্য পরের দাসত্বের কথা ওঁকে কোনোদিন চিন্তাও করতে হয় নি। তার ফলে আপন ইচ্ছা মতো জীবন ও চিন্তাকে গড়ে নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি দুই শতাব্দী জুড়ে আছেন। পাঁচবার বিশ্বভ্রমণে গেছেন। প্রতিবার ভ্রমণান্তে ওঁর চিন্তার ধারা বিস্তৃততর হয়েছে। ওঁর ঈশ্বর ঔপনিষদিক ব্রহ্ম। সেই ঈশ্বরকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন ভক্তির পথে, গানের পথে, প্রকৃতির পথে। শাস্ত্রচর্চা ও বুদ্ধিচর্চা অপেক্ষা মহৎ ভাবসৃষ্টির প্রেরণা ওঁকে চালিত করেছে। কোনো নির্দিষ্ট দর্শনচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বেঁধে রাখেন নি। ওঁর চিন্তালোকে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। তবে মানবতা ও বিশ্বাত্মবোধের ধারাই তিনি নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। বিশ্বপ্রেম ওঁর অদ্বিষ্ট। যে বিচিত্র ছলনাময়ী সৃষ্টিকে আকীর্ণ করে রেখেছেন, ওঁর শক্তি ও ছলনাকে মেনে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেছেন।

বঙ্কিমের জীবনবোধ ওঁর ধর্মচেতনা। এই জীবনবোধের পরিচয় অনুশীলনতত্ত্বে ব্যাখ্যাত হয়েছে। খ্রীকৃষ্ণের বাণীতে যে চিত্ত-সাধনার কথা আছে, বঙ্কিম তাকেই পরিপূর্ণতার সাধনা বা ভক্তি

বলে নির্দেশ করেছেন। বঙ্কিমের কাছে ভক্তির অর্থ চরিত্র-সাধনা বা জীবন-সাধনা। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে যে সাধক-চরিত্রের কথা বলা হয়েছে, বঙ্কিম মানুষের জীবনে পথনির্দেশ করতে গিয়ে ঐ চরিত্রের কথাই বলেছেন :

"যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সে-ই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, তাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে।"

রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ সত্যবোধ বা পরিপূর্ণতার উপলব্ধি। "যে সীমার মধ্যে আমাদের সত্য, সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপূর্ণতা।" বঙ্কিম যেখানে জীবনের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও পরিণতির কথা বলেন (অনুশীলন-তত্ত্ব), রবীন্দ্রনাথ সেখানে জীবনের কোনো একটা রূপকেই সার্থক করে তোলার কথা বলেন। স্পষ্টতাই আমাদের লক্ষ্য, অস্পষ্টতাই ক্ষতিকর ; সর্বাঙ্গীণ পরিণতি যদি না পাই তবে যেন কোনো একটা সীমাকেই সার্থক করে তুলি। এই বিশ্বাসের বলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"জীবনে একটি মাত্র কথা ভাবিবার আছে যে, আমি সত্য হইব। আমি কবি হইব, কি কর্মী হইব, কী আর কিছু হইব সেটা নিতান্তই বাহ্যচিন্তা। সত্য হইব এ কথার অর্থ এই, কোথায় আমার সীমা সে কথা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিব।" (সীমার সার্থকতা, পথের সঞ্চয়)।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে অমিলের কথাটা দেখাবার প্রয়াস ইদানীং লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মতৈক্য আবিষ্কারে অগ্রসর হলে আমরা উপকৃত হব বলে আমার ধারণা।

গোড়াতেই একথা স্বীকার করা উচিত যে, বঙ্কিমের চিন্তায় অতীন্দ্রিয় রহস্য বা মিস্টিসিজমের কোনো স্থান ছিল না, অষ্টাদশ শতকীয় রিজন ও জড় প্রকৃতির শক্তি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। আর রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় অতীন্দ্রিয় রহস্য একটা বড়ো স্থান জুড়ে বসেছিল।

বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই পূর্ণতার আদর্শের কথা বলেছেন, এবং মানবজীবনকে সেই পূর্ণতার অভিমুখী করে দেখিয়েছেন। উভয়ের ধ্যানেই এই পরিপূর্ণতা মানবিক। প্রভেদ এইখানে যে, বঙ্কিমের ধ্যানে এই পূর্ণতা মানব শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে নির্দিষ্ট ; রবীন্দ্র-ধ্যানে তা মানবিক ভূমার অনির্দিষ্ট, অসীম ; তাকে তিনি নবজাতক বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

বঙ্কিম বলেছিলেন, পরিপূর্ণ মানবের কথা। রবীন্দ্রনাথ বললেন, মানবিক পরিপূর্ণতার কথা। দৃষ্টিভেদে পটভূমিভেদে একই বক্তব্য দুই ভিন্ন রূপ নিয়েছে।

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ,—কেউই মানুষকে পরিপূর্ণ বলে স্বীকার করেন নি। বঙ্কিম বলেছেন পরিপূর্ণতার সাধনায় আমরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যাব। বঙ্কিম-চেতনার একপ্রান্তে আছে অপূর্ণ, সীমিত, খণ্ড সাধারণ মানব ; অপর প্রান্তে পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ, শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই ঈশ্বর। অনুশীলন তত্ত্ব এই প্রান্তের মধ্যবর্তী সেতু।

রবীন্দ্রনাথ এরকম কোনো সেতুর কথা বলেন নি। আমাদের পরিপূর্ণ হতে হবে, একথা তিনি বলেন নি। বরং তিনি বলেছেন, অপূর্ণতাই আমাদের সত্য ; কিন্তু নানা অপূর্ণতার মধ্য দিয়ে আমরা

এগিয়ে চলেছি পূর্ণতার অভিমুখে। সে পূর্ণতা অনির্দিষ্ট, অরূপ, অসীম, তা অন্তহীন সাধনার শেষে তত্ত্বরূপে বর্তমান, কিন্তু তা মানবিক। আমাদের সাধনায় পূর্ণতাকে পাই না, পূর্ণতার ইঙ্গিতকে পাই। বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিবর্তিত হয়েছে বিশ্বমানবে। বঙ্কিমের ঘোড়ক সেতুর জায়গায় এসেছে রবীন্দ্রনাথের পথ, পথ চলাতেই তাঁর আনন্দ, পথ-ই তাঁর সাধনার বড় কথা।

বৃত্তিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ বঙ্কিমের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথেরও তা-ই ছিল। তবে বঙ্কিমের কাছে বৃত্তির চর্চা নিয়ন্ত্রিত সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্ত, রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ন্ত্রণমুক্ত সীমাহীন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্ত।

শিক্ষা বলতে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই বিষয়কে বুঝেছিলেন। বঙ্কিমের মতে শিক্ষা সকল ইন্দ্রিয়-মনের সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন। বঙ্কিম শিক্ষাকে ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র করে দেখেন নি :

"আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ যে ধর্ম তাহা সমাজের স্থিতি গতি উভয়ের মূল। এখনকার নবভারত সমাজের গতি ইংরেজি শিক্ষার ফল, ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু শিক্ষাও আমার বিবেচনায় ধর্মের অন্তর্গত।.....যাহাকে আমরা ইংরেজি শিক্ষা বলি তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি।"

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বলতে ইন্দ্রিয়মনের অনুশীলনের কথাই বলেছেন এবং শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ লক্ষ্য করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হইতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষা-সাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে।.....এই আয়ত্তন ইকনমিক্সে ডিগ্রি নেওয়ার নয়; চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্তে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়।" ('শিক্ষা ও সংস্কৃতি,' শিক্ষা)

কিন্তু সত্যসম্পর্কে উভয়ের মধ্যে তীব্র মতভেদ হয়েছে। বঙ্কিম সত্য বলতে যা বুঝেছেন, রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেন নি। সত্য সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন ধারণা গত শতকে গুরুতর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। তার বিস্তারিত ইতিহাস এখানে নিষ্প্রয়োজন। বঙ্কিমের মতে সত্যের নৈতিক মূল্য আছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্যের মূল্য তার মানবিক ধর্মে। বঙ্কিম সত্যের এই দিকটা একেবারে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে সত্যকে শর্তান্তরহীন অনিবার্য অপরিবর্তমানরূপে দেখেছেন, বঙ্কিম তা দেখেন নি। বরং বঙ্কিম বলেছেন, লোকহিতৈষণার খাতিরে মিথ্যা কখনো কখনো সত্য হয়। রবীন্দ্রনাথ এ মত মানেন নি। ১২৯১-৯২ বঙ্গাব্দে 'প্রচার' ও 'নবজীবনে' এই নিয়ে দুজনের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের একটা সুবিধা ছিল যা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বঞ্চিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সময়ের দিক থেকে পরবর্তী বলেও বিশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধে বেঁচেছিলেন বলে তাঁর ধারণা ও চিন্তাকে বারবার যাচাই করতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমের জীবন গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে আবদ্ধ বলে তাঁর পক্ষে সে সুযোগ ছিল না। বঙ্কিম যখন 'আনন্দমঠ' (রচনাকাল ১৮৮০) লেখেন তখন তাঁর সামনে দেশ-প্রেমের কোনো বাস্তব রূপ ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন 'ঘরে বাইরে' 'চার অধ্যায়' লেখেন (এই শতকে), তখন তার বাস্তবরূপ তাঁর চোখের সামনে ছিল। সত্যের রূপ পরিবর্তনশীল বলে বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন, রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় তা বিশ্বাস করেন নি, পরে করেছেন। ইংরেজের ভত

বৃদ্ধি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে, 'কালান্তর' ও 'সভ্যতার সংকট'এ তা প্রত্যাহৃত হয়েছে। তবু কয়েকটি বিষয়ে বঙ্কিমের বক্তব্য ধরেই রবীন্দ্রনাথ এগিয়েছেন।

পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান গ্রহণ ও স্বীকরণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্যক্তির বিচারবোধ উন্মেষের জন্য শিক্ষা, মানবিকতার ধর্ম, ইংরেজের সহযোগিতা—বঙ্কিমের এইসব ভাবনা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন, পরে তার কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমের দৃষ্টি ছিল মূলতঃ ভারতমুখী, আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমুখী। বঙ্কিম সাহিত্যসৃষ্টিকে সমাজচিন্তার নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে সর্বপ্রকার প্রয়োজনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমের দেশপ্রেম বাস্তব ভিত্তিহীন আদর্শ স্বপ্ন, রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম বাস্তবভিত্তিক ও রাজনৈতিক কর্মচিন্তামুক্ত বাস্তবচিন্তাজাত। বঙ্কিমের দেশপ্রেমে নিবিড় অতীতধ্যান প্রাধান্য পেয়েছে, 'আনন্দমঠের' স্বামী সত্যানন্দ ও কমলাকান্ত চক্রবর্তী উভয়েই অতীতের স্বপ্নে বিভোর। রবীন্দ্রনাথের নির্বিশেষ বাস্তববুদ্ধির মানুষ এবং গোরার দেশধ্যানের সার্থকতা তার স্বপ্নভঙ্গে। বঙ্কিম চেয়েছেন সমাজমুখী বাস্তবচিন্তা-স্বীকৃত মানব সম্পর্ককে, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন বিশ্বাত্মবোধোদ্ভাসিত মানব সম্পর্কের সহজ সত্যকে।

দেশপ্রেম সম্পর্কে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা একই উৎসজাত। 'ধর্মতত্ত্বের'র প্রায় প্রতি অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য ন্যাশনালিজমকে ধিক্কার জানিয়েছেন এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য চিন্তা সমন্বয়জাত মনুষ্যত্বের অনুশীলনকেই আমাদের লক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছেন। বঙ্কিম বলেছেন, "আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। .... জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতীয়দের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্যধর্ম না লিখেন।" (ধর্মতত্ত্ব, অধ্যায় ২৪)

বঙ্কিম-নিন্দিত এই লোভী শোষক পরস্বাপহারক ইউরোপীয় দেশপ্রেমকে রবীন্দ্রনাথ 'ন্যাশনালিজম' আখ্যা দিয়েছেন এবং তাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। এখানে তিনি বঙ্কিম-অনুসারী। তৎসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

"দেশের শত্রু আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি ইউরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশানাল মহত্বকে আমরা অত্যধিক আদর করিতে শিখিয়াছি।"

ইউরোপীয় ন্যাশনালিজমের অন্ধ নিষ্ঠুর মূর্তিকে রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা জানান নি।

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ উভয়েই একই প্রতিবেদক নির্দেশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সকল মানুষে ও সংসারে প্রীতি আমাদের লক্ষ্য বলেছেন (ধর্মতত্ত্ব' অধ্যায় ২১, ও 'আমার মন,' কমলাকান্তের দপ্তর) রবীন্দ্রনাথও তা-ই বলেছেন। 'নববর্ষ, বিজয়া সম্মেলন' প্রভৃতি প্রবন্ধে (নব পর্যায় বঙ্গদর্শন, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ) তিনি স্বদেশের মানুষের দিকে মুখ ফেরালেন, সেখানেই দেশলক্ষ্মীকে খুঁজে পেলেন তারে তারে প্রীতিকে বড় করে তুললেন (বাংলার মাটি, বাংলার জল গান)।

বঙ্কিম-মানস ও রবীন্দ্র-মানসের আলোচনায় আর একটি বিষয়কে অবলম্বন করা যেতে পারে ; তা হল প্রেম—বিশুদ্ধ মানবিক প্রেম বা প্রণয়। বঙ্কিম উপন্যাসে দাম্পত্য-সম্পর্ক-বহির্ভূত প্রেম কোনোদিন সম্মানিত হয়নি। যেখানে তা ঘটেছে, সেখানেই তার পতন হয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্ক ভারতীয় জীবনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, বঙ্কিম একেই বাঁচাতে চেয়েছেন, যেমন চেয়েছিলেন মধুসূদন মেঘনাদবধ-কাব্যে। চতুর্থ সর্গে সীতা-সরমা-সংবাদের সার্থকতা এইখানে যে, মধুসূদন রাবণের পাপের গুরুত্ব

নির্দেশ করেছেন। পবিত্র দাম্পত্য জীবনকে ভেঙে দেবার পাপে রাবণের পতন অনিবার্য, তা চতুর্থ সর্গেই আভাসিত। বঙ্কিম-উপন্যাসে এই প্রেমেরই জয়গান, তাই শৈবলিনী, ভ্রমর, সূর্যমুখীর জয়, শৈবলিনী, রোহিণী, কুন্দনন্দিনীর পরাজয়।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যে উপন্যাসে এইভাবে প্রেমের জয় ঘোষণা করেন নি। রক্তকরবীর বিশুর প্রেম বা 'মহুয়া'র প্রেমকে তিনি জয়যুক্ত করেছেন, কারণ তা জৈব কাম নয়, বিকশিত কাম। কামের বৃন্তে প্রেমের ফুলটি বিকশিত হয়েছে।

দাম্পত্য-সম্পর্কের বাইরে যে কোনো প্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র জৈব কাম বলে মনে করেন, এবং সে কারণেই তাতে প্রেমের বিকার লক্ষ্য করেন। নগেন্দ্রনাথ, সীতারাম, গোবিন্দলালের প্রেমে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের বিকার অর্থাৎ জৈব কাম বলে মনে করেন। কিন্তু বিশু-নন্দিনীর প্রেম, অমিত-লাবণ্যের প্রেম বিকশিত কাম, সেখানে প্রেমের বিকার নেই, আছে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ, তা স্বভাবসুন্দর। 'মহুয়া' এই প্রেমেরই অভিনব সঙ্গীত।

বঙ্কিম-উপন্যাসে এই প্রেমের চেতনা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সুতরাং এ কথা বলা যায়, প্রেম-ভাবনায় বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথে আমরা অনেকদূর এগিয়েছি—জৈব কাম থেকে বিকশিত কামে অর্থাৎ যে প্রেমে আনন্দময় মুক্তিচেতনা বিকশিত হয়, সেখানে উপনীত হয়েছি। বঙ্কিমের লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতা, তাই তিনি প্রেমের বিকারগুলিকে সমর্থন করেন নি। মোহ বেদনার মধ্য দিয়ে জীবনের যে ঊর্ধ্বায়ত উদার প্রকাশ, বঙ্কিম তাকে শিল্পনৈপুণ্যে উপস্থিত করেছেন, কিন্তু স্বীকার করেন নি। আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের এক নবতর প্রেমলোকে উন্নীত করেছেন।

বঙ্কিম তাই বলেছেন, মানব জীবনে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমেরই জয়। যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে ভালবাসার নাম আত্মত্যাগের অভিলাষ। তাই প্রতাপ জৈব প্রেম পরিত্যাগ করে এমন এক আদর্শ প্রেমলোকে উন্নীত হল যেখানে "লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পড়িলেও ফিরিয়া চাহিবে না।"

আর রবীন্দ্রনাথের বিকশিত কাম স্বভাবসুন্দর আনন্দচেতনায় বিলসিত হয়ে ওঠে, সেখানে বিকারের শংকা নেই, অধঃপতনের ছলনা নেই, আছে প্রেমের গান :

সেই দিনক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে,
পূর্ণতার গম্ভীর অধরে
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে। [সপ্ত, মহুয়া]

বঙ্কিমের চিন্তাধারার বিকাশকাল বিশ বৎসর (১৮৭২—১৮৯২), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বিকাশকাল ষাট বৎসর (১৮৮০—১৯৪০)। কালের পটভূমি বিচার করে দেখলে স্বীকার করতে হয়, দুজনেই আপন যুগের সংশয় ও উৎকণ্ঠাকে বাণীরূপ দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-দিগন্তকে যদি আমরা দেখতে চাই তবে আমাদের বঙ্কিম-পর্বতশীর্ষে আরোহণ করতে হবে, তাকে বাদ দিলে আমাদের রবীন্দ্র-দর্শন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

অবিস্মরণীয় স্মৃতি

ফিওদোর প্রেদ্রোফ

(সোভিয়েত মহাবিশ্বকোষের সহকারী প্রধান সম্পাদক)

১৯৩০ সালের গ্রীষ্মের শেষদিক। জার্মানী থেকে একটা টেলিগ্রাফ পেয়ে মনটা খুশীতে ভরে উঠল। তার এসেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। তিনি তখন ছিলেন বার্লিনে। তিনি লিখলেন, সোভিয়েত জনশিক্ষা ব্যবস্থা দেখবার জন্য তিনি সোভিয়েত দেশে আসতে চান। তার পাঠান হয়েছিল "ভোক্স"-এর নামে। বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনই এই সংগঠনের কাজ। আমি ছিলাম এই সংগঠনের সভাপতি। তৎক্ষণাৎ আমরা তাঁকে সাদর ও সপ্রেম আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিলাম।

সোভিয়েতের সকল মানুষ সাগ্রহে তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় রইলেন। অনেকেই তাঁর বই পড়েছিলেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন সবাই। আজ অনেক ব্যাপক আকারে তাঁর বই পড়ে আমাদের দেশের লোক।

আগস্টের এক সুন্দর শীতল প্রভাতে বার্লিন এক্সপ্রেস এসে থামল মস্কোর বিয়েলোরুস্ক প্রান্তীয় ষ্টেশনে। সাদাসিদে পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি ট্রেন থেকে নামলেন। তাঁর রূপালী চুল লম্বা দাড়িতে শোভিত মস্কোর বায়ু বিলোল। উজ্জ্বল চোখ, যৌবনশ্রীমণ্ডিত সুন্দর মুখ, পক্ক কেশ এই সৌম্য পুরুষই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাননীয় অতিথিকে একটি মোটরে নিয়ে আমি চলে এলাম মস্কোর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ইয়োরোপ হোটেলে। রবীন্দ্রনাথের ঘর থেকে দেখা যেত রেড স্কোয়ার, ক্রেমলিন প্রাসাদ, উদ্যান, মোস্কভা নদী।

আমাদের প্রিয় অতিথির যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে দিকে আমরা লক্ষ্য রাখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু একটা বিষয় আমরা কিছুই করতে পারিনি। মস্কোর এই কেন্দ্রস্থলে দলে দলে দর্শকরা আসতে লাগলেন কবিকে দেখতে, তাদের ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব ছিল। কবি নিজেও চান নি সবার থেকে দূরে নির্জনে বসে থাকতে। সকাল ৮টা থেকেই শুরু হল কর্মসূচী। দর্শকদের ভিতর এল শিশুর দল, এলেন অভিনেতা, চিত্রকর, ছাত্র, গৃহিণী। হাজার হাজার মানুষ রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চেয়েছেন; তাঁর সঙ্গে কথা বলতে, এমন কি শুধু করমর্দন করতেও চেয়েছেন।

অতি অমায়িক ছিলেন তিনি। চিন্তাশীল ও সদয় তাঁর চোখ দুটি। প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। অজস্র মস্কোবাসী দেখতে আসতেন তাঁকে। আমরা এ জনস্রোত কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছি, কারণ তাঁকে অনেক স্থানে যেতে হয়েছে, কিছু বিশ্রামও তো চাই।

রবীন্দ্রনাথ আমার মন গভীর রেখাপাত করেছেন। দেখেছি তিনি সর্বদাই স্বদেশের চিন্তা করেন, কোন জিনিষটি কিভাবে ভারতের কল্যাণে লাগতে পারে, সেই চিন্তায় তাঁর মন আচ্ছন্ন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জনশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ছিল সব চেয়ে বেশী আগ্রহ।

বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধে যাদের বাবা-মা নিহত হয়েছেন, সেই সব অনাথদের খুব পায়োনিয়র শিবিরে শিক্ষাপদ্ধতি দেখে কবি যে কি খুশী হয়েছিলেন তা বর্ণনা করা কঠিন। বিদ্যালয়ে নানা কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। মহান কবির প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গভীরতর হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির সৌন্দর্যও হৃদয়ঙ্গম করা যায় শুধু হৃদয়ের ভিতর দিয়েই।

রবীন্দ্রনাথের কথা শুনতে শুনতে আমার বারবার মনে হচ্ছিল লেনিনের কথা। লেনিন শ্রম ও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। মাননীয় ভারতীয় অতিথির সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতে করতে দেখতাম কোন কোন বিষয়ে সোভিয়েতের মানুষের মতের সঙ্গে তাঁর মত অনেকটা মিলে যায়। এ কথা ঠিক অনেক বিষয়ে আবার নীতির দিক থেকে আমরা একমত হলেও, প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আমাদের মতভেদ হত।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে জাতি সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং সমাজে ও পরিবারে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখে তিনি পরম সন্তোষ লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথ বারবার আমাকে বলেছেন, দেখছি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষই আপনাদের দেশে সমান। নর-নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাস্তব ক্ষেত্রে।

শিক্ষার আলো বিস্তার, মানুষের বৈষয়িক উন্নতি, জাতি অধিজাতির সমান মর্যাদা, এই সব বিষয় ভারতে সাফল্যলাভ করতে পারে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর এই কথাই তিনি বলতেন।

জিজ্ঞেস করেছি, "তার মানেই তো সংগ্রাম?"

হেসে তিনি জবাব দিয়েছেন, "তা, সংগ্রাম বৈকি!"

একথাও তিনি বলেছেন, সর্বোন্নত ও সবচেয়ে নিখুঁত সমাজ ব্যবস্থা সমাজ-তন্ত্রবাদও নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের দেশে।

রবীন্দ্রনাথ একদিন কৃষকদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। তাই আমরা তাঁকে নিয়ে গেলাম, কৃষকদের একটা ক্লাবে। কৃষিসমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান দেখে কৃষকেরা অবাক হয়ে গেলেন। যন্ত্রে চাষবাস, সার, ফসলের ফলন, নানা বিষয়ে তিনি আলাপ করতে লাগলেন। তাঁর সাদা পোষাক ও লম্বা চুল দেখে কৃষকরা তাঁকে পুরোহিত বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতরই মহাকবিকে কৃষকরা চিনতে পারেন এবং অন্তরঙ্গভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। কৃষকরা কবিকে তাঁদের নিজেদের কথা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা বলেন এবং ভারতের গ্রাম্য জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করেন।

আমাদের দেশের শিল্পীরা কবির সঙ্গে আলাপ করে খুবই আনন্দলাভ করেছেন। সে কথা অবশ্য বোঝা কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথ অন্য জাতির শিল্পসৃষ্টি গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

রবীন্দ্রনাথের সফর শেষে "ভোক্স" প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সোভিয়েতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নিয়ে একটি নৃত্য-গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। আজও আমার মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। রবীন্দ্রনাথ আগ্রহভরে চাইকোভস্কি, গ্লিংকা ও বিথোফেনের সুর শোনেন। তারপর তিনি একটা ভাষণ দেন এবং ইংরাজীতে তাঁর কবিতা পড়ে শোনান।

মস্কোর পাশ্চাত্য শিল্প মিউজিয়মে কবির চিত্রের একটা প্রদর্শনীর আমরা আয়োজন করি। যখনই রবীন্দ্রনাথ এই প্রদর্শনীতে আসতেন তখনই মুগ্ধ দর্শকরা তাঁকে ঘিরে ধরতেন। তিনিও আলাপ করতেন সবার সঙ্গে। সোভিয়েতের মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তিনি খুশী হতেন।

আপনার গৃহে প্রিয় অতিথি এলে মনে হয় যেন সময় তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যখন এলেন, তখন আমাদেরও মনে হচ্ছিল কত তাড়াতাড়ি যেন সময়টা চলে গেল। আমার আবার সুস্পষ্ট মনে পড়ে সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলি। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত সেই অপূর্ব মানুষটিকে সোভিয়েতের যাঁরা একটিবারও দেখেছেন, তাঁরা চিরকাল মনে রাখবেন তাঁকে।

দুর্গেশনন্দিনী ও বঙ্কিম

অর্পণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত

(১)

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মক্ষণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "বাংলা সাহিত্যাকাশে সেটি স্মরণীয় দিন—ঐ দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্বের নিশ্চয়ই দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল, দেববালারা অলক্ষ্যে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল—স্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল।" দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশবর্ষে বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরাও মহোৎসবের আনন্দ অনুভব করেছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকার সাক্ষ্যে এবং সমকালীন ও পরবর্তী লেখকদের স্মৃতিকথায় তার প্রমাণ এখন আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ। এ সকল বহু আলোচিত তথ্যের সাক্ষে দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশ বর্ষ যথার্থই ১৮৬৫ কিনা এ প্রশ্নও কেউ কেউ করেন। ১৮৬৫ মার্চ দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশকাল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ এখনও থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রাসঙ্গিক অপর একটি প্রশ্ন অনুচিত নয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস রচনা করেন কেন এবং কখন?

১৮৬৪ সালের মার্চ মাসে বঙ্কিমের বয়স ছিল ছাব্বিশ বৎসর নয় মাস। ইতিপূর্বে তিনি কিছু বাংলা কবিতা এবং একখানা ইংরাজী উপন্যাস লিখেছিলেন। বাংলা গদ্য বৎসামান্য যাহা লিখেছিলেন তাহা অপাঠ্য এবং আমাদের নিকট এখন অর্থহীন মনে হবে। এখানে কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, "যে লম্পটেন্দু শত ২ শশধর সমান শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দ্দম মণ্ডিত হওত মূত্রমণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অনুরেণু অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রস পান না করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক।" সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত বঙ্কিমের এই অপাঠ্য গদ্য দুর্গেশনন্দিনীর উদ্ধৃত লিপিচাতুর্যে রূপান্তরের পশ্চাতে লেখকের ঐকান্তিক প্রয়াস অবশ্যই ছিল। তাঁর সেই প্রয়াস কি বাংলায় উপন্যাস রচনার অভিলাষে অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত! শিবরিয়া-প্রসন্ন রায় চৌধুরী রচিত "বঙ্কিমচন্দ্র" দ্বিতীয় ভাগে এই সম্বন্ধে কিছু তথ্যের আভাস আছে। তৎকালে বাংলাভাষার উন্নতির জন্য বহু বদান্য ব্যক্তি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের লেখককে পারিতোষিক দিতেন। রামনারায়ণের 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটক সৃষ্টির প্রসঙ্গে এরূপ একটি পুরস্কারের কথা জানা যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের লিখিত ডেভিড হেয়ার এর জীবনীতে এরূপ অনেক অর্থ পুরস্কারে উল্লেখ আছে। বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মানের আশায় বঙ্কিমচন্দ্র "রাজমোহনের স্ত্রী" (বাংলায় অনুদিত) উপন্যাস প্রেরণ করেন। (ডাঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড।) কিন্তু উহা পুরস্কারের অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়। সম্ভবতঃ ১৮৬১-৬২ সালে এ ঘটনা ঘটে। ইংরাজীতে "রাজমোহনস্ ওয়াইফ" উপন্যাসের প্রকাশ বর্ষ ১৮৬৪ এর পরে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী রচনায় হাত দেন। এ যাবৎকাল অবধি প্রকাশিত তথ্যের সাক্ষ্য—দুর্গেশনন্দিনীর রচনাকাল ১৮৬২-৬৪। সুতরাং একথা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে ইংরাজীতে উপন্যাস লিখে বঙ্কিম তৃপ্তি পাননি। এতে তাঁর খ্যাতি হবে না তা বুঝতে পেরেছিলেন। মধুসূদনের ইংরাজী কাব্য

ফলের পরিণাম তিনি অনবগত ছিলেন না। এবং "রাজমোহনের স্ত্রী" উপন্যাসের পুরস্কার লাভের ব্যর্থতার হেতু এর পারিবারিক পটভূমির অপকর্ষ—এরকম একটা ধারণা বঙ্কিমকে ইতিহাসের উপাদান অবলম্বন প্রলুব্ধ করেছিল। ১৮৬২ সালে পরবর্তী উপন্যাসের উপাদান নির্বাচনে বঙ্কিমচন্দ্র এভাবে চিন্তা করেছিলেন এটা যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে করা যেতে পারে।

ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করে তিনি বিশেষভাবে মোগল পাঠানের যুদ্ধের এই বিশেষ ঘটনাটি কেন অবলম্বন করলেন। এখানে তাঁর সংকোচের পূর্ণাঙ্গের সংখ্যা মুশাবান। তাঁদের পূর্বপিতামহ জাহানাবাদে, বিষ্ণুপুর, মান্দারণ অঞ্চলের ঐতিহাসিক কাহিনী অবগত ছিলেন এবং এখানকার জমিদারের স্টেকহোল্ডার পাঠানদের হাতে বন্দী হওয়ার সরস গল্প গৌরবের নিকট বলতেন। এই গল্প বঙ্কিমকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এর যথার্থ ইতিহাসের জন্য তিনি স্টুয়ার্টের হিস্ট্রি অব বেঙ্গলের সাহায্য নেন। তাতে কতলু খাঁ ওসমান প্রভৃতির কথা আছে। ওসমান সেখানে কতলু খাঁর পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র নয়। আয়েসার প্রেমোপাখ্যানের জন্য বঙ্কিম ওসমানকে কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র করেন। পরবর্তী ইতিহাসে বঙ্কিমের অনুমান সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। (Jadunath-History of Bengal Vol II pp 210.) কিন্তু জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা, বীরেন্দ্রসিংহ ও বিমলার গল্প বঙ্কিম কোথায় পান? এতদিন সকলের একটা ধারণা ছিল এ কাহিনী বঙ্কিমের কল্পনা। যদুনাথ সরকারও তাই বলে গেছেন। পিতামহের নিকট শ্রুত কাহিনীর কঠামোতে নিজের কল্পনাবলে যে ঘটনা বিন্যাস করেন, স্টুয়ার্ট বর্ণিত ইতিহাসের উপাদান মিশ্রণে তাহাই দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের নির্মাণ ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রতি শ্রীতারকচন্দ্র চৌধুরী এ বিষয়ে বিশেষ মূল্যবান তথ্যের সংবাদ দিয়েছেন। (The Statesman. April 4. 1965) রাজমহলের নিকটবর্তী অঞ্চলে একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে মানসিংহ বাংলার সুবাদাররূপে সেখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন। তৎকালে তাঁর পুত্র জগৎসিংহ পিতার সম্মতি না নিয়েই সন্নিহিত তাপ্পা অঞ্চলের জমিদার বীরেন্দ্রসিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। বীরেন্দ্র সিংহের রাজধানী ছিল বিক্রমকিতা নামক স্থানে। এর নিকটে জগৎসিংহের নব পরিণীতা স্ত্রীর বিমাতা বিমলার নামানুসারে বিমলিগড় নামে একটি দুর্গ ছিল।—ও'ম্যালির সাঁওতাল পরগণার গেজেটিয়ারে এ তথ্য আছে।

"Mangarh, a mauza contiguous to Kasba, is associated with the memory of Akbar's General, Man Singh. The story current among the people of the place is that when Man Singh came to conquer Bengal, he encamped at Manihari and built a fort which was called Mangarh after him. Legend also relates that his son, Jagat Singh, married the daughter of Birendra Singh the chieftain of Tappah, without his father's permission. Bikram Kita is said to have been the capital of Birendra Singh, and there are still remains of a fortress called Bimligarh after Bimala, his wife and stepmother of Jagat Singh's bride" Gazetter of Santal Parganas by O' Malley. (quoted from the Statesman.)

দুর্গেশনন্দিনীর ছটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে বীরেন্দ্রসিংহ বিমলা ও জগৎসিংহের নাম এবং তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক এই গেজেটিয়ারে সঠিক বর্ণিত আছে। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যার সহিত

জগৎসিংহের বিবাহ-কাহিনীও এই মূল বিবরণের অংশ। ওসমানের নাম স্টুয়ার্টের ইতিহাস থেকে নেওয়া। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তিলোত্তমা ও আয়েষার নাম দুটি গড়ে নিয়েছেন। আয়েষার চরিত্র অনৈতিহাসিক। তিলোত্তমার নাম অনৈতিহাসিক, পরিচয় কিন্তু ইতিহাসাশ্রিত। অপর চারটি নাম ও চরিত্র ইতিহাসের পাতায় আছে।

(২)

এ প্রসঙ্গে অপর একটি তথ্যও বিচার্য। তাহা ওসমান সম্বন্ধে। যদুনাথ সরকার তাঁর আবিষ্কৃত বহারিস্তানের সাক্ষ্যে ওসমানের যে অন্তিম ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তাতে দেখা যায় ময়মনসিংহের শ্রীহট্টের সন্নিহিত অঞ্চলে দৌলদ্বাপুরে মোগল সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধে সে পরাজিত ও নিহত হয়। সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ দুর্গেশনন্দিনীর ভূমিকায় এগারসিন্ধুর নিকটে দৌলদ্বাপুরের যুদ্ধ ও এই ওসমানের মৃত্যুকাহিনী বর্ণিত আছে। সম্প্রতি কোন কোন আলোচনায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে যে, দুর্গেশনন্দিনীর ওসমান এবং বহারিস্তানের ঈসমান এক ব্যক্তি কিনা। চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ও স্টেটসম্যান পত্রে এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

দুর্গেশনন্দিনীর ঘটনাকাল ৯৯৭ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ, ৯৯৮ বঙ্গাব্দ) ও খ্রীষ্টাব্দ ১৫৯০। দৌলদ্বাপুরের যুদ্ধের তারিখ ২মার্চ ১৬১২। এই দুই ঘটনার মধ্যে বাইশ বৎসরের ব্যবধান। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে বাঙ্গলা উড়িষ্যার অনধিকৃত অঞ্চল মোগল শাসনের অধীনে আনবার ব্যবস্থা চলছিল। কতলু খাঁ ও ওসমানের সঙ্গে মোগলদের এ কারণেই মান্দারণ বিষ্ণুপুর বা তাম্রা অঞ্চলে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে কতলু খাঁ নিহত হন। পাঠানরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হলেও হতোদ্যম হয়নি। পূর্ববঙ্গের নদীসঙ্কুল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে তারা আশ্রয় নেয়। অসংখ্য নদী অতিক্রম করে তলোয়ার ও বল্লমধারী মোগল অশ্বারোহী সৈন্যদলের অগ্রগতি সম্ভব নয় বলে মোগলপক্ষ নাওয়ারা বা নৌবাহিনীর সৃষ্টি না করা অবধি অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়। মোগল নাওয়ারা সৃষ্টি হলে পূর্ববঙ্গের আধিপত্য পাঠানরা আর রক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু তখন জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকাল। বাংলার রাজধানী তখন তাণ্ডায় নহে, তখন ঢাকাতে।

১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে দৌলদ্বাপুরের যুদ্ধের সময় ওসমানের বয়স ছিল ৪১ বৎসর। গড় মান্দারণের ঘটনাকালে তিনি কুড়ি বৎসরের তরুণ যুবক। সুতরাং মান্দারণ বা তাম্রা অঞ্চলের অধিকারচ্যুত পাঠানগণ কুড়ি বাইশ বৎসর পরে ত্রিপুরা ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সেখানে পুনরায় মোগলদের দ্বারা আক্রান্ত হবে এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই।

যদুনাথ সম্পাদিত বাঙ্গলার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে পরবর্তী গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে কতলু খাঁ ওসমানের ইতিহাসে আছে। (Jadunath Sarkar—History of Bengal, Vol II Published by Dacca University 1948) সুলেমান ও ওসমান দুইভ্রাতা (nephews of Qutlu Khan) কিভাবে উড়িষ্যা থেকে পূর্ববঙ্গে যায়, চাঁদ রায়কে হত্যা করে, ভূষণা লুণ্ঠন করে এবং ঈশা খাঁর সঙ্গে যোগ দেয় তার ইতিহাস স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। এ সকল ১৫৯০ সালের ঘটনা (পৃষ্ঠা ২১০)। মোগলদের সঙ্গে ওসমান দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে। বোকাইনগরের যুদ্ধে পরাজয়ের পর শ্রীহট্টের দিকে চলে যায়। কিন্তু এই অংশ সম্বন্ধে অতিরিক্ত নূতন তথ্য এখনও কিছু পাওয়া যায় নি।

(৩)

"দুর্গেশনন্দিনী বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছিল।...(ইহার) এখানে ওখানে দোষ ত্রুটি থাকিলেও দুর্গেশনন্দিনী সম্পূর্ণাঙ্গ, সুপাঠ্য, সর্বগুণবিশিষ্ট উপন্যাস। মনে হয় জুপিটারের মাথা হইতে পরিণতবুদ্ধি মিনার্ভা যেমন সম্পূর্ণ সুসজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন এই কাহিনীও তেমনি সুপরিণত, তেমনি সুসঠিত ও সালংকৃত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে অপরূপ প্রণয় নিবেদন আছে; ইতিহাসের পটভূমিকা ইহাকে একই সঙ্গে বিস্তৃতি ও বাস্তবতা দান করিয়াছে, আশমানি ও গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ইহার মধ্যে লঘু চপলতা মিশ্রিত করিয়া দিয়াছে।...বাঙ্গালা উপন্যাস যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিণত রূপ পাইয়াছে তাহার প্রধান কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের তথা দুর্গেশনন্দিনীর শিল্পচাতুর্য। দুর্গেশনন্দিনী পূর্ণাঙ্গ পরিণত রূপ লইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়াই পরবর্তী ঔপন্যাসিকদিগকে অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় নাই; তাঁহারা বিরাট উত্তরাধিকারকে বাড়াইয়া গুছাইয়া গিয়াছেন মাত্র।" *

ভবিষ্যৎকালের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তারকারী উপন্যাস তার আত্মপ্রকাশ কালে প্রায় সকলের দ্বারাই প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু প্রশংসার সঙ্গে অশ্লীলতার প্রতি কটাক্ষও ছিল। রহস্য-সন্দর্ভ পত্রিকার মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন,....."আশমানির রূপ বর্ণন প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অনুপযুক্ত হয় নাই। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, সেই বাক্যগুলি এই স্থানে উদ্ধৃত করিব, কিন্তু তন্মধ্যে কয়েকটী স্পষ্ট বর্ণনা থাকা প্রযুক্ত আমাদিগের স্ত্রী-পুত্রপাঠ্য সম্বর্তে তাহা গ্রহণীয় হইল না।..... শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু হাস্যরসোদ্দীপনে বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এইক্ষণে বাঙ্গালী পুস্তক তত্ত্বজ্ঞিসারা পাঠ করিয়া থাকেন ইহা তিনি সর্বত্র স্মরণ রাখেন নাই, অথবা তাঁহার পুস্তক তাহাদিগের গ্রাহ্য করিবার সম্যক চেষ্টা পায়েন নাই। অনেক কথা আছে যাহা স্পষ্টাপেক্ষা পরোক্ষে চমৎকার হয়, ইহা বিস্মৃত হওয়া অনেক গ্রন্থকারের সঙ্কল্পতার হানিকর হইয়া থাকে।" এই রহস্য সন্দর্ভের সমালোচনার প্রারম্ভেই আবার একথা বলা হয়েছিল যে "বাঙ্গালীতে যত গল্পকাব্য হইয়াছে তৎসকলই প্রায় বিদ্যাসুন্দরের ছায়াস্বরূপ বোধ হয়।" এ সকল গল্পকাব্য নবাবাবু বিলাস, নবাবিবি বিলাস শ্রেণীর গ্রন্থ। শুধু গদ্য নয়, পদ্যেও বিদ্যাসুন্দরের অনুকৃতি সেদিনে যথেষ্ট ছিল। ১২৪০ সালে কাঁচড়াপাড়া নিবাসী গুরুপ্রসাদ রায় বৈদ্য রচিত "গুণীল মল্লি সংবাদ", ১২৪২ সালে গোপালপুর নিবাসী রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "প্রীতি পদ্ধতি", ১২৫৩ সালে মাধবাসী নিবাসী জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত "অভিলাষ রসবিন্দু" প্রভৃতি ভারতচন্দ্রের রচনার সরস অংশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমর্থ। এ সকল গদ্য পদ্য গ্রন্থের সঙ্গে তুলনায়ও দুর্গেশনন্দিনী তত্ত্বজ্ঞিসাদের পড়বার উপযোগী নয় মন্তব্য কৌতুকজনক।

(৪)

বিষ্ণুর ছদ্মনামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি অন্যত্র দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত অনুভূতির উল্লেখ করেছেন। তিলোত্তমার রূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজের প্রথমা স্ত্রীর কথাই প্রকারান্তরে

* 'গ্রন্থ পরিক্রমা' পত্রিকার বিশেষ উপন্যাস সংখ্যায় ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিত প্রবন্ধ।

বলেছিলেন। প্রথমবার বিবাহের সময় বঙ্কিমের বয়স ছিল বারো আর তাঁর স্ত্রীর (মোহিনী দেবীর) বয়স ছিল পাঁচ। মোহিনী দেবীর মৃত্যু হয় ষোলো বৎসর বয়সে। দীর্ঘ এগার বৎসর কাল উভয়ে উভয়ের সাহচর্য অনুভব করেছিলেন। এই সাহচর্য যৌবনের অন্বয়ঙ্গতায় উত্তীর্ণ হবার মুহূর্তে মৃত্যুর বিচ্ছেদ এসে উভয়কে পৃথক করে দেয়। দুর্গেশনন্দিনী রচনা আরম্ভের অল্পকাল পূর্বে এই দুর্ঘটনা ঘটে। কিশোর বয়সে এবং যৌবনের প্রারম্ভে দেখা তাঁর কিশোরী ও উদ্ভিন্ন যৌবনা স্ত্রীর মূর্তি তিনি ভুলতে পারেন নি। তিলোত্তমার ষোল বৎসর বয়সের রূপের বর্ণনায় নিজের প্রিয়-সঙ্গিনীর রূপের কথাই এসে পড়েছে। তিনি লিখেছেন, "পাঠক! কিশোর বয়সে কোন দিবা ধীরা, কোমল প্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন? একবার মাত্র দেখিয়া চিরজীবন মধ্যে যাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই···এমন তরুণী দেখিয়াছেন?··· তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহারতন প্রস্ফুটবয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহারতনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল।" এই রূপবর্ণনা আপন অভিজ্ঞতা প্রভাবিত।

(৫)

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের মধ্যে সাজাত্য বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন; পাঠকের মনেও যেন এই বোধের সঞ্চার হয়, সেদিকে সতর্ক ছিলেন। বাঙালীর ভাল মন্দ গুণ দোষ সমস্তই তিনি প্রশংসা অথবা নিন্দার দ্বারা সিঞ্চিত করেছিলেন। তাঁর এই ভাব দুর্গেশনন্দিনীতে কতকটা প্রচ্ছন্ন ছিল। স্পষ্টরূপে তখনও তা প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তী সাহিত্যে তা ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এর একটা নিদর্শন, রাজসিংহ ব্যতীত অন্য সকল উপন্যাস কি ইতিহাসাশ্রিত কি গার্হস্থ্য প্রত্যেকটি বাঙালায় ও বাঙালীর কথায় মুখরিত। বাঙালীর পরাধীনতায়, বাঙালীর হীনমন্যতায় তিনি সর্বদা পীড়া অনুভব করতেন। দুর্গেশনন্দিনীর একটি ঘটনায়ও এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। ওসমান কতলু-খাঁর নির্দেশে জগৎসিংহকে মোগলপাঠানের সন্ধির উদ্যোগী হতে অনুরোধ করে। যুক্তি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলে যে সন্ধিতে উভয় পক্ষের মঙ্গল। নতুবা দিল্লীশ্বর কতকাল তাঁর কত সেনাপতি পাঠানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবেন। কেন না "পাঠান স্বাধীন হবে। পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে; কখনও অধীনতা স্বীকার করে নাই; একজন মাত্র জীবিত থাকিতে কখন করিবেও না; ইহা নিশ্চিত কহিলাম।" বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানের মুখে নিজের মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। নিজেদের স্বাধীনতা স্পৃহা ব্যক্ত করবার জন্য বাঙালীকে তিরস্কার করা ওসমানের কোন প্রয়োজন ছিল না।

(৬)

দুর্গেশনন্দিনী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক প্রণয় কাহিনী। প্রথম মৌলিক ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই শ্রেণীর উপন্যাসের লক্ষণ সাহিত্যের একটি বিতর্কিত বিষয়। বঙ্কিম নিজেও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন না। সে জন্য এ সকল উপন্যাস ইতিবৃত্তমূলক বলে উল্লেখ করে নিজেই তা পরে

অস্বীকার করেছেন। এখানে এ কথা স্মরণীয় যে লেখক কখনই তাঁর নিজের সৃষ্ট সাহিত্যের উপযুক্ত ব্যাখ্যাতা নন। রবীন্দ্রনাথের নাম মনে রেখেও এ কথার সার্থকতা স্বীকার করতে হয়। বঙ্কিম-চন্দ্রের ক্ষেত্রেও এ কথার ব্যত্যয় হতে পারে না। তাঁর অস্বীকৃতি সত্ত্বেও দুর্গেশনন্দিনী সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। দুর্গেশনন্দিনীর মূল ঐতিহাসিক কাঠামো: বাঙলা উড়িষ্যার মোগল পাঠানের যুদ্ধ। বঙ্কিম পদে পদে ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করে তা বর্ণনা করেছেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির সমন্বয়ে কখনও কখনও তাঁর কল্পিত ঘটনা অথবা সম্পর্ক পরবর্তী গবেষণায় সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কতলু খাঁ ওসমানের সম্পর্ক এর একটি উদাহরণ। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায়, পরে রচিত, মৃণালিনী উপন্যাসের ঘটনাও বিস্ময়কর রূপে সত্য। বখতিয়ার খিলজী তাঁর সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নবদ্বীপ জয় করেন নি। তাঁর সঙ্গে বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল বঙ্কিমের এ অনুমান যদুনাথ সরকারের গবেষণায় সত্য প্রমাণিত হয়েছে। (History of Bengal, Vol II)। এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র পশুপতি যথার্থ ঐতিহাসিক পুরুষ এবং তিনি লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের আরম্ভে আছে, "গৌড়দেশের ধর্মাধিকার পশুপতি অসাধারণ ব্যক্তি; তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর।" বঙ্কিমচন্দ্র কোথায় এ তথ্য পেয়েছিলেন বলা কঠিন। কিন্তু পশুপতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তিনি যথার্থ লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর আরও পরিচয়, তিনি বেদের বিখ্যাত পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ সর্বস্ব-গ্রন্থের রচয়িতা হলায়ুধের ভ্রাতা।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের শুধু সৃষ্টি নয়, এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাঙালীর চিন্তা ও কর্মের একটা দিকের ইঙ্গিত তিনি রেখে গেছেন। সে বিষয়েও গবেষণা নির্ভর উপাদেয় প্রবন্ধ রচিত হতে পারে।

• • • •

"কাল ৭৬ সাল ঈশ্বর-কৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালায় ছয় আনার কম মনুষ্যকে—কত কোটি তা কে জানে—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সে দুর্বৎসর নিজে কাল-গ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্য-শালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্যা। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া পশুগণের বিশ্রাম ভূমি এবং প্রেত ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্বর ভূমিখণ্ড সকল অকর্ষিত অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পুরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাস্যময় শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো-মহিষাদি বিচরণ করিত, যে সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক-যুবতীর প্রমোদভূমি ছিল, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। একবৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে, নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল।·····

—বঙ্কিমচন্দ্র

পাঠক-পাঠিকার প্রতি বঙ্কিম

নীলিমা দে

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "বঙ্কিমবাবু একে তো কোথাও কোনোরূপ অবাবদিহি করেন না'ই, তাহার উপরে আবার মাঝে মাঝে নির্দোষ পাঠকদিগকেও ধমক দিতে ছাড়েন নাই। মাণিকলালের বসন পথের মধ্যে হঠাৎ অপরিচিতা নির্মল-কুমারীকে তাহার সহিত এক ঘোড়ায় উঠিয়া বসিতে বলিল এবং নির্মল যখন তাহার নিকট বিবাহের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে মাণিকলালের অনুরোধ রক্ষা করিল, তখন লেখক কোথায় তাঁহার স্বরচিত পাত্রগুলির এইরূপ অপূর্ব ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইবেন, তাহা না হইয়া উল্টিয়া তিনি বিস্মিত পাঠকবর্গের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন, "বোধ হয় কোর্টশিপ্‌টা পাঠকের বড়ো ভালো লাগিল না। আমি কী করিব। ভালোবাসাবাসির কথা একটাও নাই, রহস্যসঙ্কেত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—হে প্রাণ! হে প্রাণাধিকা! সে-সব কিছুই নাই—ধিক!"

কেবল 'রাজসিংহ' উপন্যাসে নয়, প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই মাঝে মাঝে কাহিনীর স্রোত সাময়িক সময়ের জন্য রুদ্ধ রেখে পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে ঔপন্যাসিক একটু কথা বলে নিয়েছেন। এখনকার দিনে ঔপন্যাসিক, বা নাট্যকার নিজেকে যথাসম্ভব আড়ালেই রাখেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে-সঙ্গেই আছেন, মাঝে-মাঝে আত্মপ্রকাশ ক'রে পাঠক-পাঠিকাদের তিনি তা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি যেন সেই নাট্যকারের মতো যিনি নিজের নাটক মঞ্চে চলেছে এমনি সময় মাঝে মাঝে নট-নটীদের আড়াল ক'রে নিজে দর্শকদের সামনে হাজির হ'য়ে তাদের কিছু বলছেন। তিনি সেই সংগীত-শিল্পীর মতো যিনি মাঝে-মাঝে যন্ত্রে রাগ-রাগিনীর আলাপ থামিয়ে শ্রোতাদের সঙ্গে একটু রসিকতা ক'রে নিচ্ছেন। এ-রকম মন্তব্য স্থানে স্থানে করাতে উপন্যাসের গতি বা রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে কি না তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। কিন্তু এই ভঙ্গিটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য। ভেনাসের যে হাত-ভাঙা মূর্তিটি দেখে আমরা অভ্যস্ত তা বিকলাঙ্গ হ'লেও আমাদের কাছে অসুন্দর মনে হয় না। যদি কাহিনীর মাঝখানে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব উপস্থিতি ত্রুটি ব'লেও বিবেচিত হয়, তথাপি বঙ্কিমের উপন্যাসে মন্তব্যের অংশগুলি আজ আর দোষের তো নয়ই, বরং বেশ উপভোগ্য মনে হয়। যে তপ্ত হাস্যরস বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রাণ ও সম্পদ, ওই মন্তব্যগুলির মধ্য দিয়ে তা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝ'রে পড়েছে। কাহিনী লিখতে গিয়ে ওই মন্তব্যগুলি নিজের থেকেই কলমের মুখে এসে গেছে। বাইরে থেকে বা জোর করে বঙ্কিম এই মন্তব্যগুলি আমদানী করার চেষ্টা করেন নি। সেই জন্যই পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত বাক্যাবলী তাঁর কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকেই বঙ্কিম কাহিনীর ফাঁকে-ফাঁকে পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে বলতে শুরু করেছেন। তিলোত্তমার রূপ-লাবণ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি পাঠককে সম্বোধন ক'রে বলেছেন:

"তিলোত্তমা সুন্দরী। পাঠক! কখন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা, কোমল প্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য স্নেহচক্ষুতে দেখিয়াছেন? একবার মাত্র দেখিয়া চিরজীবন যাহার মাধুর্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; কৈশোরে, যৌবনে, প্রগল্‌ভ বয়সে, কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে,

নিদ্রায়, পুনঃপুনঃ যে মনোমোহিনী মূর্তি স্বপ্ন পথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে চিত্তমালিন্য-জনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্তমার অবয়ব মনোমধ্যে স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিবেন।...পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস? তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরঞ্জিনী হইতে পারিবে না।" পাঠান কতলু খাঁর বিলাসগৃহের বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিম পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নীতি-শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে নানা কথা বলেছেন। এর উদাহরণ 'কপালকুণ্ডলা'য়। সবার সুবিধার জন্য নবকুমার গেল বনে কাঠ কাটতে। অথচ তাকেই অপরিচিত, হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে রেখে সকলে স্বার্থপরের মতো চ'লে গেল। মানব-চরিত্র সম্পর্কে পাঠকের যাতে খারাপ ধারণা না জন্মে, তার জন্য, পাঠক কিছু ভাববার আগেই যেন এইকথা ব'লে উঠলেন: "ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপকার নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন!"

বিশেষত, যেখানেই সুন্দরী নারীর রূপ-বর্ণনার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে সেখানেই যেন পাঠক-পাঠিকার ডাক পড়েছে। 'কপালকুণ্ডলা'য় পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক পাঠককে স্মরণ করেছেন: "যদি এই রমণী বিধাতার সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা হইতেন, তবে বলিতাম, 'পুরুষ পাঠক! ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠকারিণি! ইনি আপনার 'দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় রূপবতী' তাহা হইলে রূপবর্ণনার একশেষ হইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নহেন, সুতরাং বিরত হইতে হইল।" 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন: "এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে।"

পাঠক যাতে অধৈর্য হয়ে না পড়েন, কৌতূহল না হারান তার জন্যও বঙ্কিম এখানে-ওখানে পাঠককে আগে থেকেই বলে রেখেছেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের গোড়ার দিকে বলেছেন: "আমার এই সামান্য কাব্য স্বর্গও নয়—ইহার সকলোজন সিঁড়িও নাই। রসও অল্প, সিঁড়িও ছোট। এই নীরস পরিচ্ছেদ কয়টি সেই সিঁড়ি। যদি পাঠকশ্রেণী মধ্যে কেহ মানিনী চরিত্র থাকেন, তবে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই যে, তিনি এ সিঁড়ি না ভাঙ্গিলে সে রসমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন না।"

যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা ব'লে নিয়েছেন। যেন কাহিনীর নীরস রেয়াসের গায়ে ঔপন্যাসিক ইচ্ছে করেই কিছুকিছু জানালা রেখে দিয়েছেন। সেই জানলাপথে স্বল্প সময়ের জন্য উঁকি মেরে তিনি পাঠক-পাঠিকার মনের ভাব জেনে নিচ্ছেন, নিজের বক্তব্য তাদের জানাচ্ছেন। এই মন্তব্যের অংশগুলির অল্প সার্থকতা থাকুক বা না থাকুক, আমাদের অন্তত এইটুকু লাভ হয়েছে যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে, কাছের মানুষ হিসেবে পেয়েছি।

একটি পুরাতন কথা

(বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ)

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাসে, কাব্যে, কথায়, বারমাস্যার পাশায় প্রেমের ত্রিভুজের কতো কাহিনীই না পড়ি—শুনি তার মান অভিমান বিরহ মিলন উৎকণ্ঠা বিচ্ছেদের গল্প, রসিয়ে, রাঙিয়ে ঘরিয়ে তা উপভোগ করি। আজকাল অবশ্য ত্রিভুজ আর চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ নয় একেবারে অনন্তবাহু অনন্তবাহু হয়েছেন, সর্বভূতে আমরা যারা ও যারিনকে দেখছি, কিন্তু সেই একই ফাঁদ পাতা থাকে ভুবনে, তারই কলরোল ওঠে ভবনে ভবনে।

এই ত্রিভুজের কথা তুললাম, কেননা রবীন্দ্রনাথের যৌবনে তিনি একদিন তর্কের রৈবথে পড়েছিলেন বঙ্কিমের সঙ্গে, যাঁর প্রতি তাঁর ছিল শ্রদ্ধা অসীম,

বঙ্কিম তোমার নাম বিদিত ভুবনে

একে আমি বলি ভালোবাসার ঝগড়া। মাথা ফাটাফাটি হয়নি বটে, তবে কথা কাটাকাটি জোর চলেছিল। একদিকে নবীন কিশোর তপ্ত চঞ্চল প্রাণোচ্ছল তরুণ, আর একদিকে প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় প্রৌঢ়। প্রথম ও দ্বিতীয়ের কথা বললুম। তৃতীয়া ছিলেন নেপথ্যে, রঙ্গমঞ্চে অনাগত। বঙ্কিমচন্দ্র নামকরণ করেছিলেন—রবির পিছনের ছায়া। কথাটা অবশ্য আদি ব্রাহ্ম সমাজের। গল্পটি বলি তাহলে। কাল—উনিশ শতকের অষ্টম দশম, স্থান—খাস কলকাতা সহর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাড়ী, কুলীনবয়া তত্ত্ববোধিনী, ভারতী, নবজীবন, প্রচার প্রভৃতি কাগজগুলি আর তাদের লেখকরা যার পুরোভাগে ছিলেন—বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয় সরকার, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ সবে তখন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেছেন। একথা বলা স্বাভাবিক যে তাঁর তখন 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করার উৎসাহের অভাব ছিল না, আলস্যও নয়। বঙ্কিমের মতে 'নবজীবন' পত্রিকায় 'তত্ত্ববোধিনী' অপেক্ষা 'বঙ্গদর্শন'কে বেশী উৎসাহ দেওয়াই এই ঘন্দের মূল। 'সঞ্জীবনী'তে তার পাল্টা জবাব বেরুলো এবং উত্তরের প্রত্যুত্তর স্বরূপ একটি বেনামী পত্রও প্রকাশিত হোল। লেখকের নামের আদ্য অক্ষর ছিল 'র'। সেটা রবীন্দ্রনাথের লেখা কিনা কেউ জানেনা তবে তারপরে 'প্রচারে' রবীন্দ্রনাথের স্বনামে আবির্ভাব এবং ভারতীতে উত্তোর পাওয়া। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—এইটে হচ্ছে তাঁর প্রতি চতুর্থ আক্রমণ এবং স্বয়ং আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দ্বারা। তিনি সাধারণতঃ এ ধরণের বিতর্ক বিতণ্ডায় কোন অংশ নিতেন না, তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র। রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা তাঁকে যে বেশ খানিকটা ক্ষুব্ধ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর কয়েক বছর পূর্বেই (১৮৮২ সালে) তিনি ব্রহ্মের রমেশ দত্তের কন্যার বিবাহ-বাসরে

যে মালা রমেশচন্দ্র বঙ্কিমের গলায় দিতে যাচ্ছিলেন, সেই মালা রবীন্দ্রনাথের গলায় বঙ্কিম স্বয়ং দেন এবং বলেন—এ মালা ইহারই প্রাপ্য, রমেশ—তুমি সন্ধ্যা-সংগীত পড়িয়াছ ?

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়া বাড়ীতে ও হাওড়াতেও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে রবীন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল। বঙ্কিমের মতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ঠিক বুঝেছিলেন—"তবে আমি স্পর্ধা সহকারে বলিয়াছি, তোমার ছাইভস্ম সভা ভাসাইয়া দাও, মিথ্যার আরাধনা কর।" রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন তিনি যদি মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কূটোক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা করিয়া থাকেন……কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রের এই তর্কযুদ্ধ যেন দ্রোণ-একলব্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্কিমের উক্তির কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি—রবীন্দ্রবাবু যখন 'ক' 'খ' শিখেন নাই, তাহার পূর্ব হইতে এরূপ সুখ-দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে……রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ স্বভাব এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণ বয়স্ক। যদি তিনি দু'একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য……আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি, গালিগালাজে প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত। তবু প্রভু ভৃত্যের মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই; প্রার্থনা মন্দির হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ—অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।

প্রবোধ প্রভাতবাবুর রবীন্দ্র জীবনীতে পড়ি যে 'ভারতী'তে পুনরায় উত্তর দেবার সময় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখোমুখী প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছে, তাই আমার কর্তব্য সাধন করিয়াছি। না হলে সাধ করিয়া বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয়না, ভরসাও হয়না।

অনেকদিন পরে 'জীবন-স্মৃতিতে' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে, যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়াছিলেন।

স্থলচরবরেষু, আর্য ও অনার্য, সূক্ষ্ম বিচার, আত্মসমীক্ষা, গুরুবাক্য প্রভৃতি নানা লেখায় এই সময়কার এই বিরোধের একটা শুরুত্বপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়, বাঙ্গে, কবিতায়, প্রবন্ধে ইত্যাদিতে।

বঙ্কিমের সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

সেই সম্মিলন সভায় (রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এমারেল্ড থিয়েটারে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রদের বার্ষিক সম্মিলনীর কলেজ রিইউনিয়ন সভায় ১৮৭৬) ভিড়ের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটা দৃপ্ততেজ দেখিলাম ……ওঁহার ললাটে যেন এক অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

তারপর কোনও পণ্ডিতের কোনো স্বরচিত সংস্কৃত কবিতা পাঠকালে তাঁর কবিতার এক স্থলে অশ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটা উপমা ছিল—বঙ্কিমবাবু মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যান এবং সেই হোঁচাইয়া পালানোর দৃশ্যটি রবীন্দ্রনাথের মনে চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের, বঙ্কিমের স্মৃতিসভা নিয়ে বিরোধ ও বিতণ্ডায় নবীনচন্দ্র বলেছিলেন, তাঁর কাছে শোক পবিত্র, তাকে সভাসমিতিতে হাঁকডাকে প্রকাশ করা অনুচিত।

আরো মনে পড়ছে শ্রীঅরবিন্দের কথা : বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, একটা শতাব্দী যথেষ্ট দিয়েছে বাংলা সাহিত্যকে। বন্দেমাতরম্ মন্ত্র একটা জাতির অন্তরনিহিত তূর্যনাদের প্রতীক্, যার একদিকে রয়েছে শক্তি, আর একদিকে হৃদয়ে ভক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, বঙ্কিম ছিলেন সাহিত্যে কর্মযোগী, তাঁর কল্পনা ছিল, কিন্তু কাল্পনিকতা ছিল না—তাঁহার নিপুণ কর্মকার, চরিত্র অংকণে সুদক্ষ। এই শিল্পীকে তখনকার প্রাচীনরা সসম্মানে আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেছিলেন কিনা জানি না, তবে শুনেছি পূজনীয় পণ্ডিতরা একশো বছর আগে দুদিন ধরে তাঁর বাড়ীতে বসে দুর্গেশনন্দিনীর পাঠ শুনে সাধুবাদ দিয়েছিলেন।

আজকের এই পুণ্য বৈশাখে রবীন্দ্র জন্মতিথিতে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই তাঁকে প্রণতি জানাই—

এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে চলিতেছ সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশার ফলধান ভবিষ্যতের পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে
বঙ্কিম তোমারি নাম তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।

• • • • •

বিশ্ব-ভারতী

"বহুদিনের ত্যাগের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা এই আশ্রমকে দেশের বেদীমূলে স্থাপন করবার জন্য নৈবেদ্য সংরচন কার্য আমার আয়ুর সঙ্গে সঙ্গে একরকম শেষ করে এনেছি। দূরের অতিথি অভ্যাগতদের অনুমোদনের দ্বারা আমাদের কাছে এই একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, এখানে প্রাণশক্তি রয়েছে। মূলে ফলে বাহিরের ফসলের কিছু একটা প্রকাশ এঁরা দেখেছেন, তা ছাড়া তাঁরা এর অন্তরের ক্রিয়াকে ও দেখেছেন। দূরের সেই অতিথিরা নবীবারা আমাদের পরম বন্ধু, কারণ তাঁদের আশ্বাস আমরা পেয়েছি। আমাদের এই আশ্রমের কর্মেতে আমি যে আপনাকে সমর্পণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই সৃষ্টি আমি যাবার পূর্বে দেশকে সঁপে দিতে পারি। প্রদ্ধা দেয়ম্ যেমন, তেমনি প্রদ্ধয়া আদেয়ম্। যেমন প্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি প্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে। এই দেওয়া নেওয়া যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আমার সারা জীবনের কর্মসাধনার এই ক্ষেত্র পূর্ণতার রূপ লাভ করবে।" — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কি একজন স্বপ্ন-বিলাসী কবি ছিলেন ?

মরেন্দ্র দেব

শিক্ষিত ছেলে মেয়েরাও অনেকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বেশ একটু ইতস্তত: করবেন। তাঁদের অধিকাংশেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একজন উচ্চস্তরের বিস্তৃত ভাবুক কবি ছাড়া আর কিছু ছিলেন কিনা ?

এই ধরণী প্রেম-প্রেমিক কবি যে সারা জীবন ধরে নিজের সর্বস্ব নিঃশেষে দান করে শেষে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন আপন আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত করবার জন্য তার সন্ধান আমরা ক'জন রাখি ?

আসুন, আমরা আজ সমগ্রভাবে তাঁর সেই বিপুল দানের বিষয় সংক্ষেপে একটু আলোচনা করি। বিশদভাবে ও সবিস্তারে তার আলোচনা করতে বসলে আর একখানি অষ্টাদশপর্ব মহাভারত হয়ে উঠবে। সুতরাং সে চেষ্টা না ক'রে কেবল তাঁর অমিত দানের সামান্য উল্লেখ মাত্রই করে যাবো।

মানব ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনের ফলেই মানুষ হয়ে ওঠে শিল্পী বা শিল্পানুরাগী। জেগে ওঠে তার মনের মধ্যে সূক্ষ্ম রসানুভূতির একটি বিশিষ্ট চেতনা। এই রসবোধের অনুভবই নিয়ে যায় মানুষকে ভাবজগতের এক আনন্দলোকে। যে লোকে অমৃতলাভ করে কাব্যলক্ষ্মীর বন্দনার শ্লোক। রচিত হয়ে ওঠে জীবন রহস্যের বিচিত্র সংগীত। রূপায়িত হয়ে ওঠে রম্যকলা ও সুকুমার শিল্প সম্ভার।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই ভাবভুবনের রাজ-রাজেশ্বর। তাঁর বিচিত্র মধুর অমিত ভাবরস ধারায় আমাদের মর্মমূল অভিসিঞ্চিত হয়ে নিরানন্দপ্রায় শুষ্ক জীবন তরু মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। যে কথা অন্তরে অন্তরে একান্তভাবে অনুভব করেও উপযুক্ত ভাষার অভাবে তা প্রকাশ করতে পারিনি, কবি আমাদের কণ্ঠে নিজেকে প্রকাশের সেই শক্তি দিয়ে গিয়েছেন।

মহামানব ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে ঋষি-কবি বলে অভিহিত করলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয়না। মহামানবের মহাজীবন! অল্প কথায় তাঁর পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল মাত্র তাঁর বিবিধ দানের উল্লেখ করে যাবো। জানি, এভাবে কিছু বলবার চেষ্টা করলে তা ঠিক সাহিত্যের পর্যায়ে গিয়ে পৌছবে না, তবে, কবির বিরাট কর্মের পরিচয়, তাঁর দুঃসাধ্য কীর্তি কাহিনীর কিছুটা সংবাদ হয়ত দেওয়া যাবে। সেটাওতো তুচ্ছ নয়।

এই মহাকবিকে জানতে হ'লে, কবির অন্তরের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপন করা প্রয়োজন। সে পরিচয় তিনি রেখে গেছেন তাঁর অসংখ্য পত্রাবলীর মধ্যে আর অমূল্য রচনা সম্ভারের মধ্যে। আর 'বিশ্ব-ভারতী', 'শান্তিনিকেতন', 'শ্রীনিকেতন' এবং 'লোকশিক্ষা সংসদের' কার্যসূচীর মধ্যে। এর প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার মধ্যে-নিহিত রয়েছে কবির সুগভীর দেশপ্রেম। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব পত্রাবলী যাঁরা মনদিয়ে পড়েছেন, কবির মনের খবর তাঁদের মধ্যে পৌছবে।

প্রথমে কবির রচনাবলীর কথাই বলি। সম্ভবতঃ অনেকেই এ খবর জানেন। সুতরাং, তালিকা উদ্ধারের প্রয়োজন নেই। কবির গ্রন্থাবলী থেকে আমরা দেখতে পাই তিনি কাব্য, নাটক, গীতিনাট্য

নৃত্যনাট্য, রূপকনাট্য, ছোটগল্প, বড়গল্প, উপন্যাস, রম্য রচনা, বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সমালোচনা, জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শব্দ তত্ত্ব, গ্রামের কথা, পল্লী উন্নয়ন, আর্থিক উন্নতি, ভক্তি, প্রেম, ধর্ম ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতাবলী, লঘু হাস্য পরিহাস মূলক নানা প্রহসন ও রসরচনা, শিশুদের জন্য নানা ধরণের ছড়া, কবিতা, গল্প প্রভৃতি অনবদ্য শিশু-সাহিত্য, ছোটদের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক, ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা-গ্রন্থ এবং চিত্রাঙ্কন ও গৃহ-শিল্প সম্বন্ধেও নিবন্ধ রেখে গেছেন। এ ছাড়া বিবিধ সাময়িক পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও সহযোগিতার দ্বারা আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সকল বিভাগকে তিনি তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার দিব্য আলোকে সমুজ্জ্বল করে দিয়ে গেছেন। দেখলে আশ্চর্য বোধ হয় যে, বিবিধ বিষয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ তাঁর জীবিত কালেই প্রকাশিত হয়েছিল ২৭ খানি। কবির স্বর্গারোহণের পরও নানা পত্র-পত্রিকায় ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত তাঁর নানা রচনা সংগ্রহ করে বিশ্বভারতী গ্রন্থ প্রকাশন বিভাগ পুস্তকাকারে আরও কয়েকখানি প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি বাংলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১৫টি খণ্ডে এই বিপুল রচনা বিধৃত হয়েছে। পৃথিবীর আর কোনও দেশে কোনও একজন মাত্র লেখক তাঁর সারা জীবনে এতরকম বিভিন্ন বিষয়ে এত বেশী সংখ্যক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করে যেতে পারেন নি।

রচনা সম্ভারের দিক দিয়ে কবিগুরু বিশ্বে যেমন অদ্বিতীয়, তেমনি আরও অনেক বিষয়ে অনেক দিক দিয়ে আমরা এই পুরুষোত্তম কবির কাছে নানাভাবে কতো যে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ হয়ে আছি সে কথা ভেবে দেখলে কবিগুরুর চরণে আপনিই মাথা নত হয়ে পড়ে। তাঁর অসামান্য প্রতিভার অমিত দানে শুধু বাংলা সাহিত্যই বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সমগ্র দেশ ও জাতির জীবনকেও তিনি তাঁর নবীন প্রাণস্পর্শের সঞ্জীবন মন্ত্রে উজ্জীবিত করে দিয়ে গিয়েছেন। কবি আমাদের মনকে, বুদ্ধিকে, আত্মচেতনাকে ও বিচার শক্তিকে, আমাদের অন্তরের সমস্ত সৎ ও সুকুমার বৃত্তিকে, আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও রসবোধ এবং সংস্কৃতির প্রজ্ঞাকে নানা দিক দিয়ে বিকশিত, স্ফূর্ত ও পরিপুষ্ট করে গিয়েছেন।

বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় উপনিষদের অমৃতময় বাণীকে আমাদের অন্তর্লোকে তিনিই পুনর্জীবিত করেছিলেন। জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি আমাদের স্তিমিতপ্রায় দেশাত্মবোধ, স্বাজাত্যবোধ ও মনুষ্যত্ব-বোধকে বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে অভিনব গৌরবে। সর্বমানব প্রীতির পরম ঔদার্যকে তিনি এনে দিয়েছিলেন আমাদের মনের সকল সংকীর্ণতার মালিন্যকে অপসারিত করে। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি মানব সমাজের সকল ঘৃণিত বিভেদকে তিনি বিদূরিত করে মানব সভ্যতার উদার দৃষ্টিভঙ্গীকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন মহামানবতার ঐক্যবোধের সূত্র আবিষ্কার করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বহু মনীষীরই আবির্ভাব ঘটেছিল এই বাংলাদেশে। তাঁদের সকল মহিমার চূড়ায় বিজয়ধ্বজপট নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের মানস মনীষার পরম পরশমণি রূপে এই মহামানব রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অনন্ত বিচিত্র রসসম্ভার পুষ্ট কবিতাবলী সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি। কারণ আমরা অনেকেই কমবেশি সেই অপূর্ব কাব্যধারায় অমৃত আস্বাদ গ্রহণে আজও পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। যে কথা মনে মনে ভাবি, কিন্তু প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাই না, কবি যেন আমাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে সেই ভাবনাকে অন্তরঙ্গের মতোই আশ্চর্যরূপে প্রকাশ করে গিয়েছেন।

কবির গীতবিতানের অজস্র পুষ্পিত কুঞ্জে প্রবেশ করলে আমরা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কিন্তু আমরা কি জানি যে রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে প্রায় দু'হাজার সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছেন। সুরের সঙ্গে ভাব ও ভাষা এবং ছন্দ ও মিলের এমন অপূর্ব সমন্বয় ইতিপূর্বে আর কোনও গীতিকারের সঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ হয়ে উঠতে দেখিনি! প্রতিটি গানের ছন্দে যেন আমাদের অন্তরের না-বলা বাণী আত্ম-প্রকাশের দিব্য ঐশ্বর্য খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন গীতরচয়িতাই ছিলেন না। তিনি অসামান্য শক্তিশালী একজন সুরস্রষ্টাও। কতো নব নব মিশ্র রাগ-রাগিণী এবং নূতন নূতন তালমানও সৃষ্টি করে গেছেন তিনি যা ভারতীয় সঙ্গীত রাজ্যে এনে দিয়েছে এক সুরলোকসঞ্চারিত যুগান্তর। প্রথম জীবনে রচিত তাঁর কয়েকটি প্রণয়ী সঙ্গীত ও বৈষ্ণব পদাবলীও অপূর্ব!

এ তথ্যটিও হয়ত অনেকেই জানেন না যে বাংলা সাহিত্যের কথা-শিল্প বিভাগে ছোট গল্পের প্রকৃত স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথই প্রথম। তাঁকেই বলা যায় এ বিভাগের আদি-শিল্পী। নিমেষে ফুরিয়ে যাওয়া অথচ মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেওয়া ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে কিছু ছিল না। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এ বিভাগে আমাদের দিয়েছিলেন তিনটি অনিন্দ্য সুন্দর রচনা—'রাধারাণী', 'ইন্দিরা' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়'। কিন্তু বিশ্বের সাহিত্য সমালোচকদের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে এ তিনটি রচনাই 'ছোট উপন্যাস' বলে চিহ্নিত হয়েছে, ছোটগল্প বলে স্বীকৃত হয়নি। তাঁরা বলেন, এ আখ্যায়িকা তিনটি উপন্যাসধর্মী। আকারে অবশ্য ক্ষুদ্র কিন্তু উপন্যাসের আঙ্গিকেই রচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি যেমনই ছোট, তেমনি গল্পও। জীবন মুহূর্তের ক্ষণিক চমক পাই এগুলির মধ্যে, যা অপচলায় মতই মনকে চকিতে দীপ্ত করে দিয়ে যায়।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ এক নূতন যুগ প্রবর্তন করে গিয়েছেন। নিবিড় ও গভীর মনস্তত্ত্বমূলক বাংলা উপন্যাস তিনিই বাংলা ভাষায় প্রথম রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা 'চতুরঙ্গ' ও 'চোখের বালি' এ দেশের কথা সাহিত্যে সম্পূর্ণ এক নূতন অবদান যা সাহিত্যের ধারাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রানুসারী শরৎ সাহিত্য যে রবীন্দ্রনাথের কাছেই সম্পূর্ণ ঋণী একথা শরৎচন্দ্র স্বয়ং অকপটে স্বীকার করে গেছেন।

আমাদের নাট্যসাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ এ বিভাগেও একাধিক নূতন পথের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন। নাট্যসাহিত্যেও কবির দান অপরিমেয় ও অতুলনীয়। তিনি সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকে বিবিধ শ্রেণীর নাটক রচনা করেছিলেন। কি পৌরাণিক, কি ঐতিহাসিক, কি রাজনৈতিক, কি সমাজ ও ধর্ম সংস্কার মূলক নাটক, সব ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার স্পর্শ এক নূতন দিক্‌নির্দেশ করে গেছে। সমস্যামূলক রূপক নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব দান। এছাড়া, গীতিনাট্য, প্রহসন, ব্যঙ্গরসাত্মক নাটক, ব্যঙ্গ ও কৌতুকনাট্য, এদিকেও রবীন্দ্রনাথের দান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের আর একটি নূতন কীর্তি 'নৃত্যনাট্য'। এগুলিকে ঠিক পশ্চিমের 'অপেরা' জাতীয় বলা চলেনা। অনেকটা সেই ধরণের হ'লেও, কবির স্বকীয়তার নিদর্শনে এগুলির প্রত্যেকটিই যেন অনবদ্য। আমাদের নাট্য সাহিত্যকেও কবিগুরু নবগৌরবে মণ্ডিত করে দিয়ে গেছেন।

শিশু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে বসলে দেখা যায় শিশু সাহিত্য যাকে বলে আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারে ঠিক সেরকম কিছু ছিলনা। শিশু-শিক্ষার উপযোগী পাঠ্য পুস্তক একাধিক রচিত

হ'লেও ছোটদের আনন্দ বর্ধক, তাদের অবসর বিনোদনের উপযোগী কোনও ত্রুটির বই ছিল না। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এর মোড় পরিবর্তন করেছিলেন শিশু মনোরঞ্জনোপযোগী একাধিক লালিত্য সাহিত্য রচনা করে। যেমন,—'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'খাপছাড়া', 'সে', 'গল্পগুচ্ছ', ইত্যাদি। তিনি একাধিক ছেলে-ভুলোনো ছড়া দিয়েই শিশুদের ভোলাননি, তিনি 'বালক' নামে একখানি মাসিক পত্রও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় দীর্ঘকাল প্রকাশ করেছিলেন। কত না গল্পে, পদ্যে, ছড়ায়, ছবিতে, গানে শিশুদের ঝুলি পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি শিক্ষিত জনসাধারণের জন্য একাধিক নূতন ধরণের 'মাসিকপত্র' সম্পাদন করে গিয়েছেন। যেমন—সাধনা, ভারতী, তত্ত্ববোধিনী, জ্ঞানাঙ্কুর, বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার, শান্তিনিকেতন পত্রিকা প্রভৃতি, এছাড়া 'সবুজপত্র', 'প্রবাসী', বিচিত্রা 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী', 'মাসলী ধর্মবাণী' প্রভৃতি পত্র পত্রিকা কবির বিবিধ রচনার দানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে কবি তাঁর জীবনের বহুমূল্য সময় ও অর্থ অকাতরে ব্যয় করে গিয়েছেন। এই দেশপ্রেমিক কবি বলতেন, আমাদের ছেলে মেয়েরাই হল দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা। শৈশবাবস্থা থেকেই তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চরিত্র ও মানসিক গঠনের প্রতি অভিভাবকেরা যদি সযত্ন দৃষ্টি দিতে না পারেন তবে দেশ বড় হয়ে উঠবে কেমন করে? দেশের কল্যাণ চিন্তা করেই তিনি শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' স্থাপন করেছিলেন। প্রাচীন তপোবনের আদর্শে এ বিদ্যালয় প্রথম পরিচালিত হত কবির আপন অর্থে ও সামর্থে। পরে অবশ্য দাতারা অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। যার ফলে সেই ক্ষুদ্র শিক্ষায়তনটি আজ বিশ্বভারতী নামে এক আন্তর্জাতিক মহাবিদ্যালয় হয়ে উঠেছে। দেশের নানা অঞ্চলেও বর্তমানে এই আদর্শেই দেখি একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এঁরা সকলেই কবির কাছেই ঋণী।

রামমোহন, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ভারত পথিকেরা প্রাচ্যাদর্শনের অধ্যাত্মবাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন সাগর পারের সুদূর প্রতীচ্য ভূমে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গিয়েছিলেন তদতিরিক্ত ভারতীয় শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার শাশ্বত সুন্দর পরিচয়। বেঁধে এনেছিলেন তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদান নিয়ে বন্ধুত্বের প্রীতির ডোর। যার প্রভাবে ভারত পেয়েছিল জগৎ-সভায় মর্যাদার উচ্চ আসন। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে—তিনি বিশ্বের বিশিষ্ট নরনারীকে সাদরে টেনে এনে একত্রে মিলিয়েছিলেন। জানেন কি বিশ্ব সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য কবি শুধু ইংরাজীই নয়, ফরাসী ও জার্মান ভাষাও সযত্নে শিক্ষা করেছিলেন?

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি ছিল যেমনি গভীর তেমনি অকৃত্রিম। কিশোর বয়স থেকেই তিনি দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিবেদন করেছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই জননী জন্মভূমির কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। কত না ছন্দে, গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে নিবন্ধে তিনি মাতৃভূমির বন্দনার শ্লোক রচনা করে গিয়েছেন যা আজও স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত রূপ আমাদের দেশ মাতৃকার পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ হয়ে রয়েছে। এক সময় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। স্বদেশের এতটুকু অসম্মানে এতটুকু অমর্যাদায় কবি অত্যন্ত মর্মাহত ও একান্ত বিচলিত হয়ে পড়তেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে তিনি জননীর ধীর পুত্রের প্রাপ্য স্নেহ ও প্রীতি দিয়েছিলেন। জালিওয়ানবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদে তিনি

ইংরাজ সরকারের প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। মিস মেয়োকে ভারতের কুৎসার জন্য তীব্র ভৎর্সনা করেছিলেন। জাপানী কবি নোগুচী তাঁর বন্ধু হ'লেও যুদ্ধ সম্পর্কে বন্ধুর অন্যায় মন্তব্যের তিনি কঠিন প্রতিবাদ করেছিলেন। স্বদেশের সম্মান ছিল তাঁর কাছে সবার উপরে। তাই মিস র‍্যাথবোনের ধৃষ্টতায় তিনি সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি ভারতবাসীদের একদা সেদেশে প্রবেশ নিষেধ ছিল বলে।

দেশের অনাদৃত ও অবহেলিত পল্লীবাসীদের প্রতি কবির গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। তিনি ছিলেন একান্ত ভাবে পল্লী-প্রেমিক। গ্রামের অসহায় দরিদ্র অশিক্ষিত অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দশা দেখে বেদনাহত কবি ব্যাকুল হ'য়ে পল্লী সংগঠনের কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মহাজন ও কাবুলী পাওনাদারদের জুলুম থেকে নিরীহ কৃষক সম্প্রদায়ও গ্রামেরদুঃস্থ অধিবাসীদের বাঁচাবার জন্য তিনিই প্রথম গ্রামাঞ্চলে কৃষিব্যাঙ্ক ও 'সমবায়-সমিতি' এবং কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তাদের আর্থিক দুরবস্থা থেকে কিছুটা রক্ষা করবার বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। পল্লী সংগঠনের কাজে কবিই এদেশে প্রথম অগ্রসর হয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার এগুলোকে বিপ্লবাত্মক কার্যের সহায়ক সন্দেহ করে কবির আরব্ধ কাজ সমস্তই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তার ফলে কবি বিরক্ত হয়ে তাঁর শান্তিনিকেতনের পাশেই 'শ্রীনিকেতন' নামে একটি পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন যা আজও আশে পাশের গ্রামের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রয়েছে। এখানে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের শিক্ষার সঙ্গে নানা শিল্প কর্মে দক্ষ করে তোলা হয় যাতে তারা স্বাধীন ভাবে সসম্মানে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারে। কী অসাধারণ পরিশ্রম, অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার ও প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি আজীবন দেশের অসহায় পল্লীবাসীদের সকলকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করেছেন। পল্লীবাসীদের স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্য কবির এই নিয়ত চেষ্টার কথা আমরা ক'জনই বা মনে রাখি? পল্লী না জাগলে যে দেশ জাগবেনা, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের চেষ্টায় যে দেশের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া যাবেনা এ তিনি জানতেন। তাই পল্লীর গ্রামে পড়া শিরদাঁড়া খাড়া করে তোলবার জন্য তিনি বিশেষ ভাবে যত্নবান ছিলেন। বিপ্লবী ছেলেদের তিনি ভ্রান্ত মনে করলেও ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। হিজলি জেলের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবি তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহান রূপটিকে তিনি বিশ্বের দৃষ্টিপথে তুলে ধরেছিলেন তাঁর বারংবার পৃথিবী পর্যটনের অবকাশে। অতীন্দ্রিয় ভাব সমৃদ্ধ ও ভগবৎ প্রেমের প্রসাদন মধুর 'গীতাঞ্জলি' রচনা করে বাংলার কাব্যলক্ষ্মীর কণ্ঠে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বরমাল্য এনে দিয়েছিলেন তিনি। কবির 'নোবল' পুরস্কার পাওয়ায় শুধু বাংলা নয় সারা ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হয়েছে।

কবি চেয়েছিলেন তাঁর স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী জন্মভূমির যোগ্য মর্যাদা যেন জগৎ সভায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর মানুষেরা তাদের পরস্পরের ভৌগোলিক, সামাজিক এবং বর্ণ ও জাতিভেদের বিচ্ছিন্ন জ্ঞান বর্জন করে যেন এক আন্তর্জাতিক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সকল মানব এক অখণ্ড মহামানব জাতি হোক এই ছিল মহাকবির ঐকান্তিক স্বপ্ন ও কামনা। আমাদের সমাজে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অন্ধ কুসংস্কারের সকল হীনমন্যতা, সকল গ্লানি, মনের সংকীর্ণতা আর বুদ্ধির জড়তা এবং আমাদের চিত্তের ও চরিত্রের সকল প্রকার ক্ষুদ্র অনুদারতাকে সম্পূর্ণ দূর করতে রবীন্দ্রনাথ আজীবন যত্নবান ছিলেন। তাঁর প্রত্যেক রচনার মধ্যে এ প্রচেষ্টার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবনের অপরাহ্ণে এক অসামান্য শিল্পী রূপে সংসার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার অভিনব আঙ্গিকের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। ছবির যে একটি নিজস্ব বিশেষ ভাষা আছে তা আমরা অনেকেই বুঝিনা, কিন্তু পৃথিবীর আওয়ান দেশগুলিতে কবির আঁকা ছবির জয়ধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ষাট বছর বয়স উত্তীর্ণ হবার পর কবি সখ করে তুলি ধরেছিলেন এবং সত্তর বছর পার না হতেই কবি রেখায় ও রঙে প্রায় তিন হাজারের ওপর ছোট বড় ছবি এঁকে ফেলেছিলেন। এ অধ্যবসায় অসাধারণ এবং এ শক্তিও একান্ত বিস্ময়কর।

রবীন্দ্রনাথের নানা বিষয় রচিত প্রবন্ধগুলি যাঁরা পড়বেন তাঁরা অবাক হয়ে ভাববেন এতবড় চিন্তাশীল মনীষী জগতে অতি অল্পই এসেছেন। আমাদের জাতীয় সমস্যা, রাষ্ট্রীয় সমস্যা, ভাষা সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, শিল্প,-সাহিত্য, স্বদেশ, সমাজ, ধর্ম ও কর্ম প্রভৃতি এমন কোনও জটিল বিষয় নেই যা এই দেশ-প্রেমিক কবির প্রতিদিনের ভাবনাকে স্পর্শ করে যায়নি। ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব, দর্শনের নিগূঢ় জ্ঞান, ধ্যান উপাসনার আবেদন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র কবি যিনি আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সাধনার ঐতিহ্যকে বিশ্বমণ্ডলে মহত্তর করে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন দেশ-কালোত্তীর্ণ এক যুগশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, তিনি চির নবীন কবি। দৃষ্টি ছিল যাঁর সর্বদা অগ্রগামী—'আগে চল আগে চল ভাই !'

বেদ উপনিষদকে এই পুরুষোত্তম মহাকবি যেমন সহজ ভাবে আমাদের আয়ত্তে এনে দিয়েছিলেন তেমনি বিজ্ঞানকেও তিনি অবহেলা করেন নি। জ্যোতির্বিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, শরীরতত্ত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ প্রকরণ, বাংলা ব্যাকরণ প্রভৃতি একাধিক দুরূহ বিষয়ের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা করে গিয়েছেন। আমাদের বিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডারকে নানা বহুমূল্য সম্পদে পূর্ণ করে দিয়ে গিয়েছেন তিনি।

কবির আর এক মহৎ দান হল এই নির্জীবপ্রায় জাতকে তার বিস্মৃতপ্রায় জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানগুলির পুনরুজ্জীবনের দ্বারা আবার সজীব করে তোলা। প্রাচীন বাংলার যে সব বিশেষ গ্রাম্য বা লোক-সংস্কৃতি ছিল সেই লুপ্ত ঐশ্বর্য তিনি উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের নিরানন্দ জীবনে ফিরিয়ে এনে দিয়ে গেছেন তিনি নববর্ষের আনন্দোৎসব, হলচালন ও বৃক্ষরোপন উৎসব, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, নবান্ন পর্ব, বসন্তোৎসব ইত্যাদি। আমাদের এই হারিয়ে যাওয়া, ভুলে যাওয়া ঋতুরঙগুলিকে কবিগুরু রঙীন করে তুলেছিলেন আবার। নিয়ে এসেছিলেন তিনি আমাদের জড়তাপূর্ণ জাতীয় জীবনে তারুণ্যের এক অভিনব পুলকোচ্ছল প্রাণস্পন্দন। কবি তাঁর স্বজাতীয় যযাতিদের অকালজরা বিনষ্ট করে ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন আপনার দৃপ্ত তেজোময় দুরন্ত যৌবন। অজর অমর তাঁর এ বিশ্ববিশ্রুত কীর্তিরাজি।

আমাদের ঘরের মেয়েদের আজ যে রূপ আমরা দেখছি, পঞ্চাশ বছর আগেও তা ছিল না। তাঁরা ছিলেন ঘরের কোণে অন্তঃপুরচারিণী চিরবন্দিনী পুরন্ধ্রী। নৃত্য, গীত, বাদ্য, আবৃত্তি, অভিনয়, চিত্র, ও শিল্পকলার চর্চা, উচ্চশিক্ষার সুযোগ এসব সুকুমার বৃত্তি থেকে তাঁরা ছিলেন চিরবঞ্চিতা। কবিই তাঁদের হাত ধরে নিয়ে এসেছিলেন আলোর রাজ্যে আর সেই সঙ্গে তাদের সাজে সজ্জায় বসনে ভূষণে প্রসাধনে ভারতনারীর একটি বিশিষ্ট শ্রী ও সৌন্দর্য তিনিই প্রথম এনে দিয়ে গেছেন। খুলে নিয়েছেন তিনি তাদের চরণের কঠিন নিগড়। পরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন বাণীর শ্রীপাদপদ্মের সপ্তস্বরা নূপুর।

তারা আজ সঙ্গীতের সুরে সুরে মৃদঙ্গের তালে তালে মুক্তির আনন্দে অপরূপ নৃত্য করছে। বাংলার নিরানন্দ পুরীর নন্দিনীরা আজ আবার ফিরে পেয়েছে তাদের হারিয়ে যাওয়া আনন্দ বন্দনার স্বচ্ছন্দ ছন্দ। ফিরে পেয়েছে তাদের জীবনের নির্বাসিত সুরমূর্ছনা। নটরাজের ডমরু ডিমি ডিমি রবে বেজে উঠেছে আবার তাদের চারু চরণতলের রণরুন্দের তালে তালে।

রবিরশ্মির আশ্চর্য প্রভাবে আমাদের সমাজ জীবন থেকে সকল কুসংস্কার নিঃশেষ মুছে গেছে। আজ আর পরিবারের মধ্যে পিতামাতা পুত্রকন্যা বধূ ও বন্ধুদের একত্রে বসে নৃত্য গীতের আনন্দ উপভোগে কোনও বাধা নেই। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, গুণীজন সংবর্ধনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সভামণ্ডপ রমণীয় করে সাজানো, সুচারু বেশভূষা গৃহসজ্জার প্রাচ্যভঙ্গীর প্রবর্তন, বাসগৃহে একটি কলা সম্মত সুরুচিপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করতে শিখেছি আমরা, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই। বিদেশী সভ্যতার চমকলাগা মোহ থেকে আমাদের মুক্তি এনে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথই। ইংরেজের 'কাল্‌চারাল কংকোয়েস্টকে' ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির দিব্যসুন্দর রূপটিকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে। সুকণ্ঠ গায়ক এবং সুঅভিনেতা ছিলেন তিনি। বাংলার রঙ্গমঞ্চে নব যুগের প্রবর্তনা করে নাট্যপীঠে নূতন প্রয়োগের সন্ধান দিয়েছিলেন।

স্রষ্টার সৃষ্টির সৌন্দর্যে মুগ্ধ, প্রকৃতির প্রাণোচ্ছল রূপের পূজারী এই কবির কাছেই শিখেছি আমরা প্রভাত ও সন্ধ্যায়, উষা ও গোধূলির অপূর্ব রাগরঞ্জিত রূপ উপভোগ করতে। বর্ষার শ্যাম সমারোহের দিকে তিনিই আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। শরতের শেফালী বিকীর্ণ রাঙামাটির পথে সোনালী রোদে ঝলমল্ সবুজ ধানের শিস ও কাশফুলের শুভ্র হাসির খবর তিনিই আমাদের জানিয়েছেন। চূত মুকুল গন্ধে সুরভিত ফাল্গুনের দখিনা বাতাসে বসন্তের রোমাঞ্চময় স্পর্শ সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করে তুলেছেন তিনি। এমনি ভাবে কতদিক দিয়েই কত ভাবে না কবির কাছে আমরা অজস্র উপহার পেয়ে অন্তরে অন্তরে ধনী হয়ে উঠেছি। এই পুরুষোত্তম কবির অজস্র দানের পরিশীলা নেই। আমাদের সকলের নয়নকোণে রবিরঞ্জনের দিব্যাঞ্জন লেগে সারা সৃষ্টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি বদলে গেছে আজ। জয় হোক সেই মহাকবির। তাঁর চরণোদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানাই।

• • • •

রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চায় মনোনিবেশ করেন প্রাচীন বয়সে (১৩৩৪); কিন্তু প্রথম জীবনেও চিত্রবিদ্যার অনুরাগী ছিলেন, একান্তে কখনো কখনো এ বিষয়ে চর্চাও করিয়াছেন। তিনি শ্রীমতি ইন্দিরাদেবীকে লিখিয়াছিলেন :—

'আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোনটা আমার আসল কাজ।...লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের মুগ্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই—তাঁর একেবারে বন্ধুকচাপা পথ—তুমি টেনে টেনে একেবারে হয়রান্ না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সন্ন্যাসী

গৌরীশংকর দে

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিচিত্র মানুষের ভিড়। রাজা, উজীর, সেনাপতি, জমিদার, সুন্দরী নারী, জ্যোতিষী, দাস-দাসী ইত্যাদি নানা জাতীয় নরনারীর সমাবেশ তাঁর সাহিত্যে। বিচিত্র ধরণের এই সব চরিত্র ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই দেখা যায় সাধু সন্ন্যাসীদের। কখনো এই চরিত্র মিশে রয়েছে কাহিনীর অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে; প্রায় চোখেই পড়ে না। কিন্তু কপালকুণ্ডলা, আনন্দমঠ আর দেবী চৌধুরাণীর মতো উপন্যাসে সন্ন্যাসী চরিত্রের ভূমিকা যেন সর্বব্যাপী। এই চরিত্র বাদ দিলে ওই সব উপন্যাসের কাহিনীই যেন ধসে পড়বে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সন্ন্যাসী চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে নানাভাবে। পুরাকালের রাজারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরামর্শ নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন এবং সন্ন্যাসীদের দেবতার মতো মান্য করতেন। সেই জাতীয় জ্ঞানী ব্রাহ্মণের ছায়া যেন আমরা দেখতে পাই 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিরাম স্বামীর মধ্যে। গড় মান্দারণের অধিপতি বীরেন্দ্র সিংহ যাবতীয় সাংসারিক কাজে বরাবর সংযমী অভিরাম স্বামীর পরামর্শ নিতেন, সফলও হতেন। আবার অনেক কাহিনীতে, বিশেষ ক'রে 'কপালকুণ্ডলা'য়, সন্ন্যাসীর দৃষ্টি ভীষণ-দর্শন। ছিন্নশির শবের ওপর আসীন কাপালিক। যেন রহস্যময় অন্ধকার জগৎ, অতিপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে ওই জটাধারী ভয়ংকর কাপালিকের যোগাযোগ। কাপালিক চরিত্র না থাকলে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস অতখানি রহস্যময় এবং আকর্ষণীয় হত কিনা সন্দেহ। কাপালিক চরিত্র আছে বলেই সেই চরিত্রের অন্ধকারপটে কপালকুণ্ডলার চরিত্র বিজলী রেখার মতো ফুটে উঠেছে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অন্ধকার পর্বতগুহায় উপলশয্যায় শুয়ে শৈবলিনী নরকের ভয়ংকর দৃশ্য দেখে আতংকিত। সেখানেও এক মহাকায় পুরুষের আবির্ভাব। তিনি শৈবলিনীকে মুক্তির উপায় বলে দিচ্ছেন।

বঙ্কিম-সাহিত্যের অনেক সন্ন্যাসী জগতের কল্যাণে উৎসুক। অসহায়, অনাথ, দরিদ্র, রোগ-পীড়িতের সেবা করাই তাঁদের ধর্ম, জীবনের উদ্দেশ্য। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে যিনি পীড়িত সূর্যমুখীর প্রাণরক্ষা করেছিলেন তিনিও এমনি এক ব্রহ্মচারী। যুদ্ধে আহত, মৃতপ্রায় প্রতাপের পাশে গুরু ব্রহ্মানন্দ স্বামীর আবির্ভাবে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের সমাপ্তি মহাকাব্যের শেষ অঙ্কের গৌরব ও শান্ত সৌন্দর্য পেয়েছে। এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে এক ঝলক জ্যোৎস্নার আবির্ভাব।

সন্ন্যাসী চরিত্র সবচেয়ে প্রধান হ'য়ে উঠেছে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। দেশপ্রেমই এই মঠের সন্ন্যাসীদের একমাত্র ধর্ম। দেশই তাদের দেবী, তাদের মা। তাই বন্দেমাতরম 'সন্তান'দের মূলমন্ত্র। স্বদেশপ্রেমের মূর্তপ্রতীক, ভারতের মুক্তি-সাধকদের আদর্শ সত্যানন্দ। তখনো পাঠকও দেবী চৌধুরাণীকে দীক্ষিত করেছেন দেশপ্রেমের মন্ত্রে। আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের সন্ন্যাসী চরিত্র শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতীক, উদ্দীপনার উৎস, আত্মার উৎসার।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য কাহিনীতেও সাধু সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটেছে : মৃণালিনী উপন্যাসে মাধবাচার্য, যুগলাঙ্গুরীয় গল্পে আনন্দস্বামী, সীতারাম-এ সন্ন্যাসিনী। কৃষ্ণকান্তের উইল-এর শেষ অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে দুঃখী গোবিন্দলাল নিজেই সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট সন্ন্যাসীদের অনেকেরই পূর্বজীবন রহস্যাবৃত। 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিরাম স্বামী এমনি এক চরিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে বারবার সন্ন্যাসী চরিত্রের আবির্ভাবের কারণ কি? গল্পের প্রয়োজনে নিশ্চয়ই। তিনি যেকালের পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করেছেন সেকালের সমাজে ও রাজনীতিতে ধর্ম ও তার সঙ্গে সঙ্গে সাধু-সন্ন্যাসীদের ভূমিকা নিশ্চয়ই প্রবল ছিল। 'আনন্দমঠ' তো সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনেই রচিত। এ ছাড়াও অন্য কারণ আছে। সেই কারণ জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-কাহিনী থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা যাদবচন্দ্র ছিলেন নিষ্ঠাবান, ধার্মিক ব্রাহ্মণ। একবার তিনি এত অসুস্থ হ'য়ে পড়েন যে বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। এমন কি সৎকারের জন্য তাঁকে বৈতরণীর তীরে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময়ে এক সন্ন্যাসী তাঁকে নবজীবন দান করেন। আরোগ্য লাভের পর তিনি ওই সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নেন। এই কাহিনী শুনে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। শুধু তাই নয়, বাবার সন্ন্যাসী-প্রীতি ও জীবন-যাত্রা বঙ্কিমচন্দ্রের মন ও কল্পনা গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যে বাড়িতে দেবদেবীর নিত্য সেবা, বারোমাসে তেরো পার্বণ, সাধু-সন্ন্যাসী ও ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম, সে বাড়ির ছেলে বঙ্কিমচন্দ্র যে নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সন্ন্যাসীদের জীবন-যাত্রার প্রতি কৌতূহলী হ'য়ে উঠবেন এ আর বিচিত্র কি! তাই তাঁর উপন্যাসগুলিতে বারবার দেখা যায় সন্ন্যাসীদের। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসে সাধুসন্ন্যাসী শ্রেণীর চরিত্র রয়েছে ব'লে তাঁর সাহিত্যে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের ছবি প্রায়ই দেখা যায়।

সন্ন্যাসীর জীবন ধূপশিখার মতো। নিজেকে দহন ক'রেও তা অন্যের জীবনকে করে সুবাসিত। বঙ্কিমের চোখে সন্ন্যাসীরা ছিলেন নিষ্কাম কর্মের প্রতীক, আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল এক উচ্চতর জীবনের উদ্গাতা, মানব-সেবার মহান আদর্শের ধারক। তাই তাঁর সাহিত্যে বারবার সন্ন্যাসীর পদক্ষেপ।

আদর্শবাদী বঙ্কিম আত্মদানের আদর্শ উপন্যাসে সঞ্চারিত করার জন্য গুরু-চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। যে সন্ন্যাস ধর্ম নিষ্কাম কর্মে সার্থক তার প্রতিই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃত সন্ন্যাস কর্মত্যাগে নয়, নিষ্কাম কর্মে, মানুষের কল্যাণ সাধনে। সেই আদর্শ প্রচারের জন্যই তিনি সন্ন্যাসী-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন সন্ন্যাসীর পরমধর্ম মানবজাতির সেবা। স্বামী বিবেকানন্দও তো এই মতই পোষণ করতেন।

মডার্ণ ডেকরেটরস
৬৫ এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন ৫৫-২৫৪৮

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

পল্লী-ভারতী
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

"কথা প্রসঙ্গে"

॥ প্রকৃত শিক্ষা ॥

আজকে দেশের দুর্দশা এবং দুর্গতির কথা ভেবে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই অত্যন্ত ব্যথিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই বুঝেছেন যে সত্যিকারের শিক্ষার অভাবই আমাদের দুর্গতির কারণ।

শিক্ষা সম্বন্ধে বহু আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক স্বাধীন ভারতবর্ষে হয়েছে এবং হবেও। সব চেয়ে গোড়ার কথা ও আসল কথা যা তা হচ্ছে আমাদের দেশের প্রকৃত শিক্ষার রূপ ও প্রণালী কি হবে নির্ধারণ করা, এবং তাকে পল্লবিত করে তোলা। এক কথায়,—যে-শিক্ষা আমাদের দেশের লোককে মানুষ করবে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাবে ও চরিত্রগঠনের দৃঢ় ভিত্তিকে গড়ে তুলবে—সেই শিক্ষাই হবে আমাদের দেশের প্রকৃত শিক্ষা।

স্বামী বিবেকানন্দ সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে এসে বলেছিলেন, 'পৃথিবীর অনেক দেশ আমি ঘুরে এসেছি। ঐসব দেশের লোকেদের সঙ্গে আমাদের দেশের লোকদের অবস্থা তুলনা কোরে দেখলুম। মনে প্রশ্ন জাগলো—কিসে ঐসব দেশের লোকের এত রকম ব্যাপারে এত উন্নতি হলো? তার উত্তর এলো—শিক্ষা-শিক্ষা-শিক্ষা। এই শিক্ষা—আসল শিক্ষাকে আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যে অবাধে বিস্তার কোরতে হবে। আসল শিক্ষা বিস্তার করলে আমাদের সমস্ত রকম জাতীয় ব্যাধি (অজ্ঞানতা জড়চিন্ততা প্রভৃতি) দূর হয়ে যাবে।

এই শিক্ষা কি?

বই পড়া? না। নানাবিধ জ্ঞান অর্জন?—তাও নয়। যে-শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগও স্ফূর্তি আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়—তাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা।'

দেশের যে-কোনো প্রকার সংস্কার বা উন্নতি করতে হলে সর্বাগ্রে চাই শিক্ষার সংস্কার সাধন করা। দেশ গড়তে হলে তার বনিয়াদে চাই শিক্ষা। সে-শিক্ষা কি রকমের হবে? অর্থাৎ জাতির উপযোগী প্রকৃত শিক্ষা কি?

এই সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন, 'মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনই শিক্ষা' আমাদের আধুনিক শিক্ষায় এই অন্তর্নিহিত পূর্ণতারই অভাব। বরঞ্চ বাহ্যিক আড়ম্বরের সাজসজ্জায় এবং ক্যারিকুলামের চাপে আমাদের দেশের শিক্ষায় অন্তর্নিহিত পূর্ণতারই ভার।

শিক্ষাই জাতিকে গঠন করে। কিন্তু আমাদের শিক্ষায় প্রকৃত জাতিগঠনের কোন উপাদান আছে কি?

রবীন্দ্রনাথ পরিতাপ করে বলেছিলেন, 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সমাজের বা দেশের প্রয়োজনে পরিকল্পিত হয় নাই, আপনা হইতে স্বাভাবিক ভাবে অভিব্যক্তও হয় নাই।'

স্বামী বিবেকানন্দের সন্ধানী দৃষ্টিতেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই ত্রুটিই সম্যকভাবে ধরা পড়েছে। তিনি ভর্ৎসনা করে বলেছেন, 'একটি বিদেশী ভাষার অপরের চিন্তারাশি মুখস্থ করিয়া তদ্বারা তোমার মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি উপাধি গ্রহণ করিয়া তুমি ভাবিতেছ, তুমি শিক্ষিত। তোমার শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় একটা কেরাণীগিরি, না হয় ওকালতী, আর খুব বেশী হইলে একটা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (যাহা আর এক প্রকার কেরাণীগিরি)। ইহা কি সত্য নহে? ইহাতে তোমার নিজের বা তোমার দেশের কি কল্যাণ হইবে!'

অন্য দেশের শিক্ষার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরাণীগিরি ওকালতী ডাক্তারী ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গে আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষযোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি, কুমারের চাক ঘুরিতেছে সেখানে এ শিক্ষার কোন স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোন শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই। তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে।'

পরাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে এই দুই মহাপুরুষের উক্তি স্বাধীন ভারতবর্ষেও প্রযোজ্য।

দেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর সর্বপ্রথমে যে কাজ করা উচিত ছিল তা হচ্ছে শিক্ষার সংস্কার। বিদেশীর প্রয়োজনে এদেশে যে-শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছিল সেই শিক্ষারই বেরকের আজও আমাদের স্বাধীন দেশে প্রচলিত। অনেক রকমের কমিশন গঠন করে,—বহু শিক্ষাবীদের প্ল্যানিং কমিটি সংস্থাপিত করেও স্বাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নতিই হয় নি। কারিগরী শিক্ষা,—কৃষিশিক্ষা,— প্রভৃতি গালভরা নামের সংস্করণ আর নানা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন-এর বাইরে আমরা দেশের সর্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটুকু এগুতে পেরেছি?

শিক্ষাদানে সেই মাথাভারী ব্যয়ের আধিক্য যা সাধারণ লোক বহন করতে অক্ষম। তবু এরই ভেতর থেকে যাঁরা তথাকথিত শিক্ষিতের ছাপ নিয়ে সমাজের শুরুজন বলে আখ্যাত হচ্ছেন—তাঁরা বিত্তের লোভে শিক্ষাকে হাটবাজারে বিক্রি করতে প্রয়াসী। দেশ বা মনের কি উপকারে লাগছে এই শিক্ষা?

স্বামীজীর ভাষায় পুঁথিপড়া বিদ্যায় স্বাধীন ভারতবর্ষেও 'নেতিমূলক শিক্ষাই' লাভ করছি—যা কোনমতেই মানুষগঠনের উপযোগী নয়। আমাদের দেশের নেতারাও জাতির শিক্ষায়

দৈন্যকে উপলব্ধি করছেন। মন্ত্রীরা ভারতবর্ষের বাইরে এক একদেশে গিয়ে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা দেখে চমৎকৃত হয়ে সেই সেই দেশের অনুকরণে এ দেশের শিক্ষাকে রূপায়িত করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠছেন।

শিক্ষার কোন্ আদর্শকে আজ আমাদের নিতে হবে?—সে-সম্পর্কে বিস্তৃত কথা বলার আগে আমরা স্বামীজীর কথাই অনুধ্যান করি; 'আমরা সেই শিক্ষা চাই যাহার দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের জোর বাড়ে, বুদ্ধি বিকাশিত হয় এবং মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। মানুষ তৈরী করাই সকল শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। স্বভাবাভ্যন্তরস্থ মানুষকে বর্ধিত হইতে দেওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য। যাহার দ্বারা ইচ্ছা শক্তি বিকশিত, বর্ধিত ও সৎভাবে চালিত হয় তাহাই শিক্ষা। আমাদের দেশের এখন আবশ্যক লোহার মত শক্ত মাংসপেশী, ইস্পাতের মত বলশালী স্নায়ু এবং দুর্দমনীয় বিপুল ইচ্ছাশক্তি।'

স্বাধীন ভারতবর্ষের দুর্বল স্নায়ুগ্রস্ত এবং নির্জীব জনচেতনায় আজ শক্তিশালী ও চরিত্রবান মানুষ তৈরী করার উপযোগী ও জাতিগঠনকারী শিক্ষারই প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

॥ রামানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী ॥

সাংবাদিক, চিন্তানায়ক, শিক্ষক এবং দেশপ্রেমিক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-শতবার্ষিকে আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

তিনি আজীবন দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে জাতিকে মুক্ত করার সংগ্রামেও তাঁর অবদান কম নয়। তা ছাড়া দেশের অর্থনীতি সংস্কারে তাঁর সক্রিয় চেষ্টাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে শিক্ষকতা এবং পরে সাংবাদিকতা—এই দুই বৃত্তির ব্যবহারিক দিক অপেক্ষা আদর্শের প্রতিই ছিল তাঁর সমধিক নিষ্ঠা। আর সেই আদর্শ-নিষ্ঠাই হচ্ছে স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রগাথা। বাংলাদেশের সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা কে না জানেন? তিনি সাময়িক পত্রিকার মান যে ভাবে উন্নয়ন করে গেছেন তা কালের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তাঁর কীর্তি এবং স্মৃতিকে চিরস্থায়ী মর্যাদা দেওয়ার কাজে দেশের সরকার এবং জনসমাজ এগিয়ে আসুন—রামানন্দ জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবে আমরা এই প্রস্তাবই করছি।

বরণীয় যাঁরা স্মরণীয় তাঁরা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

অমিলকুমার ভট্টাচার্য

আচারে শুভ্র—বিচারে ন্যায়দর্শী, কর্মে নিরলস, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধপ্রাণ, শিক্ষক এবং সংগঠক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উনবিংশ শতকের সুশীলন এক প্রাণপুরুষ। তাঁর জীবনের দুটি মুখ্য ধারা। এক হচ্ছে স্বদেশসেবা এবং অপর হচ্ছে সাংবাদিকতা। ইতিহাসের এক পুণ্য লগ্নে জন্ম তাঁর। বাঁকুড়ার রাঙামাটির পথ, প্রসারিত শালবন—রামানন্দের জীবনের বিশালতার প্রতীক।

ভারতের আকাশ তখন জাতীয়তাবোধের প্রথম রশ্মিতে উদ্ভাসিত—যে রশ্মির সূচনা সিপাহী বিদ্রোহে। সেই নতুন রশ্মিতেজাত রামানন্দ স্বাদেশিকতাকে নিজের তেজস্ক পেয়েছিলেন সহজ উত্তরাধিকার সূত্রে। নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ,' হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত,' টডের 'রাজস্থান,' রজনীকান্তের 'মহারাণা প্রতাপসিংহ,' রমেশদত্তের 'বঙ্গবিজেতা' সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত মাৎসিনি এবং নব্য ইতালীর স্বাধীনতা অর্জনের কাহিনী রামানন্দের কিশোর চেতনাকে আলোড়িত, উদ্দীপিত করে তুলেছিল। তাঁর মনে আজীবন কাজ করেছিল স্বদেশ প্রেমের দীক্ষামন্ত্র, যা তিনি পেয়েছিলেন জাতীয় জীবনের প্রথম ভাগে।

এই উদ্দীপনা নিজের জীবন থেকে জাতির জীবনে সঞ্চারিত করবারই মানসিকতায় তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সাংবাদিক রামানন্দকে প্রণতি জানিয়েছিলেন, "যে-শিক্ষাদ্বারা এই জাতি ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৃহত্তের অনুসন্ধান করিত, যাহা দ্বারা মনুষ্যত্বের অভীত হইত, যে বীর-ধর্মের অনুষ্ঠানে শক্তিহীনের দুর্বহ ভার শক্তিশালী স্বেচ্ছায় বহন করিত,—সেই শিক্ষা ও দীক্ষা এখনও এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই শিক্ষা যেন তোমার লেখাদ্বারা সর্বত্র প্রচারিত হয়।"

দেশ তখন পরাধীন, আর সেই পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ জাতি তখন আত্মপ্রকাশ, আত্মবিকাশের পথ খুঁজছে—সেই সময় শুধু রাজনৈতিক ম্যাটফরম নয় জাতিগঠন ও সেবামূলক নানাকাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন—তাঁদের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে শিক্ষক, সাহিত্যসেবী, সাংবাদিক এবং সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেও দেখি প্রকৃত দেশহিতৈষী এবং একজন সংগঠক ও আদর্শ মানুষ হিসাবে।

স্বদেশ-ভক্ত আদর্শবান এবং স্বাধীনচিত্ত যুবকের মানসিকতায় কিন্তু ভিন্ন চিন্তাধারা। তিনি তাঁর পরিবারস্থ ভাইদের জানালেন, "গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিব না ধনের আশা করিও না।"

কেননা,—এ-কথা তিনি নিজে লিখেছেন,—সে-কথা শুধু কেতাবীভাষা নয়,—তা হচ্ছে তাঁর আত্মপ্রত্যয়, "যাঁহারা কোন আদর্শের জন্য সর্বস্বপণ, সর্ব সুখপণ, প্রাণপণ করেন, তাঁহাদের অন্তরে যে একটি গভীর বিশ্বাস থাকে, তাহা তাঁহাদিগকে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করে।"

জাতির চরিত্রগঠনের আদর্শে নিয়োজিতপ্রাণ রামানন্দ বাক্তি এবং সংসারের স্বার্থকে তাই বড় করে দেখতে পারলেন না আর পাঁচজন মানুষের মতন। কেননা,—তাঁর আত্মবিশ্বাস 'চরিত্র চাই'।

আর সেই চরিত্র গড়তে হলে, "প্রতিভার স্ফুরণের জন্য শিক্ষা চাই, যোগ্য লোকদের সংসর্গ চাই, মনের সহিত মনের সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ চাই, জ্ঞানলাভের ও আহরণের জন্য পুস্তক সংগ্রহ বিজ্ঞানমন্দির ইত্যাদি চাই।"

শিক্ষক রামানন্দ তাই অধ্যাপনা কাজে আর নিজেকে সীমিত রাখতে পারলেন না। তাঁর নিজের কথা তিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন,—"যদি প্রত্যেকে সাধারণ স্বার্থ ও সাধারণ হিতের জন্য নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা ও স্বার্থ কিছু ত্যাগ করিতে না শিখে, এবং যদি প্রত্যেকে অবিশ্রামী ও পরিশ্রমী না হয়, তাহা হইলে কোন বড় কাজ হইতে পারে না। ফাঁকি দিয়া চালাকি করিয়া, লম্বা-চওড়া কথা বলিয়া, স্বপ্ন দেখিয়া কোন জাতি বড় হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না।"

এই চরিত্রই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আসল চরিত্র।

অতি সাধারণ কিন্তু পরিচ্ছন্ন সাদা ধুতি এবং সাদা জামা-ই রামানন্দবাবুর পরিধেয় ছিল। আহারও করতেন নিরামিষ এবং অত্যন্ত সাদাসিধা ধরণের আহার্য। স্বদেশী খদ্দরের বস্ত্র এবং পোশাক ব্যবহার আজীবন করে গেছেন তিনি। তাঁর পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা, মিতব্যয়িতা, স্বদেশ প্রেম,—এ-শুধু বাইরের ঠাট নয়,—জীবনের আচার-আচরণেও তারই পরিচয় বহন করে বেড়াতেন। অথচ,—তা নিয়ে জাঁক-জমক বা হাঁক-ডাকের কোন বিজ্ঞপ্তি ছিল না। সাদা খদ্দরের বেশ-ভূষা আর সাদা অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা রামানন্দবাবু অমলিন জীবনের প্রতিচ্ছবি।

যে-যুগে তিনি জন্মেছিলেন, সে-যুগে তাঁর মতন উচ্চশিক্ষিত বাক্তি সুখে-স্বচ্ছন্দেই জীবনধারণ ও সংসার প্রতিপালন করতে অবশ্যই পারতেন,—ছোট্ট বিত্তের সংসার, বিদেশী প্রভুর মনোরঞ্জনের বিনিময়ে সামাজিক পদমর্যাদা—সাধারণ সংসারীর যা কাম্য তা প্রচুর পরিমাণে লাভ করার কোন অন্তরায় তাঁর পক্ষে থাকবার কথা নয়, কিন্তু আদর্শই যাঁর জীবনের বড় সম্পদ,—তাঁর কাছে লৌকিক সাংসারিক এই প্রলোভন ও লাভ তুচ্ছতর।

কলকাতার সিটি কলেজের একশত টাকা বেতনের অধ্যাপকবৃত্তি ছেড়ে চলে গেলেন এলাহাবাদে। অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেও স্থির হতে পারলেন না। জীবনের বৃহত্তর আদর্শ,—জনকল্যাণ, জনশিক্ষাদান, যে কাজ আগে থেকেই সুরু হয়েছিল দাসী এবং প্রদীপের পাতায়—সেই কাজই রামানন্দের জীবনের আসল কাজ। প্রথমে প্রকাশ করলেন প্রবাসী। প্রবাসীর আত্মপ্রকাশ বাংলার সাময়িক পত্রের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তার রচনা নির্বাচন, সম্পাদকীয় নিবন্ধ এবং ছবি

ছাপা—বাংলার সাময়িক পত্রের জীবন ইতিহাসের এক অপূর্ব গৌরবময় অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে তদানীন্তন বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা প্রবাসী-জাত। কিন্তু এই ঐতিহ্যকে গড়ে তুলতে সম্পাদক রামানন্দকে যে কী বিপুল পরিশ্রম এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে—তার ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরাই স্বীকার করেন রামানন্দের জীবনাদর্শ কত উচ্চমুখী।

শুধু বাংলাদেশের সীমিত ভৌগলিক রেখায় তিনি তাঁর আদর্শকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। সারা ভারতবর্ষের মানসকৃষ্ট শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং স্বদেশ প্রেমকে জাগরিত করতে প্রকাশ করলেন ইংরেজি ভাষায় 'মডার্ণ রিভিউ' এবং হিন্দী ভাষায় 'বিশাল ভারত'।

এই তিনখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা পরিচালনা এবং সম্পাদনার দায়িত্বের কথা স্মরণ করলে রামানন্দের বিপুল কর্মশক্তির কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

রামানন্দের প্রতীতি ছিল 'আত্মা কখনো অরাজন্য হয় না।' সেই আত্মাকেই তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন সমস্ত দেশের মানুষের মধ্যে। ন্যায়ের পথে চলো, নির্ভীক হও, দেশকে চেনো, দেশকে ভালোবাসো, সত্যাদর্শী হও।—এসব নীতিকথা শুধু মুখের কথা নয়, শুধু লেখনীর ভাষণ নয়, —এ তাঁর জীবন সত্য। আর জীবন সত্যকেই তিনি মেলে ধরেছিলেন সমগ্র জাতির মানস চেতনায়।

'আমরা যা কিছু বলি বা লিখি তা সত্যও ন্যায়ের নিষ্ঠায়। স্বার্থ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আমরা কোন কিছু বলি না'।—'মডার্ণ রিভিউ'এর সম্পাদকের এই উক্তি তাঁর সম্পাদকীয় ন্যায় এবং নীতিরই সমর্থন সূচক কথা। এই ন্যায় এবং নীতিকে জীবন সত্যে গ্রহণ করে সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আজীবন যে সাংবাদিক ধর্ম পালন করে গেছেন তা অতুলনীয়। 'প্রবাসী'র লেখার অপরাধে তিনি যুক্তপ্রদেশের ইংরেজ সরকার কর্তৃক উত্তরপ্রদেশ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। এলাহাবাদের সাজানো সংসার, প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাকে ত্যাগ করে রামানন্দ এলেন কলকাতার রাজপথে। প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ অতঃপর কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতে লাগল।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক সাংবাদিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ রামানন্দ শতাব্দীর জীবন আন্দোলনকে রূপায়িত করে গেছেন। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে আচার-আচরণে জাতি গঠনের মহান দায়িত্ব পালনে তাঁর সাংবাদিক জীবন উৎসর্গীকৃত।

তার জীবন প্রদীপের প্রজ্বলিত শিখায় যে আলো; তা চলমান জাতির পথের দিশা। কায়াহীন রামানন্দের জীবন শিখা তাই অনির্বাণ।

———

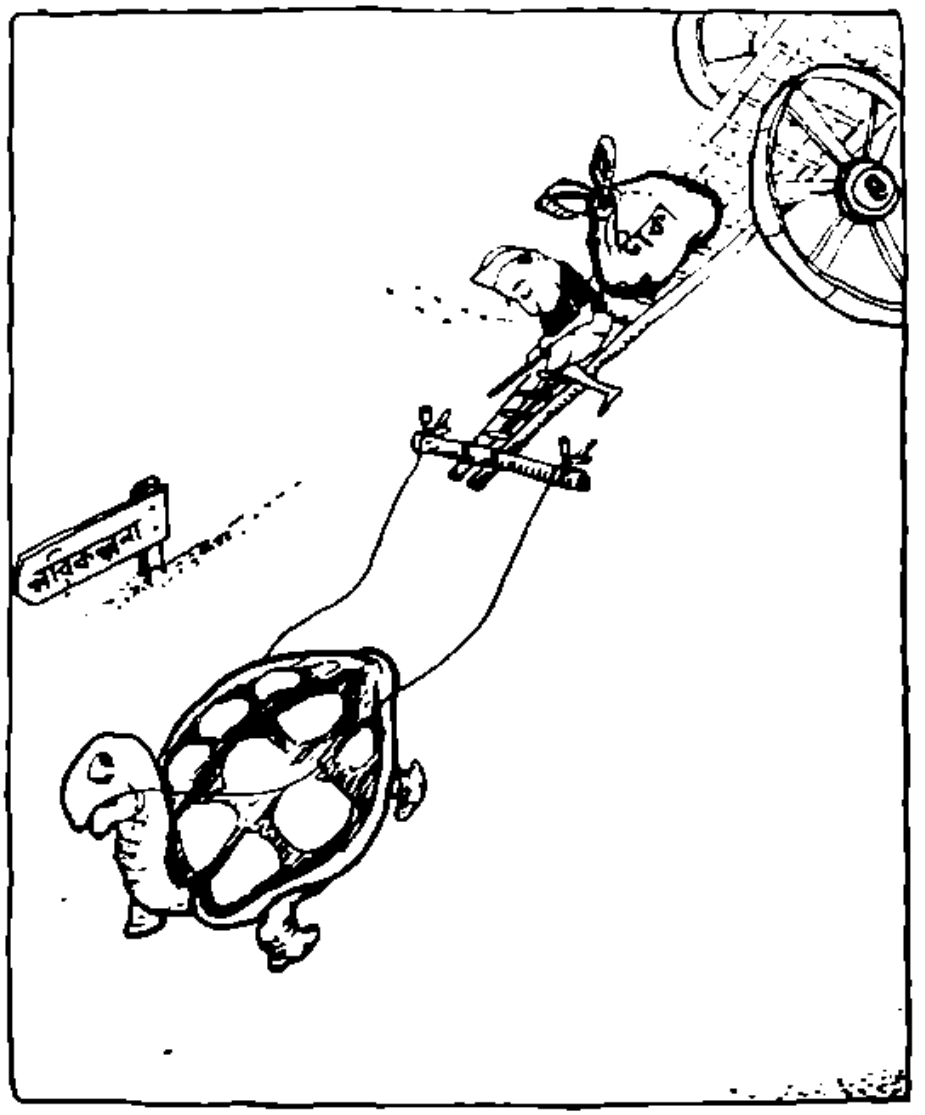

আমাদের পরিকল্পনা
এই ভাবেই চলেছে !

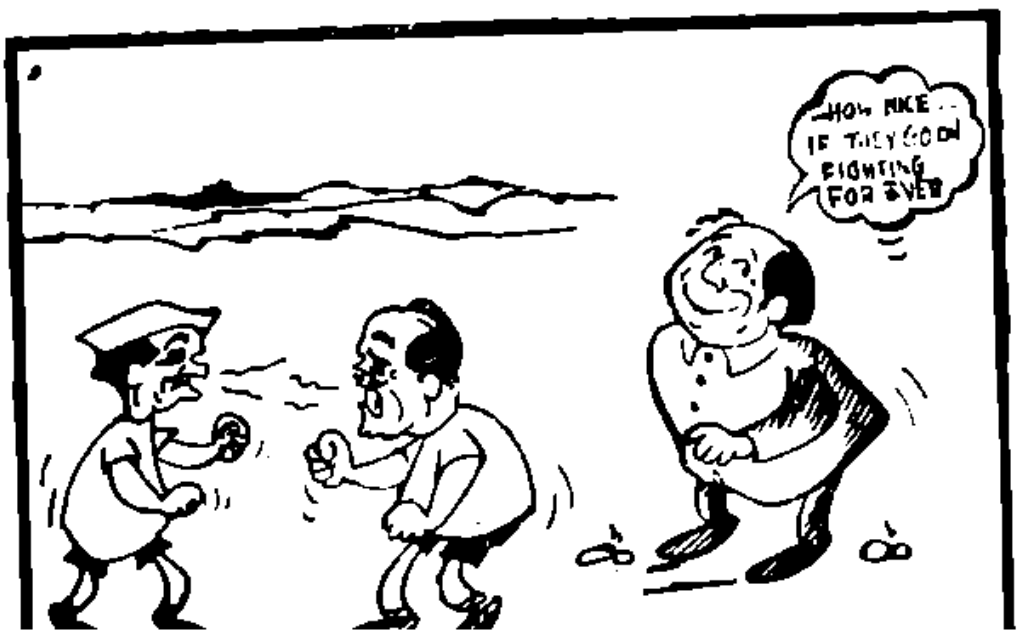

কী মজা !
যদি এইভাবে
চলে

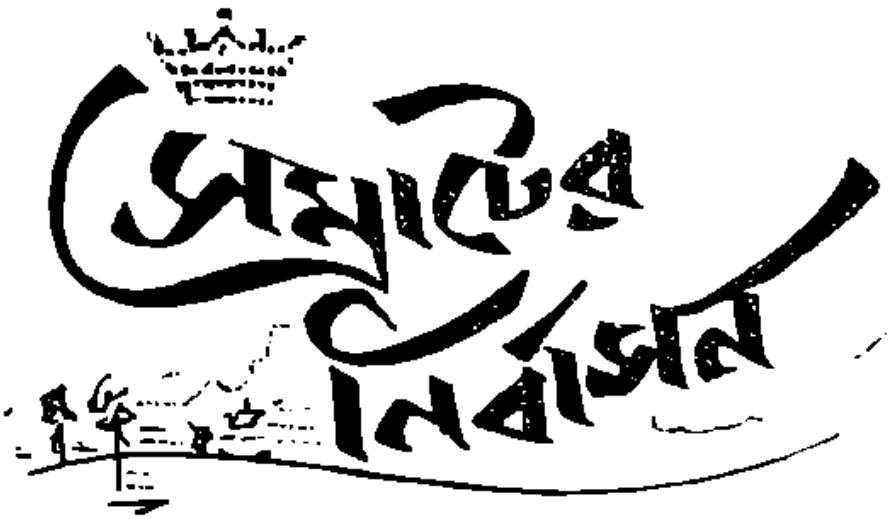

চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য

বররুচি

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পলেটের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘনিয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে নানাস্থানে নিজের খেয়াল খুসীমত ঘুরে বেড়াচ্ছিল পলেট। সে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কী ভাবে বা কাদের সঙ্গে দিন রাত্রি অতিবাহিত করছে, তার কোন খবরই ইদানিং চার্লি আর পেতেন না।

শহর থেকে দূরে অন্য এক স্থান থেকে একদিন সফরের পর চার্লি বিভালি হিলস-এ ফিরে এসে প্রধান পরিচারকের মুখে শুনলেন, পলেট পরশুদিন এসেছিল এবং তার জিনিষপত্র কয়েকটা সুটকেসে ভরে নিয়ে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আবার চলে গেছে। কোথায় যাচ্ছে তা জানিয়ে যায় নি।

কয়েকদিন পরেই চার্লি খবর পেলেন, পলেট মেক্সিকোয় গেছে এবং সেখানকার আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা রুজু করেছে।

চার্লির মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হল।

ব্যর্থতা জীবনের সুখ শান্তি কী তাঁর কপালে লেখা নেই?

• • • •

গ্রেট ডিক্টেটর মার্কিন জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তলে তলে তার বিরুদ্ধে একটা জনমত গড়ে তোলা হচ্ছিল।

মার্কিন রাষ্ট্রসমাজধুরন্ধরেরা আর সবই সইতে পারে, পারে, না কমিউনিজমের নামগন্ধ সইতে। ক্ষণে ক্ষণেই তারা যেখানে সেখানে দড়ি দেখে সাপ বলে চেঁচিয়ে ওঠে। গ্রেট ডিক্টেটরের মধ্যেও তারা সেই সাপ দেখেছিল।

তাদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল হলিউডের চিত্রসাংবাদিকরা। তাদের মনে হয়েছিল, চার্লি তাদের অবজ্ঞা করেন উপেক্ষা করেন।

গ্রেট ডিক্টেটর মুক্তিলাভ উপলক্ষে চার্লি কেন আগে হলিউডের সাংবাদিকদের ছবি না দেখিয়ে বা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার না করে, ছুটলেন নিউইয়র্কে? এতে হলিউডের সাংবাদিকরা তাঁর ওপর অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিল। অপমানিত বোধ করেছিল তারা।

সে প্রমাণ তিনি পেলেন, নিউইয়র্ক থেকে হলিউডে ফিরে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে।

তাঁর আহ্বানে তাঁর বিভার্লি হিলস-এর বাড়ীতে এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।

কুড়িজন সাংবাদিক যথাসময়ে এলো।

সকলেই চুপচাপ, গম্ভীর! পরিবেশ প্রথম থেকেই থমথমে।

চার্লি তাদের টেবিলে দামী হুইস্কি পানীয়ের বোতল সাজিয়ে দিলেন। তারা তা স্পর্শ করলে না।

চার্লি বুঝলেন, গতিক সুবিধের নয়।

যাই হোক, তিনি নিজে হাসিমুখে যথা সম্ভব তাদের আদর আপ্যায়ন করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে একজন সাংবাদিক হঠাৎ প্রশ্ন করল—আপনার আসল অভিপ্রায়টা জানতে পারি কি?

রহস্যভরে চার্লি উত্তর দিলেন—গ্রেট ডিক্টেটরের জন্যে কিছু প্রচার। আর কিছু নয়।

কথায় কথায় চার্লি তাদের জানালেন, নিউইয়র্কে গিয়ে তিনি দেখে এসেছেন, নাৎসী ছোকরারা সেখানে পথসভা করে হিটলারের জয়গান করে বেড়াচ্ছে।

চার্লির কথার জবাবে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলে—আপনি এত নাৎসীবিরোধী কেন? বোধ করি আপনি নিজে ইহুদি, সেই কারণে। তাই নয় কি?

চার্লি উত্তর দিলেন—নাৎসীবিরোধী হবার জন্যে ইহুদী না হলেও চলে। যে কোন স্বাভাবিক মনোবৃত্তির ভদ্রমানুষ নাৎসীবিরোধী হতে বাধ্য।

চোখা উত্তর। কিছুক্ষণ কারুর মুখে কোন কথা নেই।

চার্লি তখন নিজেই আবার কথা সুরু করলেন।

নিউ ইয়র্কে গিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর আমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর সঙ্গে হোয়াইট হাউস-এ দেখা করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁকে বলেছিলেন, গ্রেট ডিক্টেটর ছবি নিয়ে আর্জেন্টিনায় গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে।

চার্লি প্রেসিডেন্ট-এর সঙ্গে তাঁর সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ সাংবাদিকদের দিলেন। মনে করেছিলেন, সে সম্পর্কে সাংবাদিকরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার সুযোগ পেয়ে খুসী হবে।

কিন্তু কারুর কাছ থেকে কোন মন্তব্য শোনা গেল না।

চার্লি তখন আবার ঠাট্টার সুরে বললেন—আমার কোন কথাই আপনাদের মনে ধরছে না দেখছি!

সাংবাদিকদের সেই গোমড়ামুখো মুখপাত্রটি গম্ভীর গলায় এবার বললে—না তা ধরছে না। আপনি আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন নি। আপনার জনসংযোগ ভাল নয়। আপনি এখানকার সাংবাদিকদের গ্রাহ্য করেন না। আপনি আমাদের অবজ্ঞা করে নিউ ইয়র্কে গিয়ে সেখানকার

সাংবাদিকদের সঙ্গে আগে আলাপ-আলোচনা করলেন। অথচ আপনার উচিত ছিল, আগে হলিউডের সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। আপনার এইসব কার্যকলাপ আমরা পছন্দ করি না।

চার্লি বুঝলেন, ব্যাপার খুব ঘোরালো।

যে ছবির জন্যে তিনি আগেভাগেই বিশ লক্ষ ডলার খরচ করেছিলেন, তাঁর প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হলিউডের সমালোচকদের হাতে সেই ছবি ছিন্নভিন্ন হোক, সে ঝুঁকি তিনি নিতে চান নি। তাই তিনি ছবির মুক্তির আগে কোন প্রিভিউর ব্যবস্থা করেন নি—সোজা নিউইয়র্কে ছবি রিলিজ করবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তিনি তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে তাঁর সেই নাৎসীবিরোধী ছবির অনেক শত্রু আছে, তাই তিনি ছবির মুক্তির আগে কোন সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন নি, তাঁদের ওপর চার্লির সম্পূর্ণ আস্থা আছে, তাঁরা যেন তাঁকে ভুল না বোঝেন।

কিন্তু চার্লির কথায় কোন ফল হল না।

অবস্থাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে লাগল।

প্রথমে ছোটখাটো আক্রমণ।

তারপর ব্যক্তিগত কুৎসা শুরু হল। বীভৎস তার রূপ। নিষ্ঠুরতার তুলনাহীন। চারিদিক থেকে এক যোগে আক্রমণ চলল। যেন সপ্তরথী ঘিরে ধরেছে অভিমন্যুকে।

• • • •

বোমার মত সংবাদটা ফেটে পড়ল।

জাপান পার্ল হার্বার বিধ্বস্ত করেছে।

তামাম আমেরিকা সেই সংবাদে বজ্রাহত, বিক্ষুব্ধ ও ক্রোধদীপ্ত।

কয়েকদিনের মধ্যেই সৈন্য চলাচল আরম্ভ হল। দেখতে দেখতে অনেকগুলি মার্কিন সৈন্যদল সাগর পাড়ি দিলে।

নতুন করে রণদামামা বেজে উঠল।

ওদিকে তখন হিটলারের সৈন্যরা মস্কোর দোরগোড়ায়।

মস্কোর যায় যায় অবস্থা।

মরিয়া হয়ে লড়ছে রুশ সৈন্যরা। প্রাণের মায়া ছেড়ে লড়ছে। সৌর্যে বীর্যে তাদের সেই লড়াই ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়েছে।

কিন্তু একা তারা আর কতদিন পারবে?

দ্বিতীয় রণাঙ্গন চাই। খোল দেকেও ফ্রন্ট। রাশিয়ানরা আবেদন জানাচ্ছে। সে আবেদন সাড়া জাগাচ্ছে বিশ্বের চতুর্দিকে।

রুজভেল্টের সে বিষয়ে সম্মতি আছে। নাৎসী-পন্থীর দল গাচাকা দিলেও তাদের প্রভাব অন্তর্হিত হয়নি। যে বিষ তারা ছড়িয়েছিল তার রেশ তখনো ভেসে বেড়াচ্ছে আমেরিকার আকাশে বাতাসে। তখনও রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এবং গোপনে প্রচার চলেছে সমানে—"জার্মান রুশ লড়াই—যা শত্রু পরে পরে, ষাঁড়ের শত্রু বাঘের পেটে যাক, রুশ আর জার্মান রক্তারক্তি করে কৌৎ হোক, তারপর আমরা গিয়ে লুটের মাল পাচার করব।"

এদিকে প্রত্যহ নতুন খবর নতুন চমক নতুন রক্তপাত।

হাজারে হাজারে কশ সৈন্য প্রতিদিন মরছে।

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধি মস্কোকে রক্ষা করা গেল না।

* * * *

এই সময় চার্লির জীবননাট্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সৃষ্টি হল।

কখনও কখনও মানুষের জীবনে অগোচরে এমন ঘটনার সমাবেশ হয় যার মধ্যে কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ নেই, একান্ত নির্দোষ এবং তাৎপর্যহীন সেই ঘটনাই কিন্তু পরে অত্যন্ত বিপদ এবং সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

চার্লির জীবনেও সেই রকম একটি ঘটনা ঘটল।

সানফ্রান্সিস্কোর কশ দুস্থত্রাণ সমিতির সভাপতি চার্লির কাছে এক বিচিত্র অনুরোধ পাঠালেন।

ঐ সমিতি একটি বড় সভার আয়োজন করেছিলেন। কথা ছিল, সেই সভায় রাশিয়াস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত জোসেফ ডেভিস ভাষণ দেবেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় সভায় উপস্থিত হতে পারবেন না। তাঁর জায়গায় চার্লিকে বক্তৃতা দিতে হবে, এই অনুরোধ।

যদিও হাতে সময় ছিল খুব কম তাহলেও চার্লি রাজী হলেন।

তিনি তখন উদ্দীপ্ত, উত্তেজিত। নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে নিজের মনের কথা বলবার সুযোগ পেয়ে তিনি খুশী হলেন। সেই রাত্রেই চলে গেলেন সানফ্রান্সিসকোয়।

পরের দিন সভা।

যথা সময়ে চার্লি সভাস্থলে উপস্থিত হলেন।

বিরাট হল, লোকে ভর্তি। তিল ধারণের জায়গা নেই। অন্তত দশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছে। দেখে শুনে চার্লির হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মঞ্চের উপর বসলেন সব মার্কিন সমরনায়ক। তাদের ঝাকঝকে সবুজের মেলা। মেলার বাঁদিকে চার্লি।

পর পর কয়েকটা বক্তৃতা হল। ঢেকে ঢেকে বলা। তীব্র বা ঝাঁঝালো নয়। রাশিয়াবাসী যে আজ মরণ বাঁচনের সন্ধিক্ষণে এবং তাদের যে আজ সর্বরকম সাহায্যের প্রয়োজন, একথা বক্তারা বললেন বটে কিন্তু তেমন জোরাল মনে হল। অর্থাৎ, রাশিয়াবাসের সম্পর্কে মার্কিনের মনের দরজা সবটা যেন খোলা হয় নি।

চার্লির পালা এল বক্তৃতা করবার।

কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়ালেন।

একদিকে মনের মধ্যে দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা অন্যদিকে অনভ্যাসের ঝোঁটায় কপালের চড়চড়ানি। এতকাল বেতার যোগে সেজে ছায়াছবিতে অভিনয় করেছেন। বক্তৃতা কোনোদিন করেননি। এই রকম এক বিরাট জনসমাবেশে তাঁকে ভাষণ দিতে হবে এ তো তিনি স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারেন নি।

সভাপতির মুখে চার্লি চ্যাপলিনের নাম শুনেই সভাস্থলে হাততালি পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে, একটু থেমে জনতাকে সম্বোধন করে চার্লি বললেন—কমরেডস্……

আবার হাততালি। সেই সঙ্গে হাসির রোল।

চার্লি বললেন—হ্যাঁ, আমি আপনাদের কমরেডস্ বলে সম্বোধন করছি……

চারিদিক থেকে সহর্ষ বাহবাধ্বনি উঠল।

চার্লি বলতে লাগলেন—এই সভায় নিশ্চয় অনেক রুশ নাগরিক আছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, যে অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে তাঁদের দেশভায়েরা বর্বর নাৎসী দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়ছেন তাতে আজ আপনাদের সামনে দাঁড়াতে এবং আপনাদের কমরেড বলে ডাকতে আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করছি।

সভাগৃহে ঝুমুল আলোড়ন এবং হাততালি। হর্ষধ্বনি থামলে চার্লি বলতে লাগলেন—আমি কমিউনিষ্ট নই। এই পৃথিবীর একজন সাধারণ অধিবাসী আমি। মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। মানুষের মনের প্রতিক্রিয়া কিছু কিছু জানা আছে। পৃথিবীর আর সব অধিবাসীদের মত কমিউনিষ্টরাও মানুষ। হাত পা কাটা গেলে আমাদের মত তারাও বেদনাবোধ করে। কমিউনিষ্ট-জননী পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের মায়ের মতই। তিনি যখন খবর পান যে তাঁর ছেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর ফিরবে না তখন তিনি অন্যদেশের মায়েদের মতই কেঁদে আকুল হন। তাঁর সেই বেদনা উপলব্ধি করবার জন্যে কমিউনিষ্ট হবার প্রয়োজন নেই। আমি একজন মানুষ হিসেবেই সেকথা জানি। আরও জানি যে এই মুহূর্তে রাশিয়ার বহু বহু জননীর কাতর ক্রন্দনে সেখানকার আকাশ বাতাস আলোড়িত হচ্ছে।

থামলেন চার্লি। সভাগৃহে যেন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বইছে। চার্লির কথা সকলকে অভিভূত করেছে।

চার্লি বলতে লাগলেন—রুশ যুদ্ধত্রাণ সমিতি আপনাদের সাহায্য প্রার্থী। হ্যাঁ, টাকা চাই, অবশ্যই টাকা চাই। কিন্তু টাকাটাই আজ সবচেয়ে বড় কথা নয়। রাশিয়ানরা মরণপণ লড়াই চালাচ্ছে। যদি তাদের সেই লড়াইকে জয়যুক্ত করতে হয় তাহলে এখুনি চাই দ্বিতীয় রণাঙ্গণ, সেকেণ্ড ফ্রন্ট।

চার্লিকে থামতে হল। উল্লাসে বাহবার ঝড় যেন ফেটে পড়ল। অসংখ্য টুপি শূন্যে উঠল। উন্মাদনার আবেগে শ্রোতারা যেন উন্মত্ত অধীর।

উপসংহারে চার্লি বললেন—যদি আপনারা মনে করেন দ্বিতীয় রণাঙ্গণ দরকার, তাহলে আপনারা এক কাজ করুন। এই সভা থেকে বেরিয়ে প্রত্যেকে এখুনি প্রেসিডেন্টের নামে একটি করে জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করুন। কাল সকালের মধ্যেই তাঁর হাতে দশ হাজার টেলিগ্রাম গিয়ে পৌঁছোক। সেইসব টেলিগ্রামের একটিমাত্র বক্তব্য—খোল সেকেণ্ড ফ্রন্ট।

চার্লির সেদিনকার বক্তৃতা সমগ্র মার্কিন দেশকে বিস্ময়ে উচ্চকিত করেছিল।

কয়েক সপ্তাহ পরে এক মহতী সভায় তাঁকে টেলিফোন যোগে ভাষণ দেবার জন্যে অনুরোধ করলেন সেই সভার গণ্যমান্য উদ্যোক্তারা।

চার্লি রাজী হলেন। নিজের ঘরে বসে বহুদূরবর্তী ম্যাডিসন স্কোয়ারের সেই বিপুল জনসমাবেশে তিনি টেলিফোন মারফৎ যে দূর-ভাষণ পাঠিয়েছিলেন তা পরে সেই সভার উদ্যোক্তারা ছেপে বার করেছিলেন।

চার্লি বলেছিলেন—গণতন্ত্রের জয় হবে কি পরাজয় হবে তা নিরূপিত হবে রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে।

আজ রাশিয়ার ওপরেই নির্ভর করছে মিত্রশক্তির ভবিষ্যৎ, সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। যদি রাশিয়া হেরে যায় তাহলে সারা এশিয়া নাৎসীদের করতলগত হবে। যদি সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ড নাৎসী এবং জাপানীদের হাতে চলে যায় তাহলে মিত্রশক্তি তাদের সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারবে না।...আমরা এতাবৎ নাৎসীদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো যুদ্ধ হেরেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাশিয়ানরা এখনও আমাদের প্রাণে আশা জাগিয়ে রেখেছে। তারাও যদি হেরে যায় তাহলে সব যাবে, আমাদের জীবনবোধ, ধ্যান ধারণা, সমাজসভ্যতা সবকিছুই নাৎসীদের বুটের তলায় দলিত মথিত হবে। সুতরাং আমাদেরই স্বার্থে রাশিয়ানদের সাহায্য করতে হবে এবং তাদের বাঁচাবার জন্যে এখুনি দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টি করতে হবে।...আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হই। সকলে সমস্বরে বলি, খোল সেকেণ্ড ফ্রন্ট। আগামী বসন্তকালের মধ্যেই আমাদের লড়াই শুরু করতে হবে। যে যেখানে আছ এই সংকল্প মনে নিয়ে কাজ করো। তুমি আছ সৈনিকের বেশে, পৃথিবীর নাগরিক হিসাবে তুমি আছ সর্বত্র ছড়িয়ে, তুমি এস, নারকীয় নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে আমাদের এই অভিযানে তুমি যোগ দাও। অদূরবর্তী সরকারী ওয়াশিংটন, আর দূরবর্তী সরকারী লণ্ডন, তোমরা দুজনে মদৎ দাও আমাদের, অসাধ্য সাধনে ব্রতী হব আমরা। স্মরণ রেখো, ইতিহাসে যে সব বড় বড় কীর্তির কথা লেখা আছে সেগুলি সাধন করা মানুষ প্রথমে অসাধ্য বলেই মনে করেছিল। অতএব আমরাও পারব আর একটি অসাধ্য সাধন করতে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চার্চিল প্রমুখ মিত্রশক্তির নেতাদের মুখে যেসব বক্তৃতা আমরা শুনেছি, ওজস্বিতায়, আবেগে, ভাবের গভীরতায়, চিন্তাশীলতায় এবং দূরদর্শিতায় চার্লির বক্তৃতা তাদের চেয়ে কম নয়। বরং অনেক বিষয়ে অনেক বেশী চিত্তস্পর্শী। কিন্তু চার্লির প্রতি মার্কিন সাংবাদিকদের মনে বিরুদ্ধ ভাব থাকায় তাঁর সেই অবিস্মরণীয় ভাষণ দুটি কোনো পত্রিকাতেই কলাও করে ছাপা হয়নি। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষরা সংবাদপত্র মারফৎ সেগুলি পড়বারও সুযোগ পায়নি।

* * *

পরবর্তী অধ্যায়ে : চার্লির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মামলা... সাংবাদিক সম্মেলনে প্রত্যুত্তর...চার্লি লম্পট...চার্লি দেশদ্রোহী... চার্লি বলেছেন তিনি আমেরিকার নাগরিক নন, তিনি পেয়িং গেষ্টরূপে আমেরিকায় আছেন। বার করে দাও অমন পেয়িং গেষ্ট-কে, অমন দেশদ্রোহীকে...চার্লির বিরুদ্ধে কূটচক্র...

প্রত্যাবর্তন

মানবেন্দ্র পাল

এ বাড়িতে শিবাণী বৌ হয়ে এসেছে তা অনেক দিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সংসারের কোনো কাজে তার হাত নেই—অধিকার নেই। শাশুড়িই সব। তিনিই সর্বময়ী কর্ত্রী। ছেলে টাকা মায়ের হাতে তুলে দেয়, সংসারের খরচ মা-ই নিজে হাতে বের করে দেন। শুধু সিন্দুকের চাবি নয়, দোকানের চাবি, পুজোবাড়ীর চাবি, এমনকি ভাঁড়ারের চাবিটিও তাঁর কাছে। অবশ্য এর জন্যে শিবাণীর কোনো ক্ষোভ নেই। সে এসে পর্যন্ত দেখছে, এ বাড়িতে শাশুড়িরই আধিপত্য একচ্ছত্র। এমনকি শ্বশুরমহাশয়ও স্ত্রীর কথামতো চলতেন। কিন্তু শ্বশুরমহাশয়ের ক্ষেত্রে যেটা ভয়ের জন্যে ঘটত ছেলের ক্ষেত্রে সেইটেই ঘটল স্নেহের প্রভাবে। শ্বশুর মারা যাবার পর স্বামী স্বচ্ছন্দে সংসারের ভার তার ওপর দিয়ে দিতে পারত—যেমন আর পাঁচটা সংসারে হয়ে থাকে। কিন্তু এখানেই ব্যতিক্রম। বাপ মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন মাকেই আঁকড়ে ধরলে। উঠতে বসতে 'মা', কথায় কথায় 'মা', বাড়ি ঢুকেই মাকে খোঁজ করা চাই, বাড়ি থেকে বেরোবার সময় সামনে মাকে দেখা চাই। অন্য স্ত্রী হলে হয়তো স্বামীর এতখানি মাতৃপরায়ণতা সহ্য করতে পারত না। বিদ্রোহী হয়ে উঠত। কিন্তু শিবাণী শুধু সহ্যই করে নি সে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল। এ বাড়িতে বৌ হয়ে এসে পর্যন্ত তাকে সংসারের কোন গুরু দায়িত্ব নিতে হয়নি। দু'বেলা রেঁধে দিয়েছে, ঘরদোর গুছিয়ে রেখেছে, দুটি ছেলে মেয়ে—তাদের মানুষ করছে। ব্যস। এ ছাড়া আর দায়িত্ব নেই।

শাশুড়ি ওঠেন ভোরে। ভোরে উঠেই চলে যান গঙ্গাস্নানে। সারা পথে নানা ভাবনা। স্নান করে ফিরেই ভাঁড়ারের জিনিস বের করে দিতে হবে। আর ভাঁড়ারের অবস্থা যা হয়েছে। সব শূন্য! ভাঁড়ার না ছাই! তেল নেই, আটা নেই, চিনি নেই, ডাল নেই। সংসারের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। প্রতিদিন নতুন দুশ্চিন্তা। আজ এটা পাওয়া যাচ্ছে না কাল ওটা পাওয়া যাচ্ছে না। চিলে-কোঠার ছাদ ফেটে গেছে কিন্তু বাজারে সিমেন্ট নেই। দূর ছাই, আর ভাবতে পারা যায় না। আর সংসারের জন্যে তাঁর এত ভাবাই বা কেন? অমন বৌ রয়েছে। নতুন বৌ নয়, তা ছাড়া লেখাপড়া জানা মেয়ে।

মনে মনে হাসেন—তা হোক! তবু কি এত বড়ো সংসারের ভার সে নিতে পারে? না হয় লেখাপড়া জানে—কিন্তু লেখাপড়া জানলেই কি আর পাকা গিন্নি হওয়া যায়? বৃদ্ধা মনে মনে যেন উপযুক্ত যুক্তি খুঁজে পান। খুশি হয়ে পথ হাঁটেন। না, এ সংসার তাঁরই। তিনি বেঁচে থাকতে এ সংসারের ভার আর কারও ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না।

বৃদ্ধার মনে সম্ভবত মাঝে মাঝে এমনি সংশয় উপস্থিত হয়। তিনি বুঝতে পারেন এই সংসারের দায়িত্ব থেকে খুব সন্তর্পণে কাকে যেন বঞ্চণা করছেন। বঞ্চণা! হ্যাঁ, বঞ্চণা বৈকি। সময় থাকতে থাকতেই যার যা দায়িত্ব তাকে তা বুঝিয়ে দিতে হয়। কিন্তু তিনি তা করেননি। কোনো অভিমানে নয়—ইচ্ছে করেই বৌয়ের হাতে সংসারের ভার তুলে দিতে পারেন নি। এইটেই বোধ হয় মাঝে মাঝে তাঁর বিবেককে দংশন করে। তখনই তিনি মনে মনে যুক্তি খোঁজেন নিজেকে সমর্থনের জন্যে।

কিন্তু এই সংসারটি বৃদ্ধা সত্যিই বুক দিয়ে ধরে রেখেছেন। ভোরে উঠে দরজায় দরজায় গঙ্গাজল দেবেন। বন্ধ জানলাগুলি একটি একটি করে খুলে দেবেন। নতুন দিনের নতুন আলো দুয়ার স্তিমিত দুইটির সামনে যেন নতুন কোনো সংবাদ এনে দেয়। তারপর চলে যান রান্নাঘরে। পাটকাঠি দিয়ে উনুন ধরিয়ে চা করেন। ভোরে উঠে এই চা খাওয়াটি ওঁর অভ্যাস। শুধু নিজেই চা খান না, সকলকে ডেকে ডেকে তুলে চা খাওয়ান। শিবানী প্রথম প্রথম লজ্জা পেত। কোথায় সে উঠে শাশুড়িকে চা খাওয়াবে—তা নয় শাশুড়িই নিজে—

কিন্তু ক্রমশঃ বুঝেছে শাশুড়ি এইটেই পছন্দ করেন। এই চা করাটি নিজের হাতে নইলে ওঁর মন ভরে না। চা করে ঘরে ঘরে দিয়ে আসবেন।—ওগো বৌমা, চা নাও।

এই চা-টি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে নিতে হবে, হাসি মুখে নিতে হবে। খাব না বললে শাশুড়ি দুঃখিত হন।

একটু বেলা হলে নিজেই একটা চটের থলি নিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ান। বাজার যাবার লোক নেই। ছেলে তো সকাল থেকে দোকানে। বাজার দোকান করার জন্যে লোক রাখার কথা উঠেছিল। কিন্তু বৃদ্ধা সে প্রস্তাবে রাজি হন নি। তিনি বললেন, শুধু শুধু একটা লোক পোষার দরকার কী? বাজার আমি নিজেই করতে পারব। সেই থেকে তিনি রোজ সকালে বাড়ির সামনে বড়ো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ান। বাজারের পথে কোড়েরা ঝাঁকা মাথায় যায়। বৃদ্ধা ডাকেন, কী আছে গো?

—বেগুন।

—কত করে?

—বারো আনা!

—বলো কী! বারো আনা! আচ্ছা নামাও তো!

কোড়ে ঝাঁকা নামায়।

বৃদ্ধা একটা একটা করে বেগুন বেছে ওজন দাঁড়িতে তোলেন। তারপর দরদস্তুর। এমনি করেই এখানে দাঁড়িয়ে আলুটা, পটলটা, মুলোটা, শাকটা—এমনকি সুবিধে মতো পেলে মাছটাও কিনে নেন। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াবার সময় নেই। অনেক কাজ। বৌমা স্নান করতে গেছে এর মধ্যেই এদব কেনাকাটা করে ফেলতে হয়। বৌমার স্নান হয়ে গেলেই রান্না চড়াবে। কিন্তু ওঁর কাজ আছে এখনো ঢের। ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে হবে। বাড়িতে নারায়ণ শিলা আছেন। ওঁর নিত্য পূজা নিত্য ভোগ। ঠাকুরমশাই পুজোয় আসবেন ঠিক দশটায় তার মধ্যে ভোগ রাঁধা শেষ করতে হবে। ঠাকুরের পুজো সারতে সারতে বেলা এগারোটা, তারপর তিনি দুটো মুড়ি গুড় খেতে পারেন। ভোর থেকে উঠে এই বেলা এগারোটা পর্যন্ত শুধু এক কাপ চা খেয়ে এই বয়েসে এই খাটুনি—কিন্তু এর জন্যে অন্য কেউ দায়ী নয়। এ কষ্ট তাঁকে করতেই হবে। এ যে তাঁরই কর্তব্য। এ কি আর ঐ লেখাপড়া জানা বৌ পারে?

এ বাড়িতে বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটায় ঠাকুরের ভোগ হওয়ার পরই একটা পর্ব শেষ হয়, কিন্তু শেষ পর্ব চুকতে বেলা দুটো বাজেই। দোকান বন্ধ করে আসতে আসতে ছেলের ঘেড়টা বেজে যায়। বাড়ি এসে মায়ের হাতে এক বেলার বিক্রি-পত্তর বুঝিয়ে দিয়ে টাকার তোড়া এগিয়ে দেয়। সিন্দুকে তুলে রাখেন মা। তারপর স্নান, তারপর খাওয়া দাওয়া।

কিন্তু খাওয়ার পর বেশিক্ষণ বিশ্রাম করতে পারেন না। তিনটে বাজতে না বাজতেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হবে। শব্দ কোবে নয়, আস্তে। সেই শব্দের জন্যে যেন বৃদ্ধা কান পেতে থাকেন। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে ওঠেন, ভালো করে দেখে নেন—বৌমা টের পাচ্ছে কিনা, তারপর উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেন। শিবানী এ সংসারে এসে পর্যন্ত এই সময়ের এই কড়া নাড়াটুকুর সঙ্গে পরিচিত। জানে ঘুঁটে কিনতে এসেছে পাঁচুর মা, নইলে সিদু গয়লানীর ঝিঝি। শাশুড়ির এই একটা রোজগারের পথ ছিল। বাড়িতে গোরু আছে, গোবরের অভাব নেই। নিজেই সেই গোবর গোয়ালের দেওয়ালে লেপে দেন—বড়ো বড়ো ঘুঁটে হয় তাতে। সংসারের ঘুঁটের খরচ তো বাঁচেই তারপর বাকি ঘুঁটে বেচে দেন পাড়া-পড়শীদের কাছে। শিবানীর এইখানেই আপত্তি ছিল। সে কোনো দিন এ সংসারের কোন ব্যাপারে গায়ে পড়ে একটু বলতে যায়নি, সে জানত এ সংসারে তাকে সবাই ভালবাসে, স্নেহ করে বটে; কিন্তু এখানে তার কথা কেউ শোনে না। সংসারের ভালো মন্দ লাভ লোকসানের ব্যাপারে তার পরামর্শ কেউ নেয় না। কিন্তু এই যে শাশুড়ি ঘুঁটে বিক্রি করেন এটা তার কোনোদিনই সহ্য হত না। প্রথম প্রথম কিছু বলতে পারত না, ইদানীং বলে। কথায় কথায় প্রায়ই বলে, মা ঘুঁটে বেচাটা ছেড়ে দিন। ও কি আপনাকে মানায়? তা ছাড়া ভগবানের ইচ্ছেয় আপনার অভাব কিসের?

শাশুড়ি শোনেন না। বলেন, আমার অত মান অপমান নেই বাপু। কর্তার সময় থেকে করে আসছি। কর্তার খাতিরও কম ছিল না।

একটু থেমে বলেন, তা ছাড়া ঘুঁটে বেচা কি কিছু খারাপ কাজ মা? বাড়ি বসে পয়সা দিয়ে যায় কী করে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলি বলো দেখি!

না, বলার কিছু নেই। শিবানী জানে, আজও এ সংসারে তার কথা কেউ শুনবে না, মানবে না। একদিন স্বামীকেও ঐ ঘুঁটে বেচার কথা বলেছিল, কোনো প্রতিকারের জন্যে নয়, শুধু একটু বাজিয়ে দেখতে। স্বামী স্বভাব মতো একটু হাসলেন। বললেন, মায়ের কথা বাদ দাও। ঐ ঘুঁটে বেচা কি আজকের? কোন ছোটো বেলা থেকে দেখছি। শুধু ঘুঁটে বেচা কেন ঐ যে স্নানের ঘরের পাশে জমিটা দেখছ ওখানে ছিল সার সার কলাগাছ। কত কলা যা বাজারে বেচতে পাঠিয়ে দিত।

—সে আলাদা কথা। কিন্তু ঐ পাঁচুর মায়ের কাছে দর কষাকষি করে ঘুঁটে বেচা—

স্বামী প্রাণ খুলে হেসে ওঠেন। বলেন, ছেড়ে দাও ওদিকে তাকিও না।

সেই থেকে শিবানী ওদিকে আর তাকায় না। তিনটের সময়ে যখন পাঁচুর মা দরজায় কড়া নাড়ে শাশুড়ি যখন সন্তর্পণে উঠে যান, শিবানী তখন দুহাতে কান চেপে বিছানায় পড়ে থাকে।

একদিন কিন্তু সামান্য ঐ ঘুঁটেতেই আগুন জ্বলল।

বৃদ্ধার বয়েস প্রায় পঁয়ষট্টি হল। সোজা হয়ে সব সময় হাঁটতে পারেন না। মাজা পড়ে এসেছে। তবু অমানুষিক পরিশ্রম করেন। এতটা পরিশ্রম করার দরকার হয় না। শিবানীর মনে হয় এ যেন কেবল তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে পরিশ্রম করা। আধুনিক কালে প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়, একালের বৌ-ঝিরা দু'পাতা ইংরিজি পড়ে—দু'একটা পাস দিয়ে মোটেই সংসারের কাজে খাটতে চায় না। শিবানী দেখেছে শাশুড়ির কথাটি বড় ভালোলাগে। প্রায়ই তিনি অন্যের দরজায়

কথাটি নিয়ে আলোচনা করেন। শিবানী নিজেও পাস করা মেয়ে কিন্তু সংসারের কোনো কাজ তো তার বাকি থাকে না। তবে শাশুড়ির মতো বাজে কাজে সময় বা শক্তি নষ্ট করে না।

সেদিন দুপুর বেলা, খাওয়া-দাওয়া সেরে শিবানী শুয়েছে। শাশুড়ি আজ আর শুতে যাবেন নি। বর্ষা কাল। বার বার করে আমসত্বগুলো রোদে দিচ্ছিলেন, আবার আকাশে একটু মেঘ দেখলেই তুলে নিচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, এ ছাড়াও আর একটা কাজ জুটেছে। উঠোনে ঘরে নি, তাই খড় এবার কিছুটা ছাতে পাশা দিয়ে রাখা হয়েছিল। এত খড় লাগবে না। বেচে দেওয়া স্থির হয়েছে। কিন্তু কোন্ খড়টা আগে বেচবে—উঠোনের না ছাদের? শাশুড়িই জানিয়েছেন, আগে ছাতের খড়গুলো বেচে ফেলাই ভালো। বর্ষাকাল, জল জমে জমে ছাতটা যাবে। পরামর্শ অবশ্য ছেলের সঙ্গেই হয়েছে। ছেলে আর কী বলবে। মায়ের কথাতেই রাজি। তাই দুপুরেই তারা গয়লানীকে ছাদ থেকে খড়ের আঁটি নামিয়ে দিচ্ছিলেন।

—এই দুগুণ্ডা হল, ভালো করে দেখে নাও বাপু।

তারা গয়লানী ভালো করেই দেখছিল। দু'একটা পছন্দ হল না, সেগুলো আবার ফেরত দিয়ে, পালা থেকে আর দু আঁটি টেনে নিয়ে পয়সা গুণে চলে গেল। বৃদ্ধা তবু রাগে গজগজ করতে লাগলেন,—পালা থেকে আঁটি টেনে নেওয়া সোজা, কিন্তু গোজা? এই যে দু আঁটি অকারণে টেনে বের করালি সে বেগার খাটার দাম দেয় কে শুনি?

এমনি সময়ে খিড়কি দরজায় কাড়া নাড়ার শব্দ হল। পাঁচুর মা এসেছে ঘুঁটে নিতে। কিন্তু গোল বাধল। বরাবর পাঁচুর মা আনায় পাঁচগণ্ডা ঘুঁটে দেয়ে এসেছে, হঠাৎ আজ গিন্নি চারগণ্ডা দিয়ে বললেন, আর না। পাঁচুর মা অবাক হয়ে বললে, সে কি গো মা।

বর্ষাকালে ঐ রেট। গিন্নি উত্তর দিলেন।

পাঁচুর মা ঝংকার দিয়ে বললে, রেটফেট বুঝি নে, সে সব অন্য খদ্দেরের কাছে। আমি বারোমেসে বাঁধা খদ্দের, আমাকে পুরো পাঁচগণ্ডা দিতেই হবে।

কিন্তু বৃদ্ধা শুনবার পাত্রী নন। সামান্য কয়েকখানা ঘুঁটে নিয়ে সেদিন পাঁচুর মা'র সঙ্গে তাঁর যে বচসা হয়ে গেল তা শুনে শিবানীর দু'কান গরম হয়ে উঠল। কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই। শাশুড়ি তো তাড়াতাড়ি ঝুড়িশুদ্ধ বাড়ির ভেতর ঢুকে গিয়েছেন, আর পাঁচুর মা সারা পথ অজস্র গালাগালে মুখর হয়ে রণে ভঙ্গ দিল।

শিবানী সেদিন কিছুতেই সহ্য করতে পারল না; বিশেষ পাঁচুর মায়ের গালাগালির উপলক্ষ্য ছিল যদিও ঘুঁটে কিন্তু লক্ষ্য ছিল তার স্বামী।

—এমন ছেলেও গর্ভে ধরেছিলে মা, যে এই বয়েসে গরীবের পয়সা মেরে ঘুঁটে বেচে পেট ভরাতে হয়!

শিবানী জানত তার স্বামীর ওপর এ ঘা-টা কেন। মনে পড়ল, একদিন ঐ পাঁচুর মা তার স্বামীর কাছে টাকা ধার চেয়েছিল, স্বামী দেন নি। কিন্তু সেই জের টেনে এই দুপুর বেলা পাঁচুর মা চীৎকার করে গালাগাল দিয়ে গেল শিবানী তা আজ কিছুতেই সহ্য করতে পারল না। স্বামী পাশের ঘরেই শুয়েছিলেন, শাশুড়িও মুখ ভার করে উঠোনে ব'সে ঝুড়ি থেকে ঘুঁটেগুলো অকারণে গুণে গুণে দেখছিলেন, শিবানী বেরিয়ে এসে একটু উত্তেজিত সুরে বললে, শুধু শুধু এই দুপুর বেলা গালাগালগুলো খেলেন তো?

শান্তড়ি মুখ না তুলে বললেন, ও ছোটোলোক ওর কথা কি গায়ে মাখতে আছে?

শিবাণী তেমনি উত্তেজিত ভাবেই বললে, ভদ্রলোক-ছোটলোকের জ্ঞান কি আপনার আছে মা! তা'হলে আর পাঁচুর মা'র কাছে ঘুঁটে বেচে দু'পয়সা লাভ করতে যেতেন না।

শান্তড়ি এবারও মুখ তুললেন না। কঠিন অথচ সংযত স্বরে বললেন, আমি তো আগেই বলেছি, মান-অপমান আমার অত নেই। আমি গাল খাই গাল হজম করতে পারি বলেই।

শিবাণী উদ্ধত ক্রোধে বললে, আপনি হজম করতে পারেন হয় তো, কিন্তু সকলে পারে না।

সকলের পারা না-পারার সঙ্গে আমার তো কোনো সম্পর্ক নেই বৌমা। গাল তো আমিই খেয়েছি।

শিবাণী দৃঢ় স্বরে বললে, না শুধু আপনিই একা নন, আপনার ছেলেকেও গাল খেতে হয়েছে।

এমনি সময়ে দ্বিপ্রহরের সুখনিদ্রা ছেড়ে নিরাপদ নিজেই এসে উপস্থিত হল। ব্যস্ত হয়ে বললে, আঃ কর কী! সামান্য একটা বিষয় নিয়ে—

শিবাণী ফুঁসে উঠে বললে, না, সামান্য বিষয় নয়। তোমার যে বিষয়ে বোধশক্তি নেই তা নিয়ে মাথা গলাতে এসো না।

নিরাপদ আবার ঘরে ফিরে গেল। ছেলের এই বাধ্যতা বৃদ্ধার বুকে শেলের আঘাত হানল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আঁচল থেকে সদ্য খুঁটে বেচার পয়সাগুলো শিবাণীর পায়ের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, এ পয়সা তোমাদেরই জন্যে বৌমা। এ থেকে এক আধলা আমি নিজের জন্যে খরচ করি না। আমি যখন থাকব না তখন আমার কথা বুঝবে। বলতে বলতে বৃদ্ধার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধা নিজের ঘরে চলে গেলেন।

কিন্তু শিবাণী অত সহজে চলে যেতে পারল না। সে যেন নিদারুণ অপ্রস্তুতে পড়ল। আজ এত দিনের মধ্যে এই প্রথম শান্তড়ির চোখে জল দেখল।

এর পর থেকে বৃদ্ধা যেন কেমন হয়ে গেলেন। মুখে হাসি নেই, সব সময়েই বিষণ্ণ। কথায় কথায় কেবলি বলেন, তোমাদের সংসার তোমরা এবার বুঝে নাও, আমি দিন কতক তীর্থধর্ম করে আসি।

তিনি বলেই যান, ছেলে আর বৌ শুনে যায়। কিন্তু তীর্থে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না!

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন নাতনী এসে উপস্থিত। তার ছেলের অন্নপ্রাশন। সবাইকে যেতে হবে। সবাইয়ের যাওয়া সম্ভব হল না, কেবল বৃদ্ধাই গেলেন মহা-উৎসাহে। দীর্ঘকাল পর তিনি বাড়ি থেকে বেরোলেন, দীর্ঘকাল পর স্বামী-শ্বশুরের ভিটের বাইরে পা পড়ল। এই সংসারের নিত্য হিসাব-নিকাশের বাইরেও যে এমন মুক্তির আনন্দ আছে দীর্ঘকাল পর বৃদ্ধা তা অনুভব করলেন।

শিবাণীরও এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বৌ হয়ে এ বাড়িতে আসা পর্যন্ত এমন স্বাধীনতা আর কখনো পায় নি। তার এতকালের ধারা সেল বদলে। এখন নিজের দায়িত্বে ভোরে উঠতে হয়, চা তৈরি করতে হয়; তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিতে হয়। আসা দীক্ষা নেওয়া ছিল তাই তো ঠাকুরের ভোগ রাঁধার অধিকারও পেয়েছে। সেও কম দায়িত্ব নয়। আর একটু পরেই ঠাকুরমশাই এসে পড়বেন পুজো করতে, তার আগেই ভোগ রাঁধা শেষ করতে হবে। তা ছাড়া ছেলেদের ইস্কুলের

তাড়া তো আছেই। সকাল থেকে এই যে ব্যস্ততা এ তার জীবনে একটা নতুন আস্বাদ। কোমরে কাপড় জড়ানো, পিঠের ওপর ছিঁড়ে ঝুলের বাস, কপালে মোটা সিঁদুরের ফোঁটা,—মুখে বিশ্রী ঘাম—শিবাণী মনের আনন্দে কাজ করে চলে, এখন আর কথায় কথায় কারও অনুমতি নিতে হয় না, হঠাৎ কারো সামনে মাথায় কাপড় দেবার দরকার নেই, তিরিরি এসে তাকে এক মুঠো চাল ভিক্ষে দিতে গিয়ে ভয়ে ভয়ে আর কারও দিকে তাকাবার দরকার হয় না।

শিবাণী বেশ পরিষ্কারভাবে কল্পনা করতে পারল যে দিন তার পাতড়ি সত্যিই থাকবে না সে দিনটার কথা। কিন্তু সে কল্পনায় আনন্দ পেল না। আজ এই যে মনের আনন্দে পরম উৎসাহে স্বাধীনভাবে কাজ করছে—এ এক জিনিস, কিন্তু যেদিন মাথার ওপর সত্যিই কেউ থাকবে না সেই শূন্যতাকে শিবাণী কিছুতেই কল্পনাতেও সহ্য করতে পারল না।

নিরাপদরও কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হল। মা চলে যাবার পর হঠাৎ যেন গোটা বাড়িটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু ফাঁকাই নয়, নিরাপদ যেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। বাবার মৃত্যুর পর এই মাকেই সে একমাত্র নির্ভরস্থল মনে করতে পেরেছিল। মায়ের বুদ্ধি, মায়ের সাংসারিক অভিজ্ঞতার কাছে শিবাণীকে মনে হয়েছিল নিতান্তই ছেলেমানুষ। ও যেন তার খেলার পুতুল। প্রথম প্রথম তাই নিরাপদ বড় কাহিল পড়েছিল। কিন্তু ক্রমশ মাতৃহীন এই সংসারে শিবাণীকে নতুন দায়িত্বে নতুন উৎসাহে ব্যস্ত দেখে সে যেন বিস্মিত হল। মনে হল, শিবাণী তো কেবল তার বিলাসসঙ্গিনী নয়, এই সংসারের প্রতিটি কাজ মা যেমনটি করে যেত ঠিক তেমনি ভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছে। অথচ মা তো কোনোদিন তাকে এমনি করে হাতে-হাতে কাজ শিখিয়ে যায়নি। বরঞ্চ শিবাণী লেখাপড়া জানা মেয়ে—সংসারের কাজ পারবে না বলে দূরে দূরে ঠেলেই রেখেছিল।

সেদিন দুপুরে খেতে বসে নিরাপদ অবাক হয়ে গেল। চিরকাল মায়ের সামনে বসে খাওয়া অভ্যাস—শিবাণী থাকে নেপথ্যে। মা সামনে বসে পাখা হাতে নিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে গল্প করেন আর নিরাপদ খেয়ে যায়। আজ হঠাৎ খেয়াল হল, সামনে মা নেই। অথচ ঠিক মায়ের মতন করেই থালার ওপর ঝুঁকে তাড়া। পাতের এক পাশে নুন, লেবু। তরকারিগুলি পর পর সাজানো। নিরাপদ খেতে বসল। সামনে কেউ পাখা হাতে বসল না বটে, কিন্তু শিবাণীই বসল পাশে একসঙ্গে খেতে। শিবাণীর সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাওয়া নিরাপদের এই প্রথম। কেমন যেন তার নিজেরই সংকোচ হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, শিবাণীর এতটুকু সংকোচ নেই। ডাল, তরকারি মাঝখানে রেখে সেও বসে পড়ল। সহজ সুরেই বললে, যা লাগবে চাইতে করে তুলে নিও।

খেতে খেতে আজ গল্পের প্রসঙ্গও অজস্র। শিবাণী বললে, আজ যে কী খবর নিয়ে শুধু ফিরবে তাই ভাবছি।

নিরাপদ চমকে উঠল,—কেন? কী হয়েছে?

—বাঃ, ওদের ঢাকিস্কুল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে না আজ? ফার্স্ট না হলেও লেটার তো হবেই।

নিরাপদর কাছে এসব তথ্য নতুন। কিন্তু ভালো লাগল। তার ছেলে ফার্স্ট হতেও পারে।

কিছুক্ষণ পরে নিরাপদ বললে, আজ যেন মাছিটা কম।

শিবাণী হেসে বললে, ফ্লিট দিয়ে দিয়েছি যে। একটু থেমে বললে, একটা ফ্লিট কিনে ফেলবার যা মাছি—

নিরাপদ নিঃশব্দে খেতে লাগল।

শিবানী বললে, কতকগুলো কাজ আছে, এর মধ্যে সেরে ফেলতে হবে। সবচেয়ে দরকারি কাজ হচ্ছে বাড়িটা চুণকাম করা। কত বছর চুণকাম হয়নি বলো তো।

নিরাপদ স্বীকার করল তা সে নিজেও জানে না।

—আর সেই সঙ্গে কয়েক জায়গায় প্লাস্টার করাতে হবে! লক্ষ্য করে দেখেছ কোনো দিন কি রকম ভাবে দেওয়ালগুলো ফেটে গেছে?

নিরাপদ এই প্রথম উর্ধ্বে চোখে একবার তাকালো।

—কিছু খরচ হয়তো হবে, কিন্তু বস্তুদের ভিটে এমনভাবে নষ্ট হতে দেব না।

নিরাপদ সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল।

নাতনী হেসে বললে, দিদিমা, বড় বৌ পেয়েছিলে বটে! উঃ, চিঠির পর চিঠি। আর কেবল 'আসুন' 'আসুন' 'আসুন'। আমি কিন্তু ছাড়ছি না এখন।

বৃদ্ধা কোনো কথা বললেন না; শুধু হাসলেন একটু!

কয়েক দিনের জন্যে এসে এক মাস হয়ে গেল, তবু বৃদ্ধা আর বাড়ি ফেরার নাম করেন না। নাতনীর ছেলের অন্নপ্রাশনে এই বয়েসে কিছুতেই আসতেন না, কিন্তু হঠাৎ মনের ভেতরটা যে কিরকম করে উঠল আর কিছুতেই ওবাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করল না। এখানে এসেও সুখ নেই। অত লোকজন হৈ-চৈ কি আর এ বয়েসে ভালো লাগে? তিনি কেবলই ভাবেন, এবার বৌমা কষ্ট হয়েছে। বুঝতে পারছে লেখাপড়া জানলেই আর সংসার চালানো সহজ হয়ে যায় না। মনে মনে তিনি যতই ছেলে-বৌয়ের অসুবিধে কল্পনা করেন তাই খুশিতে মন ভরে ওঠে।

নাতনীর কথা ঠিক। এই এক মাসের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে একখানা দু'খানা করে কখনো ছেলের কাছ থেকে কখনো বৌয়ের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন। সে-সব চিঠিতে সবিনয়ে ফিরে যাবার জন্যে সানুনয় তাগিদ রয়েছে। কিন্তু যতই তারা ফিরে আসতে লেখে ততই, তারা যে অত্যন্ত অসুবিধেতে পড়ে তাঁকে ডাকছে এই কল্পনা করে, তিনি যাবার দিন পিছিয়ে দেন। অথচ মনের মধ্যে শান্তি নেই। তাঁর এতদিনের পরিচিত সংসার—তাঁর নানা সুখ দুঃখ নানা আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বারে বারে যেন তাঁকে ইশারা করে ডেকে। সেই পরিচিত গোয়ালটি, ধবলা গাইটি, সেই উঠান, ঠাকুরঘর, বাড়ির পিছনের নিমগাছটি, দুরন্ত নাতি দুটির কোলাহল এবং সর্বোপরি পাঁচুর মা'র কাছে খুঁটে বেচার আনন্দ তাঁকে বিচলিত করে তুলল। অবশেষে একদিন হঠাৎই তিনি বাড়ি ফেরার জন্যে মনস্থ করে ফেললেন। নাতনী নাতজামাই আরও কয়েকদিন থাকার জন্যে অনুরোধ করল, বৃদ্ধা শুনলেন না।

বাড়ির সামনে রিক্সা থেকে নেমেই তিনি চমকে উঠলেন। এ কোন্ বাড়ি!

বৃদ্ধা একবার ভালো করে তাকালেন। সেই পুরনো জীর্ণ বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই—দেওয়ালে দেওয়ালে নতুন পলস্তারা—রঙের সমারোহ! গোটা বাড়িটার চেহারাই বদলে গিয়েছে—!

কোম্পানী আমলের কাহিনী

অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

[কোম্পানী আমলের স্বনাম পুলিশ কর্মচারী রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে যে ছোট পরিচয়লিপি দিয়েছিলাম তা পড়ে অনেক পাঠক খুশী হয়ে পত্র দিয়েছেন এবং রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের লেখা আরও কিছু কাহিনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করবার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁদের অনুরোধ অনুসারে শতবর্ষ পূর্বে বাংলাদেশের ডাকাত ও ডাকাতির আরও কিছু কাহিনী এই সংখ্যায় দেওয়া হল।

—অ.ন.ম.]

গ্রামাঞ্চলে ও শহর কলকাতায় চুরি ডাকাতি

ডিটেকটিভ এসেবার আসিষ্টাণ্ট অতীনলালের ঘরে একবার ১৩টি পুরান ডাকাইতির সন্ধান হয়। একরারী ডাকাইত মধ্যে দুইজনকে সরকারের পক্ষে সাক্ষী করা হয়। ইহাদের একরারে অন্যান্য লোক মধ্যে জিলার জেলখানার প্রধান জমাদার একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ অনেকগুলি ডাকাইতিতে লিপ্ত ছিল প্রকাশ হয়। ঐ সময়ে জেলে ঐ জমাদারের কার্য্য ছিল না, সে সদর ষ্টেসনে আপন উপপত্নীর বাটীতে থাকিত। কথিত দুই ব্যক্তির একরার গ্রহণের পরেই পুলিশ বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত ম্যাজিষ্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া জমাদারের উপপত্নীর বাটীতে যায় এবং একরার অনুসারে এত চোরা সামগ্রী বাহির হয় যে জমাদার তাহা অপলাপ করিতে অপারক হয়, পরিশেষে নিজে একরার করিয়া ফেলে। জেলখানার কয়েদি মধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ডাকাইতকে লইয়া অন্ধকার রাত্রিতে জেল হইতে বাহির হইত এবং উহাদের সন্ধান ও সাহায্যে দলবদ্ধে ডাকাইতি করিয়া রাত্রারাতি জেলে আসিয়া উপস্থিত হইত। এই সকল কথা জমাদার প্রকাশ করিল এবং সকলকে বিস্মিত হইতে হইল। ইহা স্থানীয় পুলিশের জ্ঞান গোচর হওয়া দুরূহ ছিল।

একরারী গোয়েন্দা মধ্যে দামুদাস এক অদ্ভুত জিনিস। তাহার বুদ্ধি চাতুর্য্য দেখিয়া কি পুলিশ, কি উকীল, কি বিচারক সকলকেই বিস্ময়াপন্ন হইতে হইয়াছিল। সে আপন বৃত্তান্ত অতি সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। এই বৃত্তান্তগুলি তাহার নিজের কথায় সংক্ষেপে বলিতে পারিলে অনেকের নানা বিষয়ে জ্ঞান জন্মিতে পারে।

দামুদাস। আমি বাঁকুড়া জেলার জজ আদালতের দেওয়ানবাবুর, কৃষ্ণসঙ্গের সন্তান। ৭।৮ বৎসর বয়সের সময়ে যা যা হইছিল তাহাই ভাল মনে আছে। দেওয়ানবাবু তান্ত্রিক ছিলেন। রাত্রিতে তাঁহার পূজার পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত মাতাকে আসিয়া থাকিতে হইত। সেই সময় হইতে আমারও রাত্রি জাগা অভ্যাস। বাবুজী আমায় স্কুলে দিয়াছিলেন। বাংলা এবং খোড়া বহুৎ ইংরাজী শিখিয়াছিলাম। আমার ১৪।১৫ বৎসর বয়স হইলে বাবুজীর মৃত্যু হয়। ইহার কিছুদিন পরে ওলাওঠা রোগে মাতার মৃত্যু হয় এবং আমি নিরাশ্রয় হই। ইহার পূর্বেই আমার পড়াশুনা

বন্ধ হইয়াছিল। মায়ের যে কিছু গহনাপাতি ছিল তাহাতে কিছুদিন গুজরান হইল। আর একটি বিশেষ রোগ জন্মিল। পাড়ার স্বামী হারিনী আমার মনের মধ্যেমধ্যে দাঁড়াইল। স্বামী আমার বয়সী। দেখিতে অতি সুন্দরী। তাহাকে এবং তাহার বড় তন্বী রামীকে দেখিলে বড় বড় বাবু-সায়েবের মন বিচলিত হইত। ছেলেবেলা হইতে স্বামীর সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা চলিত। সে রাজী কিন্তু তাহার তন্বী বিরক্ত হইত। মায়ের দুইখানা গহনা রামীকে দিয়া হাত করিলাম। স্বামীর স্বামী আছে। সে অয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বাবুর্চি নিযুক্ত ছিল। আমার সুযোগের অভাব ছিল না। ক্রমে পয়সার প্রয়োজনে চুরি অবলম্বন হইল। দেখিলাম ইহাতে বেশ আয়োজ। পাড়ার ও তামার শহরের অনেকেরই যেখানে যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, আমার হস্তগত হইল। ক্রমে এই কাজে হাতযশ বাড়িল। সময় ক্রমে ফৌজদারী কোর্টে মোক্তারদের নিকটে এটর্নীগিরি আরম্ভ করলাম। এখানে অন্যরকমে বিশেষ লাভ দেখলাম না তবে মুক্তার যোগা হয়ে পরস্পরের লড়ায়ের সময়ে উহাদের পকেট হতে টাকা বাহির করতে লাগলাম। অল্প দিন মধ্যে এই কাজে হাতের এত সাফাই হল যে কোন মুক্তারকে কাহার নিকটে টাকা পেয়ে পকেটে রাখতে দেখে মনে মনে বলতাম কেন আর পকেটে রাখা, আমার হাতে একেবারে দাওনা। সন্ধ্যার সময়ে বাসায় টাকার হিসাব না মিল হওয়ায় পরদিন কাছারীতে মুক্তারেরা কেহ আপন মওক্কেল, কেহ আপন মোহরিকে ধমকাইত। ক্রমে সকলেরই সমান হাল। বেশী গোলমাল সময়ে আমি তোমাদের পাছে থাকব এবং চোর ধরে দেব বললাম। মুক্তারেরা রাজী হলো। এতেও কতক সুযোগ থাকল। একদিন একটা ছাতাচোরকে ধরে দিলাম। পরে কয়েকদিন দেওয়ানী আদালতে ঘুরতে লাগলাম। সেখানে বেশী সুবিধা বোধি হল। সেখানে বেঞ্চ নাই। এক এক উকিল পৃথক পৃথক চৌকীতে বসে। বসলে, আর পকেট ভারী হলে তাহা চৌকীর বাহিরে প্রায় ঝুলে পড়ে। বিশেষ সেসনের বিচার সময়ে উকিলদের পকেট বেশ ভারী হতো ও বেশী ঝুলত। বসে বসে ভারী পকেট একটু ঝুলে ধরে বোতল কি আরসী ভাঙ্গা দিয়ে পকেট কেটে টাকা বাহির করতে লাগলাম। শেষে আমার উৎপাতে উকিল মুক্তারেরা পকেটে টাকা রাখা বন্ধ করল এবং বামভাগে কোমরের ওপরে পকেট বানিয়ে নিল কিন্তু আমার চালাকি যে কেহ জানতে পারে নাই তাহা বুঝতে পেরেছিলাম।

এই সময়ে একজন উকিলের আপন আত্মীয় কলিকাতার ছোট আদালতের এক উকিলের নিকটে কাজ পাইয়া সেখানে যাবার উদ্যোগ করল এবং আমায় চাকর করে নিতে চাইল। আমি তখনও কৃষ্ণনগরের কায়স্থই আছি। খাঁটী হাড়ি বলে বিখ্যাত হই নাই। কলিকাতার হাটহদ্দ একবার দেখবার বড় ইচ্ছা। কিন্তু আমার স্বামীর ভালোবাসা। মনের মধ্যে বড়ই গোলোযোগ। শেষে যাওয়াই স্থির। স্বামীর মত করলাম।

কলিকাতায় আসবার অল্পদিন মধ্যেই আমার মুখ চোখ বেশী ফুটল। যেন আমার সাবেক পরিচিত জায়গায় এসেছি মনে হতে লাগল। মধ্যে মধ্যে ছোট আদালতে যেতাম। যাজে লোকের ভীড়ের মধ্যে একদিন একজনের পকেট হতে অজ্ঞাত কাগজের সঙ্গে একখানা নোট পেলাম। বারান্দায় গিয়া দেখি ৫০০ শত টাকার নোট। ধরা পড়তে হবে—দওয়া হবে না, স্থির করলাম। যেমন কাগজে বাঁধা ছিল তেমনি করে রেখে, কোর্ট ঘরে এসে একজন পেয়াদাকে ডেকে কাহারও নোট

খোয়া গেছে কিনা দেখবার জন্যে বললাম। একজন মাড়োয়ারী ব্যস্ত হয়ে নিকটে আসল। নোটের নম্বর আদি জিজ্ঞাসা করে বখশিশ চাইলাম। সে তখনি পঁচিশ টাকা দিল। আমি নোটও কাগজ ছিলাম। ইহাও এক মন্দ কর্ম্মী বোধ হল না।

যে যেমন লোক, তার তেমন সঙ্গীর অভাব হয় না। কয়েকজন সঙ্গী জুটল। তাহারাও আমার মত কুকর্ম্মা। যে লোকের সঙ্গে এসেছিলাম, তার বাসা ছাড়লাম। সঙ্গীর সঙ্গী এবং আলাপী অনেক লোকের সঙ্গে মাখামাখি হল। উহাদের যা ভগ্নীর বাড়িতে থাকতাম। দেখলাম কলিকাতার বড় বড় বাড়ীর আড়ালে গলি খুঁজিতে থাকায় অনেক লাভ। ক্রমে বড়বাজারের সিন্দুরপটি, খাংরাপটি, জগন্নাথ ঘাট প্রভৃতি স্থানের স্কুলে ভর্ত্তি হলাম। স্কুল বললে বুঝতে পারবেন না, এই সকল স্থানে গাঁটকাটা ও পিকপকেটদের দল আছে। দলের কর্ত্তা আছে। যে যেখানে যাহা কিছু পাইবে, হাতে হাতে কর্ত্তাদের গুদামে এসে জমা হবে। শেষে ভাগ হত। সঙ্গী সঙ্গীতে বেশ পরিচয় না থাকলে যুধভঙ্গী, গোঁফে হাত এবং ভিড়ের মধ্যে গা টেপার রকমে সঙ্গী চেনা যায়। কর্ত্তারা আমায় চিনে নিল কিন্তু সঙ্গীদের মধ্যে কয়জনে আমায় পাড়াগেঁয়ে চোর বলে ঘৃণা করতো। আমি চটিবার লোক নই। রাত্রিতে সময়ে সময়ে এক এক দাঁও মারা হতো।

এক রাত্রিতে আমরা চারিজনে চোরবাগানের এক গলির মধ্যে এক বাড়ীতে ঢুকে ক্রমে তিন বাড়ীতে চুরি করলাম। সকলেই বেশ কাজের লোক। আমি এক ঘরে ঢুকে বড় মদের গন্ধ পেলাম। দেখলাম একটা মেয়ে মানুষ এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে। তার মাথাটা তক্তোপোষ হইতে একটু ঝুলে পড়েছে। একটা পুরুষ এক খাটে ঘাড় গুঁজে পড়েছে। একটা মদের বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। মেয়েটার গলা হতে চিক এবং এক হাতের মর্দ্দানা কেটে নিলাম, একটা বাক্স বাহির করলাম। যে বাড়ী দিয়া ঢুকে ছিলাম ঐ বাড়ীর বাঁধা কুয়াতলায় বাক্স আদি রাখা হতেছিল। এই সময়ে সঙ্গী একজনা এসে পাশের বাড়ীর এক পুরুষ জেগেছে বলে সমাচার দিল। আমরা সকলে খানিক চুপ করে থাকলাম। আমি দেখলাম ঐ লোকটা জাগে নাই, স্বপ্নে কথা কচ্ছে "এদিকে আসুন, দেখুন না, ঘরের সুবিধা হবে" বলতেছে। আমি বললাম এ বেটা রাধাবাজারের দোকানদার, স্বপ্নে খদ্দের ডাকচে। উহার ঘর হতে আমরা কোট, পেন্টালুনের কয়েকটা গোটা থান ও বাক্স বাহির করলাম। বাক্স সকল ভেঙে আমরা মোট-ঘাট বেঁধে যেমন গলিতে বাহির হতেছিলাম, অমনি বড় রাস্তায় পাহারাওয়ালা বললো গলির মধ্যে কিসের শব্দ হচ্ছে। গলিতে পাহারাওয়ালার এলে আমাদের বিপদ ভাবলাম। ঐ দিকের দুয়ার খোলা—কপাট ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি দুইটা পেয়ালে যেমন ঝগড়া করে, নাক টিপে সেই রকম শব্দ কয়েকবার করলাম। জমাদার হাতে লণ্ঠনের আলো গলির মধ্যে চালাইল এবং "গিধড় হ্যায়, ডরো মৎ" বলিয়া পশ্চিমমুখে চলিয়া গেল। অনেক রকমের চাল—সহরে থাকা হবে না বলে আমরা শেয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হলাম। বড় রাস্তায় বা গলিতে জনপ্রাণী সঙ্গে দেখা হলো না। চাঁপাতলার দীঘির নিকটে আসিলে দক্ষিণের চৌরাস্তায় পাহারাওয়ালাদের গোলমাল শুনে আমরা একটু দাঁড়াইলাম। জমাদার প্রভৃতি কয়েকজন দক্ষিণ মুখে খানিক গিয়া একজনের নাম ধরে ডাকতে লাগলো। চৌরাস্তায় যে পাহারাওয়ালাটা ছিল, সে জমাদারের কাছে গেল বুঝিয়া—আমরা তাড়াতাড়ি চৌরাস্তা পার হইয়া পূর্ব্ব মুখে যেতেছিলাম এই সময়ে পাহারাওয়ালাটা পাছু হতে চীৎকার করতে লাগলো। আমরা শেয়ালদহ

ষ্টেশনে যাচ্ছি বললাম। সে মানবার লোক নহে। আবার চেঁচাতে লাগলো। আমি খাড়া হলাম। সঙ্গীদিগকে চলে যেতে ইশারা করলাম। পাহারাওয়ালা এসে আমার কাঁধ হতে থান কাপড়ের মোটটা নিয়ে দীঘির উত্তরের ঘাটে লণ্ঠনের আলোতে দেখতে লাগলো। তখন আমার পকেটে সোনার চিক ও মর্দ্দানার কথা মনে হলো। মনে করেছিলাম ঐ জিনিষ দুইখানা রাণী ভাবীকে দিব, সঙ্গীদিগকে দেখাব না। তালাসির ভয়ে দৌড়িয়া গিয়া সঙ্গীদের একজনের হাতে তাহা দিলাম। আমি থানের গাঁটরি রেখে পলাচ্ছি বিবেচনায় পাহারাওয়ালা আমার পাছে যেতে ছিল দেখে মতিক ভাল নয় বিবেচনায়—আমি একটু রাগ প্রকাশ করলাম—এবং চীৎকার করে সঙ্গীদের বলাম—ওরে। চাপাতলার থানায় সিউনন্দন সিং পাহারাওয়ালা আমায় মিছিমিছি আটক করে রাখলো বলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে তারে খবর দিয়ে হবে গাড়ি চড়িস্—পেখিস জুলিস না। পাহারাওয়ালা প্রথমে মাল দেখে "এ চোরাই মাল" বলতেছিল। পরে আমার চিৎকার শুনে "তাঁহার নাম আমি কেমন করে জানলাম, এবং কোথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট" বলে জিজ্ঞাসিল। তখন আওয়াজ নরম দেখে আমি কিছু গরম হলাম। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের লোক, তার বরাতে হামেসা কলিকাতায় আসি, কয়েকবার থানার নিকটেই তোমাকে দেখেছিলাম বললাম। বাস্তবিক কিছু পূর্বে জমাদার সিউনন্দন নাম ধরে ডেকেছিল এবং ঐ পাহারাওয়ালাটা দৌড়িয়া গিয়াছিল আমার লক্ষ্য ছিল। "আচ্ছা যাও" বলে সে আমায় ছেড়ে দিল। কলিকাতার পাহারাওয়ালারা ভাল মন্দ লোক চিনতে পারে না; সন্দেহ হয় তো ষ্টেশনে চল, সাহেবের হাতের লেখা জিনিসের তালিকা দেখাব বলিয়া বললাম। পাহারাওয়ালা কিছু বলিল না। আমরা নৈহাটী ষ্টেশনে নামলাম। গঙ্গা পার হওয়ার সময়ে সঙ্গী একজন বলিল—ভাই। তোমাকে পাড়াগেঁয়ে বলেছিলাম—তাহা নিতান্ত ভুল ছিল, বড় তুমি!

আমরা ৫।৭ দিন বাদে কলিকাতায় ফিরিয়া এলাম। এই সময়ে কলিকাতায় পাটগুদামে আগুন লাগার বিষয়ে তদারকের ধুম লেগেছিল। এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমার সন্ধানে অন্য রকম।

সন্ধানে আসল কথা বের করলাম। এক একজন মহাজন পাট দিবে বলে অনেক টাকা দাদন লয়। কতক পাট দিবার পরে গঙ্গার ধারে গাঁইট সকল যখন গুদামজাত হয়, তখন ঐ মহাজন বিশ্বাসী মুনীদের দ্বারা গাঁইট সকলের নিচে কখন মেসলাইর বাক্স, কখন আগুন ধরান টীকা রাখাইয়া দেয়। পাট-পুড়লেই তার বেশ কাটতি। এই বিষয়ের কত প্রমাণসহ পুলিশের একটি বড় অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসল কথা জানালাম, আর বললাম পাটগুদামে জল ঢাললে আগুন নিবিবেনা। মহাজনের গদিতে আগুন লাগালেই চিরদিনের জন্যে এই আগুনের শাস্তি হবে। এই অফিসারটি কিছু ভেদভেদে রকমের লোক বোধ হলো—রোক ছিল না। কয়েকদিন আমার সঙ্গে মহাজনের গদিতে যাতায়াত করলেন। কিন্তু কোনো ফল দেখলাম না। ইহার ৫।৬ দিন বাদে মহাজন আমায় ডেকে কিছু দিলেন। তখন বুঝলাম ঐ বড় পুলিশেরও জঠরাগ্নিরও শান্তি হয়ে গিয়েছে। সুযোগ পেলেই এক চিলের মুখ হতে খাদ্য অন্য চিল কেড়ে লয়। আমার কপালে তাই একবার ঘটেছিল। —অনেক দিনের পরে কলিকাতা হতে বাড়ী যাই। কতকদূর নৌকায় যেতে হয়। নৌকা হতে নেমে যাবার সময় পথে একটি আধা-বয়সী লোকের সঙ্গে দেখা হয়। তার বাম কাঁধে একটি ছোট

গাটরি কোলান। লোকটার কাছ ঘেঁষে গেলে সে একেবারে জড়োসড়ো হয়। মুখ যেন ভয়-মাখানো। জিজ্ঞাসায় জানা গেল দুইজনকে একপথে অনেক দূর যেতে হবে। কথায় কথায় সে কলাবেড়ে জয়নগরের নিকট হইতে আসিতেছে প্রকাশ করিল। সন্ধ্যা হওয়ায় এক চেটিতে থাকা গেল। দোকানের এক ঘরেই দুজনে আড্ডা গাড়লাম। আমি রসুই করলে সে খাবে স্থির হলো। আহারান্তে তাকে একবার সম্মুখে নদীর ঘাটে যেতে হবে ও এক ঘটি জল আনতে হবে।—ঘাটে যাবার সময় সে আপন গাঁটরিটি টানতেছিল দেখে আমি তামাসা করে বললাম - ভয় নাই, তোমার গাঁটরি লয়ে পালাব না। সে "তা নয়, তা নয়"—বলে গাঁটরি ফেলে ঘাটে গেল। মনে বড় সন্দেহ দাঁড়াল। সেটা খুলে দেখি কয়েকখানা কাপড় মধ্যে একটা বড় কৌটা ; কৌটার পাশে সোনার গহনারাদি সজ্জান আছে। কৌটার ভিতরে কি ছিল দেখবার অবকাশ হোলো না। যেমন ছিল তেমনি করে বেঁধে রাখলাম। চোরাই মাল বলে ঠিক হোলো। কতক রাত্রে গরমী বলে আমি সম্মুখে বারান্দায় শুলাম। লোকটার তা ইচ্ছা নয়। সে বারবার জিজ্ঞাসায় আমি বললাম, অধিক রাত্রি নাই ; রাস্তা দিয়ে এখুনি লোকজন যাতায়াত করবে। আমি এক লোকের সন্ধানে আছি ; কলাগেড়ে অঞ্চলে একটা বড় চুরি হয়ে গেছে, অনেক গহনাগাটি চুরি হোয়ে গেছে ; আর পাঁচজন পুলিশ অফিসর আর পাঁচ দিকে গেছে আমি এইদিকে এসেছি। খানিক পরে আমি ঘুমবার ভরুসে চুপ করে থাকলাম। লোকটা উঠে বাহিরে যাবার চেষ্টায় আছে বুঝলাম। সে গাঁটরিটি একবার তুলে একবার ফেলে, শেষে গাঁটরিটি আমার মাথার দিকে ঠেলে দিয়ে আপনি আস্তে আস্তে বেরুলো। বারান্দায় খানিক পা-চালি করে আমার মাথার উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া আস্তে আস্তে গাঁটরিটি নেবার চেষ্টা করল। আমি অমনি স্বপ্ন দেখার মত বলে উঠলাম—"না, না, এতে বড় বিপদ"। লোকটা অমনি গাঁটরিটি রাখল। খানিক পরে আর তার সাড়াশব্দ পেলাম না।

কোন কাজে গেছে আবার আসবে ভেবে আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকলাম ও স্বপ্নে কথা কইতে লাগলাম। সে আর এলো না। বেলা পর্যন্ত খানিক অপেক্ষা করলাম। তার আর দেখা নাই। পথে ধরবো ভেবে গাঁটরি লয়ে রওয়ানা হলাম আর দেখতে পেলাম না। পথে এক স্থানে গাঁটরি ও কৌটা খুলে দেখে চোখ একেবারে ঝলসে গেলো। এক ছড়া মোটা চক্‌চকে চিক ও আর আর গহনা আছে। তখন স্বামী ও রামীকে মনে পড়লো। আবার মনে করলাম কয়েক-খানা কাপড়, আর কতক গহনা খানায় জমা দিয়ে জয়নগর অঞ্চলের পুলিশকে লিখতে ও সন্ধান করতে বলিলে পুলিশের কাছে মান বাড়বে। এতে কোন বিপদ আছে কিনা আবার সে চিন্তারও উদয় হলো। যা হউক বাড়ীতে পৌঁছে যা-যা সঙ্গে এনেছিলাম সবগুলা একবারে স্বামী ও রামীকে দেখালাম না। ইহার পরেই আবার ডাকাইতির কাজ আরম্ভ হলো।

নিজের ঘরখানা বেমেরামত। স্বামীর ঘরেই প্রায় আড্ডা করতে হলো। উহার পুরুষ একদিন কয়েক কথা শক্ত শক্ত শুনায়ে দিল। আমারও রাগ জন্মাল। ইংরাজিতে গালি দিতে দিতে জয়েন্ট সাহেবকে বলে যাতে উহার কর্ম যায় তা করবো বলে ভয় দেখালাম এবং সাহেবের কোর্টে ও কুঠীতে যাতায়াত করতে লাগলাম। স্বামীও বিলক্ষণ ওকালতী করলে। শেষে উহার পুরুষের সঙ্গে রফা হলো আর কোন গোলযোগ হলো না। কিন্তু সাহেবের কুঠীতে যাতায়াত বন্ধ হলো না। সাহেবের

একটা দাঙ্গা বাজ ঘোড়া ছিল, বেড়াতে গিয়ে একদিন ঘোড়া হতে পড়ে সাহেব বেহুঁস হন। আমি তাঁকে পাথুরে কোলা করে প্রায় কুড়ি বিঘা দৌড়ে একবারে ডাক্তর সাহেবের কুঠীতে লয়ে ফেলি। অরেষ্ট সাহেবের নিজের লোকেরা সঙ্গে ছিল না। আমি এই রকম বাহাদুরি না করলে অরেষ্ট সাহেবের বিপদ হতো ডাক্তার সাহেব প্রকাশ করেছিলেন। অরেষ্ট সাহেব ভাল হয়ে আমায় বক্সিস দেন। ক্রমে আমি বাবুর্চির জাদারি লোক বলে প্রকাশ হয়। আমার উপরে সাহেবের ভাল নজর পড়লো এবং আমি নয় খানসামা নয় সেয়াদা এক রকমে বামাবয়ে গোচ হয়ে থাকলাম। এক রাত্রির ডাকাইতিতে আমাদের দলের একজন আহাম্মক গোঁয়ার অথম হয় ও ধরা পড়ে। ডাকাইতি সময়ে বাড়ীর মধ্যে একটা মেয়ে মানুষ ছাগল কাটা খাঁড়া লয়ে দাঁড়ায়। ঐ গোঁয়ার ডাকাইত ঐ মেয়ে মানুষের হাত হতে খাঁড়া কেড়ে লওয়ার চেষ্টা করে। এই সময়ে আর এক যুবা পুরুষ পিছে হতে তাকে এক তলওয়ারের চোট মারে। অন্য ডাকাইতেরা তাকে তুলে আনবার চেষ্টা করেছিল, পারে নাই। ক্রমে সকলে ছত্র ভঙ্গ হয়ে পালায়। আমি প্রায় দুই কোশ দৌড়ে একবারে অরেষ্ট সাহাবের কুঠিতে পৌছি। পূব ধারের এক কুঠারিতে ঢুকে কয়েকখানা টিনের বাসন ভেঙে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালের কান্নিয়ার মত শব্দ করি, আর "সিধড়" "সিধড়" বলে চীৎকার করতে করতে বাহিরে যাই। সাহেবের দুইটা কুকুর মহাশব্দ করে উঠে। মেম সাহেব দক্ষিণের বারাণ্ডায় এসে গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসায় শিয়ালে কি লোকশান করেছে ও তাড়িয়ে দিয়েছি বললাম।—সাহেব আসবে জোরা গোলমাল করোনা বলে মেম সাহেব ভিতরে গেলেন। আমার কাজ সিদ্ধ হইল। তখন রাত প্রায় তিনটা বাজে বাজে হইয়েছিল।

এই মোকদ্দমায় অথমী অন্যান্য সঙ্গে আমার নাম প্রকাশ করেছিল। পরদিন পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে উহার জবানবন্দী লেখবার খানিক পরে ঐ লোকটা মরিয়া যায়। ডাকাইতিতে বেশী মাল যায় নাই। পুলিশ আমাকে লয়ে খানিক টানাটানি করেছিল। ঐ রাত্রিতে আমি অরেষ্ট সাহেবের কুঠীতে হাজীর ছিলাম স্বয়ং সাহেব ও মেম সাহেব আমার সাক্ষী আছেন বলিলাম। এই কথা সত্য কিনা জানবার নিমিত্ত সব ইনস্পেক্টর কুঠীতে যায় এবং মেম সাহেবের বমক খাইয়া সরিয়া পড়ে। আমার গায়ে বিশেষ আঁচ লাগে নাই।

কলিকাতার এক বন্ধুর পত্র পাইয়া নব গ্রামের জওহর মোল্লার সঙ্গে দেখা করতে হয়। জওহর মোল্লা তখন নামজাদা ডাকাইত।

কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর রাত্রি। নদীর উত্তরে রাস্তার পাশে তেঁতুল তলায় সাতজন জোয়ান মুখে মাথায় কাপড় বেঁধে প্রস্তুত। পূর্ব্বদিক, হইতে লাঠি হাতে একটি লোক উহাদের নিকটে এসে সমাচার দিল—৮টার সময়ে দুই জনা বাণিওলা বানপুর ডাকঘর হতে ছেড়েছে, তাদের সঙ্গে তিনজন পাইক থাকবে রাত্রি ১১।২ টার সময়ে এই নদী ঘাট পার হবে, পাইক মধ্যে লোচন তেওয়ারিকে দেখে "কে—তোরা" বলে দিবে পলাবে এই সঙ্কেত, অপর পাইকদিগকে পরীক্ষা করবার সময় হয় নাই। যথা সময়ে বাণিওয়ালারা পৌছিলে লাটলাঠি আরম্ভ হইল। দুইজন সীমানাদার বা পাইক খানিক লড়িল। শেষে উভয়ে অথম হইয়া পড়িল। একজন বাণিওয়ালা বেহুঁস হইয়া পড়িয়া গেল; আর একজন বাণি ফেলে পলাইল। এক পুলের নিকটে কাগজপত্র ফেলে কেবল কাট ও টিনের কেসগুলা লয়ে আমরা পলাইলাম। প্রায় এক ক্রোশ ঘুরে গিয়ে সকলে খানিকক্ষণ বসে বিশ্রাম করা গেল।

কাপড় ও কারপেটের জুতা আদি কতক জিনিস যে যা ইচ্ছা করিল নিল। বাকি সমে ভারি টিনকেস ও বাক্স ছুটি জওহর মোল্লা আপন কাপড়ে বেঁধে নিল, আর বলিল এই বাক্সিমারা সারে বড় ধুমধাম হবে, গোল মিটে গেলে ন'শ ভাগ হবে। একজন বাক্সিওয়ালা লাঠির চোটে মারা পড়েছিল। পুলিশ কিছুদিন তদারক করেছিল, কোন সন্ধান করতে পারিল না। তবু জওহর মোল্লার ওস্তাদ মিটল না। শেষে সে সকলকে ফাঁকি দেখাইল। আমার সঙ্গে কাজিয়া করে তাড়াইয়া দিল। আমার বড় রাগ জন্মিল। এই রাগেই ডিটেকটিভ এসেথার নূতন আসিষ্টাণ্ট বাবুর নিকটে এই ঘটনা এবং অন্য অনেক ডাকাইতির কথা বলিলাম। অনেক দিনের পরে ২৩ জনা আসামীর মত হইল। তাহার মধ্যে জওহর মোল্লার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর চালানের হুকুম হইল।

সেসন আদালতের হুকুমের পরেই আমি আসিষ্টাণ্ট বাবুকে নির্জনে বলিলাম—আর চিন্তা নেই আজ আপনার ভারি ভারি বাক্সি সকলের সন্ধান ও রাঘব মোল্লাকে আবার গাঁথবার যোগাড় হয়েছে নিশ্চয় জানবেন। তিনি আমার কথা ভাল রূপে না বুঝে বলিলেন তবে তুই বেটা বুঝি রাঘবের সঙ্গে যোগ করে বাক্সি সকল তফায়ৎ করেছিস। আমি বললাম তা নয়, জওহর মোল্লা অতি শক্ত লোক। সে আপন পুত্রকেও বিশ্বাস করিত না। যখন এত সন্ধানেও মাল পাওয়া যায় নাই তখন সে যে কোথা রেখেছে তাহা এপর্যন্ত কাকেও বলে নাই এই আমার বিশ্বাস। আর যখন ঘরে ফিরে যাবার সম্ভাবনা নাই, তখন আজ অবশ্য সে রাঘবকে বলে যাবে। আপনি শীঘ্র গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করুন, সেসন আদালতের কোর্ট ঘর হতে কয়েদিদিগকে পাঠাতে হবে পথে রাঘব মোল্লা আপন পিতা সঙ্গে কথা কহিতে চাহিলে জজ সাহেবের এ হাতা মধ্যে বিলাতী গাবগাছের তলায় যেন কথা কইতে দেয়, অন্য স্থানে নয়। রাত্রিতে এত কয়েদি জেলে পাঠান সুবিধা হবে না বলে, পুলিসের অনেক আপত্তি হবে, শুনবেন না বলে বাবুকে সাবধান করলাম এবং গাবগাছ দেখাইয়া দিলাম। রাস্তার উপরেই ঐ গাছ। আমার কথা ঠিক। অন্ধকারে আমি গোপন ভাবে গাবগাছের নীচেকার ডালে মিশাইয়ে পড়ে থাকলাম। জওহর মোল্লার হাতকড়ায় লম্বা রশি বেঁধে হাওলদার ঐ গাছতলায় ছেড়ে দিল, কয়েকজন কনষ্টেবল তফায়তে খাড়া থাকল, অন্য কয়েদিদিগকে খানিক তফায়তে খাড়া করান হইল। জওহর কাঁদিতে কাঁদিতে কয়েক কথা রাঘবকে বলিল, সকল কথা ভালরূপে শুনতে পেলাম না। যা শুনলাম তার মধ্যে নিকাই স্ত্রী, দীঘির উত্তর, জল, বাঁশ রশি আদি কয়েকটা কথা আমার দরকার।

ঐ রাত্রিতে পুলিশ লোকসহ রওনা হলাম। জওহর মোল্লার বাটীর উত্তরে ৮।১০ রশি তফায়তে এক প্রকাণ্ড দীঘি। তাই আশপাশে সকলে থাকলাম। ঐ রাত্রিতে কেহ দীঘিতে আসিল না। উকিলের বাসায় অনেক রাত্রি হওয়ায় রাঘব ঐ রাত্রে আসিতে পারে নাই, পরে সন্ধান পাইলাম। দ্বিতীয় রাত্রি প্রায় দুই প্রহর সময়-এ একটা পুরুষ এবং একটা স্ত্রীলোক আসিল। স্ত্রীলোকটা পূর্বপাড়ের ওপরে খাড়া রহিল। পুরুষটা পূর্ব উত্তর কোণেতে দীঘির জলে নামিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত জলেই থাকিল। শেষে আমাদের লোকের তাড়াতাড়িতে সকল কাজ খারাপ হয়ে গেল। আমাদের পূর্বপাড় হতে দেখিবার চেষ্টা করায় স্ত্রীলোকটা ভয়ে দক্ষিণে পলাইল। পুরুষটাও সতর্ক হয়ে জল হতে উত্তর পাড়ে উঠতেছিল এই সময়ে তাহাকে ধরা হইল। সে রাঘবমোল্লা। তাহার নিকটে কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু কেন রাত্রিতে দীঘির জলে নামিয়াছিল তাহার কারণ বলিল না। তাহাকে তখায় রাখা গেল। পরদিন অন্যান্য বড়বড়

পুলিশ অফিসার আসিয়া জল তদারক করিয়া চারিটা টিনকেস পাওয়া গেল—জলের মধ্যে এক বাঁশের খোঁটায় রসি বাঁধা দেখা গেল—খানিক তফাতে একটা বড় হাঁড়ি পাওয়া গেল। তাহাতে আর কিছু ছিল না। বোধ হইল রাখব জিনিষগুলা ও হাঁড়ি এখানে সেখানে ফেলিয়া দিয়া পাড়ে উঠিতেছিল। অওধরের নিকাই স্ত্রীকে দুই দিন বাদে তাহার ভাইয়ের বাটীতে পাওয়া গেল। তাহার নিকটে বাক্সি ডাকাইতির কোন মাল ছিল বলিয়া সনাক্ত হইল না। অওধর যেরূপ লোক তাহার উপযুক্ত কাজই হইয়াছিল। বানরের কিচ্‌কিচ শব্দের অর্থ বানরই বুঝিতে পারে, তাহা বুঝা পুলিশের কাজ ছিল না।

কিসে কি হয় সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না, তাহাতেই আবার বিচক্ষণের চক্ষু দিবাজ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে।

* * * *

বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস তখন যুবক শিক্ষার্থী মাত্র।

তাঁর শিক্ষকের ইচ্ছা হল এই পার্থিব সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে তাঁকে একটু জ্ঞানদান করবেন। সেই উদ্দেশ্যে একদিন তাঁকে নিয়ে, এক নদীতীরে এলেন, বললেন—দেখ, নদী কত দ্রুত বয়ে চলেছে। একই নদীতে তুমি দু'বার স্নান করতে পার না।

তৎক্ষণাৎ হেরাক্লিটাস বিনীতভাবে উত্তর করলেন, একই নদীতে আমি একবারও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি না। কারণ নির্দিষ্ট নদীতে ঝাঁপ দেবার জন্যে মনস্থির করে যখন সত্যিই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম, তখন—ওই এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ সময় পরে, পূর্বের সেই নদী আর নেই।

জীবনের দুর্গমনীয় বেগ—পরিবর্তন—তার অনিবার্য প্রবাহ ও পরিণতির চিত্র তখনই হেরাক্লিটাসের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

নির্বাসন

হরি প্রসাদ ভৌমিক

প্রিয়নাথের শোকে সমস্ত আকাশটা আজ কাঁদছে। সারারাত জলে ভিজে শ্মশানযাত্রীরা এইমাত্র আধমরা হ'য়ে ঘরে ফিরেছে। সরমা শুনতে পেল, শেয়ালের মতো হরিধ্বনি দিয়ে তারা ঘরে উঠেছে।

গতকাল সন্ধ্যা থেকে এ পাড়ায় কারুর চোখে ঘুম নেই। হাসপাতাল আর বাড়ী। বাড়ী আর হাসপাতাল করতে হয়েছে সারারাত। কী হয় কী হয়? একটা চরম উদ্বিগ্নতার ভেতর দিয়ে সারটা রাত কেটেছে, তারপর ভোরবেলার দিকে অবস্থাটা একটু ভালোর দিকে গিয়েছিল। নাকি নাড়ীর স্পন্দনও বেশ বোঝা যাচ্ছিল। তখন ঘরে মানুষে একটি ইতস্তত ধস্তাধস্তি সুরু হ'ল। অকস্মাৎ যমরাজের জয়—অসহায় মানুষের পরাজয়।

আর দশজন আত্মহত্যাকারী মৃত মানুষের মতো প্রিয়নাথের দেহও খণ্ড বিখণ্ড ক'রে কাটা হ'ল। অভিজ্ঞ ডাক্তার প্রয়োজনীয় তথ্য গুছিয়ে রাখলেন। প্রিয়নাথের শবদেহ পেতে আত্মীয়স্বজনের অনেক তোগান্তি পোহাতে হয়েছিল। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। বেতার বার্তার মতো এ সব খবর বাতাসে উড়ে এসে সরমার কানে লেগেছে। প্রিয়নাথের খবরাখবর এ পাড়ায় সবার মুখে মুখে।

'—আহা ছেলেতো নয় যেন একখণ্ড রত্ন।' এই ধরণের অনুরক্ত আবেগোচ্ছ্বাসবাক্যে সারা পাড়া প্রিয়নাথের শোকগাথায় মুখর হ'য়ে উঠল। সরমা লক্ষ্য করল, মৃত্যুর পর কত সহজভাবে মানুষ মহামানবের পর্যায়ে উঠে যেতে পারে।

—ছি, ছি। সরমা মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল।

"—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।"—যদি এই কথার পরিবর্তে প্রিয়নাথ অন্যকিছু লিখে যেতো তা'হলে আর কেলেঙ্কারীর শেষ ছিল না। হয়তো শেষ পর্যন্ত আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের সততা প্রমাণ করবার প্রয়োজন হ'তো সরমার। কী লজ্জা—কী লজ্জা! অতএব সরমা স্বীকার করল, প্রিয়নাথ মহৎ—প্রিয়নাথ পরোপকারী।

আজ নয় কাল প্রিয়নাথের মৃত্যু রহস্য ফাঁস হবেই। কেউ যদি একদিন জোর ক'রে সরমাকে চেপে ধরে বলে, তুমি জান প্রিয়নাথের মৃত্যুর কারণ। সরমা, লুকালে চলবে না। তোমাকে বলতেই হবে।

অন্ধকারে সমস্ত অস্তিত্বে কতবিক্ষত হতে লাগল সরমা। প্রিয়নাথের প্রেতাত্মা ওকে ভয় করল নাকি? গাটা যেন ছমছম্ করছে। সুইচ টিপে আলো জ্বালতে ইচ্ছা হচ্ছিল সরমার।

অথবা কেউ যদি কোনদিন বলে বসে, প্রিয়নাথ তোমাকে ভালবাসতো। একটি তীব্র চরিত্রের মেয়েকে ভালোবাসার পরিণতি প্রিয়নাথের মৃত্যু।

—ভালোবাসা! হঠাৎ স্বগতস্বরে ফিসফিস করে ওঠল সরমা। বাদাম চানাচুরের মতো এ যুগে স্বচ্ছন্দ ভালোবাসা কিনতে পাওয়া যায়। প্রিয়নাথ অন্তত তাই মনে করতো।

টুপটাপ জল পড়ছে। রাস্তার লাইট পোষ্টটা ঝাপসা দেখাচ্ছে। সরমার চোখের ওপর প্রিয়নাথের উত্তপ্ত সান্নিধ্যের এক টুকরো স্মৃতি ভেসে উঠল।

—কে?

—আমি প্রিয়নাথ।

—এসো। দরজা খোলাই আছে।

তখনি রঙীন পর্দার আড়ালে প্রিয়নাথের উজ্জ্বল মুখ উঁকি মারল।—রমা, হিয়ার ইজ এ গুড্ নিউজ ফর ইউ।

দেয়ালে টাঙানো দর্পণে শেষবারের মতো নিজেকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দেখে নিচ্ছিল সরমা। প্রিয়নাথের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে হঠাৎ সে চমকে উঠল।

প্রিয়নাথ ছ'পা এগিয়ে এসে টাইপ করা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা এগিয়ে ধরল। প্রিয়নাথের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়তে পড়তে সরমার মুখ সূর্যরশ্মির মতো চক্‌চক্ ক'রে উঠল।

—আমরা একথাপ এগোলাম। প্রিয়নাথ অর্ধস্ফুটকণ্ঠে বলল। সরমার চোখের ওপর চোখ রেখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

—কী আশ্চর্য! তোমার যে কেন হ'ল না ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এই মুহূর্তে অজুহাত কথা খুঁজে না পেয়ে সরমা এই কথা বলল।

প্রিয়নাথ হাসতে হাসতে বলল,—ইন্টারভিউ দিয়েই তো তোমায় বলেছিলাম—আমার নো হোপ, নো চান্স!

—সেবার তো বি. এ পরীক্ষা দিয়েও তাই বলেছিলে। অথচ শেষ পর্যন্ত আমার চেয়েও ভাল রেজাল্ট করেছ।

প্রিয়নাথ গম্ভীর হয়ে বলল,—আমার দুর্ভাগ্য!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সরমা প্রিয়নাথের হাত ধরে বলল,—চল, আজকে তোমায় কিছু খাইয়ে দেব।

—কেন? চাকরী হয়েছে বলে?

—ছি, ছি। আজকাল তুমি বড় নোংরা হ'য়ে যাচ্ছ প্রিয়নাথ।

—হলেই বা। দোষ কি? প্রিয়নাথ হো হো ক'রে হেসে উঠল।

রাস্তার পা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ হাঁটল। এখান থেকে বাসস্টাণ্ড মিনিট সাত আটেকের পথ। চলতে চলতে হঠাৎ প্রিয়নাথ জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে থমকে দাঁড়াল। বলল,—রমা, চলনা এক কাজ করা যাক।

—কি! সরমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রিয়নাথের মুখের দিকে তাকাল।

—চল, একটা শোকসভা করা যাক। প্রিয়নাথ হাত পা নাড়তে লাগল।

—কেন! সরমা বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

প্রিয়নাথ কণ্ঠস্বরে ভাঁজ মিশিয়ে বলতে লাগল,—তোমার আদিম যাযাবর জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। দু'দিন পরেই তুমি শৃংখল পরছ। আই মিন একটা গুড্‌গার্লের মতো কলম ধরছ। নিজস্ব

সভা বলে কিছু থাকছে না। ব্যক্তিত্ব বলে বস্তু বড় সাহেবের বচন চাবুকে পদদলিত হবে। সরকারী অফিসের বাইরেও যে একটা জগৎ আছে সে কথা মনেই থাকবে না। এমন নৈতিক অবনমনের আগে একটা শোকসভার আয়োজন করা অবশ্যই উচিত নয় কি—?

সরমা বুঝতে পারছে—প্রিয়নাথ আরও কিছু বলবে। অবশ্যের কথা ওঠাবে। বিংশ শতাব্দীর ভোলো সভ্যতার বিরুদ্ধে অনেকগুলি চোখা চোখা বাণ নিজের তূণ থেকে ছুঁড়ে মারবে। কণ্ঠস্বর আরও উপরে তুলে রাস্তায় ভিড় জমিয়ে ফেলবে। অন্তত এই ধরণের কিছু অভিজ্ঞতা আগেও সঞ্চয় করেছে সরমা। আমি যা বোঝাতে চাই তোমাকে বুঝতেই হবে। কেউ বুঝতে না চাইলেও প্রিয়নাথ তাকে বোঝাতেই থাকে। সুতরাং কৌশলে ওকে ঠেকিয়ে দেওয়া দরকার।

সরমা প্রিয়নাথের একটা সঞ্চালিত হাত ধরে বলল,—তোমার প্রস্তাব নিঃসন্দেহে লোভনীয়। কিন্তু সময়ও কি জান,—দু'জনে মিলে তো আর শোকসভা করা যায় না।

প্রিয়নাথ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তখনি সরমা তার হাত শক্ত করে, ধরে বলল,—প্লিজ আমাকে একটু বলতে দাও—

প্রিয়নাথ মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা, বল—

—এতদিনের স্বাধীন জীবনে শিকল পড়তে যাচ্ছি। অত্যন্ত মর্মান্তিক। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জান—স্বাধীন জীবনে যাদের যাদের সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছি তাদের সবাইকে যে দরকার—তুমি না হয় বুঝলাম, অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবে—দু'একজন ভালো বক্তারও যে দরকার।

—সেজন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রিয়নাথ অস্বাভাবিক উৎসাহ দেখিয়ে বলল।

সরমা মুচকে হেসে বলল,—কিন্তু সময় বড় কম। অতএব নাস্ত পন্থাঃ।

একটা নতুন প্রস্তাবে প্রিয়নাথ বুঝি হেরে হেরে যাচ্ছিল। সুতরাং বাসস্টাণ্ডে পৌঁছে প্রিয়নাথ আবার সরমার কথার প্রতিবাদ করতে লাগল।

সরমা বলল,—চল, চৌরঙ্গীর দিকে একটা রেস্টুরেন্ট বসে গল্প করব।

প্রিয়নাথ সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলল,—নো, নেভার। চৌরঙ্গী পাড়াটা একটু বুর্জোয়া বুর্জোয়া গোছের।—তার চেয়ে কার্জন পার্ক-এ গিয়ে বসব চল। দু'একটা মিছিলের স্লোগানও শুনতে পাব। প্রেমালাপও জমবে ভালো।

সরমা মুখ টিপে হেসে বলল,—তোমার মুখে প্রেমালাপ কথাটা অপূর্ব শোনাচ্ছে। প্লিজ, আবার বল প্রিয়নাথ।

সরমা প্রিয়নাথের হাত ধরে শিশুর মতো আবদার করতে লাগলো।

প্রিয়নাথ বিরক্ত হ'য়ে বলল,—কী ছেলেমানুষী করছ?

সরমা কপট অভিমানে মুখ ভার করে বলল,—আমরা বুঝি বুড়ো হ'য়ে গেছি! আসলে প্রেম-প্রীতির কথা উঠলে তুমি ঠিক সহ্য করতে পার না।

—প্রেম! প্রিয়নাথের কণ্ঠস্বর ছলকে উঠল।—মানুষের আদিম আকর্ষণের একটা জন্তুগোছের পরিভাষা হচ্ছে প্রেম।

সরমা বেশ বুঝতে পারল আলোচনা জটিলতার দিকে যাচ্ছে। অতএব চুপ করে থাকতে হবে। আর সরমা একথা জানে যে বোবার শত্রু নেই।

ওরা বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে এগোতে লাগল। অনেক ভীড় অতিক্রম করে বাসে উঠে সরমা বসে পড়ল। সরমার পাশে জায়গা ছিল। ইচ্ছা করলে প্রিয়নাথ বসতে পারতো। কিন্তু বসল না। নিরাপত্তাহীন উত্তপ্ত সাহচর্য প্রিয়নাথ কোনদিন পছন্দ করে না। যে কোন মুহূর্তে কেউ বলে ওঠবে, দাদু, সীটটা ছাড়ুন। ওটা লেডিজ সীট।

এই সুযোগে চিড়িয়াখানার জন্তুর মতো কেউ একবার প্রিয়নাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে সে বড় অসহায় বোধ করবে। রাগে দুঃখে প্রিয়নাথের সর্বশরীর বাসের ইঞ্জিনের মতো ঘর্ঘর করে কাঁপবে। তার চেয়ে এই ভালো—সোনালী রঙ ধরে বার্দ্ধক্য অন্তপ্রাপ্তির রিহার্সাল দেওয়া।

—টিকিট? কন্ডাকটর ভিতর থেকে হাত বাড়াল।

প্রিয়নাথ চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করল। ইচ্ছা করেই টিকিট কিনল না। গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে তার কোন কৌতূহল নেই। সরমা যেখানে খুসি সেখানে নিয়ে যাক প্রিয়নাথকে। সরমারই হোক জয়। প্রিয়নাথ আঙুলের ইঙ্গিতে সরমাকে দেখিয়ে দিল।

সরমা বাধ্য হয়ে এক্সপ্রেসের দু'খানা টিকিট কাটল।

বাস থেকে নেমে মনুমেন্টের পাশ দিয়ে ওরা নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল। কেউ কোন কথা বলল না। অথচ এতক্ষণ চুপ ক'রে থাকা সরমার রুচিবিরুদ্ধ।

—তোমার সঙ্গে দেখছি কোনদিন আমার ঘর পাতানো সম্ভব হবে না। সরমা মুচকে হেসে বলল।

—বাইবা হল মিলন মোদের! প্রিয়নাথ টেনে টেনে বলল।—পরিচয় থাকলেই ঘর বাঁধতে হবে—এ তোমার কেমন ধারণা রমা?

—যাযাবরের মতো আর কদ্দিন চলবে?

—যতদিন চলে চলুক না। বেশতো লাগছে।

একটা বড় পাকুড় গাছের তলায় এসে ওরা থামল। বিকালের পড়ন্ত রোদ গাছের আগায় শেষ আসর জমিয়েছে। সরমার মুখ এক টুকরো সোনার মতো রোদ্দুরে পড়ে চক্‌চক্ করছে। অন্য কোথাও বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল প্রিয়নাথ। হঠাৎ খামোয়ারী সেটার বন্ধ খুলে সরমার নামে সরকারী স্ট্যাম্পযুক্ত খাম দেখেই প্রিয়নাথ ছোঁ মেরে টেনে নিল। খুলে পড়ল। পড়ে, বিস্মিত হল। তারপর পুতুলের মতো নাকাতে নাকাতে সরমার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। হয়তো অন্য কোথাও বেরুবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল সরমা। এতবড় শুভ সংবাদটা দেওয়ার পর লজ্জায় খাতিয়ে সেকথা প্রিয়নাথের কাছে স্বীকার করা সম্ভব হয়নি। এই প্রসঙ্গ ভাবতে ভারী বিশ্রী লাগছে।

দুর্বাঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিল ওরা। সরমা রুমাল বার করে মুখ মুছল। আস্তে আস্তে বলল,—যাই বলো, এবার কিন্তু তোমাকে চেষ্টা করতেই হবে। তোমার কিছু যোগাড় না হলে আমি যেন ঠিক বল পাচ্ছি না।

—চেষ্টা কি আর কম করছি? প্রিয়নাথের কণ্ঠস্বর থেকে ব্যথার সুর বেরিয়ে এল।

—তোমাকে আরও সিরিয়াস হতে হবে। যাবতীয় জটিল তথ্য একটু কম ভাবতে হবে। যত বেশী ভাববে সমস্যা তত সমুদ্র ঢেউয়ের মতো উথলে ওঠবে। কোনদিন সমাধান করতে পারবে না।

প্রিয়নাথের আপাদমস্তক হঠাৎ ঝিম্ মেরে উঠল। হয়তো তাই হবে। বিংশ শতকের

অবক্ষয়, অধঃপতন, অবনমন—এই সম্বন্ধে রাতদিন ভেবে ভেবেও কূল কিনারা করতে পারছে না প্রিয়নাথ। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বাস—এই শব্দগুলি যেন আজকাল একটা কথার কথা হয়ে গেছে।—জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্ত সরকার হয়তো খুব কঠিন আইন পাশ করতে বাধ্য হবে। অথচ এই কোটি কোটি জনসংখ্যার মধ্যে চন্দ্র সূর্যের মতো সৎ লোকের সংখ্যা হাতের আঙুলে গোনা যাবে। দুর্নীতির ঝাপটে সমাজ জীবন আজ বিপর্যস্ত। শঠতা আর বঞ্চনার নতুন দিগন্তরী আবিষ্কার ক'রে দু'কলম লিখতে পারলেই টাকার একটা মোটা অংক নিয়ে ঘরে ওঠা যায়। সাহিত্যের নামে চলেছে, রুচিহীন কদর্য বুলি কপচানো। রাজনীতির নামে চলেছে, মহাত্মা আর মার্ক্সের বিভিন্ন শাখার ন্যায় মারামারি, সমাজ সেবার নামে চলেছে আপত্তিকর কাজকর্ম। যেদিকে তাকাও—নকল সোনার চকমকি চোখ ধাঁধিয়ে ফেলবে। তবুও জৌলুস বজায় রাখবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে। যে কোন সন্ধির বিনিময়ে যে কোন সর্তের বিনিময়ে কেবল বেঁচে থাকতে চাওয়াই আমাদের এই যন্ত্রণা যুগের চরম অভিশাপ। আজ আর এতটুকু অস্বীকার করবার উপায় নেই—এই ঘুণ ধরণার হাপরের মুখে পড়ে প্রিয়নাথ জলন্ত লৌহপিণ্ডের মতো কেবল রক্ত হচ্ছে, পুড়ে পুড়ে মরছে। প্রিয়নাথ জানে, কামার শালে লাল লৌহপিণ্ড থেকেই শাণিত বল্লম তৈরী হয়, বর্শা তৈরী হয়, বরশা তৈরী হয়। মাঝে মাঝে দু'দণ্ড চুপ ক'রে বসে থেকে কোন এক অদৃশ্য কামারের অপেক্ষায় প্রিয়নাথ দিন গোনে। ভাবে একদিন সেই তেজোদীপ্ত পুরুষের নৈপথ্য সংকেত লাভ করে ধন্ত হব। প্রতিজ্ঞা করতে ইচ্ছা করে প্রিয়নাথের!—হে ঈশ্বর, আমার হৃদয় মন্দিরে তোমার উপস্থিতির জন্ত আমি সমস্ত কাল আরাধনা করব। আমি শবরীর মতো দীর্ঘদিন অপেক্ষা করব।

—ঈশ্বর! হঠাৎ হেসে উঠল প্রিয়নাথ।

সরমা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল,—হাসছ যে?

—আচ্ছা রমা, আন্তরিক অগ্রগতির পরও আমরা ঈশ্বরকে স্বীকার করব?

উত্তরটা কী দেওয়া উচিত সরমা ঠিক ক'রে উঠতে পারল না। সুতরাং সে চুপ করে রিল—প্রিয়নাথের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করেই থাকল।

প্রিয়নাথ বলে চলল—মানুষ মহাশূন্তে থেকে ঘুরে আসছে। উষর মরুভূমি শস্তশ্যামলা হচ্ছে। ভূমার প্রান্তরে জনবহুল উপনিবেশ গড়ে উঠছে। আকাশে ইথারং উঠছে—পাতালে মানুষ নামছে। তারপরও আমরা অন্ধ বিশ্বাস করে বসে থাকব রমা?

প্রিয়নাথ সরমার হাত ধরে কাঁকুনি দিল। তীব্র উত্তেজনার তীব্র আক্ষেপে প্রিয়নাথের কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল।

সরমা আস্তে আস্তে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে বলল—তোমার এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

প্রিয়নাথ এবার সংযত কণ্ঠে বলল,—অথচ দেখ, স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটি কতরকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে দেশে। তারা তোমাকে শেখাবে!—কি শেখাবে বলতো? বোধ জিনিষটি না এলে কেউ কি কাউকে দিতে পারে?

সরমা সরব হ'তে চেষ্টা করল। বলল,—সাহায্যতো করতে পারে।

প্রিয়নাথ সমর্থন সূচক মাথা নাড়ল। তর্জনী উঁচু করে বলল,—ঠিক তাই। পৃথিবীতে কেউ শিক্ষক নন। সবাই সাহায্যকারী। কী লজ্জা রমা, এই সহজ সত্যটা কেউ স্বীকার করবে না।

সরমা প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্ত উঠে পড়ে লাগল। বলল,—আমার অনুরোধটা তা'হলে তুমি রাখবে না।

—নিশ্চয়ই রাখব। তুমি মনে করো না আমি একটা বদ্ধ উন্মাদ। তোমার কথাটা আমার লক্ষ্য আছে। চাকরী একটা আমাকে অবশ্যই যোগাড় করতে হবে।

সরমা এই উত্তপ্ত পরিবেশকে হালকা করবার জন্ত কৌতুকের সুরে বলল, তোমার এই সাধু মনোভাবের জন্ত অশেষ ধন্যবাদ।

এস্‌প্লানেডের দিকে কলকাতা জাগছে—কলকাতা মিতছে। প্রিয়নাথ রঙীন আলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সরমা প্রিয়নাথের হাত ধরে বলল,—চল, রাত হয়েছে।

প্রিয়নাথ ঘাসের ওপর থেকে পা টেনে তুলে বলল,—জান রমা, মাঝে মাঝে মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাব।

সরমা আর কথা বাড়াল না। সন্ধ্যার পর কুয়াশা সিক্ত দুর্বাঘাসের ওপর পা চালিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল।

দিন কাটছিল—এবং দিন কাটতে লাগল।

প্রিয়নাথ আস্তে আস্তে মাকড়সার জালের মতো চারদিকে দুর্লঙ্ঘ্য আবরণে আটকা পড়তে লাগল। অসম্ভব রকমের জটিলতায় জড়িয়ে যেতে লাগল। প্রিয়নাথের মন দিন দিন কঠিন হল, কঠোর হ'ল কর্কশ হল। রূঢ় বাস্তবের তীক্ষ্ণ হাতুড়ীর আঘাতে প্রিয়নাথের আত্মচিন্তা নিজেকে প্রতিমুহূর্তে ক্ষত বিক্ষত করে তুলল। অন্ত দশজনের মতো একটা সংসার জুটিয়ে গতানুগতিক ধারায় জীবন যাপনের প্রতি প্রিয়নাথের চরম আপত্তি দেখা যেতে লাগল। কখনো দার্শনিক প্রভাবে, কখনো সাম্যবাদী প্রভাবে, কখনো মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে সিক্ত হয়ে প্রিয়নাথ করুণ হল, ক্লান্ত হ'ল, ক্লিষ্ট হল। সরমার নারীত্বের মাদক প্রভাব এড়িয়ে চলবার জন্ত বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠল প্রিয়নাথ।

মৌসুমী মেঘের মতো ভাসতে ভাসতে এক টুকরো নীল আকাশের নীচে বসে দু'দিন বাইরে কোথাও কাটিয়ে এল প্রিয়নাথ। বাতাসের সোহাগ চুম্বনে সবুজ ধানগাছের খেলা দেখল। শালিকের ঘুমন্ত পাখায় দিনান্তের সূর্যরশ্মি মিলিয়ে যাবার দৃশ্য দেখল। গরুর খুরে ধুলো উড়ে যাচ্ছিল। রাখালদের কংকাল দেহ দেখে প্রিয়নাথের মায়া হ'ল। আহা, শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুরা আজ সর্বহারা। কালকের রাজা আজ ফকির। আমি, তুমি এই গ্রহ—সব অনিত্য।—হঠাৎ প্রিয়নাথের মনে হল সরমার নিকটতম সান্নিধ্যও তাই। ফুরফুরে বাতাসে প্রিয়নাথের বাউল মন গান ধরল, "আমার যেমন বেশী তেমনি রবে চুল ভিজাব না।"

—প্রিয়নাথ জীবনটা ছেলে খেলা নয়।

সরমা প্রিয়নাথের যুক্তির বিরুদ্ধে শাণিত যুক্তি দাঁড় করাতে চেষ্টা করল।

—রমা, একটা বিশেষ বোধের নাম জীবন।

—কী তোমার সেই বিশেষ বোধ? যা মানবতার পরোয়া করে না; স্নেহ মায়া প্রেম প্রীতির ধার ধারে না?

সরমা চেঁচিয়ে উঠল।

—প্লিজ আমাকে ভুল বুঝো না রমা! মুক্ত বিহঙ্গকে আমি কোনদিন খাঁচায় বন্ধ করতে পারব না। প্রিয়নাথের কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে এল। শঙ্খচিলের ডাকের মতো ভেঙে যাচ্ছিল।

—কি দরকার ছিল এতদিন এই প্রতারণা করবার? সরমা বিষাদে ভেঙ্গে পড়ল, টুকরো টুকরো হল।

—আমায় ক্ষমা কর রমা। আদর্শ স্বামীত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে আমি কোনদিন পারব না।

বাধ্য হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে সরমা একদিন পালিয়ে এল। অভিভাবকদের কাছে এতদিনের একটি অবাধ্য মেয়ে সবিনয়ে এসে আত্ম-সমর্পণ করল। একদিন ওরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিল। অনেক চিঠি এল। যে ছেলেটি সরমাকে প্রথম দেখতে এল—তার সঙ্গেই কথাবার্তা ঠিকঠাক হতে লাগল। ফুল বাগানে বিভিন্ন যৌসুমী ফুলের সমারোহ করতে ভালো লাগল সরমার। ভালো লাগল নববধূর একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে নিজের মতো করে নিতে। সাড়ি, ব্লাউজ আর গয়নায় নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলল। স্নো, পাউডার লিপস্টিকের ব্যবহারে সরমা উজ্জ্বল হল। মোটকথা প্রিয়নাথের আপাত বিরোধী স্পর্শের প্রভাব থেকে বাঁচতে হ'লে যতকিছু করবার তাতে নিয়তম ফাঁকও রাখল না সরমা। প্রিয়নাথকে ঘৃণা করে সরমা মহৎ হ'তে চাইল।

হঠাৎ একদিন লোভনীয় পোশাকে সজ্জিত সরমাকে আবিষ্কার করল প্রিয়নাথ। আভিজাত্যের উগ্র গন্ধে সরমার সর্ব শরীর মহুয়া ফুলের মতো ভুর ভুর করছে। কুমারী মেয়ের টিয়া পাখীর মতো রঙীন ঠোঁট দেখে এতদিন পরে প্রিয়নাথ লুব্ধ হ'ল। বিবিধ বিন্যাসে রচিত কবরী দেখে মুগ্ধ হল। পরিপাটি দেহ দেখে স্নিগ্ধ হল।

ইদানীং প্রিয়নাথকে দেখলে সরমা পাশ কাটিয়ে যায়। আজও তাই করতে চাইল সরমা। প্রিয়নাথ বৃহৎ প্রাচীরের মতো এসে সরমার পথ আগলে দাঁড়াল।

—রমা আমি ভালো হতে চেষ্টা করছি। তুমি পিছিয়ে এসো। আমি মৃত্যু পথযাত্রী। আমাকে বাঁচাও।

তীব্র শ্লেষে, তীব্র জীবনাসোয়, তীব্র ক্রোধে সরমা লিপস্টিক রঞ্জিত অধর দংশন ক'রে বলল,—আই ওয়ান্ট ডাই। তাই চাই আমি। তুমি মরলেই আমি সত্যকারের সুখীহব। গুডবাই।

সরমা হন হন করে প্রিয়নাথের কথাগুলি দিলতোলা জুতোর তলায় থেঁতলে থেঁতলে চলে গেল।

সারারাত অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল সরমা। উঠতে একটু দেরী হয়েছে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে সরমা ভাবল আদালতে গিয়ে স্বেচ্ছায় কারাদণ্ড গ্রহণ করব। কিন্তু তখন আবার আইনের মারপ্যাচ সুরু হবে। একটি অন্ধকার পরিচ্ছদকে বেশ মুখরোচক ভাবে আলোচনা করবে সবাই। প্রিয়নাথের মতো আত্মহনন এবং মৃত্যুর স্নেহাক্ত সমাপ্তি কোনদিন মেনে নেবে না সরমা।

—বিয়ে! পাগলের মতো হেসে উঠল সরমা।—নৈব নৈব চ।

—আমি বাঁচতে চাই। আমি বাঁচব।

হঠাৎ মনে পড়ল বাঁচার অস্ত্র সরমার নিজের হাতেই আছে এখন। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হল সরমা। অন্যদিনের মতো বেশ সেজেগুজে অফিসে গেল। অফিস থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে মধ্যপ্রাচ্যে বদলীর আদেশটা পুনরায় মঞ্জুর করিয়ে নিল।

—মন চল নিজ নিকেতনে। অনেক দিনের এই পরিচিত সহরের সান্নিধ্যে ছেড়ে সরমা বাইরে বেরুল। ময়না টিয়া, হরিয়াল এবং অনেকগুলি অর্ধপরিচিত পাখীর কণ্ঠস্বরে সরমা সুর খুঁজে পেল। একক জীবনের স্বপক্ষে, স্বাধীন জীবনের স্বপক্ষে স্বতন্ত্র জীবনের স্বপক্ষে, সরমা প্রিয়নাথের মতোই বক্তৃতা করতে পারছে এখন।

প্রতিশ্রুতি

লেখা বড়ুয়া

শ্রীচরণকমলেষু

বাবা,

নানা কারণে বহুদিন হইল তোমাকে পত্র দিতে পারি নাই। তুমি ত' জানো চিঠি লিখিবার হুকুম আমার নাই। এবার অনেক কান্নাকাটি করিয়া এই চিঠিখানি লিখিতে পারিলাম। সারাদিন ঘোষের মত খাটুনী আর অমানুষিক নির্যাতন আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। ভগবান জানেন কি ভাবে আমার দিন কাটিতেছে। বিবাহের সময় তুমি বারোমাসের বারটি দিতে পারো নাই। তুমি বলিয়াছিলে পরে দিবে। আমি জানি দেওয়া তোমার পক্ষে কত দুঃসাধ্য। কিন্তু তবু লিখিতেছি, এই হারের জন্য আমার কি যন্ত্রণা না দেখিলে বুঝিবে না। এতদিন তোমাকে জানাই নাই বাক্যযন্ত্রণা ছাড়া শারীরিকও আমাকে নিয়ত সহ্য করিতে হইতেছে। শাশুড়ী আর বিধবা ননদ যৎপরোনাস্তি করে। তোমার জামাইএরও ইহাতে সমর্থন আছে। তুমি আমাকে জোর করিয়া ভূমুরখালি হইতে না লইয়া আসিলে মামারা এত রাগ করিত না। তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইতে পারিতে। সবই আমার কপালের দোষ। আমার সারা গায়ে মারের চিহ্ন দেখিলে তুমি বুঝিতে যে আমার বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা ফুরাইয়া গিয়াছে। শাশুড়ী বলিয়াছে এই চিঠি পাইবার সাতদিনের মধ্যে যদি হার না আসে তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকার সাধ মিটাইয়া দিবে। হার যদি না আসে তাহা হইলে বিড়কীর পুকুরে ডুবিয়া মরা ছাড়া আমার আর গতি নাই। মনে মনে এই স্থির রাখিয়াছি। আর অধিক কি লিখিব। এই হয়ত তোমার নিকট আমার শেষ চিঠি। মাকে আমার প্রণাম দিও। পুটু, বাবুল, সন্তু আর বিনিকে স্নেহাশীর্বাদ দিও। তুমি আমার প্রণাম নিও। ইতি—

হতভাগিনী—টুলু

ঠিক স্প্রিংএর মত লাফ দিয়ে তক্তপোষের ওপর উঠে বসল অনিল। উঁচু হাঁটুটার ওপর আর এক পায়ের গোছটা তুলে দিয়ে আড় হয়ে শুয়ে চিঠিটা পড়ছিল ও। পা নাচানোটা অনেকক্ষণই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দ্রুত চোখ চিঠির শেষেদিকে চলে এলো। টুলু—মাথাটা যেন একদম ভোঁতা হয়ে গেছে। টুলু, টুলু—অর্থহীন নামটাই বারে বারে উচ্চারণ করে চলেছে অনিল। তারিখ? তারিখ নেই চিঠিতে। চিঠিটা উল্টে ধরল অনিল। নতুন ইনল্যাণ্ড লেটারটার ওপর ছ' তারিখের ছাপ আছে হাটখোলা পোস্ট অফিসের, পরিষ্কার পড়া যায়। আজ কত তারিখ? দেওয়ালে ঝোলানো নীলমকুমারীর ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডারটার দিকে চায় অনিল। ক্যালেণ্ডারটা ও এনেছিল ছবিটার জন্যে, না হলে তারিখের বিশেষ দরকার করে না ওর। ক্যালেণ্ডার ত' মানুষ রাখে ছুটির দিন আর মাইনের তারিখ জানবার জন্যে। এ দুটো অবশ্য ওরও জানা দরকার। তার জন্যে ক্যালেণ্ডার ওর দরকার হয় না।

উঠে গিয়ে টান মেরে ওপরের দু তিনটে পাতা মুঠো করে ছিঁড়ে ফেলে অনিল। এটা মার্চ মাস। কত তারিখ আজ? তারিখগুলোর ওপর আঙুল বুলিয়ে চলে ও। হাঁ—পেয়েছে, আজ

এসারো, বুধবার। পাঁচদিন হয়ে গেছে—আর দুদিন পরে খিড়কীর পুকুরের হাতছানি দুর্বার হয়ে উঠবে তার হাত থেকে কে বাঁচাবে টুলুকে? দুমুরখালির টুলু, যে মানুষ হয়েছিল মামাবাড়ীতে, মামাদের সঙ্গে ঝগড়া করে যার বাপ নিয়ে চলে গিয়েছিল কলকাতায়।

মামারা প্রতিজ্ঞা করেছিল অমন নেমকহারামের মুখ দেখবে না। প্রতিজ্ঞা রেখেছিলও। টুলুর বিয়েতে মামাবাড়ীর কাক পক্ষীটিও আসেনি।

মামাদের সংসারে মেয়ে ছিল না। তিন মামার ওপে গেঁথে সাতটি ছেলে। টুলুর বাপের চাকরী ছোটর চেয়েও ছোট। কলকাতায় পায়রার খুপরীর ভাড়া মিটিয়ে স্বামীস্ত্রী বাদে আরও পাঁচটি ছোট ছোট শরীরের আচ্ছাদন আর আরও ছোট ছোট পাঁচটি পেটের খোরাক জোটানোর সাধ্য ছিল না তার। মামারা আদর করে টুলুকে ডেকে নিল। বলল, অন্য আর চারটিকে তুমি মানুষ কর যেমন সাধ্য। এটির কথা তোমায় ভাবতে হবে না, এর সব কিছু দায় আমরা নিলাম। ফ্রক পরা ছোট্ট টুলু এলো মামীদের দরবারে। বড়মামী মেজমামী খুসী, খালি ছোটমামীর মুখ ভার হল। খাওয়াও খাওয়াও ভাল কথা, কিন্তু বিয়ের দায় শুদ্ধ কেন ঘাড়ে নেওয়া বাবু! সেত এককাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ—আধিখ্যেতা আর কি! ছোটমামীর মনটাও ছোট, আপনারটি বেশী বোঝে। তবু এর মধ্যে বেশ খাপ খেয়ে গেল টুলু। দুমুরখালি গ্রাম নয় জংশন স্টেশন। মেয়ে স্কুলও রয়েছে একটা। মামাবাড়ীর আদরে খেয়ে-দেয়ে গোলগাল শরীরে খাটো মোটা বিনুনী দুলিয়ে স্কুলে গেল টুলু।

তেরো বছরে ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরল ও। এত কলকাতা নয়, জংশন স্টেশনের হিসেবে ঢের বয়েস হয়েছিল ওর। বুকের কাছে বইএর মোহা চেপে পেন্সিল হাতে ক্লাস এইটের ছাত্রী। রোজ স্কুলে যায়! পিঠের ওপর তার লম্বা বিনুনী, কখনও বা খোলা চুলের মোড়ায় সযত্নে ফিতের ফাঁস। পরণে কখনও নীল ধনেখালি, কোনদিন সন্ধ্যাযমুনা ডুরে আবার আবার কোন সময়ে বাসন্তী রংএর বেনারসী। বাসন্তী রংটাই আবার ইদানীং বেশী পরে টুলু। ওতেই নাকি ওকে সবচেয়ে বেশী মানায়। বলেছে অবশ্য রন্টুদা।

রাস্তার মোড়ে ঠিক সওয়া দশটায় রোজই দেখা যাবে রন্টুদাকে। চক্রবর্তীদের বাড়ীর ছেলে, এবার স্কুল ফাইনাল দেবে, সামনে বারে কলেজে ঢুকবে। প্রায় ত ধরেই গেছে তাই এখন থেকেই কলেজের ছেলেদের মত মোটা একটা বই কিম্বা একটা খাতা নিয়ে স্কুলে যায় রন্টুদা। বুক পকেটে চকচক করে ফাউন্টেন পেনের ক্লিপটা। চক্রবর্তীদের একমাত্র ছেলে রন্টুদা, কত বড়লোক ওরা। চকমেলানো বাড়ী জমি জায়গা কত কিছু। তাছাড়া ওরা বামুন। তবু ওর এক গোঁ। দশ এগারো বছর বয়েস থেকে সমানে বলে আসছে, তোকে আমি বিয়ে করবই টুলু দেখিস, ওসব বামুন কায়েত আমি মানি না। পেশকার বাবুদের পেয়ারা বাগানে কাদের একটা সাধা গুঁতিয়ে দিয়েছিল টুলুকে। কি মারটাই সাধাটাকে সেদিন মেরেছিল রন্টুদা। টুলুর কোন কষ্ট হতে দিত না সে। বলত, আমি থাকতে যদি তোর কষ্ট হয় তাহলে আমার বেঁচে থেকে কি লাভ। খুব ভালো ভালো কথা বলত রন্টুদা। বলত, কোনোদিন কোন বিপদে যদি পড় টুলু, ইদানীং টুলুকে আর তুই বলত না সে, জেনো আমি আছি তোমাকে বাঁচাবার জন্যে। এইসব কথা বলার সময় কত বড় মনে হত ষোল বছরের রন্টুদাকে। সবই ভাগ্য, না হলে ছোটমামীরই বা কেন এত আলা হবে আর টুলুর বাপই বা মাটিতে কথা পড়ামাত্র কেমন অমন তেজে ছাড়া কৈ মাছের মত চড়বড়িয়ে উঠবে।

মেজমামী শুধু বলেছিল, এ ভালো নয় দিদি, এবার রাশ টানতে হয়, ওরা হ'সপে রাড়ী—

সেই কথাটিই ঘুরিয়ে টুকুস করে ঠিক জায়গায় লাগালো ছোটমামী। —বড় মেয়ের জন্যে ভাবনা নেই ভাদুড়ী মশাই, মেয়ে আপনার সেয়ানা, নিজেই যোগাড় করে নিচ্ছে। তা হলই বা রাড়ী, ভালবাসার বিয়ে ত' এমন আখছারই হচ্ছে—মুখ টিপে হেসেছিল ছোটমামী। আর যার কোথা, চিড়বিড়িয়ে উঠল টুলুর বাপ, কতবড় কুলীন বারেন্দ্র ঘরের সন্তান আমি, নাই বা থাকলো পয়সা, তাই বলে রাঢ়ীয় ঘরে—লায়েক হয়েছেন মেয়ে, ও মেয়ের যদি রক্তদর্শন না করি ত'—

—আঃ অক্ষয়, ঠাণ্ডা হও, কি ব্যাপার তার ঠিক নেই, মেয়েদের ঠাট্টা ইয়ার্কির কথা—

—আরে রাখুন মশাই, ঠাণ্ডা হয়ে থেকে আমার এই সর্বনাশটি করিয়ে এখন আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। লজ্জা করে না আপনাদের?

কথায় কথায় বেশ জট পাকিয়ে গেল, সব কৃতজ্ঞতা ভুলে গেল টুলুর বাবা। মেয়ে নিয়ে সেই দিনই কলকাতা রওনা হল সে। মামারা বলল ও মেয়কলারামের মুখ দেখব না। তিন থেকে তাল। খালি বড়মামী চোখের জল ফেলল ছোটদের জলখাবারের থালা সাজাতে গিয়ে।

আর রন্টু? টুলুর বিপদে বুক দিয়ে আগলানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, টুলুর মামাতো ভাইদের ডালমুট, পেন্সিল ঘুষ দিয়েও সে টুলুর কলকাতার ঠিকানাটা বার করতে পারল না। সব ছোট ভাইটা ছিল বিচ্ছু। সে ভরসা দিল, তুমি ভেবো না রন্টুদা, বড়দেটি ঠিক চিঠি লিখবে টুলুদিকে, আমি তকে তকে থাকব। ঠিকানাটি টুক করে কপি করে আনব তারপর তুমি কলকাতা গিয়ে একেবারে টুলুদিকে বিয়ে করে এনো। টুলুদি বলেছে কলকাতা গেলে আমি আর বাঁচব না, হাড়হাভাত পিশেমশাইটা—সবশেষে মন্তব্য করেছিল সাহু।

কিন্তু বাঁচালো টুলুই। ভেতরে ভেতরে অশান্তি জমছিল, তবু এতটা ভাবেনি কেউ। স্বাধীনতা লাভের আনন্দের ঢেউ এসে লাগলো ডুমরখালিতেও। বাইরে থেকে শিকল বন্ধ ঘরে পুড়ে মরলেন চক্রবর্তীদের কর্তা আর গৃহিণী। এই মহোৎসবের প্রধান হোতা ছিল ওদেরই মজুর বাহিনীরা। শুধু প্রাণটুকু নিয়ে সে রাত্রে পালাতে পেরেছিল রন্টু। তারপর শেয়ালদা স্টেশনের গণ্ডি ছাড়িয়ে যখন রাস্তায় পা দিল তখন পৃথিবীর চেহারা বদলে গেছে। সেদিনের উদ্বাস্তু জীবনে টুলুর কথা না ভুললেও ভাববার অবকাশ কমই ছিল। সতেরো বছরের রন্টুর জীবনের পুরো একটা বছর কেটেছে প্রধানতঃ কলের জল আর ফুটপাথের আশ্রয়ে। এরপর আরও পাঁচটি বছর কেটেছে এই ছ বছরে ছত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে রন্টু। গল্পের বইয়ের অনেক ঘটনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে ওর কত অভিজ্ঞতা। চক্রবর্তীদের নরম চেহারা তামা চোখ গৌরবর্ণ রন্টুর চোখে এসেছে বাজপাখীর তীক্ষ্ণতা। রুক্ষ কর্কশ চামড়া, গায়ে রঙচঙে হাওয়াই সার্ট আর সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি চওড়া পায়ের নীল রংএর প্যান্ট পরা এই রন্টুই কি টুলুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সব বিপদে রক্ষা করবার? ক্ষমতা? তা এখন কিছুটা হয়েছে বই কি। পোষাক, রেস্টুরেন্ট, সিনেমা সিগারেট সব কিছুতে উড়িয়েও হাতে টাকা থাকে রন্টুর। বাঁধা রোজগারের কাজ ত নয়। আর্টিস্টের মত আলতো হাতের স্পর্শ খানি, এরই দাম কত। এরই জোরে কেমন অনায়াসে উঠে এসেছে পেট মোটা ম্যাণিব্যাগটা। নোট ভেবে টেনে বার করল চিঠিটা। ধুস্—চিঠিটা ফেলে আবার অনুসন্ধান। বেরিয়ে এলো পাতলা বেগুনী কাগজে মোড়া একছড়া চকচকে বিছে হার—ওজনে কোন না দেড়ভরি হবে।

প্রসন্নমনে সিগারেট ধরিয়ে হাঁটুর ওপর আর এক পায়ের গোছ তুলে দিয়ে আড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে তারপর নিতান্ত কৌতূহল বশেই তুলে নিল চিঠিটা।

পা নাচানো অনেকক্ষণই বন্ধ হয়েছিল। স্প্রিংএর মত শক্তপোষের ওপর উঠে বসল অনিল—অনিল চক্রবর্তী। টুনু—টুনু চিঠির শেষের নামটাই বারবার উচ্চারণ করে চলেছে ও। তারিখ? হ্যাঁ আছে, হাটখোলা পোস্ট অফিসের স্পষ্ট ছাপ দু' তারিখের। ঠিকানা? তারিখ ঠিকানা কোনটাই টুনু দেয়নি চিঠিতে। ওর একগুঁয়ে খিটখিটে বাপ ঠিকানা নিশ্চয় জানতো তাই পয়লা তারিখে মাইনের সবকটা টাকাই আকবার দোকানে দিয়ে খালি ব্যাগে হাতটুকু ভরে নিয়েছিল। সেই হাত এখন নিশ্চিন্তে আশ্রয় লাভ করেছে অনিল চক্রবর্তীর সরু পাওয়ালা প্যান্টের পকেটে, যে অনিলের কোনকালে আরও একটা ছোট্ট নাম ছিল।

খিড়কীর পুকুরের ডাক ক্রমে দুর্বার হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে কোথায়? কোন গ্রামে, কোন সহরে? উল্টো পিঠের পোস্ট অফিসের ছাপটা একেবারে কালো হয়ে গেছে কালি মেখে—আর সেই সঙ্গে ঘোমটায় টুনুর কপালটাও।

• • • •

দিন যায়। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর, দিন যাবে, রবে না। যে অবস্থায় ইচ্ছা, সে অবস্থায় থাক, দিন যাবে, রবে না। পথিক! ঘোর দারুণ ঝটিকা বৃষ্টিতে পতিত হইয়াছ? উচ্চ রবে শিরোপরি ঘনগর্জন হইতেছে? বৃষ্টিতে প্লাবিত হইতেছে? অনাবৃত শরীরে ঝরঝরাতিঘাত হইতেছে? আশ্রয় পাইতেছ না? ক্ষণেক ধৈর্য ধর, এ দিন যাবে—রবে না! ক্ষণেক অপেক্ষা কর; দুদিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে; ভানুদয় হইবে; কালি পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

"কেবল বীরত্বে জয়লাভ নাই; যথানীতি সন্ধিবিগ্রহ করিলেই জয়লাভ।"

আঁধারে আলোয়

তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

আফিসের বড় দোরটা অতিক্রম করার সময়ই নবেন্দু, কিসের একটা আগ্রহে, বেয়ারা বা কর্তব্যবোধে হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল ব্রজেনবাবুকে। ভেতর থেকে বাইরে পা বাড়াবার মুহূর্তেই ব্রজেনবাবুর পা দুটো টাল সামলেছিল। নবেন্দু তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়েছিল—ব্রজেনবাবু কপালটা তখুনি ঘষে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিলেন নবেন্দুর দিকে। এ দৃষ্টির ভাষা নবেন্দুর অজানা। তাই বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। প্রবীণকে বিদায় জানিয়ে, নবীনকে স্বাগত জানাবার একটি বিহ্বল মুহূর্ত।

ব্রজেনবাবুর পা দুটো কাঁপছে। মাটিতে পা ঠেকছে আজীবন অভ্যাস মতই—কিন্তু তাতে জোর নেই, এলোমেলো। দেওয়াল ধরে ধরে আফিসের বারান্দা পর্যন্ত এসেছেন। বারান্দার পর বেশ কয়েকটা সিঁড়ি, রাস্তায় নেমে গিয়ে দাঁড়াবার। এবার দেওয়ালের ভরসা ছেড়ে ব্রজেনবাবুকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নামতে হবে। এক একটা সিঁড়ি ছেড়ে নেমে যেতে হবে সামনের বাস, ট্রাম রাস্তার ঘন ভীড়ের মধ্যে। ব্রজেনবাবু দেওয়ালটা ছেড়ে দাঁড়াবার আগে শেষবারের মত আফিসের উঁচু উঁচু দেওয়াল, থামগুলোর দিকে যুঁতি চেয়ে চেয়ে দেখছেন। রাস্তার ওপারে লাল রংএর বড় বাড়ি। তার ওপাশে গঙ্গা। বড় বড় জাহাজের মাস্তুল দেখলেন ব্রজেনবাবু। জাহাজের চিমনির ধোঁয়া দুপুরের ঘুসর আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। চল্লিশ বছর এক নাগাড়ে দেখে দেখে আর নতুন কিছু দেখার ছিল না। পরিচয়ের প্রাত্যহিক ঘনিষ্ঠতায় যারা একাত্ম হয়ে যায়, তাদের আবার তফাৎ করে দেখে বিস্মিত হবার আগ্রহ আর থাকে না। ব্রজেনবাবুর বিস্ফারিত চোখ কি যেন দেখছে চারিদিকে। ছেড়ে যাওয়া, ফেলে আসার মর্মবেদনা ব্রজেনবাবুর নতুন দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। এরা সব পর হয়ে গেল, আপন রইল না।

এই বিচ্ছেদ ব্যথাকে সহ্য করবার জন্যে একটু একটু করে তৈরী হচ্ছিলেন ব্রজেনবাবু। এক বছরের এক্সটেনশন পাবার পর থেকেই। তবু আরও ক'টা বছরের বাড়তি চাকরির একটা আশা ছিল মনে। এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয় এ আফিসে। সহকর্মীরা কেউ কেউ আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু না:—সেদিন রাত্রে বোর্ড অব্ ডাইরেক্টরসদের মিটিংএ তাঁর আর্জি নামঞ্জুর হয়েছে। মিটিংটা যে কতকাল হবে জানা ছিল না। কখন কি প্রয়োজনে ওদের মিটিং হয় কে জানে। তাই এই বিচ্ছেদের দিনটির জন্যে একটু একটু করে প্রস্তুত হলেও, এই দিনটি এমন হঠাৎ এসে পড়বে, তা জানতেন না। আর এসে পড়ার পর মনের অবস্থা যে এরকম হবে, তা বুঝতে পারেননি।

আকাশটা ঘুসর। ট্রামে উঠবেন? না বাসে? ভীড় ঠেলে ওঠার জন্যে একটু শক্তির দরকার হয়! কিন্তু আজ দেহে মনে তেমন জোর পাচ্ছেন না ব্রজেনবাবু। তবু দেওয়ালটা এবার ছেড়ে দিতে হল। এরা ছুটি দিলেও, জীবন থেকে ছুটি পাওয়া যায়নি। জীবনের কর্তব্যকর্ম তাঁর কাছ থেকে এখনও দাবি মিটিয়ে নেয়নি। মানু আছে, মাসুর মা আছেন। মানুকে তার যোগ্য বর খুঁজে দিতে হবে। হাটের রুগী চিরকগ্না মাসুর মাকে সেবা করে যেতে হবে। প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের বাকি জমা মিটিয়ে প্রাপ্তির অঙ্কটা

যে ক'বছর বেঁচে থাকবেন সে অনুপাতে কিছুই না। মাসুর ওপরের আরও তিন মেয়েকে একে একে পরের ঘরে তুলে দিতে গিয়ে ঐ ধার শোধটা কোনদিকই ঘাড় থেকে নামার সুযোগ পায়নি। মাসুর লেখাপড়া এই জন্যেই খানিকদূর এগিয়ে অসমাপ্ত রয়ে গেছে, বিয়েটাও উপযুক্ত সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে।

বুকটা ভার ভার লাগছে ব্রজেনবাবুর। বুকের ভেতরকার চাপ চাপ হাওয়া বার দুই জোরে জোরে নিঃশ্বাস টেনে হালকা করতে চাইলেন ব্রজেনবাবু। তারপর সিঁড়ির নীচে পা রাখলেন। পা দুটো আবার একবার টলে গিয়েছিল। আর ঠিক সেই সময়ই সতর্ক সবল দুটি হাত ধরে ফেলেছে ওঁকে পেছন থেকে। কে! ফিরে দেখেন, নবেন্দু। অবাক হলেন। ওকি পেছন, পেছনই এগিয়ে আসছিল! টের পাননি তো!

নবেন্দু কি রকম ভাসা ভাসা চোখে চেয়ে আছে। পাড়ার ছেলে। ওর চাকরির জন্যে এ আফিসে ধরাধরি করেছেন বড় কর্তাদের নিজে আগে থেকে। নিজের ছেলে নেই, অপরের ছেলের জন্যে আপন জন মনে করে চেষ্টা করা। কিন্তু, ওঁর নিজের পরিত্যক্ত স্থানটি পূরণের জন্যে যে নবেন্দুর নিয়োগটা ত্বরান্বিত হবে ধারণা করতে পারেননি। কিন্তু কথাটা কি তাই। না এটা একটা যোগাযোগ! বড় কর্তারা একদিকে ব্রজবাবুর কথা রেখেছেন ওঁর মনোমত লোক নিয়োগ করে। আবার আর একদিকে কথা রাখতে পারেননি, তাঁকে আরও ক'বছর চাকরির মেয়াদ না বাড়িয়ে দিয়ে।

ব্রজেনবাবু নবেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পুরাণো প্রতিবেশী বন্ধু শুভেন্দুর মুখটা। ওঁর ছেলে নবেন্দুর মুখের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে। কর্তব্য। পুরাণো মৃত বন্ধুর জন্যে কর্তব্য করেছেন ব্রজেনবাবু। মনের মধ্যে বেশ একটা তৃপ্তি বোধ করছেন—আবার ঐ সঙ্গে মাসু আর মাসুর মায়ের বেদনার্ত মুখচ্ছবি মনে পড়ে যেতেই অভিভূত হয়ে পড়ছেন। ব্রজেনবাবু হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন নবেন্দুর মুখের দিকে।

—কাকাবাবু, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

—না। আজ তোমার চাকরির প্রথম দিন।

—তা হোক। আপনি বলে দিলে কাল থেকে জয়েন করা যাবে।

—না। চাকরি জীবনে নিয়মানুবর্তিতাই প্রথম শিক্ষা।

চাকরি জীবনে সবার প্রশংসাভাজন হবার আসল কথাটি বলতে পেরে, একটু যেন জোর পেলেন ব্রজেনবাবু। নবেন্দুর মাথাটা আলতো ভাবে একবার স্পর্শ করে পথে নামলেন।

ব্রজেনবাবু হাঁটছেন। ওঁর গতি শ্লথ, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ভীড়ে ধাক্কা খাচ্ছেন, সামলে নিচ্ছেন। অনেকগুলো মাথার মধ্যে ব্রজেনবাবুর অল্প কাঁচা পাকা চুল বিশিষ্ট মাথাটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

নবেন্দুর বুক উজাড় করে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। সামনে জাহাজের চিমনি এক গাদা কাল ধোঁয়া উদ্গীরণ করে আকাশের খানিকটা নোংরা করে ফেলল। আফিসের উঁচু বারান্দার ওপর একা দাঁড়িয়েছিল নবেন্দু। এত কষ্টে চাকরি পাওয়ার আনন্দটা কিসের একটা অপরাধ বোধের যন্ত্রণায় নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

বড়বাবু ডাকছেন। আফিসের দারোয়ান কর্তব্য কর্মের নির্দেশ নিয়ে এসেছে।

নবেন্দু সচেতন হল। নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনা। কাকাবাবু একটু আগে বলে গেছেন। নিজের নতুন নির্দিষ্ট জায়গায় এসে বসল নবেন্দু। বড়বাবু কিছু বললেন না। যে জন্যে ডাকা তার মানে বুঝতে পেরেছে যখন……।

নবেন্দু বড়বাবুর আগের দেওয়া কাজগুলো তুলে নিল হাতে। কিছু চিঠিপত্তর শুধু কপি করে দেওয়া। কাজ শেষার আগে এইসব খুচরা কাজগুলো করিয়ে এ অফিস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে নিতে চাইছেন বোধহয় বড়বাবু।

কপি করতে লাগল নবেন্দু। কাকাবাবু হয়ত এতক্ষণ হাওড়ার পুল পর্যন্ত পৌছাবেন। তারপর যাবেন ষ্টেশনে। মিনিট কুড়ি গাড়ি চেপে গন্তব্যস্থলে পৌছাবেন। তারপর বাড়ি। নবেন্দুদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় মাকে কি এই সুখবরটা দিয়ে যাবেন কাকাবাবু যে শেষ পর্যন্ত নবেন্দুর চাকরিটা হল এবং সে এখন কাজ নিয়ে ব্যস্ত! হয়ত দেবেন আবার নাও দিতে পারেন। কেননা মনটা তাঁর হু হু করছে। নিজের বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই কারিমা সামনে এসে দাঁড়াবেন। এমন অসময় আসার কারণ জিজ্ঞেস করার আগেই কাকাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে খানিকটা অনুমান করে নেবেন। মাসুও নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে। বাবা মার মুখের দিকে চেয়ে বুঝবে ব্যাপারটা। কিছু বলবে না। কথা কম বলে ইদানিং মাসু। ওর মুখের কথা ক্রমশঃ অনেক কমে এসেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর নিজের আকাঙ্ক্ষাগুলো বয়সের ধর্মে যখন নতুন পরিচয় নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে চাইছিল ওর কাছে, তখন ও জেনেছিল এই কথাটাই এ সংসারের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কালো মেয়ে, বেশী লেখাপড়া শেখেনি শেখান যায়নি অনুনয়টা আমল পায়নি কারুর কাছে। দারিদ্যতাওয়ার মানদণ্ডে এসব অনুনয় অর্থহীন। মাসু তাই নিজে ক্রমশঃ গুটিয়ে ফেলেছে নিজের কাছে।

কলমের ভগাটা অনেকক্ষণ থেমেছিল। চারিদিকে একবার চেয়ে নিল নবেন্দু। কেউ লক্ষ্য করেনি। কাজ হাতে নিয়ে অবশ্য সকলে কাজ করছে না—অনেকে গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। বড়বাবু ব্যস্ত নিজের কাজে।

এক নাগাড়ে বেশ কিছুক্ষণ কাজ করে গেল নবেন্দু। অপরাধী ভাবটা মনটাকে বিষণ্ণ করে রেখেছে, অন্যমনস্ক করে তুলতে চাইছে। কিন্তু না অনেক কষ্টের পাওয়া চাকরি।

টিফিনের সময় অন্য সকলের মত উঠে পড়ল নবেন্দু! অনেক কষ্টের পাওয়া চাকরি। পার্টটাইম টিউশানি করে শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত হেঁটে আই-এ পাশ করার পর এই চার বছর কেটেছে। কত দরখাস্ত, ইনটারভিউ—তারপর এ অফিসে চাকরির জন্যে কাকাবাবুর কি আপ্রাণ চেষ্টা। কাকাবাবুর নিজের ছেলে নেই।

চাকরি পাওয়ার আনন্দটা ম্লান হয়ে যাচ্ছে। টিফিন রুমের এককোণে বসে চা বিস্কুট খেতে বসল নবেন্দু। অন্য সকলে হৈ হৈ করছে। ব্রজেনবাবুর জায়গায় এসেছেন বুঝি? আলাপ করে নেন কয়েকজন। ব্রজেনবাবুর আপনি কেউ হন নাকি?—এঁা, না—মানে। চমকে উঠে নবেন্দু কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। ওরা বলাবলি করল—ভদ্রলোক আরও কয়েক বছর একসটেনসন পেলে সামলে উঠতে পারতেন কতকটা। ছেলে নেই, বাড়িতে এখনও কুমারী মেয়ে—কাকাবাবুর শুভানুধ্যায়ী ওরা দুঃখ করছে কয়েকজন মিলে।

টিফিন রুম ছেড়ে চলে এল নবেন্দু। বলতে পারল না সেখানে। বুকটা কেমন হু হু করে

উঠল। চারদিন ধরে কাকাবাবুর শুভানুধ্যায়ীদের কথাগুলো যেন ছুটে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে—চার পাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ছোট ভাই খোকনের কথা মনে পড়ে গেল নবেন্দুর—আর বাবা মারা যাবার দিনটার কথা। দশ বছর আগের ঘটনা। খোকন জন্মাবার দুদিন পরে বাবা মারা গেলেন। উত্তাল শোক সমুদ্রে যখন সকলে দিশেহারা—তখন মায়ের বিলাপ ধ্বনির মধ্যে একটা কথা তীরের মত কানে এসে বিঁধেছিল। খোকনকে জড়িয়ে উনি কেঁদে কেঁদে বলছিলেন—তুই এলেই তোর বাবাকে তাড়িয়েছিস্। দুদিন আগে নতুন আগন্তুকের এ বাড়িতে আসার আনন্দটা এ বাড়ি থেকে আর একজনের বিদায় আর্তনাদের মধ্যে পিষ্ট হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল নবেন্দু। মা আর নবেন্দুর সেই খোকন এখন তাদের কত আদরের ধন। সেদিনের ঘটনা অতীতের বিস্মৃতির অন্তরালে চাপা ছিল—আজ মনে পড়ে গেল। একজনকে নিয়ে, আর একজনকে ফিরিয়ে দেয়। এই বিরাট অফিস ঘরটার জন্ম সময় থেকে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ত কতবার হয়েছে।

পাঁচটা পর্যন্ত কোন রকমে সময়টা কাটিয়ে দিল নবেন্দু; সব কাজ শেষ হল না। বড়বাবুর টেবিলে এসে বললে সসঙ্কোচে—কিছু বাকি রয়ে গেল স্যার।

বড়বাবু মুখ তুললেন। চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—বেশ, কাল কর।

স্বরটা বেশ ভদ্র, নম্র। কৃপা এগিয়েছিল নবেন্দু।

—ব্রজেনবাবু তোমার কেউ হন? বড়বাবু প্রশ্ন করেছেন।

—বাবার বন্ধু।

—ও। ওঁর ছেলে নেই, না?

—না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নবেন্দু। বুকটা চাপ লাগছে।

—কিছু বলবে?

—ব্রজেনবাবুর আরও ক'বছর যদি· ···।

বড়বাবুর গম্ভীর মুখটায় এবার একটু হাসি দেখা দিল। বললেন—তা হবার নয়! এই নিয়ম-এ অফিসের, আর সংসারেরও। একটু চুপ করে রইলেন বড়বাবু, তারপর আবার বললেন—একজনের অভাব আর একজনকে দিয়ে পূর্ণ করা। এইই নিয়ম। মন খারাপ কর না। নতুন চাকরি পেয়েছ—বাড়ির লোকেদের নিয়ে আনন্দ কর।

আনন্দ! বাড়ি আসতে আসতে ভাবছিল নবেন্দু। মা হয়ত খবর পেয়েছেন—হয়ত পাননি। মা খুসি হবেন, খোকনও। কিন্তু এরা আনন্দ পেলেই তো হবে না। পাশের বাড়ির সকলেরই খুসি হওয়ার কথা। ওরা এ বাড়ির, আর আমরা ও বাড়ির সুখ দুঃখের অংশীদার। এইভাবে চলে আসছে। কাকাবাবু, কাকিমার খুসি হওয়ার কথা। মাহুরও। অনূঢ়া মেয়ের বিয়ে না হওয়ার দুঃখ, আর শিক্ষিত যুবকের চাকরি না পেয়ে বেকার হয়ে থাকার দুঃখ বোধ হয় এক। দুজনেই অবহেলিত, লাঞ্ছিত নিজের কাছে, সবার কাছে।

কিন্তু না। মাহু এ দুঃখটা অতটা এক করে দেখতে পারে নি। একদিন একটা ইন্টারভিউ-এর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে, আবার দ্বিতীয়বার ডাক পড়ার চিঠি এসেছিল বাড়িতে। আশায় আশায় থাকা মুখগুলো সেদিন সকলের উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মা, খোকন, মাহুও যোগ দিয়েছিল এসে।

ভাল করে খাইয়ে দেবার একটা জোরাল দাবি ছিল মাসুর তরফ থেকেই বেশী। ঐ প্রসঙ্গেই কিভাবে আর একটা কথা এসে গিয়েছিল। কথায়, কথায়,—হাসিচ্ছলেই। নবেন্দু বলতে গিয়েছিল, মাসুর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হলে ঐ ধরণের যাওয়া দাওয়া যেন ও বাড়িতেও···। না, এর বেশী বলতে পারেনি। মাসুর মুখের দিকে চেয়ে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। মাসু একটু থেমে ধীরে ধীরে বলেছে—তোমার মত ছেলের চাকরি একটা পাওয়া যাবেই। কিন্তু—। ওর পাতলা ঠোঁট দুটো থরথর কেঁপে উঠেছিল অব্যক্ত বাকি কথাগুলো নিয়ে। চোখের দৃষ্টি ক্রমশঃ নিথর, নিশ্চল। মর্মভেদী। তারপর ওর ঐ বড় বড় কালো চোখের কূল ছাপিয়ে জল ভরে উঠেছিল। সেটা বুঝতে পেরেই, তাড়াতাড়ি সামনে থেকে সরে গিয়েছিল মাসু। তারপর থেকে কেমন সরে সরে থাকার অভ্যাসে পেয়ে বসেছে মাসুকে।

হাওড়া পুলে উঠে নবেন্দু দেখল প্রত্যেকের গতি বেশ দ্রুত। গাড়ি ধরবার তাগিদে সকলে ব্যস্ত। ঠিক এইভাবেই ব্যস্ত হতে হবে এবার ওকেও। কর্মহীন মানুষ ব্যস্ততার স্বাদ বোঝে না। নবেন্দু আর বেকার নয়। তার জীবনে পূর্ণতা এসেছে।

একজনের অভাব আর একজনকে দিয়ে পূর্ণ করা—! কে বলেছিল কথাটা? বড়বাবু। একটু আগেই আফিসে। পূর্ণতা। হাওড়া পুলের মাঝামাঝি এসে পড়েছিল নবেন্দু। একটা দমকা হাওয়ার প্রশান্তি যেন হঠাৎ পথ আগলে দাঁড়াল। বুক ভরে নিতে ইচ্ছে করছে বাতাসটা। বুকের ভেতর অনেক বেদনার রক্তগুলো ভরে উঠতে চাইছে। সামনে গঙ্গা, নৌকা, জাহাজ জলের ঢেউ—পশ্চিম কোনে লাল টকটকে সূর্য। কিরকম একটা নতুন ভাব সমস্ত প্রকৃতিতে। কিসের একটা উদারতায়, প্রশস্ততায় সব কিছুই প্রসন্ন, পরিপূর্ণ।

হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়িটার নজর পড়তেই কিসের একটা ব্যস্ততা পেয়ে বসল নবেন্দুকে। ৬টা বাজে। ৬-১০এ গাড়ি আছে। ওটাই ধরা যায়। তাড়াতাড়ি হাঁটতে সুরু করল নবেন্দু।

সন্ধে হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে। মিনিট পনের কুড়ি হেঁটে বাড়ি আসতে হয় স্টেশন থেকে। ঐটুকু পথ একটা অদ্ভুত অন্যমনস্কতায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল নবেন্দু। ঘরে এসে ঐভাবেই ঢুকেছে। খোকন এসে জড়িয়ে ধরল। খবরটা তাহলে এরা পেয়েছে। মা-ও এগিয়ে এলেন। মা-র এ ধরণের মুখের ভাব কখনও লক্ষ্য করেনি নবেন্দু। একটা খুসির উচ্ছ্বাসকে মা যেন দমন করে আছেন। কেননা ওরই সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনার অনুভূতিও অপ্রচ্ছন্ন থাকতে চাইছে না। আশ্চর্য! আশ্চর্য এই দুনিয়া, এই সংসার।

—মা—! নবেন্দুর মুখে অস্ফুট স্বর।

—আয় বাবা। চাকরিটা হল তো! ঠাকুরপো বলে গেলেন যাবার সময়। মাসুও এসেছিল।

—কি বলল!

—দুটো খবরই দিল। তুই চাকরি পেলে কত আনন্দ করবে বলেছিল—! কিন্তু—।

নবেন্দু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। বলতে ভুলে গেল।

—হাত মুখ ধুবি না?

—মা একের বেদনা অপরের আনন্দ দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া যায় না?

—যায় বৈ কি! মা একটু আশ্চর্য হলেন। ছেলেকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন খুব আগ্রহভরে।

—মা, তাহলে ওরা আনন্দ করতে পারছেন না কেন?

অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন মা ছেলের মুখের দিকে। স্মিত প্রসন্ন হাসিতে মুখটি ভরে উঠল। বললেন তাইতো উচিত বাবা। তুই কি এখুনি ও বাড়িতে একবার যেতে চাইছিস?

—হ্যাঁ মা!

মা সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

ব্রজেনবাবু বাইরে ঘরটাতেই বসেছিলেন তাঁর ইজিচেয়ারে। ঘরে অল্প পাওয়ারের আলো। আবছা অন্ধকার।

—কে?

—আমি নবেন্দু।

—এস।

—বড় আলোটা জ্বালব কাকাবাবু?

—জ্বালবে? বেশ জ্বালো।

বড় আলোটা জেলে সামনে বসল নবেন্দু। ব্রজেনবাবু একবার মুখের দিকে চেয়ে মুখ নিচু আছেন। একদিনেই কত বয়স বেড়ে গেছে যেন।

—মন দিয়ে কাজ করেছ তো?

—হ্যাঁ।

—কি রকম লাগল নতুন কাজ?

—এঁ্যা!

—নতুন কাজ কেমন লাগল?

—ও হ্যাঁ, ভাল ভাল।

নবেন্দু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। ব্রজেনবাবুরও কথা ফুরিয়ে গেল। টেনে টেনে কি কথা আর বলবেন?

নবেন্দুই এবার কথা বলল—অফিসের সকলে আপনার কথা বলছিল।

—তাতো বলবেই।

আপনার ছেলে নেই বলে দুঃখ করছিল।

—হুঁ।

—আমিই যেন দায়ী—!

—নারে পাগল ছেলে। উঠে বসেছেন এবার ব্রজেনবাবু। নবেন্দুর মুখে কিসের একটা অস্বস্তি। এতক্ষণে যেন লক্ষ্য করলেন। একটু হাসবার চেষ্টা করলেন—বললেন এই নিয়ম। উপায় কি!

—বড়বাবুও তাই বললেন।—একের অভাব আর একজনকে দিয়ে পূর্ণ করা—।

—তাইতো সংসারের চিরাচরিত প্রথা।

—তাই বলছিলাম—

ব্রজেনবাবু কিছু বুঝতে পারছেন না। নবেন্দু ওঁর মুখের দিকে সোজা তাকাতে পারছে না। কেন?

—বলছিলাম—আমরা আপনারা কেউ তো সংসারের বাইরে নই—!

ব্রজেনবাবু নির্বাক। নবেন্দু যেন আজ হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেছে। মুখটা কিসের জন্যে অমন উজ্জ্বল লাগছে? এত কথা বলতে পারছে কি করে?

—আপনার ছেলে নেই। তাই আমি ভাবছিলাম, আমি যদি আপনার ছেলের মত হয়ে যাই, আর মা'র মেয়ের মত যদি···!

সামনে চা হাতে মানুকে আসতে দেখে কথাগুলো সোলমাল হয়ে গেল নবেন্দুর। মানু দু'পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেদিনকার অন্তর্ভেদী কালো দুটি চোখ কেমন যেন থতমত খেয়ে গেছে। নবেন্দুর সেদিকে চোখ পড়ে যেতেই চুপ করে গেল।

ব্রজেনবাবু স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন নবেন্দুর দিকে হাঁ করে চেয়ে। অল্পক্ষণ। তারপর চোখে কি যেন একটা হঠাৎ পড়েছে ভেবে অজুহাতে কোঁচার খুঁটটা চোখে চেপে ধরে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। এরপর যখন চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন নবেন্দু চলে গেছে। চা'টা সামনে টেবিলের ওপর। মানুও নেই সামনে।

• • • •

ফরাসী বিপ্লব মানুষের মনে এনেছিল এক অপরূপ আশার আলো—সে তার নিজের ওপরে বিশ্বাস।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর, প্যারিসের নোতরদাম্ গির্জায় এক বিচিত্র উৎসবের আয়োজন হোল—মুক্তি ও যুক্তির উৎসব।

যুক্তিদেবীরূপে সাজিয়ে বসানো হোল এক সুন্দরী মহিলাকে। সত্যের মন্দিরে চলল যুক্তির পূজা।

আদর্শবাদীর স্বপ্ন, মানুষের চিরকালের স্বাধীনতা পিপাসা ঐ একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠল আর তারপরেই নেমে এল অন্ধকার, এই আন্দোলনের নেতাদের হত্যা করা হোল গিলোটিনে।

রাজরপ্পা

পুষ্পকুমার পাল

পূজার পর এবার ইচ্ছা হোল রাজরপ্পায় যেতে হবে। হাজারীবাগ জেলায় রামগড়ের পথে বিহার প্রদেশে "রাজরপ্পা" এক মনোরম স্থান। কলকাতা থেকে বিভিন্ন রাজপথ ধরে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া হয়ে "গোলা" এবং সেখান থেকে আটমাইল গেলেই এই মনোরম উপত্যকায় পৌঁছানো যায়। কিংবা ট্রেনে যেতে গেলে "পুরীতে" বদল করে "গোলা রোড" স্টেশন আসতে হয়, এবং তারপর বাসচালিত ছোট বাসে "গোলা" থেকে রাজরপ্পায় আসা যায়। এ-পথে বাস একবারই চলে, সকাল দশটায় ছেড়ে দুটায় আবার "গোলা" ফিরে আসে।

আমি গিরীডী ছিলাম, অনেকদিন ইচ্ছা ছিল, রাজরপ্পায় গিয়ে জাগ্রত ও অতি পুরাতন ছিন্নমস্তার মূর্তি ও মন্দির দর্শন করবো। গিরীডীতে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের আশ্রয়ে ছিলাম। একদিন সেই সুপ্রভাত এলো, একটি মোটরে, আমি, বিজনতারা, ভাই অচ্যুতানন্দ ও শ্রীমান দিলীপ রাজরপ্পা যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলাম। আশ্রমের সুচিত্রাদি মায়ের পূজার জন্যে সর্ব সামগ্রী সুষ্ঠুভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। একটি বিরাট সাজিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বড় ঘটিতে স্নানের জল, দুগ্ধমিশ্রিত জল, গন্ধদ্রব্য, বস্ত্র, সদ্য প্রস্ফুটিত গিরীডীর মায়ের বাগানের বিখ্যাত গাঁদা ও গোলাপ ফুল এবং মিষ্টান্ন উপাচারে ত্রুটি নেই, প্রয়োজনীয় ভক্তি সহযোগে নিবেদন করলেই মনে হবে মা এ পূজা গ্রহণ করবেন।

গিরীডী থেকে "রাজরপ্পা" প্রায় ৮৭ মাইল। আমরা দুমরীর পথে এগিয়ে চলেছি। দুদিকে পাহাড় ও ঘন বনশ্রেণী। সবে বর্ষা শেষ হয়েছে, পাহাড় ও বন ঘন সবুজ, চতুর্দিকে সতেজ ও সজীবতা, মাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। মন আনন্দময় হয়ে উঠছে, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের দুর্গামাতাজীর কথা মনে পড়ছে। সেই কল্যাণময়ী লোকমাতার কথা, শ্রীশ্রীমার ভাবে ভাবময়ী অনন্তা মাতৃমূর্তি। তীর্থ যাত্রার পথে, মা সন্তানদের শিরে কর অর্পণ করে যাত্রাপথ সুগম করে দিতেন। অন্তরে জাগিয়ে তুলতেন বিশ্বাস, ব্যাকুলতা ও নির্ভরতা।

গাড়ী বেশ জোরেই চলেছে। অচ্যুতভাই "সাধনা" বই থেকে স্তোত্রাবলী পাঠ করে যাচ্ছে। অদূরে প্রভাতে মৌনী পরেশনাথ পাহাড়। মধুবনের কাছে, মাঝে মাঝে জৈন ভক্তদের দেখা যাচ্ছে। তাঁরা তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়েছেন।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পেরিয়ে এবার আমরা "বেরমোর" দিকে এগিয়ে চলেছি। 'বেরমোর' এই রাস্তা দিয়ে বোধায়ো যাওয়ার সুবিধা। এখানেও সেই একই দৃশ্য, ছোট বড় পাহাড় ও ঘন বৃক্ষলতা। বেরমোর পথে ২২ মাইল দিয়ে আমরা "পুরলোর" মধ্য দিয়ে আরো আটমাইল গিয়ে চায়নামোড়ে, পুরুলিয়া ও রাঁচীর প্রধান পথে উঠে পড়লাম। এ পথের দৃশ্য আরো সুন্দর। দূরে নীলাভ পর্বতশ্রেণী, তার নীচে ঘন সবুজের শাল ও সেগুনের বন এবং নিকটে হালকা সবুজের কৃষিক্ষেত্র। চায়নামোড় থেকে ২৬ মাইল গিয়ে 'গোলায়' পৌঁছে গেলাম, এখান থেকে ৮ মাইল পাবত্য পথে রাজরপ্পা।

ঘোপে ঢাকা পথ দিয়ে, গাড়ী এসে দাঁড়ালো ভৈরবী নদীর পাশে, এখানে ভৈরবী নদী, স্থানীয় লোকের কাছে যা ভেড়া নদী বলে পরিচিত,—উঁচু পাহাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

তন্ত্রসাধনার একটি তত্ত্ববিভাগ খোলবার আশা রাখেন। ভারতের তন্ত্রসাধনার বিষয়ে এখানে গবেষণা করা হবে। সুকুমারবাবুর মতে এ মন্দির বহু পুরাতন, তাঁর আমন্ত্রণে পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে মন্দির ও মন্দির গাত্রের শিল্প নমুনা নেওয়া হয়েছে। মন্দিরের স্থাপত্য পাল সাম্রাজ্যযুগের বলে সন্দেহ করা হয়েছে।

মা ছিন্নমস্তা এ অঞ্চলে অত্যন্ত জাগ্রত দেবী বলে কথিত। মন্দিরের ছয় মাইলের মধ্যে কোন গ্রাম নেই, তবে অন্ততঃ বিশ মাইলের মধ্যে মায়ের নাম শুনলেই লোকে মাথা নত করে, যা কিছু মানতের পূজা মায়ের কাছে দিয়ে থাকে। শনি মঙ্গলবার ও অমাবস্যায় সাধারণতঃ এখানে লোক সমাগম হয়ে থাকে। বহু তন্ত্রসাধক এখানে সাধনা করে থাকেন, বহুলোক এখন সদলে এসে এখানে মায়ের দর্শন করেন এবং প্রকৃতির এই সৌন্দর্যময় স্থানে বনভোজন করে আনন্দ লাভ করেন। পঞ্চমারাধ্যা দুর্গামাতা প্রায় ৩০।৩৫ বছর আগে সদলে একদিন এ স্থানে দর্শনে আসেন। ভোগাদি নিবেদনের পর ভৈরবীর এই বিস্তীর্ণ প্রস্তর খণ্ডের উপর বসে তাঁরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। আজ তাঁদের কথা স্মরণ করে মন আনন্দময় হয়ে উঠলো।

বহু প্রাচীন এই মন্দির হয়তো এককালে সমৃদ্ধ ছিল। বহু উপাচারে হয়তো মায়ের পূজা হোত। জনসমাগমে হয়তো এ স্থান এককালে পূর্ণ হয়ে উঠতো। পরে হয়তো কালের নিয়মে এ স্থান নির্জন ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়েছে। মা অপ্রকট ভাবে থেকে কোন কোন সাধকের তপস্যায় মধ্যেই তৃপ্ত ছিলেন। আবার দেখা যাচ্ছে এখানে জনসমাগম আরম্ভ হয়েছে। গড়ে উঠেছে পূজা উদ্যান এবং আবাস গৃহ। মা আবার বহুজনের কলরবের মধ্যে প্রকট হয়েছেন, বহুজন তাঁর দর্শনে তৃপ্ত হচ্ছে, প্রচ্ছন্ন অবস্থা থেকে এখন যেন প্রকাশ হওয়া।

সাধকের সাধনায় সাধনপীঠের মধ্যে প্রকাশ। কয়েক বছরের মধ্যেই মনে হয় এ স্থানের এ নির্জনতা এ ধ্যান গম্ভীর পরিবেশ বোধহয় লুপ্ত হবে। আরো ব্যাপকভাবে সর্বসমক্ষে প্রকাশমানা হয়ে সর্বমনে পরিতৃপ্তি দেবেন।

• • • •

১৯৪২ সনের এপ্রিল ভয়াবহ মহাযুদ্ধ চলেছে পৃথিবীতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট শত কর্মের মধ্যেও বিস্মৃত হলেন না একটি কর্তব্য পালন করতে। আমেরিকার পুস্তক বিক্রেতা সমিতির কাছে এক বাণী পাঠালেন: বই অগ্নিতে দগ্ধ হবার নয়। মানুষ মরে যায়; কিন্তু বই মরে না। কোন শক্তি বা মানুষ স্মৃতিকে বিনষ্ট করতে পারে না। আমরা জানি, এই যুদ্ধে বই কোন একটি অস্ত্র।
প্রতিটি সংস্কৃতি-প্রেমিকের মনে সেদিন নতুন আশার আলো জ্বলে উঠেছিল এই কথায়।

এই প্রথম

সূর্য ওঠে আর অস্ত যায়

শ্রীলেখা বসু

প্রখর রোদে চারিদিকের কদর্যতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সোনা ধরা বাড়ীটার সর্বাঙ্গে মাপজোক করে যেন কেউ কতকগুলো পায়রা'র খোপ বসিয়ে দিয়ে গেছে—অরুণা বসে বসে ভাবছিলো—তেমনি নোংরা, তেমনি আবর্জনাপূর্ণ। শুধু পায়রাগুলো তবু মাঝে মাঝে স্বচ্ছন্দে উন্মুক্ত নীলিমায় বিহার করে আসে, অরুণার উপায় নেই।

অফিস যাবার মুখটাতেই দীপেনের সঙ্গে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটা কথা নিয়ে কি বিশ্রী কথা কাটাকাটিই না হয়ে গেল। অর্ধভুক্ত মানুষটা এখন এই রোদে গরমে ঘেমে নেয়ে প্রাণ হাতে করে ঝুলে ঝুলে অফিসে যাবে, ফিরতে তো সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। অরুণা অনুশোচনায় দগ্ধ হলো, ছি ছি—এখনই কি নিতান্তার নেই নেই রবটা না তুললেই হতো না? প্রতিদিনের প্রসঙ্গ বটে; কিন্তু প্রতিদিনই যে এটা অপ্রীতিকর তা অরুণার থেকে ভালো আর কে জানে! কিন্তু অরুণাও আর পারে না। আর যাচ্ছে না এক ফোঁটাও অথচ কি অমিতব্যয় নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রের। আত্মীয় বন্ধু বাড়ীতে এলে আনন্দের চেয়ে ভয় বেশী হয়—ভদ্রতা রক্ষা হবে কি উপায়ে? অসুখে পড়লে রোগের যন্ত্রণার চেয়ে ওষুধ কেনার যন্ত্রণাটা ঘন্টো হতে ওঠে। এই তো তাদের সোণার সংসার, এই সংসারের জাঁতায় পেষাই হ'তে হ'তে মানুষ কি তার বিচার বুদ্ধি বিবেচনা সবকিছু হারিয়ে ফেলে না? দীপেনই কি বোঝে না যে যে-টাকায় দু'বছর আগেই টানাটানি করে চালাতে হতো আজ সে টাকার ভদ্রতার আবরণটুকুও রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে? কিন্তু সে-ই বা কি করবে? একটা টাকা ভেঙে দু'খণ্ড করতে পারে; কিন্তু মুখে রক্ত তুলেও তো সেটাকে দুটো টাকায় পরিণত করতে পারে না। বোঝে—দুজনেই বোঝে পরস্পরকে। যখন কোনোমতে চা-টা গিলেই সাত সকালে দীপেন টিউশনি করতে দৌড়ায় তখন অরুণার মুখে অসহায় কারুণ্যের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর যখন কয়েকটা বাড়তি পয়সার জন্যে পুরোণো শিশি বোতল কাগজওলাদের সঙ্গে অরুণা আধঘণ্টা ধরে চেঁচামেচি কাকুতি মিনতি করে তখন দীপেনের মুখে যে নিরুপায় ক্ষোভ ফুটে ওঠে সেটাও মেকী নয়। কিন্তু তবুও অভাবের প্রচণ্ড তাড়নায় সহানুভূতি, মায়া, মমতার সূক্ষ্ম তন্তুগুলো ছিঁড়ে যায়, আবর্জনার পাকটা ঘুলিয়ে হাওয়াটা আরো বেশী বিষাক্ত হয়ে ওঠে। আর নিরুপায়তার প্রাচীরের দুইধারে দাঁড়িয়ে দীপেন আর অরুণা মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে রোজ একটু একটু করে মরে।

রাতের অন্নব্যঞ্জনগুলো তুলতে তুলতে অরুণা ভাবছিলো কি দুর্বিসহ এই জীবন, কি অবসাদের শৃঙ্খল এর পায়ে পায়ে জড়ানো। স্কুল কলেজের খাতায় যখন জীবন সংগ্রামের ওপর প্রবন্ধ লিখতো তখন কি কল্পনাও করতে পেরেছিলো কি নিষ্ঠুর ভয়াবহ তার বাস্তব রূপ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকে কেন্দ্র করে যে বিরাট সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার সমাধান খুঁজতে প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত উৎসর্গ করে দিতে হয় সারাটি জীবন ধরে। তবু তো এর সমাধান হয় না।.....মুখের অন্ন চাই, পরণের বস্ত্র চাই আর ভিতর বাহিরের রিক্ততাকে ঢাকা দেবার জন্যে ভদ্রতার একটু পালিশও চাই। উঃ দারিদ্র্য

কি বীভৎস তোমার চেহারা, কি সর্বগ্রাসী তোমার ক্ষুধা! রক্তচোষা ভয়ঙ্কর একটা প্রাণীর মতো আমাদের জীবন থেকে সংসার থেকে, অন্তর থেকে তুমি সমস্ত রঙ রস গন্ধ শুষে নাও। বেঁচে থাকার আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ সব নিতে যায়; শুধু বিস্বাদ বিবর্ণ এই সংসার ক্ষেত্রে কতকগুলো অনুভূতির মৃত পড়ে থাকে। তবুও তো দিন আসে দিন যায়। সূর্য ওঠে আর অস্ত যায়।

ক্লান্ত পায়ে রান্নাঘরে ফিরে এসে অরুণা আরম্ভ কাজ তুলে নেয়। বেলা দশটার সময় পৃথিবীটা কতো বদলে যায়। রুক্ষ রোদের প্রহারে সমস্ত কুশ্রীতা আর আঘাতের প্রতিটি চিহ্ন উন্মুক্ত করে মেলে ধরে যেন ক্লান্ত কুকুরের মতো পড়ে পড়ে হাঁপাতে থাকে। রান্নাঘরের ঝুলকালিগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে, দেওয়ালের এক একটা ছোটো চাপড়া হঠাৎ খসে পড়ে। অথচ····· অথচ নতুন বিয়ের পরে এসে অরুণা এই পারবার খোপটাকেই ভালোবেসেছিলো, ভেবেছিলো এইখানেই তার হৃৎপদ্ম বুঝি দলে দলে বিকশিত হয়ে উঠবে। দাম সুজনী ঢাকা পরিপাটি বিছানা, সুবিন্যস্ত বইক'টির পাশে রঙীন মাটির সরা আর ফুলদানি—নাইবা থাকলো ফুল তাতে, তবু ফুলের সম্ভাবনাটা তো ঘোষণা করবে। সিঁড়ির কাছের জায়গাটুকু ঘিরে ছিমছাম দু'একটি বেতের চেয়ার থাকে অরুণা নিজের হাতে রঙ লাগাবে, লাল আর হলুদ।—ছটফটিয়ে উঠলো অরুণা হঠাৎ, হঠাৎই একবারে হাতের কাজ ফেলে দৌড়ে গেল তার শোবার ঘরে, যে ঘরটা এই খানিকক্ষণ আগেই গুছিয়ে সুজনি টেনে বিছানা ঢেকে দিয়ে গেছে। গিয়ে দেখলো বিছানার ওপরে সুজনি এলোমেলো আর চতুর্দিকে ছাই ছড়িয়ে পরমানন্দে তার কলেজে পড়া দেওর বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারছে। মেঝের জুতো ছড়ানো, আধখাওয়া চায়ের পেয়ালার পোড়া সিগারেটের টুকরোয় ঘরটা যেন নরককুণ্ড! রুদ্ধরোষে অরুণা দাঁড়িয়ে দেখলো, তার ঘরটাই বারোয়ারী বৈঠকখানা। অবশ্য আর কোথায়ই বা যাবে? অন্য ঘরখানার একপ্রান্তে দেওর অন্যপ্রান্তে শাশুড়ী মনদ শোয় আর মাঝখানে থাকে অচেল অবিন্যস্ত জিনিষপত্র। কিন্তু সেই মুহূর্তে অরুণা আর কিছুই ভাবলো না, নিরুপায় ক্রোধে ঠোঁট কামড়ে ফিরে যেতে উদ্যত হলো।

"বৌদি, বৌদি প্লীজ," রূপেন লাফিয়ে সামনে এলো, কৃত্রিম বিনয়ে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে হাতদুটি জোড় করে বললে, "প্লীজ বৌদি, আর এক কাপ চা দিতে পারবে?"

"না—চা-চিনি অতো সস্তা নয়," অনাবশ্যক রূঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলো অরুণা, "আর আমিও তোমার চাকরাণী নই যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় হুকুম তামিল করতে দৌড়বো।"

আহত বিস্ময়ে রূপেন শুধু বললে, "তার মানে?"

অরুণা কঠিন মুখে আরো কি বলতে যাচ্ছিলো; কিন্তু পাশের ঘর থেকে খোকনের কান্নার আওয়াজ তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। অবিবাহিত ননদ পারু কোলে নিয়ে ভোলাচ্ছিলো, তার কাছ থেকে হিংস্র ভাবে খোকনকে ছিনিয়ে নিয়ে অরুণা রুক্ষ স্বরে বললে "একটু ধরতে পারো না ছেলেটাকে?"

পারু কুণ্ঠিত মুখে বললে "পান সাজছিলুম, ওরে কখন·····"

"পান সাজছিলে না হাঁ করে জানলার ওপারে তাকিয়ে ছিলে?"

পারুর মাথাটা আরো নুয়ে গেল, চোখে ভীতত্রস্ত একটা আকুতি ফুটে উঠলো। খোকনকে কাঁখে ফেলে সিঁড়ির ধারের ছোটো জায়গাটায় কাছে এলো অরুণা। কত লোক রাস্তায়, সবাই ব্যস্ত, সবাই অগ্রসর···। খোকনটা একটু চুপ করেছে, সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছেলেকে নিয়ে

জানালার ধারে বসলো একটু, পরম স্নেহে গায়ে একটু হাত বুলোলো অরুণা। "—খোকনমণি, সোনামণি আমার পরশ—" মুখের রেখাগুলো কোমল হয়ে এলো অরুণার; কিন্তু পরক্ষণেই দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটলো ওর মুখে কপালে।

প্রথম প্রেমের রঙিন ফুল, নতুন যৌবনের অমৃত ফল এই খোকন, তবু ছেলেটা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নয়, প্রাণবন্ত নয়, নির্জীব একটা হাড় চামড়ার ঢেলা। গায়ে হাত দিলে হাড়গুলো হাতে ফোটে, মায়ের বুকে ফোটে। অল্পতেই খুঁৎ খুৎ করে কাঁদে আর গভীর ক্লান্তিতে যখন তখন পড়ে পড়ে ঘুমোয়। তেমন কোনো অসুখ নয় যে ডাক্তার ডাকবে। তবুও একবার কোনো বাচ্চাদের স্পেশালিষ্টকে দেখাবার কথা অরুণা তুলেছিলো। দীপেন হেসে বলেছে, "পাগল নাকি?"

"কেন, পাগল কেন," অরুণা তর্ক করেছিলো, "তোমার কি চোখ নেই? দেখতে পাও না ছেলেটা কেমন শুকনো হয়ে যাচ্ছে দিন দিন? ভেতরে ভেতরে কোনো অসুখ হলো কিনা একবার দেখাবে না?"

"এক থোক্ টাকা লাগবে, অরুণা, তাছাড়া—"

"ওগো লাগুক টাকা, আমি যেমন করে পারি খোকনকে একবার দেখাবোই। বার বার তো নয় শুধু একটিবার।"

"—তাছাড়া," দীপেন অন্যদিকে তাকিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেছে, "ডাক্তার কি বলবে তাতো জানাই আছে। এই পরিবেশে এই খাবার খেয়ে কোনো শিশুই খুব ভালো থাকতে পারে না, অরুণা। দেখ না পাড়ার অন্য বাচ্চাদের দিকে চেয়ে, খোকনের চেয়ে ভালো আর কাকে দেখতে পাচ্ছো?"

কথাটা নির্মম সত্য, অরুণা তা জানে। তবু এই টানাটানির মধ্যেও সে নিয়ম করে খোকনকে একটু দুধ খাওয়ায়, অবশ্য তারও বেশীর ভাগই জল। একটা করে কলা দেয় প্রায় রোজই, অন্য ফল তো ছোঁবার জো নেই, আর এদিক ওদিক থেকে বাঁচিয়ে কখনও একটা ডিম কখনও একটুকরো মাছ। কিন্তু এমন করে কি কিছু হয়? চার বছরের শিশুর যে আরো অনেক কিছু দরকার নিয়ম মত চাহিদা মত, তবে তো সে স্বাস্থ্যে প্রাণে ভরপুর হয়ে উঠবে। অরুণার কল্পনার গোপাল বাস্তবে মূর্ত হবে।

দীপেনের যা রোজগার তাতে কি এমন একটি সুস্থ পরিপূর্ণ সংসার গড়ে উঠতে পারতো না? দীপেন, অরুণা আর খোকন। একটু ভদ্র পাড়ায় একটু মনের মতন গৃহস্থালী, পরিপাটী সুরুচি ঢাকা বিছানা, ছিম্‌ছাম বেতের চেয়ার—লাল আর হলুদ, আর রঙীন ফুলদানীর বুকে পুষ্প স্তবকের ঘোষণা।··· কিন্তু না, তা হবে না! বিধবা শাশুড়ী, কলেজে পড়া দেওর, অবিবাহিতা বিশ বছরের ননদ, পুষ্টির আর অন্ত নেই। মনে মনে একটা কটূক্তি করলো অরুণা, কিন্তু খোকনকে একটা চুমন দিয়ে জানলার ধারে বসিয়ে রান্নাঘরে ফিরে যেতে যেতেই লজ্জায় গ্লানিতে তার মন কুঁকড়ে গেল। ছি-ছি, এসব কি ভাবছে সে। শ্বশুর মশাই কতো আদর যত্নে আদরের নির্বাচন করে এনেছিলেন তাকে। "মাগো, আমার ঘরের লক্ষ্মী"—কি স্নেহই না ঝরিত হতো আদরের সেই ডাকে। প্রথম পুত্রবধূ তাঁর, তাঁর কেরাণী জীবনের বিবর্ণ প্রান্তসীমায় একটু শ্যামল সরসতার স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন দীপেনের বধূ নির্বাচন করে। মেয়ে দেখতে গিয়ে অরুণার সামনেই তার বাবাকে বলেছিলেন, "রমিও রঙ

ওতো কর্শা নয় তবুও মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এমনি একটি ধীর স্থির লক্ষ্মী প্রতিমাই আমি দেখেছিলুম, মিত্তিরমশাই।" সেই নিষ্ঠুরতম শ্বশুর মারা গেলেন বিয়ের এক বছর পরেই। খোকনকে দেখেও যেতে পারেন নি শুধু সম্ভাবনটা জেনে গেছলেন। আর বিছানায় পড়ে—দীপেনের নয়—অরুণার হাতে দুটি ধরে অনুরোধ করেছিলেন—শাশুড়ী দেওর ননদকে যেন সে সাধ্যমত দেখাশোনা করে। শ্বশুরের কথা মনে হলে আজও চোখে জল আসে অরুণার।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, রান্নার কাজে ব্যাপৃত হাতদুটো যান্ত্রিক নিয়মে কাজ করে চলেছিলো। পদশব্দ শুনে সচকিত হয়ে ফিরে শাশুড়ীকে দেখতে পেল, বললে, "মা আপনার পুজো হয়ে গেছে? চায়ের জল চড়িয়ে দিই?"

"থাক্ বাছা," শাশুড়ীর কণ্ঠের বিষ চাপা রইলো না, "দেওর ননদকে তো ঝাঁটা মেরে এলে, পাশের ঘরে বসে সবই শুনছিলুম। নিজের কাজটুকু নিজেই সেরে নিই নইলে শাশুড়ী বুড়ীকেই বা ক-দিন ছেড়ে কথা বলবে!"

অরুণা নিঃশব্দে অপরাধ মেনে নিল।

"আমাদের সময়ে অবিশ্যি দেওর ননদকেও মান্য করে চলতে হতো তবে এ-কালে তো দেখি দেওর ননদই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। আর হবেই বা না কেন? দাদা কর্তা, বৌদি বাড়ীর গিন্নী! তা আমি তো বাছা ছেলে বৌয়ের কাছে হাতজোড় করে থাকতে পারবো না। অবিশ্যি জানি যে স্বামী না থাকলে…"

অনেকক্ষণ ধরে বলে যান শাশুড়ী, অরুণা শুনেই যায়। বলবার কিই বা আছে? ভিতরের আকণ্ঠ তিক্ততাকে কেমন করে চেপে রাখবে মানুষ সবক্ষণ? সে নিজে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেনি একটু আগে? রূঢ় ভাষায় দেওর ননদকে তিরস্কার করে আসে নি? তবে বৃদ্ধা শাশুড়ীর অসহিষ্ণুতায় বিরক্ত হবে কেমন করে? এই শাশুড়ীই কি এমনি ছিলো, নতুন বিয়ের পর কখনও একটু বকেছেন, চোখের জল দেখলেই তক্ষুনি বুকে টেনে নিয়েছেন। আর এখন কি অসহিষ্ণুই না হয়ে গেছেন। খিটখিটে মেজাজ, সর্বদাই বৌকে, ছেলেকে, মেয়েকে, নিজের দুর্ভাগ্যকে গালমন্দ করছেন। শ্বশুর মশায়ের মৃত্যুর পর যখন অভাবের সংসারটা আরো করাল দারিদ্র্যের মুখের ভিতর এগিয়ে গেল, যখন সঘাতে অভাবের ধারালো দাঁতগুলো সুতীক্ষ্ণভাবে বসে গেল তখন দিনে দিনে মানুষগুলো বদলে গেল—রস-কষশূন্য ছিবড়ে পড়ে রইল কয়েকটা—বিরক্ত, অসহিষ্ণু, তিলমাত্র ত্রুটিতে পরস্পরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে উৎসুক কয়েকটা জীব। নইলে কেন, সেই বা কেন, রূপেনের সামান্য একটু আবার হাসিমুখে সহ্য করতে পারলো না, কেন অমন নির্মম হয়ে আঘাত করলো ভীত অসহায় ননদটাকে। বিশবছরের মেয়ে, স্কুল থেকেই পড়ার পালা সাঙ্গ করে এসে সংসারের সহস্র কাজে নিজেকে ক্ষয় করছে। বিয়ের আশা তো সুদূর পরাহত। জীবন ওকে কিই-বা দিয়েছে, কিই-বা দিচ্ছে আর ভবিষ্যতের গর্ভেই বা কি অমূল্য নিধি সঞ্চিত আছে ওর জন্যে? খুব কি দোষ দেওয়া যায় যদি দিনান্তে একবার জানলায় দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ীর ছেলেটার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে? হয়তো সেই মুহূর্তটুকু একখণ্ড মণির মত তবুও ওর নিষ্প্রভ দিন রাত্রির এতোটুকু ঔজ্জ্বল্য এনে দেয়, এতোটুকু জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করে ওর ধমনীতে।

শাশুড়ীর বাধা অগ্রাহ্য করে অরুণা নম্র মুখে চা তৈরী করে এগিয়ে দেয় তারপরে আরো

দুটি পাত্রে চা ঢালে। শাশুড়ী ভ্রুকুটি করে বললেন, "এই তো অল্প দুধ, আবার তার এখন চা খাবার শখ হলো তুমি ?"

"একটু ঠাকুরপোকে দিয়ে আসি, মা।"

বাদানুবাদের অপেক্ষা না করে অরুণা চা নিয়ে রূপেনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। বৌদিকে দেখে রূপেন ত্রস্তে উঠে বসলো।

"চা! ব্যাপার কি বৌদি ?" একটু অভিমান একটু উল্লাস দোলা দিল ওর গলায়।—আহা একেবারে ছেলেমানুষ এখনও, অরুণা ভাবলো, যে ক'টা দিন এমন থাকে থাক্। বৌদির মুখে প্রশ্রয়ের হাসি দেখে রূপেন আশ্বস্ত হলো. "থ্যাঙ্ক ইউ বৌদি, তুমি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।"

অরুণার মুখে ব্যথাবিদ্ধ হাসি দেখা দিলো, "অন্নপূর্ণার চায়ে কিন্তু দুধ চিনির অবস্থা খুবই সঙ্গীন।"

"তাই বা মন্দ কি ? গ্র্যাণ্ড হয়েছে, বৌদি, তুমিও খাও।"

"তাই তো ? খেতে হবে দেখছি, বড্ড চলে গেছে, না ? আচ্ছা···পারু, পারু···এই নে·· আরো আমিও একটু নিচ্ছি।" প্লেটে খানিকটা ঢেলে নিয়ে পেয়ালাটা পারুর দিকে বাড়িয়ে ধরে অরুণা। জোলো দুধ মেশানো গরম লিকারটায় চুমুক দেয় তিনজনে, একটু হাসি ফুটে ওঠে চোখে চোখে, একটু স্নেহপ্রীতির ঝলমানি। প্রখর সূর্যের নিচে ভেসে আসা একটুকরো শ্যামল মেঘের ছায়া।

·· সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। শাশুড়ী গেছেন পাঠবাড়ীতে। দীপেনের প্রতীক্ষায় খোকন বার বার সিঁড়ির কাছে ছুটে যাচ্ছে।

"বেড়াতে যাবে, বৌদি ?" রূপেন এসে পাশে বসলো।

অরুণা একটু হাসলো, "হঠাৎ—?"

"না বৌদি, সত্যি চলো না, ভালো লাগবে। দিনরাত এই খোপের মধ্যে বসে থাকা, অসুখ বিসুখ আর মা-র খ্যাচাখেচি শোনা, এতে কি কারো মন মেজাজ ভালো থাকে কখনও ?" গভীর মমতায় বৌদির দিকে তাকালো রূপেন, "কি চেহারা হয়ে যাচ্ছে বৌদি তোমার দিন দিন। চলো আজ একটু খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে আসবে।"

গভীর ক্লান্তির ছাপে নিষ্প্রভ চোখ দুটি বুঝি দেওরের আন্তরিকতার স্পর্শে সজল হয়ে উঠতে চায়, তবু হাসি ফুটিয়ে অরুণা বলে, "ধুর, পাগল কোথাকার।"

"কি করে থাকো বৌদি সারাটা দিন এই ঘুপরিটার মধ্যে ? দমবন্ধ হয়ে কোনদিন মারা পড়বে দেখছি ?"

অরুণার ঠোঁটে হাসিটা ফুটেই রইলো কিন্তু চোখের গভীরে ভাষা স্পষ্ট হলো, মৃত্যু, সেতো রোজই একবার করে ছুঁয়ে যায় ? বাইরে বেরোলেই বা কি ? নিরবিত্ত সমাজের নারীপুরুষ নির্বিশেষে রোজই এই শ্বাসরোধকারী মৃত্যুর স্পর্শ পায় তাই বুঝি তাদের জীবনটুকু ধরে রাখবার ব্যাকুলতা এমন হাস্যকর, এমন প্রাণান্তকর ভাবে প্রকাশ পায়। আর এই অবস্থা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করবার জন্য কয়েকটা কাঁচা তরুণ মন ছাড়া আর কেউ অবশিষ্টও থাকে না।

প্রকাশ্যে এক হাতে পারুকে জড়িয়ে ধরে সামনে টেনে এনে রূপেনকে বললো, "বেড়াতে যাবে বলছিলে না, তবে এই মুখপুড়ীটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। ঘরে বসে বসে এরই বা কি শ্রী খুলছে। পার করতে হবে না ?"

"আর তুমি বৌদি ?"

"আমার কি এখন নড়তে ইচ্ছে করে রে ?" অরুণা কৌতুকের খিলিক ফোটালো, "তোদের দাদা আসবে যে !"

দেওর ননদকে তবু দ্বিধাগ্রস্ত দেখে অরুণা আবার বললে, "যা নারে", খোকনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "এই বাঁদরটাকেও নিয়ে যা। নিরিবিলি বাড়ীতে তোদের দাদার সঙ্গে একটু বিশ্রম্ভালাপ করা যাবে।"

ওদের পিছনে দরজা বন্ধ করে এসে অরুণা আবার বসলো চুপচাপ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে—আকাশ প্রান্তের রঙীন আলোটা এসে পড়ে শ্রীহীন এই পায়রার খোপটাকেও রাঙা করে তুলেছে, অরুণার মুখে গালেও বুঝি তারই ছোঁয়া লেগেছে !—নিচের তলা থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে এলো, এখনই উঠতে হবে সন্ধ্যা দিতে, কিন্তু থাক্ আর একটু পরে উঠলেও হবে। বড়ো ক্লান্ত লাগছে, অবসাদে ছেয়ে আছে শরীর মন। কেন জানি এমন ম্লান ধূসর সন্ধ্যালোকে কান্না নেমে আসতে চায় চোখে। অথচ এই তো একটু সময় যখন পাঁচমিনিট বসতে পারে অরুণা, যখন স্নিগ্ধ হাওয়া এসে সর্বাঙ্গে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দেয়।—হাঁ, ভোরবেলাটাও মিষ্টি···মায়াবী কিন্তু তারপর সূর্য উঠে গেলেই—

দরজায় কড়াটা নড়ে উঠলো, দীপেন ফিরেছে। তার শ্রীহীন ক্লান্ত মুখ আর নিষ্প্রভ চোখের দিকে তাকিয়ে অরুণার মন যেন মোচড় দিয়ে উঠলো।

এ-দিক ও-দিক চেয়ে দীপেন একটু ক্ষমাপ্রার্থীর বিষণ্ণ হাসি হেসে অরুণার হাতে একটা ছোটো প্যাকেট গুঁজে দিলো !—নিচু আদরের স্বরে বল্লে, "রুণী, রাগ পড়েছে ?"

কি এটা ? ফুল নাকি—লাল আর হলুদ ? না, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—তবে বোধহয় বই। অরুণার ঠোঁটে দীপেনের বিষণ্ণ ক্ষমাপ্রার্থীর হাসি প্রতিফলিত হলো, যদিও চোখের কোলে সজল আভাস. ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে।

খুলে ফেললো প্যাকেটটা।—না ফুল নয়, বই নয়—একটা রঙীন ছিটের ব্লাউজ পীস। দেখতে দেখতে উচ্ছ্বসিত আবেগে কেঁদে ফেললো অরুণা সেই কাপড়টাতেই মুখ গুঁজে।

"অরুণা—রুণী···রুণী—" দীপেন ব্যাকুল হয়ে অরুণাকে বেষ্টন করলো। গভীর স্নেহে চোখ দুটী ওর নরম হয়ে এলো—আহা কত খাটুনি সংসারে, এতোজনের মন জুগিয়ে চলা, তার ওপরে আমিও যদি এমন অবুঝপণা করি "—রুণী···রুণী···"

অরুণা কাঁদছিলো !—না.—খাটুনির জন্যে নয়, দীপেনের অবুঝপনার জন্যেও নয়। অরুণা শুধু ভাবছিলো এই ভাবেই দিনের পর দিন যাবে আর মানুষগুলো ক্রমেই আরো বেশী করে বদলে যাবে। অরুণা ক্রমে পাতড়ীর মতো খিটখিটে হয়ে যাবে। দিনরাত শুধু আত্মীয় পরিজন নিজের দুর্ভাগ্যকে গালাগাল দেবে। আর দীপেন—দীপেন আর জীবনে দুটো ফুলের তাঁটি নিয়ে বাড়ী ফিরবে না। সন্ধি স্থাপনের সূত্র খুঁজতে কিনে আনবে একটা ছিটের ব্লাউজ, যাতে অরুণার পরিধেয়টা শুধু কিছুদিন একটু ভদ্র হয় কিংবা আনবে একটা কুড্ যাতে খোকনের গালের পাংশু অভাবটা কিছুদিন একটু কমানো যায়।

আঃ—কি ক্লান্তিকর এই আবর্তন ! প্রতিদিন···প্রতিদিন সূর্য উঠবে সমস্ত কুশ্রীতাকে নগ্নভাবে প্রকট করে দিয়ে। মানুষগুলো সেই কুশ্রীতা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে জানোয়ারের মত আঁচড়া আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি করবে। আবার সন্ধ্যা এসে যখন রিক্ত দরিদ্র এই পৃথিবীর উপর নামিয়—শ্রান্তির একটা মায়াবী আবরণ টেনে দেবে তখন মানুষগুলো আবার লজ্জিত অনুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থী হয় পরস্পরের কাছে এগিয়ে যাবে। এমনি করেই কাটবে দিনের পরে রাত আবার রাতের পরে দিন, জীবনের পরে মৃত্যু আর মৃত্যুর পরে আবার জীবন। ঈশ্বর ! কি বিবর্ণ, বিস্বাদ, বৈচিত্র্যহীন তোমার সৃষ্টি !

আঁচলে চোখ মুছে তাড়া তাড়া গলায় অরুণা বললে, "সারাদিন না খেয়ে আছো। হাত মুখ ধুয়ে যাবে চলো।"

দিনান্তের শেষ আলোটুকুও নিভে গেল।

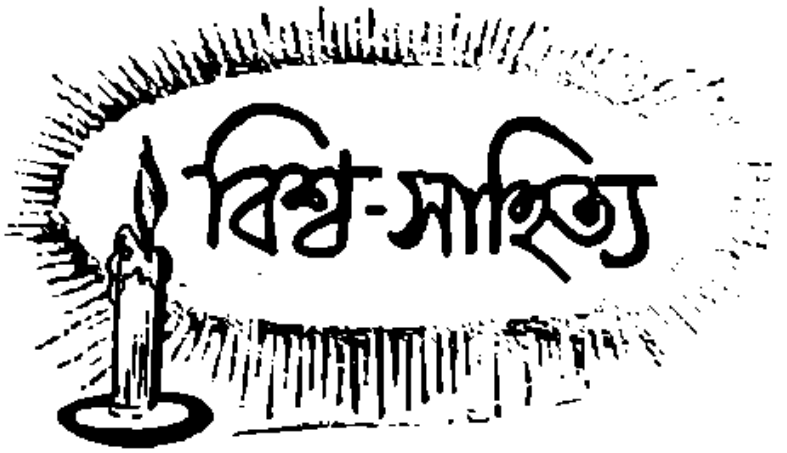

সেবাস্টিয়ান বাক

নীলাদ্রি সোম

সংগীতের দেশ, সুরের মায়াপুরী জার্মানী। সেখানে এসেছে নতুন প্লাবন। নতুন উদ্দীপনা : জার্মানীর সংগীত-রাজ্যে চলেছে রেনেসাঁস।

ওই দেশেরই এক তরুণ শিল্পী গেছেন হ্যামবুর্গ শহরে। তীর্থ করতেই বুঝি গেছেন। অনেক দিনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। দেখা করতে পারবেন প্রায় শতাব্দী কালের বর্ষীয়ান শিল্পী রিনকে-র সঙ্গে। অর্গান বাজিয়ে হিসেবে ওই বৃদ্ধ শিল্পীর খ্যাতি তখন সমগ্র জার্মানীতে। তাঁর খ্যাতি তখন জাতীয় খ্যাতি। তরুণ শিল্পীটি ওই বৃদ্ধ কলাবিদকে এতদিন ধ'রে দেখে এসেছেন দেবতার মতো। তরুণ শিল্পী তাঁকে বাজিয়ে শোনালেন একটা পুরোনো সুর : "আপ অন দি রিভারস অব ব্যাবিলন।" যেন সুর নিবেদন করলেন বৃদ্ধের উদ্দেশে। বৃদ্ধ শিল্পীর চোখে দেখা দিল আনন্দের অশ্রু। তরুণ সংগীতকারকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন : "এতদিন ভয় ছিল আমার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই এই (অর্গান বাদন) শিল্পেরও মৃত্যু হবে। কিন্তু আর আমার ভয় নেই। তুমি এই শিল্প বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।"

ওই তরুণ শিল্পী সেবাস্টিয়ান বাক। ওই সাক্ষাৎকারের কিছুকালের মধ্যেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। সুরস্রষ্টা আর অর্গান-বাজিয়ে হিসেবে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

জন্ম ১৬৮৫ সালে। আইজেনাকে। বাবা ছিলেন রাজসভার অন্যতম সংগীত-শিল্পী। বাক রক্তের ভেতরে সুর পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁর পরিবারের প্রায় সবাই অল্প বিস্তর গান-বাজনার চর্চা করতেন। প্রতি বছর তাঁদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হত সংগীত সম্মেলন। অনুমান ক'রে নেয়া শক্ত নয় এই আকাশে ভাসা মেঘেই বাক প্রথম শুনেছিলেন সুরের সকার।

তাঁর জীবনের বেশির ভাগ কাল কেটেছিল হ্যাইমার আর লাইপজিগ শহরে। জার্মানীর বিভিন্ন রাজসভায় বিভিন্ন সময়ে ছিলেন কনসার্ট পরিচালক। যশ, সম্মান সবই পেয়েছিলেন প্রচুর।

তবু বাক স্বভাবের দিক থেকে ছিলেন নির্জনতা পিয়াসী। নিজেকে জাহির করতে অনিচ্ছুক। প্রলোভন এসেছিল জীবনে অনেক। ভালো ভালো কাজের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন অনেকবার। কিন্তু সেই সব ডাকে সাড়া দেননি বাক, সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কেন? কারণ তিনি জানতেন ওই সব আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে পয়সা কড়ি বা অন্য পাঁচটা বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা নিশ্চয়ই

হিসবে। কিন্তু এর ফলে যে সমাজে গিয়ে তাঁকে পড়তে হবে তা চটুল, সৌখিন। গভীরতার কোনো স্থান সে জগতে নেই। গা-ভাসিয়ে চলাতেই, নিজের রূপ ঐশ্বর্য প্রকট ক'রে দেখানোতেই সেই সমাজের নর-নারীদের আগ্রহ, আনন্দ। সেখানে গেলে আর সবই হয়তো হবে, হবে না শুধু সুরের সাধনা। সেই সর্বনেশে সমাজের চাইতে ঢের ভালো তাঁর নিজস্ব সীমিত জগত। হয়তো জীবন সেখানে কৃচ্ছ্রতা সাপেক্ষ, কিন্তু সংগীতের মৃত্যু-জয়ী ধারায় স্নাত। কী দরকার নিজের সেই আশ্চর্য পৃথিবী ত্যাগ ক'রে বাইরে যাবার।

তবু মাঝে-মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয়েছে বাককে। তখনকার দিনে কেবল যে যুদ্ধের প্রদর্শনী বা টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হত তা নয়। সংগীত প্রতিযোগিতার আসরও বসত মাঝে-মাঝে। অসংখ্য শ্রোতা সেই সব আসরে উপস্থিত থাকত।

পোল্যাণ্ডের রাজা এবং স্যাক্সনীর ইলেক্টর দ্বিতীয় অগাষ্টাসের পৃষ্ঠপোষকতায় এই রকম একটা আসর বসেছিল একবার। বাকের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন একজন ফরাসী শিল্পী। ইনি নির্বাসিত হয়েছিলেন প্যারিস থেকে। নিজের বাজনা শুনিয়ে তিনি আগেই মোহিত করেছিলেন রাজাকে। স্থির হল ওই শিল্পী এবং বাক একই বিষয় বাজাবেন। বাজনার উৎকর্ষ শুনে দু'জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নির্ণয় করা হবে। কিন্তু প্রতিযোগিতার আগেই ফরাসী শিল্পী বাকের বাজনা শুনে বুঝতে পারলেন বাক তাঁর চাইতে অনেক বড় বাজিয়ে। প্রতিযোগিতার দিন তাঁকে আর দেখা গেলনা। ড্রেসডেন শহর থেকে তিনি গোপনে কখন স'রে পড়েছেন।

প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর জীবন লেবাস্টিয়ান বাকের। বাইরের দিক থেকে প্রায় যেন নিস্তরঙ্গ। কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ জীবন ছিল সমুদ্র-গর্ভের মতো, রূপের সমারোহে বিস্ময়কর।

বাক বিবাহ করেছিলেন দু'বার। ছেলে মেয়ের সংখ্যা ছিল কুড়ি। অথচ তাঁর আয় খুবই কম। তবু, মিতব্যয়ী ছিলেন ব'লে ওই আয়েই সংসার চালিয়ে গেছেন। বাকের স্ত্রী-ভাগ্য ভালো ছিল। স্বামীর সুর-সাধনা যাতে একটুও ব্যাহত না হয় সে-দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল।

মৃত্যুর বছর তিনেক আগে বাক সাদর আমন্ত্রণ পেলেন সেকালের প্রাশিয়ার বিখ্যাত রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের কাছ থেকে। বার্লিনে যাবার জন্যে তিনি বাককে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। ফ্রেডারিকের রাজসভা তখন য়ুরোপের উজ্জয়িনী।

যে রাতে বাকের রাজধানীতে পৌঁছাবার কথা সেই রাতে ফ্রেডারিকের প্রাসাদে সংগীতের আসর বেশ জমে উঠেছিল। কনসার্টের সুর-তরঙ্গে শ্রোতাদের হৃদয় আপ্লুত। ফ্রেডারিক শুনলেন যার নাম আজ জার্মানীর ঘরে ঘরে উচ্চারিত সেই মহৎ সংগীত-শিল্পী এসে পৌঁছেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তাঁকে আহ্বান করলেন রাজসভায়। জানালেন অন্যদের মতো তাঁকে নিয়ম মানতে হবে না, প্রাসাদে আসার জন্য পরতে হবে না নির্দিষ্ট পোষাক। যা প'রে এসেছেন সেই পরিচ্ছদেই যেন তিনি চলে আসেন সংগীত সভায়। বাক এসে হাজির হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কনসার্ট থামিয়ে রাজা ঘোষণা করলেন: "ভদ্র-মহোদয়গণ, এই যে বাক উপস্থিত হয়েছেন।" কৃতজ্ঞ বাক পরে এই রাজার উদ্দেশে তাঁর রচিত একটি সুর উৎসর্গ করেছিলেন। তবে রাজার অনুরোধ সত্ত্বেও বেশিদিন থাকেননি বার্লিনে। ফিরে গিয়ে-ছিলেন লাইপজিগে, নিজের বাড়িতে।

সুরসৃষ্টির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করতেন, চোখ খাটাতেন বাক। তাই মৃত্যুর কিছু আগে তাঁর দু'টি চোখই অন্ধ হ'য়ে যায়। তাঁর মৃত্যু হয় ১৭৫০ সালের ৩০শে জুলাই। তাঁর সমাধি সমগ্র জার্মানীর পবিত্র তীর্থ।

মাকড়সার জাল

মূল : রিয়োনোস্থকি আকুতাগাওয়া

অনুবাদ : গৌরীশংকর দে

[লেখক পরিচয় : রিয়োনোস্থকি আকুতাগাওয়া জাপানের এক অনন্য সাহিত্য-প্রতিভা। তাঁর গল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে জাপানের ক'য়েকটি সেরা চলচ্চিত্র। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত 'রাশোমোন'। মামুলী বিষয়ের চাইতে, অসাধারণ আর অদ্ভুতের দিকেই ছিল এই জাপানী লেখকের আকর্ষণ। বর্তমান গল্পে আশ্চর্য সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে বুদ্ধের করুণাঘন হৃদয়।]

এক

একদিন বুদ্ধ স্বর্গের পদ্ম-সরোবরের তীরে পায়চারি করছিলেন।

সরোবরের পুষ্পিত পদ্মগুলি মুক্তার মতই শুভ্র। পদ্মের সোনালি গর্ভ-কেশর আর পরাগ-কেশর অনবদ্য ঘ্রাণে অনবরত ভ'রে রাখছে বাতাস।

ভোর হয়েছে স্বর্গে।

এক মুহূর্তের জন্য বুদ্ধ পদ্ম-সরোবরের তীরে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন। আর, জলের ওপরকার পাতার ফাঁকে হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ চোখে পড়ল নিচের দৃশ্য।

স্বর্গের পদ্ম-সরোবরের ঠিক নিচেই নরকের মেঘ। তাই স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জলের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল অনন্ত তমসার দিকে প্রবাহিত ত্রি-ধারা নদী আর সূঁচ পাহাড়ের তীক্ষ্ণ চূড়া।

বুদ্ধের চোখ পড়ল কান্দাতা নামে একজন লোকের ওপর। অন্য পাপীদের সঙ্গে সে-ও কিলবিল করছিল নরকের তলদেশে।

বেঁচে থাকতে কান্দাতা ছিল কুখ্যাত দস্যু। নরহত্যা, গৃহদাহ ইত্যাদি কত দুষ্কর্ম যে তখন সে করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে জীবনে অন্তত একটা ভালো কাজ সে করেছে। গভীর বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে তার চোখে পড়েছিল একটা ছোট মাকড়সা রাস্তার ধারে বুকে হেঁটে যাচ্ছে।

ওটাকে মেরে ফেলার জন্য এক পা তুলেছিল কান্দাতা। হঠাৎ তার মন ব'লে উঠল : "না, না। যত ছোট হোক, ওরও আছে প্রাণ। অবিবেচনা বশে ওটাকে মেরে ফেলা খুবই অন্যায় হবে।" মাকড়সাটাকে সে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

কান্দাতা যে মাকড়সার প্রাণ রক্ষা করেছিল তা বুদ্ধের মনে পড়ল। নরকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। তিনি স্থির করলেন ওই সৎকাজের জন্য কান্দাতাকে তিনি উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন। আনন্দের কথা, একটু এদিক ওদিক তাকাতেই দেখতে পেলেন স্বর্গের একটা মাকড়সা পদ্মপাতার ওপর চমৎকার রুপোলি জাল বুনে চলেছে।

বুড়ো আঙুলে সুতোটা নিজের হাতে তুলে নিলেন। মুক্তা-শুভ্র পদ্মগুলি নিজেদের মধ্যে খানিকটা ব্যবধান রেখেছিল। সেই ব্যবধানের একটির মধ্য দিয়ে সুতোটা সোজা নামিয়ে দিলেন নরকের দিকে।

দুই

কান্দাতা নরকের মেঘের ওপরকার রক্তের সরোবরে অন্যান্য পাপীদের সঙ্গে একবার ভেসে উঠছিল, আবার ডুবে যাচ্ছিল।

সরোবর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। সেই অন্ধকারে যা অস্পষ্ট চেহারা নিয়ে থেকে থেকে ভেসে উঠছে সেটা ভয়াবহ 'দুঁচ পাহাড়'। সরোবরে কবরের স্তব্ধতা। কেবল মাঝে মাঝে শোনা যায় পাপীদের ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস। কারণ এখানে যে-সব পাপীরা এসেছে তারা এর আগেই এত সব যন্ত্রণা ভোগ ক'রে এসেছে যে এখন আর তাদের কাঁদবার ক্ষমতাও নেই।

পার্থিব জীবনে মস্ত ডাকাত ছিল কান্দাতা। কিন্তু এখন? দম আটকে আসছে রক্তে। যেন অন্তিম অবস্থায় একটা ব্যাং বাঁচবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তবু তার বাঁচার আশা নেই।

কিন্তু আশার কারণ বোধ হয় আজ এসেছে। কান্দাতা হঠাৎ মাথা তুলে রক্ত সরোবরের ওপরকার আকাশের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল উঁচু, স্বর্গের বহু উঁচু আকাশ থেকে মাকড়সার একটা রুপোলি জাল তার দিকেই নেমে আসছে। শুধু অন্ধকারে সে'টি সামান্য ঝিলমিল করছে, যেন মানুষের চোখকে তার ভয়।

জালটা দেখতে পেয়ে কান্দাতা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। ওই সুতোটা বেয়ে বেয়ে যদি উপরে ওঠা যায় তবে নিশ্চয়ই নরক থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। মাঝখানে কোনো গোলমাল হ'লে হয়তো স্বর্গেও ঢুকে পড়া যেতে পারে। তা হলে আর দুঁচ পাহাড়ের গায়ে গিয়েও আছাড় খেতে হবে না। কিংবা নাকানি-চুবানিও খেতে হবে না রক্ত সরোবরে।

এই সব কথা ভেবে সে দুহাত দিয়ে সুতোটাকে শক্ত ক'রে ধরে মরিয়া হয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল। আগে বড় ডাকাত ছিল ব'লে উপরে ওঠার এই সব কায়দায় সে খুবই অভ্যস্ত।

কিন্তু স্বর্গের থেকে নরকের দূরত্ব যে কত মাইলের তা কেউ জানে না। তাই চেষ্টা ক'রেও সে সহজে নরকের সীমানা ছাড়াতে পারল না। কিছুটা উপরে উঠতেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল। আর এক ইঞ্চি উপরে ওঠার ক্ষমতাও যেন নেই।

অবসন্ন কান্দাতা একটু বিশ্রাম নিতে লাগল। সুতোয় ঝুলতে ঝুলতে তাকাল অনেক নিচে। প্রাণপণ চেষ্টায় সুতো বেয়ে এসেছে বলে সে অবাক হ'য়ে দেখল একটু আগেও যে রক্ত সরোবরে সে ছিল, তা ঢাকা পড়ে গেছে অন্ধকারে। কেবল মাঝে মাঝে ঝিকমিক ক'রে উঠছে অস্পষ্ট, ভয়ংকর দুঁচ পাহাড়। এই ভাবে উপরের দিকে উঠতে পারলে, সে যা ভেবেছে তার চাইতেও সহজে নরক থেকে উদ্ধার পাবে।

মাকড়সার জালে হাত দুটি মোচড়ানো অবস্থায় রেখেই কান্দাতা হো হো ক'রে হেসে, তারস্বরে ব'লে উঠল: "সফল হয়েছি। সফল হয়েছি!"

কিন্তু হঠাৎ তাকিয়ে দেখল সুতোর নিচেকার অংশে অগণন পাপী ঝুলছে। তার নিচে তারাও ব্যাকুল হ'য়ে উঠে আসছে উপরের দিকে। ক্রমশই উপরের দিকে। যেন অসংখ্য পিপড়ের মিছিল।

এই দৃশ্য দেখে কান্দাতা কয়েক মুহূর্ত শুধু চোখের পলক ফেলল। বিস্ময়ে আর আতঙ্কে তখন তার প্রকাণ্ড মুখ হাঁ হ'য়ে গেছে।

মাকড়সার যে সরু সুতোটা কান্দাতারই শরীরের ভর রাখতে পারবে ব'লে মনে হচ্ছে না, সেটা কেমন করে সইবে এতগুলি মানুষের ভার।

সুতোটা যদি মাঝামাঝি জায়গায় ছিঁড়ে যায় তবে তার এত কষ্ট ক'রে এতখানি উপরে উঠেও কিছুই লাভ হবে না। আবার গিয়ে সোজা পড়তে হবে নরকে।

কিন্তু ইতিমধ্যে হাজার হাজার পাপী সার বেঁধে প্রাণপণ শক্তিতে সেই সরু, ঝিলমিল সুতো বেয়ে উঠে আসছে অন্ধকার রক্ত সরোবর নিচে ফেলে। এর মধ্যে কোনো প্রতিকার না করলে টুকরো হ'য়ে যাবে। আবার পড়ে যেতে হবে নিচে।

চিৎকার ক'রে বলল: "শোন পাপীরা। মাকড়সার এই সুতোটা আমার। এটা বেয়ে উপরে ওঠার অনুমতি কে তোমাদের দিলে? নেমে যাও! নেমে যাও!"

সুতোটা ছিঁড়ে যাবার কোনো লক্ষণই এতক্ষণ দেখা যায় না।

ওই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তা হঠাৎ সামান্য শব্দ ক'রে ছিঁড়ে গেল।...যেখানটায় ঝুলছিল, ছিঁড়ল তার একটু উপরে। চিৎকার করার সময়ও সে পেলে না। লাটিমের মতো ঘুরতে ঘুরতে আবার গিয়ে পড়ল অন্ধকারে।

এর কিছু পরে, স্বর্গের মাকড়সার জালটাকেই শুধু ছেঁড়া অবস্থায় ঝুলতে দেখা গেল চন্দ্রহীন, নক্ষত্রহীন আকাশে। ঝিলমিল করছিল সেই সরু সুতো।

তিন

স্বর্গের পদ্ম-সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনাটা প্রত্যক্ষ দেখছিলেন। কান্দাতাকে একখণ্ড পাথরের মতো রক্ত সরোবরের তলায় ডুবে যেতে দেখে তিনি আবার বিষণ্ণ মুখে হাঁটতে শুরু করলেন।

কেবল নিজেকে বাঁচবার জন্য কান্দাতার স্বার্থপরতা এবং নরকে আবার তার পতন বুদ্ধের চোখে মনে হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু স্বর্গের পদ্ম-সরোবরে শতদলেরা এই সব বিষয়ে একেবারে উদাসীন।

মুক্তা-শুভ্র পদ্মপুষ্পরাশি বুদ্ধের পায়ের কাছে আন্দোলিত হচ্ছিল। আর তাদের স্বর্ণাভ গর্ভ-কেশর থেকে অবিরাম নিঃসৃত সৌরভ পূর্ণ ক'রে রেখেছিল বাতাস।

স্বর্গে তখন দুপুর হতে চলেছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ৬ ॥

বরেনবাবু বললেন, 'লক্ষ্মীর মার অসুখ। লক্ষ্মীকে সে একবার দেখতে চায়।'

'তার মানে আপনি নিয়ে যেতে চান লক্ষ্মীকে। এই তো ?'

'হ্যাঁ। দিনকতক্ রেখেই আবার আমি দিয়ে যাব তাকে।'

হরেনবাবু বললেন, 'অসম্ভব। লক্ষ্মীকে ছেড়ে আমি লক্ষ্মীছাড়া হতে পারবো না। লক্ষ্মীকে আমি চিরদিনের জন্য বেঁধে রাখবো এই বাড়ীতে।'

বরেনবাবু ভাবলেন, কথাটা হাসি-রহস্যের কথা। বললেন, 'লক্ষ্মী তো আপনার ঘরে বাঁধাই আছে বেইমশাই, কিন্তু আমার ঘরেও এক-আধবার উঁকিঝুঁকি মারতে দোষ কি ?'

বরদাসুন্দরী এগিয়ে এলেন। বললেন, 'দোষ কিছুই নেই বেয়াই মশাই। আমি আপনাদের হেঁয়ালী বুঝি না। আমার কাছে সত্যি কথা শুনুন। আমার বাড়ীতে পুজো জানেন তো ?'

'জানি।' বললেন বরেনবাবু।

'বাস, জানেন যদি তাহ'লে এক কাজ করুন। আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্ত্রীকে আর ছেলেকে নিয়ে চলে আসুন এই বাড়ীতে। পুজোর দিনগুলো আমরা সবাই মিলে আনন্দ করে থাকি।'

এঁরা বড়লোক। তার ওপর মেয়ের শাশুড়ী। তাঁর কথার ওপর কথা বলা চলে না। বরেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, 'বেশ তাই বলিগে যাই।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'বলবেন আবার কি ? আপনিই তো বাড়ীর কর্তা। আসতেই হবে। মা এলে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসবো।'

লক্ষ্মী তারি খুশী। তার মা আসবে এই বাড়ীতে। তার দাদা আসবে পুজোর সময়, বেশ মজা হবে।

লক্ষ্মী দিন গুণতে লাগলো।

বরদাসুন্দরী একদিন নিজে লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাজার থেকে তার ভাল ভাল কাপড়জামা কিনে আনলেন। ওই সঙ্গে রবিরও কিনলেন, ছবিরও কিনলেন।

বাড়ীতে পুজো। ঠাকুর দালানে প্রতিমা এসেছে। বেয়াইবাড়ীতে গাড়ী গেছে। বরেনবাবু আসবেন। লক্ষ্মীর মা আসবে, দাদা আসবে। লক্ষ্মীর আনন্দ আর ধরে না।

বঙ্গীর দিন সকালে বরদাসুন্দরী লক্ষ্মীকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন। খুব দামী একখানি শাড়ী পরালেন। সোনার গহনা'র সর্ব্বাঙ্গ মুড়ে দিলেন। মাথায় দিলেন সোনার মুকুট। পায়ে দিলেন রূপোর নূপুর দেওয়া পায়জোর।

লক্ষ্মীকে দেবী-প্রতিমার মত মনে হতে লাগলো।

লক্ষ্মী প্রণাম করলে বরদাসুন্দরীকে।

বরদাসুন্দরী বললেন, 'চল এবার তোমার শ্বশুরকে প্রণাম করবে চল।'

এই বলে তাকে ধরে নিয়ে গেলেন হরেনবাবুর কাছে। পায়ের তোড়া ঝুম্ ঝুম্ করে বাজতে লাগলো।

হরেনবাবু লক্ষ্মীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তার পর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নববধূর দিকে।

বরদাসুন্দরী বললেন, 'ভাখো কেমন মানিয়েছে। আমার ঘর আলো-করা বৌ।'

হরেনবাবু বললেন, 'সত্যিই তোমার চোখ আছে।'

বাইরের সদরে মনে হলো যেন একটা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়ালো।

'ওই বোধহয় আমার মা এলো!'

বলেই সে ছুটলো সেইদিকে। ঝুম্ ঝুম্ করে পায়ের নূপুর বাজতে লাগলো।

হরেনবাবু তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছিলেন।

'কি ভাবছো?' বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন।

হরেনবাবু বললেন, পুজো তো আমার বাড়ীতে প্রতি বৎসরই হয়। কিন্তু মনের এই ভাবটি তো কখনও হয় না!'

'মনে আবার কি ভাবের উদয় হলো তোমার?'

হরেনবাবু বললেন, 'বৌমাকে দেখে হঠাৎ আমার মনে হলো যেন মা-দুর্গা নিজে এসেছেন আমার বাড়ীতে।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'হ্যাঁ, মা দুগ্‌গাই তো!'

ওদিকে লক্ষ্মী যাচ্ছিল সদর দরজার কাছে গাড়ী দেখতে। পথে রবির সঙ্গে দেখা। রবি বললে, 'আমাদের গাড়ী নয়। যেতে হবে না। এসো।'

লক্ষ্মীর হঠাৎ কি মনে হলো, রবির কাছে গিয়ে তার কানে কানে বললে, 'তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও ঠাকুরপো।'

রবি জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন?'

লক্ষ্মী বললে, 'মা যদি এইদিকে আসে তো আমাকে ইসারা করে জানিয়ে দিও।'

রবি বললে, 'তুমি বুঝি দাদার ঘরে যাচ্ছো?'

লক্ষ্মী হেসে বললে, 'যাবো, জানো না বুঝি? আজ যে প্রণাম করতে হয়!'

এই বলে লক্ষ্মী তার পায়ের তোড়াটা হাত দিয়ে একটু তুলে পা টিপে টিপে রবির ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

রবি পাহারা দিতে দিতে হঠাৎ দেখলে মা সেইদিকেই আসছে।

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৌমাকে দেখলি ?'

মিছে কথা বলতে অনেক সময় ভালই লাগে। রবি বললে, 'কইনা তো !'

বলেই সে আঙুল বাড়িয়ে উল্টো দিকটা দেখিয়ে দিল।

'মনে হলো যেন এইদিকে গেল দেখলুম।'

বরদাসুন্দরীর বিশ্বাস হলো না। রবির মুখ চোখের ভাবভঙ্গী কেমন যেন অন্যরকম।

'না সে ওদিকে যায়নি। ওর মাকে দেখবার জন্যে এইদিকেই যেন ছুটে এলো। কিন্তু আমাদের গাড়ী তো এখনও আসেনি। তাহ'লে সে গেল কোথায় ?'

মনে-মনে ঠিক জানেন সে কোথায় গেছে।

ছবির ঘরের দিকে যেই তিনি পা বাড়িয়েছেন, রবি তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের কাছে হেঁট হয়ে বললে, 'দাঁড়াও তোমাকে একটা প্রণাম করি। আজ নতুন জামাকাপড় পরে প্রণাম করতে হয়।'

রবির প্রণাম যেন শেষই হয় না !

বরদাসুন্দরী এতক্ষণে সবই বুঝতে পারলেন। ভালই লাগলো তাঁর। হাসতে হাসতে বললেন, 'আর কত প্রণাম করবি ? ওঠ্ !'

এই বলে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে দিলেন।

ওদিকে ছবির ঘরে তখন আর এক ছবি।

ছবিকে প্রণাম করে লক্ষ্মী উঠে দাঁড়াতেই ছবি তাকে তার বুকের কাছে চেপে ধরলে। চেপে ধরে চুপিচুপি তার কানে কানে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বরদাসুন্দরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বৌমা !'

'এই রে ! মা ডাকছে।'

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

রবিও যেন ধরা পড়ে গেছে। তাই আর সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো না। পালিয়ে যাচ্ছিল সেখান থেকে।

বরদাসুন্দরী বললেন, 'রবি, খাসনে, দাঁড়া।'

রবিকে দাঁড়াতে হলো।

লক্ষ্মী আসছে। পায়ে ঝুম্ ঝুম্ শব্দ উঠছে। তারও মুখখানি ধরাপড়া চোরের মত ম্লান। ধীরে ধীরে সে বরদাসুন্দরীর কাছে এসে দাঁড়ালো মাথা হেঁট করে।

বরদাসুন্দরী বললেন, 'রবি, তোর বৌদিকে প্রণাম কর্ !'

তার খেলার সাথী লক্ষ্মী। প্রণাম কর্ বললেই কি প্রণাম করা যায় ? একবার মার মুখের দিকে একবার লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসতে লাগলো রবি।

'হাসি নয় বাবা।' বরদাসুন্দরী বললেন, 'বৌদি তোমার গুরুজন।'

রবি প্রণাম করলে লক্ষ্মীকে।

বরদাসুন্দরী বললেন, আজ এই পুজোর দিনে আমার পায়ে হাত দিয়ে বল—বৌদির কথার অবাধ্য কোনোদিন হবে না। সে যখন যা বলবে তাই করবে।'

লক্ষ্মীর যে দুটি পায়ে রবি একদিন আলতা পরিয়ে দিয়েছিল সেই দুটি পায়ে হাত রেখে রবি তার সেই হাত মাথায় ঠেকালে।

ফাঁকা গাড়ী ফিরে এলো। লক্ষ্মীর মা-বাবা আসতে পারলেন না। লক্ষ্মীর মার শরীর নাকি খুব খারাপ।

মার অসুখ শুনে লক্ষ্মীর মুখখানি শুকিয়ে গেল। কিন্তু মুখে কিছুই সে বলতে পারলে না।

বরদাসুন্দরী বুঝলেন সেকথা। বললেন, পুজোর পর তোমাকে আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। মা-বাবাকে বিজয়ার প্রণাম করে আসবে আর রেখে আসবে।'

ছেলেমানুষ। পুজোর আনন্দে সবই সে ভুলে গেল। আবার হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো রবির সঙ্গে।

আবার যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো সবই।

লক্ষ্মীকে চোখে চোখে রাখেন বরদাসুন্দরী। ছবির ঘরে যেতে দেন না। আবার যখন রবিকে পাহারা রেখে লুকিয়ে চুরিয়ে লক্ষ্মী গিয়ে ঢোকে ছবির ঘরে—তখন তিনি খুশী হন। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেন আর মনে মনে খুশী হন।

নবমী পুজোর দিন হরেনবাবু বরদাসুন্দরী দুজনেই ব্যস্ত হয়ে ছিলেন ঠাকুর-দালানে। এদিকে ততটা নজর দিতে পারেননি। রবিও ছিল তাদের সঙ্গে।

হরেনবাবু নিজের চোখে দেখলেন, লক্ষ্মী বেরিয়ে এলো ছবির ঘর থেকে।

বরদাসুন্দরীকে ডেকে বললেন, 'ওরা যে দেখছি দিব্যি ভাব জমিয়ে তুলেছে। আজ বোধহয় সারাটা দিনই একসঙ্গে ছিল।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'থাক্ না। কত আর হাত আড়াল দেবে?'

হরেনবাবু বললেন, 'না না তুমি বুঝতে পারছো না। ছবির পড়ার ক্ষতি হবে।'

'খুব বুঝতে পারছি।' বরদাসুন্দরী বললেন, আমার মনে হয়, ওদের যদি বাধা দিই তাহ'লেই ক্ষতি হবে পড়ার। দিনরাত বৌএর কথা ভাববে, পড়ার কথা আর ভাববেই না।'

হরেনবাবু সেদিন থেকে আর কিছু বলেন না।

'বেশ তবে তাই হোক্। তাড়াতাড়ি নাতি নাৎনীর মুখ দেখো।'

বিজয়া দশমীর দিন বরদাসুন্দরী লক্ষ্মীকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছবিকে প্রণাম করেছো বৌমা?'

লক্ষ্মী মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো। কথাটার জবাব দিলে না।

রবি ছিল কাছেই দাঁড়িয়ে। সে তখন হাসছে মুখ টিপে টিপে।

'কি'রে, তুই হাসছিস কেন?'

রবি তাকালে লক্ষ্মীর দিকে।

'বলে দেবো?'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'বল না।'

রবি বললে, 'করেছে। করেছে।'

'তুমি প্রণাম করেছো তোমার বৌদিকে?'

রবি বললে, 'সেদিন করলাম তো! হরদম প্রণাম করতে হবে নাকি? আমি পারব না।'

রবি চলে যাচ্ছিল। বরদাসুন্দরী হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন তাকে।

বললেন, 'আজ বিজয়া দশমী। প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিন সবার আগে তুমি প্রণাম করবে তোমার বৌদিকে। এখনও করনি? খুব অন্যায় করেছ।

রবি রেগেই বললে, 'এই নাও, করছি!' বলেই লক্ষ্মীর পায়ের কাছে চিপ্ করে নিজের মাথাটা ঠুকে দিলে।

লক্ষ্মী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

(ক্রমশঃ)

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

প্রথম বাঙলা নাটকের অভিনয়

বাংলা নাটক অভিনয়ের আগে কলকাতার বিশিষ্ট ধনী ও রসজ্ঞ ব্যক্তিরা ইংরেজী নাটকের অভিনয় করেছেন। প্রথম বাঙলা নাটক অভিনীত হয় শ্যামবাজারের অধিবাসী নবীনচন্দ্র বসুর চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে।

এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো সেই জায়গায় নবীনচন্দ্র বসুর বসত বাড়ি ছিল। নবীনচন্দ্র একশ তিরিশ বছর আগে বাঙলা নাটকের প্রচলন করার জন্যে বহু টাকা খরচ করেছিলেন। তাঁকেই আজ বাংলা নাটকাভিনয়ের প্রবর্তক রূপে স্মরণ করা হয়।

১৮৩৫ সালের ৮ই অক্টোবর নবীনচন্দ্রের নাট্যশালায় বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হয়। অভিনয় কেমন হয়েছিল তার বিবরণ আমরা পাই 'হিন্দু পায়োনীয়র' নামক ইংরাজী পাক্ষিক পত্রের এক দীর্ঘ সমালোচনায়। সমালোচনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। তাই সেটির অনুবাদ নীচে তুলে দিলাম :—

"দেশীয় নাট্যশালা।—বৎসর দুই পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালাটি এখনও বাবু নবীনচন্দ্র বসুর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এটি শ্যামবাজারে স্বত্বাধিকারীর বাড়ীতেই অবস্থিত। ইহাতে প্রতি বৎসর চার পাঁচটি নাটক অভিনীত হয়। এই অভিনয় দেশীয়, সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হইয়া থাকে।

ইহাতে আর একটি ব্যাপারও দেখা যায় যাহা আমাদের এবং ভারতবর্ষের উন্নতিকামী বন্ধু-মাত্রেরই নিকট অতিশয় আনন্দের বিষয়—এই নাট্যশালায় বাঙালী রমণীরা সাগ্রহে দেখা দিয়া থাকেন কারণ, স্ত্রীলোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই করিয়া থাকেন।

গত পূর্ণিমা দিবস। [৬ অক্টোবর] সন্ধ্যায় আমাদের একটি নাট্যাভিনয় দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই অভিনয় দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা আমরা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি।

অভিনয়কালে বাড়ীতে এক হাজারের উপর হিন্দু, মুসলমান, কয়েকজন ইউরোপীয় ও অন্যান্য নানাজাতীয় দর্শকের ভিড় হইয়াছিল। ইহাদের সকলেই অভিনয় দেখিয়া সমভাবে আনন্দিত হইয়াছেন।

রাত্রি বারোটার কিছু পূর্বে অভিনয় আরম্ভ হয় এবং পরদিন ভোর সাড়ে ছয়টায় শেষ হয়। আমরা প্রথম হইতে এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলাম এবং শেষ দুইটি দৃশ্য ভিন্ন প্রায় সমগ্র অভিনয়ই দেখিয়া ছিলাম। অভিনয়ের বিষয় ছিল বিদ্যাসুন্দর।...সুমধুর ঐকতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হয়। সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্র হিন্দুরাই বাজাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সকলেই আবার ব্রাহ্মণ। এই বাদকের মধ্যে বাবু ব্রজনাথ গোস্বামী অতিশয় দক্ষতার সহিত বেহালা বাজাইয়া-

ছিলেন, এবং চারিদিকের শ্রোতাদের নিকট হইতে ঘন ঘন করতালি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী ভাল করিয়া তাঁহার বাক্য শুনিতে পায় নাই।

যবনিকা উত্তোলনের পূর্ব্বে বিঘ্নহর প্রথামত পরমেশ্বরের স্তোত্রপাঠ করা হয়, এবং প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্ব্বে একটি ভূমিকা আবৃত্তি করিয়া অভিনয়ের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। দৃশ্যাঙ্কন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলির "পারস্পেকটিভ" মেঘ, জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এই গুলিতে সুরুচি ও চিত্রাঙ্কণের রীতিজ্ঞান, উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটিকে বিন্যস্ত করা ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। দেশীয় কারিগরদের দ্বারা কৃত হইলেও একটু নিপুণ হাতে পড়িলে এগুলি আরও অনেক ভাল হইতে পারিত, ইহাদের মধ্যে রাজা বীরসিংহের প্রাসাদ ও তাঁহার কন্যার কক্ষ অঙ্কন একটু ভাল হইয়াছিল।

এই নাটকে সুন্দরের ভূমিকা বরানগরের শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি কিশোর যুবক কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। প্রশংসাই উহার সম্বেও সে এই ভূমিকার সমুচিত উৎকর্ষ দেখাইতে পারে নাই। এই চরিত্রের অভিনয়ে বার বার ও হঠাৎ ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিয়া অথবা নায়িকার পিতা যাহাতে প্রণয়ের খেলা না ধরিয়া ফেলিতে পারেন, এইরূপ কৌশল দেখাইয়া অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। যুবা শ্যামাচরণ মাঝে মাঝে ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছে সত্য, কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালন ও ভঙ্গী যেন ইচ্ছাকৃত ও আড়ষ্ট বলিয়া মনে হইল। রাজা এবং অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সন্তোষজনক হইয়াছিল।

এই নাটকে বিশেষ করিয়া স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় খুব চমৎকার হইয়াছিল। রাজা বীরসিংহের কন্যা ও সুন্দরের প্রণয়িনী বিদ্যার ভূমিকা রাধামণি বা মণি নামে একটি বৎসর ষোল বয়সের বালিকা অভিনয় করিয়াছিল। সে আগাগোড়া খুব নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। তাহার সুললিত অঙ্গ ভঙ্গী, মধুর কণ্ঠস্বর, সুন্দরের প্রতি প্রণয়সূচক হাবভাব দর্শক মণ্ডলীকে অভিনয় মুগ্ধ করিয়াছিল। অভিনয় কালে সে একবারও নৈপুণ্যের অভাব দেখায় নাই।

আনন্দে ও দুঃখে মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন, প্রহরীকে বাঁধিয়া পিতার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইয়াছে শুনিয়া তাহার করুণ উক্তি ও ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী তাহার নিজের এবং নাট্যশালার উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। সুন্দরের বধের আদেশ হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিবার পর তাহার সখীরা তাহাকে প্রবোধ দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে ভূমিতে পতিত হইয়া গেল।

সখীদের যত্নে একবার জ্ঞানলাভ করিয়া আবার সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণের জন্য দর্শকমণ্ডলী সভয়ে নীরব হইয়া রহিল। রাধামণির মত অশিক্ষিত এবং মাতৃ-ভাষার সূক্ষ্ম অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ একটি বালিকা যে এরূপ একটি কঠিন অংশ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিতে পারিবে এবং সকলকে তৃপ্ত করিয়া ঘন ঘন করতালি লাভ করিতে পারিবে, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। অন্য স্ত্রী চরিত্রের অভিনয়ও খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

ইহাদের মধ্যে রাণীর ও মালিনীর অভিনয়ের উল্লেখ না করা অন্যায় হইবে। অন্নপূর্ণা নামে প্রৌঢ়া রমণী এই দুইটি ভূমিকাই গ্রহণ করিয়া উভয় অংশেই সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে তাহার অভিনয় লক্ষ্য করিবার মত হইয়াছিল। সে সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। রাজকুমারী বা রাজু নামে আর একটি স্ত্রীলোকও বিদ্যার সখীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অন্নপূর্ণার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।

দেশব্যাপী অজ্ঞানতার মধ্যে একল অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার ঘটিতে পারিয়াছে তাহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। যে সকল বালিকাদের দেখিয়া কি দেশীয় দর্শকেরা তাঁহাদের স্ত্রী ও কন্যাদের শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন না? হিন্দু হিসাবে আমি এই কথাটা আমার দেশবাসীদের জিজ্ঞাসা করিতে চাই,—এই যে বালিকা, যে নাট্যশালায় এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, সে যদি মাতৃভাষায় শিক্ষিতা হইত, তবে কি তাহার প্রতিভার আরও স্ফূর্তি হইত না?

এই বালিকাটি শুধু কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিয়া গিয়াছে মাত্র। পুরুষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যাহারা প্রকৃতি দেবীকে দোষী সাব্যস্ত করেন, তাঁহাদের কাছে এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই কি প্রতীয়মান হইবে না যে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরাও তাহাদের স্বামীদের ন্যায় শিক্ষা লাভের উপযুক্ত।

এই অভিনয়ের দ্বারাই কি হিন্দু দর্শকদের নিকট প্রমাণিত হইবে না যে, যতদিন পর্য্যন্ত নারী শিক্ষাহীন থাকিবে, ততদিন তাহারা সমাজে অবর্ত্তমান বলিলেই চলে? আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকদের মানসিক শক্তির এই মহান, ও নূতন দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি লোকে স্ত্রীশিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহাদের হৃদয় কঠিন ও চিত্ত আবেগহীন বলিতে হইবে।

দেশীয় রঙ্গমঞ্চ এবং তাহার পরিচালন পদ্ধতি এইরূপ। এই সকল প্রশংসনীয় কিন্তু ভ্রমে পতিত স্ত্রীলোকদের চারিত্রিক উন্নতি করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু নবীনচন্দ্র বসু ধন্যবাদের পাত্র। এই সকল অভিনয় অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও উক্ত বাবু নিজের চেষ্টা ও আর্থিক সাহায্য দ্বারা ইহাকে উৎসাহিত করিতেছেন। একজন ধনী দেশীয় ভদ্রলোক যে এইরূপে আমাদের দেশের উন্নতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। ধনী সম্প্রদায় কি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন না? আমরা যেন একটা বড় নৈতিক বিপ্লব দেখিতে পাই—যাহা দ্বারা কালে ভারতবর্ষের প্রাপ্য খ্যাতিলাভ ঘটিবে।

এই প্রশংসাই উদ্যম যাহাতে সফল হয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা কামনা করি। এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী যতদিন পর্য্যন্ত সচেষ্ট থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত যে এই নাট্যশালা বর্ত্তমান থাকিবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে হিন্দু স্ত্রীলোকের অবনতির কারণ স্বরূপ যে সকল কুপ্রথা আছে, সে সকল দূর করিবার জন্য যেন তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন,—উন্নতির নূতন উপায় যেন আবিষ্কার করেন, এবং সর্ব্বোপরি, 'হিন্দু থিয়েটার' এর ন্যায় এই নাট্যশালা যাহাতে প্রথম অবস্থাতেই লোপ না পাইয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহার চেষ্টা যেন করেন। ইহা দ্বারাই তিনি সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া যশস্বী হইতে পারিবেন। এই সকল কার্য্যের কোন প্রশংসার আবশ্যক নাই। এগুলি সকল দিক হইতেই গৌরব আহরণ করে—ইহাদের দ্বারা সজ্জনেরা অনন্ত যশ অর্জন করেন।"

এই দীর্ঘ সমালোচনার মধ্যে কয়েকটি জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার আছে।

এ তথ্য সত্যিই বিচিত্র এবং ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে একশ তিরিশ বছর আগে বাংলা নাটকাভিনয়ে স্ত্রীচরিত্র মেয়েদের দ্বারাই অভিনীত হয়েছিল এবং মেয়েদের সেই অভিনয় সমালোচকের প্রশংসা অর্জন করেছিল!

তাছাড়া এই অভিনয় স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে (তখনকার দিনের স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধতার আবহাওয়ায়) পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য করেছিল। সেদিক থেকেও যে এই অভিনয় তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তা উক্ত সমালোচকের আলোচনার শেষাংশ পড়লেই বোঝা যায়।

ব্যাপার যা চলছে

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ তামাম পাকিস্তানে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে। করাচি শহরে ছাত্ররা ট্রাফিক পুলিসের কাজ করছে, ট্রাফিক পুলিসরা চলে গেছে সৈন্য বিভাগে, নিষ্প্রদীপের মহড়া, তার সঙ্গে অসামরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরোদমে চালু হয়েছে, সিনেমায় সিনেমায় স্লাইড দিয়ে জনতাকে যুদ্ধের জন্যে তৈরী হতে বলা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে নানা উত্তেজক শ্লোগান শোনা যাচ্ছে। জনসভায় ও গণসমাবেশে নাগরিকদের জেহাদের জন্যে প্রস্তুত হবার অনুরোধ জানানো হচ্ছে, উর্দু সংবাদ-পত্রগুলো বড় বড় হরফে ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র হানবার জন্যে তাগিদ দিচ্ছে।

এদিকে আমরা কি করছি? খোদা জানে !!

• • • •

যে কথাটা আমাদের মত অভাজন অনেকদিন আগে থেকেই জানে সেই কথাটা এতদিনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন। মার্কিন সরকার ভারতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নতুন কথা আর কি? এ তো জানা কথাই। ওরা চায়, আমরা বেকায়দায় পড়ি এবং ওদের সাহায্য নিতে নিতে ওদের কাছে ক্রীতদাস হয়ে থাকি। এই তো ওদের আসল মতলব। রাশিয়ানদের সম্পর্কে অবশ্য সেকথা বলা যায় না। তারা বারবার ভিটো দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু তাহলেও তাদেরও স্বার্থ কি নেই? তাদের স্বার্থ আরও বড় আরও ব্যাপক—ইতিমধ্যে কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফরকালে সেই দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সুদীর্ঘ যুক্ত ইস্তাহারের মধ্যে পাকিস্তানের ভারতের প্রতি আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি বাক্যও না থাকায় সাধারণের মনে দুঃখ দেখা দিয়েছে। .....আসল কথা, পরের দয়ার ওপর তাকিয়ে থাকলে চলবে না। বাঁচার মত বাঁচতে হলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে! এ বিষয়ে গত সংখ্যায় এই পত্রিকার কথা-প্রসঙ্গে কলমে বিশেষ যুক্তিপূর্ণ ও চিন্তাশীল আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

• • • •

শেখ আবদুল্লা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলাম যে তার কাছে পৌঁছোবার জন্যে উভয়পক্ষেও অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ ঘটবে। ব্রিটিশ সাংবাদিক স্টাসি ধরা পড়ায় তার প্রমাণ হল। ধরা পড়েছে স্টাসি। ধরা পড়েনি এমন আরও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি যে কাছাকাছি নেই তাও বলা যায় না। ওদিকে সেই নামকরা জাহাবাজ মেয়েমানুষ পাকসরদিনী মুহুমা সরাসরি আবার আসরে নেমেছেন। এদিক থেকে তাবেদী ভাষাবেগে আগুনঝরা ছাড়ছেন আর অন্য-কেই দু'ভাই পৌ ধরেছেন।

• • • •

গত পূর্বসংখ্যা গল্প-ভারতীতে এক পত্র লেখক 'ভুলে ভুলে ভুলময়' বলে যা লিখেছিলেন তা সর্বৈব সত্য। ছাত্রদের নিয়ে পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ যেন ছিনিমিনি খেলছেন। কিছু দিন আগেকার সংবাদে প্রকাশ এ বছর মু: কা: ও উ: মা: পরীক্ষায়, উত্তরপত্রের খাতা প্যাকেট করার কাজে ত্রুটি ঘটায় মু: কা: পরীক্ষকের কাছে গেছে উ-মার খাতা আর উ-মার পরীক্ষকের কাছে গেছে মু কার খাতা। পরীক্ষকগণও তেমনি, তাঁরা-খাতা পেয়েই খুশী। তাঁরা টাইট হয়ে বসে আছেন, অপর পরীক্ষার খাতা নিয়ে। এদিকে শুনছি দেহার উত্তরপত্র এবার ওধার চলে গিয়ে বেওয়ারিশ অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের কপালে কি আছে কে জানে। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ছেলেমেয়েদের জীবন ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যার ওপর তার ব্যবস্থাপকদের কী শোচনীয় ব্যর্থতা। অন্য দেশ হলে যাঁরা দায়িত্ব পালনে গুরুতর অযোগ্যতার পরিচয় দেন তাদের বরাত সেকাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হত। আর এদের বেলায় প্রমোশন হয়।

• • • •

কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি-স্থানীয় লোক যখন কুকর্মের জন্যে ধরা পড়ে তখন তাকে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাপার চলছে উল্টো। এখানে কুকাজ করলে চাকরি যায় না, বরং পদোন্নতি হয়। খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এটি একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এর কর্মকর্তার দায়িত্ব ও সেই পদের গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ এই লোকটির প্রতি এমনি আসক্ত যে তার বিরুদ্ধে সামান্যতম ব্যবস্থাও অবলম্বন করেন নি। উলটে তাকে ম্যানেজার থেকে উঠতে তুলে সেলস ডিরেকটর করে দিয়েছেন। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় রাজ্যসভায় কয়েকজন বিক্ষুব্ধ সদস্য নানা কথা বলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আইনমন্ত্রী অশোক সেন স্বীকার করেছেন, অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত শেষ হবার আগেই উক্ত ম্যানেজারকে সেলস ডিরেকটর পদে উন্নীত করা উচিৎ হয় নি।

• • • •

পাক-মার্কিন যোগসাজসের গুহ্য কথা ক্রমশ-প্রকাশ্য রহস্য-কাহিনীর মত মাসের পর মাস বেরুচ্ছে। আমেরিকা পাকিস্তানকে কত টাকার রণসম্ভার দিয়েছে জানেন? আটশ' কোটী টাকার! টাকার অঙ্কটা ভাবলে মাথা ঘুরে যাওয়া আশ্চর্য নয়। পাকিস্তান মুফৎ এই অস্ত্র পেয়েছে। আধুনিকতম ট্যাঙ্ক, কামান, রাইফেল ইত্যাদি এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী বিমানবহর, আনবিক অস্ত্র যে নেই তাই বা কে বলতে পারে। এসব অস্ত্র তো আর ঘর সাজাবার জন্যে দেওয়া বা নেওয়া হয়নি। আমেরিকার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল এই অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানকে জোরদার করে একদিকে চীনকে ঠেকানো অপরদিকে ভারতকে কাবু করে কবজায় আনা। পাকিস্তান আমেরিকার চেয়েও চালাক। অস্ত্রগুলোর খরচে খরচে দেওয়া চলে না—ব্যবহার শুরু করে দিলে ভারতের বিরুদ্ধে আর প্রকারান্তরে চীনের সঙ্গে দোস্তি পাতানো! আমেরিকার চাল একেবারেই ভণ্ডুল হোয়ে গেল। চীনাদের সঙ্গে পাকিস্তানের এমনি ভাব যে বহু চীনা সমর-নায়ক এবং সেনিকা যুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানে রীতিমত শিক্ষাদান করছে। সেই সঙ্গে আছে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত গেরিলাবাহিনী। ভারতের অন্তরমহলে তারা ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা এবং আসাম অঞ্চলের সীমানার ধারে তাদের গতিবিধি প্রায়ই ধরা পড়ছে। দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান সর্বদিক দিয়ে তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে।

তার পিছনে আছে চীন। ভারতবর্ষ জোট-নিরপেক্ষতার মহৎ বাণী জগৎকে শোনাচ্ছে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে দেখা যাচ্ছে ভারত আজ একক ও নিঃসহায়। এই সুযোগে বৃটিশ কূটচক্র নানা উপদেশ দিচ্ছে। আমাদের মাতৃভূমি যে আজ কতখানি অসহায় এবং বিপন্ন সে বোধশক্তিটুকুও বোধকরি আমরা হারিয়েছি।

• • • •

ইংরাজ আমলে দেশপ্রেমিক বীর সন্তানরা কি অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছেন, একাধিক বোমা নির্যাতনের চোটে রক্তবমন করেছেন, চিরদিনের মত স্বাস্থ্যহীন হয়েছেন, এই সূত্রে সদ্যবর্গত অগ্নি-যুগের অন্যতম বীর উল্লাসকর দত্তের কথা স্মরণ করে সেই সব নির্যাতনের কাহিনীও মনে পড়ছে। মৃত্যুকে উল্লাসকর পরোয়া করেননি। মৃত্যুকে সামনে রেখে তিনি নিজের হাতে বোমা তৈরী করেছেন। একটু এদিক ওদিক হলেই যে বোমা বিদীর্ণ হয়ে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতো। এই বোমা তৈরীর ব্যাপারে ইংরাজের গোয়েন্দা দপ্তরে যে নথি তৈরী হয়েছিল তাতে তিনজনের নাম ছিল—Barin the leader, Ullaskar the manufacturer and Hemchandra the chemist.

এই মহাপ্রাণ উল্লাসকর দত্ত আন্দামানের কারাগারে ইংরাজের হাতে কী পাশবিক নির্যাতন ভোগ করেছিলেন সে কাহিনী আমরা জেনেছি। ঘানি টেনে টেনে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল তবুও রেহাই পাননি। অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিলেন বলে কড়িকাঠের সঙ্গে তাঁর দুহাত বেঁধে সারা দিনরাত ঊর্ধ্বাহু হয়ে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। যখন তাঁকে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া হল তখন তিনি আর সোজা হতে পারেন না! এবং সেই অবস্থায় তাঁকে ব্যাটারি চার্জ করা হল। এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—"এই অবস্থায় মোরে ব্যাটারি চার্জ করে উল্লাসকরের ব্রেন নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং তার ফলে সে পাগল হয়ে যায়।"

এই সুযোগে উল্লাসকরের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানাবার অবকাশ পেলাম। তিনি এবং তাঁর সমগোত্রীয় যাঁরা, ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়ে গেছেন তাঁদের আমরা আজ ভুলতে বসেছি।

• • • •

কলকাতার পৌরসভার সাম্প্রতিক কার্যক্রমের একটি সংবাদ: কর্পোরেশনের পৌর পিতাদের ঘরগুলো এয়ার-কনডিশন করা হবে বলে স্থির হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে কয়েকজন কাউন্সিলর বেসুরো আওয়াজ তুলেছেন। অর্থাভাবে যখন নগরবাসীর জন্যে প্রয়োজনীয় জরুরী কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না তখন কলকাতার পৌরসভার অধিবেশন-কক্ষ, মেয়র-ডেপুটি মেয়রের ঘর এবং কমিটি রুমগুলো ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে কয়েক লাখ টাকা ব্যয় করা কী শোভন হবে? এই প্রশ্ন তুলে কোন কোন কাউন্সিলাররা পৌরসভার সেক্রেটারীর কাছে এক কড়া চিঠি লিখেছেন বলে জানা গেছে। "কী আপদ! তোমরা জেলে পচে মরছ কিনা, তাই তোমাদের ঘিরেছে। একটু আরাম করব তাতেও বাগড়া? আমাদের বেলাতেই দোষ! আর দার্জিলিং-এ যে ফুর্তির স্রোত বয়ে গেল, মন্ত্রী উপমন্ত্রী আর তাদের তল্পিবাহকদের মোচ্ছবে, তাতে দোষ নেই? দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না বলে আমরাও না খেয়ে থাকবো নাকি। তুমি চাল পাচ্ছ না, জল পাচ্ছ না, আবর্জনায় গন্ধে বমি করছ, ওলাউঠোয় মরছ,—তাতে আমরা কী করব বল। আমরা তো সাধ্যমত ধান

করছি। বাণী দিচ্ছি। গোল টেবিলে বসে কতরকম ফন্দীফিকির আঁটছি তোমাদের ভালর জন্তে। এর বেশী আর আমরা কী করতে পারি।" আজকের গৌর-নেতা ও দেশ নেতাদের এই হল বুলি!

• • • •

আলিগড়ে বাঘ বেরিয়েছে। বিষধর কেউটে। ঘাসের মধ্যে লুকিয়েছিল, সুযোগ বুঝে ছোবল মেরেছে। ছোবল মেরেছে নোকন আরগায়, লেখাপড়া শেখার পীঠস্থানে, লক্ষ্য ছিল উপাচার্য। অল্পের জন্তে তিনি বেঁচে গেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী চাগলা সাহেবকেও নাকি ছোবল মারবে, এইরকম আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভারতে এ ধরণের হিংস্র কেউটে আজ নতুন নয় এবং তার সংখ্যাও কম নয়। ভারতের মাটিতে চতুর্দিকে তারা ছড়িয়ে আছে। খানা-খোন্দলে লুকিয়ে আছে, সুযোগ পেলেই পিছন থেকে ছোবল মারবে। ইতিপূর্বে অনেকবার তাদের ছোবল আমরা পেয়েছি। অনেক অমূল্য প্রাণ খুইয়েছি। তাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্তে যে সতর্কতার বা প্রতিষেধকের প্রয়োজন আছে সে সম্বন্ধে আমাদের চেতনা প্রখর নয়। এই রকম অবস্থা দেখেই বোধ করি চাণক্য শ্লোক লেখেছিলেন—সর্পে চ গৃহে বাস, মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।

• • • •

কিছুদিন ধরে উগ্র হিন্দিবাজদের সম্বন্ধে কোন বড় খবর বেরোয়নি। তাই বলে মনে করবেন না, ওরা ওদের কাজ বন্ধ রেখেছে। ওদের কাজ ওরা ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, শুধু আংরেজি হটাও নয়, সেই সঙ্গে বংআলাও হটাও। বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের বাড় বাড়ন্ত দেখে ভিতরে ভিতরে উগ্র হিন্দি-বাজেরা ; [আমি শুধু তাদেরই লক্ষ্য করে বলছি ; সকল হিন্দীভাষীদের উদ্দেশ করে নয়, কারণ আমি জানি তাঁদের মধ্যেও বহু সমদর্শী সুবুদ্ধিসম্পন্ন বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ব্যক্তি আছেন] জলে পুড়ে মরছে অনেক দিন থেকেই। ওদের একটা কীর্তি সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে। ২৫শে মে রাঁচির খবর: হাজারিবাগে বিহার রাজনৈতিক সম্মেলন হচ্ছে। সেখানে দেশাত্মবোধক গান গাইবার জন্তে রাঁচির সুখ্যাত সংস্থা গীতালিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। গীতালী বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত বহুদিনের প্রতিষ্ঠান। তাদের সমবেত কণ্ঠের জাতীয় ভাবোদ্দীপক বাংলা গান ওই সব প্রদেশের সুধীজনের প্রশংসা পেয়েছে। তাঁরা যথাসময়ে আসরে এসে বসেছেন গান গাইবার জন্তে, এমন সময় তাঁদের প্রতি হুকুম হল, বাংলা গান চলবে না। হিন্দি গানা গাও। তাঁরা তো অবাক। এতাবৎ তাঁরা তো বাংলাতেই দেশাত্মবোধক গান গেয়েছেন, এবং উদ্যোক্তারা তো তা জানেন! কিন্তু কে শোনে তাঁদের কথা। হিন্দি-বাজদের বাজখাঁই আওয়াজ শোনা গেল—'চলবে না, চলবে না, বাংলা গান চলবে না। হিন্দিতে দেশভক্তিমূলক গান গাও।' গীতালীর কর্তৃপক্ষ বললেন, হিন্দিগান তাঁরা জানেন না। জানেন না? তাহলে বিদায় হোন। সত্যিই তাঁরা চলে এলেন। ফেরবার পথে রাহাখরচ পর্যন্ত পেলেন না। ঘটনাটি ঘটে রাজনৈতিক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে, যার উদ্বোধন করেছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। যে যাই বলুক—"হিন্দুস্থান হামারা হ্যায়"।

চিঠি শুধু চিঠি নয়

শ্রীদিলীপ কুমার রায়কে লিখিত

ম্যাঞ্চেস্টার জেল

৯।১০।২৪

একথা কিছুতেই মনে কোরোনা যে, আমার দৃষ্টি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। "Greatest good of the greatest number" এতে আমি যথার্থই বিশ্বাস করি, কিন্তু সে "Good" আমার কাছে সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। অর্থনীতি বলে, মানুষের সকল কাজ হয় "productive" নয় "unproductive"। তবে কোন কাজ যে "productive", তা নিয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হয়ে থাকে। আমি কিন্তু কারু কলা বা সে সংক্রান্ত কোন প্রচেষ্টাকে "unproductive" মনে করিনে, আর মার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে নিষ্ফল বা নিরর্থক বলে অবজ্ঞা করিনে। আমি নিজে একজন আর্টিষ্ট না হতে পারি—আর সত্যি বলতে কি আমি জানি যে তা নই—কিন্তু সেজন্যে দোষী প্রকৃতি বা ভগবান যাই বল, আমি, নই। অবশ্য যদি বল যে আর জন্মের কর্মফল এজন্মে ভোগ করছি, তাহলে আমি নাচার। সে যাই হ'ক এজন্যে যে আর্টিষ্ট হলুম না তার কারণ, হতে পারলুম না, আর আমার বিশ্বাস শিল্পী জন্মায়, তৈরী করা যায় না, এ কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু নিজে আর্টিষ্ট না হলেই যে আর্ট উপভোগ করা যায়না, এমন কোন কথা নেই, আর কোনও কলার সমঝদার হতে গেলে তাতে নিজের যেটুকু পরিমাণ হাত থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সুলভ।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে এ আক্ষেপ কোরোনা যে, সঙ্গীত নিয়ে তুমি সময়টা হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, যখন শেক্সপীয়রের কথায় বলতে গেলে "the time is out of joint." বন্ধু, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও, আর যে সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদন করা কি কখনও সম্ভব? কার্লাইল বলতেন সঙ্গীত যার প্রাণে নেই, সে করতে পারেনা হেন দুষ্কার্যই নেই। একথা সত্যি হোক বা না হোক, আমার মনে হয় যার প্রাণে সঙ্গীতের কোন সাড়া নেই, সে চিন্তায় বা কার্যে কখনও মহৎ হতে পারে না। আমাদের প্রত্যেক রক্ত কণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হোক এই আমরা চাই, কারণ আনন্দের পূর্ণতাতেই আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আর সঙ্গীতের মত এমন আনন্দ আর কিসে দিতে পারে।

কিন্তু আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রগণের পক্ষেও সহজলভ্য করতে হবে। সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে চলবে, আর সে রকম চর্চা হওয়াও উচিত; কিন্তু সঙ্গীতকে সর্বসাধারণের উপযোগীও করে তুলতে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তাতে আর্ট নির্জীবও খর্বই হয়ে যায়। আমার মনে হয় লোকসংগীত ও নৃত্যের (folk music and dancing)

ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছে, অথচ তার স্থানে নূতন কোন যোগসূত্র যে আমরা পেয়েছি, তাও নয়। আমাদের যাত্রা, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি যেন কোন অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করতে পারেন, তাহলে আমাদের চিত্তের যে কি দৈন্যদশা ঘটবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তোমার হয়ত মনে আছে তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম যে, মালদার "গম্ভীরা" গানের সৌন্দর্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাতে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাঙলার অন্যত্র ওরূপ জিনিষ কোথাও আছে বলেও আমি জানিনে, আর মালদাতেও ওর মৃত্যু শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী, যদি নতুন করে ওতে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করবার চেষ্টা না হয়, আর বাঙলার অন্যান্য স্থানেও ওর প্রচলন না হয়। বাঙলা দেশে লোক সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্র যাওয়া উচিত। গম্ভীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা মহৎ কিছুই নেই, তার গুণই এই যে সহজ, সাদাসিধে। আমাদের নিজস্ব folk music ও folk dancing একমাত্র এই মালদাতেই বেঁচে আছে, আর সেই হিসাবেই গম্ভীরার যা মূল্য। সুতরাং যাঁরা ও প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য পুনর্জীবিত করতে চান, তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

তোমার স্নেহের—সুভাষ

• • • •

গ্রীক নগর এথেন্স আক্রমণ করেছেন বীর ডিমিট্রিয়াস। প্রবল বাধার সম্মুখীন হলেন তিনি, এথেন্সবাসীরা বিপুল আক্রোশে আক্রমণ করল তাঁকে। তিনি অবরোধ রচনা করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অবশেষে খাদ্যের অভাবে নগরবাসীরা পরাজয় স্বীকার করল।

ডিমিট্রিয়াস আদেশ করলেন যে নারী ও শিশু ব্যতীত সকলেই তাঁর সশস্ত্র সৈনিকদের প্রহারাধীন এক উন্মুক্ত প্রান্তরে নীত হবে।

সকলেই বুঝল তাদের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এসেছে।

ডিমিট্রিয়াস বন্দীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, হে এথেন্সবাসিগণ, যে তোমাদের শত্রু নয় পরন্তু যে রাজপুত্র তোমাদের ভালবাসে তোমরা তাকেই বাধা দিয়েছ। আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই তোমাদের বন্ধুত্ব কামনা করে। তোমরা বাড়ী ফিরে যাও, এতক্ষণে আমার সৈন্যগণ তোমাদের প্রতিটি গৃহে আহার্য উপহার দিয়ে এসেছে চতুর্দিকে আনন্দ কলরোল পড়ে গেল।

খেলাধূলা

বিমল দেব

ফুটবলের দেশ ইস্রায়েল

ছোট্ট দেশ ইস্রায়েল—আয়তনে যেমন ছোট তেমনি লোক সংখ্যায়। কিন্তু খেলাধুলোর প্রচেষ্টা এদের ছোট নয় বরং বেশ বড়। ইস্রায়েলে ফুটবলের জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর। অবিশ্যি সাঁতার, বাস্কেটবল ও এ্যাথলেটিকদের কদরও যথেষ্ট আছে। কিন্তু ফুটবল যেন ইস্রায়েলবাসীকে পাগল করে তোলে। সামান্য লীগ খেলাকে কেন্দ্র করে তেলআভিভ শহর উদ্দীপনায় যেরকম মেতে ওঠে তা সত্যি বিস্ময়কর। শুধু মেতে ওঠাই নয়। ফুটবলে বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে ইস্রায়েল আবির্ভূত হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই এশিয়া ভূখণ্ডে তাদের পদসঞ্চার সুরু করেছে—তাদের নৈপুণ্য স্বীকৃতিও পেয়েছে। টোকিওতে সদ্য সমাপ্ত এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে ইস্রায়েল তরুণদল সারা এশিয়ায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমান করেছে। ফাইন্যালে অন্যতম শক্তিশালী দল বার্মাকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে ইস্রায়েল যোগ্য দল হিসেবেই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে।

ইস্রায়েলের ফুটবল—সাধনা অল্পদিনের। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই তারা অভাবনীয় উন্নতি করেছে! সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এই উন্নতির মূলে সরকারী প্রয়াস ও সাহায্য কিন্তু খুবই সামান্য। ফুটবল দরদী জনসাধারণের একান্ত আগ্রহ ও সবরকম সাহায্য ভিত্তি করেই ওদের ফুটবলের উন্নতি।

মাত্র ১৮টি ক্লাব নিয়ে ইস্রায়েল ফুটবল এসোসিয়েশনের সূচনা। কিন্তু এর মধ্যেই সারাদেশে ফুটবল খেলার প্রসার ঘটেছে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। অক্টোবর থেকে জুন এই ন'মাস হোল ইস্রায়েলে ফুটবল মরশুম। শুধু খেলাই নয়—আধুনিক ক্রীড়াকৌশলে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করে তোলার পরিকল্পনাও ব্যাপক। বিদেশ থেকে বিশেষ করে মধ্য ইউরোপের দেশগুলি থেকেই "কোচ" আনা হয়। এখন প্রায় ১০ জন বিদেশী "কোচ" ইস্রায়েলে ফুটবলের কলা-কৌশল শিক্ষাদানে রত আছেন। এছাড়া বিদেশী ফুটবল দলও আমন্ত্রণে ইস্রায়েল সফর করে থাকে। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। ইস্রায়েলে পেশাদারী ও অপেশাদারী ফুটবল খেলোয়াড়েরা একসঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে অবতীর্ণ হন। ফলে অপেক্ষাকৃত তরুণ ও অপেশাদারী খেলোয়াড়েরা পেশাদারী খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের নৈপুণ্য বাড়িয়ে তুলতে সমর্থ হন। শিক্ষা ব্যবস্থাও চমৎকার। সাধারণতঃ

১২-১৩ বছরের কিশোরদের ফুটবলের প্রথম শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব বিভিন্ন ক্লাবের। এরপর বিস্তৃত পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর শিক্ষার আসরে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্রমান্বয়ে এইভাবে একজন খেলোয়াড় উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় কথা—শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতাই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা সংবাদ উল্লেখযোগ্য। টোকিওতে গত এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা যে সময়ে আরম্ভ সে সময় ইস্রায়েলের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নির্ধারিত। ইস্রায়েল দলের পক্ষে নির্বাচিত কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ও ঐ পরীক্ষার জন্য তখন পরীক্ষার্থী।

ফলে এইসব পরীক্ষার্থী খেলোয়াড়দের টোকিও যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভাল ভাল খেলোয়াড়েরা দলে না থাকলে প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করা যাবে না—সংশ্লিষ্টমহল তখন স্বভাবতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাল। তাঁরা নির্ধারিত পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়ে পরীক্ষার্থী খেলোয়াড়দের টোকিও যাবার সুযোগ করে দেন। আন্তর্জাতিক গৌরব অর্জনের প্রয়াসে ইস্রায়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মনোভাব বিশ্ব ক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ সুযোগ না করে দিলে ইস্রায়েলের তরুণদল এশীয় ফুটবলে বিজয়ী হোত কিনা সন্দেহ।

• • • •

ভারতীয় ফুটবল প্রসঙ্গে—

ভারতের বর্তমান ফুটবল শিক্ষণ পরিকল্পনা আগাগোড়া ঢেলে না সাজালে ভারতীয় ফুটবল যথার্থ উন্নতির পথ খুঁজে পাবে না—এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইংলণ্ডের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় ও 'কোচ' হ্যারি রাইট। ভারতের জাতীয় স্পোর্টস ইনষ্টিটিউটের আমন্ত্রণে হ্যারি রাইট চার বছরের জন্য প্রধান ফুটবল কোচ হয়ে ভারতে এসেছিলেন। চার বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাদান করে তিনি সম্প্রতি স্বদেশে ফিরে গেছেন। দেশে ফিরে যাবার আগে তিনি জাতীয় স্পোর্টস ইনষ্টিটিউটের কাজের ধারা ও ফুটবল শিক্ষণ পরিকল্পনার যথেষ্ট সমালোচনা করে গেছেন। আবার সেইসঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিকল্পে কয়েকটি সুপরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন যে বিদেশ থেকে 'কোচ' এনে ভারত সরকার প্রচুর অর্থের অপব্যয় করেন। এই অপব্যয় সহজেই রোধ করা যায় যদি ভারতীয় 'কোচ'দের উপর শিক্ষাদানের ভার ন্যস্ত হয়। ভারতে অনেক শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রতিভাবান 'কোচ' রয়েছেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে সম্প্রতি ৮০ জন 'কোচ'কে শিক্ষিত করে তোলা হয়, কিন্তু স্পোর্টস ইনষ্টিটিউট তাদের মধ্যে মাত্র ১০ জনের ওপর শিক্ষাদানের ভার ন্যস্ত করেছেন। অবশিষ্ট ৭০ জনও শিক্ষাদানে উপযুক্ত। ফুটবলের উন্নতিকল্পে হ্যারি রাইটের পরামর্শ মোটামুটি নিম্নরূপ :—

(১) তরুণ খেলোয়াড়দের শিক্ষাদানের ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে। একেবারে বিদ্যালয় থেকেই এই শিক্ষাদানের কার্যক্রম সুরু হওয়া প্রয়োজন। ভারতের জাতীয় যুব-ফুটবল প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার। তরুণদের প্রতিযোগিতার বয়স-সীমার ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় যদি এই বয়সের

প্রতিযোগিতায় অংশ নেন তাহলে তরুণ খেলোয়াড় যথার্থ নৈপুণ্য প্রদর্শনে অসমর্থ হন। ফলে ক্রীড়াস্থানের উন্নতিও ব্যাহত হয়।

(২) ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে ফুটবল খেলার সময় সর্বত্র এক রকম নয়। কোথাও ৪০, কোথাও ৯০ আবার কোথাও ৭০ মিনিটকাল পর্যন্ত ফুটবল খেলা হয়ে থাকে। সবচেয়ে প্রয়োজন খেলোয়াড়দের দম যাতে বৃদ্ধি পায় তার প্রতি নজর দেওয়া। ভারতীয় খেলোয়াড়েরা তাড়াতাড়ি দম হারিয়ে ফেলে। কাজে কাজেই খেলার সময়ের ব্যাপারে ভারতের সর্বত্র সমতা থাকাই উচিত। আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার সময় ৯০ মিনিট। সুতরাং ভারতেও অবিলম্বে খেলার সময় ৬০-৭০ মিনিট হওয়া দরকার। এইভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য খেলোয়াড়দের তৈরী করা দরকার।

(৩) অনেক খেলোয়াড়কে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ-ছটি খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। এই অবস্থার পড়ে তাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য অনেকভাবে ব্যাহত হয়।

(৪) কলকাতায় ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় অনেক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু সিনিয়র ডিভিসনে দশটির বেশী দল থাকা উচিত নয়। এর ফলে দলের খেলোয়াড়দের প্রতি সপ্তাহে বেশী খেলায় অংশ নিতে হবে না। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের উচিত সারা ভারতে ফুটবল মরশুমের একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া। এর মধ্যে দু-তিন মাস বিরতি থাকাও প্রয়োজন। এই বিরতিকালে কোন দল ফেডারেশনের অনুমতি ব্যতীত খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

হ্যারি রাইট ছাড়াও আর একজন ভারতীয় ফুটবল শিক্ষণ পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন। ইনি হলেন ভারতের প্রাক্তন অনির্বান খেলোয়াড় কৃষ্ণস্বামী কিট্টু। সম্প্রতি ইনি জার্মানী থেকে ফুটবল কোচিং সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা নিয়ে ফিরেছেন; কিট্টু বর্তমানে ভারতের জাতীয় স্পোর্টস ইনষ্টিটিউটের অন্যতম কোচ। কিট্টুর মতে অল্পদিনের জন্য ফুটবল শিক্ষা শিবিরের কোন মানেই হয় না। এতে সময়, অর্থ, পরিশ্রম সবই ব্যয়িত হয়—কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অন্ততঃ পক্ষে দু-তিন মাস ধরে ফুটবল শিক্ষা-শিবির পরিচালিত হওয়া দরকার। স্কুল-কলেজ থেকেই ফুটবলের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। শিবিরে শিক্ষা প্রাপ্ত খেলোয়াড়েরা নিজেদের অঞ্চলে ফিরে গিয়ে শিক্ষা শিবিরের ধারা অনুযায়ী অন্যান্যদের শিক্ষাদান করবেন। তাহলেই শিক্ষার ব্যাপ্তি ঘটবে।

আশাকরি ভারতীয় ফুটবল পরিচালকরা এই দুই ফুটবল বিশেষজ্ঞের অভিমত বিবেচনা করে দেখবেন এবং ভারতে ফুটবলের মান উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে যথাবিহিত ব্যবস্থা করবেন।

* * * *

বাতিল ! বাতিল !! বাতিল !!!

ভারতীয় ক্রীড়াদলের বিদেশ সফর সম্বন্ধে ভারত সরকার কঠোর মনোভাব অবলম্বন করছেন বলে মনে হয়। ভারতীয় তরুণ ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড সফর বাতিল হোল। এরপর বাতিল হোল ভারতীয় তরুণ টেনিস দলের যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর এবং ভারতীয় মূক ও বধিরদলের ওয়াশিংটন সফর। আগামী ১৯শে জুন থেকে ওয়াশিংটনে মূক ও বধিরদের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠিত হবে। পূর্বে ঠিক ছিল ভারতীয় যুব ও বরিয়দের একটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। কিন্তু ভারত-সরকার এই সফর প্রস্তাব অনুমোদন করেননি।

ভারত সরকার প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করতে অসমর্থ হওয়ায় এই সব সফর বাতিল হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার আগামী শীতকালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের প্রস্তাবিত ভারত সফর সম্পর্কে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডকে চূড়ান্তভাবে এখনও কিছু জানাতে পারেননি। ভারত সফর সম্পর্কে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদল কয়েকটি আর্থিক শর্ত আরোপ করেছেন। ভারত সরকারের অনুমোদন প্রত্যাশায় ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এখনও কিছু স্থির করতে পারেনি।

ভারতের কাছ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পেলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদল সফরের আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদি করবে। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এখনও চূড়ান্তভাবে কিছু জানাতে পারেনি। অথচ আগামী নভেম্বর থেকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের ভারত সফরের কথা।

আলোচ্য সফরের সঙ্গে জড়িত বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয়টি ভারত সরকার অনুমোদন না করলে সফর বাতিল হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

• • • •

শুভ্র রাত। রণক্ষেত্র। মেঘের ফাঁকে চাঁদের ম্লান আলো।

বাগাবোর রণক্ষেত্রে বিজয়ী নেপোলিয়ন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চতুর্দিকে মৃত ও আহত সৈনিকের রক্তাক্ত দেহ।

মধ্য রাত্রি। রণক্ষেত্রের সমস্ত নিরীহ শুদ্ধ।

হঠাৎ একটি মৃত সৈনিকের পাশ থেকে একটা কুকুর ছুটে এল নেপোলিয়নের দিকে, আবার ছুটে গেল তার রক্তাপ্লুত প্রভুর কাছে, করুণ সুরে কি যেন নিবেদন করতে চাইল সে।

খুবই বিচলিত দেখাল নেপোলিয়নকে, বিশ্বাসী কুকুরটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি পার্শ্বচরদের বলে উঠলেন, ঐ ওর কাছে, আমাদের মানবতার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

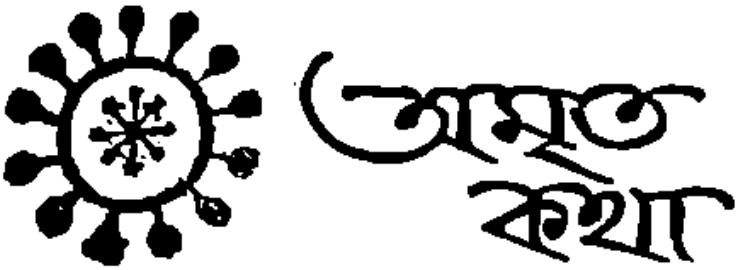

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

যে মাছ ধরতে ভালবাসে সে যদি শোনে অমুক পুকুরে বড় বড় মাছ আছে, তবে যারা সেই পুকুরে মাছ ধরেছে সে তাদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করে সত্যি সত্যি সে পুকুরে বড় বড় মাছ আছে কিনা। যদি থাকে তবে কিসের চার ফেলতে হয়, কি টোপ খায় এসব বিষয় জেনে নিয়ে পরে সে সেই সব নিয়ে সেখানে মাছ ধরতে যায়, মাছ ধরতে গেলে একেবারেই মাছ ধরা যায় না ; সেখানে ছিপ ফেলে বসে থাকতে হয়। তারপর সে মাছের ঘাই ও ছুট দেখতে পায় এবং তারপর মাছ ধরতে পারে। ধর্মরাজ্যেও সেইরূপ। মহাজনদিগের কথায় বিশ্বাস ক'রে ও ভক্তি চার ফেলে, মন ছিপে, প্রাণ কাঁটায় নাম টোপ দিয়ে বসে থাকতে হয়। মাছ যত দূরেই থাক না কেন, ভাল ভাল চার ফেলবামাত্রই যেমন তারা ছুটে আসে ; ভগবানও সেরূপ বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র এসে উদয় হন।

• • •

পানাকে সরিয়ে দিলে আবার পানা এসে জোটে। মায়াকে ঠেলে দিলে আবার মায়া এসে জোটে। পানাকে সরিয়ে দিয়ে বাঁশ বেঁধে দিলে যেমন পানা আর আসতে পারে না, সেইরকম মায়াকে ঠেলে দিয়ে জ্ঞানভক্তির বেড়া দিলে আর মায়া আসতে পারে না। ঈশ্বর প্রকাশ থাকেন।

একটি ভক্তকে একজন ধোপা মেরেছিল। সে 'নারায়ণ', 'নারায়ণ' বলে কাঁদছিল। নারায়ণ বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর নিকট ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে তাকে বাঁচাতে গেলেন ; কিন্তু খানিকটা গিয়ে ফিরে এলেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলেন, ফিরে এলেন যে? নারায়ণ বললেন, আর আমাকে যেতে হ'ল না। সে শালাও ধোপা হয়েছে, সে নিজেই নিজেকে রক্ষা করছে যে তাকে মারছিল সেও তাকে মারছে, আর আমার যাবার দরকার কি? সম্পূর্ণ নির্ভর না করলে তিনি রক্ষা করেন না।

• • •

ধোপা পাখী আকাশে থাকে, আকাশেই ডিম পাড়ে, ডিমটা পড়তে থাকে, পড়তে পড়তে শূন্যেতেই ফোটে, ছানা হয়ে উড়ে যায়, নিচে আসে না। নিত্যসিদ্ধ জীবও তেমনি, তাঁরা কখন সংসারে বদ্ধ হয় না। ঈশ্বর প্রসঙ্গ নিয়েই মত্ত থাকে।

নিত্যসিদ্ধ জীবের বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। প্রহ্লাদের 'ক' রেখেই কান্না—অমনি কৃষ্ণকে মনে পড়েছে। কিন্তু সাধারণ জীবের সর্বদাই সংশয় বুদ্ধি, তাদের সহজে বিশ্বাস হয় না।

দৈ, বাঁশ, সিঁড়ি, দড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন বাড়ীর ছাদে উঠা যায়, তেমনি ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে, প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায় দেখিয়ে দিচ্ছে।

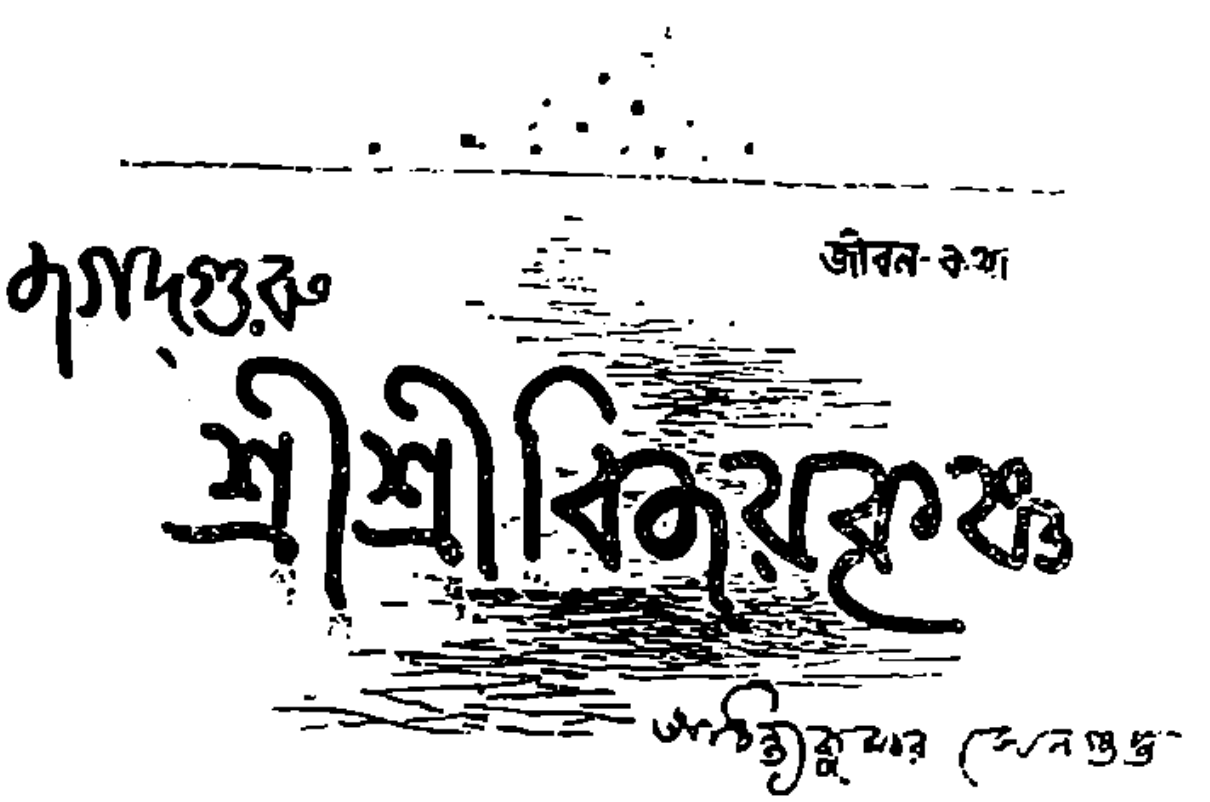

৩১

আরো এক কাঠিয়াবাবার সঙ্গে দেখা হল, নাম ছোট কাঠিয়াবাবা। এরও পরিধানে কাঠের কৌপীন, গা খোলা, রেশম-পশম-তুলো তন্তুমাত্র আচ্ছাদন নেই, না জট বা মালা-তিলকের আড়ম্বর। মুক্ত আকাশের নিচে ছেঁড়া একটা চ্যাটাইয়ের উপর বসে আছে। শরীর শক্ত ও মজবুত কিন্তু মুখখানি শিশুর মত সুকুমার। কথাও শিশুর মত আধো-আধো। বারেবারে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। যত দেখা যায় মনে হয় আরো একবার দেখি।

কিন্তু সাধু দেখে শুধু গোঁসাইকে। রোজ দু-তিনবার করে গোঁসাইয়ের আড্ডায় আসে আর ধুনির ওপারে ঠাকুরের মুখোমুখি হয়ে বসে। দুটি হাত জোড় করে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর কাঁদে।

গোঁসাইজি বলেন, 'ইনি এক সিদ্ধ মহাপুরুষ, ভরতের ভাবে রামের উপাসনা করেন। পাঁচ শো বছর আগে দেহরক্ষা করেছিলেন, এখনো অটুট আছেন। একটিও চুল পাকেনি, দাঁত পড়েনি। শরীরের কোনো গ্রন্থি ঢিলে হয়নি এতটুকু।'

'থাকেন কোথায়?'

'পাহাড়ে। কোনো আশ্রয় নেই অবলম্বন নেই। এমন কি পাঁজা-চরস পর্যন্ত খান না। আগে খেতেন তবে ওসব সংগ্রহ করতে হলে লোকালয়ে আসতে হয় আর তাতে অনেক সময় নষ্ট হয় বলে ছেড়ে দিয়েছেন।'

কিন্তু এই ছাউনিতে বারে বারে আসেন কেন? কিসের লোভে?

'বা, এই তাঁবুতে যে আমার রামজী থাকেন। যখনই আসি তখনই রামজীর দেখা পাই। আসব না আমি? আমাকে আসতে কি কেউ বারণ করছেন?'

যেন বারণ করলে শুনবে! যেন কারু সাধ্য আছে তার রামপ্রণাম বন্ধ করে!

সাধু নরসিংহ দাসকে দেখ। আরেক নাম গাছাড়ীবাবা। 'তুমি মেরা প্রাণ' বলে যাকে খুশি আলিঙ্গন করে ধরে, আর যে সেই আলিঙ্গন পায় নিমেষে পুলকপ্রাবল্যে প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। যিনে পেলে সামনে যাকে পায় তারই কাছে হাত পাতে, কিছু না দিয়ে পালায় এমন সাধ্য কী। সাধু থাকে কোথায়? মানস সরোবরে। মানসেই সরস হয়ে আছে। নইলে এমনি করে প্রাণের আলিঙ্গন বিলোয় কী করে!

আর একে চেন? এর নাম ভিখন দাস, পাটনার কাছাকাছি কোথাও আশ্রম। বহির্বাস সাধারণ কৌপীন, গলায় তুলসীর মালা, গোপীচন্দনের তিলক। প্রেমঘন প্রণয় দৃষ্টি। এরও বৈশিষ্ট্য আকাশবৃত্তি। আজকের বস্তু কালকের জন্যে সঞ্চয় করে না। যদি ভাণ্ডারায় অভাব হয়, রঘুনাথজীর দরজায় গিয়ে ধরা দেয়। বলে, ধরা পাবার জন্যেই রঘুনাথজীর এই কৌশল। ধরার সঙ্গে-সঙ্গেই কোত্থেকে কে জানে খাদ্যবস্তু এসে পড়ে। বলে, মা গঙ্গা নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলেছেন, কার অপেক্ষা না রেখে, তেমনি ভগবৎকৃপা বিশ্বময় বয়ে চলেছে। আমি গঙ্গাস্রোতে হাত রাখছি স্পর্শে পবিত্র হবার জন্যে, তেমনি ভগবানের কৃপাস্রোতে আমার প্রার্থনাটি রাখছি ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে।

এস, এস। গোঁসাইজি নিজ আসনের পাশটিতে ভিখন দাসকে বসালেন আদর করে।

আর ইনি নাথ যোগীদের মোহান্ত গম্ভীরনাথ। ইনিও গঙ্গার কাছে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের সানুতে কপিলধারায় যোগ সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছেন। এমন নিত্যযুক্ত যোগী কম মেলে। গোঁসাইজি বলেন, অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলে মেরেছে। অভিমন্যু হচ্ছে অভিমান। আর আমার সপ্তরথী হচ্ছে গঙ্গার গম্ভীরনাথ, অযোধ্যার রামোদাস, নবদ্বীপের চৈতন্যদাস, কাশীর ত্রৈলঙ্গস্বামী, মেছুয়াবাজারের সন্ন্যাসী, দার্জিলিঙের দাদা আর মানসসরোবরের পরমহংস। গায়ে যেমন শীত বা তাপের অনুভব হয় তেমনি গম্ভীরনাথের কাছে গিয়ে বসলে হয় তেমনি যোগানুভব।

এ কে এক উগ্রতেজা সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত। গোঁসাইজিকে বললে, 'তুমি অহর্নিশ যে সমাধিতে থাকো তা শাস্ত্রসম্মত নয়। শাস্ত্রে বলে—' বলে একগাদা সংস্কৃত আওড়াতে লাগল।

পনেরো-ষোলো বছরের একটি হিন্দুস্থানী বালকসন্ন্যাসী অদূরে এসে বসল। কতক্ষণ শুনে বিদ্রূপের হাসি হেসে বালক বললে, 'আরে! কাকে আপনি শাস্ত্র শোনাচ্ছেন? শাস্ত্রের আপনি জানেন কী!'

'বটে।' বালকের স্পর্ধায় সন্ন্যাসী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল: 'তুমি কী বোঝ! কোথাকার চ্যাংড়া ছোকরা, তুমি শাস্ত্রের নাম শুনেছ কোনোদিন?'

বালক গম্ভীর স্বরে বললে, 'সমস্ত শাস্ত্র আমার মুখস্থ।'

মহাশব্দে হেসে উঠল সন্ন্যাসী, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত আরো অনেকে। একটা সংস্কৃত বচন আউড়ে সন্ন্যাসী বললে, 'ওটা কোন শাস্ত্রে আছে বলতে পারো?'

'ব্যস, খুব হয়েছে।' বালক টিটকিরি দিয়ে উঠল: 'উচ্চারণ ঠিক নেই, ছন্দজ্ঞান ঠিক নেই, শাস্ত্র ঘাঁটতে এসেছেন!'

'তুমি ছন্দের কী জানো! মুখ দিয়ে ভালো করে একটা কথা ফোটেনি, উচ্চারণ শেখাতে

এসেছে।' সন্ন্যাসী প্রায় মারমুখো হয়ে উঠল। 'শাস্ত্র তো মুখস্থ বলছ কিন্তু এক বর্ণও আবৃত্তি করো তো।'

'বেশ, তবে শুনুন। বসুন চুপ করে।'

বালক তখন শাস্ত্রশ্লোক আবৃত্তি করতে লাগল। যেমন হুলস্থান তেমনি উচ্চারণ। যত রকম সমাধির কথা শাস্ত্রে বলা আছে তা বললে অনর্গল, ব্যাখ্যা করে বোঝালে।

সন্ন্যাসী তো হতভম্ব। যারা এতক্ষণ বালকের প্রতি উপেক্ষমান ছিল তারাও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। এ কী অকাটাপ্রকটন।

বালক গোসাইজিকে দেখিয়ে বললে, 'ইনি যে অবস্থায় আছেন তার চেয়ে উচ্চতর অবস্থা নরদেহে সম্ভব নয়। এর চেয়ে এক রেণু উপরে উঠতে গেলেই দেহ ছুটে যাবে। এঁর এখনো দেহ ছেড়ে যাবার সময় হয়নি।'

গোসাইজি বালককে এগিয়ে আসতে ইশারা করলেন। বালক ধুনির সামনে এসে বসল। গোসাইজি তাকে প্রণাম করলেন।

সন্ন্যাসী পালিয়ে গেল।

অন্তরঙ্গ ভক্ত গোসাইজিকে জিগগেস করল, বালকটি কে?

গোসাইজি বললেন, 'কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী। মৃত একটি ব্রাহ্মণ বালকের দেহে ঢুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।'

তখন উপস্থিত সকলে হায়-হায় করে উঠল। ঠাকুর নিজে প্রণাম করলেন, তা জেনেও আমাদের মাথা নোয়াবার মতি হল না। আমাদের গতি কী হবে!

আর ঐ দেখ হরিদ্বারের মহান্তা। দণ্ডী সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন ঐশ্বর্য তেমনি মাধুর্য! নাম বলে দিতে হবে? নাম ভোলা গিরি।

আজ উত্তর সংক্রান্তিতে মকর স্নান।

সুরু হয়েছে সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা। প্রথমে নাগাসন্ন্যাসীদের দল, তাদের অগ্রণী ভোলা গিরি, চলেছেন ঘোড়ায় চড়ে। সন্ন্যাসীদের কাঁধে ঝাণ্ডা, আবার কারু হাতে চামর, সেই ঝাণ্ডাকেই ব্যজন করতে-করতে চলেছে। তাদের পিছনে ত্রিপুণ্ড্রধারীর দল, হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু। তাদের পিছনে অটিল ব্রহ্মচারীরা, চলেছে নত শিরে। এর পর দিগম্বর উদাসীনের দল। ক্রমে ক্রমে দশনামা, নির্মলা, আকালী কত রকম সম্প্রদায়। এগুচ্ছে আর স্নান করে করে ফিরছে। তুমুল আনন্দনাদে স্বর্গমর্ত একাকার হয়ে যাচ্ছে।

সন্ন্যাসীদের পরে বৈষ্ণবের দল আর তাদের অগ্রনায়ক রামদাস কাঠিয়া বাবা। তাদের কারু কারু কণ্ঠে 'সীতারাম' 'সীতারাম,' কারু কারু কণ্ঠে বা 'রাধেশ্যাম' 'রাধেশ্যাম'। কখনো গর্জন কখনো বা গদ্গদস্বরে।

তীর্থগুরু ভক্তদের জ্ঞানময় পড়াচ্ছে। বলো ধন দাও জন দাও স্বর্গ দাও মোক্ষ দাও।

গোসাইজি শুনতে পেয়ে আপত্তি করলেন। ও সব কী চাইতে বলছেন? ওসব কি চাইবার মত?

সে কি? সচ্চিদানন্দ পড়াব না?

না। আমাদের সঙ্কল্প বিকল্প নেই। শুধু ভগবৎ প্রীতির জন্যেই আমাদের এই স্নান। এর বাইরে আমাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, থাকতে পারে না।

কিন্তু ধারণেষে কথা উঠল গোসাইজিকে নিয়ে। বৈষ্ণবদের মাথার উপরে উঠে আড্ডা গেড়েছেন, কী এঁর অধিকার? অনেক কুম্ভমেলায় আমরা এসেছি, চড়ায় থেকেছি কিন্তু কোনো বাঙালী সাধুকে ছাউনি করে এমনি জাঁকিয়ে বসতে কোনোদিন দেখিনি।

আগে ব্রাহ্ম ছিল পরে সাধু হয়েছে এমনি এক বাঙালী বন্ধু গোসাইয়ের বিরুদ্ধে দল পাকাল।

দেখুন না, বৈষ্ণবদের মধ্যে স্নান নিয়েছে অথচ বৈষ্ণবের প্রচলিত বেশ পরেনি। পরেছে গেরুয়া। গলায় শুধু তুলসী নয়, তুলসীর সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা। তিলক ধারণ করেছে অথচ আবার জটা রেখেছে, দণ্ড-কমণ্ডলুও বাদ রেখেছে। আরো দেখুন, আশ্রমে দুটি বিগ্রহ স্থাপন করেছেন, দশাবতারের মধ্যে যাদের নামোল্লেখ নেই। নাম শুনবেন তাদের? সীতা-রাম বা রাধা-কৃষ্ণ নয়, তাদের নাম গৌর-নিতাই। গৌর-নিতাইয়ের পূজা কি শাস্ত্রবিহিত? আরো দেখুন ব্যাপার, আশ্রমে মহিলাদের স্থান দিয়েছে। হলই বা না তারা শাগুড়ি বা বধূ, কিন্তু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সংসারের সংস্রব হয় কী করে?

এ সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের অপমান। এর মীমাংসার জন্যে সভা বসুক। সভা যদি সমর্থন না করে মেলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক গোসাইকে।

'গোসাইজী যে বেশ ধারণ করেছেন শাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে।' বললে অমরেশ্বরানন্দ, 'তার নাম অবধূতবেশ। পদ্মপুরাণেও আছে তুলসী আর রুদ্রাক্ষের সহাবস্থিতির কথা।'

'পদ্মপুরাণ বৈষ্ণবদের প্রামাণ্য গ্রন্থ।' সমর্থন করল বৃদ্ধ পরমানন্দ।

'আর গৌর-নিতাই?' অমরেশ্বরানন্দ আবার বললে, 'নবদ্বীপে আমি শাস্ত্র পাঠ করেছি। আমি জানি বাঙলাদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা হয়। আর গৌর নিতাই যে কৃষ্ণ আর বলরামের অবতার সে কথার প্রমাণ শাস্ত্রেই দেওয়া আছে।'

তাই বলে আশ্রমে স্ত্রীলোক রাখবে?

এবার উঠলেন স্বয়ং ভোলা গিরি। বললেন, 'সন্ন্যাসী-আশ্রমে স্ত্রীলোক রাখা নিষিদ্ধ বটে কিন্তু তা সাধারণের পক্ষে, সামর্থ্যবানের পক্ষে নয়। গোস্বামি প্রভু সমর্থতম পুরুষ, সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। যে জীবন্মুক্ত সে সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত। দেখছ না অহর্নিশ ইনি কেমন সমাধিস্থ! কেমন প্রেমরস!'

'সাক্ষাৎ মহেশ্বর।' বললেন কাঠিয়াবাবা, 'এঁর কপালে আগুন জ্বলছে, যা কিছু এতে পড়ছে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। যেমন তেজস্বী তেমনি প্রেমিক। বৈষ্ণবদের মহাভাগ্য যে ইনি তাদের মধ্যে ছাউনি করে রয়েছেন।

সমগ্র সন্ন্যাসীমণ্ডলে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতারাই গোসাইকে শিবতুল্য বলে মেনেছেন। কোথায় মেলা থেকে তিনি বিতাড়িত হবেন, তা নয়, দলে দলে সকলে গোসাইকে দর্শন করতে ভিড় করে দাঁড়াল। স্থির হয়ে পূজাবিনম্র হয়ে দাঁড়াল। কৌতূহলীর দৃষ্টি নিয়ে নয়, ভক্তি-পবিত্র শরণাগতের দৃষ্টি নিয়ে।

'এ সাধুর নাম কী?'

ঠাকুরের সন্ন্যাস নাম অচ্যুতানন্দ। তাই এবার প্রচার হল।

'আপনারা কোন সম্প্রদায়?'

'মাধ্বাচার্য সম্প্রদায়।'

সমস্ত সন্দেহ নিরস্ত হল। নিষ্পত্তি হল সমস্ত তর্কের। স্থাপিত হল অখণ্ড মহিমা। হরলাল দাস স্বামী তার ছাউনিতে গোঁসাইকে সশিষ্য নিমন্ত্রণ করল।

বললে, 'আমার এক মিত্র, বাঙালী শিষ্য, আপনাকে ডাকবার চেষ্টায় অগ্রণী ছিল, তাতে মনে আমি ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিলাম। এখন আপনার মহিমা যখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে তখন আপনাকে বিশেষ সম্মান দেবার জন্যেই আমার নিমন্ত্রণ।'

গোঁসাই বললেন, 'আমি সম্মানের ভিখারি নই।'

'তা কি আমি জানিনা? এ সম্মান গৌর নিতাইকে। সঙ্কীর্তনকে। চলুন আমার ছাউনিতে কীর্তন করবেন চলুন।'

কীর্তনের নাম শুনলে কে স্থির থাকে? চলো হরলাল দাসের ছাউনিতে ভিক্ষে নিই গে। নামগানের বন্যা আনি।

চড়ার উপর দিয়ে যাচ্ছেন দেখতে পেলেন তাঁবুর একধারে তক্তাপোষের উপর মখমলের গদিতে এক সাধু বসে আছে। রাজার মত চেহারা, রাজার মত সাজগোজ। গলায় হীরে-মুক্তোর মালা, মাথায় দামী সিল্কের পাগড়ি, গায়ে গেরুয়া রঙের সিল্কের আলখাল্লা। এপাশে ওপাশে পিছনে মোটাসোটা মখমলের তাকিয়া। তাঁবুর ভিতরে বাইরে ধনী মাড়োয়ারী শিষ্যদের ভিড়। পুঞ্জীকৃত উপহারের দ্রব্য।

'এ রকম বিলাসী আবার সন্ন্যাসী নাকি?' এক ভক্ত নালিশ করল গোঁসাইয়ের কাছে: 'কোথায় ত্যাগের আগুন হয়ে থাকবে, তা নয়, আসক্তির আঠা হয়ে আছে।'

গোঁসাইজি কোনো কথা কইলেন না।

'নবাব সাধুর নাম জানেন?'

'নাম জানি। তবে সাধু নবাব কিনা তা জানি না।'

'কী নাম?'

'নাম সত্যরাধ্য।'

সেদিন সন্ধ্যার চারদিক আঁধার করে দুর্দান্ত ঝড় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি। সমস্ত ছাউনি-ছাতা উড়ে গেল। হাজার-হাজার সাধু সই অনাবৃত আকাশের নিচে শুয়ে রইল। কোথায় বা কম্বল কোথায় বা ধুনি।

পরদিন ঝড় থামলেও বৃষ্টি থামল না।

তাঁবুর বাইরে এক দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী এসে হাজির। বললে, আপনাদের ভাণ্ডারে কোনো জিনিস লাগবে? বৃষ্টিতে সব তছনছ করে দিয়েছে। যদি লাগে তো বলুন পাঠিয়ে দেব। সমস্ত রাত ধরে সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে জানছি কার কী লাগবে, আর যার যা দরকার তাই দিচ্ছি পাঠিয়ে। সর্বক্ষণ ছুটোছুটির উপর আছি, বলুন, দেরি করবেন না।'

'দুধও চাল লাগবে আর কাঠ আর ঘি—' ভক্ত বলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। শুধোল: 'এ কী, আপনার গায়ে রক্ত কেন?'

'ও কিছু নয়।' সাধু পাশ কাটাতে চাইল: 'জলকাদায় ছুটোছুটি করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছি বারকতক, তাই খানিক কেটেকুটে গিয়েছে। ও কিছু নয়। ঐ নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে আর কাজ হয় না। যত শিগগির সম্ভব আপনাদের জিনিস আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই বেরিয়ে গেল সন্ন্যাসী।

'এ কে মহাপুরুষ?' ভক্ত জিজ্ঞেস করলে গোঁসাইকে: 'নিজের শরীরকে তুচ্ছ করে পরোপকার করে বেড়াচ্ছে। আঘাতের দিকে পর্যন্ত তাকাচ্ছে না। কে এ?'

'সে কী? এঁকে চিনতে পারলে না?'

'আগে দেখেছি কি কখনো?'

'দেখেছ বৈ কি। ইনিই তোমার সেই বিলাসী সাধু নরহরিদা। যাকে তোমার সন্ন্যাসের অনুপযুক্ত মনে হয়েছিল।'

'বলেন কী! এত বড় ত্যাগী, এত বড় পরোপকারী!'

'হ্যাঁ, শুধু বাইরেটা দেখেই বিচার কোরো না।' বললেন গোঁসাই প্রভু, 'ভক্তরা শিষ্যরা যদি গুরুকে সাজিয়ে সুখ পায় তা হলে গুরু কি তাদেরকে বঞ্চনা করবে? নিরাসক্ত পুরুষের কী আসে যায় দুটো তুচ্ছ সাজসজ্জায়? শুধু ভক্ত চিত্তবিনোদের জন্যেই গুরুর এই বিলাসভাব।'

নরহরিদার উদ্দেশে প্রণাম করল ভক্ত। যেন কাউকে বিচার না করি। যেন চোখের দেখাকেই না সার বলে মানি।

এ আবার কে এল তাঁবুতে? রাত তখন প্রায় এগারোটা, তখনো সমানে বৃষ্টি চলছে। ধুনির সামনে গোঁসাইজি আসনে বসে আছেন, আর সকলে কেউ ঘুমুচ্ছে নয়তো বসে বসে ঢুলছে। এ অসময়ে কে এই রসময়?

সাধু-সন্ন্যাসী নয়, মাথায় টুপি, কোট-প্যান্ট পরা সাধারণ এক সিভিল সাহেব।

কিন্তু ঠাকুরের এ কী ব্যবহার! একেবারে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন সাহেবকে, আর যা অসাধারণ, নিজ আসনে তাকে বসালেন।

তারপর দুজনে ঘন হয়ে বসে নিম্নস্বরে কথা বলতে লাগলেন। বাইরে তখনো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির শব্দে তাদের কথা ভক্তরা কেউ শুনতে পেল না।

সিভিল সাহেব হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি এখন যাব।

সে কি, এই বৃষ্টির মধ্যেই? ভক্তদল চঞ্চল হয়ে উঠল। যদি একান্তই যাবেন, ছাতা দিই, ছাতা নিয়ে যান।

একজন ছাতা দিতে যাচ্ছিল, ঠাকুর বাধা দিলেন। বললেন, 'ওঁর ছাতার দরকার হবে না। যেখানে না বৃষ্টির মধ্যে এলেন, গায়ে এক ফোঁটাও জল লাগেনি!'

সত্যিই তো, এ আমরা লক্ষ্য করিনি এতক্ষণ।

'ইনি কে? নাম কী?'

'ইনি আমার গুরুভাই। নাম সা-সাহেব।' বললেন গোঁসাইজি।

'মুসলমান ?'

'ছিলেন। বলতেন, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সেই এক উৎস। যিনি বৃন্দাবনে বেণু চরিয়েছিলেন তিনিই আবার আরবদেশে ছাগল চরিয়েছিলেন।' বললেন গোসাইজি, 'এখন পরমহংস অবস্থা। এখন ওঁর শক্তি অসাধারণ। জল ওঁকে সিক্ত করতে পারে না। আগুন পারে না দগ্ধ করতে। এলাহাবাদে খুব গোপনে আছেন, আমরা কী ভাবে আছি, খবর নিতে এসেছিলেন।'

তারপর মেলার শেষে গোসাইজি যখন কলকাতায় ফিরছেন - ছুটতে-ছুটতে রেল স্টেশনে সা-সাহেব এসে হাজির।

একটা কামরায় সবাইকে নিয়ে গোসাইজি উঠেছেন, সা-সাহেব সেখানে গিয়ে পড়ল। এ করেছেন কী ? ও কামরায় নয়, পিছনের কামরায় গিয়ে উঠুন।

সে আবার কী কথা! তাছাড়া গাড়ি ছাড়তে চার পাঁচমিনিট মাত্র বাকি আছে। এখন কী আর এ হাঙ্গামা পোষায়? মোটঘাটই বা কত!

কিন্তু ঠাকুর উঠে পড়লেন। গুরু ভাইয়ের, সা-সাহেবের নির্দেশ তিনি অগ্রাহ্য করতে রাজি হন।

মগরা স্টেশনে মুখোমুখি একটা ট্রেনের সঙ্গে ঠাকুরদের ডাউন ট্রেনের প্রচণ্ড কলিশন হল। ঠাকুরদের কামরার আগের ও পিছের কামরা দুটো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, মাঝখানের কামরাটার কিছু হল না। যেমন নিটুট, তেমনি নিখুঁত রইল।

এখন বুঝতে পারলে সা-সাহেবের কতখানি শক্তি! গুরুভাইয়ের জন্যে কতখানি ব্যাকুলতা।

[ক্রমশঃ]

*　　*　　*　　*

প্রাশিয়া আক্রমণ করেছেন নেপোলিয়ন, যুদ্ধ চলেছে, ক্রমশঃ হেরে যাচ্ছে প্রাশিয়া। রণক্ষেত্রে হঠাৎ চোখে পড়ল এক তরুণ শত্রুসৈনিক, নেপোলিয়ন লক্ষ্য করলেন তার রক্তাপ্লুত দেহে মৃত্যুযন্ত্রণা দেখা দিয়েছে তবু সে প্রাশিয়ার পতাকাখানি বুকের কাছে ধরে আছে।

তৎক্ষণাৎ সেনাপতিদের ডেকে নেপোলিয়ন বললেন, এ সৈনিক তার পতাকাকে প্রাণেরও অধিক মনে করে, যথোচিত সম্মান সহকারে যেন এর সেবশুশ্রূষা সম্পন্ন করা হয়। নাম জানলে আমি এর পিতামাতাকে সংবাদ দিতাম। ওর ঐ পতাকা কখনো সরাবে না, ঐ হবে ওর স্মরণীয় আচ্ছাদন।

পাঠক পাঠিকার কলম

[পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক গ্রাহিকাদের কাছ থেকে আমরা প্রায়শই নানা ধরণের পত্র পাই। অনেক পত্রে চিন্তাশীলতা এবং নানা সমস্যা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও সুচিন্তিত মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন থেকে আমরা এই ধরণের প্রকাশ-যোগ্য এক বা একাধিক পত্র প্রতি সংখ্যায় দেব। এই বিভাগে শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে সমসাময়িক জীবন ও তার সমস্যা সম্পর্কে মতামত আহ্বান করা হচ্ছে।
— গল্প-ভারতী-সম্পাদক]

(মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী নন্)

শ্রীযুক্ত গল্প-ভারতী সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ গল্প-ভারতীর বৈশাখ সংখ্যায় (১৩৭২) বঙ্কিম-রবীন্দ্র সংগম সংযোজনায় অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। বিশেষ করে 'দুই মহাযুগ'।

১২৮৯ বৈশাখে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র দেশের মানসিক উন্মেষ সাধনের ব্রত নিয়ে সাহিত্য পত্র প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যের কথায় বর্ণিত হয়েছিল, 'যদি দেশের ও দশের উন্নতির সহায় না হইতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য মনে করিতাম।'

১৩০৮ বৈশাখে বঙ্গদর্শন নব পর্যায় প্রকাশ কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মহাপুরুষদিগের কীর্তি এককালকে অন্যকালের সহিত বাঁধিবার জন্য যোগ সূত্রের কাজ করে।'

এই দুই মহাউক্তি আমাদের এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়,—যে সাহিত্য এবং সাহিত্য পত্র-পত্রিকার আদর্শ কী!

অধুনা সাহিত্য এবং সাহিত্য-পত্রিকা আদর্শাপেক্ষা ব্যবসায়কেই অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করে। কমার্শিয়াল ভ্যালু আজ হিউম্যান ভ্যালুর উর্ধ্বে। তাই আদর্শের কোন ছাপকেই মনুষ্যত্বের কোন মহান নীতিকেই আমাদের মনে অঙ্কিত করার দায়িত্ব সাহিত্য এবং সাহিত্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছেনা। ফলে জাতীয় জীবনে আজ আর আদর্শের প্রতিষ্ঠা নেই। স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিন পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এঁরা সাময়িক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পতিত বাঙালীকে তুলে ধরেছিলেন। তার পরবর্তীকালের ইতিহাসও অতীতকে বিসর্জন দেয়নি। একালের পত্র-পত্রিকায় সে আদর্শের প্রেরণা কই? লঘু রচনা, নগ্ন ছবি আর কদর্য সংবাদ প্রকাশের মধ্যে ব্যবসায়ী-বুদ্ধিই আজ প্রাধান্য লাভ করছে। আর দু'চারজন খ্যাতনামা লেখকের দু'চারটি লেখার মোড়কে সাহিত্যের নামকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে।

জাতীয় সাহিত্য-পত্র এবং সাহিত্যের এই নিম্নগতির দিনে আপনারা 'দুই মহাযুগ'কে আবার আধুনিক কালের পাঠক-পাঠিকাদের চোখের সামনে মেলে ধরার কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছি।

'কথা প্রসঙ্গে দুটি মূল্যবান কথা' 'উদাত্ত আহ্বানে' শুচিশুভ্র 'রবীন্দ্র বাণী' এবং 'বঙ্কিম-রবীন্দ্র সংগমে' সাহিত্য-তীর্থযাত্রায় যে অমূল্য পাথেয় আপনারা আমাদের পরিবেশন করেছেন, তার জন্যে আপনাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি।

এই রচনার মধ্যে সেকালের সঙ্গে একালের সাংস্কৃতিক সেতু বন্ধনের মন্ত্রই নিহিত। আপনারা সেই কথাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাহিত্য এবং সাহিত্য পত্র-পত্রিকার প্রকৃত ধর্মকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

নমস্কার।

বক্সাপুর—জৈষ্ঠ, ১৩৭২

সুধীর রায় (অধ্যাপক)

গল্প-ভারতী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

অন্যান্য বছরের মতো এবারও কলকাতা এবং মফঃস্বলের বহু স্থানে বহু রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হলো। রবীন্দ্র জয়ন্তী বলতে নাচ-গান-অভিনয় এবং মেঠো বক্তৃতা। দেখে-শুনে মনে হলো ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ নাটক আর গান লিখেছিলেন। সেই জন্যেই তো সারাবছর তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেও বছরের অন্তত একটি দিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমরা সচেতন হয়ে উঠি। বাস্তবিকই তাই। যে রবীন্দ্রনাথ সূর্যের মতো আমাদের মানস-বৃত্তিকাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত ক'রে তুলেছেন, পথ-নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের জাতীয় জীবনের বিপুল অগ্রগতির, বাংলা তথা ভারতকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্বের দরবারে, যাঁর ভাব এবং ভাষা ছাড়া স্বপ্নে-জাগরণে, দিনে-রাতে, আনন্দে, বিষাদে, সুখে দুঃখে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের চলে না সেই কবি-সার্বভৌমের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্পণ আজকাল কয়েক দিনের নাচ-গানের অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় বলেছিলেন যে ঈশ্বর বারবার দূত পাঠিয়েছেন মানুষের পৃথিবীতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে দেবদূতের অমৃতবাণী। দূর থেকে নমস্কার করেই মানুষ বিদায় দিয়েছে তাঁদের। রবীন্দ্রনাথকেও তো আমরা আজ দূর থেকে নমস্কার করেই কর্তব্য সমাধা করছি। তাঁর বাণী, জীবনাদর্শ গ্রহণের জন্য আমরা আজ একেবারেই উৎসুক নই। তা যদি হতুম তাহলে মনে রাখতুম কেবল পঁচিশে বৈশাখ কেন, প্রতিদিনই, এক অর্থে, রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি। তাহলে প্রতিদিনই আমাদের কর্মে-কথায়, আচরণে আর রচনায় কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতুম।

আমাদের দেশের আরেক প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। মনীষী রোমা রোঁলা লিখেছেন, বিবেকানন্দের বাণী তাঁর মনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মতো কাজ করতো। প্রকৃত পক্ষে, বিবেকানন্দের রচনায় এমন অনেক কথা আছে, এমন অনেক আদর্শ আছে যা সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করলেও আমাদের দেশবাসীর ক্লীবত্ব, জড়ত্ব, দুর্বলতা ঘুচে যেতো। দেশের যুবকেরা সত্যিকারের তরুণ, শক্তিমান হয়ে উঠতে পারতো। বিবেকানন্দকে কেবলমাত্র গেরুয়াধারী মঠের সন্ন্যাসী কিংবা ধর্মপ্রচারক বলে মনে করলে খুবই অন্যায় করা হবে। বিবেকানন্দ ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক, সমাজ-বিপ্লবী, নবা-ভারতের সংগঠক। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ উদ্দীপনার অফুরন্ত উৎস। কিন্তু বিবেকানন্দের দুর্ভাগ্য যে তিনি নাটক লিখে যাননি। যে-সব গান লিখেছেন তা-ও আবার ধর্মীয়। কাজেই তাঁকে নিয়ে আমাদের হুজুগ বা প্রমোদ অনুষ্ঠানের সুযোগ নেই। সে সুযোগ থাকলে সারা বছর তাঁকে ভুলে থেকে বছরের একটা দিনে অনুষ্ঠান করে তাঁর প্রতি আমাদের সব শ্রদ্ধা জানিয়ে ফেলতুম।

আমাদের দেশে অনেক বড়ো-বড়ো মানুষ জন্মেছেন সত্যি। কিন্তু আমরা এমনই ছোট যে অকৃতজ্ঞতার বশে তাঁদের অনেকের নাম পর্যন্ত ভুলতে বসেছি। এমন আত্ম-বিস্মৃত জাতির ধ্বংস অনিবার্য। আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে যদি আমাদের বাঁচতে হয় তবে ফিরে পেতে হবে শক্তি, আত্মবিশ্বাস আর মনুষ্যত্ব। তা পেতে হলে আমাদের দাঁড়াতে হবে রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্য সব মহাপুরুষদের কাছে, তাঁদের কাছ থেকে আবার গ্রহণ করতে হবে মনুষ্যত্বের দীক্ষা, তারপর প্রতিটি দিন যাপন করতে হবে সেই আদর্শ অনুযায়ী।

৫২।১, সেন্ট্রাল রোড
কলিকাতা—৩১

সুপর্ণা রায়চৌধুরী

বিচিত্রা

আপনি কি জানেন উটপাখি ঘোড়ার মত লাথি মারতে পারে?

উটপাখি যে পৃথিবীর বিহঙ্গ-কুলের মধ্যে বৃহত্তম এ-কথা বোধহয় অনেকেই জানেন। কিন্তু আপনি কি জানেন উটপাখি ঘোড়ার মতো লাথি মারতে পারে? সেই লাথি এমনই জোরালো যে তাতে একজন সবল লোকও মরে যেতে পারে। যেমন বপু, পাখিটার তেমনি খিদে। ছোট-ছোট প্রাণী, পাখি, সাপ, সিরসিটি, পোকা-মাকড়, ঘাস, পাতা, ফল, বীজ—হেন জিনিস নেই যাতে তার মুখের অরুচি। এমনকি, চাবি, পয়সা, বোতাম, কাচ ইত্যাদি জিনিসও সে গলাধঃকরণ করে ব'লে জানা যায়। একটা উটপাখির পেট থেকে একবার পাওয়া গিয়েছিলো নস্যির কৌটা। উটপাখিটা হঠাৎ ম'রে যায়। তার মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ওটার পেট চিরে নস্যির কৌটো ছাড়াও পাওয়া যায় পেরেক, চাবি, লোহা আর তামার টুকরো, লণ্ঠনের একটা অংশ পর্যন্ত। পুরুষ-উটপাখি মাঝে-মাঝে সিংহের মতো গর্জন করে, আর সকালের দিকে ডাকে ষাঁড়ের মতো।

একটি অতি অদ্ভুত গাছ!

ছোট এক রকমের গাছ আছে। নাম সোলস্তানেলা। এরা আলোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বরফের ভেতর দিয়ে নিজেদের পথ তৈরি ক'রে নিতে পারে। বসন্তকালে এর গোল-গোল পাতাগুলি থাকে সবুজ। তখন ফুল আর কুঁড়ি থাকে গাছগুলিতে। শীত পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে গাছ থেকে ফুল এবং বীজ অদৃশ্য হয়। তবে শীতের আগেই ওরা প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য পাতায় সঞ্চিত ক'রে রাখে। কাজেই শীতের সময় পাতাগুলি বেশ ভারি আর মোটা হ'য়ে উঠে। শীতের সময় গাছগুলি বরফের নীচে চাপা প'ড়ে যায়। কিন্তু ওদের আলোর তৃষ্ণা এতই প্রবল যে বসন্ত আসার সঙ্গে-সঙ্গে ওদের ঘণ্টাকৃতির সুন্দর ফুলগুলি বরফের ভেতর দিয়েই ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে—খোলা হাওয়ায় মাথা তোলে। অবশ্য পাতা থেকে উত্তাপ পায় বলেই এই বিদ্রোহ সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে কিন্তু ওদের পাতাগুলি আবার হালকা ফিকফিকে হ'য়ে যায়। কারণ সারাটা শীতকাল পাতায় জমানো খাবার খেয়েই ওরা বেঁচে ছিলো কিনা।

এভারেস্ট সত্যি কি পাঁচ মাইল উঁচু?

এই তো দিন কয়েক আগে ভারতীয় দল এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করলো। শুনে অনেকেই বিস্মিত আর আনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু এভারেস্ট সম্পর্কে একটা বিস্ময়কর কথা জানেন কি? এভারেস্ট সত্যি পাঁচ মাইল উঁচু হওয়া সত্ত্বেও চোখে দেখে কিন্তু তাকে তেমন উঁচু মনে হয় না। চোখে দেখে মনে হয় না সে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ। এর কারণ, উচ্চতার হিসাব শুরু করা হয় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে। কিন্তু হিমালয়ের চূড়াগুলি উঠেছে বেশ উঁচু জায়গা থেকে। পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের উচ্চতার জন্য ঠিক যতটা উঁচু, এভারেস্টকে ততটা উঁচু দেখায় না।

এমন আশ্চর্য্য ঘটনার কথা কখনও শুনেছেন কি ?

সাহারা এবং গোবি-মরুভূমির বালুকার নিচে অনেক শহর চাপা পড়েছে ব'লে জানা যায়। উত্তর য়ুরোপে তার চেয়েও আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটে। এক সময়ে বাল্টিক সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে কুনজেন নামে একটি শহর ছিলো। শহরের ধারেই ছিলো বালির এক প্রকাণ্ড স্তূপ। তাকে বালির পাহাড় বলাই বোধহয় ভালো। যখনই বাতাস বইতো, বালু একটু একটু ক'রে এগিয়ে যেতো শহরের দিকে। ক্রমশ শহরটির বাড়ি-ঘর, গির্জা বালুর তলায় চাপা পড়তে লাগলো। সেই চলন্ত বালুর পাহাড়ের অগ্রগতি রোধ করা কিছুতেই সম্ভব হলো না। কালক্রমে গোটা শহরটাই ঢাকা প'ড়ে গেলো বালুকা-স্তূপের তলায়। শহরটার অস্তিত্বই যেন লোপ পেলো। বালুর পাহাড় কিন্তু শহরটিকে গ্রাস ক'রে থামলো না। ক্রমশঃ তা আরো এগিয়ে গেলো। ফলে লোকচক্ষুর সামনে আবার একদিন উদ্ভাসিত হলো গোটা কুনজেন শহর। বাল্টিক সাগরের ওই পাড়ে ও-রকম ঘটনা অনেক গ্রাম আর শহরেই ঘটেছে।

আপনারা শিশুদের "হোমে" রেখে মানুষ করেন কি ?

—তবে শুনুন !

বহু পিতামাতার ধারণা শৈশবে ছেলেমেয়েদের বোর্ডিং বা "হোমে" রেখে মানুষ করলে তারা সবদিকে বেশ চৌকশ হয়ে ওঠে। তাদের এই ধারণা ভুল প্রতিপন্ন ক'রে পশ্চিম জার্মানীর শিশু-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার থিওডোর হেলব্রুগে বলেছেন যে, ওতে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তিনি বলেছেন যে, সুপরিচালিত "হোমে" রাখা অপেক্ষা মায়ের অবহেলা বা অযত্ন সত্ত্বেও শিশুদের বাড়িতে রাখা ভালো। সব মায়েদের এই কথাটা জানিয়ে দেবার জন্যে তিনি তাঁর সহযোগীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে, ১৬-১৮ মাসের শিশুদের সুপরিচালিত "হোমে" রেখে মানুষ করলেও তারা শরীর ও মনের দিক দিয়ে ৮ থেকে ১০ মাস পিছিয়ে পড়ে। যদি কোন শিশুকে দেখাশোনার কেউ না থাকে, তবু তাকে "হোম" বা কোন আশ্রমে না রেখে পালক পিতামাতার কাছে রেখে মানুষ করা ঢের ভালো, কারণ সেখানে যতোই সুব্যবস্থা থাকুক, তার স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন সেখানে সে পায় তার মাত্র এক পঞ্চমাংশ মাত্র।

শিশুর বিকাশ ও তার ক্ষমতার স্ফুরণের জন্যে তিনটি ধাপ একান্ত দরকার ; প্রথম পাঁচমাস যে শিশুর লালনপালন করে, তার সাথে শিশুর একটা সম্বন্ধ গড়ে ওঠে এবং এক্ষেত্রে সেই লোক একজন বিশেষত শিশুর মা হলেই ভালো হয়। এই ধাপটি শিশুর জীবনে পরবর্তী সম্পর্ক পাকা করার প্রধান বনিয়াদ। তিনবছর বয়স পর্যন্ত অনবরত মায়ের কাছে কাছে শিশুর থাকা দরকার, কারণ তবেই বিচ্ছেদ সত্ত্বেও মা ও শিশুর সম্পর্ক বজায় থাকা সম্ভব। তবে সাত আট বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছেদের সময় একটানা কয়েক সপ্তাহের বেশি হওয়া উচিত নয়।

অধ্যাপক কেলফটগের মতে, শিশুর জীবনের প্রথম বছরটি ভীষণ জরুরী, কারণ সেই সময় শিশুর মনে কি ভাবভাব হয় সে সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত খুবই অল্প জানতে পারা গেছে; সুতরাং সেই সময়টা মায়েদের খুব সতর্ক থাকা দরকার। অপর একজন শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ফাউণ্ডলের তো স্পষ্টাস্পষ্টি বলেই দিয়েছেন যে, যারা পশুপালন করে তারা জানে যে শূকরীমাতার কাছ থেকে তার বাচ্চাদের আলাদা রাখা ঠিক নয়। আর শূকর বাচ্চাদের বিষয়ে যে কথাটা খাটে, মানুষের বাচ্চাদের সম্পর্কে সে কথাটা নিশ্চয়ই আরো বেশি খাটবে।

ভাবতে পারেন যে পশ্চিমী রূপসী তরুণীদের ফ্যাশানের চোটে চিতাবাঘের বংশ লোপ পেতে চলেছে ?

পশ্চিমের মহিলাদের ফ্যাশানের চাহিদা মেটাতে চিতাবাঘের বংশ পৃথিবী থেকে লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে। পশ্চিম দেশগুলিতে চিতাবাঘের চামড়ার আজ এতো দাম যে একদল পশু শিকারী সরকারী সব বাধানিষেধ উপেক্ষা ক'রে এদের নির্বিশেষে হত্যা ক'রে চলেছে।

এই চিতাবাঘ যাতে পৃথিবী থেকে লোপ না পায় সেজন্য ফ্রাঙ্কফুর্ট পশুশালার অধ্যক্ষ ডাক্তার বের্নহার্ড গ্রিৎসমেক সকলের কাছে জরুরী আবেদন জানিয়েছেন। কাউকে চিতাবাঘের চামড়ার কোট পরা দেখলেই এখন তিনি চটে যান। সৌখীন ধনী মহিলাদের তিনি অনুরোধ করেছেন তারা যেন চিতাবাঘের চামড়ার কোট পরা পরিহার করেন। ইতিমধ্যেই তাঁর অনুরোধে ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথ, ডাচ রাজবংশের পরিবারবর্গ ও জেকেলিন কেনেডি চিতাবাঘের চামড়ার কোট পরা ছেড়ে দিয়েছেন; এমনকি ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি প্রদত্ত উপহার দেওয়া চিতাবাঘের চামড়ার কোট পশ্চিম জার্মানীর প্রেসিডেন্ট পত্নী খিদহেলমিনে লুইবকে একবার মাত্র প'রে তুলে রেখেছেন।

একমাত্র ইতালিয়ান চিত্রতারকা সিনা লোলোব্রিগিডা ডাক্তার বের্নহার্ডের আবেদন উপেক্ষা করে তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি যেন মহিলাদের অনুরোধ না করে শিকারীদের অনুরোধ করেন। এদিকে পশু চামড়ার ব্যবসায়ীরাও ব্যবসা পড়ে যাওয়ায় বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। চিতাবাঘের বংশ যে লোপ পাচ্ছেনা এটা প্রমাণ করে ডাঃ বের্নহার্ডকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য পশ্চিম জার্মানীর পশু চামড়ার ব্যবসায়ীরা তথ্য ও সংখ্যা সংগ্রহে উঠে পড়ে লেগেছেন।

পশ্চিম জার্মানীতে পাকা করার জন্য যেসব চিতাবাঘের চামড়া আসে সেগুলি প্রধানত আমদানি হয় বাইল্যাণ্ড, ভারত ও পাকিস্তান থেকে এবং অতি অল্প সংখ্যকই আসে আফ্রিকা থেকে কিন্তু ডাঃ বের্নহার্ডের মতে পূর্ব আফ্রিকা থেকে গোপনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার চিতাবাঘের চামড়া পশ্চিম জার্মানীতে চালান হয়। এই অবাধ হত্যা বন্ধ করার জন্য ডাঃ বের্নহার্ড সম্প্রতি টেলিভিশন মারফৎ মহিলাদের সম্বোধন করে বলেছেন যে তাঁরা যেন চিতাবাঘের চামড়ার কোট পরা ত্যাগ করেন এবং এই বর্জনের নজির স্বরূপ তিনি মার্কিনী মহিলাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। দেখা যাক মহিলারা তাঁর এই অনুরোধে কতদূর সাড়া দেন।

শীতকালে বরফের কনকনে ঠাণ্ডায় কি করে রাস্তা গরম করে জানেন কি ?

ঠাণ্ডা দেশে শীতকালে তুষারপাতের ফলে পথঘাট বন্ধ হয়ে যায়। সেইসব বরফ সরিয়ে গাড়ি-চলাচলের জন্যে রাস্তা খুলতে একদল মানুষকে সবসময় তৈরী থাকতে হয়।

এখন পশ্চিম জার্মানীর একটি বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান রাস্তা গরম রাখার এক উপায় উদ্ভাবন করেছে। এতে রাস্তার ওপর প্লাস্টিকের মুড়ম বিছিয়ে তার তলা দিয়ে বিজলীর তার চালিয়ে দেওয়া হয় আর ওপরে বেকালাইটের পলেস্তারা দেওয়া হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে রাস্তা গরম রাখার এই আস্তরণটিতে যেমন জল বসেনা তেমনি গাড়িঘোড়ার চলার দরুণ এর ক্ষয়-ক্ষতিও অনেক কম হয়। রাস্তায় বরফ জমলেই এর বিজলীর ব্যবস্থা আপনা-আপনি চালু হয়ে যায় ও এক ইঞ্চি বরফ দশ মিনিটে গলে যায়। উত্তর জার্মানীতে কোন একটি সেতু ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থায় "সরম" রাখা হয়। বরফ গলাবার খরচের চেয়ে এতে ব্যয় অনেক কম পড়ে।

* * * *

একজনা একটা বাড়ির জানালার ধারে বসে তিনটি সুন্দরী মেয়ে সুতো কাটছিলো। এমন সময় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে প'ড়ে তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ভদ্রলোক যেমন লম্বা, তেমনি সুদর্শন। মাথাটা লাল। তার চোখের দৃষ্টি কেমন ঠাণ্ডা। আর সেই দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে কী এক সংকল্প। যেন তিনি এক ঝাঁক প্রজাপতি পরখ ক'রে দেখছেন। দরজায় কোনো রকম শব্দ না করে ভদ্রলোক বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লেন। স্বাভাবিক গলায় বললেন: দয়া ক'রে তোমাদের জামা—কাপড় খুলে ফেলো।"

শুনে একটি মেয়ে তো চীৎকার ক'রেই উঠলো। কিন্তু তার চেয়ে বেশি বয়সের মেয়েটি তাকে সাহস দিয়ে বললো: "ভদ্রলোককে মোটেই কিন্তু দুশ্চরিত্র মনে হচ্ছেনা।"

আগন্তুক ব'লে উঠলেন: "সত্যি কথাই বলেছো। আমি একজন শিল্পী। যে রকম ভাবছি তোমাদের দেহ যদি তাই হয় তবে সুতো কেটে যা পাচ্ছো তার চাইতে অনেক বেশি পয়সা পাবে আমার ছবির মডেল হিসেবে কিছু সময় ব'সে থাকলে।

সেই বছরটা ছিলো ১৮২২ সাল। জায়গাটা প্যারিস। আর ওই ভদ্রলোক হলেন বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-শিল্পী টিটার পল রুবেনস্।

উদাত্ত আহ্বান

"আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত প্রসূতি বঙ্গভূমি। এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে দূর প্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয় প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী-জন্মভূমি, এই—মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কাল-গর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তিশোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা নানাপ্রহরণপ্রহারিণী শত্রু-মর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাজ্ঞান-মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কাল-স্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

কমলাকান্তের দপ্তর

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিম-রবীন্দ্র সংগম

দুই মহাযুগ

বঙ্কিমচন্দ্র

বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন—

প্রথম প্রকাশ 'প্রচার' ১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘ

১। যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখন সেদিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন, আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

৩। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা ও পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না; সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করা পাপ।

৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

৬। যে বিষয়ে যাঁহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ অকর্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাহিত্যে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

৭। বিদ্যাপ্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে তাহা আপনি প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যাপ্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান কোটেশন বড় বেশি দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

৮। অলংকার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলংকার ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে, লেখকের ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলংকার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য আর নাই।

৯। যে স্থানে অলংকার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলিনা। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়াইয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারিবার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

১০। সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখকের উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরেজি বা সংস্কৃত বা বাঙালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, একথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

বাঙালা সাহিত্য বাঙালার তরসা। এই নিয়মগুলি বাঙালী লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে পারিবে।

বাংলা লেখক

মাঘ, ১২৯৯　　রবীন্দ্রনাথ
"সাহিত্য" গ্রন্থভুক্ত

এক হিসাবে অন্যদেশ অপেক্ষা আমাদের এদেশে লেখকের কাজ চালানো অনেক সহজ, লেখার সহিত কোনো যথার্থ দায়িত্ব না থাকাতে কেহ কিছুতেই তেমন আপত্তি করে না। ভুল লিখিলে কেহ সংশোধন করে না, মিথ্যা লিখিলে কেহ প্রতিবাদ করে না, নিতান্ত 'ছেলেখেলা' করিয়া গেলেও তাহা 'প্রথম শ্রেণী'র ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়। বন্ধুরা বন্ধুকে অম্লান মুখে উৎসাহিত করিয়া যায়, শত্রুরা যুক্তিমত নিন্দা করিতে বসা অনর্থক পণ্ডশ্রম মনে করে।

সকলেই জানেন বাঙালির নিকট বাংলা লেখার, এমনকি লেখামাত্রেরই এমন কোনো কার্যকারিতা নাই যেজন্য কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করা যায়। পাঠকেরা কেবল যতটুকু আমোদ বোধ করে ততটুকু চোখ বুলাইয়া যায়, যতটুকু নিজের সংস্কারের সহিত মেলে ততটুকু গ্রহণ করে—বাকিটুকু চোখ চাহিয়া দেখেও না। সেইজন্য যে-সে লোক যেমন-তেমন লেখা লিখিলেও চলিয়া যায়।

অন্যত্র, যে দেশের লোকে তাহের কার্যকরী অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা কেবল সংস্কার সুবিধা ও অভ্যাসের দ্বারাই বদ্ধ নহে, যাহারা স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে স্বতন্ত্র জীবন গঠিত করে, সুস্থ কাব্যে প্রবল বাস্তিতায়—সুসংলগ্ন যুক্তিতে যাহাদিগকে বাস্তবিকই বিচলিত করে, তাহাদের দেশে লেখক হওয়া সহজ নহে। কারণ, লেখা সেখানে খেলা নহে, সেখানে সত্য। এইজন্য লেখার চরিত্রের প্রতি সেখানকার পাঠকদের সর্বদা সতর্ক তীব্র দৃষ্টি। লেখা সম্বন্ধে সেখানে কোনো আলস্য নাই। লেখকরা সযত্নে লেখে, পাঠকেরা সযত্নে পাঠ করে। মিথ্যা দেখিলে কেহ মার্জনা করে না, শৈথিল্য দেখিলে কেহ সহ্য করে না। প্রতিবাদযোগ্য কথামাত্রের প্রতিবাদ হয় এবং আলোচনাযোগ্য কথামাত্রেরই আলোচনা হইয়া থাকে।

কিন্তু এদেশে লেখার প্রতি সাধারণের এমনি সুগভীর অশ্রদ্ধা যে, কেহ যদি আন্তরিক আবেগের সহিত কাহারও প্রতিবাদ করে তবে লোকে আশ্চর্য হইয়া যায়। ভাবে, সময় নষ্ট করিয়া এত বড়ো একটা অনাবশ্যক কাজ করিবার কী এমন প্রয়োজন ঘটিয়াছিল! অনর্থক কেবল লোকটার মনে আঘাত দেওয়া! তবে নিশ্চয়ই বাদীর সহিত প্রতিবাদীর একটা গোপন বিবাদ ছিল, এই অবসরে তাহার প্রতিশোধ লইল।

কিন্তু যে কারণে, এক হিসাবে, এখানে লেখক হওয়া সহজ সেই কারণেই, অন্য হিসাবে, এখানে লেখকের কর্তব্য পালন করা অত্যন্ত কঠিন। এখানে লেখকে পাঠকে পরস্পরের সহায়তা

করে না। লেখককে একমাত্র নিজের বলে দাঁড়াইতে হয়। যেখানে কোনো লোক সত্য শুনিবার জন্য তিলমাত্র ব্যগ্র নহে সেখানে আপন উৎসাহে সত্য বলিতে হয়। যেখানে লোকে কেবলমাত্র প্রিয়বাক্য শুনিতে চাহে সেখানে নিতান্ত নিজের অনুরাগে তাহাদিগকে হিতবাক্য শুনাইতে হয়। যেখানে বহু দর্শন থাকিলেও বা না-থাকিলেও তা, সহজে চিন্তা করিয়া কথা বলিলেও বা অসহ্য বোধের মাথায় কথা বলিলেও তা—এবং অধিকাংশের নিকট শেষোক্ত কথারই অধিক আদর হয়—সেখানে কেবল নিজের শুভ ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া, চিন্তা করিয়া, সন্ধান করিয়া, বিবেচনা করিয়া, কথা বলিতে হয়। চক্ষের সম্মুখে প্রতিদিন দেখিতে হইবে বহু যত্ন বহু আশার ধন সম্পূর্ণ অনাদরে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে, গুণ এবং দোষ—নৈপুণ্য এবং ত্রুটি সকলই সমান মূল্যে—অর্থাৎ বিনামূল্যে পথপ্রান্তে পড়িয়া আছে, যে আশ্বাসে নির্ভর করিয়া পথে বাহির হওয়া গিয়াছিল সে আশ্বাস প্রতি পদে ক্ষীণ হইতেছে, অথচ পথ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে—যথার্থ শ্রেষ্ঠতার আদর্শ একমাত্র নিজের অভ্রান্ত যত্নে সম্মুখে দৃঢ় এবং উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে।

…আমি বলিতেছি, আমাদের লেখকদিগের অতিরিক্ত মাত্রায় চেষ্টান্বিত ও সতর্ক হইতে হইবে।

…এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীকভাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং আঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

• • • •

সে-বার একটি সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হয়েছে। মেয়েটি রবীন্দ্রনাথের পরিচিত। একদিন বরকে নিয়ে এলো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাকে কেমন খাতির করেন তা বরকে দেখাবার জন্য মেয়েটি যে বিশেষ ব্যস্ত তা রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ালো না। নিজের দাম বাড়াবার জন্য কেউ তাঁকে ব্যবহার করছে, এ ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ কখনো বরদাস্ত করতেন না। মেয়েটি আর তার বর রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাদের দিকে ফিরেও চাইলেন না। এমন ভাব করলেন যেন তিনি মেয়েটিকে আদৌ চেনেন না। মেয়েটির তো তখন চোখে জল এসে গেছে আর কি! কোনো রকমে গলার স্বর টেনে বললো: "আপনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন না?" তখন রবীন্দ্রনাথ তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন: "ও তুমি! এই বুঝি তোমার বর? তা বেশ, কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।"

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে বললো: "বিয়েতে নিজে এসে নিয়ে যেতে পারিনি ব'লে রাগ করেছেন? বিশ্বাস করুন, সত্যি আমি নড়তে ক'রে উঠতে পারিনি।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন: "সে কথা আসছে না।"

"তাহলে।" মেয়েটি আরো উৎকণ্ঠিত স্বরে শুধায়।

রবীন্দ্রনাথ ধরা গলায় বললেন: "এর মধ্যেই ভুলে গেলে? তুমি না বলতে আমার গলায়ই তুমি মালা দেবে?"

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বাট। তাঁর রসিকতায় উপস্থিত সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো। বর-বধূকে রবীন্দ্রনাথ তো আশীর্বাদ করলেনই, বনমালীকে ডেকে চা-খাবার দিয়ে তাদের আপ্যায়িত করলেন। ওদের উপহারও দিলেন।

বঙ্কিম-সাহিত্যে স্বপ্ন-দর্শন

গৌরীশংকর দে

বড়ো লেখকদের লেখা মহাদেশের মতোই স্বয়ং-সম্পূর্ণ। আলো-আঁধার, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, বাস্তব-অবাস্তব সব কিছুরই সেখানে আশ্চর্য সমাবেশ। মহৎ সাহিত্যিকদের রচনা জীবনেরই যেন প্রতিফলন। জীবনের অন্যান্য উপাদানের মতো স্বপ্নও তাই মাঝে-মাঝে স্থান পেয়েছে শক্তিমান লেখকদের রচনায়। বিশেষ ক'রে আধুনিক সাহিত্য স্বপ্নের ব্যবহার খুবই বেশি। মামুলী ঘটনার মারফৎ লেখক অনেক সময়ই তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করতে পারেন না। স্বপ্নের কোনো ব্যাকরণ নেই, স্বপ্ন কোনো যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না, স্বপ্নের দেশে অসম্ভব ব'লে কিছু নেই। স্থান ও কালবোধ স্বপ্ন-রাজ্যের সীমান্তে এসে থমকে যায়। স্বপ্নের মধ্যে আছে যেন এক দুস্তর রহস্য, এক আশ্চর্য সাংকেতিকতা, এক অপূর্ব প্রতীকী-সৌন্দর্য। তাই যুগে-যুগে কবি সাহিত্যিকেরা মুগ্ধ হ'য়েছেন জীবনের এই অলীক উপাদানটির প্রতি। রামায়ণে রাজা দশরথ সত্যানু হয়েছেন, রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য গেছেন বনে, অযোধ্যা শ্রীহীন। ভরত তখন মাতুলালয়ে। মহাকবি বাল্মিকী তরতকে পাঠক-পাঠিকার কাছে যখন প্রথম উপস্থিত করলেন তখন তিনি সবে দুঃস্বপ্ন দেখে উঠেছেন। সেখানে আসন্ন দুঃসংবাদের ইঙ্গিতে অর্থময় হ'য়ে উঠেছে স্বপ্ন। নাট্যকার ভাস এই ঘটনাটিই ব্যবহার করেছেন তাঁর 'প্রতিমা' নাটকে। স্বপ্ন চিরকালই মানুষের কাছে পরম রহস্যময়। তাই দৈবাদেশ, দেবতা, দৈব-ঔষধ প্রাপ্তি, কবিতা বা সংগীতের প্রেরণা অধিকাংশ সময়ই স্বপ্ন। স্বপ্ন তখন স্নিগ্ধ ছায়া-পথের মতো, হয়তো বা স্বর্গ থেকে মর্ত্য পর্যন্ত প্রসারিত। মানুষের কামনা-বাসনা চরিতার্থতার স্বর্গ-ভূমিও স্বপ্ন। আবার মানুষের অন্তর্লগ্না মনের ভয়, বিকৃতি, অপরাধবোধ রূপ নেয় দুঃস্বপ্নের। অন্ধকারে এসে মানুষকে দানবের মতো নিষ্পীড়ন করে। ইংরেজীতে দুঃস্বপ্নের আর নাম নাইট মেয়ার। স্বপ্ন নামক এই আশ্চর্য, বিচিত্র, বহুরঙী, রহস্যময় উপাদানটি ব্যবহার করতে লেখকেরা মুগ্ধ হবেন বৈকি। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম সচেতনভাবে স্বপ্নের ব্যবহার করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্নের ব্যবহার প্রথম করেছেন 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে। রোগশয্যার শুয়ে তিলোত্তমা যে সব সুখ-স্বপ্ন দেখেছিলেন জগৎসিংহের কাছে তা অকপটে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ ক'রে একটি স্বপ্নের কথা তিলোত্তমার স্পষ্ট মনে আছে: সবে বসন্ত দেখা দিয়েছে। পৃথিবী রূপসী হয়ে উঠেছে বিচিত্র পুষ্প-পল্লবে। একটা ছোট পাহাড়ের ওপর তিলোত্তমা ফুল নিয়ে জগৎসিংহের সঙ্গে খেলা করছেন। বসন্তের ফুলে তিনি দু'টি মালা গাঁথলেন। একটি নিজে পরলেন, আরেকটি পরিয়ে দিলেন জগৎসিংহের কণ্ঠে। কিন্তু রাজপুত-বীরের কটিদেশে তরবারি ছিল। তার সংস্পর্শে এসে মালা ছিঁড়ে গেল। তখন তিলোত্তমা ফুলের মালা দিয়ে জগৎসিংহের পা দু'টি বেঁধে ফেলতে গেলেন। কিন্তু জগৎসিংহ স'রে গেলেন। তিনি স'রে যাচ্ছেন, তিলোত্তমাও তাকে অনুসরণ ক'রে চলেছেন। মাঝখানে একটা দীর্ঘ খর্পা পড়ল। জগৎসিংহ লাফ দিয়ে খর্পা পেরিয়ে গেলেন। তিলোত্তমা পারলেন না। সেই খর্পায় স্রোত প্রবাহিত শুরু হল। ক্রমশ তা এক বিরাট নদীতে পরিণত হল। নদীর

ভয়ংকর মূর্তি দেখে তিলোত্তমা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। এই সময়ে হঠাৎ কতগুলি হাঙ্গর হ'য়ে তিলোত্তমাকে নদীর স্রোতে নিক্ষেপ করল।···এই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তিলোত্তমার প্রিয়-মিলন-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তার মনের উৎকণ্ঠা। শুধু তাই নয়, তিলোত্তমা যেন স্বপ্নের ভাষায় জগৎসিংহকে আত্মনিবেদন করেছেন।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদের নামই 'স্বপ্নে'। পরিচ্ছেদটি শুরু করার আগে বঙ্কিম বায়রনের কাব্য থেকে একটি পংক্তি ব্যবহার করেছেন। "I had a dream, which was not all a dream." এই পংক্তিটির মধ্য দিয়ে গোটা পরিচ্ছেদটির অর্থ যেন ব'লে দেয়া হ'য়েছে। কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যত জীবনের অশুভ ইঙ্গিতে স্বপ্নের ঘটনাটির শেষ। স্বপ্ন দেখছেন কপালকুণ্ডলা। যেন তিনি নৌকোতে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলেছেন। নৌকোটি সুসজ্জিত। তাতে যে পতাকা উড়ছে সেটির রং বসন্তের। নাবিকদের গলায় ফুলের মালা। তারা গাইছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের গান। পশ্চিম আকাশ থেকে সোনালি রোদ ঝ'রে পড়ছে। সেই আলোতে সমুদ্রকেও মনে হচ্ছে আনন্দিত। মেঘগুলি আকাশে ছুটোছুটি ক'রে স্নান করছে সোনালি রোদে। হঠাৎ রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। কোথায় হারিয়ে গেল সূর্য আর সোনালি মেঘ। কালো মেঘ এসে ছেয়ে ফেলল আকাশ। নাবিকেরা দিকভ্রান্ত হ'য়ে পড়ল। তাদের গান থেমে গেল। তারা গলার মালা ছিঁড়ে ফেলল। বসন্ত রঙের পতাকা নিজের থেকেই জলের মধ্যে খ'সে পড়ল। প্রবল বাতাসে সমুদ্রে বড়-বড় ঢেউ উঠল। ঢেউয়ের ভেতর থেকে এক অতিকায় পুরুষ উঠে যা হাত দিয়ে কপালকুণ্ডলার নৌকা সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে চাইল। সেই সময়ে এক ব্রাহ্মণবেশধারী নৌকা ধরে ফেলল। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞেস করল, নৌকা ভাসিয়ে রাখবে, না ডুবিয়ে দেবে। কপালকুণ্ডলা নৌকা ডুবিয়ে দিতেই বলে ফেলল। ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছেড়ে দিল। তখন নৌকা কথা ব'লে উঠল; পাতালে প্রবেশের ইচ্ছা জানাল। কপালকুণ্ডলাকে জলে ফেলে দিয়ে নৌকা পাতালে চ'লে গেল। সমস্ত ঘটনা যেমন অদ্ভুত, তেমনি রহস্যময়। যে নৌকাটা মনে হচ্ছিল সাধারণ, স্বপ্নের শেষে এসে তার চেহারা পাল্টে গেল। নৌকাটা হয়ে উঠল ভূতুড়ে, হিংস্র, ভয়ংকর। যার উপরে ভর দিয়ে কপালকুণ্ডলা সংসার-সমুদ্র পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন সে-ই শেষপর্যন্ত তাকে আশ্রয়চ্যুত করল। যে মুহূর্তে নবকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেই মুহূর্ত থেকেই কপালকুণ্ডলা যেন ঘূর্ণাবর্তে প'ড়ে গেছে। তাকে দু'টি শক্তি দুদিক থেকে টানছে। একদিকে কাপালিক অন্যদিকে নবকুমার। এক সময়ে মনে হল কাপালিকের শক্তি বুঝি পরাভূত হয়েছে, নবকুমারই জয়ী হয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবকুমারও কাপালিকের দ্বারা প্রভাবিত হলেন। তাই, কপালকুণ্ডলা আত্মবিসর্জনে বাধ্য হলেন। কপালকুণ্ডলার এই সমগ্র জীবন-কাহিনীই যেন সংক্ষেপে ছায়া-নাটোর মতো প্রতিফলিত হয়েছে স্বপ্নে-দেখা ওই ঘটনার মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমের সাহিত্যে স্বপ্নের প্রধান ভূমিকা 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে। কাহিনীর গোড়াতেও একটি স্বপ্ন, শেষেও একটি স্বপ্ন। যেন দুই স্বপ্নের প্রচ্ছদের ভেতরে আখ্যায়িকাটি বেড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা যেন আগে থেকেই লেখক স্বপ্নের প্রচ্ছন্ন ভাষায় ব'লে দিয়েছেন। 'ছায়া পূর্ণশশিনী' পুরো অধ্যায়টিই প্রায় একটি স্বপ্নের বর্ণনা। দুর্যোগের রাত্রি। গভীর রাত্রি। একটা ভাঙা বাড়ির মধ্যে কেবল কুন্দ আর তার পিতার শব। কুন্দ পিতার শবের ধারে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার মা-কে স্বপ্ন দেখল। দেখল এক সুদর্শন পুরুষ আর উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী পদ্মপলাশলোচনী যুবতীকে। মা ওই দু'জন সম্পর্কেই কুন্দকে

সতর্ক থাকতে বলে গেলেন। কুন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছাও তিনি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কুন্দ তাতে উৎসাহ দেখায়নি। কুন্দকে আরেকবার দেখা দিলেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে অসুখ হলেন। মা স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন চন্দ্রমণ্ডলকে বাহন ক'রে। পরে কুন্দের সঙ্গে যখন নগেন্দ্র এবং হীরার দেখা হল তখন কুন্দ সভয়ে আবিষ্কার করল এদের দুজনকেই সে স্বপ্নে দেখেছিল। মা এদের সম্পর্কেই সতর্ক থাকতে বলেছিলেন। এরা যে তার সর্বনাশের কারণ সত্যি হয়েছিল আখ্যায়িকার পরের দিককার ঘটনা থেকেই পাঠক-পাঠিকা তা জানতে পারেন। তখন যাকে নিতান্ত অবাস্তব স্বপ্ন মনে হয়েছিল তা আর মনে হয়না। কাহিনীর শেষ দিকে কুন্দর মা আবার জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে স্বপ্নে দেখা দিলেন। আর চন্দ্রমণ্ডল নয়, এবার তাঁর বাহন ইন্দ্রধনুশোভিত নীল নবঘন মেঘ। এবার কুন্দ মা'র সঙ্গে যাবার জন্য আগ্রহ জানাল, কারণ জীবনে আর তার আকর্ষণ নেই। জীবনে কি এরকম দু'বার স্বপ্ন-দর্শন ঘটে? 'বিষবৃক্ষ' পড়ার সময় কিন্তু আমাদের মনে এ প্রশ্ন জাগেনা। কাহিনীটি এই যে স্বপ্নের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মনে হয় এই স্বাভাবিক।

"চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর নরক-দর্শন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে দুঃস্বপ্ন রচনা করেছেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই তার তুলনা বিরল। তিনি যে নরকের বর্ণনা দিয়েছেন তা লেখকের নিজের ভাষাতেই কেবল ব্যক্ত করা সম্ভব: "শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—রুধিরের স্রোতঃ বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নরদেহ, মুণ্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। কুম্ভীরাকৃতি জীবসকল চর্ব্য-মাংসাদি বর্জ্জিত কেবল অস্থি, ও বৃহৎ, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল চক্ষুরবিশিষ্ট—ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সেই সকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। .....সে প্রদেশে রৌদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোক মাত্র নাই—অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা যাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই তীব্রপাণ্ডুকারে দেখা যাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই—তৎপরিবর্ত্তে লৌহসূচী সকল অগ্রভাগ ঊর্দ্ধ করিয়া রহিয়াছে।"

বঙ্কিম বর্ণিত প্রতিটি স্বপ্নই মনস্তত্ত্বসম্মত। জগৎসিংহ দুর্গম রাজপুতনার অধিবাসী। তাই তিলোত্তমা জগৎসিংহকে স্বপ্নে দেখেন পাহাড়িয়া পরিবেশে। কপালকুণ্ডলার প্রথম জীবন শুধু নয়, জীবনের অধিকাংশ কাল কেটেছে সমুদ্রসন্নিহিত নির্জনতায়। তাই তার স্বপ্নে দেখা দেয় সমুদ্র, তরী আর নাবিক। কুন্দর মা স্বর্গতা, তাই চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে কুন্দ তার মাকে স্বপ্নে দেখে। শৈবলিনীর মনে পাপবোধ কাজ করছে, তাই সে দেখে নরকের দুঃস্বপ্ন। এই স্বপ্নগুলির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে মানব-মন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টির, তাঁর কল্পনা-শক্তির।

উল্লিখিত চারটি স্বপ্নের মধ্যে তিনটিতেই নদী। শুধু তাই নয়, তিলোত্তমা, কপালকুণ্ডলা, আর শৈবলিনী তিনজনই নিক্ষিপ্ত হয়েছেন নদীতে। বঙ্কিমের স্বপ্নের এই সাধারণ প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো।

শৈবলিনীর দুঃস্বপ্ন ছাড়া প্রতিটি স্বপ্নেরই প্রথম অংশ মনোরম। চাঁদ, ফুল, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি অতি পরিচিত সুন্দর পদার্থ সহযোগে তিনি যেন স্বপ্ন-সৌধগুলি নির্মাণ করেছেন। কিন্তু স্বপ্নের দ্বিতীয়ার্ধে এসে স্রষ্টা আপন সৃষ্টি নির্মম হাতে ভেঙে দিয়েছেন। নায়িকার মনে যে আশার মিনার গ'ড়ে উঠেছিল স্বপ্নটি অবলম্বন হচ্ছে সেই আশার করুণ ভগ্নস্তূপের বাস্তবতায়। মৃৎশিল্পীর মতো

মনের নিভৃত মমতায় স্বপ্ন-প্রতিমা গ'ড়ে বঙ্কিম নদীসর্ভে বিসর্জন দিয়েছেন। বাস্তবের শিলা-সৈকতে এসে চূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে স্বপ্ন-তরণী।

স্বপ্নগুলির আরেকটি বৈশিষ্ট্যও সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে: বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রায় সব ক'টি স্বপ্নেরই দ্রষ্টা পুরুষ নয়, নারী। তুর্জেয় নারী-মনের অন্ধকার প্রদেশ আলোকিত করতে স্বপ্ন-বর্তিকার সাহায্য নিয়েছেন বঙ্কিম।

পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত লেখক স্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছেন। দেশ-বিদেশের স্বপ্ন-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে বঙ্কিম-সাহিত্যের স্বপ্নাংশগুলি নিষ্প্রভ এবং খানিকটা গতানুগতিক মনে হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রকৃতি উপলব্ধি করতে হলে তাঁর বর্ণিত স্বপ্নগুলি অপরিহার্য। ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আদ্যন্ত-রোম্যান্টিক। তাই তাঁর রচিত স্বপ্নে, নদী, পাহাড়, আকাশ, চাঁদ, ফুলের সমাবেশ।

• • • •

একদিন বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় এবং দামোদর মুখোপাধ্যায় গ্রামের পথে একসঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখা গেলো ক'য়েকজন লোক একটি শব কাঁধে নিয়ে আসছে। দামোদর নদের ধারে যে শ্মশান, তারা যাবে সেই দিকে। বঙ্কিমচন্দ্র একটু হেসে শবটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন: "বুঝলে দামোদর, দামোদর মুখো।" বঙ্কিমচন্দ্রের রসিকতার উত্তরে দামোদর মুখোপাধ্যায় সঙ্গে-সঙ্গে কিছু বলতে পারলেন না। আপাতত চুপ ক'রেই থাকতে হলো। আরো খানিকটা পথ হেঁটে যাবার পর দেখা গেলো পথের ধারে এক পাটি চটি জুতো প'ড়ে আছে। জলে ভিজে, রোদে পুড়ে সেটার একেবারে অষ্টবক্র অবস্থা! ওটা দেখে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। চটিটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হেসে বললেন: "বুঝলে বঙ্কিম, বঙ্কিম চট্টো।" এবার বঙ্কিমচন্দ্রের নিরুত্তর হওয়ার পালা।

বংকিম-রবীন্দ্র সংগম

(সমালোচনার ক্ষেত্রে)

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

বংকিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান্ বাঙালী ছিলেন ; বিশেষ করে উনবিংশ শতকের উজ্জ্বল বাংলার বিশিষ্ট মনীষীদের মধ্যে এই দুই প্রতিভা যে শীর্ষস্থানীয়—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাঙালীকে ভারতবর্ষের সর্বত্র—এবং বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতির সংগে প্রতিষ্ঠিত করতে এই দুই মনীষীর দান চিরস্মরণীয়। অবশ্য এই উক্তিটির সম্পূর্ণতার জন্যে এই সংগে স্বামী বিবেকানন্দের নামও শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে স্মরণ করতে হয়—তা বলাই বাহুল্য। স্বামীজীর বিচরণক্ষেত্র ভিন্নতর হওয়ায় এখানে আমরা তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করছি না, তাই তাঁর কথা সর্বাগ্রে মনে হলেও নীরবতা অবলম্বন করছি। আবার, বংকিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যে—বিশেষ করে এই উভয় স্রষ্টার মধ্যে সমালোচনার ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় মিল আছে—সেটুকু দেখানোর জন্যেই এই ছোট লেখাটির অবতারণা।

মিল অপেক্ষা বরং অমিলটাই সহজে চোখে পড়ে ; স্থূলভাবে দেখতে গেলে দেখা যায়—বংকিম-চন্দ্র মূলতঃ ঔপন্যাসিক এবং সংস্কারক, আর রবীন্দ্রনাথ কবি এবং দার্শনিক ; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে উভয়েরই দার্শনিক চিন্তার কথা উল্লেখ করতে হয়—এবং মূল কতকগুলি বিষয়ে আশ্চর্য সাদৃশ্যও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ জীবনের অধিকারী ছিলেন—এবং প্রথমে ঐশ্বরিক উপলব্ধি আর পরে কতকটা নিরীশ্বরবাদিতায় তাঁর দার্শনিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। বংকিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতো অত বেশী দিন বাঁচেননি ; প্রৌঢ়ত্ব পার করে মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন, ফলে—তাঁর দার্শনিক-তার পরিণতি আমরা কল্পনা করে নিই মাত্র। কল্পনা করার কথা বলছি এই জন্যে যে তাঁর দার্শনিক জীবনের সম্পূর্ণ পরিণতির পথটা আমরা ধরে নিই ; নচেৎ এই ৫৪ বছর বয়সে তিনি দার্শনিক মতবাদ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, এবং বেঁচে থাকলে সেই মতবাদের পূর্ণ পরিণতিও নিশ্চিতভাবে পাওয়া যেত, কারণ তার জীবনের শেষ বারোবছর তিনি উপন্যাস রচনা করেননি, দর্শন ও সমালোচনা সাহিত্যের সৃষ্টিতেই নিময় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি, সৃষ্টিশীল সত্তার সংগে সংগেই তাঁর চিন্তাশীল মন কাজ করে গেছে। এই দুই মনীষীর প্রতিভার পার্থক্য বিষয়ে আরো দু-চার কথা আসতে পারে, কিন্তু আমরা এখানে এই দুই বিরাট মনীষীর সমালোচক-সত্তার মধ্যে কোনো মৌলিক সৌধর্ম্য আছে কিনা—তাই এখানে বিচার করতে বসেছি।

সমালোচক হিসেবে বিচার করতে গেলে প্রথমে ঐ একই কথা মনে জাগে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যতটুকু মিল দেখা যায়—তার চেয়ে ঢের বেশী অমিল। বংকিমচন্দ্রের সমালোচনা বিষয়মুখিনতায় তীক্ষ্ণ আর রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যুক্তির সংগে উক্তির সৌন্দর্য-প্রক্ষেপণে দ্যুতিমান্ ; ফলে বংকিমচন্দ্র মূলতঃ বুদ্ধিবাদী পরিচালিত—আর রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হতখানি—ঠিক তদনুরূপভাবেই হৃদয়া-বেগের দ্বারা লালিত। কিম্বা এই কারণের জন্যে ওঁদের আলোচনা ভিন্নরূপ নিয়েছে —তা বলা চলে।

কিন্তু তবু এই দুই বিরাট মনীষীর সমালোচনার ক্ষেত্রে মিল আছে।

মিল আছে তাঁদের মূল সমালোচক সত্তার বীক্ষণ দৃষ্টিতে, বিচার দৃষ্টিতে। জগৎ, জীবন এবং জীবনের যাবতীয় পরিপার্শ্বকে দেখার ব্যাপারে এই দুই প্রতিভার দৃষ্টিভংগীতে আশ্চর্য রকম মিল দেখতে পাওয়া যায়। উভয়েই জগৎ ও জীবনকে বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের ফসল হিসাবে গ্রহণ করেছেন, এবং বিজ্ঞান বহির্ভূত বিশ্বাসের বলে প্রাচীন কোনো সংস্কারের দ্বারা কি বংকিমচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথ—কেউই চালিত হন নি, এবং তাঁদের মনে তাই কোনো লৌকিক বিশ্বাস জগৎ ও জীবন-ব্যাপারের পেছনে কখনো কার্যকর হয়নি। মানুষ যে প্রাণী হিসেবে নানা স্তর পেরিয়ে বর্তমান আবয়বিক দীপ্তিতে উপস্থিত—যা মনীষী ডারউইন প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেছেন—বংকিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সেই সত্যকে মানব-জীবন ব্যবস্থার মৌল সত্য হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। ঠিক অনুরূপভাবেই সমাজের অবস্থাকেও উভয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গণ্য করেছেন। এই জগৎ ও জীবনের ব্যাপার গুলিতে ঈশ্বরের অবস্থানকেই অযৌক্তিক রূপে স্বীকার করে নেন নি।

আর একটি বিষয়ে বংকিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আশ্চর্যরকম ঐক্য দেখা যায়। সমালোচক হিসেবে উভয়ের চিন্তায় সাম্যবাদের কথা বিশেষ করে ধরা পড়ে। উভয়েই সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি মমতার কথা প্রকাশ করেছেন। আজকের রাজনৈতিক চিন্তায় সাম্যবাদী নীতি একটা ফ্যাসনের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা কোটিপতি, কালো টাকার আলোয় যাঁরা উজ্জ্বল - তাঁরাও সমাজ-জীবনে দুঃস্থ, নিপীড়িত এবং বঞ্চিত সর্বহারের জন্যে বেদনাবোধ প্রকাশ করে থাকেন,—এটাই আজকের ফ্যাসন; কিন্তু বংকিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের আলোচনাগুলি পড়লে দেখা যাবে—তাঁরা শুধু বক্তৃতার জন্যে বা আধুনিক হবার প্রবণতায় ঐ সব কথা বলেন নি। এই প্রসংগে বংকিমচন্দ্রের 'সাম্য' গ্রন্থখানি মনে পড়ে; বিশেষ করে কমলাকান্তের দপ্তরে তাঁর 'বিড়াল' নিবন্ধটি বোধহয় সকলের মনে আছে। বিড়ালের সংগে কমলাকান্তের কাল্পনিক কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সাম্যনীতির মতবাদই প্রচারিত হয়েছে। বংকিমচন্দ্রের সাম্যবাদ কতকটা ফরাসী দার্শনিক রুশোর সাম্যনীতি ওপর প্রতিষ্ঠিত। রুশো চেয়েছিলেন তাঁর সমকালের সমাজ ব্যবস্থার ধনীর প্রাধান্য লোপ করে একটা নতুন সমাজ গড়ে উঠুক—যে সমাজে ধনী-দরিদ্রের ভেদ থাকে না। যে সমাজে মানুষে মানুষে সমান - তা যেন স্বীকৃত হয়। বংকিমচন্দ্রের সাম্যনীতি কিন্তু কতকটা এই রকম—শ্রেণীহীন সমাজ হবে—সকলের সমান মর্যাদা থাকবে, পৃথিবীর তাবৎ উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর মানুষের জন্মগত অধিকার স্বীকার করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করার সম্ভাবনার কথা তিনি কোথাও বলেননি। তাই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মার্কসীয় দর্শনের আনুকূল্য পুষ্ট সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার তাঁর নেই, মানবতাবাদী দার্শনিক হয়েই তিনি সামাজিক কল্যাণের কথাটি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তাই 'বিড়াল' প্রবন্ধে আমরা দেখি পুঁজিবাদীর প্রতীক কমলাকান্ত ও সর্বহারার প্রতীক বিড়ালের আলোচনায় পুঁজিবাদীর পরাজয় ঘটিয়ে সাম্যবাদের মহিমাটুকুই প্রচার করা হয়েছে।

রবীন্দ্র চিন্তাতে যে সাম্যনীতি—তাও কতকটা এমন মানব কল্যাণের ওপর ভিত্তি রেখে গড়ে উঠেছে। যথার্থ শ্রেণী সংগ্রাম এবং তার প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ—শ্রমিকশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের মাধ্যমে যে সমাজতন্ত্র—তাই, কিন্তু রবীন্দ্র চিন্তাতে কোথাও তেমন আদর্শের কথা নেই। সমাজের সকলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুস্থ, শোভন বৃদ্ধি এবং জ্ঞানবান থাকবে—রবীন্দ্রনাথ তেমন

অন্যত্র প্রকাশিত।

এমনকি 'কালের যাত্রা'র মধ্যে 'রথের রশি' নাটিকাটির উল্লেখে আমার কথার প্রমাণ মিলবে। 'রথের রশি' রবীন্দ্রনাথের সাম্যনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত—এবং এটিকে অনেকেই মার্কস্‌বাদী রচনা বলে থাকেন। মহাকালের রথের রশিটা অনড় হয়েছে, পুরোহিত তাকে নড়াতে পারে না, পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এখানে ব্যর্থ, লৌকিক ভক্তি অর্থহীন, রাজপ্রতাপ ও বণিক্‌শক্তিও ব্যর্থ, কিন্তু নবজাগ্রত শ্রমিক-রূপী শূদ্রের স্পর্শে রথ সচল হলো। রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদী নীতি কতকটা যেন বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যনীতি থেকে ঈষৎ ভিন্ন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে কি একটি সংশয় থেকে যায় নি—যখন পুরোহিত বলেছেন—

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি রথের নিয়ম মেনে চলতে পারবে?

তার উত্তরে কবি বলছেন—

পারবেনা হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই,
রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ এই শূদ্র শক্তির ওপর মৌলিক বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। বৈজ্ঞানিক প্রথায় সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষা মানুষের হৃদয়াবেগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদ তাঁর বেশী কাম্য ছিল। তাই কবিতা, গল্পে, পত্রে, প্রবন্ধে—সর্বত্রই তিনি সভ্যতার আলো যারা জ্বেলে রেখেছে নেপথ্যে থেকে—তাদের গুণগান করেছেন—তাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন—যা জানিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রও—ধরিত্রী ভাষায়—কি সাম্যগ্রন্থে, কি কমলাকান্তের দপ্তরে।

সমালোচক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আর এক জায়গায় মিল আছে। সঙ্কলন গ্রন্থের কয়েকটি আলোচনায় দেখা যায়—উভয়েই অন্তর্মুখী (introspective) আলোচনা করেছেন। প্রাচীন সাহিত্য উভয়ের সংবেদনশীলে যে আবেগ এবং আবেদন জুগিয়েছে—তাই নিজের করে উভয়েই আলোচনা করেছেন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং ধরিত্রী স্বাধীন বুদ্ধির সাহায্যে এই দুই মনীষী সমালোচক সমালোচনাকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। ইংরাজী সাহিত্যে সমালোচনাকে সাধারণতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে, এক ভাগের নাম করা যেতে পারে, বস্তুগর্ভ অর্থাৎ thisis, আর বাকী যে এক ভাগ তার নাম—রসগর্ভ অর্থাৎ phesis. বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনা মূলক প্রবন্ধে মননশীলতার সঙ্গে রসসৃষ্টিকে একাত্ম করে মিলিয়ে দিয়েছেন, উদাহরণ হিসেবে উত্তর চরিতের আলোচনার কথা মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এমনই কাণ্ড করেছেন—তাঁর প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে—এখানে তাঁর মনীষা এবং রসসৃষ্টির ক্ষমতা একেবারে একীভূত হয়ে গেছে। অর্থাৎ উভয়েই এঁরা phesis জাতের প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এটি সম্ভব হয়েছে—এঁরা দুজনেই বিরাট স্রষ্টা—এবং সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সমালোচক।

এঁদের সমালোচনার ভাষা শুচি, শালীন এবং সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ বংকিমচন্দ্রের আলোচনায় ওঁর শুচিসুন্দর ভাষার এবং শালীনভাবোধের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষা সম্পর্কে—তাঁর শালীনতা এবং শুচিতা সম্পর্কে ত' কোন কথাই ওঠে না।

বাংগাত্মক রচনাকেও উভয়ে সুন্দর এবং হাস্যরসাত্মক করে—যাকে বলা যায় হিউমারমণ্ডিত—পরিবেশন করেছেন। কমলাকান্তের দপ্তরে বা লোক রহস্যে এই হিউমারের নিদর্শন নিতান্ত অল্প নয়। বিশেষ করে লোকরহস্যের সেই অমর উক্তি—"হে টুপ্যাবৃত মহাপুরুষ—মাতৃভাষায় কথা বল"—বাংলা সাহিত্যে শুচিস্নিগ্ধ হাস্যরসের প্রথম প্রসবন! রবীন্দ্রনাথের হিউমারও ঠিক এই জাতীয়, যেমন শালীন, তেমনই তীক্ষ্ণ, সরাসরি মনে গেঁথে যায়। যেখানেই তিনি ব্যংগ করেছেন সেখানেই এই রকম তীক্ষ্ণ অথচ হাস্যরসের সিক্ততায় আর্দ্র করে ব্যংগ পরিবেশন করেছেন। ওঁর সকল প্রবন্ধেই এ জাতীয় নিদর্শন প্রচুর ছড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশেষকে যেমন সামান্যের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন—(কবিমাত্রেই এই কাজ অর্থাৎ particular-কে universal-এর মর্যাদায় উন্নীত করেন), বংকিমচন্দ্রও ঠিক এই কাজ করেছেন। কবি সমালোচক মোহিতলাল ওঁর বংকিমবরণ গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—"যাহা সর্বকালাতীত, যাহা নিত্য ও শাশ্বত, তাহাকে তিনি কখনও ভুল করেন নাই, কিন্তু তাহাকে দেশকালের ইতিহাসের মধ্যে মূর্তি ধরিতে দেখিয়াছিলেন।"

কাব্যে বা সৃষ্টিতে নির্বিশেষের স্থান নেই—যা নির্বিশেষ—তা একটা বিশেষের রূপ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের মতো বংকিম সাহিত্যের মানুষেরও এই বিশেষ রূপ ধরা পড়েছে।

সমালোচক রবীন্দ্রনাথ মানবতার পূজারী ছিলেন, বংকিমচন্দ্রও মানুষের পূজায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। মানুষের পূজা, মনুষ্যত্বের আদর্শ-সন্ধানই হলো বংকিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার মূল-মন্ত্র ছিল। উভয়ের মানবতাবোধ নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় হতে পারে।

• • • •

আশ্রমের মেয়ে-বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেনডেন্ট এসে রবীন্দ্রনাথকে জানালেন বোর্ডিং-বাড়ির নিচতলার ঘরগুলির জানলায় লোহার গরাদ না থাকায় তিনি মেয়েদের দায়িত্ব নিতে সাহস পাচ্ছেন না। শুনে রবীন্দ্রনাথ যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনি উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। বললেন: মানুষ কি জন্তুদের জানোয়ার যে তাকে লোহার গরাদ দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখতে হবে! যেখানে আশ্রমের কোনো ঘরের জানালাতেই গরাদ নেই, সেখানে মেয়েদের বোর্ডিং-বাড়ির জানালায় গরাদ লাগাবার মতো অশোভন কাজ আর কী হতে পারে!

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

শিশুসাথী

বিংশতিতম বর্ষ । ৭ম সংখ্যা

পৌষ । ১৩৭১

আদর্শ পথ্য,
পানীয় ও খাদ্য

লিলি বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ
ও
স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

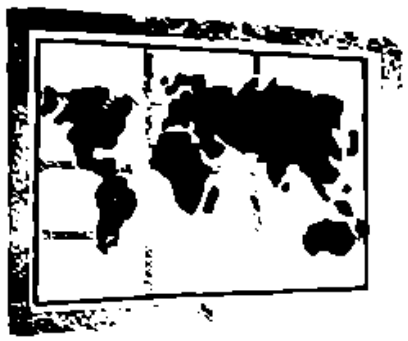

বিশ্ব-বাতায়ন

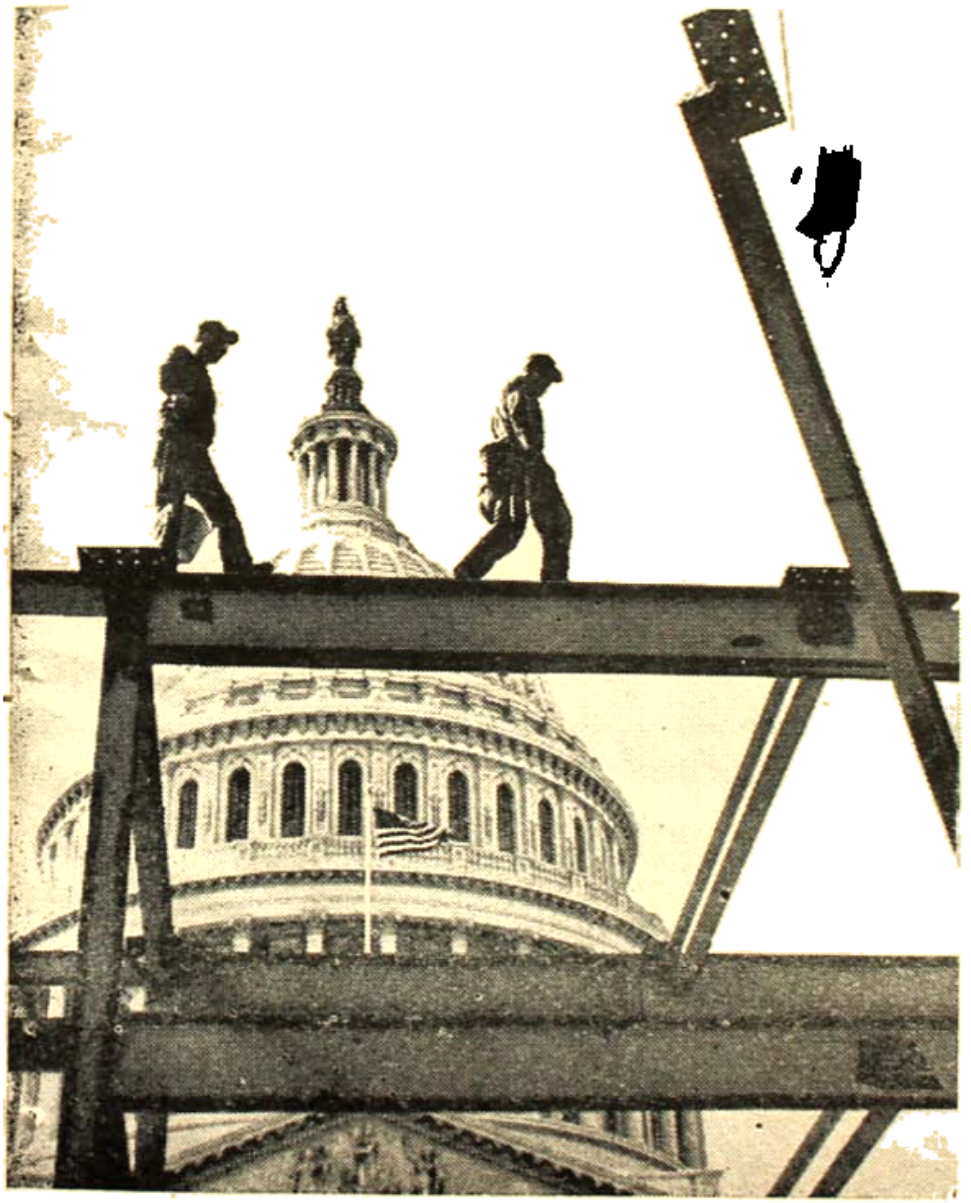

হোয়াইট হাউসে
প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের
দ্বিতীয় উৎসবের প্রস্তুতি

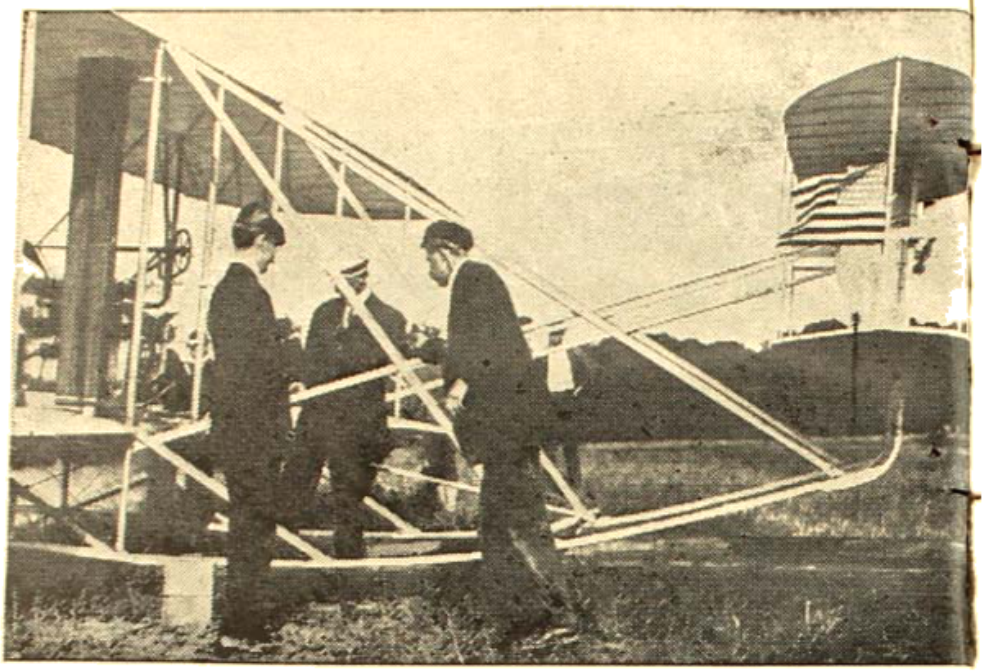

উইলবার এবং অরভিল রাইট—দুই ভাই মিলে চালিত যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে প্রথম এরাই উড়েছিলেন।

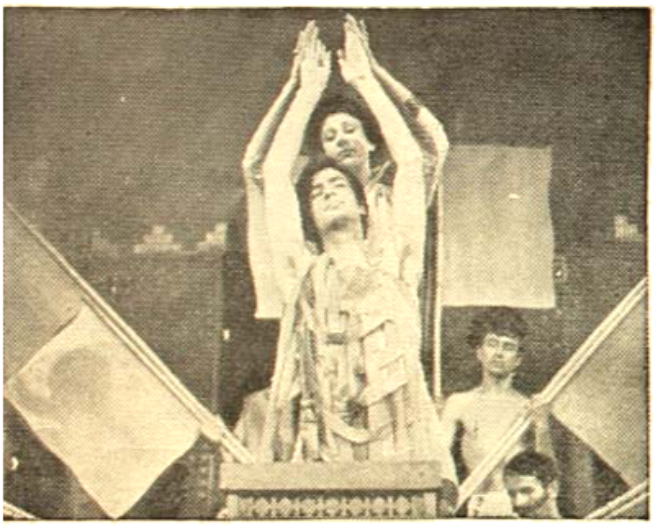

লণ্ডন থিয়েটার ক্লাবে সংগীত নাটক 'বৃষকটিক' অভিনয়ের একটি মনোরম দৃশ্য।

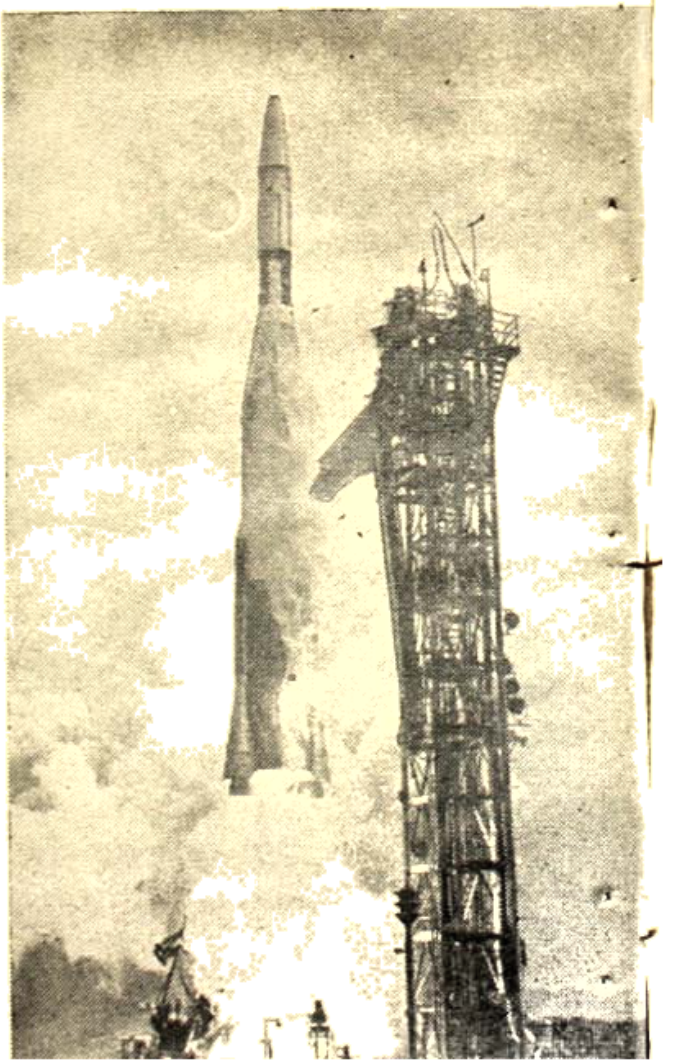

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ অভিযানে—১৯৬১ সালের বিখ্যাত ৭নং মেরাল উপগ্রহ।

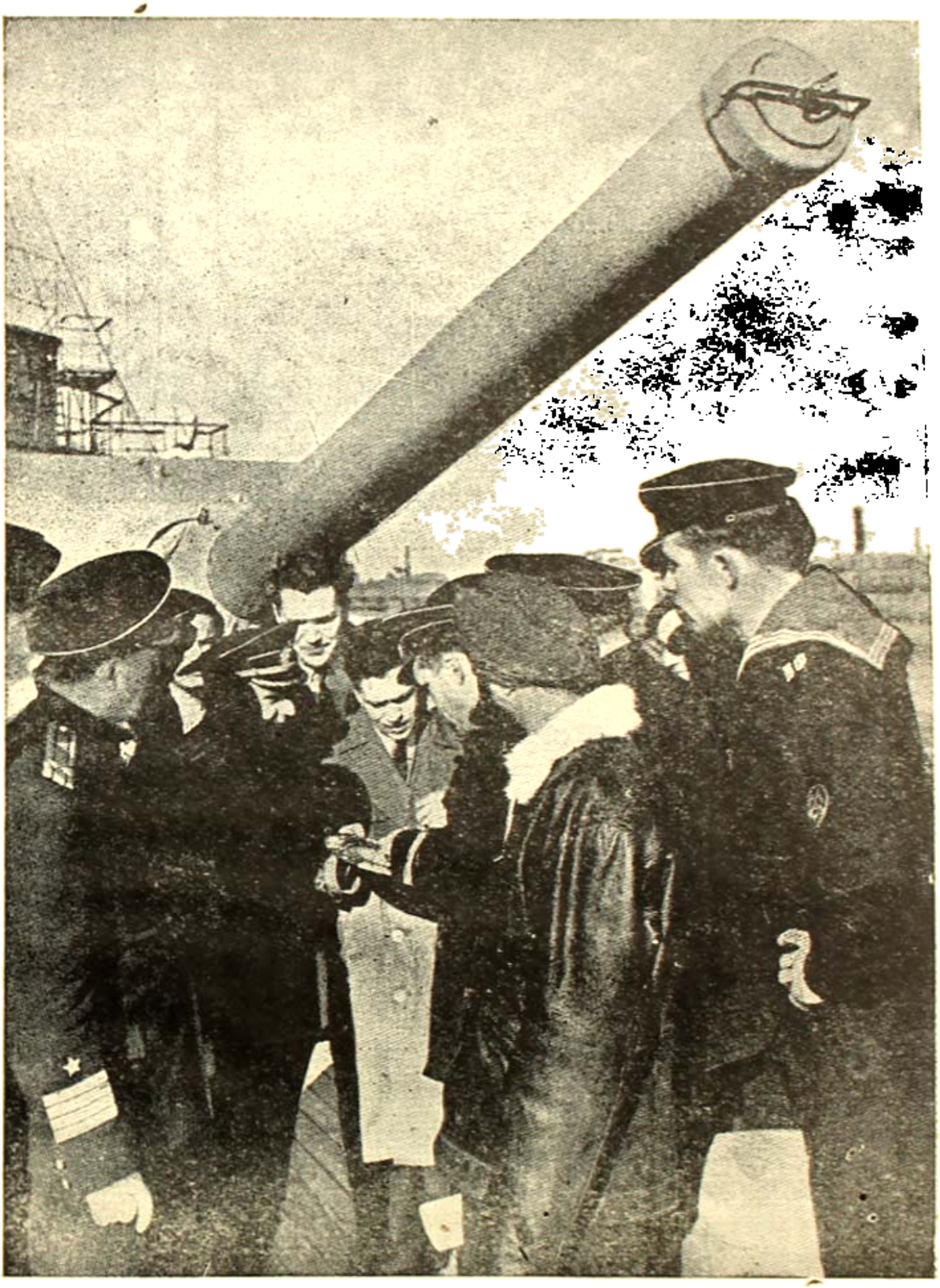

রুশ স্বাধীনতার প্রতীক ক্রুইজার 'অরোরা' ১৯১৭ সালে রুশিয়ার ইতিহাসখ্যাত এই ক্রুইজার অক্টোবর বিপ্লবের সূচনা করে।

H. GILBERT SINGH
63

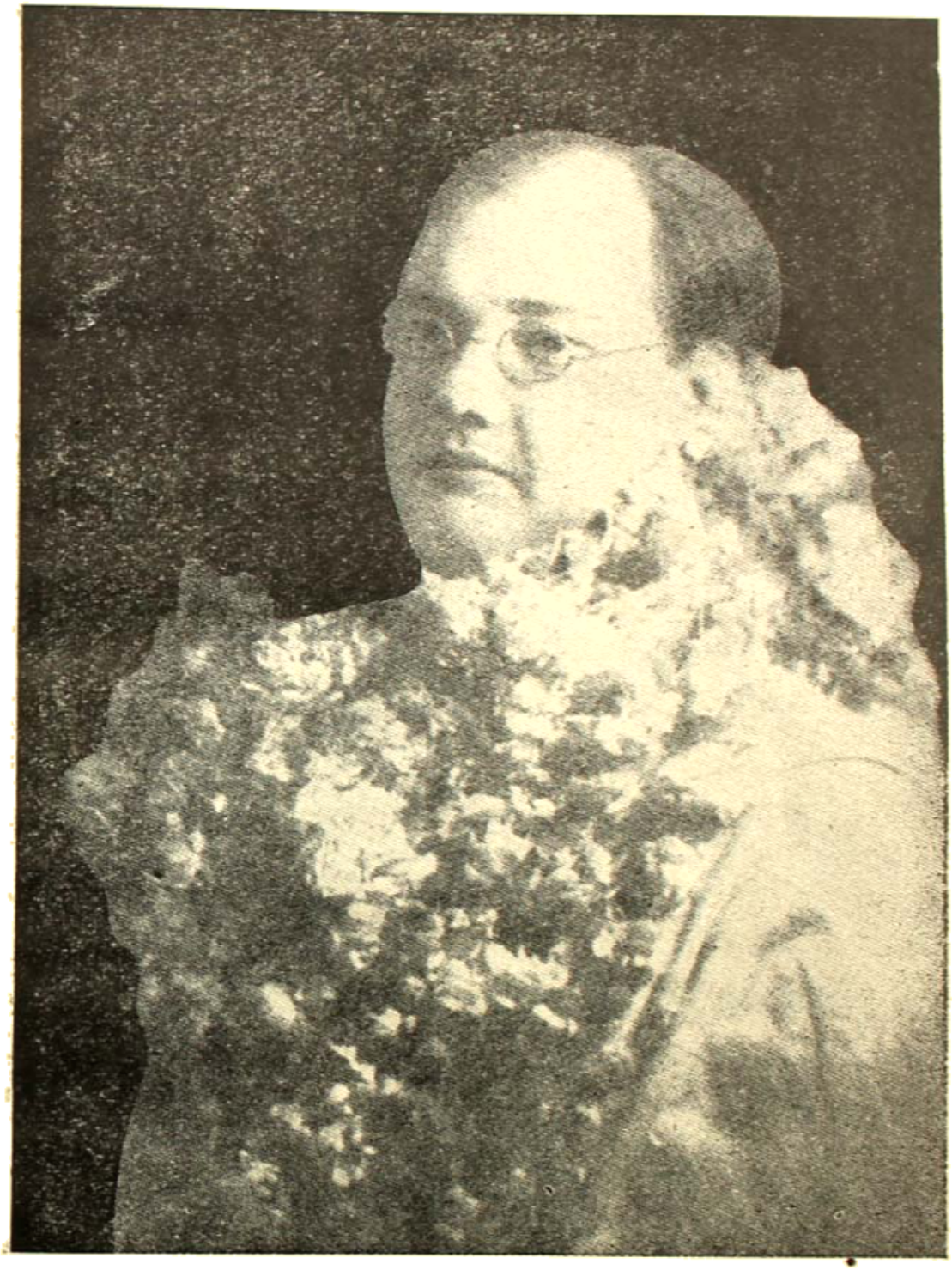

সুভাষচন্দ্র

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে

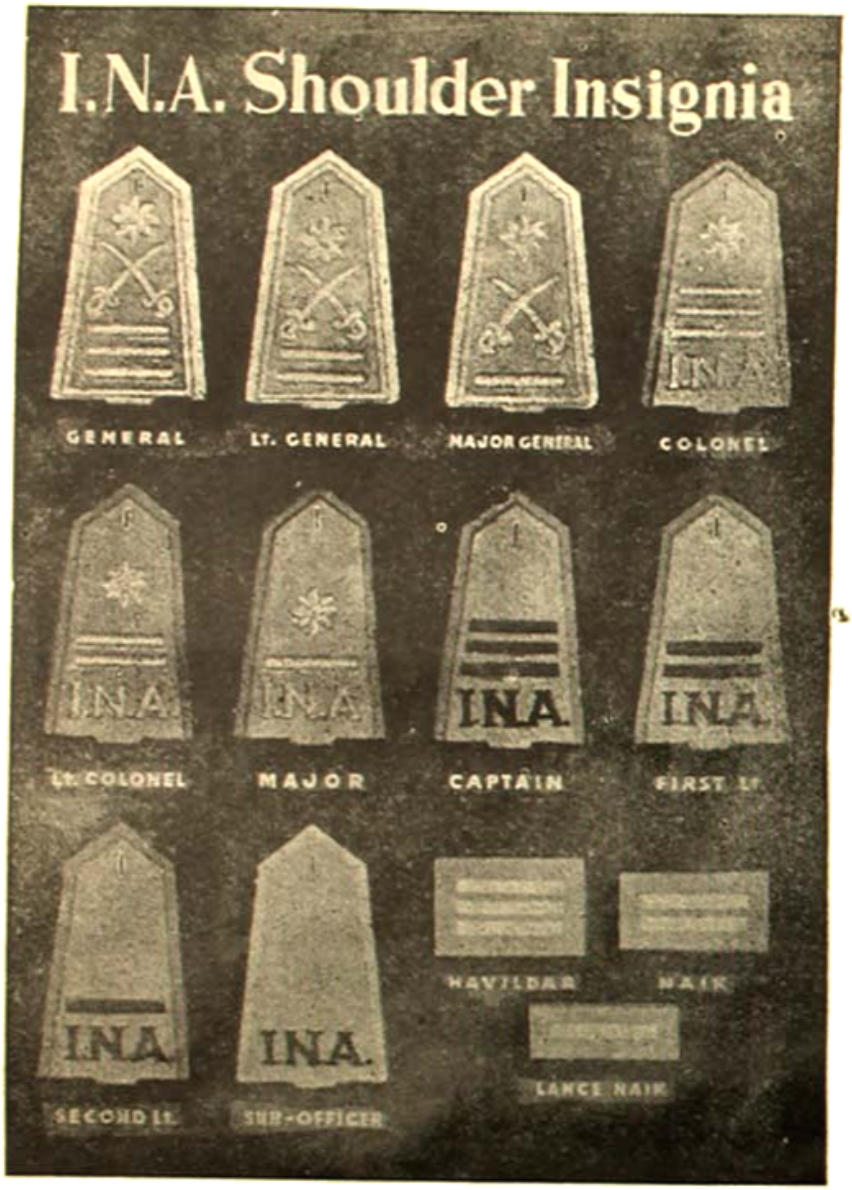

আজাদ হিন্দ সৈন্যদের ভূষণ

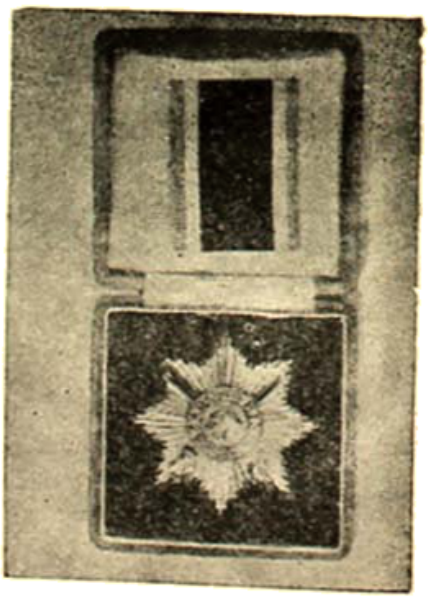

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে

ব্রহ্মদেশের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী বা ম এবং ফিলিপাইন এর প্রেসিডেন্ট লরেল
নেতাজী সুভাষচন্দ্র

আজাদহিন্দের ডাকটিকিট

ব্রহ্মদেশের সীমান্তে আজাদহিন্দের একটি প্রচারপত্র

জার্মানীতে আজাদহিন্দ ফৌজের সঙ্গে নেতাজী

টি. এস. এলিয়ট

গৌরীশংকর দে

নতুন ইংরেজী বছর শুরু হওয়ার পর এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই দুঃসংবাদ এল, টি. এস. এলিয়ট মারা গেছেন। এলিয়ট নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। দেশে-বিদেশে তাঁর অসংখ্য পাঠক। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তারা মনে-মনে পতাকা অর্ধ-নমিত করেছেন।

"ধর্মে আমি ক্যাথলিক, সাহিত্যে ক্লাসিসিষ্ট, আর রাজনীতিতে নৃপতি-তন্ত্রের সমর্থক।" নিজের রক্ষণশীলতার সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছিলেন টি. এস. এলিয়ট। এর মধ্যে অতিকথন নিশ্চয়ই আছে, তাঁর ধ্যান-ধারণা হয়তো পুরোনো আর সনাতন ধারায় প্রবাহিত; কিন্তু যে চেহারায় তা তিনি হাজির করেছেন তা অতি আধুনিক। কাব্য-রচনায় গতানুগতিক রীতি অস্বীকার ক'রে কবিতার আঙ্গিকে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তিনি এনেছিলেন তা কিছুতেই ভুলবার নয়।

টি. এস. এলিয়টের জন্ম ১৮৮৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর। আমেরিকার সেণ্ট লুই নামে একটা জায়গায়। বিশিষ্ট পরিবারে। ছেলেবেলায় তাঁর স্বাস্থ্য তেমন ভালো ছিল না। বই পড়তে দারুণ ভালোবাসতেন। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলা করার চাইতে নদীর ধারে একা-একা বেড়াতেই তাঁর বেশি ভালো লাগত। মিসৌরী আর মিসিসিপি নদীর প্রভাব ছিল তাঁর ওপর সারা জীবন। এলিয়ট নিজেই বলেছেন: যার ছেলেবেলা কোনো বড় নদীর ধারে কেটেছে সে যে কী পেয়েছে তা একই অভিজ্ঞতার লোক ছাড়া উপলব্ধি করতে পারবেনা। শৈশব থেকেই যে এলিয়ট সাহিত্যে অনুরাগী

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরির প্রকল্প—যার উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১২,০০,০০০ কিলোওয়াট হাইড্রেল যন্ত্রপাতি, ১৫,০০,০০০ কিলোওয়াট থার্মাল যন্ত্রপাতি এবং ৫,১৫,০০০ কিলোওয়াট বড়ো ও মাঝারি আকারের এ. সি. ও ডি. সি. বৈদ্যুতিক মোটর।

দুর্গাপুর ও রাঁচীর প্রকল্প দুটির জন্যে ইতিমধ্যেই প্রায় ১৩৪ জন ইন্‌জিনিয়ার ও ৪৫ জন দক্ষ কারিগর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। প্রথমটির জন্যে মোট ২২৭ জন এবং দ্বিতীয়টির জন্যে মোট প্রায় ২১০ জন ভারতীয় ইন্‌জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ান সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে আসবেন। সেই সঙ্গে এখানে যেসব সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ এই কারখানা গুলিতে কাজ করছেন তাঁদের কাছে ভারতীয় কর্মীরা তো ট্রেনিং পাচ্ছেনই। কাজের সময়ের পরেও বিভিন্ন শিল্পে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা টেকনিক্যাল শিক্ষাদান করে থাকেন।

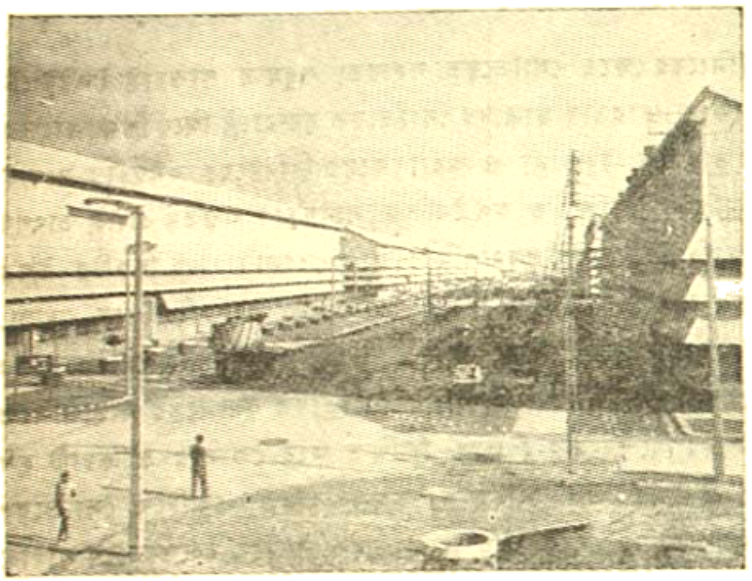

দুর্গাপুর প্রকল্পের একটি দৃশ্য

রানীগুরের কারখানার জন্যেও এ পর্যন্ত ১৩৬ জন ভারতীয় ইন্‌জিনিয়ার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। আরও ২১০ জন ইন্‌জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ান সেখানে ট্রেনিং নিতে যাবেন। সেই সঙ্গে ভারতে এসে এই কারখানায় ভারতীয় ইন্‌জিনিয়ারদের টার্বাইন, জেনারেটর ও বৈদ্যুতিক মটর ডিজাইন করার কাজে ট্রেনিং দেবার জন্যে একদল সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ এসেছেন। এই কারখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল স্কুলে তাঁরা ভারতীয় কর্মীবাহিনীকে যাবতীয় ট্রেনিং দিচ্ছেন। ভারতীয় কারিগরী গড়ে তোলার ব্যাপারে সোভিয়েতের প্রধান লক্ষ্য হল—যাতে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় প্রযুক্তিবিদরা পুরোপুরি তাঁদের প্রকল্পের দায়িত্ব নিতে পারেন।

শ্রমশিল্প ও ভারী ইন্‌জিনিয়ারিংয়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী টি. এন. সিংহ বলেছেন, "আমাদের তরুণদের নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা ও দক্ষতা আয়ত্ত করার জন্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, আমরা তার উচ্চ মূল্য দিই। ট্রেনিং শেষে ভারতীয় ইন্‌জিনিয়াররা খুব যোগ্যতার সঙ্গে যন্ত্রপাতির সঙ্গে তাঁদের দায়িত্বভার পালন করছেন। এর কারণ—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তাঁরা খুব উঁচুদরের শিক্ষালাভ করে এসেছেন।"

বিশ্ব-উৎসব

॥ সচিত্র সংযোজন ॥

জাপানের চা-পান-উৎসব

শীতের উৎসবে

বিশ্বউৎসব ঃ

জার্মা

বিশ্বউৎসব ঃ

জাপান

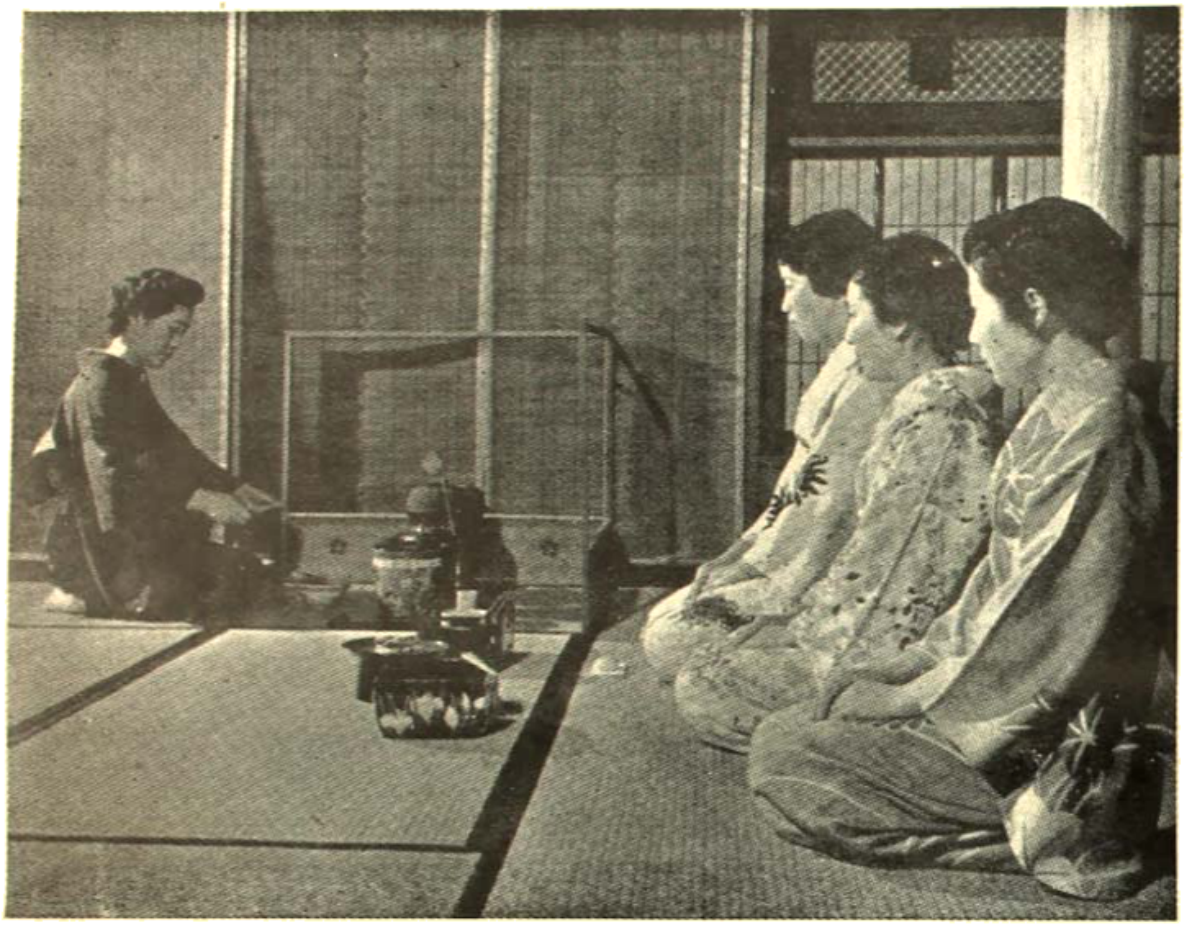

'চা-পানে-উৎসব'

বিখ্যাত পুষ্প উৎসব

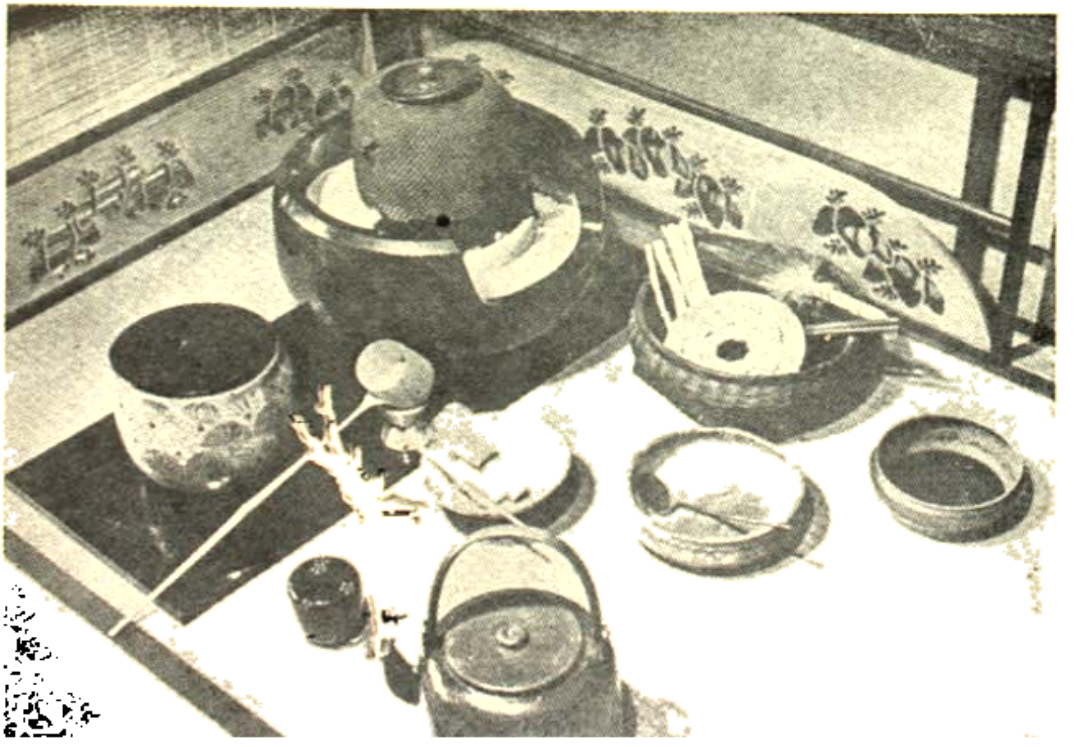

বিশ্ব-বাতায়ন

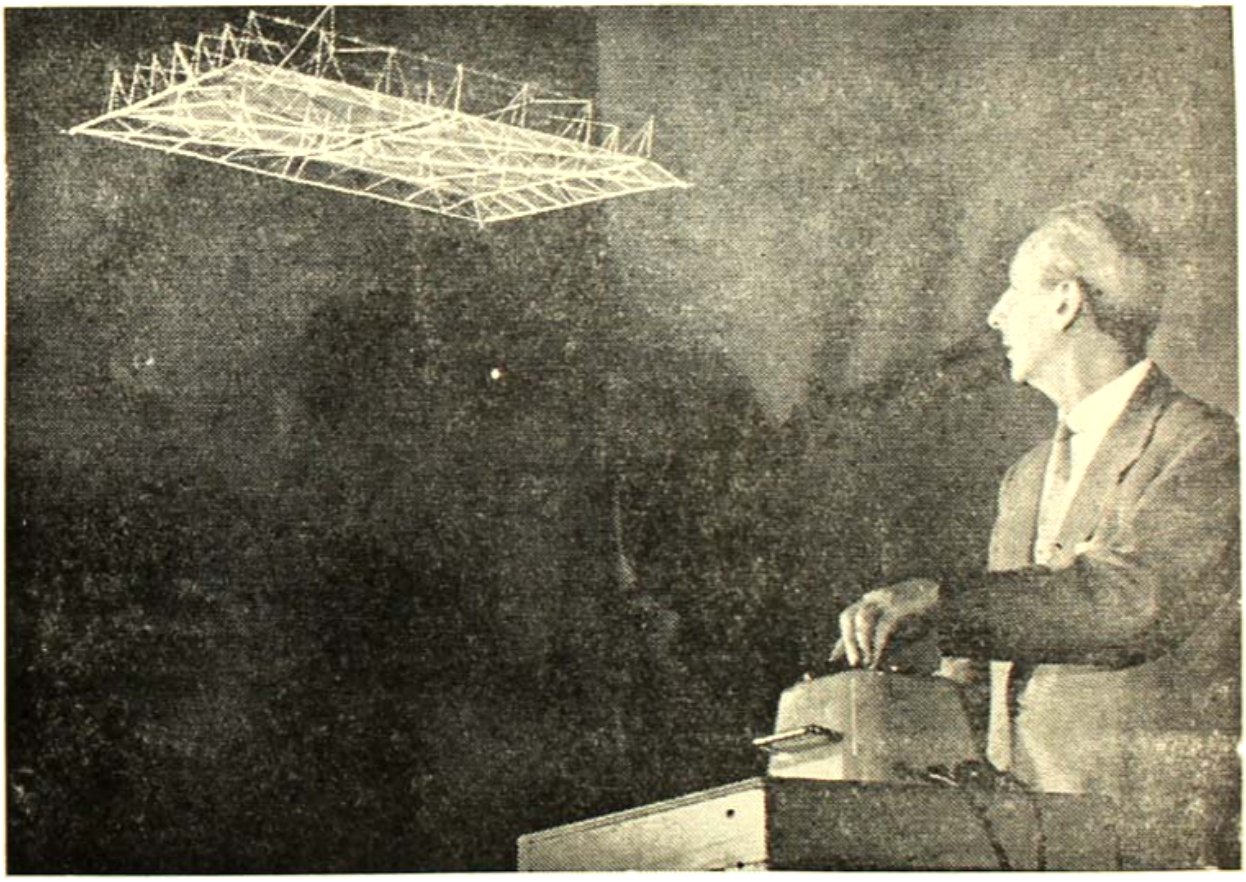

শূন্যমার্গে আণবিক শক্তি চালিত জাহাজের মডেল। আমেরিকার মেজর সেভেস্কি এই যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছেন

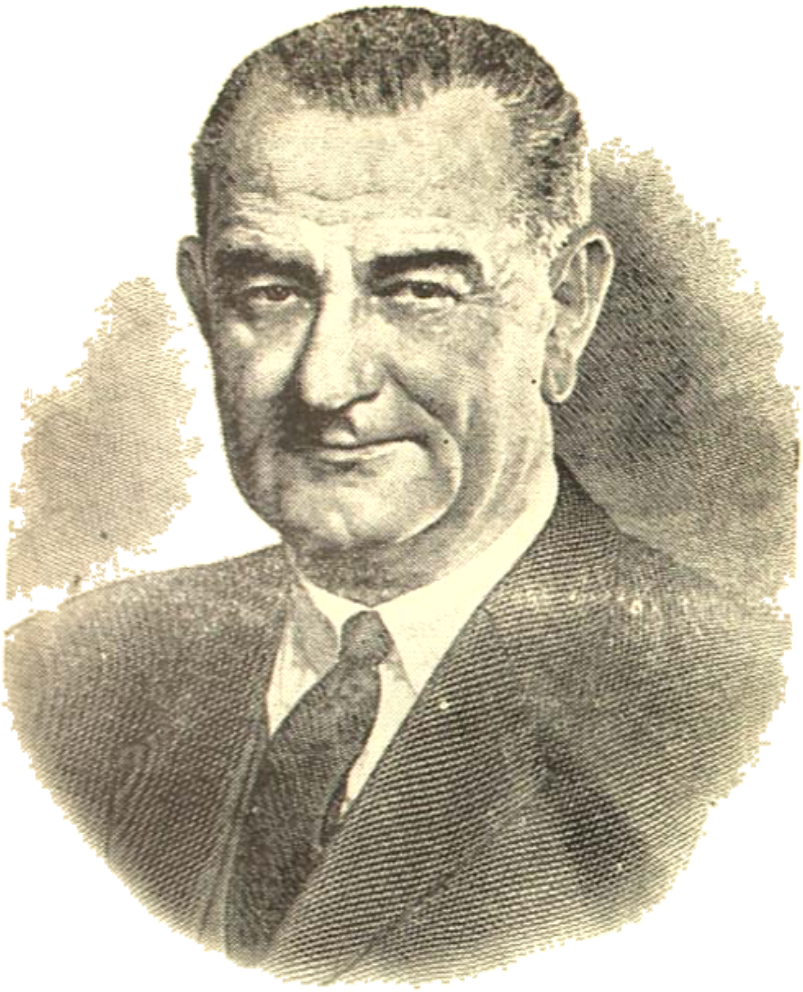

প্রেসিডেন্ট জনসন

বিজয়োৎসবে প্রেসিডেন্ট জনসন
ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হুবার্ট হাম্ফ্রে

(১৯৭৫) জার্মানীর বিখ্যাত রাইন নদীর তীরে জেনারেল আইসেনহাওয়ার ও চার্চিল

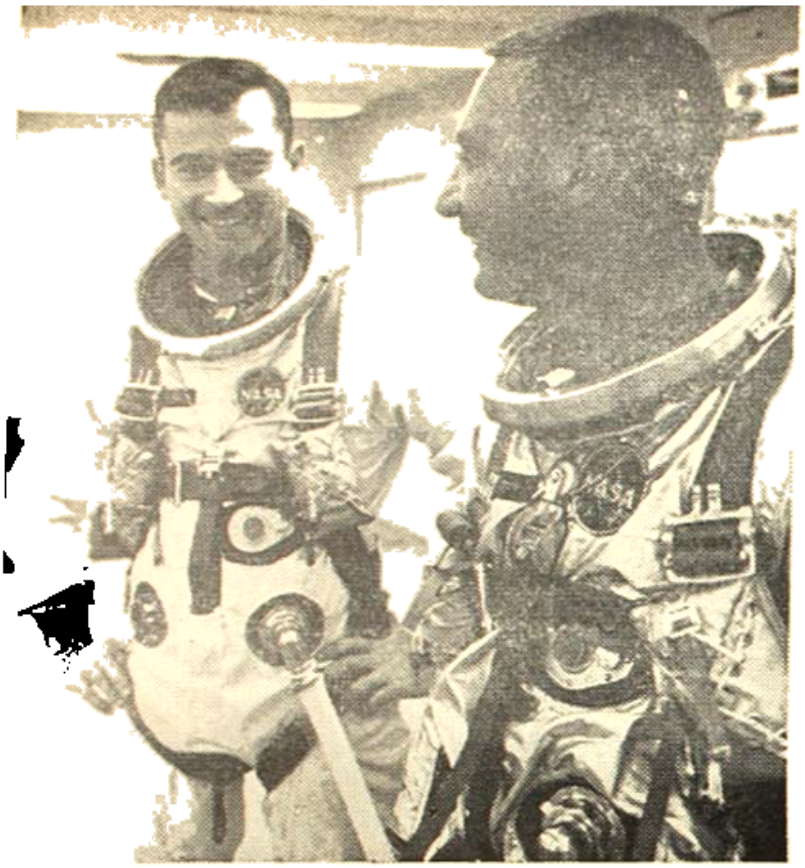

জেমিনি মহাকাশ যানের দুজন যাত্রী। জন ইয়ং ও ভার্জিল গ্রিসম্। জেমিনি মহাকাশ অভিযানে এরাই প্রথম অংশ গ্রহণ করছেন।

বিশ্বের বিস্ময়!
টেলিভিসন ও মাইক্রোস্কোপ অস্ত্রের প্রস্তুত সমাবেশে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ। আমেরিকার নিউ জার্সি ল্যাবরেটরিতে এই যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে

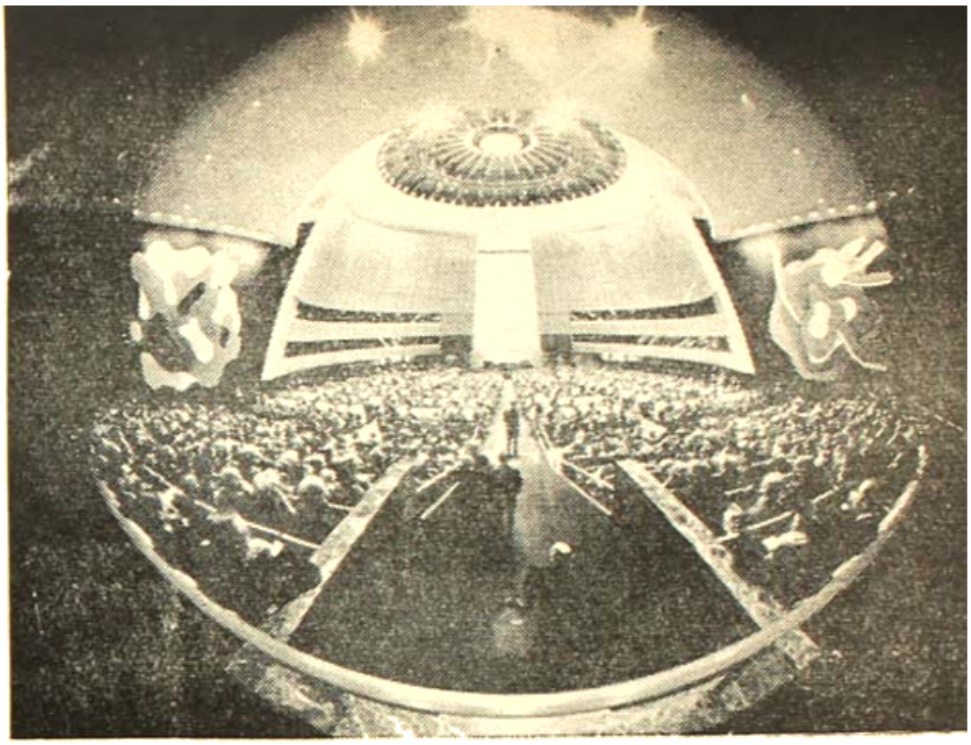

মহাকাশ যাত্রার পূর্বে
জেমিনি মহাকাশযান।
এই জেমিনিতেই দুজন
মানুষকে চন্দ্রলোকে
পাঠান হবে।

সোভিয়েত ব্যালেরিনা কিরোভের আসন্ন ক্রীড়াউৎসবের প্রস্তুতিতে বিখ্যাত ইয়ং পাইনিওয়ার্স দল।

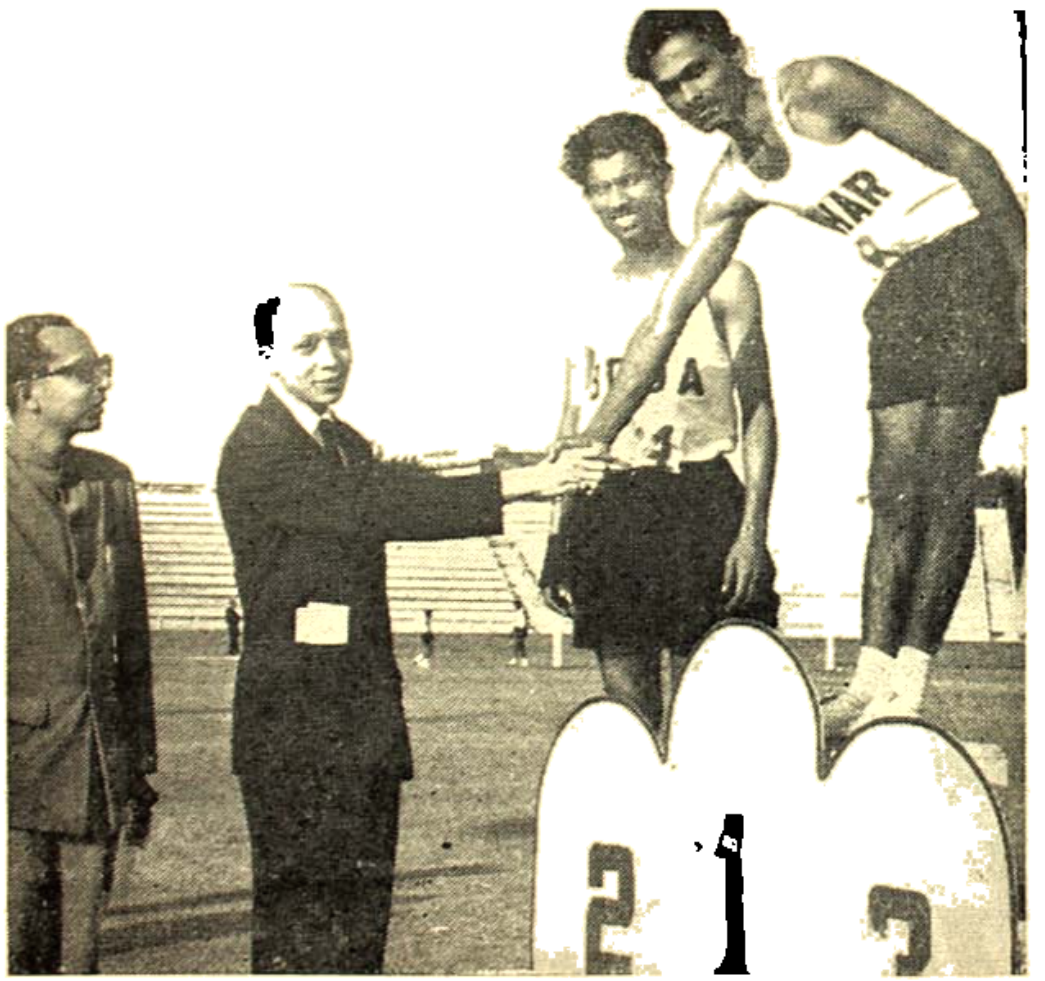

ঢাকায় মুক্ত-কুস্তির লীগ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ভারতীয় দলের দুজন সদস্য।

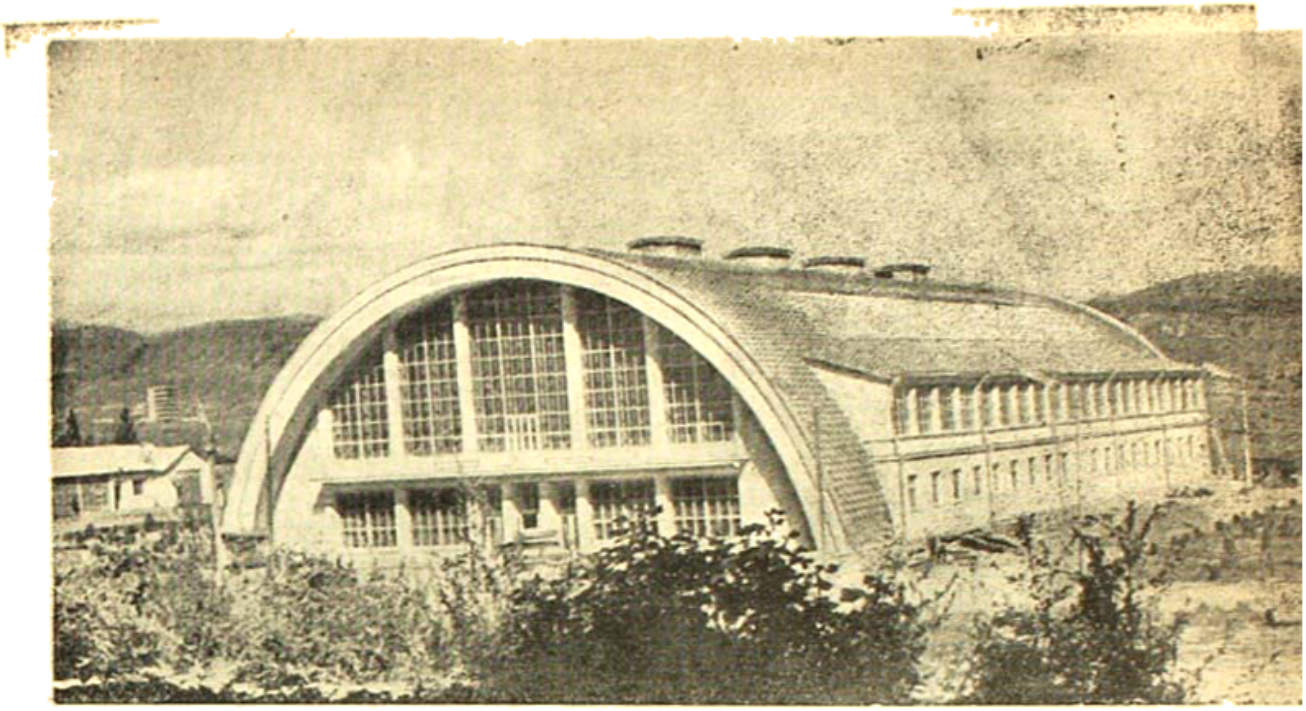

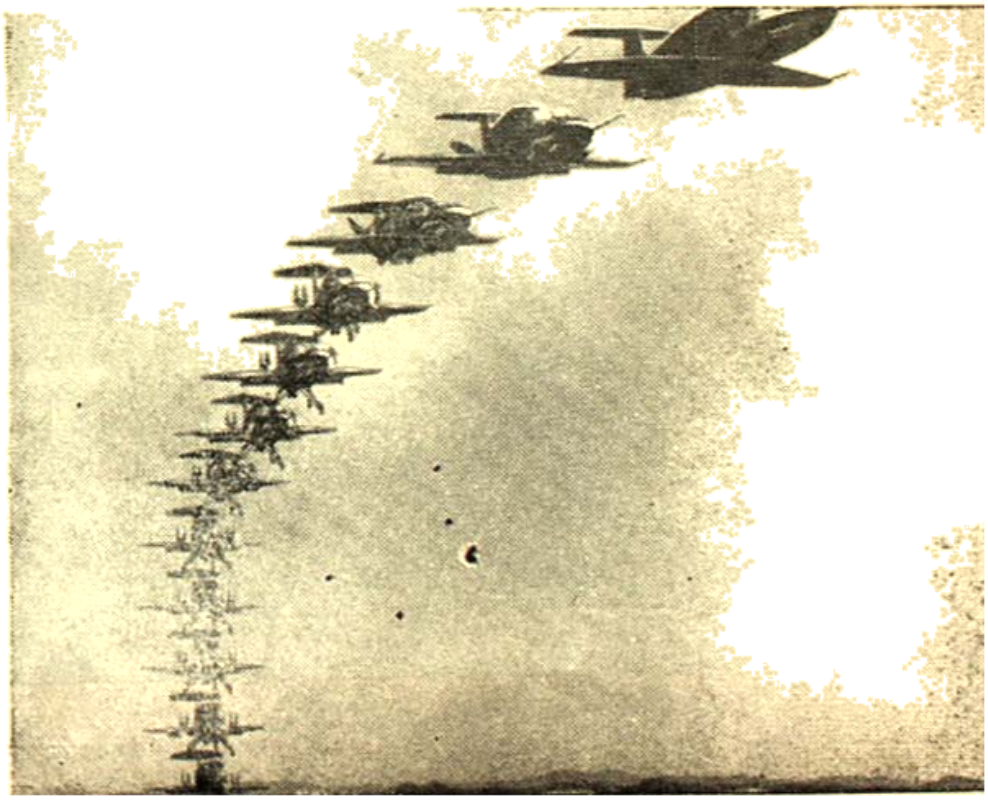

আমেরিকার নূতনধরণের বিমান। মাটি থেকে সোজা উপরে উঠতে পারে। এগুলির নাম XV—5A

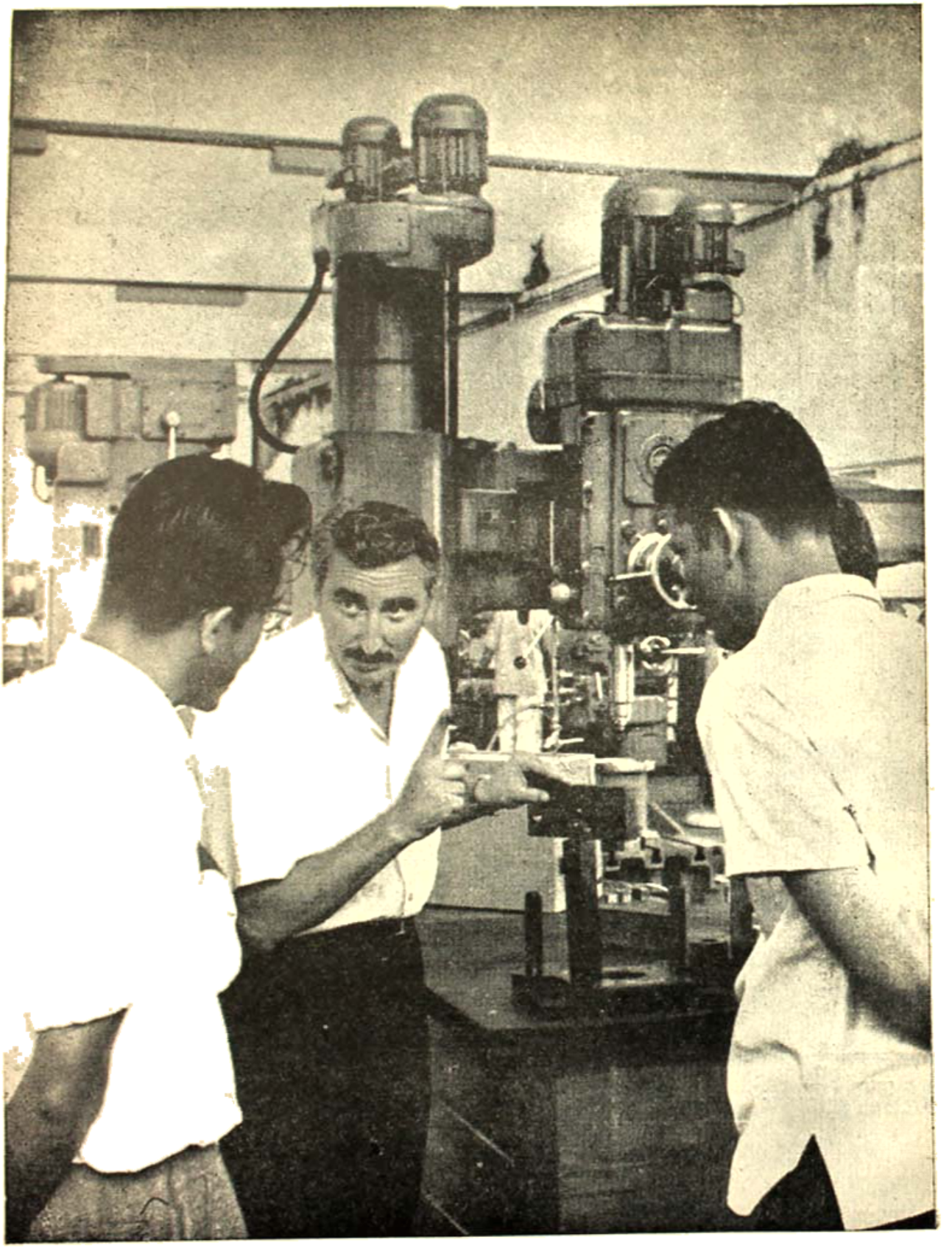

আধুনিক দাজসরঞ্জামে সজ্জিত বিখ্যাত পাওয়াই
ইনস্টিটিউটের মেশিনটুল লেবরেটরি।

শ্রমশিল্পায়নের পথে ভারতের বিরাট অগ্রগতির স্মরণীয় এক দশক

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতার দশম বার্ষিকী উদ্‌যাপনী ফোরামের উদ্বোধন :

সোভিয়েত ভারত সহযোগিতার বিরাট প্রেক্ষাপট এবং উহাকে বিরাটতর এবং আকারে আরও অগ্রসর করিয়া লইয়া চলার সম্ভাবনা, সোভিয়েত-ভারত অর্থ-নৈতিক সহযোগিতার দশম বার্ষিকী উদ্‌যাপনী ফোরামে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর মধ্য দিয়া উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

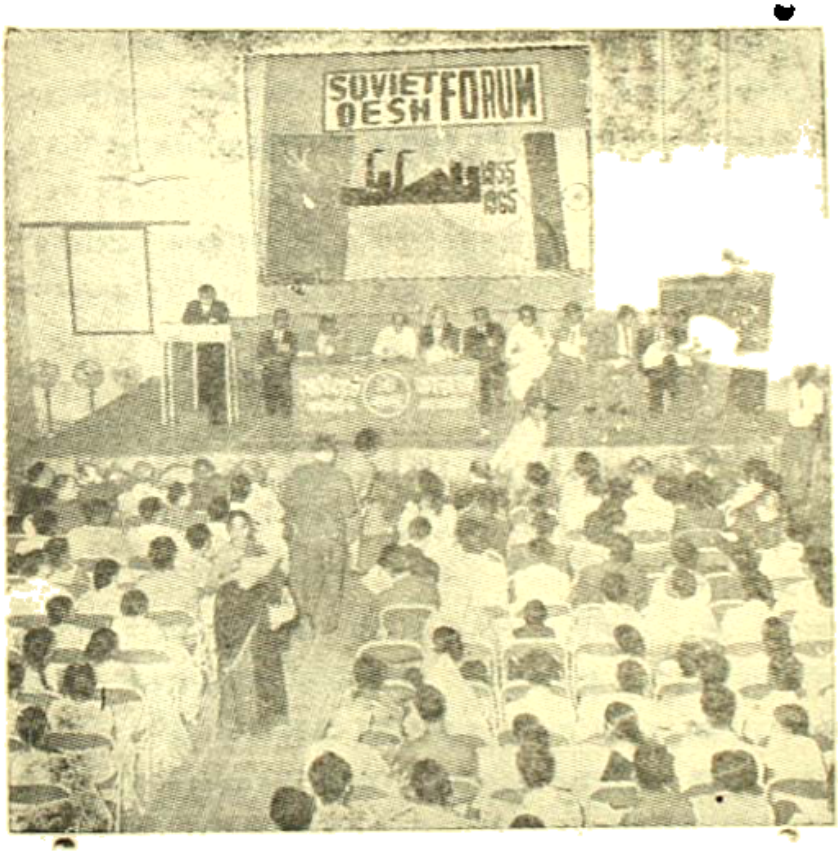

সোভিয়েত-দেশ ফোরামের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন সোভিয়েত কন্সাল জেনারেল শ্রী এন, আই ভোইনক।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ২৬শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করিয়া বলেন: "সারা ভারত জুড়িয়াই আজ আমরা ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর স্তম্ভগুলিকে দেখিতে পাই। শ্রমশিল্পায়নের লক্ষ্যের দিকে ভারতের অগ্রগতির পথে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলিকে উহারা চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে এবং আমাদের দুই দেশের মৈত্রী সহযোগিতার সুদৃঢ় ভিত্তিকেও উহারা চিহ্নিত করে।"

সোভিয়েত-ভারত মৈত্রীর মুখপত্র "সোভিয়েত-দেশ" পত্রিকার উদ্যোগে এই ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়।

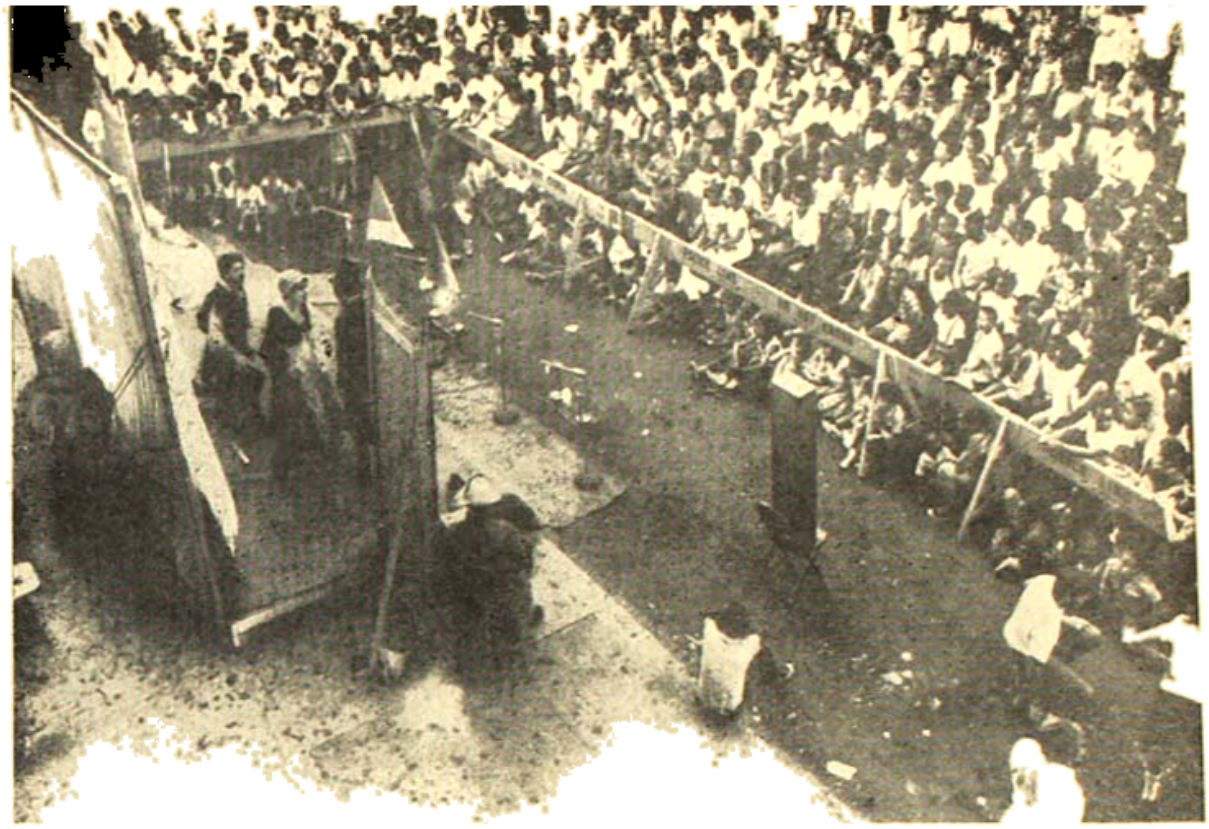

বিশ্ব-উৎসব

আমেরিকা

মেক্সিকোর উড়ন্ত মানুষ

'কাবুকী' নাট্যোৎসবে পুতুল নাচ

'কাবুকী' জাপানের বিখ্যাত নাট্যোৎসব

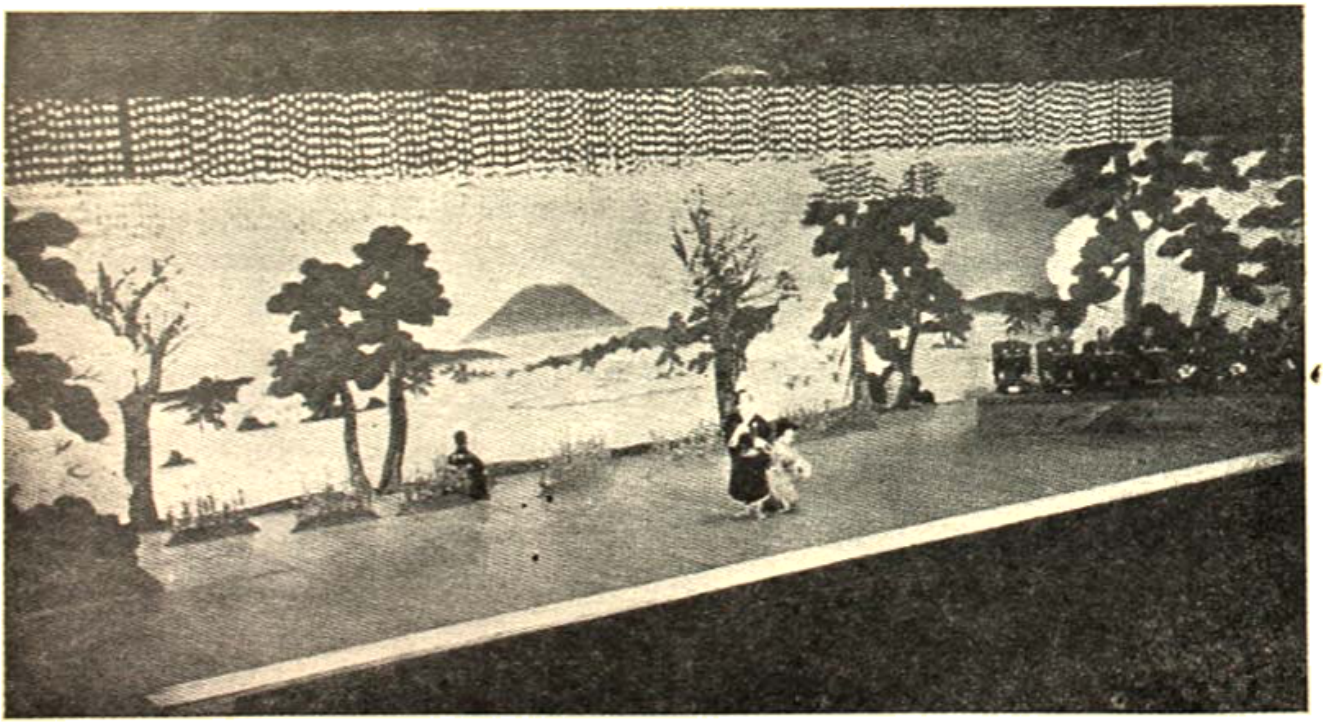

'কাবুকী' নৃত্যনাট্য উৎসব

বিশ্ব-বাতায়ন

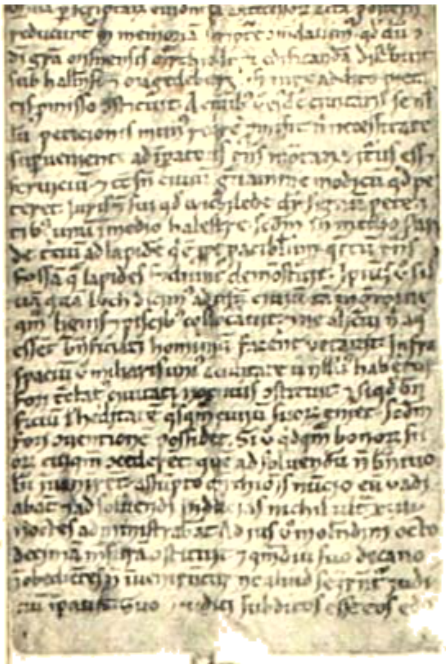

১১৬৫ সালের লাইপৎসিকের
ঐতিহাসিক দলিল

জার্মানির বিখ্যাত লাইপৎসিক মেলা

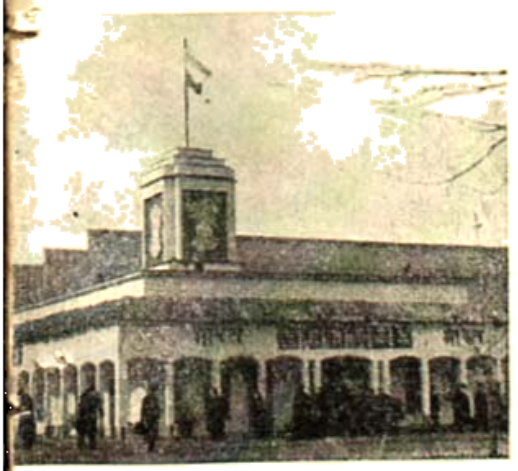

লাইপৎসিকে ভারতীয় দপ্তরের

জার্মানীর বিখ্যাত লাইপৎসিক :
অতিথিদের সুবিধার জন্যে এই ছাত্রীটি দোভাষীর কাজ করছেন।

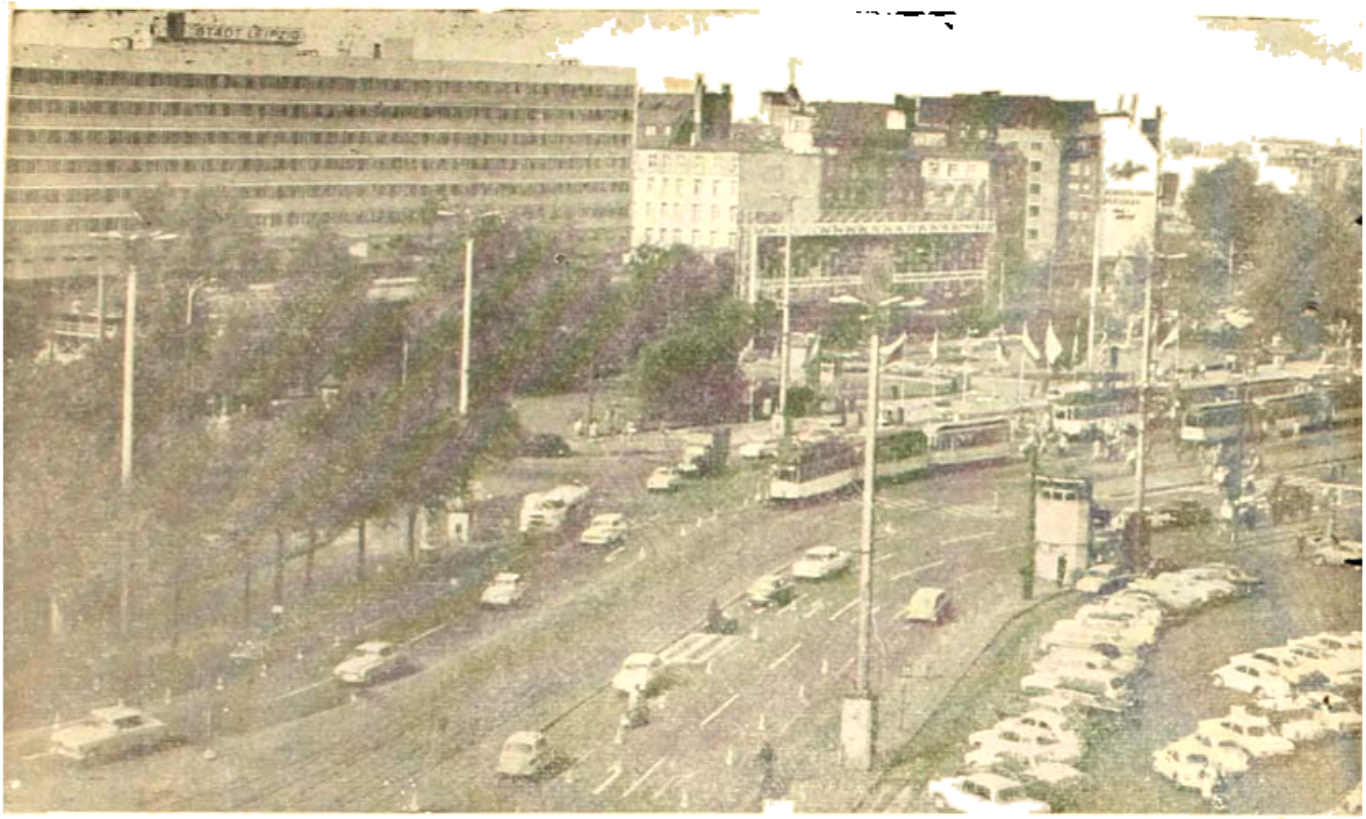

[illegible] একটি
বেসরকারি উপগ্রহ নির্মিত একটি নতুন
আন্তর্জাতিক।

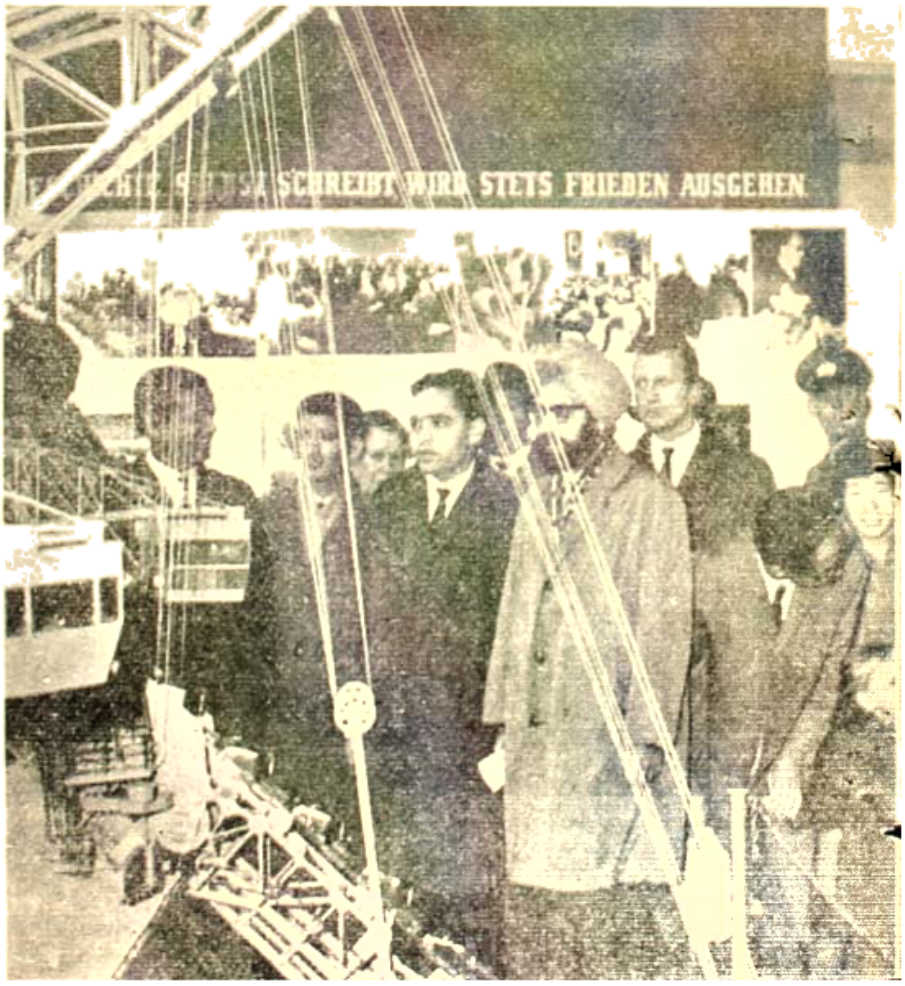

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের
পঞ্চাশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে
বার্লিনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে
কয়েকজন ভারতীয় দর্শক।

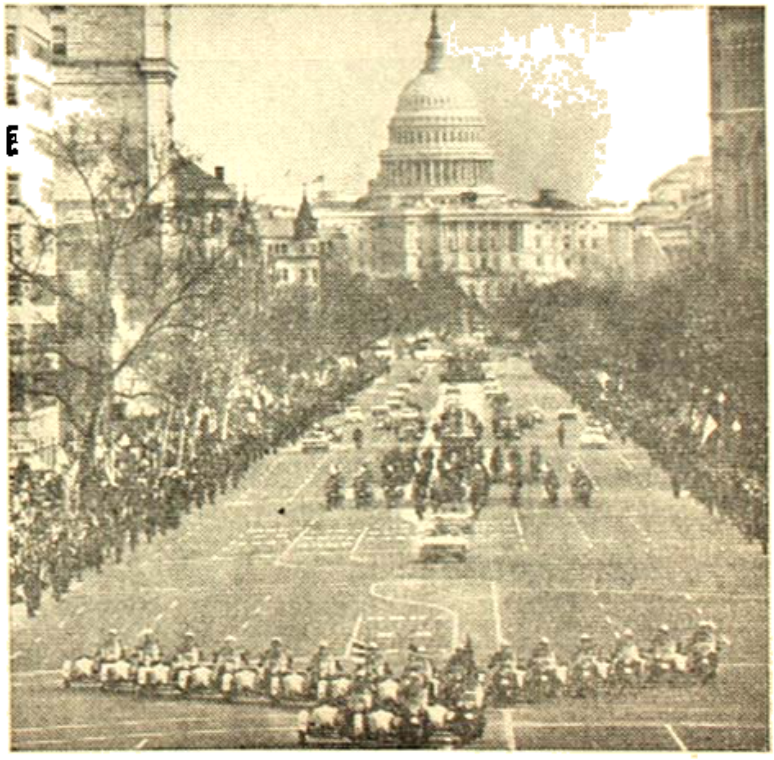

১৯৬৫ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসনের শপথ গ্রহণ উপলক্ষে হোয়াইট হাউস অভিমুখে বিরাট ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা।

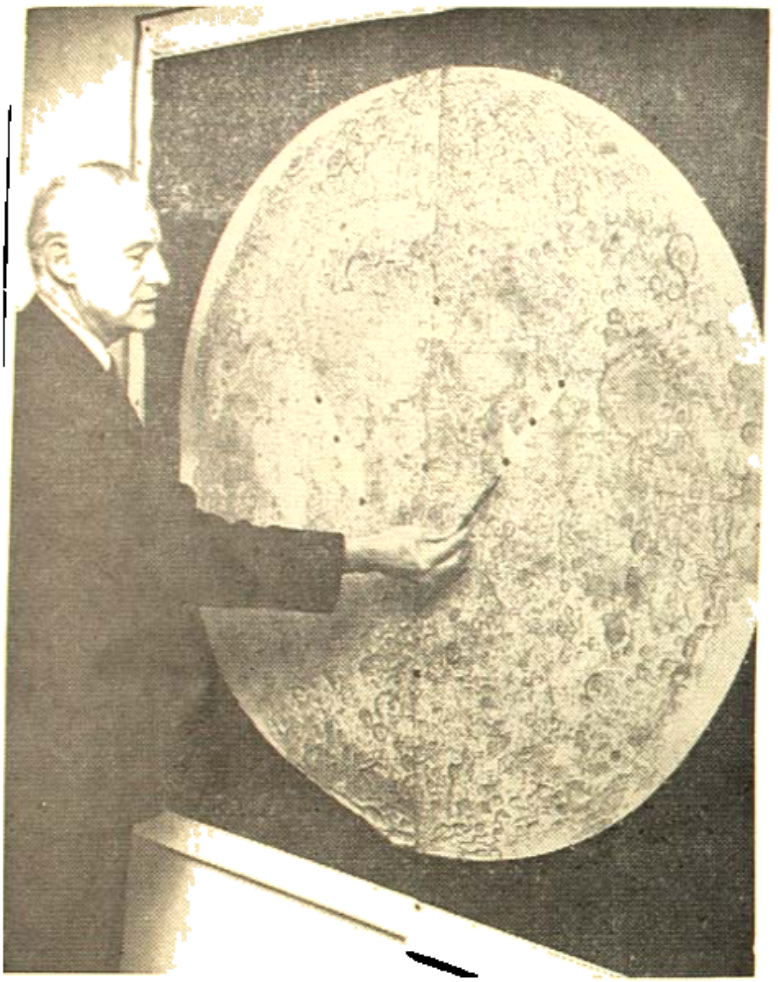

রেঞ্জার-প্রেরিত
চন্দ্রলোকের চিত্র

পূর্ব্ব পরিকল্পিত অকাশে চন্দ্রলোকের শান্তি সাগরে পড়ে ধ্বংস হবার পূর্ব্বে শেষ ২৩ মিনিটে ৮ নং রেঞ্জার তার ৬টি ক্যামেরার সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের ৭ হাজারের অধিক আলোকচিত্র গ্রহণ করে পৃথিবীতে পাঠায়।

ডানদিকের ছবিটিতে চন্দ্রলোকের ঠিক কোন জায়গাতে ৮নং রেঞ্জার উপগ্রহটি অবতরণ করবে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছেন এলবার্ট এল নোইকি। ইনিই চন্দ্রপৃষ্ঠের মানচিত্র রচনা করেছেন।

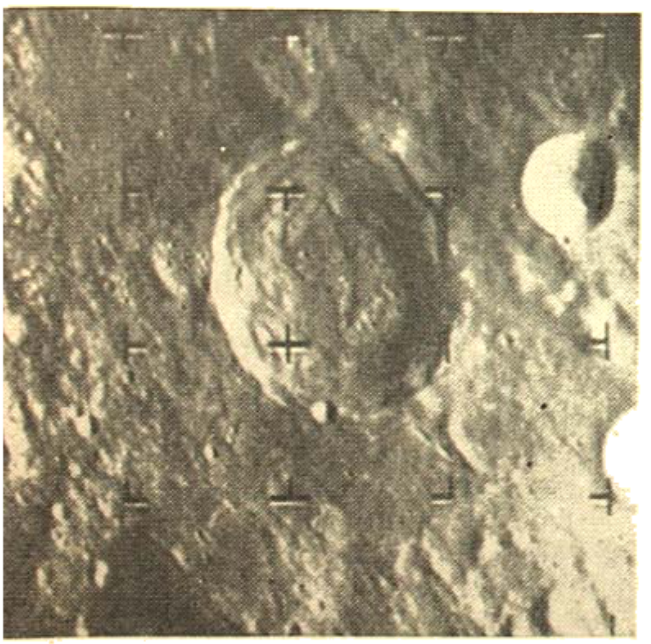

চন্দ্রপৃষ্ঠে পতিত হবার ৭ মিনিট পূর্ব্বে ৪৭০ মাইল দূর থেকে তোলা হয়েছে।

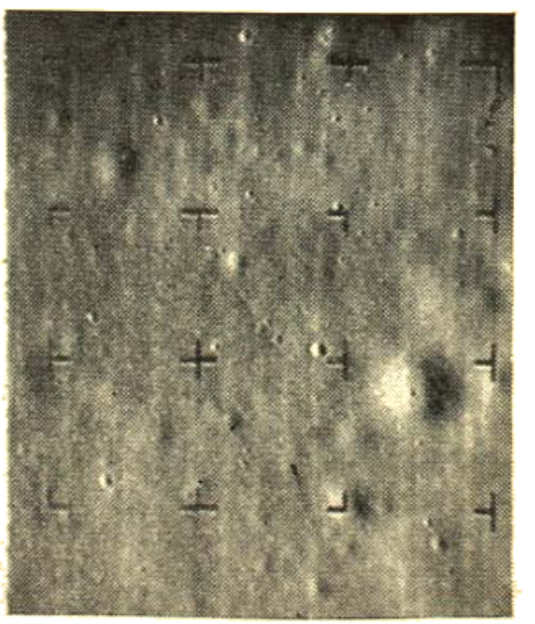

ধ্বংস হয়ে যাবার ঠিক পূর্ব্বে। এখানিই শেষ চিত্র।

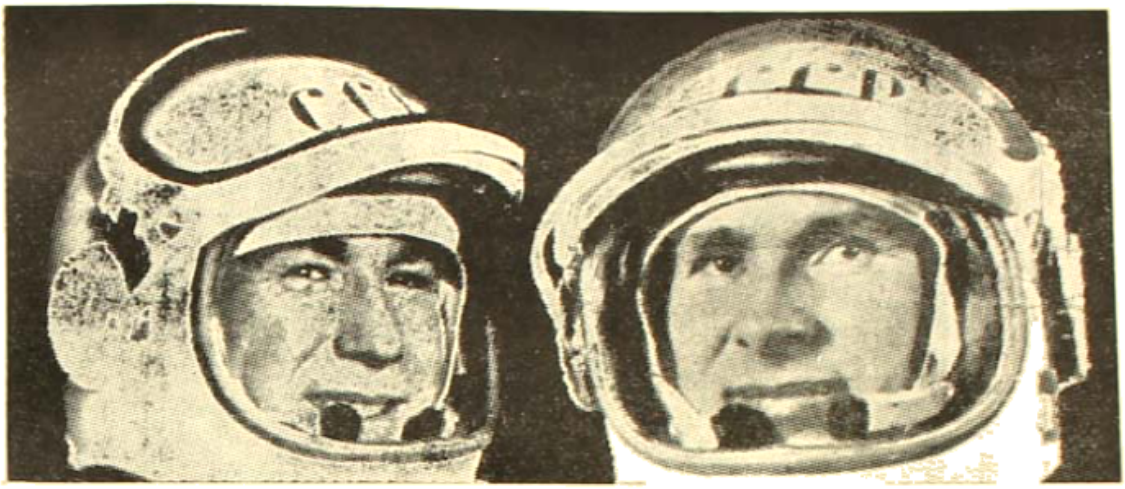

মহাশূন্যদেশে ভ্রাম্যমান প্রথম দুইজন মানুষ। আলেক্সি লিওনভ ও পাভেল বেলিয়াভেভ।

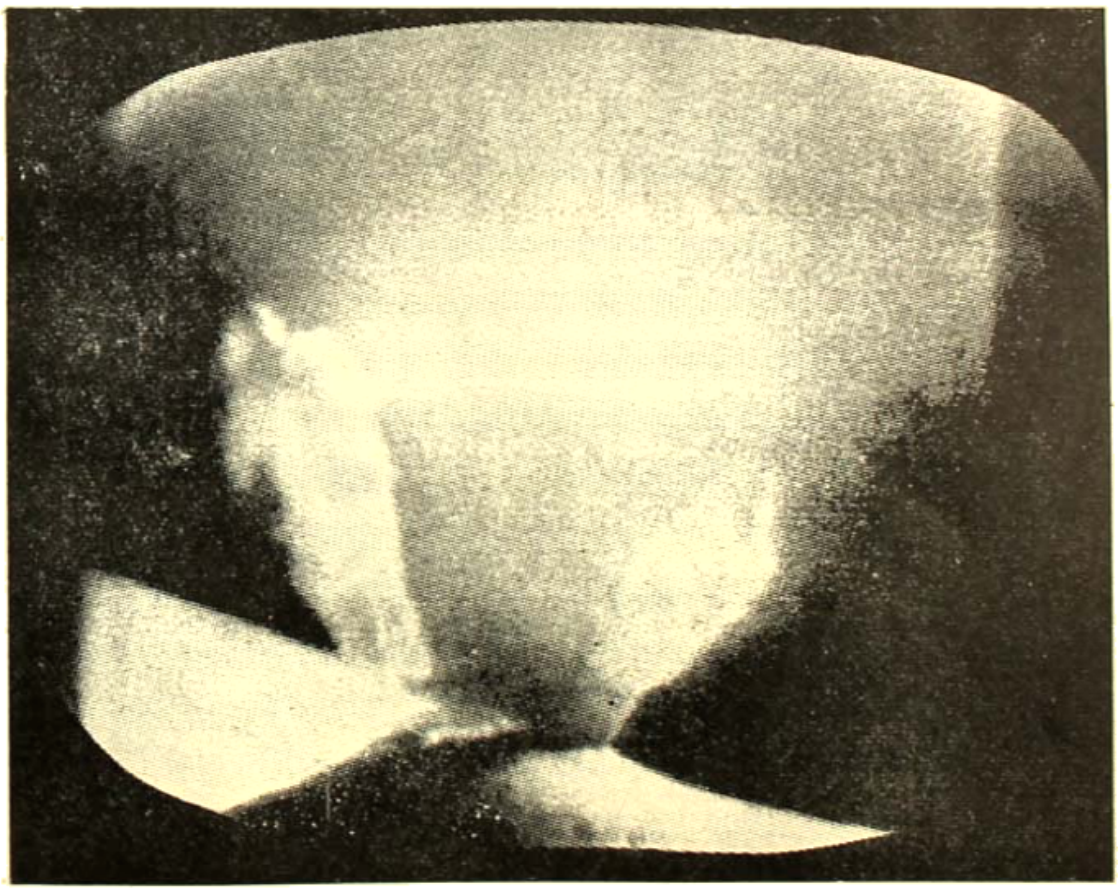

টেলিভিশনে গৃহীত মহাশূন্যে বিচরণকারী সোভিয়েতের লিওনভের আলোকচিত্র।

শিশু সন্তান সহ
মহাকাশচারিণী ভালেন্তিনা
নিকোলায়েভা তেরেশকোভা

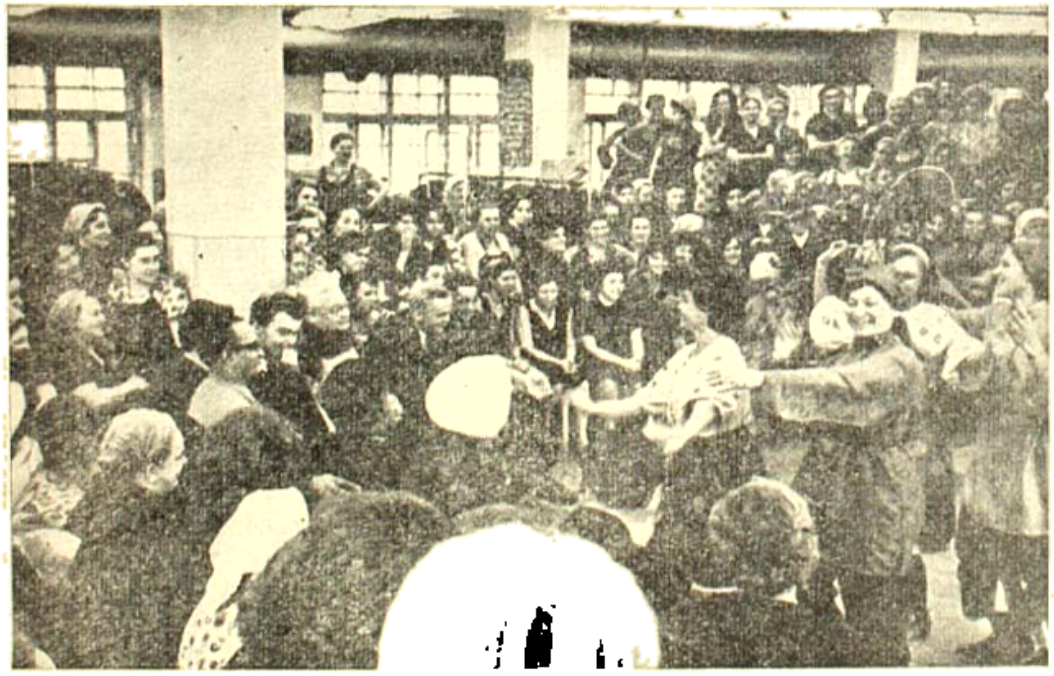

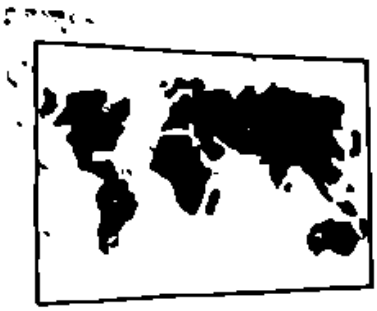

বিশ্ব-বাতায়ন

আমেরিকায় বিদেশী-ছাত্র দিবস

মহাশূন্যে ভ্রমণকারী আমেরিকার র‍্যাসেল স্যাঁর ২৯তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করছেন।

আমেরিকার প্রখ্যাতনাম্নী বৈজ্ঞানিক ডক্টর এলেন ক্লোনিশ ওয়েভার। ইনি সম্প্রতি আণবিক গবেষণা পরিষদ থেকে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছেন।

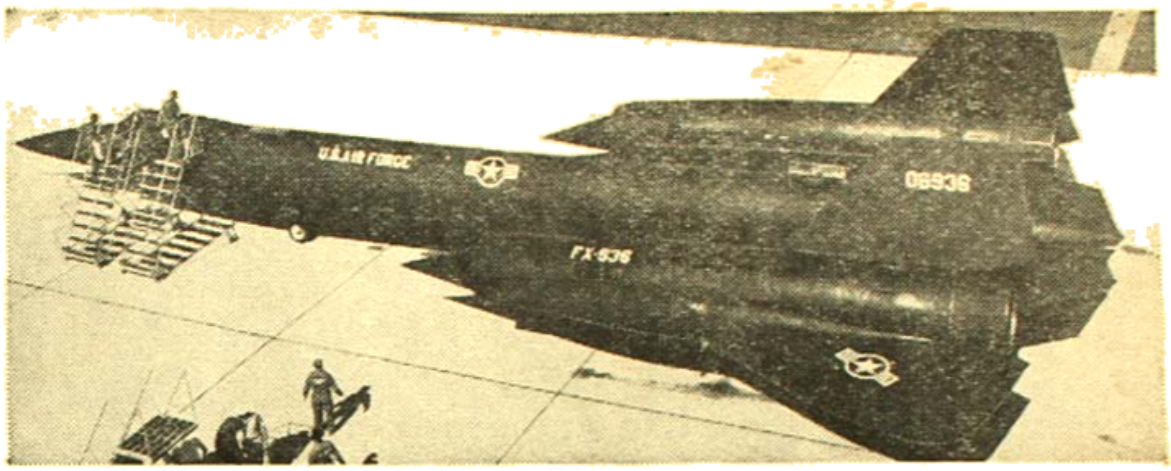

সুপার ইন্টারসেপ্টার আমেরিকার নতুন ওয়াই, এক : ২৫ একটি যুদ্ধবিমান।

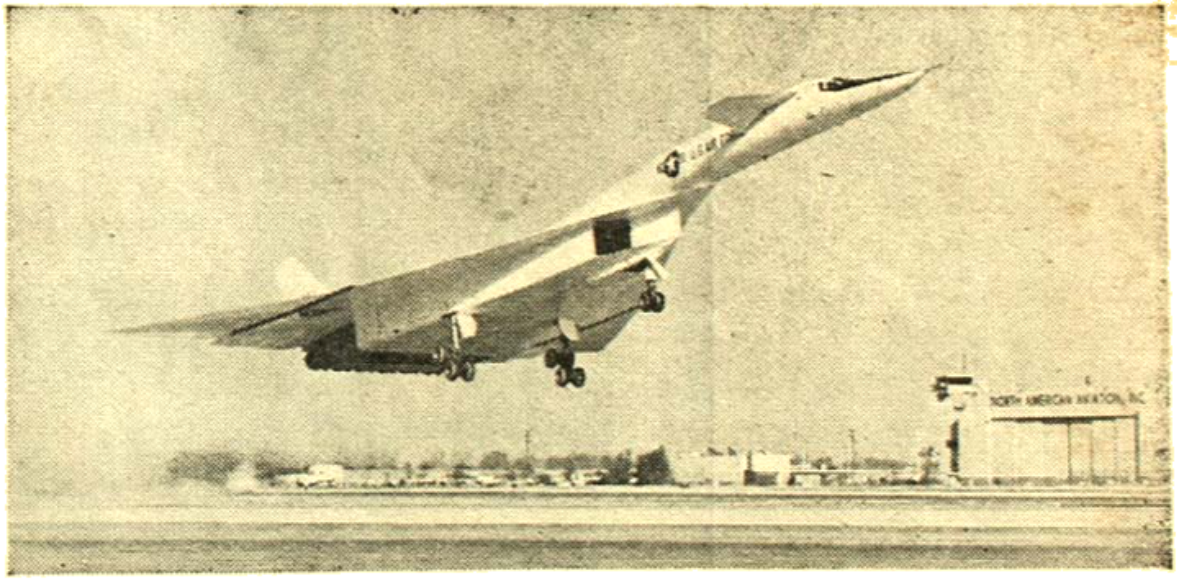

বি-৭০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর একটি সুপারসোনিক বোমারু বিমান। জেট ইঞ্জিনযুক্ত ছয় ডানার এই বিমানটি ঘণ্টায় ২০০০ মাইল বেগে চলে

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে বক্তৃতা দানের পর বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী রবিশঙ্কর মার্কিন ছাত্রের সঙ্গে আলোচনারত

মার্কিন নৌ বাহিনীর একটি বিস্ময়কর যন্ত্র। সমুদ্রের গভীরে ৩৫,৮০০ ফুট পর্যন্ত এর গতি। সমুদ্রের তলদেশের সন্ধেষণার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

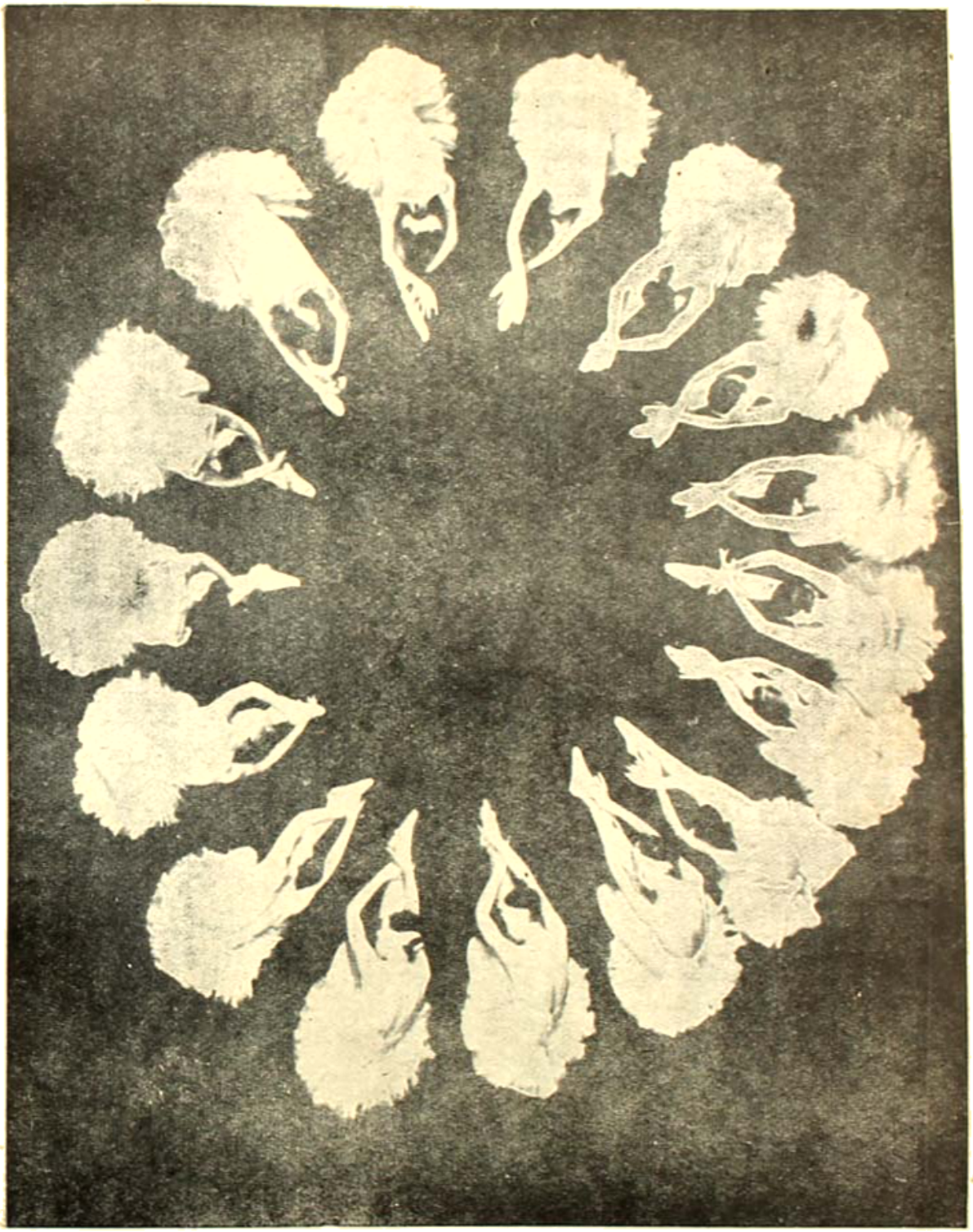

রাশিয়ার বিখ্যাত বালে।

বাঘের বিখ্যাত সেলিমগ্রাম মিউজিয়াম।

াশিয়া

উৎসবের দিনে
মাভিয়েত রা
শিখর।

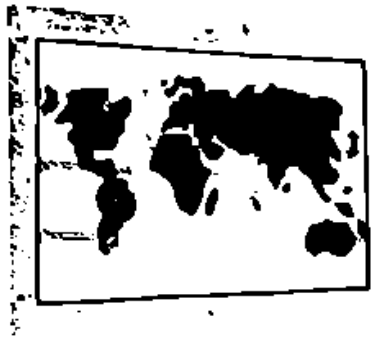

বিশ্ব-বাতায়ন

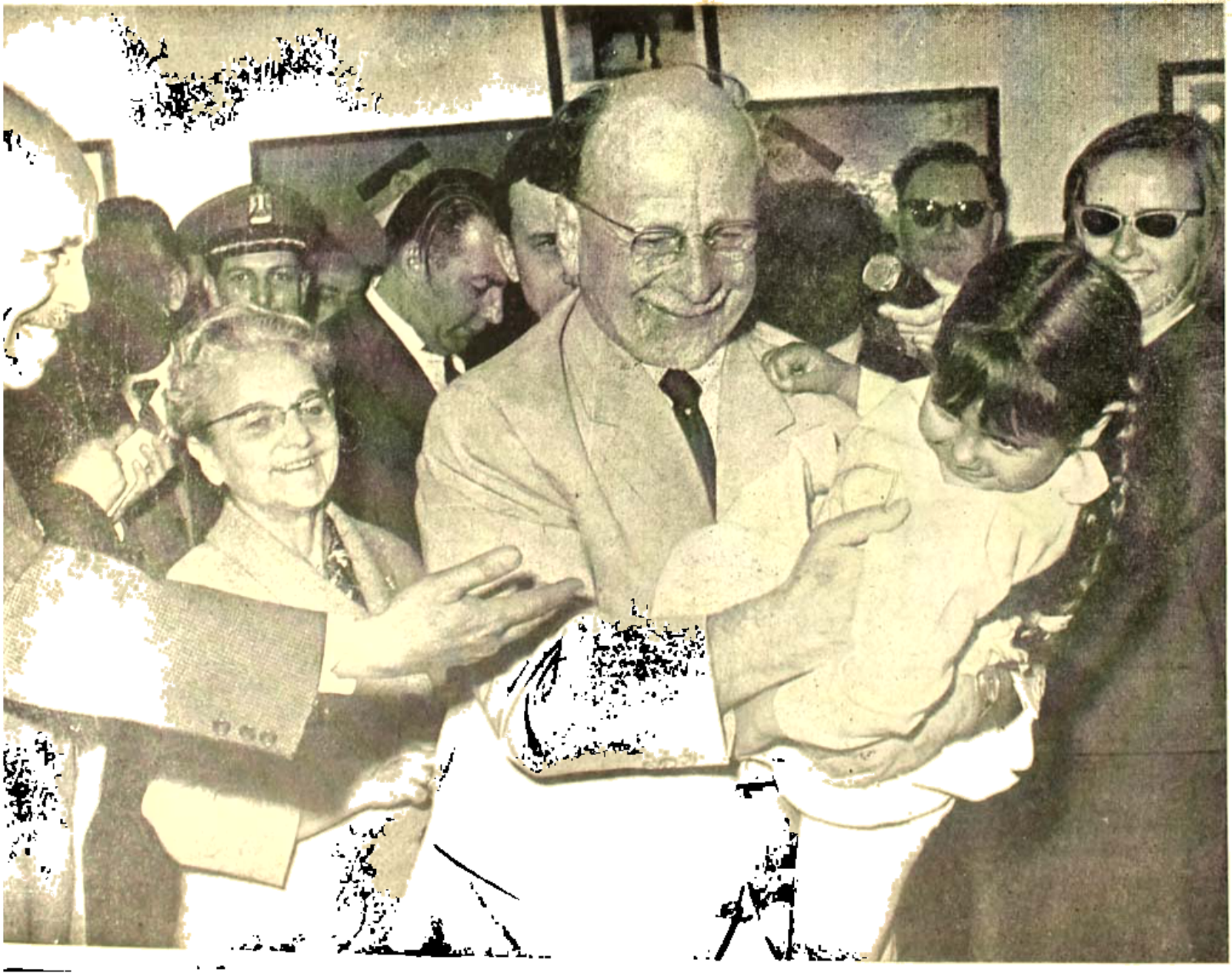

সংযুক্ত আরব
প্রজাতন্ত্র সফ
জার্মান রাষ্ট্রপ
ভাল্টের উল

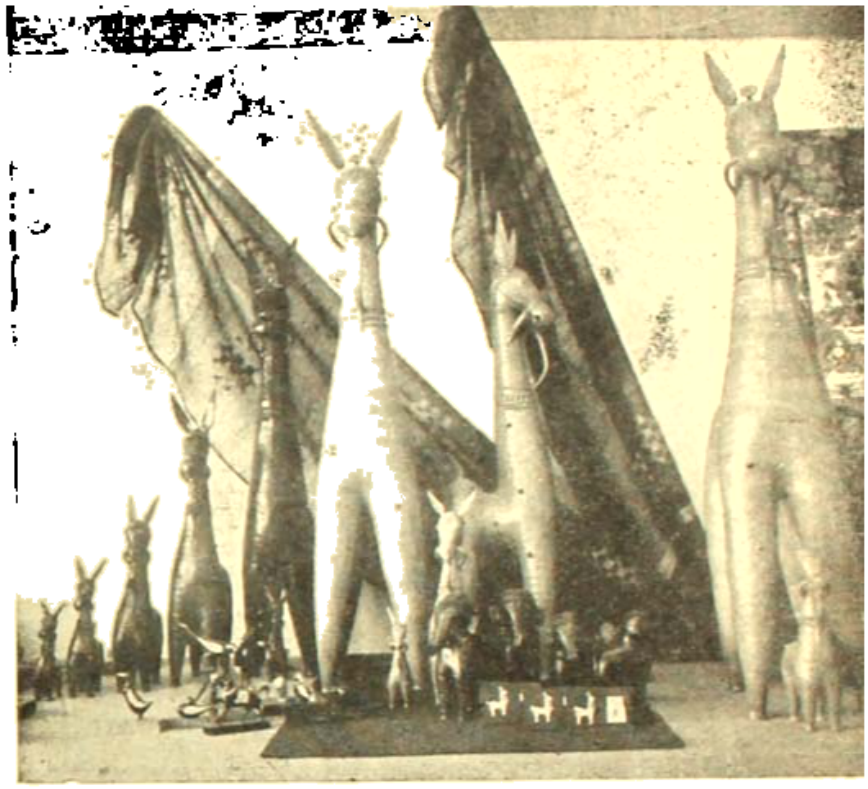

জার্মানির লাইপজিগ মেলায় প্রদর্শনের জন্যে ভারতীয় ভাস্কর্যের একটি নমুনা

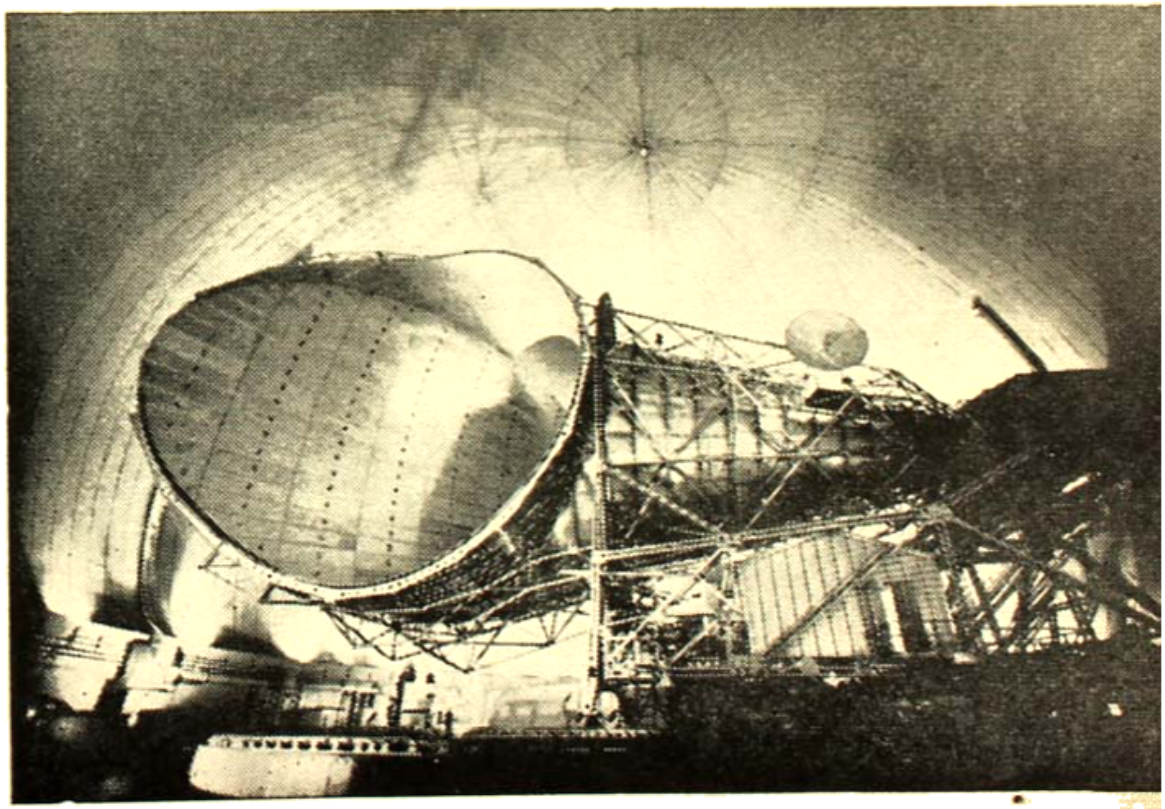

ছবি: ঘরে ঘরে আজ ভাতের উৎসব

সোভিয়েত রাশিয়া

সোভিয়েতের বিখ্যাত ব্যালে নর্ত কী মালিকা সবিরে

সোভিয়েত রাশিয়া বেগারেতে নববধূকে অভিনব উপহার প্রদান

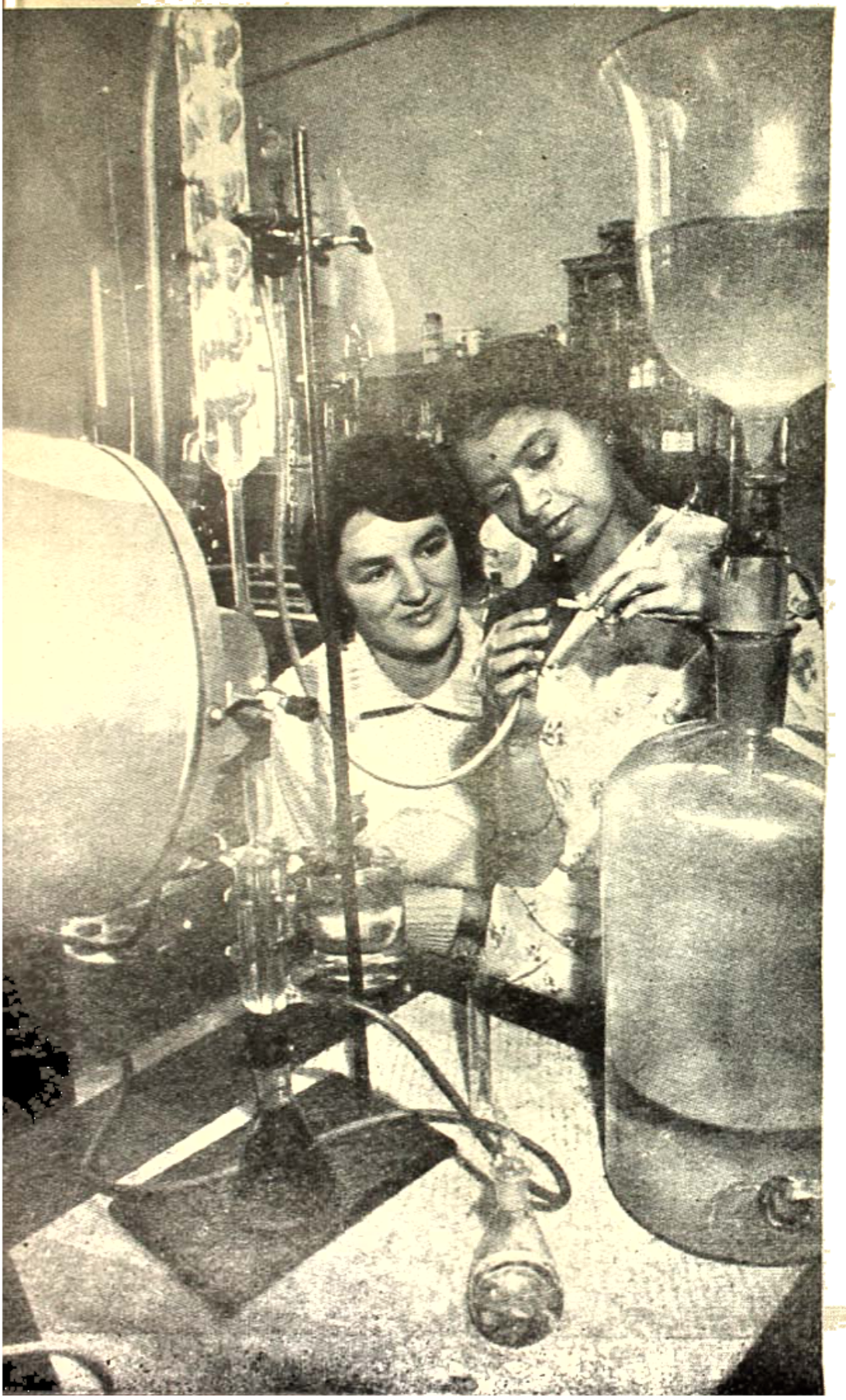

ব. শ্রীনিবাস বিশ্বাস
[illegible] মৈত্রী
বৈজ্ঞানিকদের
গবেষণাগারে
সোভিয়েত ও ভারতীয়
বিজ্ঞান কর্মীরা।

চরিত্রই জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শুধু ব্যক্তির নয়,—জাতির চরিত্র গঠনে রামানন্দবাবু নিজের জীবনের পরিধিকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করলেন। কলেজের অধ্যাপক এবং অবসর জীবনে দেশের চরিত্র গঠনের প্রথম সোপানের কাজ অনেকদিন ধরেই তিনি করে আসছিলেন। ঝাকুড়ায়

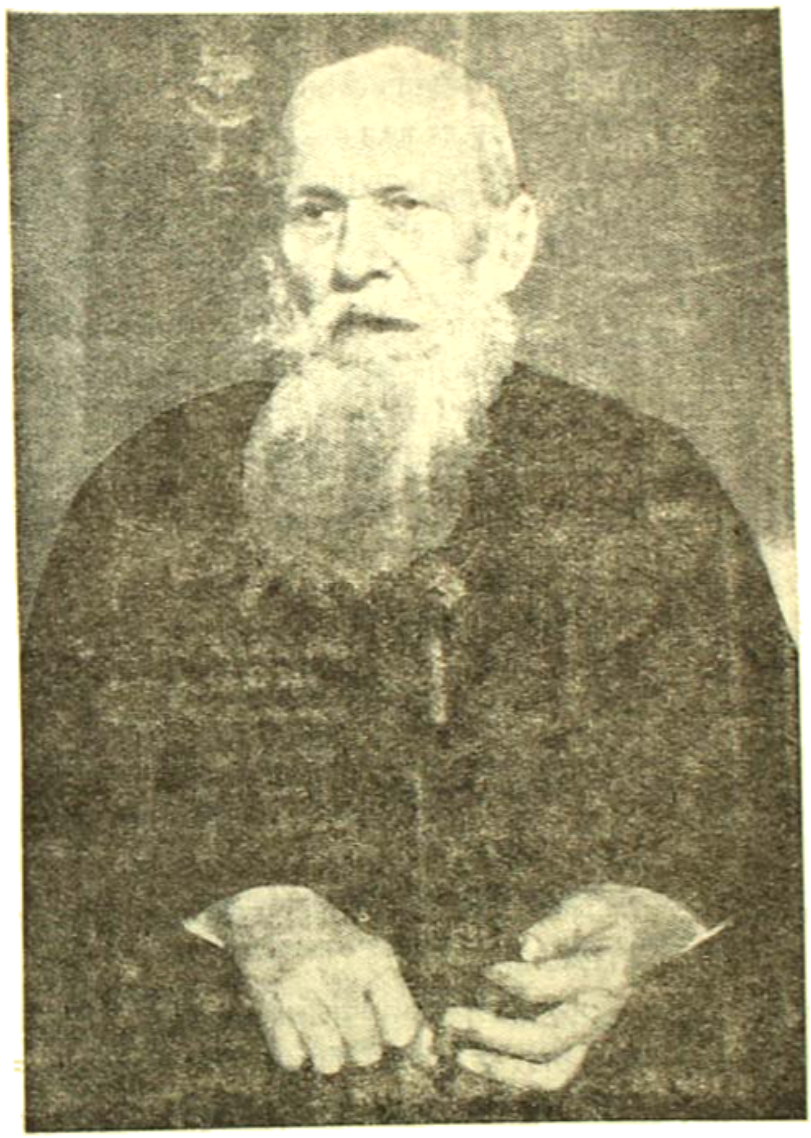

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে,—নিজের চেষ্টায় এবং আত্ম-প্রত্যয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সোপানে উঠেছেন সগৌরবে। বি-এ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করায় রামানন্দ State Scholarship পেলেন এবং বিলাতে পড়তে যাবার কথা উঠলো। পরিবারস্থ সকলেই খুশি। ভাইয়েদের ইচ্ছে তিনি অন্তত ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসুন!

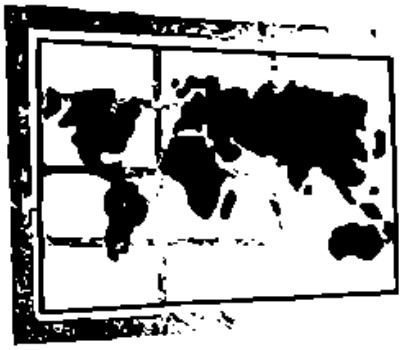

বিশ্ব-বাতায়ন

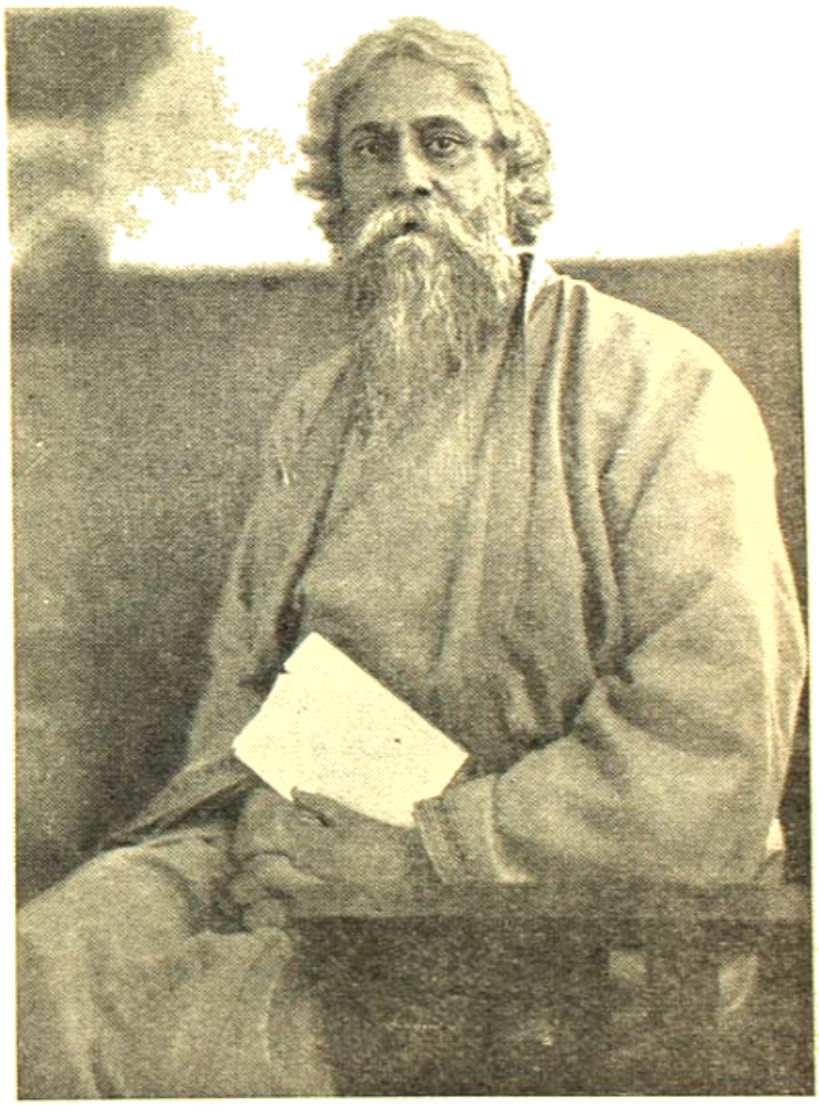

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ
(১৯১৬

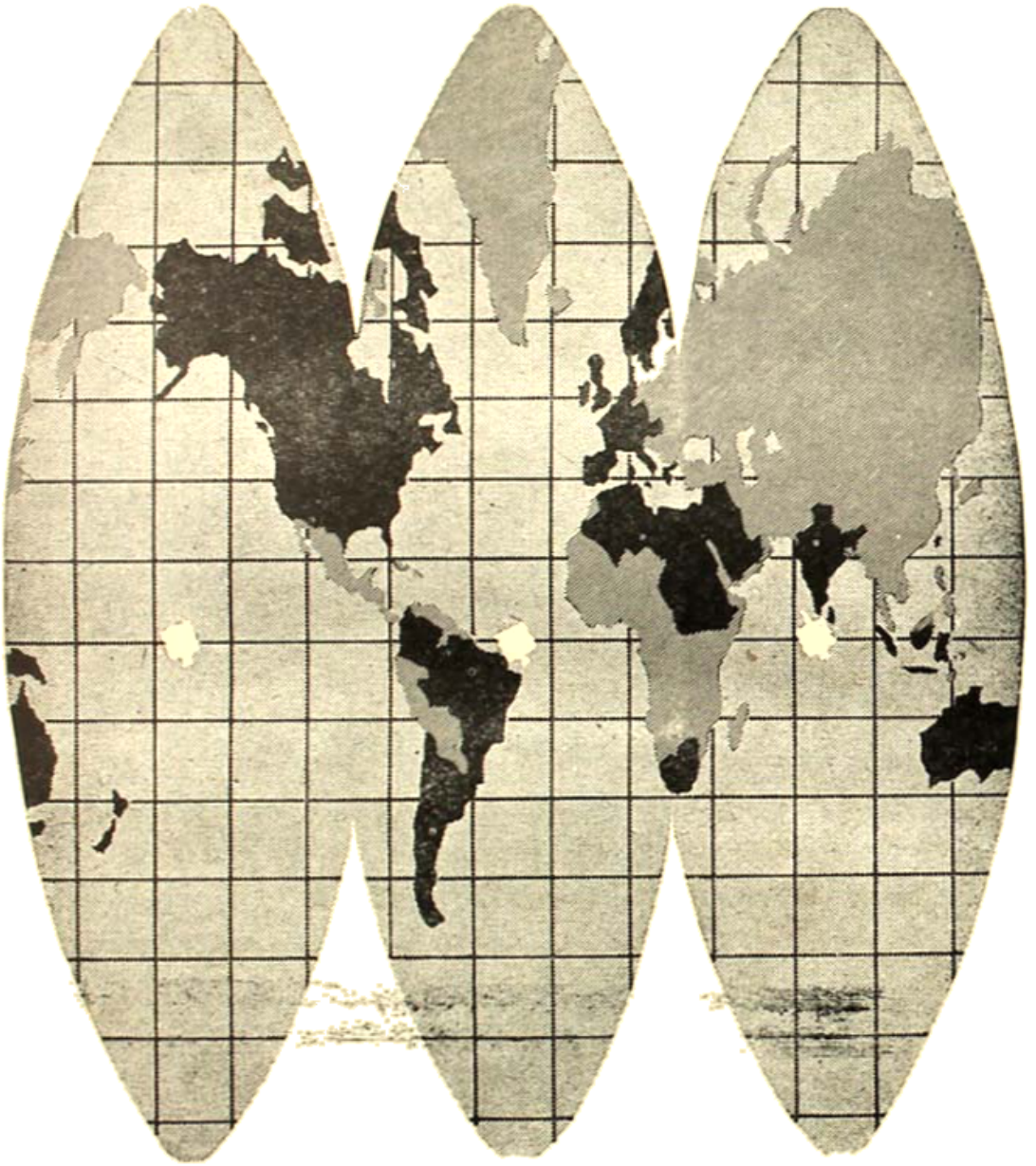

'আর্লিবার্ড' প্রেরণের উপগ্রহের সাহায্যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্যে ৩৫টি রাষ্ট্রের মানচিত্রে কালো অংশগুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে।

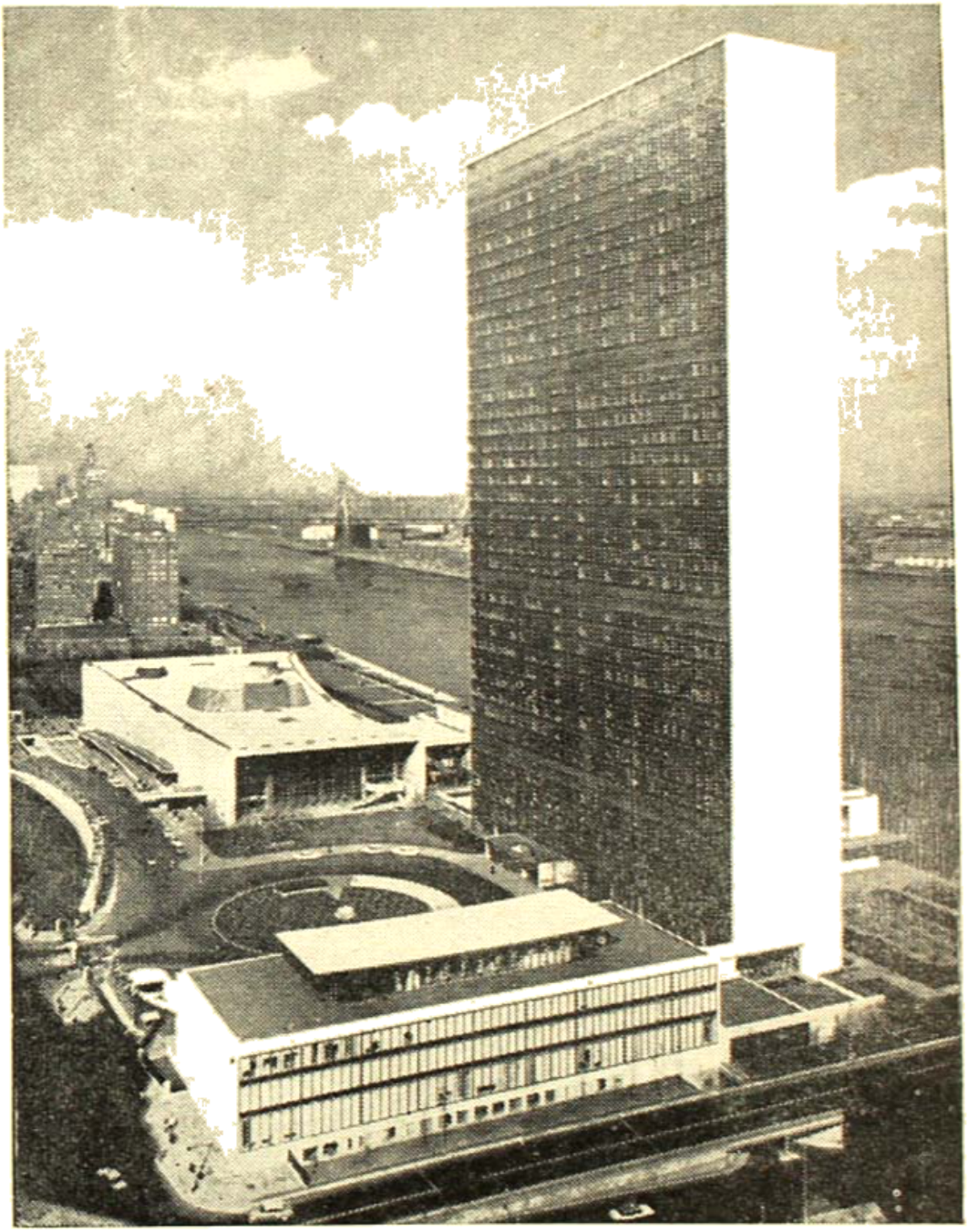

নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের প্রধান দপ্তর
স্থাপিত হয় কুড়ি বছর আগে।
বিশ্বমানবের শান্তির আশ্রয়ভবন রূপে
রাষ্ট্রসংঘ আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।

আন্তর্জাতিক ভারত
মহাসাগর সমীক্ষা।

এই যন্ত্রের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের
সমূনা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীগণ গভীর
সমুদ্রের নির্ভুল হিসাব করতে পারেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার আজারবাইজানের এক স্মরণীয় দিনে
চতুরত প্রাণোচ্ছল নরনারী

নৃত্যরত দুটি নগ্ন নারী মূর্তি। মূর্তিগুলো ও ওপরের দেওয়ালের শিল্পী সুপ্রিয়া

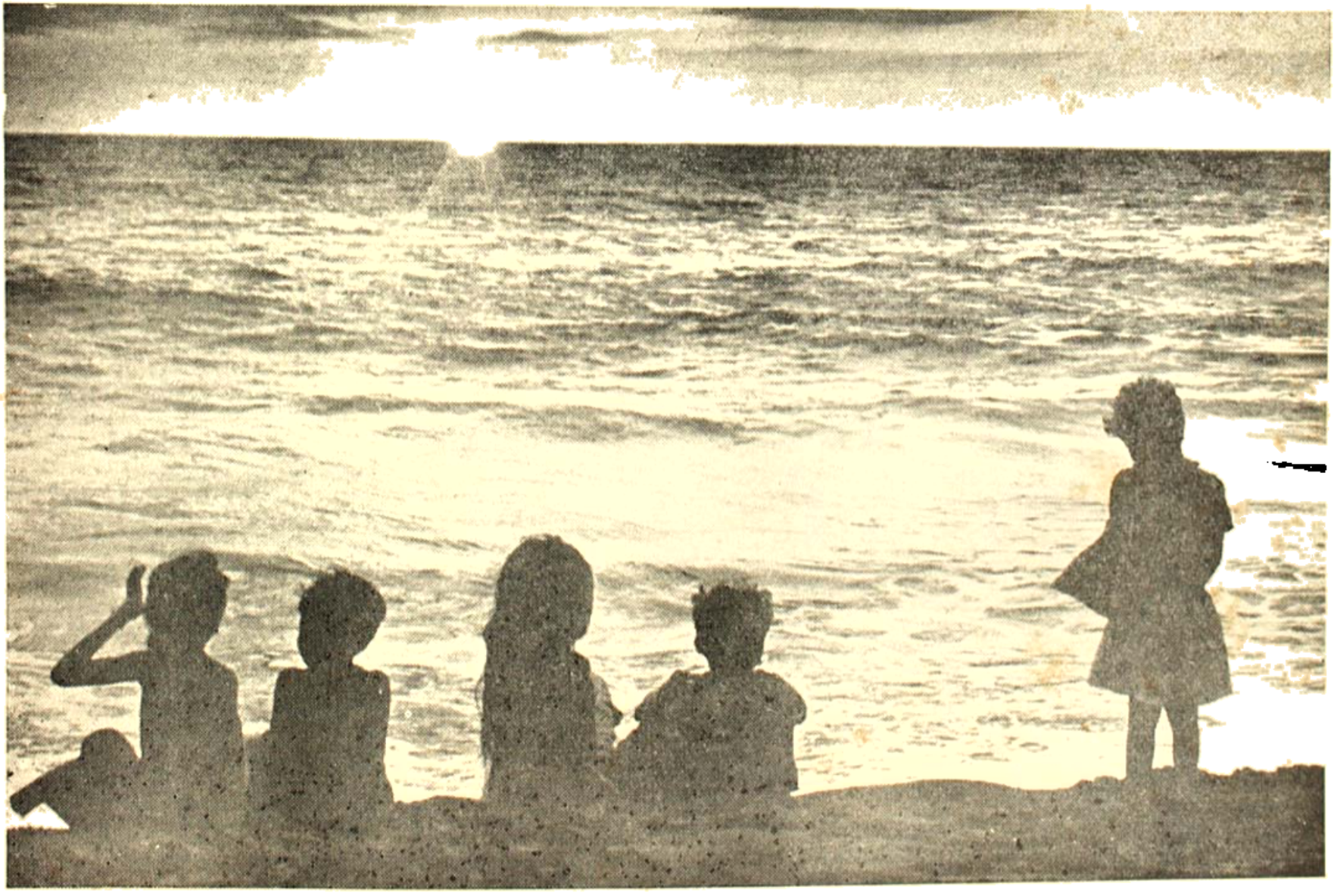

কেরলের সমুদ্র উপকূলে। অতল সমুদ্রের রহস্যভাণ্ডারের চাবিকাঠিটির
খোঁজে বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের অতি গভীরে পাঠাচ্ছেন সন্ধানী যন্ত্রপাতি।

ঐতিহাসিক মেডিসের গৃহ-প্রতিকৃতি।
এই গৃহেই তিনি তাঁর কর্মজীবনের ও বৈদেশ প্রতিষ্ঠানের

এ সময় খুব জল বা স্রোত নেই। এই নদী সামান্য এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে, সামান্য প্রপাতের মতো হয়ে অপর পাহাড়ে অধিকতর স্রোত ও জলধারায় প্রবাহিত দামোদর নদে সংযুক্ত হয়েছে। দুই জলধারার সংযোজন স্থানে লক্ষেন বারিধারা। ভৈরবীর জলধারা স্বচ্ছ ও দামোদরের ঈষৎ গৈরিক। পাহাড় ও জলের সংঘর্ষণে সর্বদাই একটি একটানা সুরের আওয়াজ। চতুর্দিকে পাহাড়, তার উপর ঘন বনরাজি এবং সম্মুখে পাহাড়ের উপর নেচে চলা দুই নদীর ত্রিকোণাকৃতি উচ্চ ভূমিতে বহু পুরাতন রাজরপ্পার মা ছিন্নমস্তার মন্দির। ভৈরবীর উৎপত্তিস্থান নিকটবর্তী কোন পাহাড়। দামোদর বয়ে আসছে কাছেই পালামৌর কোন পর্বত থেকে। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হস্তে নয়নাভিরাম এক দৃশ্য মেলে বসে আছেন। নির্জন ধ্যানগম্ভীর স্থান। সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র তাতে সন্দেহ নাই।

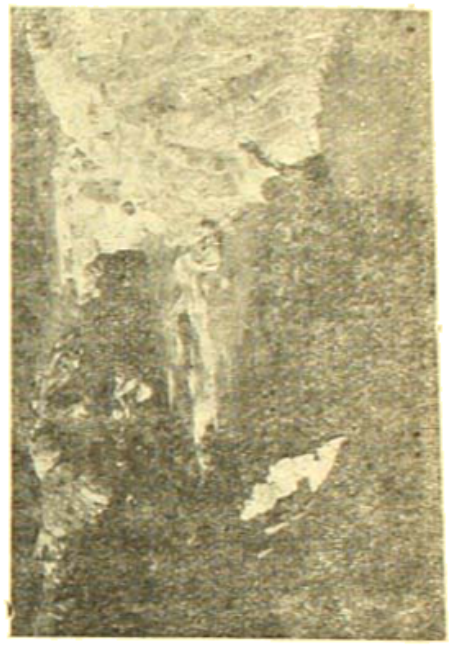

রাজরপ্পায় দামোদর নদ

ভৈরবী এখানে নৃত্যচপলা এক কিশোরী, বড় বড় প্রস্তর খণ্ডের নীচু বা উপর দিয়ে তার গতি। আর দামোদর স্রোত ও জলে পরিপূর্ণ বেগবান ও শক্তিমান এক যুবক। নাতি বৃহৎ পাহাড়ের তলদেশ ছুঁয়ে দামোদর বয়ে চলেছে।

দুপাশে খাড়াই পাহাড়। জলের স্রোতে ও রৌদ্রের সংস্পর্শে পাহাড়ের গায়ে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা। বেশী দূর এগিয়ে গিয়ে দেখার সুযোগ নেই, কেননা পথ বন্ধুর ও শ্বাপদসঙ্কুল। একটু বেলা পড়লেই এ স্থানে বাঘের আগমন বিচিত্র নয়। পায়ে হেঁটে চলা ভৈরবী পার হয়ে আমরা মন্দির দুয়ারে এলাম এবং মন্দির পশ্চাতে পাহাড় বেয়ে দামোদর নদের নিকটবর্তী হলাম। পাহাড়ের এককোণে দামোদরে সাবধানতার সঙ্গে স্নান সমাপন করা হোল। স্বল্পকাল মধ্যেই পূজার উপাচারসহ মা ছিন্নমস্তার মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলাম।

রাজরপ্পায় ভৈরবী ও দামোদর নদের সংযোগ

মন্দিরের মাত্র একটি প্রবেশ দ্বার। মন্দির সুদৃঢ় পাথরে তৈরী, ভিতরটি স্বল্প অন্ধকারময়। মন্দির অভ্যন্তরে উত্তর পার্শ্বে ছোট একটি বেদী, বেদীর উপর মা ছিন্নমস্তার মূর্তি মাতা দক্ষিণাস্য হয়ে বিরাজ করছেন। প্রায় দেড়ফুট চৌকা একটি ধূসর বর্ণ প্রস্তরে মাতৃমূর্তি উৎকীর্ণ। মূর্তি কোন শিল্প-চাতুর্যে সমৃদ্ধ নয়, অস্পষ্ট ভাস্কর কার্য, দর্শনেই বোঝা যায় অতি পুরাতন মূর্তি। বৈদ্যনাথ ধামের শ্রীদুর্গার মূর্তির সমসাময়িক মূর্তি, অথবা মনে হয় আরো পুরাতন। মন্দিরের মধ্যে

আর কোন মূর্তি বা আলেখ্য নেই। কঠিন প্রস্তরে তৈরী গম্বুজটি একটি সোনাকার প্রস্তরে প্রস্তুত। মন্দিরের বাহিরের উৎকীর্ণ শিল্পকলা বহু পুরাতন। মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত ভিতরেই উপবিষ্ট ছিলেন। বাঙালী পুরোহিত। তাঁরা প্রায় দশ পুরুষ ধরে মায়ের কাজে ব্রতী আছেন। কথাবার্তায় একটু বিহারী টান দেখা যায়। পুরোহিত মশাই আমাদের মায়ের মূর্তি স্পর্শ করে পূজা করার অনুমতি দিলেন। আমরা মাকে নানা উপাচারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরিতৃপ্ত হলাম। দীপ, ধূপে, পুষ্পগন্ধে ও চন্দনে মন্দির পরিবেশ মনোরম হয়েছে। মায়ের বেদী ও পাদস্পর্শ করা মাত্র শরীরে এক শিহরণ অনুভব করা যায়।

মন্দির বা মাতৃমূর্তি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কেহই সে কথা সঠিক বলতে পারেন না। এক সাধু মহারাজ কদাচিৎ এখানে এসে থাকেন। এ সময়ে শ্যামাপূজার সময় তিনি আবার এখানে এসেছেন, তিনি বললেন, এক সাধক প্রায় ৫০০।৬০০ বৎসর পূর্বে এই মূর্তির সামনে সাধনা করতেন। তদানিন্তন রামগড়ের রাজা এই সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং এই মন্দির তৈয়ারী করেন। মাত্র দুবছর পূর্বে এ অঞ্চল আরো জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বেলা ২টার পর এখানে থাকা বিপদসঙ্কুল ছিল, দ্বিপ্রহরের পর বন্য তন্ত্র বাঘের দেখা পাওয়া অসম্ভব ছিল না। দুবছর পূর্বে শ্যামপুকুর নিবাসী শ্রীসুকুমার বসু হঠাৎ এক অন্তরের প্রেরণায় মায়ের দর্শনে আসেন। তিনি সাধারণ গৃহস্থ, পূজ্যপাদ আচার্য করুণাময় সরস্বতীর কাছে তাঁর দীক্ষা। তিনি মায়ের কৃপায় অনন্যসাধনে রত। এই দুবছরে তিনি মন্দির সংস্কার করেছেন। তার চতুর্দিকে সুন্দর প্রাচীর দিয়েছেন, প্রায় দুই হাজার গাছ কেটে মন্দিরের চতুর্দিক পরিষ্কার করেছেন। কয়েক বিঘা জমি নীচু পাঁচিলে ঘিরে, সেখানে নানারূপ ফলের গাছ লাগান হয়েছে এবং সেখানে একটি ছোট খাটো দীঘি কাটাবার ব্যবস্থা হয়েছে। একটি সুপেয় জলে পরিপূর্ণ কূপ কাটানো হয়েছে, এবং আরো খানিকটা স্থান নিয়ে সুন্দর এক ফুলের বাগান করা হয়েছে। বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী ইত্যাদি নানা দুষ্প্রাপ্য গাছ এখানে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে।

রাজরাপ্পার ছিন্নমস্তার মন্দির

মন্দিরের বাহিরে চতুর্দিকে মায়ের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়। বলির পিণ্ডের উপর ছাগ বা মহিষ শিশু বলি দেওয়া হয়, মন্দির প্রাকারের চারিদিকেই রক্তধারা। মন্দিরের বাহিরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এখন একটি নূতন হাঁড়িকাঠ করা হয়েছে এবং মনে হয় এখন থেকে ঐ স্থানে বলি দেওয়া হবে। এবার মন্দির সংলগ্ন স্থানে তেরটি কুণ্ড করা হচ্ছে সেখানে তন্ত্রমতে সাধনা করার সুবিধা হয়। মন্দিরে উত্তরে উঁচু জমিতে বহু পুরাতন একটি যাত্রীবাস আছে। প্রায় দুবছর পূর্বে বিড়লা একটি তিনচার কামরা বিশিষ্ট নূতন যাত্রীনিবাস করে দিয়েছেন। শুনলাম রাত্রে এখনও এখানে সাবধানে থাকতে হয়। কেননা বর্তমানেও বাঘের আগমন বিরল নয়। সুকুমারবাবু এখানে

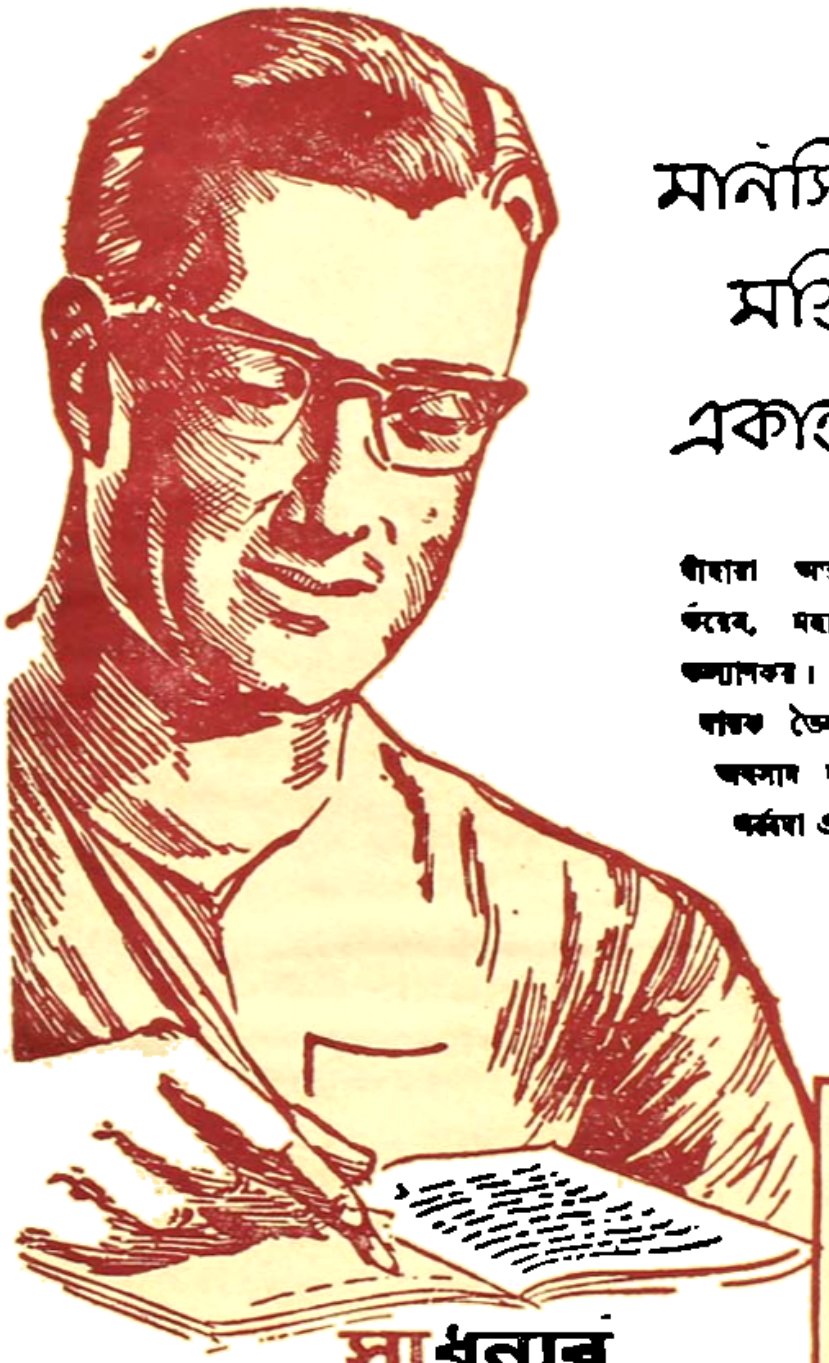

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে

সাধনার

মহা ভৃঙ্গরাজ তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কবিরাজ শ্রেষ্ঠ – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম, বি, বি, এস, (ঢাকা) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ.
আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য, এল, সি, এস, (লণ্ডন) এফ, সি, এস (আমেরিকা)
[illegible]

Cover painted by—

Regd. No. C3643 CALPA-BHARATI Bengali Monthly June 1965 Price Re. 1·00 Phone 55-3284

12 JUL 1965

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী
কমলা কমলদল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাম্।

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্;
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।
বন্দেমাতরম্॥

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মীঘি-এর প্রস্তুতকারক
লক্ষ্মীদাস প্রেমজী কর্তৃক প্রচারিত